সেরা ভ্রমণ কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড



অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

সেরা ভ্রমণ কাহিনী
দ্বিতীয় খণ্ড
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

স্বর্ণাক্ষর

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

SERA BHRAMAN KAHINI PART-II
A collection of travelogues

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৬ **মুদ্রণ সংখ্যা** ১০০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ডিসেম্বর ২০০৯ **মুদ্রণ সংখ্যা** ১০০০

ISBN : 81-86891-52-8

প্রকাশক
সবাণী চক্রবর্তী
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস
৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড
কলকাতা- ৭০০ ০০৯

দাম ২৭৫ টাকা

ভূমিকা

'সেরা ভ্রমণ কাহিনী' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল দু-বছর আগে, ২০০৩-এ। দশ বছরের 'ভ্রমণ' থেকে সংকলিত একশোরও বেশি ভ্রমণকাহিনীর হাজার পাতার সেই মহাসংকলন মাত্র দু-বছরে তিন হাজার কপি নিঃশেষিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত।

সেই আনন্দে এই দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডের ভ্রমণকাহিনীগুলি গত তিন বছরের 'ভ্রমণ' থেকে সংকলিত। দুয়েকটি লেখা পূর্ববর্তী 'ভ্রমণ' থেকেও উদ্ধৃত হয়েছে।

কলকাতা
২১ জানুয়ারি, ২০০৬

প্রথম খণ্ডের ভূমিকা

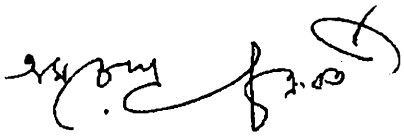
বাংলা ভ্রমণসাহিত্য গুণে হিমালয়তুল্য হয়েও পরিমাণে বিন্ধ্যপর্বতও নয়, বড়জোর মাঠাবুরু কি মেঘাতাবুরু। কিংবা গুণে যদি গঙ্গা, তো পরিমাণে—গোদাবরী? মনে হয় না, খুব বেশি হলে বাঁকুড়ার কংসাবতী বা ঝাড়গ্রামের ডুলুং বললেই ঠিক হয়। এ যেন সমুদ্রপরিমাণ খিদে মেটাতে একমুঠো খুদের যোগান।

ভ্রমণগ্রন্থের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয় হবার একটা কারণ নাকি এর কম ক্রেতা। 'ভ্রমণ' পত্রিকার সূচনায় দেখেছি গরিষ্ঠ পাঠকশ্রেণী চান ভ্রমণ-গাইড, ভ্রমণকাহিনীতে তাঁদের আগ্রহ কম। এই মর্মান্তিক আবিষ্কারে একসময় 'ভ্রমণ' প্রকাশ বন্ধ করার কথাও ভেবেছি। তারপর ভ্রমণ-গাইডের পাশাপাশি নিয়মিত দুয়েকটি ভ্রমণকাহিনী পরিবেশন করে শেষ পর্যন্ত শারদীয় সংখ্যায় শুধুই ভ্রমণকাহিনী ক্রমশ অধিক পাঠককে আকর্ষণ করছে দেখে আমরা আহ্লাদিত। তবে, ভ্রমণসাহিত্যে আমাদের যদি কিছুমাত্র অবদান কোথাও থাকে তা হয়তো ভ্রমণকথারচনার গঙ্গাকে মহাদেবের জটা থেকে মর্ত্যে নিয়ে আসায়। এভাবেই

'ভ্রমণ' পত্রিকা বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের জয়যাত্রায় হয়তো অজান্তেই শামিল হয়ে গেছে।

দশ বছরের 'ভ্রমণ' থেকে নির্বাচিত একশোরও বেশি ভ্রমণকাহিনী নিয়ে এই বৃহৎ ভ্রমণকথাসংকলন। সম্ভবত, বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ ভ্রমণকথামৃত। একথাও নিশ্চিত করে বলা যায় যে কোনও একটা বইয়ে ভূ-ভারতের এত বেশি স্থানের ভ্রমণকাহিনী এর আগে আর সংকলিত হয়নি। সেদিক থেকে আমাদের এই বইকে ভ্রমণের মহাভারত বলা যায়, হয়তো।

তবে বিপুল এই ভ্রমণগ্রন্থ সংকলনের মহাভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ভ্রমণ-এর বর্তমান সম্পাদক মহাশ্বেতা আমাকে সশ্রম সাহায্য না করলে কাজটি চিরকাল কল্পনা হয়েই থেকে যেত, কখনও সম্পূর্ণ করতে পারতাম বলে মনে হয় না। পাঠকের ভালো লাগলে তবেই আমাদের সকলের সব শ্রম সার্থক।



সূচি

পাখা মেলে বক্সায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় যেই আমার হাত দেখেছে, সেই বলেছে— নাঃ, তোমার কপালে সমুদ্রযাত্রা নেই।

কথাটা যে এমন অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হবে কখনও ভাবিনি।

কিন্তু আমার জীবনে সেটাই ফলে গেল।

সেকালে সাতসমুদ্র তেরোনদী পার হতে গেলে জাহাজই ছিল তার একমাত্র উপায়। আকাশপথেও যে সমুদ্রলঙ্ঘন করা যায়, সে কথাটা কারও মাথাতেই আসত না।

জাহাজে একেবারে চড়িনি তা নয়। কিন্তু সে তো নোঙর-ফেলা জাহাজ। ভাসন্ত হলেও চলন্ত নয়।

চলন্ত জাহাজে চড়েছি একবারই। মিশরের পোর্ট সৈয়দে। যাত্রীবাহী জাহাজে নয়। মাছ-ধরা ট্রলার। পাহাড়ের কোলের কাছে দু-পা গিয়ে বড় বড় বড়শিতে মাছের টোপ দিয়ে মাছ গেঁথে ঝড়ের মুখে টলতে টলতে সেই মাছ পুড়িয়ে খাওয়া। সেইসঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে থ্রি-চিয়ার্স।

সেই প্রথম আর সেই শেষ।

সমুদ্রযাত্রার পাট উঠে গেছে এখন। শখ করে জল বেড়ানোর ব্যাপারটা আলাদা।

নইলে ভবঘুরেদের আজ আর নাক বরাবর যাত্রা নয়। উল্লম্ফন ছাড়া তাদের আর গতি নেই।

সাধে কি আর সমর সেন আমাকে খোঁটা দিয়ে একবার কাগজে লিখেছিলেন— ছিল পদাতিক, আজকাল খুব উড়ছে।

কথাটা মিথ্যে নয়।

কেননা একটা সময়ে সত্যিই মাটিতে আমার পা পড়ত না। ল্যাজ মোটা হয়েছিল বলে নয়। পকেট গড়ের মাঠ হলে কী হয়, দশচক্রে আমাকে হতে হয়েছিল যৎপরোনাস্তি উড়নচণ্ডি। আজ এদেশে তো কাল আরেক দেশে।

আমাদের কালে বিদেশযাত্রা বলতেই বোঝাত বিলেত যাওয়া। একবার বিলেত ফেরত হতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে তার দাম বেড়ে যেত।

বিলেতযাত্রীরা গলায় ফুলের মালা প'রে হাওড়া ইস্টিশনে বোম্বাইয়ের ট্রেন ধরত। সে ছিল এক দেখার মতো দৃশ্য। কাগজে ছাপা হত ছবি। জামাই করার জন্য হত্যে দিয়ে পড়তেন হবু শ্বশুরের দল।

বোম্বাইতে জাহাজে ওঠার সময় হত আরেক পর্বের বিদায়। আরও একবার ফুলের মালা। আপনজনদের আরও একবার অশ্রুবিসর্জন।

এইসব কারণেই বোম্বাইকে তখন বলা হত হাফ-বিলেত।

হাফ-বিলেতের পদস্খলন শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর।

সমুদ্রপথে শেষ নিশ্বাস ফেলেছিল বোধহয় যাত্রীবাহী বাতোরি জাহাজ।

ব্যস, সেই থেকে শুরু দেশছাড়াদের আকাশযাত্রা।

গণনার ভুলে মাথা কাটা যেতে লাগল হস্তরেখাবিদ গণৎকারদের। হাতে যার সমুদ্রযাত্রা নেই, সেও দিব্যি ড্যাংডেঙিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পারাপার করতে লাগল।

এতদিন যে স্বপ্ন দেখেছি, তার চারপাশে ছিল ছাঁ-পোষা মধ্যবিত্তের গণ্ডি। টিকিট কাটা যাত্রী হয়ে নয়, খালাসি হয়ে নিখরচায় ভ্রমণ। কিন্তু ফুটো পকেটে তো আর আকাশে পাড়ি দেওয়া যায় না।

কিন্তু স্বপ্ন কারও কোনও বাধ্যবাধকতাই মানে না।

সমুদ্রযাত্রা যখন সেকেলে হয়ে গেল, তখনও দেখে চলেছি জাহাজে চড়ে দেশভ্রমণের স্বপ্ন।

কিন্তু উড়োজাহাজ?

স্বপ্নে নৈব নৈব চ।

তখন আমার ডানা ছাঁটা। আন্দোলন করে ধরা পড়ে এ-জেল ও-জেল করছি।

সেবার একটানা সাতচল্লিশ দিনের অনশন।

শুনছি আমাদের কথা ভেবে দেশের লোকের নাকি চোখে ঘুম নেই। সরকার না নড়লে তারাই জেল ভেঙে আমাদের বার করে নিয়ে যাবে।

কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে সবাই আমরা সতৃষ্ণ নয়নে জেলগেটের দিকে চেয়ে কান খাড়া করে রয়েছি। আর ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টাচ্ছি।

খবর আসছে, সরকার নাকি আমাদের টিট করতে পাহাড়ে নির্বাসনে পাঠাবে।

মনে মনে ভাবছি, কেন কালাপানি নয়? তাহলে তো মজা করে জাহাজে চড়া যেত।

বাইরে থেকে আমাদের ভরসা দেওয়া হচ্ছে— সরকারের সাহস হবে না তোমাদের অন্য কোথাও চালান করার। দেশের লোকে রেলের লাইনই নাকি

রাতারাতি উপড়ে ফেলবে।

ইতিমধ্যে মরে হেজে কোনওরকমে তো আমরা অনশনের পাট শেষ করে গলা ভাত খাওয়া শুরু করেছি।

এক ওয়ার্ড থেকে আরেক ওয়ার্ডে শুরু হয়েছে আসা-যাওয়া। অনশনের গোড়ায় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে প্রভাত-সুমন-মুকুল। সেই শূন্যতা আমাদের মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে। অনেকদিন পর যাকেই দেখি, দুজনেরই ভূত দেখে চমকে ওঠার মতো অবস্থা হয়। একেকজন যেন চামড়ায় ঢাকা একেকটা কঙ্কাল।

ছ নম্বরে চারু মজুমদার। সাতে শিবদা। আটে জলি ইলিয়াস। নয়ে কেষ্ট ঘোষ আর সুশীতল রায়চৌধুরী। দশে আর সি পি আই।

আস্তে আস্তে ফিরে পাচ্ছি হারানো খেই। আবার সেই খেলার মাঠ। স্টাডি ক্লাস। দ্বিতীয় খণ্ড ক্যাপিটাল। টি ক্লাব।

ঠাঁই নাড়া হওয়ার কথা মনেই ছিল না।

হঠাৎ মাঝরাতে লক আপ খোলার শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। সেপাইতে সেপাইতে ছয়লাপ।

লটবহর জলদি গুছিয়ে নিতে হবে।

এসে গেছে জেলবদলির পরওয়ানা।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল বাড়ি। মনের কোণে ওৎ পেতে ছিল একটা ভয়। সেই ভয়টা লাফিয়ে সামনে এসে গেল। দাদা মারা যাওয়ার পর এখন আমি বাবার সবেধন নীলমণি। খোঁড়া পা নিয়ে সপ্তাহান্তে একবার বাবা আমাকে চোখের দেখা দেখে যান। আমি অন্য কোথাও চলে গেলে?

এইসব সাতপাঁচ ভাবছি আর টুকিটাকি যা আছে টিনের ট্রাঙ্কে ভরে নিচ্ছি।

বাক্স হাতড়ে পেয়ে গেলাম। একটা আখোলা বিস্কুটের টিন।

তখন মাঝরাত্তির। পাশের সেলে গঙ্গা সিং এখন বদ্ধ উন্মাদ। হাঙ্গার স্ট্রাইকের পর থেকেই ওর এই হাল।

লক আপ খুলে বেরিয়ে আসার সময় লোহার গরাদ গলিয়ে বিস্কুটের টিনটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম —গঙ্গা সিং, ভালো থেকো।

ও তখন মুখে থুথু ছিটিয়ে সমানে সেপাইদের গাল পাড়ছে। আমাকে দেখতেই পেল না।

আমরা উঠে বসতেই জেলখানার কয়েদগাড়ি ছাড়ল।

কোথায় যাচ্ছি কিছুই জানি না। জেনেই বা কী হবে। যাচ্ছি তো নিজেদের ইচ্ছায় নয়।

বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

রেলের লাইন যাদের উপড়ে দেওয়ার কথা, তারা নিশ্চয় এখন কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

কত গল্পই না শোনানো হয়েছিল।

কদিন আগেই তো জেলের পাঁচিলের বাইরে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে হুটপাট করে আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। জেসপ কারখানায় হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড।

আমরা ধরেই নিয়েছিলাম এবার জেলগেট ভাঙবে।

শেষপর্যন্ত, আমাদের মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল।

দীর্ঘকাল চার দেওয়ালে বন্দী থাকার পর খোলা আকাশের নীচে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানোর কী যে আনন্দ তা বলার নয়।

আর সেই জন্যই গাড়ি ছাড়তেই শুরু হয়ে গেল আমাদের খুশিতে উপচে ওঠা গান। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'।

মনে মনে বলছি— ছি, ছি, আবার সেই রবিঠাকুর? কদিন আগেই আমরা না তাঁকে 'বুর্জোয়া' বলে পাঁতি দিয়েছি!

এদিকে হুস করে যে বলতে বলতে আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছি, এটা বুঝতে পেরে বেজায় রাগ হল। এ আবার কোথায় এলাম। রেল স্টেশন বলে তো মনে হচ্ছে না।

জানলা দিয়ে দেখা গেল, অন্ধকার আকাশটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে সার্চ লাইটের আলো ক্রমাগত পাক খাচ্ছে।

কে যেন চেঁচিয়ে বলল— ও। এ তো আমাদের দমদম।

ঘুরে ফিরে আবার সেই দমদম?

মনটা খিঁচড়ে গেল।

হঠাৎ কানে এল— এরোড্রোম। ওই দেখ, রানওয়ে।

যুদ্ধের পর ডিসপোজালে কেনা একটা রংচটা ডাকোটা।

ঠেলেঠুলে তাতেই আমাদের তুলে দেওয়া হল। বসার সিট নেই। কয়েকটা ফাঁকা প্যাকিং বাক্স। বাকি সবাই উবু হয়ে খালি মেঝেতে বসা।

একবার ডানদিক, একবার বাঁদিক। সমানে কাতরাতে কাতরাতে বাগডোগরায় পৌঁছে গেলাম।

যতই দুর্ভোগ হোক, চোখে বাইরের ছিটেফোঁটা না দেখেও আওয়াজে বুঝলাম আকাশে উড়ে চলেছি।

তারপর লরির মাথায় ঠাসবন্দি হয়ে একের পর এক চা-বাগান পেরিয়ে চড়াইপথে সান্তালবাড়ি।

তারপর?

'আমি আজও ভুলি নি।

সামনে পিছনে সশস্ত্র পাহারা
আকাশ পত্রজালে ঢাকা

আমরা বন্দীর দল
পাথরে পা টিপে টিপে উঠছি।

হঠাৎ আমরা কথা বন্ধ করলাম
তারপর কান পেতে শুনতে লাগলাম
স্তব্ধ পাহাড়ে
ছলাৎ চ্ছল ছলাৎ চ্ছল
এক অদৃশ্য ঝর্নার শব্দ ...

এতক্ষণ বলতে ভুলে গিয়েছি। জেলের বন্দীদশায় আমার জীবনে বিনামূল্যে সেই প্রথম হাওয়াই সফর।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৩

তুতুলের সঙ্গে কোনারকে

মহাশ্বেতা দেবী

'ভ্রমণ'-এর জন্য লেখালেখি নিয়ে ছোট মহাশ্বেতা, বড় মহাশ্বেতাকে তাড়া দিচ্ছে। অতএব মহা দুঃখে আছি। দুঃখের সময়ে আমার বাবাকে মনে পড়ে। বাবাকে আমি তুতুল বলতাম। 'তুতুল' বইটা যে পারো পড়ে নিও।

আমার মা ছিলেন ভ্রমণপাগল। এই চলে গেলেন দেওঘর, আবার গেলেন দক্ষিণ ভারত। নয়তো পাঁচথুপি গ্রামে গিয়ে পুরনো জমিদার বাড়িতে সারা রাত 'মনসামঙ্গল' গান শুনলেন। কোথায় যাচ্ছি, সেটা বড় কথা নয়। বেড়াতে যাচ্ছি, তাতেই মা খুশি।

তুতুল হচ্ছেন ঠিক উল্টো মানুষ। মায়ের কঠোর শাসনে মাঝে মাঝে বেড়াতে বেরোতেন। কিন্তু ঘরে ফেরার জন্য বেজায় ব্যস্ত। একবার মা আর বড়মাসিকে নিয়ে পুজোর সময়ে দিল্লি, আগ্রা, এলাহাবাদ, মথুরা, হরিদ্বার বেড়িয়ে এলেন। আমার বয়স ১৪। অতএব আমি চার ভাইবোনকে সামলে রাখব। মায়ের চিঠি লেখার খুব অভ্যাস ছিল। রোজই বোধহয় পোস্টকার্ড লিখতেন। ওঁরা সেবার বাইরে থেকেছিলেন এক মাস, কি আঠাশ দিন! যত বলি, এত কম দিন থাকলে? ওসব জায়গা কি কেউ সহজে দেখতে যেতে পারে? তুতুল ততই মধুর হেসে বলেন, বাড়ি ছেড়ে কি অতদিন থাকা যায়? এহেন তুতুল ১৯৩৫-৩৬ সালে মেদিনীপুর থেকে কলকাতা হয়ে আমাদের পুরী নিয়ে গেলেন। মিছে বলব না, পুরো সাতদিনের জন্য। এখন পুরী যাওয়ার একাধিক ট্রেন! সেদিন শুধু পুরী প্যাসেঞ্জার আর পুরী এক্সপ্রেস বলেই মনে হচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমরা পাঁচ ভাইবোন, মা আর বাবা। আমি তো জানলার ধারেই বসব, আর প্রাণ থাকতে চোখ বুজব না। মা মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ি ব্রোচ এঁটে পরেছেন। কানে মুক্তোর টপ, গলায় তিন লহরী সোনার চেন। পায়ে নাগরা জুতো। দেখতেও সুন্দরী। আবার তেজস্বিনী। মায়ের সঙ্গে গেলে মনে মস্ত ভরসা থাকত। মা বললেন, পুরীতে আমরা থাকছি কোথায়?

কেন, সুধাকর দাদার হোটেলে?

ছেলেমেয়ে নিয়ে হোটেলে?

—ওঁদের বসবাস ছিল। সুধাকর দাদার ভাই মারা যায় জলে ডুবে, সেই থেকে

ভর... তখন পুরীতে বোধহয় শুধুই রিকশা, নইলে এক্কাগাড়ি। 'স্নেহমুকুল' বাড়িটি মায়ের খুব পছন্দ হল। চমৎকার দোতলা। সিঁড়ির মুখে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা শাজাহান ছবির কপি। যে ঘরখানা আমাদের খুলে দিল, সেটি অতীব সাজানো। খাট, পালংক, বিছানা বালিশ স-ব আছে। বারান্দায় জালের আলমারিতে ফল, তরকারি সাজানো। সমুদ্রের বাতাসে সব সজীব থাকে। ঘর দুটো। জানলা খুললেই সমুদ্র। বারান্দায় বসলে সমুদ্রের বাতাস। মনে হত, হাওয়ায় উড়ে যাব। তুতুল আর মা ভোরে সূর্যোদয় দেখতেন।

মা বলতেন, পুরী এলাম তো বেড়াচ্ছি কোথায়?

তুতুল আমাকে বললেন, তোর মা তো আমার ওপর ভরসা করেন না! নাই করলেন! আমিও... পুরীতে এলে কাদের পরামর্শ নিতে হয় বল তো?

—কাদের?

—কেন, নুলিয়াদের? ওদের মতো জলের খবর রাখে কে? ওদের সঙ্গে বেড়াবার প্ল্যান চলছে।

রাতে খাওয়ার সময়ে বললেন, কাল সকাল চারটেয় উঠে সবাই তৈরি হয়ে নেবে। আমরা বেড়াতে যাব।

—কোথায়?

—আহা! সে কি বলতে আছে? বলে মুচকি হাসলেন।

তুতুলের পক্ষে বেড়াতে যাওয়া মানে প্যাঁচ দেওয়া পেতলের ছোট কলসিতে খাবার জল। অনেক রকম খাবার, তোয়ালে, সাবান আরও কত কি! বিষ্ণুপুরের নকশা কাটা শতরঞ্চি তো থাকবেই। শৈশব থেকে ওই শতরঞ্চি যে কত জেলায়, কত বাড়িতে, কত মাঠে, ঘুরেছে, তা কেউ জানে না।

ভোর না হতে এক পেল্লায় হুড খোলা গাড়ি এসে পড়ল। বাবার সুধাকর দাদের পুরীতে জমিদারি ছিল। তা দেখাশোনা করতেন ওঁদের ম্যানেজার চতুর্ভুজ রথ। ওই জমিদারিতে ছিল সুধাকর দাদার বাবার কেনা হুড খোলা অস্টিন। বিশেষ দরকারে গাড়ি বেরোত। আজ তো একটা বিশেষ দিন।

যাচ্ছি আমরা ভুবনেশ্বর। চতুর্ভুজ রথ বললেন, আমি তোমাদের কাকা হলাম।

মা সৌজন্যের হাসি হাসলেন। কত জায়গায় আমাদের কত কাকা, কে তার হিসেব করে? নতুন কাকা বললেন, কোনও কষ্ট হবে না। সব ব্যবস্থা আমি করেছি।

আমি নিশ্বাস ফেললাম। এটাও নতুন নয়। তুতুলের সঙ্গে বেরোলে এমন কাণ্ড আগেও হয়েছে।

পথে কোথায়, কার বাড়ির আমবাগানে (চতুর্ভুজবাবুর আত্মীয়র বাড়িই হবে) আমাদের শতরঞ্চি পেতে বসে আমরা লুচি, পায়েস আর জিলিপি খেলাম। মনে আছে, ঝকঝকে কাঁসার রেকাবিতে মহিলারা একটি গোটা পানের পাতা চিরে চিরে ছোট্ট ছোট্ট খিলি মুড়ে দিয়েছিলেন। সে দেখার মতো শিল্প বটে। খেয়ে দেয়ে আবার

রওনা। উদয়গিরি, খণ্ডগিরি দেখার সময়ে মা ওইসব সময়ের ইতিহাস বললেন। বড় বড় মন্দির, সেই আশ্চর্য পুকুর, যার জল সব রোগ সারিয়ে দেয়, তাও দেখা হল। মন্দিরের ভেতরে কত যে বাদুড়, তা বলতে পারি না।

ফেরার সময়ে তুতুল বললেন, এবার যাব কোনারক। কোনারকের সূর্যমন্দির না দেখলে কি ওড়িশা দেখা হয়? চতুর্ভুজ! কোনারক যাওয়ার ব্যবস্থা কী?

—কেন, গরুর গাড়িতে?

—আর কিছু নেই?

—ঘটকবাবু! গরুর গাড়িতে যাবেন। বিকালে রওনা হবেন, ভোরে পৌঁছবেন। রাস্তাখানা অবশ্য... মাঝে মাঝেই এ, সে, উঠতে চাইবে, জয় মহাপ্রভু জগন্নাথ বলে চলে যাবেন। কোনও বিপদ হবে না।

—বিপদ মানে?

—তিনিরা হলেন দেবদেবতার খেলা! মানুষ তো নন!

মা বললেন, পথ তো অন্ধকার হবে।

—ওই মহাপ্রভুই রক্ষা করবেন। জোনাকি নিয়ে জোনাকপরীরা সঙ্গে যাবে। তবে হ্যাঁ... আসার কালে মাঝরাতে গাড়িতে চাপবেন, সকালে পৌঁছে যাবেন।

—ওই পথে? আবার অন্ধকারে?

—'জয় জগন্নাথ' বলে চলে আসবেন। কত যাত্রী যাচ্ছে আর আসছে!

তবে হ্যাঁ— পাটনার, না কলকাতার ছোকরা বাবুরা এসে মাঝপথে নেমেছিল, হ্যাজাক বাতি জ্বেলে তাস খেলেছিল। গাড়োয়ানের কোনও কথা শোনেনি। সকালে দেখা গেল কে কোথায় পড়ে আছে! দূরে দূরে!

তুতুল আমাকে বললেন, জোনাকপরীরা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, বুঝলি?

বলেছি তো, মায়ের সাহস চিরদিনই বেশি। মা বললেন, কোনও ভয় নেই। সারা রাত কোনারকের পথে। কি অ্যাডভেঞ্চার না হবে! আমি তো দেখতে দেখতে যাব।

আমি বললাম, তুতুল?

—উনি ঘুমোবেন। তোদের যার ইচ্ছে, ঘুমোবি।

আমার খুব প্রতিজ্ঞা আমি ঘুমোব না। ঘুম পেলেই ভিজে রুমালে চোখ মুছে নিচ্ছি। পুরী থেকে এসেছি। সমুদ্র কখন কাছে, কখন দূরে, হাওয়ার শব্দে তাও বুঝি না। গাড়োয়ান মাঝে মাঝে ধমকে উঠছে, দূর হ! দূর হ!

ক্ষীণস্বরে বললাম, কাকে বকছ গো তুমি?

—এই যত উৎপাত! ভালো কথা বললেই গাড়িতে চাপবে!

আমি মাথা তুলে তুলে দেখছি। কই, কাউকে তো দেখতে পাই না! ওপর পানে তাকাচ্ছি, আকাশখানা তারায় ঝলমল করছে যেন! কিন্তু আমাদের আশপাশে যেন স্নিগ্ধ আলো! চাঁদের আলোর মতো মিষ্টি।

জোনাকি!

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি! নির্ঘাৎ জোনাকপরীরা জোনাকি নিয়ে নেমে এসেছে। আকাশও যেন একটু ফ্যাকাসে হচ্ছে। আমি বললাম, তুতুল!

—দেখেছিস তো?

—দেখেছি, দেখেছি!

আমি তুতুলের হাতে হাত বোলাচ্ছিলাম। কী চমৎকার অভিজ্ঞতা না হল! তুতুল নইলে কে আমাকে জোনাকপরী দেখাত, বলো?

[illegible]' অক্টোবর, ২০০৪

আমার ভ্রমণের একাল সেকাল

মহাশ্বেতা দেবী

'ভ্রমণ'-এর পাঠক-পাঠিকাদের জন্য যাই লিখতে চাই, বড় বেশি সেই সময়ের কথা লিখে ফেলি, যখন ভ্রমণ বড় জোর ট্রেনে বা স্টিমারে বা নৌকোয় হত। আর ট্রেনে কোথাও যাচ্ছি মনে হলেই চোখ বুজে দেখতে পাই তখনকার বড় বড় ট্রাঙ্ক, বিশাল মোটা বিছানার বান্ডিল, টিফিন ক্যারিয়ার, ইত্যাদি ইত্যাদি। 'দূষণ' শব্দটি জানতাম না। পথেই ট্রেনের খানাকামরার খাবার, অথবা স্টেশনের লুচি মিষ্টি, পানিপাঁড়ের জল খেতাম। কখনও কারও অসুখ বিসুখ হয়নি।

সময় কাটল। চলাফেরায় লটবহর কমতে থাকল। আর, 'ভ্রমণ' যখন সম্পাদকের মনে কুঁড়ি হয়েও ফোটেনি, সেই ষাটের দশকে ঘুরে নিলাম হিমালয়ে, যখন গঙ্গোত্রী-গোমুখ যেতে হলে হরশিল থেকেই হাঁটো। ভৈরবঘাটির চড়াই ভেঙে জঙ্গল-রেস্টহাউসে থাকো এক রাত, পরদিন হেঁটেই চলে যাও গঙ্গোত্রীর দরজায়। দর্শনার্থী বা ভক্ত, কারও বিষয়ে পূজারীদের তরফে কোনও জুলুম নেই। এমনই ঘুরেছি কালাবোট, ডালহৌসি, কুলু, মানালি, চাম্বা, আলমোড়া, যোগেশ্বরের আশ্চর্য মন্দির ও মিউজিয়াম, নৈনিতাল ইত্যাদি। সেদিন কাঁধে একটি ঢাউস ব্যাগ। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে ভ্রমণের সরঞ্জাম হালকা হচ্ছে।

আজকাল 'ভ্রমণ' পড়েই বুঝি, বেড়ানোর ব্যাপারটা কত সহজ আর হালকা হয়ে গেছে। ভাবি, কী সন্ন্যাসী, কী তীর্থযাত্রী, একশো বছর আগেও কেমন কাঁধে ঝোলাটি নিয়ে বেরিয়ে যেতেন। যেতেন পায়ে হেঁটে। আজ চারণিকরা হাঁটেন, পর্বতারোহীরা পাহাড়ে ওঠেন, অনেক সহজ, অনেক হালকা, অনেক সুন্দর। আমার অল্প বয়সে এ সব ছিল না।

'ভ্রমণ' পড়ে তরুণতরদের ভ্রমণপ্রাণতা দেখে বিস্মিত হই, শ্রদ্ধা করি। ঘুরলাম তো কত, আগ্রহ ছিল অরণ্য ও আরণ্যকে, আগ্রহ ছিল জনজীবনে। না তুলেছি ছবি, না রেখেছি লিখে। আজ শুধু দুঃখ হয়। আবার এও জানি যে, যা হারিয়ে যায়, তা লুপ্ত হয়ে যায় না, হঠাৎ হঠাৎ স্মৃতিকে উসকে দিয়ে পালিয়ে যায়।

আগ্রহটাই মানুষে, সৌধ দেখতে কমই গেছি। একটু গুজরাটের কথা বলতে মন চাইছে, মন বলছে। ওই যে নতুন করে নতুন মানুষদের সমাজে গেলে, তাদের কথা কিছু বলো।

আমার ভারতীয় মানব জগতে ভ্রমণের সব কথা যথারীতি লেখা নেই। যা আছে স্মৃতিতে, তাই সম্বল। পঞ্চাশের দশকেও আমেদাবাদ, বরোদা গেছি। সে ছিল–গোয়ালিয়র যাবার পথে, অন্যদের পথ থেকে অনেক বেঁকে। আমার পথ চিরকালই অনেকের পথ থেকে অনেক দূরে বেঁকে বেঁকে যায়। এই যে পুরুলিয়া ঘরবাড়িই হয়ে উঠেছিল, তা অযোধ্যা পাহাড় তো আজও দেখিনি। গেছি মালভি গ্রামে, যেখানে শিল্পীরা অসামান্য হস্তশিল্প বানায়। গেছি অকড়বাইদ, কুদা, কনাড়া, কাংখুপি গ্রামে। শবরদের সঙ্গে নদীতে ঝাঁপিয়েছি, একসঙ্গে খেয়েছি। এমন সব সৎ, সরল, ঋজু চরিত্র মানবসমাজের মনে মন মিলিয়ে ভ্রমণ, সেও তো ভ্রমণ। ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। মানুষের তো আকাশ অসীম। সেখানে হারিয়ে যাবার নেই মানা, মনে মনে।' আমি অবশ্য ভ্রমণের জায়গা বলতে তেমন জায়গাই খুঁজি, যেখানে মনের মতো মানুষরা আছে।

আজ বরোদার কথাই বলি। মেদিনীপুরের লোধা, পুরুলিয়ার শবর, বীরভূমের কোরো, এরাও হল আপনতম জন। ব্রিটিশ সরকার এক সময়ে ১৮৭১ সালে ভারত জুড়ে এইসব আদিবাসী গোষ্ঠীকে 'জন্ম হতেই অপরাধী মানব গোষ্ঠী' বলে একটা আইন করে। সে আইনটা আর নেই, তবে পুলিশ আর পাবলিকের নির্যাতন বহালই আছে।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮-এ পুরুলিয়াতে বুধন শবরকে পুলিশ মেরে ফেলে।

হঠাৎ আমার মাথায় আগুন জ্বলল। হাইকোর্টে গিয়ে এক কেস করলাম ফেব্রুয়ারিতেই।

আমার হাইকোর্ট ভ্রমণও কম অভিজ্ঞতা নয়। ওই আদ্যিকালের বাড়ি, উঁচু উঁচু সিঁড়ি। লম্বা লম্বা করিডোর, হাঁপিয়ে যেতাম।

সে বছরই বরোদা গিয়ে একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলাম। কাজ করতে হয়, তো এরকম আদিবাসীদের জন্যই করো।

ব্যস, বরোদা আর আমার গভীর বন্ধুত্ব হল। গিয়ে দেখে আসতে বলব সকলকে, না-দেখা বরোদা। আদিবাসীদের জন্য গঠিত হয়েছে 'ভাষা রিসার্চ ও প্রকাশনা ইনস্টিটিউট'। এটি যখন প্রথমবার দেখি, তখন চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বিশাল ও প্রাচীন এক গিরিমালা। তার নীচে এক গভীর গভীর জলাশয়। তেজগড় হল রাঠোয়া আদিবাসীদের অঞ্চল।

এক সময়ে এখানে রাঠোয়া রাজত্ব করত। বরোদা থেকে কিছুদূরে চম্পানের নামে যে আশ্চর্য সুন্দর প্রাসাদ আছে, যা কোনও মুঘল সুবাদারের দ্বারা নির্মিত। বরোদার ওই চমৎকার ট্যুরিস্ট জায়গাটিতেই ছিল রাঠোয়া রাজাদের রাজধানী চম্পানের।

দেখার মতো রাঠোয়াদের ঘরের দেওয়াল চিত্র। এই ছবি কিন্তু 'তুমি কি কেবলই ছবি নয়'। রাঠোয়ারা কোনও মূর্তি পূজা করে না। ওদের পূজিত দেবতা হচ্ছেন 'বোবো পিথোরো' বা প্রকৃতি, পুরুষ ও জনজীবন। এই দেওয়ালচিত্রের

নামও পিথোরো। এই ছবিতে ঘোড়ার পিঠে মেয়েদেরও দেখা যায়। অর্থাৎ একদা মেয়েরা যুদ্ধ করতেন।

পিথোরো কয়েক বছর বাদে বাদে আঁকতে হয়। শিল্পীকে সম্মান জানিয়ে আসতে হয়। নগিন রাঠোয়ার ঘরে আমি প্রথম পিথোরো দেখি। ক্রমে তেজগড়ে প্রাচীন পিথোরো শিল্পীরা এসে ওয়ার্কশপ করলেন।

জঙ্গলের গহীন থেকে এলেন রাঠোয়াদের কাঠখোদাই শিল্পীরা। মানুষপ্রমাণ আশ্চর্য সব কাঠের মূর্তি বানালেন।

আজ তেজগড়ে দেখা যাবে, একদিকে পাথর দিয়ে বানানো হচ্ছে ভারতের একমাত্র ট্রাইবাল আকাদেমি। সেখানে বিশাল মিউজিয়াম ও বিশালতর লাইব্রেরি হচ্ছে।

অবশ্যই আকাডেমি শেষ হয়নি। যতদিন না হয়, ততদিন একেবারে আদিবাসী কুটিরের মডেলে মাটি ও বাঁশপাতার ঘর বানিয়ে চলছে ক্লাস। ভারতের বড় বড় পণ্ডিতরা এসে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের পড়ান।

আমাদের উচ্চশিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে গ্র্যাজুয়েট। কম্পিউটার চালায় তারা। আছে ছোটদের ইস্কুল, নিয়মিত চিকিৎসা ব্যবস্থা। ডাক্তার, ওষুধ, অপারেশন যন্ত্রপাতি সবই আকাদেমির।

এই অংশে জল ধরে রাখার বাঁধ তৈরি হয়েছে, আদিবাসীরা নার্সারিতে চারা তৈরি করে বনসৃজন করছে। ওরাই প্রশিক্ষণ দিচ্ছে মৌমাছি পালন ও মধুসংগ্রহে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখ জুড়ানো। আমাদের কিচেন আছে, রান্নাবান্না আবাসিকরাই করে।

আমেদাবাদের ছাত্রছাত্রীরা এসে ওদের সঙ্গে সাতদিন থেকে গেল সেদিন। আদিবাসী নিজজীবনের সংস্কৃতি ও সংগীত অক্ষুণ্ণ রেখেই আকাদেমির শিক্ষাব্যবস্থায় শিখছে গ্রামসেবা, জলসংরক্ষণ, মানবসেবা। গুজরাট সন্ত্রাসকালে পলাতক মুসলিম পরিবারগুলিকে গৃহনির্মাণে, স্কুল পরিচালনায় তেজগড় আকাদেমির ছেলেরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে গিয়ে ওদের সাহায্য করছে। স্কুলে পড়াচ্ছে, ওদের সন্ত্রাস থেকে বাঁচাচ্ছে।

যা লিখলাম, সবই আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি বারবার।

ব্যাখ্যাতীত একটি জিনিস দেখা হয়নি। যে পাহাড় তেজগড়ের পিছনে, সেখানে পাওয়া গেছে গুহাচিত্র। সে শুধু ছুটন্ত ঘোড়ার ছবি। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেছেন, ও ছবি ৮-১০ হাজার বছরের পুরনো।

পাহাড়ের নীচে আদিম জঙ্গলে আছে চিতাবাঘ ও ময়ূর। বিকেল না হতে রাঠোয়ারা ওদের ছাগল, গরু ঘরে তোলেন। কে না জানে, যে চিতা হলেন নৈশপ্রাণী।

নাগিনকে বললাম, থাকে কোথায়?

সে হেসে বলল, জঙ্গল আছে, গুহা আছে। তেজগড়ে দেখে আসুন। তবে খাবেন

...হিব, মদের দোকান পাবেন না। তেজগড় ঘিরে যে নদীটি আছে, তার নাম ...।

তেজগড় রাজার প্রাচীন প্রাসাদ ঘিরে হোলির সময়ে ১৫-২০ হাজার রাঠোয়া ও ... মেয়েপুরুষ আসে। ১০ দিন বিকেল থেকে ভোর অবধি ঢোল বাজায়, গান ... নাচে, তীর খেলে। সে দেখার মতো দৃশ্য বটে। নানা রঙের ঘাগরা, কাঁচুলি ও ...। সর্বাঙ্গে রুপো, রুপ-দস্তা, পিতলের কর্ণভূষা বলেওড়া, হাঁসলি, বালা, ... মল পরে আবির উড়িয়ে মেয়েরা নাচে।

এই যে ওদের মধ্যে ঘোরাঘুরি, এও তো ভ্রমণ! গল্প করো, গল্প শোনো। ঘরে ... গম ও জোয়ারের মোটা মোটা 'রোটলা' আর আচার খাও। তারপর মাটির ...তে খড়ের ওপর শতরঞ্চি টেনে ঘুমিয়ে পড়ো।

এইরকম ভ্রমণের কথাই এক ফোঁটা লিখলাম। ঘুরছি সমুদ্র সমান, উপহার ... একটি বিন্দু।

২

...রে আদ্যিকালের এক ভ্রমণের কথা বলছি। আমাদের কালে সময় জেট ...তে চলত না। আবার আমার মায়ের মণিমাসির সময়ে ভ্রমণ মানেই ছিল পায়ে ...। ১৯১২ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে মণিদিদিমা ১৮ বারই কেদার-বদ্রী গেছেন। ...র চতুর্ধাম ঘুরে এসেছেন।

চতুর্ধাম ব্যাপারটা বুঝলে?

১৯৬৪তে যখন গঙ্গোত্রী যাই, তখন হরশিল থেকে হাঁটো। তারপর ...ঘাটির দারুণ চড়াই। তারপর একরাত জিরিয়ে সুমসৃণ পথ ধরে গঙ্গোত্রী। ... রাস্তা হয়ে গেছে বহুকাল। গাড়ি, বাস ইত্যাদিতে সিধা গঙ্গোত্রী চলে যায় ...। তা পথের সাথী এক বুড়োমানুষ বলেছিলেন, গ্লেসিয়ারের নিচ দেয়ে হেঁটে ...দিন ধরে কেদার-বদ্রী-গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী গেলে সেটা হয় চতুর্ধাম। মণি ... চতুর্ধামও গিয়েছিলেন।

এই মহিলার অনবরত যাত্রাকালে নাকি এমন সব চটিতে থাকতেন, যেখানে ... ডোবার অনেক আগে পৌঁছতে হত, ঢুকে গিয়ে দরজা-জানলা আটকাতে হত, ... বেরনো নিষেধ ছিল, আর সকালে ঝলমলে রোদ না উঠলে বেরনো চলত না।

উনি বলতেন, 'কী একটা যেন ভয় ছিল রে! তীর্থযাত্রীদের হরদম তুলে নিয়ে ...।'

আমি বললাম, 'অ মণিদিদিমা! সেটা তো রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো চিতাবাঘ!'

মণিদিদিমা বলতেন, তা হবে!

চটিমালিকরা যাত্রীদের ছোট ছোট পুঁটলি দিত। তাতে শুকনো ব্রহ্মকমল ফুল, ... কী সব পাহাড়ি লতাপাতার গুঁড়ো থাকত। না, পয়সাটয়সা নিত না। বলত,

শরীর খারাপ লাগলেই শুঁকে নেবে। কোনও অসুখ কিছুই হত না। দেরাদুন স্টেশন থেকেই হাঁটতে হত, তারপর হাঁটো, শুধু হাঁটো।

সে হল কবে— কার কথা! আমার মণিদিদিমা একলা নন, তখনকার মানুষ পায়ে হেঁটেই তীর্থে যেতেন।

যাক গে, আমার ছোট বয়সের ভ্রমণের সামান্য ছিটেফোঁটা বলি। খুব ছোটবেলা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ তো অত ছিল না। পুজোর সময়ে দেশের বাড়িতে যাওয়া হত। সে যাত্রা মানে, আগে ট্রেন, পরে স্টিমার, শেষে নৌকো। বিশাল উত্তেজনা! কী দুঃখ হয় তোমাদের জন্যে, যে আজকের বাংলাদেশে সেদিনের যুক্ত বঙ্গে তোমাদের বাড়ি তেমন গ্রামে ছিল না, যে গ্রাম মামার বাড়িও বটে, নিজেদের বাড়িও বটে। অর্থাৎ শ-খানেক আপনজনদের মেলামেশা! আর খোলা মাঠ, বড় বড় পুকুর, ফলের গাছ, কী নেই? পদ্মফুল, শাপলা ফুল, এ-সবের বীজ শুকিয়ে মোয়া তৈরি হত। রূপকথার দেশই বটে!

তারপর, বাবাও বদলির চাকরি করেন, ঠাকুরদাদাও তাই। তাঁরা জেলায় জেলায় বদলি হন, সেও তো ভ্রমণ!

এরমধ্যে মা বললেন, এবার কোনও কথা শুনছি না। পুজোর ছুটিতে গয়া যাব, শীত কাটিয়ে ফিরব।

বাবা যথারীতি বললেন, ছেলেমেয়ে যে নতুন ক্লাসে উঠবে? মা বললেন, তাদের নিয়ে তুমি আসবে কলকাতা! বাড়িও রইল, কাজের লোকজনও রইল, কোনও অসুবিধা হবে না।

গয়াতে আমাদের বড়মাসি থাকতেন। ওঁদের বাড়ি শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে, বলতে পারো বোধগয়ার পথে। আমার মেসোমশাই আর তাঁর ভাই, দুজনেই ভাগ্যান্বেষণে গয়া যান ১৯১৪ সালে। বড় মেসোমশাই হোমিওপ্যাথ, ভাই অ্যালোপ্যাথ। গিয়েছিলেন যখন, তখন কলেরার মড়ক চলছিল। বড় মেসোমশাই ঘোড়া চড়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন, আর ওঁর ভাই শহরে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করেন।

ফলে তাঁদের পসার, নাম, টাকা ইত্যাদি বেজায় বাড়ে। আর বাড়ে বাড়ির জনসংখ্যা। তখন কেউ কোনও শহরে গিয়ে জীবনে দাঁড়ালেই দেশ থেকে অনেক আত্মীয়স্বজন সেখানে চলে যেতেন। এটাও তখনকার নিয়ম ছিল।

গয়ার বাড়ি বিশাল একতলা বাংলোবাড়ি। সামনে মস্ত ফুলের বাগান। কাঁটাতারে ঘেরা। ডানদিকে তরকারির বাগান। এছাড়াও ওঁরা বিষুণপুরে এক মৌজা কিনেছিলেন। সেখানে সরষে, আখ, গম, ধান চাষ হত।

অতএব তেল, গুড়, আটা, চাল, সবই গৃহপালিত। আর বাড়ি বোঝাই দশ থেকে আঠারো অবধি অনেক ছেলেমেয়ে যারা ভাইবোনও বটে, সঙ্গীসাথীও বটে।

বাবা বললেন, ভীষণ শীত! তাই এটা হচ্ছে সিরিয়াস ট্র্যাভেল!

বলেই আপিস চলে গেলেন। বাবা চেঁচাতেন বেশি। মা কাজের কাজগুলো

করতেন।

আমরা তখন ছ-ভাইবোন। সে এক ফৌজ বললে হয়। বাবা, মা, আমরা সবাই, দুজন গৃহসেবক। তাদের দেশও বিহার। অতএব তারাও গয়াজি দর্শন করতে খুব উৎসুক।

বাবা দ্বিতীয় দিন বললেন, ওখানে বেজায় শীত! এবং আপিসে বেরিয়ে গেলেন।

ট্র্যাভেল কিট যে রকম গোছানো হল, তা দিয়ে আমরা পেশোয়ার, বা রেঙ্গুন বা কামস্কাটকাও যেতে পারতাম।

কেমন ছিল তখনকার ট্র্যাভেল কিট?

বড় বড় লোহার ট্রাঙ্ক। চামড়ার অতিকায় স্যুটকেস একটি, তাতে গরম জামা, টুপি, মায়ের শাল ইত্যাদি।

বিছানা? কোন কোম্পানির জানি না, বিশাল হোল্ড-অল দুটো। তাতেও অনেক লেপ-কম্বল, চাদর, বালিশ,— এ শুধু পথের জন্য।

এত বড় বাহিনী যাচ্ছে, অতএব বিশাল দুটো টিফিন ক্যারিয়ার। তাতে দিস্তা দিস্তা লুচি, পরোটা ইত্যাদি। একটি থার্মোস ক্যারিয়ার। তিনিও বিশাল। তাতে যে আলুর দম ও শুকনো মাংস যাবে। সে সব গরম থাকবে। খাওয়ার জল থাকত কুঁজোতে। কুঁজো আবার দড়ি দিয়ে বোনা জালের থলিতে ঢোকানো হত।'

এই সব কিছু নিয়ে ট্রেনে ওঠা হল। ভাগ্যে রিজার্ভ করা সেকেন্ড ক্লাসের সঙ্গেও কাজের লোকজনের একটি কামরা ছিল (সব সময়ে কি থাকত?), তাতে নন্দলাল আর গোবর্ধন না থাকলে কী হত কে জানে!

যা হোক, গয়া আমি পরেও গেছি। আগেও গিয়ে থাকব, কেননা অতীত শৈশবের একটা ছবি ও বাড়িতে দেখেছিলাম।

আমাদের সময়ে আমরা নির্বোধ ছিলাম বলতে হবে। বাড়িতে ক্যামেরা থাকত না, ছবি তোলার চল ছিল না। দেশের হাওয়াতেই ব্যাপারটা ছিল না। আমার জীবনে ছবি তোলার অভিজ্ঞতা একবার। 'ঝাঁসীর রানী' লিখবার মালমশলা জোগাতে না-জানা দেশে রওনা হচ্ছি। সবাই এত তারিফ করছে, যেন 'বঙ্গরমণীর উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ গমন!' এর মধ্যে বিজন, তদানীন্তন নিউ থিয়েটার্সের স্থিরচিত্রশিল্পী জ্ঞান কুণ্ডুকে ডাকলেন। বললেন, একটা ক্যামেরা তোর বউদিকে দে!

জ্ঞান একটি বাক্স ক্যামেরা দিল। 'ঝাঁসীর রানী' বইয়ে ব্যবহৃত ছবিগুলি আমারই তোলা। ওই প্রথম এবং শেষ। আর কখনও ছবি তুলিনি।

গয়াতে এবং নানা পাহাড়ে জঙ্গলে গ্রামে কত না দেখেছি। ছবি তো তুলিনি।

গয়া থেকে আমরা ফৌজবাহিনী ব্রহ্মশিলা, প্রেতশিলা, ব্রহ্মযোনি, এ সব পাহাড়ে চড়তাম। মহালয়া পিতৃপক্ষে ওখানে লোক আসত। সারা বছর ধু-ধু নির্জনতা। একদিন কুমন্ত্রণা করা হল জঙ্গলে যাব।

কাছেই শেরপুরা বা শেখপুরার জঙ্গল। সে জঙ্গলে ঢোকার সময়ে মনেও রাখিনি, ওই জঙ্গল থেকেই মেসোমশাই বাঘ মেরেছেন দুবার। এক মাদী ভালুককে মারতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার বাচ্চা ভালুকটিকে সঙ্গে এনেছিলেন। সে ছোটবেলায় আমুদে ছিল। খাঁচার বাইরে এলেও বড়জোর পেয়ারা গাছে উঠে বসে থাকত।

কিন্তু বড় হতে না হতে নাকি একদিন পালাতে চেষ্টা করে। অতঃপর বড় মেসোমশাইয়ের বিশাল গাড়ির ছাদে খাঁচা চাপিয়ে তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ফল্গু নদী অনেক নীচে। পাড় ধরে গড়গড়িয়ে সে নামে এবং খানিক হতভম্ব হয়ে ওপারে চলে যায় হেঁটে। বড় মেসোমশাইয়ের হয়েছিল দুঃখ, আর ভালুকটির হয় সর্বনেশে অভিমান।

এ সব ভাগ্যে আগেভাগে ঘটে যায়। মেসোমশাই সেই থেকে জঙ্গলে ঢোকাই ছেড়ে দেন।

বেজায় জমেছিল বোধগয়া ভ্রমণ। তখন জনা তিরিশের বাহিনী নিয়ে মা, বড়মাসি এবং অন্যরা কেমন করে নিয়ে গেলেন আমাদের? তাগড়া, বলিষ্ঠ এবং শিং-উঁচানো তিনটি বলদ-গাড়ি। ওই গাড়িতে বিষুণপুরা থেকে চাল, গম, যব, আখ, গয়ার বাড়িতে গমনাগমন করে। অতএব নির্ভরযোগ্য। একটি গাড়িতে বলিষ্ঠকায় রাঁধুনি, আমাদের নন্দ ও গোবর্ধন এবং আরও দুজন। ওদের গাড়িতেই ডেকচি, কড়াই, চাল, ডাল ইত্যাদি। ৩-৫ বছরের ২-৪টি কুচোকাঁচা ওদের গাড়িতে। শেরঘাটির জঙ্গুলে রাস্তা বাঁদিকে রেখে বোধগয়ার পথে পা দিয়েছি, আশ্চর্য কোনও ফুলের গন্ধ মাখা ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেল।

—ফুল কোথায়?

—ওই তো, দেখ।

সে হল বেজায় লম্বা গাছ। বহুদূর উঠে গেছে সিধা, তারপর ডালপালা ছড়িয়েছে। সেই গাছে থোকা থোকা সাদা ফুলের গুচ্ছ। কী আশ্চর্য গন্ধ তার, এখনও মনে পড়ে। খুব ইচ্ছে হয়েছিল চারটি কুড়িয়ে নিই। কিন্তু সবাই যেন চুপচাপ। জায়গাটা পেরোতে বড় মাসি বললেন, এই আধমাইল পথেই জঙ্গল পাবি। তারপর জঙ্গল দূরে সরে যাবে। এখানে নামা, ফুল কুড়োনো, সবই বারণ।

—কিন্তু কেন?

বেশ ধমক খেলাম।

এর চার বছরের মাথায় গয়া আবার যাই। সেবার ভাইবোনদের গ্যাং নিয়ে যাত্রার পর যাত্রা,— রাজগীর-নালন্দা-বরাকর গুহা।

সেদিনের বোধগয়ার মহিমা, প্রকৃতির প্রেক্ষাপট, রহস্যময়তা বলে বোঝানো যাবে না। দশক থেকে দশকে এমন বিশ্বমানবের মন্দিরের বিবর্তন ধাপে ধাপে ছবি তুলে রাখতে হয়। মন্দিরের নিজস্ব গাম্ভীর্যই তার সৌন্দর্য। একেবারে জনবিরল,

ধু-ধু, কিন্তু সামনে জ্বলে অনির্বাণ দ্বীপ। বৌদ্ধভিক্ষুদের স্তব গান।

এ তো জানাই ছিল, ওখানে বনভোজন করলে তাতে রক্তের ছিটে লাগা বারণ। অথচ যাঁরা আসেন, তাঁরা রাঁধেন, খান। ওই খিচুড়ি।

সে জন্য তখন মন্দির সীমার বাইরে চালাঘর ছিল। গ্রামবাসীরা সানন্দে লকড়ি জোগাত, জল এনে দিত। সে সব চলছে, চলছে, মন্দিরের বেশ পিছনে শীর্ণ নিরঞ্জনার জলধারা, আর কী আশ্চর্য। অজস্র বাতাবি লেবুর গাছ। আমরা ওদিকে যাচ্ছি দেখে ভিক্ষুরা নিষেধ করেছিলেন, আমরা বুঝিনি। সে এক আশ্চর্য পরিবেশ। এত গাছ, কোনও পাখি নেই। নদীর বালুকাবক্ষে কোনও পশুর পদচিহ্ন নেই। পাখির ডাক অবধি ছিল না।

অবশেষে বলাই দাদা আমাদের তাড়িয়ে জড়ো করল, বলল, ওখানে যাওয়া নিষেধ। ও একগোছা ধূপকাঠি জ্বেলে বসিয়ে দিল বালিতে।

কোথায় তিনি তপস্যা করেছিলেন? কোথায় সুজাতা পায়েস খাইয়ে অনশনক্লিষ্ট বুদ্ধকে বাঁচান, এ সব শুনে শুনে আশ মিটছিল না। কিন্তু হঠাৎ দেখি বাতাপি লেবুর গাছ নেই। আমাদের অচেনা সব গাছ শুরু হয়েছে।

সামনে একটি চওড়া পাথর।

আমি পা বাড়িয়েছি, বলাইদা বলল, যাস না।

এমন গলায় কথাটা বলল, যে আমরা সবাই পিছন ফিরে দৌড় লাগালাম।

কেন ভয় পেলাম? কী ছিল সেখানে?

বোধহয় কিছুই ছিল না। সে বয়সে ভয় পেতে ভালো লাগত।

মা বললেন, চল আমার সঙ্গে। দেখি ভয় কোথায়! ছি ছি! তোরা ভয় পেলি?

ফেরার সময়ে হঠাৎ গাড়ি থেমে গেল। গাড়োয়ানরা ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, একদম চুপ!

না, বাঘ সিংহ বা দৈত্যদানব নয়।

ছোটয় বড়য় আট-দশটা চিতল হরিণের ঝাঁক যেন বাতাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, এমন লাবণ্যময় গতিতে পথ পেরিয়ে চলে গেল।

বড়মাসি বললেন, ওরা জল খেতে যাচ্ছে।

—কোথায়?

—কেন, ওপারে ঝিল আছে না?

—ওপারে? জঙ্গলের ওপারে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাঘ জল খায়, ওরা জল খায়!

এরপর আমরা, বড়রা একদিন বিষুণপুরা যাই। এটা ট্রেকিং ছিল। বলাইদা বলেছিল, —কিছু কাঁধে বইব না। যেখানে যা পাব, সেখানে তা খাব। যদি কিছু না পাই, গিরিয়া বুড়ির গাছের আতা আর পেয়ারা খাব।

—তাও না পেলে?

—কিছু খাব না। নদী বা ঝরনার জল খাব।

—ফিরতে দেরি হলে?

—গাছে উঠে ঘুমব। তোরা মেয়েরা তো গাছে ঘুমতে পারবি না। গাছের তলায় ঘুমবি।

—ওঃ! মেয়েরা গাছে চড়তে পারবে না!

ফোঁস করে ওঠা আমার স্বভাব। আর গত বছরই শান্তিনিকেতনে তিন বছর স্কুলে কাটিয়ে কলকাতা ফিরেছি। শান্তিনিকেতনে গাছে চড়া, আছড়ে পড়ে পা ভাঙা, বর্ষার কোপাই নদীতে সাঁতার কাটা, কী করিনি?

এমনই ঝগড়াঝগড়ি করতে করতেই ১৩-১৫ বয়সের তিন ভাই চার বোন বেরিয়ে পড়লাম। বড়দের অনুমতি পেয়েই গিয়েছিলাম।

বলাইদা ছিল স্বভাব-চারণিক। বেজায় হাঁটত। ওই গাইড। ও বলল, বড় রাস্তা পেরিয়ে গরুর গাড়ির রাস্তা ধরে গেলে তো তিন ঘণ্টা! চল, আমরা দেখতে দেখতে যাই। আগে দেখব শাকমনির চাতাল!

—'শাকমনি' আবার কী?

—আহা, বুদ্ধদেবের এক নাম শাক্যমুনি না? দাঁড়া, দাঁড়া সবাই! কালু চল রে!

দুই ভাই নেমে গেল পথের পাশের ঢাল ধরে। আখের খেতে ঢুকে আমাদের ডাকল। বলল, ভাঙ আর খা। তারপর এই খেতের মধ্য দিয়েই শর্টকাট করি।

অর্ণবদা বয়সে বড়। মানুষটাও গম্ভীর। ও বলল, তাই করো। আর খেতমালিকরা এসে তোমাদের আখ দিয়ে পেটাক।

সে যা হোক, আখ খেত পেরিয়ে সামনের মেঠো রাস্তায় উঠতেই বলাইদা বলল, ওই দেখ, দূরে শাকমনির চাতাল। আমি তো দেখলাম একটা কী যেন গাছের মাথায় একটা ফ্যারফেরে চরকি ঘুরছে। আমার মনে হল, নিশ্চয় এটা ধর্মচক্রের ট্র্যাডিশনে লাগানো হয়েছে। একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দও আসছিল।

হাঁপিয়ে, ঘেমে, ধুলো মেখে সেখানে পৌঁছে যা দেখলাম, তাতে মনে হল কোনও আশ্চর্য দেশে পৌঁছে গেছি। এখন লিখতে লিখতেও সেদিনের অবাক হওয়াটা মনকে আবছা ছুঁয়ে যাচ্ছে।

সত্যিই একটি চাতাল, অর্থাৎ পাথরের এক নিচু বেদি। সেখানে বসে আছে একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। পাশে একটি কুয়ো। একটি বলদের গলায় দড়ি বাঁধা। বলদটি কুয়ো ঘিরে ঘুরছে। দড়ি বাঁধা বালতিটা নেমে যাচ্ছে। আবার বলদটি ঘুরে ঘুরে জল তুলছে। চাতালে মস্ত একটা জালা। মেয়েটি আর ছেলেটি বালতির জল জালায় ঢালছে।

বলাইদা, কালু, হনু, অর্ণবদা, সবাইকে দেখে ওরা উঠে দাঁড়াল। বলল, ডাগদারবাবুর ঘর থেকে এসেছ?

কোথায় যাচ্ছ?

—বিষুণপুরা!

মেয়েটি গালে হাত দিল। বলল, কখন পৌঁছবে জানো? যখন সুরজদেও

পশ্চিমে চলে যাবে।

আমি বললাম, তাতে কী?

—তখন জানোয়াররা জল খেতে বেরোয়।

আমি তো একে বোকা, তায় জেদী। ফস করে বললাম, আমরা গাছে উঠে পড়ব।

মেয়েটি বলল, ও সব কিছু করবে না। ডাগদারবাবু আমাদের জানে। চলো আমাদের সঙ্গে। নাহাবে, খাবে, তারপর আমরা পৌঁছে দেব।

তৎক্ষণাৎ আমরা সবাই রাজি। এবার গল্প শুরু হল। শাকামণির চাতাল বানিয়েছিল কে?

—কে জানে, দেবদেবতারা বানিয়ে থাকবে।

—মন্দির ছিল?

—আমরা তো দেখিনি। তবে বুড়োরা বলে হাজার সাল ধরে এ চাতাল আছে। সারাদিনে গাঁয়ের লোকরা চারবার পাঁচবার আসে। জল ভরে রেখে যায়। চাষীরা এখানে জিরোয়, ঘুমোয়, জল খায়। আর ভোরে যে আসে, সে দানা ছড়িয়ে দেয়। ওই যে তেঁতুল গাছে চরকি দেখছ? ওটা দেখেই পাখিরা আসে, ওই গাছে থাকে।

—পাখিরা জল খায় না?

—চলো না দেখবে।

চাতালের পিছনে, তেঁতুলগাছের আড়ালে পাথরে পাড় বাঁধানো একটি নিচু, লম্বা চৌবাচ্চা। তাতে গভীরতা নেই। স্বচ্ছ জল। তিন জায়গায় নিচ থেকে বুদ্বুদ উঠছে।

আশ্চর্য, আশ্চর্য দৃশ্য বটে। আমাদের সামনেই এক ঝাঁক টিয়া নেমে এসে কুপকুপ করে জল খেল। খেয়ে উড়ে গেল।

—ওদের দানা কে দেয়?

—যে আগে আসবে, সে দেবে।

আমি বললাম, আশ্চর্য!

মেয়েটি বলল, দেওদেওতারা খুশি থাকে গো! আমাদের গ্রামে কোনও জানোয়োরের উপদ্রব নেই।

আমি ধপ করে চাতালে বসে পড়লাম। কবে, কতদিন থেকে আশপাশের গ্রামের মানুষ নিজেরা শাকামণির চাতালকে রক্ষা করে আসছে? এও তো এক পাখিরালয়। পাখিরা এই গাছে থাকে, জল খায়, স্নান করে, দানা খায়।

এখন ভালো করে গাছটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। গোড়াটা এত মোটা কেন? দেখে মনে হল তিন-চারটে গাছ এ-ওকে জড়িয়ে বড় হয়েছে। আর ওই যে বুদ্বুদ উঠছে, ...

—নিচ থেকে জল উঠছে?

ছেলেটি আর মেয়েটি হেসে গড়িয়ে গেল। বলল, ফল্গু নদী কি একটা নাকি?

ওপরে বয়, নীচেও বয়! আর, অবাক হচ্ছ কেন? তিন ধারিয়া পাহাড়ের কোলে আরেকটা শাকামণির চাতাল আছে। চলো, জল খাবে তো খাও। চলো, তোমাদের নিয়ে যাই।

গেছি আমরা সবাই। কিন্তু একা আমি ছিলাম দিদিমার শিষ্য। তাঁর কাছে বসে দেশের আর দেশের মানুষের ইতিহাস পড়তাম, যে তেষ্টা আজও মেটেনি। রবীন্দ্রনাথের খ্যাপা পরশপাথর খুঁজে খুঁজে ফেরে। আমি ঘুরেছি আর খুঁজেছি মানুষ, গাছ, কুয়ো, পাথর, নদীর না-লেখা ইতিহাস।

ওদের সঙ্গে চলতে চলতে কাশফুলের গাছ তুলছি, কাশগাছের গোড়া চিবোচ্ছি। ভারি সরস! তৃষ্ণা মিটে যায়। এ তো আমার শান্তিনিকেতনেই শেখা।

আর ভাবছি। শাকামণি যে শাক্যমুনি, অর্থাৎ বুদ্ধদেব, তাই হবে নিশ্চয়!

তিনি যখন বুদ্ধদেব হননি, আলোকের সন্ধানে পথ হাঁটছেন, সে সময়ে আজকের বোধগয়াতেই বোধিলাভ করেন। হয়তো তখন আশপাশের গ্রামে প্রান্তরে ঘুরতেন। সন্ন্যাসী ভিক্ষু মনে করে গ্রামবাসী খাদ্যশস্য দিয়ে যেত। জল দিয়ে যেত। পাখিরা তাঁর কাছে ভিড় করত। উনি শস্যদানা দিতেন, জল দিতেন।

একদিন আবার পথ চলতেন। শাকামণির চাতাল নিশ্চয় এমনি করে গড়ে ওঠে। ভারতের মানুষও নদীর মতো। রক্তে তার পরম্পরার ধারা বয়।

জাতককাহিনীতে শাকামণি চাতালের কথা লেখা নেই। আমাকে গম্ভীর, অন্যমনস্ক দেখে অর্ণবদা বলল, তুই লিখিস!

বলাইদা বলল, কে লিখবে? খুকু?

অর্ণবদা বলল, তুই যে লিখবি না, সেটা আমরা জানি।

এমন সব কথা বলতে বলতে আমরা হঠাৎ একটা গরুর গাড়ির রাস্তা পেয়ে গেলাম। ছেলেটা মেয়েটাকে বলল, এই! ঘুঙটা কাড়!

মেয়েটা ঘোমটা দিল।

আমি বললাম, কেন?

—বাঃ! আমার বউ আছে না ও? আমরা আমাদের বাড়িই যাচ্ছি।

নিচু নিচু খাপরার চাল, বড় বড় ঘর, মস্ত উঠোন! ছেলেটা চেঁচিয়ে বলল, ডাগদারবাবুর বাসা থেকে এসেছে সবাই!

বাড়ি তখন শুনশান। কে খেত পাহারা দিচ্ছে, কে গাই চরাতে গেছে। খালি গা, বৃন্দাবনী ছাপের শাড়ি সামনে আঁচল ঘুরিয়ে পরা, এক মুখ হাসি নিয়ে ছেলেটির মা হইচই লাগাল।

তারপর আতিথ্যের ঘটা যাকে বলে। কুয়োর পাড়ে হাত মুখ ধোও। খাটিয়ায় বসে জিরোও। তারপর খুরো লাগানো উঁচু পিঁড়িতে বসে ঝকঝকে পিতলের পরাতে আমরা টাটকা ভৈঁসা ঘিয়ে ভাজা পরোটা, মুলোর শাক, আচার খেলাম। ঘরে পাতা ভৈঁসা দুধের দই আর গুড়।

ছেলেটার নাম বিশনোয়া। মেয়েটাকে শাওড়ি —এ বহু বলে ডাকছিল।

বিশনোয়ার মা কত দুঃখ করছিল, ডাগদারবাবুর বাড়ির ছেলেমেয়ে! আগে জানলে কত কী খাওয়াত!

আমাদের পেট তখন বোঝাই হয়ে গেছে।

বলাইদা বলল, আমরা বিষুণপুরা যাব যে!

—হায় রাম! বিষুণপুরা!

বিশনোয়া বলল, হ্যাঁ মা! ডাগদারবাবুরা মৌজায় বসে থাকবে।

—যা, ওদের সঙ্গে যা! এক হাঁড়ি দই, এক হাঁড়ি গুড় নিয়ে যা!

—শাকামণির চাতাল দেখছিল!

শুনেই ওর মা হাতজোড় করে বলল, জয় শাকামণি!

বলাই বলল, কোনও দেবতা, মাসি?

—নিশ্চয়... কোন দেবতা তা জানি না ... কিন্তু চিরকাল শুনেছি খুব বড় দেওতা, কি মহাপুরুষ হবেন! তোমরা নির্ভয়ে চলে যাও। ওই চাতাল দেখে এসেছ। পথে কাঁটা বিঁধবে না, পাথরেও চোট খাবে না।

তারপর বিষুণপুরা। সে গল্প হয়তো আবার কখনও বলা যাবে।

কিন্তু আমার সেদিনের, সেকালের, ওই পথচলতি বেড়ানোর কথা ভাবলেও ভালো লাগে। বিহারে শরৎশেষের উদাসীন প্রকৃতি, গরুর গলার খরকির আওয়াজ শুনতে শুনতে হাঁটা, কোনও ঐতিহাসিক সৌধ নয়, শাকামণির চাতাল দেখা, একেবারে মাটির সন্তানদের সরল আতিথ্য, ওই ভ্রমণকে স্মৃতিতে বাঁচিয়ে রেখেছে। যতদিন যায়, তত বুঝি, সেই বোধহয় আমার ভারতকে চেনাচিনির প্রথম পাঠ।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৩

কাপাডোকিয়া

প্রতাপকুমার রায়

গতবছর ইস্তাম্বুলে ট্র্যাভেল এজেন্টের অফিসে তুরস্কের নানা স্থানের ভ্রমণের প্রচারপুস্তিকা ঘাঁটছিলাম। একটা পাতা দেখে চমকে উঠেছিলাম। এ কোথাকার ছবি? আমাদের জানা জগতের নয়। হয় অন্য কোনও গ্রহের, অথবা কোনও উন্মাদ ভাস্করের পরাবাস্তব সৃষ্টি। জায়গাটির নামেও চমক। কাপাডোকিয়া। তখনই যাবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু অন্তত তিনদিন লাগবে কাপাডোকিয়া যাতায়াতে। অত সময় হাতে নেই, তাই যাওয়া হল না।

এবারে ইস্তাম্বুলে পনেরো দিন থাকব। ইস্তাম্বুল আমার মনোমত শহর। শহরের যে অঞ্চলে আমাদের নির্বাচিত হোটেল, সেটা বোঝাতে গেলে আমাদের চিৎপুর বা বাগবাজার অঞ্চলের কথা বলতে হবে। অর্থাৎ শহরের প্রাণকেন্দ্র, সুলতান আমেট। পঞ্চদশ শতাব্দীর সুলতান আমেটের নামে এই অঞ্চল। আমাদের বাগবাজার বা চিৎপুরের মতো এলোমেলো, অভাবে পীড়িত নয়। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন, স্থানে স্থানে প্রশস্ত। ইস্তাম্বুলের প্রাচীনতম অংশ। দক্ষিণে সি অব মারযারা, পুবে গোল্ডেন হর্ন। রাস্তার মাঝখান দিয়ে আধুনিক চার-কামরার ট্রাম চলেছে। গাড়ি ও পথচারীর অন্ত নেই। এই পাড়াতেই ইস্তাম্বুলের প্রধান দ্রষ্টব্য চারটি স্থান, ব্লু মস্ক, সান্তা, সোফিয়া, তোপকাপি প্রাসাদ, সুলেমানিয়া মসজিদ। পৃথিবীবিখ্যাত কভারড বাজারও এখানে।

ইস্তাম্বুল থেকে একঘণ্টার উড়ানে পৌঁছনো যায় কায়সেরি, যেখানে কাপাডোকিয়ার এয়ারপোর্ট। কাকভোরে প্লেনে উঠতে হয়। অবশ্য সন্ধ্যার উড়ানেও যাওয়া যায়, সে যাত্রার ভাড়া বেশি। অতএব একদিন ভোর চারটেয় উঠে এয়ারপোর্ট যাওয়া স্থির হল। আরও সস্তায় যাওয়া যায় বাসে চড়ে— সারা রাত্রি ধরে। আমাদের সে ধকল সইবে না।

পাঁচটার আগেই এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেলাম। কোথায় চেকইন করতে হবে খুঁজে পাই না। আমাদের এই যাত্রায় গাইড এবং গাড়ি আমাদের সঙ্গে থাকবে কায়সেরি থেকে। কায়সেরি পৌঁছতে হবে নিজেদের উদ্যোগে।

চেকইন কাউন্টার খুঁজে পেলাম। এত যাত্রী বুঝি পুজোর সময় হাওড়া স্টেশনেও হয় না। মানুষের জটলা, কোলাহল, এলোমেলো লাইন। ঠিক কিউতে

দাঁড়িয়েছি কিনা বোঝা কঠিন। এ অব্যবস্থা আমাদের এয়ারপোর্টকে হার মানায়— দিল্লি থেকে বেসরকারি এয়ারলাইন্সে প্রস্থানের সময় যেমন হয়। কাউকে জিজ্ঞাসা করব— তার উপায় নেই। কে বুঝবে আমাদের ইংরিজি।

অধৈর্য অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজল যখন কাউন্টারে পৌঁছলাম। সুন্দরী মেয়েটি আমাদের টিকিট নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করে বলল, দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম উইথ ইয়র টিকেটস, আপনি টিকিট নিয়ে সেলস কাউন্টারে যান। কেন, কী অসুবিধা আমাদের টিকিটে, সেসবের জবাব দেওয়ার সময় নেই সুন্দরীর। বলল, নেকস্ট। পিছনে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও অধৈর্য, দুবার প্রশ্ন করবার সুযোগ নেই। সেলস কাউন্টার কোথায় জিজ্ঞাসা করতে মেয়েটি বলল, পাশের উইংয়ে।

পিছনের ঠেলায় অস্থির হয়ে ভিড় ঠেলে মোটঘাট নিয়ে বেরিয়ে এলাম। মোট বলতে সামান্যই। দুটো ছোট স্ট্রোলার মাত্র সঙ্গে। বাকি সব সম্পত্তি ইস্তাম্বুলে রেখে এসেছি। ভাগ্যিস; নইলে ওই ভিড় ঠেলে বেরনোই কঠিন হত।

সেলস কাউন্টার খুঁজে পেতে বেশি দেরি হল না। খালিও ছিল কাউন্টার। সেখানের অধিকারী টিকিট দুটি ভালো করে দেখলেন, বললেন, হোয়াটস দি প্রবলেম? আপনি যান, চেকইন করুন, নির্দিষ্ট কাউন্টারে গিয়ে। কোনও প্রবলেম নেই। সব ঠিক আছে।

আবার ফিরে গেলাম, সেই কাউন্টারের উদ্দেশে। সেখানে ভিড় কিছুমাত্র কমেনি। তাছাড়া কে কোন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে বোঝাও মুশকিল। এবং সব যাত্রীর সঙ্গেই প্রভূত মোটঘাট।

ঘড়ি বলছে পৌঁনে ছটা। ছটা পাঁচ, না দশে, আমাদের উড়ান। লাইন আর এগোয় না। আর, আমরা দাঁড়িয়ে আছি সবার শেষে। কী যন্ত্রণা বোঝানো মুশকিল। আমাদের সামনের যাত্রীরা অন্যান্য নানা স্থানে যাচ্ছিল। সব চেকইন হচ্ছে এই কাউন্টারে। বোকা সুন্দরী মেয়েটি আমাদের কী অনর্থক হয়রানি করল।

ছটা বাজল। কোনও আশা নেই প্লেন ধরবার। হোটেল, ডে ট্যুর বুক করা আছে কাপাডোকিয়াতে। সব বৃথা যাবে। আমাদের হাতে সময় নেই এত যে আবার কাল যাবার আয়োজন করব। তাছাড়া, নতুন করে আবার টাকা দিয়ে আয়োজন করবার সামর্থ্যও নেই।

এমন সময় পরিত্রাতা মধুসূদন নারী-বেশে উদয় হলেন। তিনি কাউন্টারের পিছন থেকে চিৎকার করে বলতে লাগলেন কায়সেরি (এবং অন্য একটি জায়গার নামও বললেন) যাবার যদি কেউ থাকেন তো এগিয়ে আসুন।

কাজটা সহজ নয়। কাউকে সরিয়ে কাউকে ধাক্কা দিয়ে, কারও সুটকেসে হোঁচট খেয়ে তাঁর কাছে পৌঁছলাম। মনে ভয় উনি আবার কী প্রবলেমের কথা বলবেন। তিনি আমাদের টিকিট দুটি হাতে নিয়ে দ্রুত কোথায় যেন চলে গেলেন। আমরা আশঙ্কা করছি উনি আবার কী খবর দেবেন। আজকের যাত্রাটা যন্ত্রণায় শেষ হবে।

কিন্তু, তিনি ফিরে এলেন দুটি বোর্ডিং পাস হাতে নিয়ে, এবং আমাদের বললেন, অবিলম্বে চলে যান, উড়ানের ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। যাত্রীরা প্লেনে উঠে পড়েছেন। যান, দ্রুত। জিজ্ঞাসা করব, তবে কেন আমাদের এত হয়রান করা হল, তার সুযোগ দিলেন না মহিলা। প্রায় বিরক্ত গলায় বললেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চলে যান। দেরি করলে প্লেন ধরতে পারবেন না।

এবারে সদর্পে, কারও সুটকেস মাড়িয়ে, কারও পায়ের ওপর দিয়ে, প্রভূত ঠেলাঠেলি করে ভিড় সরিয়ে দৌড়লাম। প্লেনে উঠেও পড়লাম।

ঘণ্টাখানেক পরে কায়সেরিতে নেমেছিলাম। বেরিয়ে দেখি আমাদের নামের প্ল্যাকার্ড নিয়ে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাদের গাড়ির চালক। এর পর তো নরম কার্পেটের ওপর দিয়ে পা ফেলে হাঁটা।

ষাট কিলোমিটার দূরে আমাদের হোটেল। চালক হুসেন একটা স্টেশন ওয়াগানে আমাদের বসিয়ে রওনা দিল। একঘণ্টা লাগবে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে।

কায়সেরি ছোট শহর। চমৎকার মসৃণ চওড়া রাস্তা। বাঁদিকে বরফের চূড়া নিয়ে এরসিয়েস পাহাড়। পুরনো আগ্নেয়গিরি। হুসেন বলল, এই পাহাড়ের ঢালুতে শীতকালে স্কি করা হয়। কিন্তু একদিন এটা আগ্নেয়গিরি ছিল। এখন অবসর নিয়েছে। পুবে এই এরসিয়েস আর পশ্চিমের হাসান আগ্নেয়গিরি একদা একসঙ্গে উদগীরণ শুরু করে। তার ফলেই কাপাডোকিয়ার আজকের চেহারা।

ঘটনাটা কয়েক লক্ষ বছর আগের। এরসিয়েস এবং হাসান দুটি আগ্নেয়গিরির ক্রোধে লাভায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল বিশাল অঞ্চল, দুলক্ষ বর্গকিলোমিটার।

কালে লাভা শীতল হল। ঝড় জলে ভিজে সেই জমাট লাভার বিচিত্র রূপের সৃষ্টি আজকের কাপাডোকিয়া অঞ্চল। তখনও জানি না সে দৃশ্য কত বিচিত্র, কত অপ্রত্যাশিত। শুধু ছবি দেখেছি। ছবির সঙ্গে আসল জিনিসের এত তফাত হয়?

এখন দুপাশে শস্যক্ষেত্র, গম ভুট্টা, আরও কী খাদ্যশস্যের। মাঝে মাঝে ফলের বাগান। আপেল বাবুগোসা গাছ দেখছি সারি সারি। মাঝে মাঝে নাতিউচ্চ পাহাড় পার হচ্ছি। আকাশ নির্মল নীল।

যে ছোট শহরে পৌঁছলাম, তার নাম গোরেম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। ছোট ছোট দোকানপাট। সামান্য লোকালয়। আমাদের গাড়ি ছেড়ে এখানে ট্যুর কোম্পানির অফিসে বসতে হল কিছুক্ষণ। হোটেল এখান থেকে অনেক দূর। অল্পক্ষণ পরেই একটি মাঝারি সাইজের কোচ এসে পৌঁছল। ভেতরে কিছু যাত্রী বসে আছেন। এঁরা সবাই আমাদের সঙ্গে ট্যুরে যাবেন।

পরিচয় হল। পাকিস্তান থেকে এসেছেন চারজন। তাঁদের বাড়ি লারকানায়। মাঝবয়সী কর্তার কদমছাঁট চুল। তাঁর স্ত্রী সম্পূর্ণ কালো বোরখায় ঢাকা। দুটি মেয়ে। ছোটটি স্কুলে পড়ে। বড় ডাক্তারির দ্বিতীয় বর্ষে। সে মেয়েটি ভালো ইংরিজি বলে, মিশুকে। আমাদের সঙ্গে খুব গল্প জুড়ে দিল। মনে হচ্ছিল, তার মা কথা

[illegible] কিন্তু বোরখার আড়াল থেকে বেরতে পারছেন না। চারজনের [illegible] থেকে এসেছেন। কর্তা গিন্নি মেয়ে এবং তার বন্ধুকে নিয়ে [illegible]

[illegible], যে আমাদের কায়সেরি বিমানপত্তন থেকে এনেছিল। [illegible] কিছু দেখাতে, বোঝাতে চায়। বলল, যেখানে আমরা প্রথম [illegible] বলি ভ্যালি অব ইমাজিনেশান। কেন বলি একটু পরেই [illegible]

[illegible] উঁচুতে উঠছি, পাহাড়ি পথ দিয়ে। পাহাড়ি পথ বলতে [illegible] কিন্তু অতি সযত্ন রক্ষিত। দুপাশে ক্রমশ গাছপালা কমে আসছে। [illegible] কিছু উদ্ভট আকারের পাথর, বা পাহাড়ের চূড়া দেখা গেল।

[illegible], নেমে দেখি কোনও অপরিচিত জগতে এসে পৌঁছেছি। [illegible] আপনি মনে করে নিতে পারেন, কিসের মতো দেখতে এই [illegible] মনে হচ্ছে না কি, গলা উঁচু করে উট চলেছে? আর এপাশে কী [illegible]

[illegible] পরিচিত ছবির সঙ্গে মিল পাচ্ছিলাম— ওটা কি পরাজিত [illegible] মূর্তি?

[illegible], আমরা সবাই নানাভাবে দেখি কল্পনায়। তাই নাম ভ্যালি অব [illegible] ছোট বড় পাথরে তৈরি পাহাড়ের অংশগুলি একেবারে অন্য রকম [illegible] উঁচু টিবি পাহাড় অন্য রঙের একটা পাথর মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে [illegible] এমন চেহারা বুঝি কেবল এখানেই দেখা যায়। পাশে পাহাড়ের [illegible] নামা যায়, সেও অলৌকিক ওই পৃথিবীর অংশ। সারি সারি ছোট [illegible] উঁচু টিবি। ওই যে অন্য রঙের টুপি পাহাড়ের মাথায়, ওটা ওই [illegible] অংশ।

[illegible] বছর আগে আগ্নেয়গিরির উদগীরণ এবং তার পরে হাওয়া ও বৃষ্টির [illegible] গুলির এমন রূপ হয়েছে। যেন কোনও উন্মাদ ভাস্করের কীর্তি। যে [illegible] একই ধরনের রকমফের পাহাড়, যেন অলৌকিক কোনও ভাস্কর্য [illegible]

[illegible] থেকে আমরা যাব আরেক অঞ্চলে সেখানেও বিচিত্র মূর্তির জটলা। [illegible] মূর্তিগুলি আরও বড়। একই ধরনের, তবু ভিন্ন। পরপর পাহাড় পার হয়ে [illegible] নামছি। টিবিগুলি ছোট নয়, বিশ-ত্রিশ ফুট উঁচু।

[illegible] ভোজনের আয়োজন করেছিল আমাদের ট্যুর এজেন্সি। আয়োজন [illegible] আরও ভালো লেগেছিল নানা প্রকার ফলের জন্য। তার ব্যবস্থাও [illegible] কিন্তু সবার থেকে ভালো লেগেছিল, ভোজনশালার অবস্থান। খাবারঘরের [illegible] থেকেই পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে উপত্যকায়। সেখানেও [illegible] অলৌকিক প্রাকৃতিক নির্মাণের ব্যাপ্তি।

ভোজনের পর বিশ্রামের সময় নেই। আমরা এবার চলেছি কেভ চার্চ দেখতে। কাপাডোকিয়া অঞ্চলে অনেকগুলি এমন লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন চার্চ আছে। এগুলি নির্মাণ হয়েছিল সপ্তম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। খুব বড় গুহা বলতে পারি না, কিন্তু বিস্ময়কর ফ্রেস্কো— প্রাচীরচিত্র। যিশুর জীবনের নানা ঘটনার চিত্রায়ন বহু রঙের কাজে। এবং আশ্চর্য, অনেক ক্ষেত্রে হাজার বছরের রঙিন কাজ এখনও অবিকৃত আছে।

প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক— এমন দুর্গম স্থানে মানুষের নজরের বাইরে এইসব গুহা কেন তৈরি হয়েছিল, কারা করেছিল। খ্রিস্টধর্ম প্রসারের ইতিহাস বলে রোমানরা তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে, তার প্রচার শুরু করে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীও অনেক ছিলেন, তাঁরা সর্বত্র গির্জা ধ্বংস করতেন এবং এই ধর্মপ্রচারে বাধা দিতেন। তখন খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা বিধর্মীদের আক্রমণ বাঁচাতে এইসব গোপন গির্জা তৈরি করেছিলেন। তারা এতই গুপ্ত ছিল, যে দূর থেকে গুহামুখ দেখাই যেত না।

আমরা গোরেম ওপেন এয়ার মিউজিয়ামের পাশে একটি গির্জায় গিয়েছিলাম। ঢালু কাঁকুরে পথ থেকে খানিকটা নীচে নামতে হল। গির্জার প্রবেশদ্বার কোথায় দেখতে পাওয়া যায় না। মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে ডানদিকে একটু চড়াই ভাঙতে হল। তখনও গির্জার ছোট দরজা দেখতে পাওয়া যায় না। গির্জার ভেতরে আলো প্রবেশ করে না। বিজলির আলোয় প্রথম যে হল-এ পৌঁছলাম, তার মাপ তিরিশ বাই চল্লিশ ফুট হবে। তার পর আরও দুটি অনুরূপ হল। আমার ক্যামেরায় সেই আশ্চর্য ছবি নেওয়া গেল না। এই গির্জার উপযুক্ত নাম হিডন্ চার্চ।

সেই ভোরে বেরিয়েছি। কোথাও শোওয়া বসা নেই। আমার শরীর আর বইছিল না।

হুসেনকে বলতে, সে আমাদের আলাদা নিয়ে চলল হোটেলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। অন্য যাত্রীরা আরও খুঁটিয়ে দেখছিলেন। পাকিস্তানি মেয়ে দুটিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারাও আমাদের সঙ্গে ফিরতে চাইল। কিন্তু তাদের হোটেল আবার অন্য কোনও জায়গায়। আমাদের সঙ্গে আসতে চাইল না।

জানতাম আমরা কেভ হোটেলে থাকব। কিন্তু সেটা যে অভিনব, অন্য কী কারণে তার রূপ কল্পনা করতে পারিনি। এখন চূড়াগুলির গায়ে মস্তমস্ত ফোকর, গুহামুখ প্রকৃতির তৈরি করা। একদা অনেক গুহাতে মানুষ বাস করত। এখন তারা নীচের উপত্যকায় নেমে বাড়িঘর করে আছে।

আমাদের হোটেলের নাম সারিহান। আসলে কেভ হোটেল। পাহাড়ের বিভিন্ন ধাপে গুহা নিয়ে আমাদের হোটেল। কুড়ি পঁচিশটি ঘর বা গুহা আছে। গুহার সামনে পাথরের গাঁথনি করে হলঘর তৈরি করা হয়েছে। ওই হল থেকে গুহায় ঢুকতে হবে। যে গুহাতে আমরা থাকব, যাবতীয় সুবিধা আছে সেখানে। এয়ারকন্ডিশানিং নেই, দরকার হয় না। গুহার ভেতর খুব শীতল। কৃত্রিম হাওয়া

জলচলের ব্যবস্থা আছে। শীতকালে গরম করা হয় ঘর, তার ব্যবস্থাও আছে। বাথরুম সম্বলিত, ঠান্ডাগরম জলের ব্যবস্থা। এককথায় আজকের যাবতীয় প্রয়োজন মেটায়। ঘরের দেওয়াল এবড়োখেবড়ো পাথরের, তার ওপর কলি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভালো বিছানা। ব্রেকফাস্ট হবে বাইরের ছাদে।

ছাদে উঠে চিত্ত বিহ্বল হয়ে উঠল। যেহেতু হোটেল কিছুটা উঁচুতে, তিনদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল দেখা যাচ্ছে, সব জুড়ে আছে ওই বিমূর্ত কীর্তিগুলি।

আজকের ট্যুর শেষ হয়েছে। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে নীচের রেস্টুরেন্ট বা বাজারে। আমরা ক্লান্ত। কোথাও যাবার ইচ্ছা নেই। হোটেলের মালিক সপরিবার এখানে থাকেন। তাঁকে বললাম, এখানেই ভোজনের কথা। তিনি চমকে উঠলেন, বললেন, সে কী, খাবার দেওয়ার তো কথা নেই।

আমরা বললাম, সে কথা জানি, কিন্তু দাম দিলে ব্যবস্থা করা যায়? ভদ্রলোক বললেন, নিশ্চয় করা যায়। এখনই ব্যবস্থা করছি। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ডিনার তৈরি হয়ে যাবে।

এইসব গুহা হোটেল আসলে পাঁসিওর মতো। থাকার আয়োজন এবং প্রাতরাশ ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না।

মালিক বললেন, তাঁর মা রান্না করবেন।

ডিনারের আগে চা-পর্ব সারা হল আমাদের ঘরের সামনের ছাদে। ক্রমে আলো কমে এল। ছাদেই পানীয়ের আয়োজন হল। হুইস্কি দেখে হোটেল মালিকও আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন। রাত্রে ভোজন হল নীচের বসবার ঘরে। এখানে আহারের ঘর নেই। নিচু সোফায় বসে ভোজনে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু মালিকের মায়ের আশ্চর্য রান্নার হাত। সুপ ছিল এবং সালাদ। মেষ মাংসের কাবাব খুব উত্তম বলতে পারি না। কিন্তু তুর্কিরা কোফতা বলে যে কিমার ব্যঞ্জন খায়, সেটির স্বাদ অপূর্ব। শেষে আমাদের অতি পরিচিত কাস্টার্ড পুডিং এবং কফি। এমন পরিপূর্ণ আয়োজন। কিন্তু জানি না কত খরচ নেবেন হোটেল মালিক এই বাবদ। তার জন্য সামান্য অস্বস্তিও ছিল।

রাত্রে গুহার ভেতর আরামদায়ক শয্যায় আদিম মানুষের গুহাবাসের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গুহার ভেতরে বেশ ঠান্ডা। লেপ মুড়ি দিয়ে পরিপাটি নিদ্রা হল। সকালে প্রাতরাশ শেষ হতে না হতেই হুসেন এসে গেল। কিঞ্চিৎ নিরাশ হতে হল। তুরস্কে নানা স্থানে থেকেছি। কিন্তু এই প্রথম প্রাতরাশে অলিভ অনুপস্থিত। অলিভের ব্যাপক চাষ হয় তুরস্কে। অলিভের অনুষঙ্গ ছাড়া কোথাও প্রাতরাশ হয়েছে মনে পড়ে না। অলিভ আমাদের পছন্দের জিনিস।

কোচে উঠে বসলাম। কালকের দলই বলা চলে, আমাদের দলের দুজন ছাড়া, তাঁরা আজ নিজেদের উদ্যোগে পাহাড়ের মাথায় একটি হ্রদ আছে, তাই দেখতে গিয়েছেন।

আবার সেই পরিচিত পথ দিয়ে চলেছি। দুধারে কোন অন্য গ্রহের কারিগরের

তৈরি বিশালাকার মূর্তি। তিন চার কিলোমিটার যাবার পর হুসেন বলল, আজকের প্রোগ্রামে আছে একটা ট্রেক, অর্থাৎ পদযাত্রা। হাঁটতে হাঁটতে চাষের খেতের মধ্যে দিয়ে, ফলের বাগান পার হয়ে খানিকটা নীচে নেমে আমরা পৌঁছব এক গ্রামে ঘণ্টা দুয়েক পর। সেখান থেকে আবার কোচে রওনা হব।

আমরা হাঁটতে চাইলাম না। হুসেন আমাদের নিয়ে ওই গ্রামে চলল। সেখানে আমরা বসব ঘণ্টা দুয়েক, তারপর পদযাত্রীরা এসে পৌঁছলে আবার কোথাও যাওয়া হবে।

আমরা দুজন একটা বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে চেরি গাছের তলায় দুটি চেয়ার নিয়ে বসলাম। আশেপাশের ছোট একতলা বাড়িগুলি দেখছি, কয়েকটা গুহাতেও মানুষের বাস আছে দেখলাম। বাড়ির মালিক একটা দোকান চালান, চা কফি কোক পেপসি এবং কিছু সুভ্যেনির পাওয়া যায় সেখানে। দু চারটে চড়ুই ঘুরে বেড়াচ্ছে। হুসেন আমাদের একগুচ্ছ চেরি দিয়ে গেল গাছ থেকে ছিঁড়ে। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। কয়েকটা মেয়ে নীচের কল থেকে জল নিয়ে ওপরে উঠছে। অতি শান্ত জীবনযাত্রা। পাশে একটা আখরোট গাছে ফল ধরেছে। কাঠবিড়ালিরা তার আহরণে ব্যস্ত।

দুয়েকটা সুভ্যেনির কিনলাম। জানি আরও দরদস্তুর করলে সস্তায় হত। এই শান্ত সকালবেলায় তর্কে যেতে ইচ্ছা করল না।

হৈহৈ করতে করতে পদযাত্রীর দল ফিরে এল। আবার বাসযাত্রা হবে। তাঁরা আঙুরের বাগান এবং অন্যান্য শস্যের খেত দিয়ে এসেছেন। পথে একটা শিয়াল দেখেছেন। তাকে নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা।

কোচে উঠে পড়া গেল। আবার সেই অদৃষ্টপূর্ব গ্রহের মধ্য দিয়ে যাত্রা। আমরা আবার গেলাম গোরেম ওপেন এয়ার মিউজিয়াম। প্রায় এক কিলোমিটার ছড়ানো মিউজিয়াম। নানা প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যে সাজানো।

তুরস্কে প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের অভাব নেই। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা। কৃষিকাজে পটু মানুষ যে কয়টি জায়গায় প্রথম দেখা গিয়েছিল, তুরস্ক তার মধ্যে একটি। এই কাপাডোকিয়া অঞ্চলেই পাঁচ হাজার বছরের প্রত্নচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। আগ্নেয়গিরির নিষ্ক্রিয়তার বহুযুগ পরে এখানে মানুষ বাস করা শুরু করেছিল। বিচিত্র আকারের পাথরের স্তম্ভগুলিতে জল হাওয়ায় গুহার সৃষ্টি হয়েছিল স্থানে স্থানে। সেখানে মানুষ প্রকৃতির তৈরি বাসস্থান পেয়েই গিয়েছিল। এই পাথর নরম, অল্প পরিশ্রমে কাটা যায়, সুতরাং গুহাগুলি মানুষ প্রয়োজনমতো বড় করে নিয়েছিল। এখনও কিছু মানুষ স্থানে স্থানে পরিবর্ধিত গুহাতে বাস করে। বেশিরভাগ যদিও নেমে এসেছে পাহাড়ের নীচের সমভূমিতে।

তুরস্কের আধুনিক ইতিহাসও চমকপ্রদ। গত দুহাজার বছরে তাদের পর গ্রিক, রোমান, সেলজুক এবং শেষে অটোমান তুর্কিরা এই দেশে রাজত্ব করেছে। রোমানরা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করার পর এখানে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ শুরু হয়। কিন্তু অন্য

বিধর্মীরা তাদের সহ্য করতে পারত না। তাই খ্রিস্টানদের উপাসনার স্থান গোপন রাখতে হত। গুহার গভীরে লুকোনো অনেক গির্জা কাপাডোকিয়ায় ছড়িয়ে আছে। গুহার প্রবেশদ্বারও আড়াল করে রাখা হত, যাতে আক্রমণকারী শত্রু সেই গির্জার খোঁজ না পায়। অনেক গির্জার ভেতরে ভক্তদের দ্বারা আঁকা ফ্রেস্কো প্রাচীরচিত্র এখনও দেখা যায়। ওপেন এয়ার মিউজিয়ামের এক পাশে খোলা সমভূমি থেকে খানিকটা ওপরে উঠে পাহাড়ের একপাশে আমরা হিডন গির্জা কাল দেখেছি।

আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে এবার নদীর অপর পারে। অনেকখানি নীচে নেমে এলাম, নদীর ওপর খুব নিচু সেতু পার হয়ে যে শহরটিতে ঢুকলাম তার নাম আভানোস, ছবির মতো সুন্দর। প্রচুর গাছপালায় সবুজ। সব বাড়ির সামনে কিছু রঙিন কারুকার্য করা। আমরা চলেছি একটি কারখানা দেখতে, সেখানে নানা সেরামিক বস্তু তৈরি হয়। চাক ঘুরিয়ে কুমোর বিভিন্ন আকৃতির বাটি ঘটি ঘড়া থালা তৈরি করছে। তারপর কিলনে চড়িয়ে তাতে রং দেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে দুই যাত্রী কুমোরের চাকে হাত লাগিয়েছিলেন, তাঁদের হাতে যা তৈরি হল তা শিব গড়তে বানর। এই শহর সেরামিকের কাজের জন্য বিখ্যাত।

এবারে দিনের শেষ প্রোগ্রাম। মাটির নীচে শহর। এমন শহর সাঁইত্রিশটি আছে কাপাডোকিয়ায়। আমরা একটি বড় শহর দেখব। মাটির নীচে আটতলা পর্যন্ত খনন করা গিয়েছে। হয়তো নীচে আরও আছে।

বাজার অঞ্চলের ভেতর দিয়ে অকিঞ্চিৎকর প্রবেশদ্বারে পৌঁছলাম। সামনে প্রথমে একটা ছোট্ট হল বা বড় ঘর। ঘরের একপাশ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। সম্ভবত খ্রিস্টানরা শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য এই ভূগর্ভ শহর তৈরি করেছিলেন। সেও বারো চোদ্দশ বছর আগের ঘটনা। প্রথম খ্রিস্টানদের নিরাপদ ধর্মাচরণ, প্রার্থনার জায়গা। পরে ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীতে আরব আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নিরাপদ আশ্রয়। পাঠশালা, পাকশালা, ভাঁড়ার ঘর, শোবার ঘর, ভোজনের স্থান। মদ তৈরির ঘর। অস্ত্রাগার। পালিত পশু রাখবার ঘর। শৌচাগার, বায়ু চলাচলের সুড়ঙ্গ বা নালি। সর্বোপরি, গির্জা এবং উপাসনা কক্ষ বিভিন্ন তলায়। এই শহরের নাম ডেরেনকুয়ু।

ডেরেনকুয়ুর গির্জায় কোনও প্রাচীরচিত্র নেই। শুনেছি কয়েকটি ভূগর্ভ শহরের গির্জা ফ্রেস্কোতে অলঙ্কৃত।

নীচের তলায় পালিয়ে যাবার গোপন দরজা। দরজা অর্থে মস্ত জাঁতাকলের মতো গোলাকার একখণ্ড পাথর। এমন দরজা সুড়ঙ্গের প্রবেশের দিকেও আছে। ভেতর থেকে না খুললে সেই বিরাট পাথর সরানো যায় না। শত্রুকে আটকাবার বন্দোবস্ত।

সুড়ঙ্গ অতি সংকীর্ণ। উঁচুতে পাঁচ ফুট, স্থানে স্থানে তারও কম। মাথা উঁচু করে যাওয়া যায় না। ঘাড় নিচু করে থেকে ক্লিষ্ট হয়ে পড়ি। তারই মধ্যে উঁচু নিচু সুড়ঙ্গ এবং মাঝে মাঝে সিঁড়ি। কোথাও কিছু ধরবার নেই। দেওয়ালে হেলান দিয়ে একটু

দম নেব, তাও কঠিন। দেওয়াল এবড়োখেবড়ো রুক্ষ পাথরের। সমভূমির ষাট সত্তর ফুট নীচে নেমে গিয়েছে। আমরা সাতটি তলা দেখলাম। তার নীচে আর খনন করা হয়নি। হয়তো আরও কয়েকতলা আছে সেখানে।

এইরকম ভূগর্ভের শহরে, অনুমান করা হচ্ছে, দুহাজার মানুষ থাকতে পারতেন।

আমরা বছর দুই আগে ভিয়েতনাম গিয়েছিলাম। সেখানে দক্ষিণ ভিয়েতনামে হো চি মিন সিটির (যার নাম ছিল সায়গন) উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত গেরিলা সৈন্যদের সুড়ঙ্গ দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। এই তো সেদিনের ঘটনা, এখনও অর্ধশতাব্দী হয়নি। আর, এখানে কাপাডোকিয়ায় যে সুড়ঙ্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, সেটা তৈরি হয়েছিল বারো'শ বছর আগে। তখন মানুষের কোনও যন্ত্র ছিল না। খনন করবার, পাথর কাটবার হাতিয়ারও আদিম ছিল। তা সত্ত্বেও মানুষের এই কীর্তি দেখে বাকরোধ হয়ে যায়।

ইলেক্ট্রিক আলো ছিল বলে আমরা এই সুড়ঙ্গে চলাফেরা করতে পেরেছি। কী করত প্রাচীন মানুষেরা, কেমন করে এই অন্ধকূপে বাস করত দুহাজার মানুষ? কত বছর লেগেছিল একটা ভূগর্ভের শহর তৈরি করতে, কত শ্রমিক একসঙ্গে কাজ করেছিল, কোথায় নিয়ে ফেলল ভূগর্ভের মাটি ও পাথর? এই সব নিয়ে পণ্ডিতেরা গবেষণা করছেন। আমরা একটি শহর দেখেই চমৎকৃত।

এবারে হোটেল ফিরে গেলেই হয়। কিন্তু তার আগে হুসেন বলল, আমরা একটা পুরনো গ্রিক ও তুর্কি গ্রাম দেখব। এখন অবশ্য অতি সামান্য সংখ্যক গ্রিক বাসিন্দা আছে তুরস্কে। একদা গ্রিকদেরই আধিপত্য ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে, গ্রিস এবং তুরস্কের মধ্যে ঐতিহাসিক বাসিন্দা বিনিময় হল। দশ লক্ষাধিক স্থায়ী গ্রিক অধিবাসী তুরস্ক ছেড়ে মাতৃভূমিতে ফিরে গেলেন এবং কমবেশি পাঁচ লক্ষ তুর্কি তুরস্কে ফিরে এসেছিলেন।

আমরা যে গ্রাম বা ক্ষুদ্র শহরটি দেখতে গেলাম সেখানে গ্রিকদের পুরনো বাড়ির বিশেষত্ব ছিল প্রবেশদ্বারের দেওয়ালের ভাস্কর্য। পাথরের তৈরি বাড়িঘর। এখন সেখানে তুর্কিরা বাস করে। শহরের আগে গ্রিক নাম ছিল সিনাসস, এখন নাম হয়েছে মুস্তাফাপাশ।

শহরের উপকণ্ঠে সেন্ট বেসিল চার্চ পাহাড় কুঁদে তৈরি করা— যেমন আমাদের ইলোরা। গির্জার ভেতর বহুবর্ণ ফ্রেস্কো, যেমন আছে অজন্তায়। কিন্তু এখানে প্রায় অবিকৃত, যদিও অজন্তা ও সেন্ট বেসিল গির্জা প্রায় সমসাময়িক।

রাতে ইচ্ছা ছিল বাজার অঞ্চলে নেমে কোনও ছোট রেস্টুরেন্টে আহার করব। আজ আর মালিকের মাকে কষ্ট দেব না।

সন্ধ্যায় ছাদে বসে পানের আসরে বাধা পড়ল। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল। অতএব গুহার ভেতর ফিরে যেতে হল। বজ্র-নির্ঘোষে বেশ বারিপাত হয়েছিল। বৃষ্টি যখন থামল তখন প্রায় নটা বাজে। আমাদের হোটেল থেকে অনেকটা নীচে বাজার।

ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। নীচে নামার ইচ্ছে হল না। আজ হরিমটর করেই চালাতে হবে।

বাইরে বেরিয়ে এলাম। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। দেখি এক অপার্থিব ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। চরাচর নানা কল্পনাতীত মূর্তিতে পূর্ণ। এক জায়গায় যেন তিনজন দীর্ঘদেহী রামমোহন দাঁড়িয়ে আছেন— তেমনই প্রলম্বিত পরিধান, মাথায় তেমনই টুপি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘোর এসে যায়। চাঁদের মায়ায় সব স্থির শান্ত।

কাল সকালে আমরা ফিরে যাব আমাদের পরিচিত জগতে। প্রাকৃতিক এই শিল্পকীর্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষের আধুনিক শিল্পকলার প্রকাশ দেখব ইস্তাম্বুলে।

চাঁদের আলোয় এই অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় পৃথিবীকে বিদায় জানালাম।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

এফেসুস আর পামাক্কুলে

প্রতাপকুমার রায়

তুরস্ক আমার প্রিয় দেশ। তুরস্ক বলতে ইস্তাম্বুল। ইস্তাম্বুলের বাইরে কখনও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আমার মতো পর্যটকদের বড় শহরের বাইরে বিশেষ যাওয়া হয় না। আমরা ফ্রান্স বলতে বুঝি প্যারিস। ইটালি বলতে রোম।

এবারে ইস্তাম্বুলের বাইরে গিয়েছিলাম। ইজমিরে, দক্ষিণ-পশ্চিম তুরস্কে। সমুদ্রের ধারে। ইস্তাম্বুল থেকে বিমানে এক ঘণ্টার দূরত্ব। সড়কপথে বাসে গেলে দশ ঘণ্টা লাগে। কিন্তু দেশটা আরও দেখা যায়। আমাদের সে সময় কোথায়?

সুতরাং বিমানে এক সকালে ইজমির বিমানপত্তনে পৌঁছলাম। আমাদের হোটেল সেখান থেকে এক ঘণ্টার পথ। দুপাশে, দূরে ছোট বড় পাহাড়। শেষ গ্রীষ্মে তখনও অবারিত সবুজ। পথের দুধারে অনেক গাছপালা। কৃষিক্ষেত্র। কী চাষ হয়েছে সেখানে জানবার উপায় নেই। এক তো মসৃণ রাস্তায় দ্রুতগতি গাড়ি চলেছে, সনাক্ত করতে পারি না। আর, দ্বিতীয়ত কাকে জিজ্ঞাসা করব, ড্রাইভারকে? সে বিন্দুমাত্র ইংরিজি বোঝে না। আমাদের নাম-লেখা প্লাকার্ড নিয়ে বিমানপত্তনের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। আমরা কাছে পৌঁছতে সে বুঝে নিয়েছিল আমরা দুজন তার যাত্রী। শুধু বলল, ওটল। অর্থাৎ হোটেলে নিয়ে যাবে। আমরা এসেছি এক আয়োজিত সফরে। ইস্তাম্বুলে টাকা জমা করে দিয়েছি। ট্যুর কোম্পানি আমাদের যাতায়াত, হোটেল, খাওয়াদাওয়া এবং গাইড সহ ঘোরাফেরার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমাদের কোনও বিষয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। ইজমিরে নেমে দেখলাম, কোনও শহরের চিহ্ন নেই। এয়ারপোর্ট যেমন হয় সব দেশে, প্লেন নামে সেই তেপান্তরের মাঠে।

ইজমির তুরস্কের তৃতীয় বড় শহর। খ্রিস্টের সাতশো বছর আগে এই স্থানে হোমারের জন্ম হয়।

কিছুদূর যাবার পর একটা ছোট জনপদে গাড়ি থামল। সেখান থেকে এক ভদ্রলোক উঠলেন। তিনি শার্ট ফুলপ্যান্টের অতিরিক্ত গলায় টাই লাগিয়েছেন। বোঝা যায় বেশ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। আমাদের এক নজর দেখে নিয়ে বললেন স্পষ্ট ইংরিজিতে, আমি আপনাদের গাইড। আমি আপনাদের এফেসুস নিয়ে যাব।

আজ সারাদিন আপনাদের সঙ্গে আছি। এখান থেকে আমরা বাকি সবাইকে নিয়ে এখনই রওনা হব।

আমরা বললাম, সে কি? আমরা তো হোটেলে যাব আগে। তারপর মুখহাত ধুয়ে সেখান থেকে এফেসুস যাব।

গাইড গম্ভীর গলায় বলল, তা কী করে হবে। হোটেল তো অন্যপথে। বাকি যাত্রীরা এখনই এসে পড়বেন। তাঁরা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করতে রাজি হবেন না।

কথা বলতে বলতে তখনই একদল যাত্রী একটা ছোট বাস থেকে নামলেন, তাঁদের বুঝি আর কোথাও থেকে তুলে আনা হয়েছে। তাঁরা আমাদের বাসে উঠে পড়লেন।

বাস চলতে শুরু করেছে, আমরা মহা বিরক্ত। এমন কথা ছিল না। আমাদের প্রোগ্রামে স্পষ্ট লেখা আছে, হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা গন্তব্যের দিকে রওনা হব। গাইডের গলা শোনা গেল। প্রথমে জার্মান ভাষায়, তারপর ইংরিজিতে। বলছে, আমাদের দুজন পর্যটকের জন্য হোটেলে যেতে হবে একবার। এঁরা জেদ করছেন। আধঘণ্টা লাগবে, আপনাদের অসুবিধা হবে না তো?

অন্য পর্যটকেরা নীরবে তাঁদের অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না না, আধঘণ্টা লাগবে না।

গাইড বলল, পনেরো মিনিট তো লাগাবেন, তাই না?

আমি সহযাত্রীদের উদ্দেশ করে বললাম, পনেরো মিনিটও লাগবে না, আমরা সাড়ে চোদ্দ মিনিটে তৈরি হয়ে নেব। আপনাদের কথা দিচ্ছি।

সবাই হেসে উঠলেন। আবহাওয়া একটু হালকা হল। গাইড বলল, তাহলে হোটেলেই যাচ্ছি।

হোটেলে আমাদের দশ মিনিটও লাগল না। ঘরে ঢুকিনি। রিসেপশনে নাম লিখিয়ে মালপত্র জমা দিয়ে রেস্টরুমের কাজ সেরে দশ মিনিটে ফিরে এসেছিলাম।

হোটেলের মস্ত চত্বর ফুলে-ভরা সাজানো বাগান। সহযাত্রীরা বাস থেকে নেমে ইতস্তত ঘুরছেন। দুয়েকজন সিগারেট ধরিয়েছেন।

উপক্রমণিকাতে এত কথা বললাম, তার কারণ আপনাদের সঙ্গে দুধরনের গাইডের পরিচয় করিয়ে দেব। আপনাদের অভিজ্ঞতায় আপনারাও এমন দেখে থাকবেন। পরদিন আমাদের যে গাইড ছিল, সে একেবারে অন্য প্রকৃতির। বাকপটু, হাসিমুখ, সব সময়ে সাহায্য করবার জন্য তৈরি। সে আমাদের পামাক্কুলে নিয়ে গিয়েছিল।

যাইহোক, আমরা এফেসুসের দিকে রওনা হলাম। আমাদের হোটেল থেকে আধঘণ্টার পথ। সেই পরিচ্ছন্ন মসৃণ রাস্তা, দুপাশে মাঝারি মাপের গাছের জটলা। দেখলেই বোঝা যায়, এরা প্রকৃতির অগোছাল সংসারের নয়, মানুষের রোপিত শৃঙ্খলাবদ্ধ গাছের জমায়েত।

গাইডকে জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল, এগুলি তুঁত গাছ। মানুষই এগুলি লাগিয়েছে, সযত্ন লালন করছে। তুঁত গাছে রেশমকীট তার গুটি বাঁধে, সেই গুটি থেকে রেশমের সুতো তৈরি হয়।

গাইড বলল, তুরস্কের রেশম পৃথিবীবিখ্যাত। এখানে সিল্কের বড় শিল্প আছে। আপনারা চাইলে বিকেলে আপনাদের কেমন করে সিল্ক বোনা হয় দেখাব। সেখানে সিল্কের বহুবিধ জিনিস কিনতে পারবেন। ফ্যাক্টরির দামে।

মনে হল আমাদের সহযাত্রী পর্যটকেরাও ঘর-পোড়া গরু। তাঁরা এইসব কারখানা আর দোকান থেকে দূরে থাকেন। জানেন যে গাইডের দেখানো দোকানে বাজারের থেকে বেশি দামে জিনিস বিক্রি হয়, কারণ গাইড সেখান থেকে কমিশন পাবে।

আমাদের সহযাত্রীদের অধিকাংশ জার্মান। দুজন ইজরায়েলের মানুষ ছিলেন। তাঁরা ঈষৎ স্বতন্ত্র থাকছিলেন, সবার সঙ্গে মিশছিলেন না।

পথে আরও নানাবিধ গাছ দেখলাম। আপেল, বাবুগোঁসা, ডুমুর। এটা বুঝি তুরস্কের অতি উর্বর অঞ্চল। আরেকটু দক্ষিণে গেলে আঙুরের চাষ হয়। সেই অঞ্চলের মদিরাও বিখ্যাত।

গাইড সহজে কথা বলতে চায় না। আরও অনেক জিজ্ঞাস্য ছিল। কিন্তু গাইডের বেজার মুখ দেখে কিছু বলতে ইচ্ছা করে না।

পথ এবার বেশ উঁচু-নিচু, ঢেউখেলানো। একটা পাহাড়ের কোল দিয়ে আরেক পাহাড়ে সামান্য উঠেই আমরা থামলাম। এই হল এফেসুস, দুহাজার বছর আগের সমৃদ্ধ রোমান নগরীর ধ্বংসাবশেষ।

গাইড বলল, ধ্বংসাবশেষ বটে, তবে পৃথিবীর আর কোথাও পুরো একটা শহরের অধিকাংশ বাড়ির চিহ্ন রয়েছে, এমন ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় না।

আমরা তখন শহরের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। প্রধান তোরণের সামনে। খুব গরম, মধ্যদিনের সূর্য মাথার ওপর, ঘাম হচ্ছে।

গাইড আমাদের সবাইকে জড়ো করে ছোট একটি বক্তৃতা করল, প্রথমে জার্মান ভাষায়, তারপর ইংরিজিতে। বলল, সামনেই আপনারা নাট্যশালার গ্যালারির নীচের অংশ দেখতে পাচ্ছেন। গ্যালারির চূড়ায় উঠে, ওপরে শহরের প্রধান রাস্তা পাবেন। তার দুধারে, বসতবাড়ি ছিল একদা, একটু এগিয়ে গণিকালয়ও পাবেন। বন্দিশালা, সাধারণের স্নানাগার। শেষপ্রান্তে সেলসুসের লাইব্রেরি, দোতলা বাড়িটা প্রায় অক্ষত আছে, ছাদ নেই অবশ্য, পড়ে গিয়েছে। সেখান থেকে সমুদ্রের জেটিতে যাওয়া যায়। এক সময় সমুদ্র আরও নিকটে ছিল। এফেসুস তখন বিখ্যাত বন্দর।

এত কথা কেন, আমি জানি গাইড আমাদের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পরের পর দেখিয়ে দেবে। গাইড বলল, আমি এখান থেকে আপনাদের সঙ্গে থাকব না। আপনারা জেটির দিকে না গিয়ে, লাইব্রেরি থেকে ডানদিকে মোড় নিয়ে, একটা গাছের ছায়ায় ঢাকা সমতল পথ পাবেন। এক কিলোমিটার মতো গেলে বাসস্ট্যান্ড। সেখানে আপনাদের বাস থাকবে। চিনে নিয়ে উঠে পড়বেন। আমি

সেখানে থাকব। দেরি করবেন না, দেরি হলে বাস ছেড়ে দেবে। তখন আপনাদের হোটেলে বা বাসস্থানে ফেরা একটা সমস্যা হবে। মনে রাখবেন ঠিক দুটোয় বাস ছাড়বে।

আরও অনেক কথা বলেছিল গাইড। সব কথা মনে নেই। বিনা পথপ্রদর্শক, এই পাথর, ভাঙাচোরা মূর্তিতে-ভরা, মার্বেলের এবড়োখেবড়ো দূরত্ব ভেঙে ঠিক পৌঁছতে পারব কিনা আমার সংশয় হয়েছিল।

গাইড সাময়িক গুডবাই বলে বিদায় নিল, আমরা ধীরে ধীরে গ্যালারির ওপরের সারির দিকে উঠতে লাগলাম। আশপাশে কোথাও পত্র-পল্লবের চিহ্নমাত্র নেই। ক্লান্ত হয়ে একটু ছায়ায় আশ্রয় নেব, তার আশা নেই। গরমও তেমনই বিভীষণ। তাছাড়া, একটা ছবির বই দেখে সব জায়গা সনাক্ত করা যায় নাকি!

ভেবেছিলাম, আমাদের সঙ্গী দলের কাউকে অনুসরণ করব। কিন্তু মুহূর্তে কে কোথায় হারিয়ে গেল। আমাদের দলের লালটুপি-পরা এক ভদ্রমহিলাকে চিহ্ন করেছিলাম, তাঁকেও আর দেখতে পাই না। তার ওপর ভয়, দুটোর পর বাস চলে যাবে। আমি তখন কোথায় যাব! আমার সঙ্গী অমরেন্দ্র, মানে 'ভ্রমণ'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। ছবি তুলতে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে। তার বয়স কম, আমি তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারি না। সে আবার মাঝে মাঝে ফিরে আসছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। তার দিকে নজর রাখা বড় কঠিন কাজ।

আরও অনেক পর্যটক এই পথে চলেছে। আমি যথাসম্ভব আমার কেনা বইটিতে দেওয়া ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দ্রষ্টব্য সনাক্ত করছি। দুপাশে পরের পর কারুকার্য-শীর্ষ থাম। পাথর এবং মার্বেলের তৈরি নানা মূর্তির খণ্ড যত্রতত্র পড়ে রয়েছে। একসময়ে যেখানে পৌঁছলাম সেটি মার্বেল স্ট্রিট। দুহাজার বছর আগে এই রাজপথের দুপাশে ধনী নাগরিকদের বাসস্থান ছিল। তাঁদের আমোদের জন্য রঙ্গশালা, স্টেডিয়াম, স্নানাগার।

ইতিমধ্যে অমরেন্দ্রকে হারিয়ে ফেলেছি, সে আমার আগে রয়েছে না পিছিয়ে পড়েছে জানি না। সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টিতে খুঁজে চলেছি। পথ অসমতল ও প্রস্তরাকীর্ণ। পথের দিকে মন না দিলে হোঁচট খাওয়া এড়াতে পারব না। তাই সঙ্গীকে খুঁজে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছি। যদি বাসস্ট্যান্ডে দেখা হয়, ভালো। আর না হলে? ভালো করে ভাবতেও পারছি না। বইতে হবে বলে জলের বোতল সঙ্গে আনিনি। এক ডলার বাঁচাতে গিয়ে টুপি কেনা হয়নি। নির্দয় সূর্যতাপ থেকে মাথা বাঁচাব, তার উপায় নেই।

এবারে এক সারি মার্বেলের মূর্তি। কাদের মূর্তি জানি না। বইতে তাদের ছবি খুঁজে পেলাম না।

দুটি মূর্তি চিনতে কোনও অসুবিধা হল না। নাইকে অর্থাৎ ভিক্টরি, বিজয়ের দেবী। পাথরের ওপর খোদাই। একপাশে আরও অনেক মূর্তির সঙ্গে অবহেলায়

পড়ে আছে। অন্যটি স্কোলাসটিসিরি। তিনি সাধারণের স্নানাগারের পরিকল্পনা করেছিলেন। মূর্তিটি যেন পাথরের তৈরি কবিতা, অসাধারণ লাবণ্যময়। মূর্তির নিম্নাঙ্গ আছে, মাথাটি নেই।

কিছুদূরে, হয়তো মাইলটাক হবে, সবুজের আভা দেখতে পাচ্ছি। হয়তো ওইখানে পৌঁছতে পারলে একটু আরাম পেতাম। কিন্তু ওটা আমার পথে পড়বে কিনা, কে বলে দেবে? সঙ্গে সঙ্গে, সামনে পিছনে যারা হাঁটছে তাদের জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। তাদের কাউকে ইংরেজ বলে মনে হল না। তবু দয়ালু মুখ দেখে এক প্রৌঢ়কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি ইংরিজি প্রশ্ন বুঝেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই হারিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গীরা কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

হঠাৎ সামনে দেখি একটি অতি সুন্দর থাম লাগানো দোতলা বাড়ি। এই তো সেই সেলসুসের লাইব্রেরি! আটটি সুন্দর থাম দিয়ে বানানো প্রাসাদ প্রায় অক্ষত দাঁড়িয়ে। এগুলি, আমার বই বলছে, আয়োনিয়ান শৈলীর। থামগুলির মাথার ওপরটা কারুকার্যকরা। অনুমান দ্বিতীয় শতাব্দীতে তৈরি। দোতলায় আবার অনুরূপ স্তম্ভ আটটি। হঠাৎ দেখলে বাড়িটির কল্পনাতীত সৌষ্ঠব চমকে দেয়। মনে হয় যেন বাড়িটা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, এখানে ওখানে কাজ চলছে। দীর্ঘকালের অব্যর্থ ক্ষয় সহ্য করে এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

মনে পড়ল, গাইড বলেছিল, মার্বেল স্ট্রিট অঞ্চলের পয়ঃপ্রণালীর আয়োজন চমকপ্রদ। বিগতদিনের বলে মনে হবে না।

সেলসুসের লাইব্রেরি একটু উঁচু জমিতে। তাই দূর থেকে দেখা যায়। লাইব্রেরির সুন্দর ইমারতটি দেখতে দেখতে ক্রমশ একটু নীচে নামলাম। আরও কাছে গিয়ে পাঠাগারটি দেখলে ভালো হত। কিন্তু কত আর অন্ধের হাতি দেখার মতো অসম্পূর্ণ একটা ছবি মনের মধ্যে তৈরি করব? মার্বেলের থামগুলি অসাধারণ সুন্দর, তন্বী, দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী যুবতীর মতো সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে নড়তে মন চায় না।

এমন নয় যে কল্পনার ছবির মতো এমন অপরূপ স্তম্ভ আগে দেখিনি। মূল তোরণ থেকে এখানে পৌঁছেছি। পথে দুপাশে অগণিত এই ধরনের থাম। কিন্তু তারা বেশিরভাগই অর্ধভগ্ন। এখানে ওপরের তলায় এবং নীচে আটটি করে অক্ষত থামগুলি চমৎকৃত করে। সেকালের বৈভবের কথা মনে করিয়ে দেয়। না জানি, এই সারা শহরটাই কত সুন্দর, কত আনন্দময় ছিল।

এফেসুসের পত্তন হয়েছিল এই পাঠাগার নির্মাণের প্রায় বারোশো বছর আগে। এথেন্সের রাজপুত্র আন্দ্রোক্লোস খ্রিস্টের হাজার বছর আগে এই অঞ্চলটা জয় করে প্রথম শহর নির্মাণ করেছিলেন এখানে। দেবদেবীদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হল। শহরটা কর্মচাঞ্চল্যে জাঁকিয়ে উঠেছিল। আলেকজান্ডার এফেসুসে পৌঁছলেন, তাও খ্রিস্টের তিনশো বছর পূর্বে। শহরটার সাজসজ্জা, সুখসুবিধা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

বর্তমান এফেসুসের আদিপুরুষ বলা যায় লাইসিমাকোসকে, সম্ভবত আলেকজান্ডারের উত্তর পুরুষ। তিনি শহরটা অধিকার করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ২৮৩ সালে। পাশের জলাজমির অসুস্থ পরিবেশ থেকে তিনিই এফেসুসকে সরিয়ে নিয়ে এলেন বুলবুল আর কানহির মাঝখানের উপত্যকায়। মনে পড়ল গাইড বলেছিল, শহরটাকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরেছিলেন লাইসিমাকোস। সেই পাঁচিলের ভাঙা খণ্ডাংশ এখনও কিছু দেখা যায়।

লাইসিমাকোসের মৃত্যুর পর এফেসুস অধিকার করে যথাক্রমে মিশরীয় এবং সিরিয়ানরা। রোমানদের দখলে শহরটা এল খ্রিস্টের প্রায় দুশো বছর আগে। তারপর থেকেই শহরটার সমৃদ্ধি শুরু হল। এশিয়ার রোমান প্রদেশগুলির রাজধানী হল এফেসুস। আবার আক্রমণকারীদের কবলে পড়ল এফেসুস। গথেরা আর্টেমিসের পৃথিবীবিখ্যাত মন্দির ভেঙে দিয়েছিল। তখন বলা হত পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আর্টেমিসের মন্দির। মৃগয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আর্টেমিস।

আর্টেমিসের মন্দিরের স্থানটি আমরা পরে দেখেছিলাম। সেকথা পরে বলব।

আপাতত সেলসুসের পাঠাগার দেখবার অপূর্ব সুখ ছাপিয়ে সূর্যদেব বড় যন্ত্রণা দিচ্ছেন। তার ওপর একটা দুশ্চিন্তা বড়ই ভাবিয়ে তুলল। লাইব্রেরির কাছে এসে প্রধান রাস্তা দুভাগ হয়ে গিয়েছে। আমি ডানদিকে যাব না বাঁদিকে? ভুল পথে চলে গিয়ে আবার এই নিদারুণ গরমে ফিরে আসতে হবে ভেবে আতঙ্কিত হয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত ঠিক পথেই কেমন করে রওনা হলাম জানি না। বাসস্ট্যান্ডে না পৌঁছনো পর্যন্ত শান্তি নেই। সুখের মধ্যে পথ এখন সমতল, এবং দুপাশে গাছের ছায়ায় সুশীতল না হোক, অসহনীয় নয়।

দূরে কতগুলি বাস এবং গাড়ি দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। তখন মনে হয়েছিল সেখানে পৌঁছতে যেন অনন্তকাল লাগছে।

দুপাশে ছোট বড় অস্থায়ী ছাউনির নীচে কয়েকটি দোকান। দু-চারটে চেয়ারও আছে সামনে। তারই একটাতে বসে শীতল পানীয় সেবন করে দেহমন কিঞ্চিৎ শান্ত হবার পর আবার দুশ্চিন্তা ও ভয় চেপে ধরল। অমরেন্দ্র কোথায়, তাকে তো দেখছি না। যদি বাস এবং গাইড খুঁজে না পাই তাহলেই বা কী হবে? কয়েকটি বাস সামনে দাঁড়িয়ে আছে, অনিশ্চিত পায়ে সেদিকে এগিয়ে যেতেই দেখি আমাদের গাইড। তাহলে পাশের বাসটাই আমাদের। কিন্তু অমরেন্দ্র, তার কী হবে?

সে কি এই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে বিনিদ্র রজনীতে মেহের আলির হাঁক শুনবে, সব ঝুটা হ্যায়।

বাসে উঠে গাইডকে আমার আশঙ্কার কথা বললাম। সে বিশেষ আমল দিল না। বলল, আমি তো বলেইছিলাম, ঠিক সময়ে ফিরে না এলে বাস চলে যাবে। সবাই সে কথা শুনেছে। নয় কি? তাহলে?

ইতিমধ্যে এক-দুজন করে আমাদের সহযাত্রীরা ফিরে আসছেন। সবাই বাসে উঠে পড়লেন। অমরেন্দ্রর কী হবে? আরেকটু অপেক্ষা করা যায় না এখানে?

কাকে বলব সেকথা? গাইডের বেজার মুখ দেখে কিছু বলতে ইচ্ছা করে না। জার্মানদলের এক মহিলা আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনার ক্যামেরা-কাঁধে বন্ধু কোথায়?

জার্মান দলটাই চঞ্চল হয়ে উঠল। গাইডকে বলল, আমাদের চলে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে?

গাইড বলল, এছাড়া উপায় কী? এরপর লাঞ্চ পাওয়া যাবে না।

আমি চুপ করে আছি। মনের মধ্যে ঝড় উঠছে। একটা ছোট জনপদের কাছে আমাদের বাসের গতি একটু মন্থর হল। হঠাৎ এক জার্মান মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, ওই তো, ওই তো আপনার বন্ধু। বাস থামাও।

বাস থামল একটু এগিয়ে। কোথায় অমরেন্দ্র? তাকে দেখা যাচ্ছে না। জার্মান মহিলা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, আমার মনে হল ওই দোকানের কাছে ভদ্রলোককে দেখেছি। হয়তো আর কেউ হবে।

আমরা আবার চলে যাব ঠিক হয়েছে, এমন সময় অমরেন্দ্রকে দেখা গেল। হেলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। মাথার টুপি নেই। বলল, দুটি মেয়ের দোকানে কী একটা রান্না হচ্ছে, আমাকে না খাইয়ে ছাড়বে না বলে বসিয়ে রেখেছিল।

সে তো এখানে। তার আগে কোথায় ছিলে? কী হত তোমায় আমরা খুঁজে না পেলে?

অমরেন্দ্র বলল, রাস্তা হারিয়ে গিয়ে আবার পুরনো পথে ফিরে এসেছি। এই তো সেই গেট, আমরা এখান থেকেই রওনা হয়েছিলাম। আমি পুলিশকে বলেছি, আমাদের বাস খুঁজে বার করো। খালি মুশকিল হল, পুলিশ বিন্দুমাত্র ইংরিজি বোঝে না। পুলিশ নিশ্চয় আমাকে পৌঁছে দিত, কিন্তু হোটেলের নামটা মনে নেই, কী বোঝাব? হোটেলকে বুড়ি-ছোঁয়া করে দশ মিনিটে বাসে উঠে পড়তে হয়েছিল। হোটেলের নাম দেখব কখন?

এ মানুষকে কিছু বোঝানো মুশকিল। আমি এর জন্য এত দুর্ভাবনা করছিলাম, আমার নিজের ওপরই রাগ হল। আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা লাঞ্চ খাবার জায়গায় পৌঁছে গেলাম। গাইড বলল, এইখানে আপনাদের লাঞ্চের আয়োজন হয়েছে। বুফে খেলে পয়সা দিতে হবে না। বাড়তি কিছু নিলে দাম নেবে।

গাইড তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা দুজন রেস্টরুম থেকে ফিরে এসে বুফের লাইনে যোগ দিলাম। বহু-প্রকারের স্যালাড এবং দই-সঞ্জাত কয়েক রকম চাটনি। মাছ মাংসের চরিত্র বুঝতে না পেরে ওদিকে গেলাম না। জল কিনতে হল। কিছু একটা সুস্বাদ মিষ্টান্ন ছিল। যথেষ্ট পরিমাণ ভোজন হল।

তিনটের আগেই বাস এসে গেল। গাইড বলল, এখন আমরা যাব আর্টেমিসের মন্দিরে। এই মন্দির মানুষের সৃষ্টি সুন্দর জিনিসের সেরা ছিল, পৃথিবীর সাত আশ্চর্যের অন্যতম। দেশ-বিদেশ থেকে মানুষ এই মন্দির দেখতে আসত। স্থাপত্যের অনুপম নিদর্শন কয়েকবার শত্রুর আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

এখন শুধু তার চিহ্নমাত্র পড়ে আছে।

আমরা বাস থেকে নামলাম। একটু নীচের দিকে নামতে হয়। ছোট এক আগাছা ভরা জলার ধারে একটি দীর্ঘ স্তম্ভ আর্টেমিসের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইতস্তত পড়ে থাকা স্থাপত্যের ভাঙা অংশ ছাড়া আর কিছু নেই।

গাইড বলল, আর্টেমিস গ্রিক দেবী। সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর ভগিনী। মৃগয়ার দেবী আর্টেমিসকে বন্য পশুপক্ষীর বন্ধু বলে মনে করা হত।

কিছুক্ষণ আমরা সেই স্তম্ভটি দেখলাম। আর্টেমিসের আদি মন্দিরের ছবিও কোথাও দেখিনি। আমাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন হচ্ছিল কেমন ছিল সে মন্দির।

আবার গাইডের গলা শুনলাম, আর্টেমিস মন্দিরের সৌন্দর্যের একটি নিদর্শনই থেকে গিয়েছে। সেটি আর্টেমিসের মূর্তি। হায়, সে মূর্তিও এখানে নেই, স্বভাব-সুলভ দাক্ষিণ্যে ইংরেজরা সে মূর্তি এখান থেকে নিয়ে চলে গেছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে।

আমরা ঘরপোড়া গরু, ইংরেজদের অনেক দাক্ষিণ্য পেয়েছি। বুঝতে অসুবিধা হল না, তুর্কিরাও ইংরেজ প্রভাব-মুক্ত হয়ে স্বস্তি পেয়েছে।

এবারে আমরা যাব যিশুমাতা মেরির বাসস্থান দেখতে। ছোট পাহাড়ের যে অংশে মা মেরির বাসস্থান, আমাদের লাঞ্চের জায়গা থেকে দূরে নয়। আধঘণ্টার কম সময়েই পৌঁছে গিয়েছিলাম। এখন খানিকটা পাহাড়ে উঠতে হল। পথের দুধারে পত্রবহুল বড় গাছ। মূল চত্বরের বাইরে যেখানে বাস দাঁড় করাতে হল, সেখান থেকে ছোট বাড়িটি দূরে নয়। পাথরের তৈরি নিরলঙ্কার একটি বড় ঘর। ভেতরে মায়ের মূর্তি আছে। এই মূর্তি দেখবার জন্য, পূত জায়গায় এসে পবিত্র হবার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে খ্রিস্টানরা আসেন। তাঁদের পরম তীর্থস্থান। সামনে নোটিশ বোর্ডের লেখা পড়ে জানতে পারলাম যে যিশুমাতা শেষ জীবন এই কুটিরে কাটিয়েছেন, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ক্রুশবিদ্ধ হবার পর যিশু বুঝতে পারেন তাঁর মার আর জেরুজালেমে বাস করা নিরাপদ হবে না। প্রিয় শিষ্য জনের হাতে মায়ের ভার তুলে দেন। জন যিশুজননীকে সঙ্গে নিয়ে এফেসুস-এ আসেন এবং পাহাড়ের ওপরের দিকে তাঁর জন্য একটি কুটির তৈরি করে দেন। মা মেরি এই কুটিরে শেষ জীবন কাটালেন। পরে এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পর্যটকেরা খ্রিস্ট-জননীর স্মৃতিপূত এই স্থানে এসে আর কলরব করছেন না। আরও কয়েকজন গাইড তাদের পর্যটকের দল নিয়ে এসেছে। সবাই অত্যন্ত নরম গলায় কথা বলছে। ধীরে ধীরে সবাই কুটিরে ঢুকছে, কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে আসছে।

ক্যামেরা নিয়ে ভেতরে যাওয়া বারণ, ছবি তোলা নিষিদ্ধ। অমরেন্দ্র তো টেলিভিশনের জন্য ছবি তুলতেই এসেছে। শেষ পর্যন্ত ওখানকার এক সন্ন্যাসিনীকে কী সব বুঝিয়ে অনুমতি পেয়েছিল।

গুটিকয় মিটমিটে আলো জ্বলছে সেই ঘরে। ছবি তোলার পক্ষে সম্পূর্ণ অকেজো আলো। তারই মধ্যে ছবি তোলা হল। ঘরের ভেতর মায়ের একটি মূর্তি আছে। মূর্তিটি অতি সুন্দর শিল্পকর্ম।

বাইরে বেরিয়ে বড় বড় গাছে ভরা স্থানটির মধ্যে শান্ত মন্দিরটি আবার ভালো করে দেখা গেল। আশপাশে দোকানপাট নেই, ফেরিওয়ালা নেই যে শান্তি বিঘ্নিত হবে।

সন্ধ্যার আগেই আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। তার আগে অন্যান্য যাত্রীদের নামাবার জন্য ট্যুর কোম্পানির অফিসে যেতে হয়েছিল। সেখানের আগামীকালের প্রোগ্রাম বুঝে নিলাম। অফিস থেকে রওনা হবার সময় দেখি আমাদের গাইড দাঁড়িয়ে আছে। সচরাচর গাইডকে কিছু বকশিস করা রীতিসম্মত। আমরা এতই বিরক্ত এই অনিচ্ছুক গাইডের ওপর যে আমরা বকশিস তো করলামই না, তাকে গুডবাই বলবার অবকাশ না দিয়ে চলে এসেছিলাম।

হোটেলটি বড়, কিন্তু বেশ খালি। রিসেপশনের মেয়েটি বলল, এবার আমাদের মনস্তাপের মাস চলছে। নইলে জুন মাসেই পর্যটকদের ভিড় হয়, হোটেল পুরো ভরে যায়, গমগম করে। নিউইয়র্কের এগারোই সেপ্টেম্বর, আর এবছর সার্সের ভয়ে যাত্রী আসছেন না।

তার দুঃখের কাহিনী না শুনে আমরা তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে যে যার শুয়ে পড়েছিলাম।

সারাদিন গরমে আর হাঁটাহাঁটিতে ক্লান্ত হয়েছিলাম। অবিলম্বে ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাঝরাতে বিছানার পাশে টেলিফোন বেজে উঠল। চমকেই গিয়েছিলাম। ওপাশে অমরেন্দ্রর গলা। বলল, একটু হাসপাতাল যাচ্ছি। মনে হচ্ছে বিশেষ কিছু হয়নি। তবু একবার ঘুরে আসাই ভালো। ডাক্তার আমাকে নিয়ে হসপিট্যাল যাচ্ছেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসব।

ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে আমার একটু সময় লাগল। মনে হল আমার অমরেন্দ্রর সঙ্গে যাওয়া উচিত। কিন্তু ততক্ষণে অমরেন্দ্র চলে গেছে। এবারে ক্রমশ ভাবনা বাড়তে লাগল। কী হয়েছে ওর? কত গুরুতর? এখনও ফিরছে না কেন? ঘুম আসতে চায় না। ঘড়ি দেখলাম রাত সাড়ে বারোটা।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল সকাল ছটায়। রিসেপশনে ফোন করলাম। মেয়েটি বলল, মিস্টার চকরবাটি হসপিটাল থেকে রাত দুটোয় ফিরেছেন। এখন নিশ্চয় ঘুমোচ্ছেন। তাঁকে ফোন দিতে বারণ করেছেন।

একটু আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু দুশ্চিন্তা ছাড়তে চায় না। জানি, ঘুম ভাঙলেই অমরেন্দ্র ফোন করবে। বেলা নটা পর্যন্ত ফোন এল না। আজ আমাদের দশটার সময় পামাক্কুলে দেখতে যাবার কথা। যাওয়াটা ক্যানসেল করতে হয়। অবশ্য ক্যানসেল না করলেই বা কী! অগ্রিম টাকা নিয়ে নিয়েছে। ফেরত তো দেবে না। এখন অমরেন্দ্র ভালো থাকলে হয়।

আমি দুনিয়ার সব দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে রিসেপশনের কাছে বসে আছি। যদি অমরেন্দ্রর ফোন আসে। হঠাৎ অমরেন্দ্র স্বয়ং এসে হাজির। আলুথালু চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। তবু উঠে হেঁটে বেড়াতে পারছে দেখেই আমার অপার স্বস্তি হল।

অমরেন্দ্র যা বলল তার মর্মার্থ, কাল সারাদিন রোদে রোদে ঘোরার জন্যই অসুস্থ হয়েছিল। ইসিজি করা হয়েছিল, কোনও দোষ পাওয়া যায়নি। ডাক্তারের নির্দেশ আজকের দিনটা সম্পূর্ণ বিশ্রাম। এবং সারাদিন রোদে এরকম ঘুরে একটানা শুটিং করা একেবারে বারণ।

আমার আর একা একা পামাক্কুলে যাবার ইচ্ছা নেই। কিন্তু অমরেন্দ্র জেদ করতে থাকল। সে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে, আমার পামাক্কুলে দেখে আসা উচিত। শুধু শুধু বাড়িতে বসে থেকে কী হবে?

অগত্যা দশটায় বাস আসতেই আমি অনিচ্ছুক মনে উঠে পড়লাম। আজ সহযাত্রীরা অন্য দল। জাপানি এক স্বামী-স্ত্রীর যুগল, একজন কোরিয়ার বৌদ্ধভিক্ষু। আরেকজন তুর্কি মহিলা। এদের কেউই ইংরিজি বলতে পারেন না। মোটামুটি বুঝতে পারেন। আরও জনচারেক, তাঁরা একসঙ্গে এসেছেন, নিজেদের মধ্যেই সারাক্ষণ আবদ্ধ ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হল না। হাসিমুখ যুবক গাইড বলল, আমরা যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এখন যাব সেটা আনাতোলিয়ার সম্ভবত সব থেকে সমৃদ্ধ অঞ্চল। এদিকটায় যেমন ফলের গাছ বেশি, ওদিকে তেমনই তামাক ও কাপাস তুলোর খেত বেশি দেখতে পাবেন।

কে না জানে তুরস্কের তুলো পৃথিবীখ্যাত। আর এখানের তামাকের তো তুলনা নেই। ভালো সিগারেট মানে টার্কিস টোবাকো।

গাইড ছেলেটি ভালো। আরও অনেক অজানা তথ্য জানিয়েছিল আমাদের। সব কথা মনে নেই, থাকেও না। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য গাইড ব্যাকুল। প্রশ্ন করবার যাত্রী নেই। চারজন তো নিজেদের মধ্যে মশগুল হয়ে আছে। বাকি তিনজন ইংরিজি বলতে পারে না। তুর্কি মহিলা নিজের ভাষায় প্রশ্ন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যেন এই মিশ্রদলে খুব স্বচ্ছন্দ নয়। তাঁর হয়তো প্রশ্ন করবার কিছু নেই।

পথে একবার থামা হল। যদি কারও কোথাও যাবার দরকার হয়। আমার জলপানের এই সুযোগ। সামনের দোকানে তাজা কমলালেবু থেকে রস বার করে দিচ্ছে গ্লাস ভরে। দাম এক ডলারের মতো। এক গ্লাস কমলালেবুর রস পান করে তৃপ্ত হয়েছিলাম।

দুপাশে প্রচুর চাষ হয়েছে। প্রধানত তামাকপাতা এবং কাপাস তুলোর। বড় বড় ফলের গাছও আছে পিছনে। দূরে ধূসর ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছে। তারা সারের পর সার চলেছে। বাইরে চড়া রোদ, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাসে আমরা আরামে চলেছি। রাস্তায় যান চলাচল সামান্য। এত চাষবাস হচ্ছে, কিন্তু কোথাও খেতে কাজের লোক, চাষি বা মজুর দেখতে পাচ্ছি না। গাইডকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, এখন আমাদের বৃষ্টির কাল আসন্ন। দুয়েকবার বৃষ্টি হয়েও গিয়েছে।

খেতে কোনও কাজ নেই এখন। ফসল তোলবার সময় কাজের লোকেরা আসবে।

গাইড বলল, এখন প্রায় একটা বাজে। আমরা আগে তাই লাঞ্চ খেয়ে নেব। লাঞ্চের পরে আপনারা পামাক্কুলের অপার্থিব দৃশ্য দেখবেন। সেখানে সাঁতার কাটতে পারেন, স্নান করবেন।

বড় রাস্তার ধারে আমরা একটা মাঝারি দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। নাম দেখলাম বুটিক হোটেল। বুটিক মানে বড় হোটেলের মতো বিশাল বিরাট কিছু নয়। সুন্দর করে সাজানো ছোট একটি হোটেল। ভারি মনোমতো স্থান। গাইড আমাদের নিয়ে গিয়ে বুফে টেবিলের বিবিধ খাবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

এখানে বোটি-কবাব ধরনের একটা কবাব ছিল। এরা বলে Kebap, Shish kebap। দই এবং তাহিনির চাটনি খুব ভালো লাগল। খাবার টেবিলে সবাই চুপচাপ খাচ্ছি, বিশেষ কথাবার্তা হচ্ছে না। কী করে হবে, অন্যপক্ষ তো ইংরিজি বলতে পারে না। আমি তুর্কি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি তুরস্কের কোন অঞ্চলের মানুষ? এদিকে আগে আসেননি? ভদ্রমহিলা উত্তর দিতে হিমসিম খেয়ে গেলেন। গাইড নিকটেই দাঁড়িয়েছিল। বলল, ইনি বলছেন, বছর দুই আগে ওঁর হাঁটুতে ব্যথা হয়েছিল। নিশ্চল হয়ে যাচ্ছিল। পামাক্কুলের প্রস্রবণে সাতদিন স্নান করে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছেন। তাই ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছেন।

কোরিয়ার ভিক্ষু বৌদ্ধগয়া সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি সম্প্রতি বুদ্ধগয়ায় তীর্থ করে এসেছেন। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন আমরা ধরতেই পারলাম না। তাঁর ইংরিজি উচ্চারণ আমাদের কাছে অবোধ্য। জাপানি দম্পতি নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছিলেন, তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ হল না।

ভোজনান্তে সামান্য বিশ্রাম করে আমরা পামাক্কুলের দিকে রওনা হলাম। আর মাত্র আধঘণ্টার যাত্রা। ডানদিকে নাতিউচ্চ পাহাড়ের সারি দেখা গেল। খানিকটা কাছে আসতে মনে হল পাহাড়টা বুঝি শ্বেতপাথরের তৈরি। গাছপালা নেই। এবারে ডানদিকে মোড় নিয়ে পাহাড়ের আরও কাছে আসতে দেখা গেল শ্বেতপাথরের বড় বড় চৌবাচ্চার জল টলটল করছে। কয়েকটার মধ্যে মনে হল কিছু মানুষও নেমেছেন। মনে হল শ্বেতপাথরের তৈরি চৌবাচ্চাগুলি স্নানের জন্যই তৈরি হয়েছে। দূর থেকে তাই পাহাড়টাকে মনে হয়েছিল শ্বেতপাথরে মোড়া।

গাইড বলল ওগুলো শ্বেতপাথরের চৌবাচ্চা নয়। বলা যায়, চুনাপাথরের। কয়েক হাজার বছর ধরে উষ্ণপ্রস্রবণের জল শীতল হয়েছে, তার খনিজ পদার্থগুলি জমে এই মর্মরের রূপ নিয়েছে। পাহাড়ের গভীরে কোথাও থেকে ক্যালসিয়ামপূর্ণ উষ্ণ জল প্রাকৃতিক নিয়মে ক্যালসিয়ামের আস্তরণ তৈরি করেছে। মাঝে মাঝে জল আটকে গিয়ে চৌবাচ্চার রূপ নিয়েছে। এই জলে অন্য খনিজ পদার্থও আছে। সেই জন্য অজ্ঞাত কোনও ভেষজ-গুণ আছে জলে। দেশ-দেশান্তর থেকে মানুষ এখানে চিকিৎসার জন্য আসেন।

ইতিমধ্যে আমরা পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করেছি। বাঁদিকে কিছু ভাঙাচোরা

প্রাচীন নির্মাণ দেখা যাচ্ছে। রোমান শহর হিয়েরাপলিসের ভগ্নস্তূপ।

গাইড বলল, আপনারা পামাক্কুলেতে স্নানাদি সেরে এইখানে ফিরে আসতে পারেন। রোমান শহরের বৈভবের কিছু চিহ্ন দেখে চমৎকৃত হবেন।

আমরা যেখানে পৌঁছেছি, সেখানে গাড়ি রেখে হাঁটতে হবে। একটু এগিয়েই দূর থেকে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে উঁচু নিচু বিভিন্ন স্তরে চৌবাচ্চাগুলি। ছোট বড় নানা মাপের চৌবাচ্চা, কোনওটাতে মাত্র একজনের স্থান হয়, অনেকগুলিতে একাধিক মানুষ জলে শরীর ডুবিয়ে বসে আছে। একটু ওপরে উঠে একটি বড় মাপের জলাধার। সেখানে হয়তো শতাধিক মানুষ একযোগে স্নান করতে পারে। করছেও। নানা পোশাকে প্রায়-নগ্ন মানুষের ভিড়। বহু পর্যটক এসেছেন। কেউ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য, কেউ রূপচর্চা করছেন, কেউ চিকিৎসা। গাইড বলল, এই চৌবাচ্চাগুলি সব প্রকৃতির সৃষ্টি। মানুষের কোনও হাত নেই।

আরেকটু ওপরে উঠে আরও বড় একটি জলাধার। একপাশে বড় বড় গাছের ছায়া পড়েছে। অন্য পাশে পাঁচিল তোলা, বাইরে দেখা যায় না। পাঁচিলের এপারে ছোট ছোট খাবারের দোকান, বসে-খাবার ভোজনশালা। স্ত্রী-পুরুষের বস্ত্র-পরিবর্তনের জায়গাও এটা। একসার দরজাওলা স্নানঘর আছে। সেখানে পোশাক পরিবর্তন করা যায়। কজনই বা যাচ্ছেন সেখানে! কাউকে লজ্জা করবার স্থান নয়, সকলেই তো অর্ধ-নগ্ন, বরং তারও বেশি। টিকিট কেটে জলে নামতে হয়। তার আগে সবাই এখানে হ্রস্ব সুইমিং কস্টিউম পরে নিচ্ছেন।

গাইড বলল, আপনি জলে নামবেন না? আমি বললাম, আমি তো সাঁতারের পোশাক আনিনি। তাছাড়া আমার পায়ে ব্যথা।

গাইড উৎসাহ দিল, সেইজন্যই তো আপনার এই জলে স্নান করা উচিত। এই জলাধারটিই মূল উৎস। এখান থেকেই জল নীচের চৌবাচ্চাগুলিতে যাচ্ছে। আর জলে নামবার পোশাক? সে আমি এখনই এনে দিচ্ছি। সামান্য ভাড়া। এই জলে স্নান করলে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যায়। তাছাড়া এই জল শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি করে। জানেন, স্বয়ং রানি ক্লিওপেট্রা এখানে স্নান করতে এসেছিলেন।

অনেক কষ্টে গাইডকে নিরস্ত করলাম। একা চেয়ার নিয়ে যেখানে বসেছি, সেখানেই সবাই পোশাক বদলাচ্ছে। দৃশ্যটা আদৌ সুখকর নয়। সবার শরীর তো দেখবার মতো নয়, না দেখালেই ভালো হয়। পুরনো রক্তস্রোত চঞ্চল করে দিয়ে পোশাকহীন পোশাকে মাঝে মাঝে সুন্দরীদেরও দেখা যাচ্ছে। এখানে না এলে এমন শরীর হাট দেখা যেত না।

এটা বিশ্রামেরও স্থান। বোতলে ঠান্ডা পানীয় নিয়ে অনেকে ওই পোশাকেই বসে আছেন। আমি নিরুপায় শার্টপ্যান্ট পরে এই দেবশিশুদের হাটে মূর্তিমান রসভঙ্গ। জাপানিরা কোথাও চলে গিয়েছে। কোরিয়ান ভিক্ষুকে দেখেছিলাম ছোট চৌবাচ্চাগুলির দিকে যাচ্ছে। বাকিরা কে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।

আমাদের গাইড আরেক গাইডের সঙ্গে ডোমিনো খেলছিল। বলল, আপনাকে

কি কিছু পানীয় এনে দেব? অথবা, আহার্য কিছু? তাছাড়া হিয়েরোপলিস দেখতে যাবেন না?

আমার আর কোথাও যাবার ইচ্ছা নেই। বেশ ক্লান্ত বোধ করছি। হঠাৎ অমরেন্দ্রর কথা মনে হল। ভালো আছে তো? হয়তো এখানে না এলেই ভালো হত। নাই বা হত পামাক্কুলে দেখা। দুশ্চিন্তা চেপে ধরল। সবে তিনটে বেজেছে। চারটের আগে এখান থেকে ওঠা হবে না, বলেছে গাইড। তারপর অন্তত আড়াই ঘণ্টার যাত্রা। দুশ্চিন্তা আমাকে অস্থির করে তুলেছিল।

হোটেলে ফিরতে প্রায় সাতটা বেজে গিয়েছিল। আড়াই-তিন ঘণ্টার পথ শেষ হবার ব্যাকুল অপেক্ষা করছিলাম।

হোটেলে নেমে সামনেই দেখি অমরেন্দ্র হাসি-মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ভালো আছে, বলে দিতে হবে না। তখন মনে হল পামাক্কুলে না গেলে একটা বড় লোকসান হয়ে যেত।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৩

হো চি মিনের দেশে ১৮ দিন

প্রতাপকুমার রায়

গত মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত আমাদের বিদেশযাত্রা মানে ছিল বিলাতযাত্রা। বস্তুত, বিলাতে যাওয়াই আমাদের মোক্ষ ছিল। দু-দশজন ইউরোপের বড় বিখ্যাত শহরেও গিয়েছেন দেশ দেখার আকর্ষণে।

আমার বিশ্বাস ভ্রমণের স্থান হিসেবে ইউরোপ আমাদের কাছে উন্মোচিত হল গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। তখনও ইউরোপের সর্বত্র যুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষতচিহ্ন। ভ্রমণ তখনও সংগঠিত কাজ ছিল না।

তারপর তো ইউরোপ আমেরিকা খুলে গেল। আমরা দলে দলে ওইদিকে দৌড়লাম। জাপান চিন অবধি যাত্রা অল্প হত। অস্ট্রেলিয়াই বা কজন যেতেন? আমাদের ভ্রমণের আকর্ষণ হিসেবে যাকে বলা হত সুদূর প্রাচ্য অথবা পূর্ব এশিয়া, আমাদের ভ্রমণের তালিকায় তাও থাকত না।

এখন সেই সব অঞ্চল প্রবলভাবে আমাদের আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। তার দুটি কারণ। প্রথমত, পূর্ব এশিয়া যে বৈচিত্র্যে ইউরোপের চেয়ে বেশি, সেটা আমাদের এতদিন খেয়াল ছিল না। দ্বিতীয়ত, ইউরোপ আমেরিকা ক্রমশ আমাদের কাছে দুর্মূল্য হয়ে আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে যখন আমার বিদেশযাত্রা শুরু, পাউন্ডের দাম ছিল সাড়ে তের টাকা, আর ডলারের পাঁচ টাকার কম। আজকের ডলার ও পাউন্ডের দাম তো অসহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাউন্ড চুরাশি টাকা আর ডলার সাতচল্লিশ টাকা।

হয়তো এই কারণেই আমাদের মন পুবমুখো হয়েছিল। যদিও জাপান এখনও মহার্ঘ দেশ, কিন্তু জাপানের সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করেছিল। চিনের দ্বার খুলেছে অনেক পরে। গিয়ে দেখি কত সহজে একটা সুপ্রাচীন হিরের খনিতে প্রবেশ করেছি।

তবু, চিন জাপান হংকং কোরিয়া বাড়ির কাছে নয়। কাছের দেশগুলি, বর্মা বা মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ইত্যাদি। এবারে তাই গিয়েছিলাম ভিয়েতনাম। এখানেও ভারতীয় পর্যটক বিশেষ যায় না।

ভ্রমণপিপাসুদের আকর্ষণ করবার জন্য থাইল্যান্ডের সর্বশক্তি নিয়োগ দেখলে হতবাক হই।

আমরা ভিয়েতনাম থেকে ফিরে আবার কয়েকদিন থাইল্যান্ডের চমক দেখব।

সেদিন সকালে ব্যাংকক থেকে প্লেনে উঠে দশটার আগেই সাইগন পৌঁছে গেলাম। এত ছোট্ট দেশ, সবে ভ্রমণপ্রসারে সচেতন হয়েছে, তাদের সাইগনের এয়ারপোর্ট দেখেও আমাকে চমকাতে হল। এখন সাইগন নাম বদলে হয়েছে হো চি মিন সিটি।

শুনলাম শহরের যে অঞ্চলে আমরা যাব, সেই ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান মাত্র সাত কিলোমিটার দূরত্বে। পথটা যেতে কিন্তু চল্লিশ মিনিট লাগল। খোলা রাস্তা প্রথম অংশে প্রশস্ত। তারপর বড় একটা ব্রিজ পেরিয়ে শহরে ঢুকে পড়লাম। তখন সবে দোকানপাট খুলতে আরম্ভ করেছে, রাস্তায় বেশ লোক চলাচল। তারপর দেখি সার সার মেয়েরা স্কুলে চলেছে। ছেলেরাও ছিল, কিন্তু মেয়েরা পোশাকে ভারি স্বতন্ত্র। লম্বা সাদা প্যান্ট, তার ওপর পুরো হাতা ধবধবে সাদা জামা। মনে হবে যেন বিয়ের অনুষ্ঠানে সদ্য পাটভাঙা জামায় কনের সহেলিরা চলেছে। পশ্চিমে এদেরই বুঝি বলে ব্রাইডসমেড।

রাস্তায় চার চাকার গাড়ির বাহুল্য নেই। কিন্তু চাক ভেঙে দেওয়া ক্রুদ্ধ মৌমাছির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে মোটরসাইকেল। পরে মনে হয়েছে, এখানে বুঝি কেউ হাঁটে না। সবাই মোটরবাইকের আরোহী।

চিনের সঙ্গে অনেকদিন বৈরিতা ছিল ভিয়েতনামের। শান্তি ফিরে আসবার পর চিনের রপ্তানিতে ভিয়েতনাম ভরে গিয়েছে। তার অন্যতম হল মোটরসাইকেল। টাকার হিসেবে হাজার চারেকের মধ্যেই একটা মোটরবাইক পাওয়া যায়। তাছাড়া ব্যাঙ্কঋণ সহজলভ্য। বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ উন্মুক্ত, অবাধ করে দেওয়ার পর ভিয়েতনামের আমদানি ও রপ্তানি, উভয়ই বেড়েছে। তার মানে এই নয় যে ভিয়েতনামের আর্থিক অবস্থা ভালো।

ভিয়েতনামকে স্বাধীনতা অর্জন করতে যে মূল্য দিতে হয়েছে, পৃথিবীর অল্প দেশেই তার তুলনা পাওয়া যাবে। অনেক আগ্রাসন প্রতিহত করে, কয়েকবার রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের পর ভিয়েতনাম শান্তির মুখ দেখেছে। প্রধানত ভিয়েত জনগোষ্ঠীর বাস এই দেশে। হাজার-বারশো বছর চিনের পদানত ছিল। মাঝে মাঝে ব্যর্থ অভ্যুত্থান হয়েছে। মুক্তি আসেনি।

ভিয়েতনামের ইতিহাস যেন রক্তের অক্ষরে লেখা। চিনারা যাবার পর, জাঁকিয়ে বসল ফরাসিরা। তখন পরিচয় ছিল ফ্রেঞ্চ-ইন্দোচিন বলে। আমরা বাল্যে ওই নামই শুনেছি। মহাযুদ্ধের সময় জাপান ভিয়েতনাম আক্রমণ করে অধিকার করেছিল। তারাও পাঁচ বছর ভিয়েতনামের শোষণ করেছে। বিদেশি শাসন মুক্ত হল, কিন্তু তাদের সক্রিয় প্ররোচনা এবং যুদ্ধ করবার সহায়তা চলতে থাকল। চিন, জাপান, রাশিয়া সবাই ভিয়েতনামের যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিয়েছে। তার ওপর গৃহযুদ্ধ। ইতিমধ্যে হো চি মিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি সংহত হচ্ছে। বৃহৎ এবং দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েছে। এর মাঝখানে আমেরিকার কমিউনিস্ট নিধন-যজ্ঞের

ইন্ধন হয়ে উঠল ভিয়েতনাম।

ভিয়েতনামের অধিবাসীর ছোটখাটো চেহারা, দেখলে মনে হয় শান্ত নির্বিরোধ মানুষ। তাদের ভেতরে যে এত শক্তি এবং সাহস আছে, তার প্রমাণ দেখা গেল আমেরিকান আগ্রাসনের সময় ১৯৬৩ সালে। আমেরিকার বিদেশনীতির ভ্রান্ত অক্ষম গর্বের সাক্ষী ভিয়েতনাম। কিন্তু এই শান্ত, ছোটখাটো মানুষগুলি যে সাহস ও পরাক্রম দেখিয়েছে তার কাছে অমিত শক্তিধর আমেরিকাকে হার মানতে হয়েছিল। তার নানা চিহ্ন আমরা এবার দেখব।

আমাদের হোটেলটি ভালো, মধ্যম শ্রেণীর, সাইগন নদীতীরে। সামনেটা উন্মুক্ত। ওপারে হো চি মিন স্মৃতিমন্দির। এ দেশের নানা স্থানে হো চি মিনের স্মারকস্তম্ভ, মূর্তি, সংগ্রহশালা আছে। দেশটাকে হো চি মিন মনে হবে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। এমন নেতাও তো সহজে দেখা যায় না। গান্ধির ভয়হীনতা তাঁর চরিত্রে, অর্জুনের একাগ্রতা, অসীম ধৈর্য, শস্ত্রবিহীন কিন্তু অগাধ মনের জোর।

হোটেলের জানালা থেকে দেখি সামনের প্রশস্ত রাস্তায় যানবাহন চলাচল। এই রাস্তায় মোটরবাইকের সংখ্যা কম। মানুষ বাস থেকে নেমে নদীতীরের ফেরিঘাটে যাচ্ছে শ'য়ে শ'য়ে। ওপারে দূরে কোথাও বুঝি কারখানা, অফিস। সারাদিন এপার থেকে মানুষ ওপারে যাবার জাহাজে উঠছে। বিকালের দিকে আবার ফিরতি ভিড় বেড়ে যাবে। আমাদের সামনেই সাইগন নদীর একটা চ্যানেল বা শাখা বেন নঘি চ্যানেল। তার ওপর চওড়া সেতু। সন্ধ্যায় নদীর ওপর আলোকিত ছোট বড় জাহাজ দেখব, কান পাতলে সেখানের আনন্দ কোলাহল ভাসা ভাসা শোনা যাবে। এগুলি প্রমোদ তরণী। নদীর বুকে ভ্রমণ অভিলাষীদের কিছুক্ষণ নানা আনন্দের উপকরণ জোগায়।

লক্ষ করেছি, দেশ ভ্রমণে সাহায্য করার জন্য সর্বত্র ছাপানো কাগজপত্র রেখেছে নানা পর্যটন সংস্থা। কোথায়, কখন, কী মূল্যে কতক্ষণে ঘুরে আসা যায়, তার বিস্তৃত বিবরণ। বোঝা যায় ছাপার আয়োজন ভালো নয়, ইংরিজি ভাষাতেও দখল নেই। তেমনই একগুচ্ছ ছোট বড় প্যামফ্লেট নিয়ে বিবেচনা করছি লাঞ্চের পর কোথায় যাওয়া যায়।

প্রথম কাজ বোধহয় শহরটা দেখা। তেমনই একটা ট্যুর বেছে নিয়ে ফোন করলাম। এরা ইংরিজি ভাষাতে খুব দক্ষ নয়। আমার কথা বোঝবার জন্য আরেকজনকে ফোন ধরিয়ে দিল। আমাকে সাহায্য করবার কেউ নেই এপ্রান্তে। আমি বহু কষ্টে, বহু পুনরুক্তির পর একটা প্রোগ্রাম পছন্দ করলাম। আমাদের আড়াইটার সময় বাস এসে নিয়ে যাবে। তিন ঘণ্টার প্রোগ্রাম এবং আশ্চর্য, ইউরোপ আমেরিকার থেকে তো বটেই, থাইল্যান্ডের চেয়েও সস্তা। মাথাপিছু চার ডলার। ভিয়েতনামে কয়েকবার টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে। আমরা পেলাম প্রতি আমেরিকান ডলারে পনেরো হাজার ভিয়েতনামের ডং। যখন তখন দু-দশ লাখ ডং-এর নোট রাখতে হয় সঙ্গে।

লাঞ্চের পর সিটি ট্যুরের বাসে ইংরিজিভাষী গাইড-সহ শহর ঘোরা হল। আমরা সাইগন নদীর পশ্চিম পারেই থাকলাম। আমাদের অঞ্চলে বাড়িঘরে পাশ্চাত্য স্থাপত্যের ছাপ। সব থেকে বড় দ্রষ্টব্য রি-ইউনিফিকেশন প্যালেস। বহু বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, গৃহযুদ্ধ এবং অভ্যুত্থানের পর উত্তর-দক্ষিণ ভিয়েতনাম এক হয়ে গিয়েছিল ১৯৭৬ সালে। এই প্রাসাদ দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্টের বাসস্থান ছিল। সেই প্রাসাদও পাশ্চাত্য রীতিতে ফরাসি আদলে তৈরি।

দ্রষ্টব্য আর ছিল নতরদাম ক্যাথিড্রাল ও বড় পোস্টঅফিস। ভিয়েতনামে রোমান ক্যাথলিকরা জনসংখ্যার দশ শতাংশ। শতকরা ৮৫ জন বৌদ্ধ। শহরে অনেক বৌদ্ধ প্যাগোডা ও মন্দির আছে, সেখানে প্রার্থনার সব উপচারের আয়োজন। ভক্তের সংখ্যাও অনেক। তবু ভিয়েতনামকে খুব ধার্মিক দেশ বলে মনে হয়নি। ভিয়েতনামের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বৌদ্ধভিক্ষুদের অবদান অসামান্য। স্বাধীন সংযুক্ত ভিয়েতনামের সূত্রপাত তাঁরাই করেন। আগুনে আত্মোৎসর্গ করার কয়েকটি ঘটনার পর ফরাসিরা পিছনে হটতে বাধ্য হয়।

আমাদের সেদিনের শহর ট্যুরের শেষ অংশ ছিল, চমকপ্রদ পাইকারি বাজার চো লোন, কলকাতার পোস্তার মতো। আয়তনে পোস্তার দ্বিগুণ। তেমনই ভিড়, তেমনই ব্যস্ত, নোংরা, চিৎকার চেঁচামেচি।

পাশেই চায়নাটাউন, একদা কলকাতায় যেমন, সব চায়নাটাউনই শহরের সাধারণ অংশ থেকে স্বতন্ত্র।

চিনা মশালার নানা অজানা সুবাস, কোথাও রান্না হচ্ছে ফুটপাতের ওপর, বাচ্চারা নির্ভয়ে রাস্তার ওপর খেলা করছে, যানবাহন তাদের সন্তর্পণে এড়িয়ে যাচ্ছে।

আর একটা বৃহৎ বাজার যেন অনেক বাজারের সমষ্টি, জীবনধারণের যাবতীয় উপকরণ সেখানে পাওয়া যায়। বৃহৎ সুদৃশ্য বহিরঙ্গের বাড়ি বেনথান মার্কেট, পৃথিবীর যাবতীয় বিচিত্র সামগ্রীর সেখানে উপস্থিতি। ফলের বাজার দেখে আমরা বিস্ফারিত-চক্ষু। কত রকমের ফল। লিচুর দূর সম্পর্কের আত্মীয় লোঙ্গান, তার এখানে খুব কদর, প্রকাণ্ড মাপের কামরাঙা। দরদস্তুর হচ্ছে খুব। মাছ-মাংস, নুডল।

সে রাত্রে হোটেলের খাবারঘরেই ভোজন হল। কিছুই নতুন নয়, হয়তো নানা দেশের অতিথিদের জন্য এমন সব পদার্থ তৈরি যা মোটামুটি সকলের চলে।

রাত্রে নদীর ওপর দিয়ে আলোকিত ছোট বড় জাহাজের চলাচল দেখতে থাকলাম।

পরদিন ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে এক ট্যুর এজেন্সিতে সারাদিনের ট্যুর বুক করলাম। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, সবসুদ্ধ দাম নিয়েছিল বোধহয় প্রত্যেকের কুড়ি ডলার। সকালে ট্যুর কোম্পানির ছোট একটা বাস এসে আমাদের ট্যুর এজেন্সির অফিসে নিয়ে গেল। ক্রমশ আরও যাত্রী এসে পৌঁছলেন, এইবার পাশের একটি

ছোট ভোজনালয়ে সামান্য প্রাতরাশের পর আমরা রওনা হলাম মেকং ডেলটা ভ্রমণে। আমি দেখে অবাক হলাম ভ্রমণের আয়োজনে এ দেশ সম্পূর্ণ নতুন হলেও কেমন সুষ্ঠুভাবে সারা দিনের সফরসূচি তৈরি করেছে। আমরা অনেকখানি যাব মেকং ডেলটা ট্রিপে। ঘণ্টা তিনেকের পথ। এক ঘণ্টা চলার পর বাস থামল, এখানে ঠান্ডা, উষ্ণ পানীয় পাওয়া যাবে। শরীরও হালকা করে নেওয়ার অয়োজন আছে। বড় একটা চালার নীচে সারি সারি হ্যামক লাগানো। হ্যামকে শুয়ে বিশ্রাম করা যায়। আমি হ্যামকে শোবার অভিপ্রায়ে বসবার আগেই মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গীরা সবাই ইতস্তত ঘুরছেন, কেউ বা হ্যামকে শুয়েছেন, ঠান্ডা পানীয় নিয়ে পরিচারক আসছে। তাঁরা সবাই হেসে উঠলেন। কেউ তাড়াতাড়ি দৌড়ে এল আমাকে সাহায্য করতে। আমি ততক্ষণে উঠে পড়েছি। মাটি থেকে সামান্যই উঁচুতে বলে পড়ে গিয়ে আঘাত লাগেনি। তখনও জানি না, এটা তো উপক্রমণিকা মাত্র। আসন্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।

আবার সবাই বাসে এসে উঠলাম। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাস। মসৃণ কিন্তু সংকীর্ণ রাস্তা। কয়েক দেশের মানুষ একত্রিত চলেছেন, হালকা গল্পগাছা হচ্ছে। পরে পরিচয়ও হল কয়েকজনের সঙ্গে। দেখলাম দলে সর্বগামী আমেরিকান কেউ নেই। ইংরেজের সংখ্যাও সামান্য। প্রধানত আমরা এশিয়াবাসীরা আজ যাত্রী। এর পরেও কোথাও আমেরিকান দেখতে পাব না। একটি কিশোরী মেয়ে ছাড়া। সে স্কুলের ছুটিতে দেশ দেখতে বেরিয়ে পড়েছে, স্বতন্ত্র, স্বাধীন। আমরা তাকেই দেখতে লাগলাম।

আমেরিকা ভিয়েতনামের ওপর বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছে, কিন্তু এখনও বোধহয় এদেশে আসতে লজ্জা পায়। তাদের অকারণ ভিয়েতনামের লড়াইতে যোগ দেওয়া এবং নির্বিচার বোমা বর্ষণ ও প্রাণহানি, হয়তো এখনও সাধারণ আমেরিকানদের পীড়া দেয়। তাছাড়া দুবছর আগে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর, আমেরিকানদের বিশ্বভ্রমণ কিছুটা বুঝি কমে গিয়েছে, নইলে আগে তাদের দলই প্রধান থাকত। তিন-চারজন ইউরোপিয়ান ছিলেন, তাদের মধ্যে একজন হল্যান্ডের। দিব্যি ইংরিজি বলেন।

মানুষটিকে আমার ভালো লেগেছিল। মনে হল এই তো সত্যিকার ভ্রমণ-পিয়াসি। বয়স বলেছিলেন বাষট্টি বছর। বললেন, সুখে দিন কাটছিল। দুবছর আগে মনে হল, এ কী কাজ করছি, এতকাল? পৃথিবীর কিছুই জানলাম না, সুইডেনের এক কোণে বসে গতানুগতিক জীবনধারণ। মনে হল যেন বলছেন, 'নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র-শিখা স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালি, লাভক্ষতি টানাটানি, কলহ সংশয় অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ— সহে সহে না আর।' এ জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয় আর করবেন না বলে বেড়িয়ে পড়েছেন, দিগ্বিদিকে। ব্যবসার স্বত্ব কর্মচারীদের দিয়ে দিয়েছেন। ছেলেরা অন্য কাজ করে, তাদের ওঁর ব্যবসাতে আগ্রহ নেই। গতবছর মাচুপিচু গিয়েছিলেন, এবারে যাবার

ইচ্ছা হিমালয়ে। বললেন, সমুদ্রের ধারে, সমুদ্র নিয়ে বাস করি, এবারে তাই পর্বত দেখবার ইচ্ছা হয়েছে।

আমি বললাম, কিন্তু এখানে পাহাড় কোথায়, আমরা তো সমভূমিতে। উনি বললেন তাঁকে উচ্চ পাহাড়ি পথ পার হতে হয়েছে, কারণ তিনি ভিয়েতনামে গতানুগতিক প্লেনে চড়ে আসেননি। এসেছিলেন চিনের বন্দরে। সেখান থেকে ট্রেনে-বাসে ভিয়েতনাম সীমান্ত পার হয়েছেন। সেই সীমান্ত উচ্চভূমিতে, বেশি যানবাহন চলে না পথে, যাত্রা অনিশ্চিত, কিন্তু কী রোমাঞ্চ জানেন?

কথা বলছি, দুপাশে তাকাচ্ছি, এটা বড় রাস্তা। কিন্তু তার ওপর একটাও বড় ইমারত নেই। ছোট, বড়জোর দোতলা বা তেতলা বাড়ি। ছোট দোকানপাট।

এবারে আমাদের বাস যেখানে থামল, সেখান থেকে আমরা স্টিমারে উঠব। মেকং ডেলটা আমাদের সুন্দরবনের নদীলাঞ্ছিত অঞ্চলের মতো। গাছপালা প্রচুর। সর্বত্র সবুজ। আমরা বাস ছেড়ে দিয়ে একটা স্টিমারে উঠলাম। স্টিমারে উঠতেই আমাদের এক গেলাস করে লোঙ্গন জুস দেওয়া হল। মস্ত মেকং নদীতে এসে পড়লাম। দুপাশে ঘন জঙ্গল। আবার একটা ছোট নদীতে স্টিমার মোড় নিল। দুপাশের বনাচ্ছাদিত তীর ঘন হয়ে কাছে সরে এসেছে। আমরা একটা ছোট জেটিতে পৌঁছলাম। নেমে একটু পথ হেঁটেই— জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, সেখানে নানাবিধ ফলের গাছ— আমরা ছোট একটা অঙ্গনে পৌঁছলাম। চেয়ারটেবিল পাতা আছে। আমাদের বিশ্রামের জন্য।

গাইড বলল, এখানে আপনাদের সম্বর্ধনা হবে। অল্পবয়সী দুটি মেয়ে আমাদের সবাইকে একটি করে জবা-র ধরনের ফুল দিয়ে গেল। তারপর একদল বাজনদার এসে পৌঁছল। তারা সঙ্গত করবে একটি নারী ও পুরুষ নর্তকের সঙ্গে। ভিয়েতনামী গানও হল। ইতিমধ্যে আমাদের টেবিলে কাটা ফল দিয়ে গেছে, আনারস, লোঙ্গন, কামরাঙা, পেঁপে আর ড্রাগনফ্রুট। শীতল ডাবের জল সেবন হল।

জঙ্গলের মধ্যে আপ্যায়নে কার না আনন্দ হয়। কিন্তু ওঠবার সময় হল, আমরা যাত্রীরা আবার পুরনো পথে ফিরতে লাগলাম। গিয়ে দেখি জেটিতে সেই বড় স্টিমার নেই, ছোট একটা লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে। এখন বুঝি আমরা নদীর শাখাপ্রশাখায় যাব, সেখানে বড় স্টিমার যেতে পারবে না। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাত্রা, দেখতে দেখতে আর একটা জেটি এসে গেল, সেইখানে আমাদের নামতে হবে। এখানে আমাদের মধ্যাহ্নভোজন। ভোজন বিশিষ্ট কিছু ছিল না। ফ্রুট সালাদ, নুডল সুপ, মাংস সহযোগে নুডল, কিছু সবজির মশলাহীন তরকারি, কাস্টার্ড পুডিং। জল এবং উষ্ণ পানীয় বিক্রি হচ্ছে। আমরা একটা স্থানীয় ওয়াইন নিয়ে বসলাম।

ডাচ ভদ্রলোক আমাদের টেবিলে। বললেন, দেখেছেন অভ্যর্থনার ব্যবস্থা। আশ্চর্য, এত ছোট্ট দেশ, কিন্তু কত বৈচিত্র্যের আয়োজন করেছে।

এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম এবং বাগানের মধ্যে ইতস্তত ভ্রমণের পর আমরা আবার রওনা হলাম। ছোটবড় নানা জলপথ দিয়ে বৃক্ষলতার জটলার মধ্যে অপরাহ্নে যেখানে পৌঁছলাম, সেখানে কোকোনাট ক্যান্ডি তৈরি হয়। কোকোনাট অর্থাৎ নারকেল থেকে চকোলেটের মতো ক্যান্ডি তৈরি করা দেখলাম। কেনাও হল। আর একটা নারকেলজাত লিকিওর। সে নাকি বড়ই বিশিষ্ট।

আরও কোথাও নিয়ে গিয়েছিল, সব মনে নেই। তবে একবার দাঁড়টানা নৌকোয় উঠতে হয়েছিল, অতি সঙ্কীর্ণ জলপথে কিছু দূরত্ব যেতে হবে।

সব শেষে আবার মাঝারি লঞ্চে উঠলাম। সেই লঞ্চ আমরা যেখান থেকে উঠেছি সেখানে নিয়ে যাবে।

আমরা তখন পরিপূর্ণ হৃদয়ে, ঈষৎ মদিরাচ্ছন্ন, কখন মেকং নদীতে পড়ে আবার সেই পুরনো জেটিতে ফিরে এলাম। জেটিতে আরও কয়েকটা লঞ্চ দাঁড়িয়ে। আমাদের লঞ্চের লোকেরা বলল, আপনারা যদি একটু কষ্ট করেন তো এখনই নামিয়ে দিতে পারি, নইলে জেটি খালি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। লঞ্চ নিয়ে গিয়ে পাড়ে একটা নিচু দেওয়ালের কাছে লাগানো হল। একটু কষ্ট করে আমাদের ওই দেওয়ালের ওপর উঠতে হবে। আবার দুটি ছোট ধাপ আছে, নামলেই মাটিতে।

সাত-আট জন যাত্রী অক্লেশে নেমে গিয়েছিল। আমি একটু দ্বিধা করে এগিয়ে গেলাম। দুজন মাঝি আমাকে সাহায্য করবার জন্য পাশে দাঁড়াল। আমি বিনা সাহায্যেই পাঁচিলটার ওপর উঠে পড়লাম। দেখলাম যে দুধাপ নামতে আমাকে একটু এগিয়ে যেতে হবে। সরু পাঁচিল, তবু দুপা গেলেই ধাপগুলো পাব। আমি আর দ্বিধা না করে এক পা এগোলাম। তারপর কী হয়েছিল জানি না, আমি ঝুপ করে পাঁচিল থেকে মেকং নদীতে পড়ে গেলাম। এমন আচমকা ঘটনাটা হল, আর আচমকা না হলেও আমার কিছু করবার ছিল না, কেননা আমি সাঁতার জানি না। সবাই তীরে এবং লঞ্চের ওপর থেকে এই আশ্চর্য ঘটনা দেখছে, সবাই চমকে গেছে, আমার মতোই, মনে হল আমার স্ত্রীও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে লঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন।

নদীর ওইখানে দশ ফুট জল, পরে শুনেছিলাম। সাঁতারও জানি না, তাই বোধহয় আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। ততক্ষণে লঞ্চ থেকে দুজন এবং তীর থেকে একজন জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারাই আমাকে টেনে তুলল। ইতিমধ্যে কেন ডুবে যাইনি জানি না। তীরে নেমে দেখি দাঁড়াতে গেলে পায়ে লাগছে, চোট লেগেছে। মানুষ জলে পড়লে বড়জোর ডুবে যায়, পায়ে চোট লাগবে কেন? আমার স্ত্রী খুব বিরক্ত। তাঁর মাথায় তখন অন্য ভাবনা। আমি এই ভিজে জামাকাপড়ে কী করব? তিনি আমার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালেন। আমারও তো সেই ভাবনা, এই ভিজে কাপড়ে বাসে কোথায় বসব! না হয় বসলাম, কিন্তু বাসের এয়ারকন্ডিশনিং-এর মধ্যে ভিজে জামাকাপড়ে কাঁপতে কাঁপতে এখনও তিন ঘণ্টা ওই বাসে যেতে হবে।

আশপাশে লোকজন জমে গিয়েছে। কে আমাকে এককাপ চা এনে দিল। কিন্তু ভিজে কাপড়, তার কী হবে? যদি দুটো তোয়ালে কিনতে পাওয়া যায়, একটা পরে, আর একটা গায়ে দিয়ে যেতে পারি। কিন্তু দোকান কোথায়? কত দূরে? সব যাত্রীরা বাসে উঠে পড়েছিল। শুধু ডাচ ভদ্রলোক আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। স্থানীয় এক মহিলা আমাকে একটা তোয়ালে এনে দিলেন, জামা খুলে গা মুছে ফেললাম। প্যান্ট নিয়ে কী করব? আমাদের গাইড লজ্জিত এই দুর্ঘটনার জন্য। সে কাছে আসছিল না, এবার বলল, আপনার সঙ্গে কোনও চেঞ্জ নেই?

চেঞ্জ থাকবে কেন? দিনের যাত্রা, দিনের শেষে ফিরে আসব। পোশাকের বদল কেন?

গাইড বলল, আমাকে মাঝে মাঝে রাতে থেকে যেতে হয়, বাড়ি ফিরতে পারি না। আমার সঙ্গে এক সেট চেঞ্জ আছে, কিন্তু তা কি আপনার গায়ে হবে?

তবু চেষ্টা করে দেখা যাক। গাইডের বুশশার্ট ও হাফপ্যান্ট নিয়ে পাশের একটা শৌচাগারে গেলাম। শার্ট গায়ে চড়ানো গেল, বোতাম লাগানো গেল না। না যাক। কিন্তু প্যান্ট অনেক টানাটানি করেও কুঁচকির ওপর ওঠে না। ভিয়েতনামীরা আকারে ছোটখাটো, তাদের পোশাক এর থেকে বড় হবে কেন আমার সুবিধার জন্য? পরে অবশ্য গাইড আমাদের বলেছিল, তার মা ভারতীয়। বাবা ভিয়েতনামী। তাই বোধহয় সে আকারে সাধারণ ভিয়েতনামীদের চেয়ে বড়।

সেই বিচিত্র পোশাকে বেরিয়ে এলাম। আমার স্ত্রী লজ্জায় অধোবদন। আমি সমবেত জনমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে, বুশশার্ট দিয়ে যতখানি নিম্নাঙ্গ ঢাকা যায়, তাই করে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বাসে উঠলাম। বাসযাত্রীরা আনন্দে করতালি দিয়েছিলেন, নাকি আমার দুরবস্থায় তাঁরা হাসি সামলাতে পারেননি।

ডাচ ভদ্রলোক বললেন, মিঃ রায়, আপনি যে রকম পরিকল্পিতভাবে জলে পড়লেন এবং উঠে এলেন আমি তার তারিফ করছি। আপনার চশমাটি চোখ থেকে বিচ্যুত হয়নি, আপনার পার্স ঠিক আছে, আপনার হাতঘড়ি নির্বিকার হাতে বাঁধা আছে এবং চলছে। একে পরিকল্পিত ছাড়া কী বলব? সাবাস।

বাস আবার চলতে শুরু করল। আমার ডান পায়ের ব্যথা বেশ চাগিয়েছে। স্ত্রীকে বলতে সাহস পাচ্ছি না। এই পোশাকে হোটেলে নামব কী করে, কিন্তু নামতে তো হবেই। ভিজে জুতো মোজা খুলে ফেলেছি। জানি হো চি মিন সিটিতে ফিরে মাটিতে পা ফেলতে পারব না, এত ব্যথা।

মাঝে বাস একবার থামল। এটা জংশন জায়গা। এই ট্যুর কোম্পানির একটা বাস খারাপ হয়ে গিয়েছে, তাদের কয়েকজন আমাদের বাসে উঠবেন। বাস দাঁড়িয়ে আছে, যাত্রীরা অনেকে নীচে নেমেছে, আমি চুপচাপ বসে আছি। আমার স্ত্রীও তাই, তিনি শঙ্কিত অন্য কারণে। ডাচ ভদ্রলোক নেমে ঘোরাফেরা করছেন, মানুষজনের সঙ্গে কথা বলছেন। এবারে তিনি বাসে উঠে এলেন। বললেন, মিঃ রায়, আমি এখানেই নামলাম, হো চি মিনে তো কদিন ছিলাম, সেখানে ফিরে কী

হবে? এখান থেকে দালাত যাচ্ছে ওই বাসটা. ওতেই দালাত চলে যাব।

তিনি তড়িঘড়ি বাস থেকে নেমে গেলেন। কাঁধে একটা হ্যাভারস্যাক, হাতে একটা ছোট সুটকেশ। বললেন, মিঃ রায় আপনার কথা আমার মনে থাকবে। নীচে নেমে আবার হাত নাড়লেন, বিদায়। দালাতের বাস দাঁড়িয়ে ছিল, তিনি উঠে গেলেন। আমি লজ্জা, পায়ের ব্যথা ভুলে মনে মনে বললাম, আপনাকে আমার চিরদিন মনে থাকবে। এই তো সত্যিকার ভ্রমণ-পিয়াসি। পিছুটান নেই, সামান্য বোঝা হাতে, কাঁধে, যেখানে খুশি যখন খুশি চলে গেলেই হল। কখন বাস দালাত পৌঁছবে, কোথায় থাকবেন রাত্রে। একবারও ভাবলেন না। আশ্চর্য পথিক।

আমাদের বাস রাত নটা নাগাদ হোটেলের দরজায় থামল। আমার মাটিতে পা ফেলবার ক্ষমতা নেই। হোটেলের কর্মচারী দুজন প্রায় চ্যাংদোলা করে আমাকে লিফটে তুলে দিল। লিফটের সামনেই আমাদের ঘর।

সে রাতে সামান্য কিছু খাবার ঘরে আনিয়ে খেলাম। আমার অবস্থা দেখে আমার স্ত্রীর বিরক্তি চলে গিয়েছে, এখন দুর্ভাবনা তাঁকে ছেঁকে ধরেছে। আমি যদি হাঁটতে না পারি তাহলে কী হবে? আমাদের ভ্রমণের এখনও আঠারো দিন বাকি। বাকি রেখেই কলকাতায় ফিরে যেতে হবে?

সকালে উঠেই রিসেপশনে ফোন করলাম। আমার একজন ডাক্তার প্রয়োজন। কাউকে পাওয়া যাবে কি?

উত্তর এল, নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কখন চান? আমার কী শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছিল বলতে পারব না, আমি বললাম, কত টাকা লাগবে বলতে পার? আন্দাজ?

উত্তর এল, নিশ্চয়। ডাক্তার এলে একশ নব্বই আমেরিকান ডলার লাগবে। শুনে এবারে বুঝি হৃদরোগ হয়। ভিজিটিং যদি ন হাজার টাকার অধিক, তাহলে চিকিৎসায় কত লাগবে কে জানে?

মিনমিনে গলায় বললাম, সে কি? এত টাকা?

ওপার থেকে উত্তর এল আজ্ঞে হ্যাঁ, এই ডাক্তারের চার্জ, আমরা জানি। আমি বললাম, তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ না কী হয়েছে, হয়তো কিছুই হয়নি। চুন হলুদ লাগাতে পারলেই সেরে যাবে। যাই হোক আমি কি একবার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

সাহেব ডাক্তারকে ফোন করা হল। একসেন্ট শুনে মনে হল, আমেরিকান, বললেন, আমাদের ভিজিটিং চার্জই একশ নব্বই ডলার।

ফোন ছেড়ে দিলাম। আবার নীচে ফোন করলাম। তোমাদের ডাক্তার ডাকবার দরকার হলে তোমরা কী কর? এ তো সস্তাগণ্ডার দেশ, নিশ্চয় একশ নব্বই ডলার দিয়ে ফতুর হয়ে যাও না।

উত্তর পেলাম, আমবা ভিয়েতনামী ডাক্তার দেখাই।

আমাকে তাই ডেকে দাও। আমার সাহেব ডাক্তার কী হবে? আমি তো এশীয়।

আমার ভিয়েতনামী ডাক্তারই যথেষ্ট। তবে হ্যাঁ, এখুনি এলে কত খরচ পড়বে?

উত্তর পেলাম ত্রিশ ডলারের মতো লাগতে পারে।

বলা বাহুল্য রাজি হয়েছিলাম। পনেরো মিনিটের মধ্যে ভিয়েতনামী ডাক্তার এসে গেলেন। যুবক। সঙ্গে একজন নার্স এবং একজন সহকারী।

ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। যত বলি আমার কোনও রোগ নেই, সে জন্য আপনাকে ডাকিনি। পায়ের পাতায় ব্যথা। আপনি পাটা দেখুন।

ভাষার অসুবিধা হচ্ছে। ডাক্তার আমার কথা বুঝতে পারলেন কিনা কে বলবে?

ইতিমধ্যে সহকারী আমার ব্লাডপ্রেসার দেখছে, নার্স আমার টেম্পারেচর নিল।

এ তো আশ্চর্য যন্ত্রণা। আমি মরছি পায়ের ব্যথায়, আর ইনি সর্বস্ব পরীক্ষা করছেন।

আমার পা সকালের দিকে ঈষৎ ফোলে। ভারতীয় ডাক্তার বলেছেন, ওটা কোনও ভয়ের ব্যাপার নয়। নিজেই সেরে যাবে।

ভিয়েতনামের যুবক ডাক্তার আমরা দুই পা দেখেই বললেন, ইডিমা হয়েছে। কার্ডিয়োগ্রাফ করতে হবে। আপনার কিডনির পরীক্ষা দরকার। হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে।

আমার স্ত্রীও হতচকিত। যতই প্রতিবাদ করি, ডাক্তার বলেন, না না, এই আমাদের চিকিৎসার ধারা, এই আমাদের নিয়ম।

বললাম, দেখুন আমার হার্ট একদম ঠিক আছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। মনে পড়ল ইনশিওরেন্স করবার জন্য আসার আগেই কার্ডিয়োগ্রাফ করানো হয়েছিল, প্রস্রাবও পরীক্ষা হয়েছিল।

দুটো কাগজই ইনশিওরেন্স পলিসির সঙ্গে গাঁথা আছে। সুটকেশ খুলে ডাক্তারকে সেসব দেখাতে তিনি নিরস্ত হলেন। বললেন, কিন্তু আপনাকে একবার তো হাসপাতালে যেতে হবে, পা এক্সরে করাতে হবে।

এখানে আপত্তি করা অনুচিত। তবু বললাম, আমি তো হাঁটতে পারব না।

ডাক্তার বললেন, আপনি অ্যাম্বুলেন্সে করে যাবেন। চলুন নীচে নামি।

ধরাধরি করে আমাকে নীচে নামানো হল, দেখি দরজার সামনেই এক অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

আমি আশ্চর্য এবং ভীত হলাম। সব ব্যবস্থাই করে এসেছে। না জানি কত দক্ষিণা দিতে হবে।

লজ্জার মাথা খেয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা কত খরচ পড়বে?

ডাক্তার আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, এখন পর্যন্ত আমার ফি এবং অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আপনার খরচ হয়েছে তেরো ডলার। আপনাকে এখুনি বিল লিখে দিচ্ছি।

তেরো ডলার! কোথায় ত্রিশ ডলার আর একশ নব্বই ডলার। অ্যাম্বুলেন্সে নার্স এবং ডাক্তারের সহকারীকে নিয়ে শায়িত আমি হাসপাতাল চললাম, আমার স্ত্রী

ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে।

ভিড়ের রাস্তা। তখন যানবাহন আর মোটরসাইকেলের ঝাঁকে গাড়ি চলা কঠিন। অতি নিকটের সরকারি হাসপাতাল পৌঁছতেই আধঘণ্টা লাগল।

পরের ঘটনা, নিষ্কৃতির ঘটনা, সংক্ষেপে বলি। হাসপাতালের দোরগোড়ায় আমার জন্য হুইল চেয়ার অপেক্ষা করছিল। স্ট্রেচার থেকে এবার চেয়ারে এবং একটি কেবিনের বেডে।

যুবক ডাক্তার বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ভারি পরিচ্ছন্ন, কোনও গোলমাল নেই, শান্ত। আমার পরীক্ষা হল, দুবার এক্সরে। স্প্রেন হয়েছে। বেঁধে দিলে ঠিক হয়ে যাবে। কোনও চিন্তা নেই। গোড়ালির কাছে দুপাশে দুটি প্লাস্টিকের ঢাকনা পরিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হল। পায়ের পাতায় ব্যথা এবং সামান্য যন্ত্রণা হচ্ছে বলতে একটা ইনজেকশনও দেওয়া হয়েছিল। আশ্চর্য ইনজেকশন, কিংবা আশ্চর্য যন্ত্রণা, হাসপাতাল ছাড়বার আগেই যন্ত্রণা চলে গিয়েছিল। এখানে বোধহয় মোট পনের ডলার পড়েছিল। ওষুধও কিনতে হল পাঁচ-ছ ডলারের।

ট্যাক্সি করে হোটেলে ফিরে এলাম। হাঁটতে পারছি দেখে পরিচারকেরা অবাক। কিন্তু জুতা পরা যায় না। ওই প্লাস্টিকের ঢাকনা এবং ব্যান্ডেজ, জুতায় পা ঢুকবে না।

একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। যেতে পারব। চটি পরে হাঁটতে হবে বলে ধীর গতি হয়ে যাব। প্রোগ্রাম বদলাবার দরকার নেই। আজকের দিনটা রেস্ট। এখনও হ্যানয় বাকি।

আমার স্ত্রীর মুখে আবার হাসি ফুটেছে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে নদীর ওপর আলোকিত জাহাজের চলাচল দেখতে দেখতে বিশ্রাম করলাম। রাত্রেও হোটেলেই ভোজন হল। যেমন হয় সব হোটেলেই, গোত্রহীন ভোজ্যের আয়োজন। পরিচালকদের খাদ্যের জি সি এফ অর্থাৎ গ.সা.গু বার করতে হয়। যা কারওই মনোহরণ করতে অক্ষম। বরদাস্ত করা যায় এই পর্যন্ত।

পরদিন সকালে একটা সাইক্লো চড়ে দুজনে শহরের অভিজাত অঞ্চলের বাইরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই সাইক্লোর চালক সানন্দে আমাদের হো চি মিন সিটির অন্দরমহলে নিয়ে গিয়েছিল। তখনও বারোটা বাজেনি, কিন্তু সর্বত্রই মানুষ। দোকানের দাওয়ায় বসে অথবা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বসে, দুপুরের ভোজনে ব্যস্ত। অতি সাধারণ খাবার। খানিকটা ঝোলঝোল নুডল। সুপের চেয়ে একটু ঘন। নুডলের সঙ্গে কিছু সব্জি, কোথাও মাংসের খণ্ড এবং ভাত। পথে অবশ্য খাবার স্টলে আরও দু-দশ প্রকার খাবার বিক্রি হচ্ছে। তারা আমার অপরিচিত। ছোট কোনও জাতের মাছ ভাজা বেশ বিক্রি হচ্ছে।

আমাদের সাইক্লো ড্রাইভার ভালোই ইংরিজি বলতে পারে। আমরা যা চোখে দেখছি, সেও তাই বলল, শহরে মানুষের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে, যানবাহন বেড়েছে,

মোটরবাইকের কথা না বলাই ভালো। সব মিলিয়ে সর্বদা যেন রমরমা একটা হাট বসেছে।

সাইক্লো মানে তিন চাকার সাইকেল। আমাদের সাইকেলরিকশার ধরনে। তবে, চালক পিছনদিকে উচ্চাসনে বসে। যাত্রীরা সামনের দিকে। হো চি মিনে সর্বত্র সাইক্লো। ভাড়াও কম। আমাদের সারা সকাল ঘুরে বেড়াতে বোধহয় চার ডলার লেগেছিল।

বড় রাস্তায় পড়ে দেখি অন্য দৃশ্য। বিশাল বিপণি-সম্ভার। বহু সুশোভন উচ্চতল বাড়ি। সাইক্লোদের সব রাস্তায় চলা বারণ, তাই আমরা ছোট রাস্তা দিয়ে চলেছি। এখানে এবং বড় রাস্তাতে বটেই অফিসযাত্রী মেয়েরাও মোটরবাইকে চলেছে। তাদের হাতে দস্তানা, কব্জি পর্যন্ত জামায় ঢাকা। শরীরের সব অংশই বুঝি অসূর্যস্পর্শা। মুখও তেমনই করে ঢাকা। হঠাৎ আধো-অন্ধকারে দেখলে ভূত বলে চমকে ওঠবার সম্ভাবনা। শুধু চোখ দুটি দেখা যাচ্ছে। সাইক্লো ড্রাইভার বলল, কম বয়সের মেয়েরা নিজেদের রং সম্বন্ধে বড় সচেতন। কী করবে, ছেলেরা রং ময়লা পছন্দ করে না। তাই মেয়েরা সন্তর্পণে সূর্যালোক থেকে শরীর বাঁচিয়ে রাখে।

আমি ভিয়েতনামে ময়লা রঙের মেয়ে দেখিনি। সবার রং আমরা যাকে বলি গৌরবর্ণ সেই দিকের। আমার স্ত্রী অবশ্য বললেন, সুগৌর বলা যায় না, সামান্য হলদে অথবা ফ্যাকাশে ছোপ আছে।

সেদিনও সারাদিন বিশ্রামে কাটল। ব্যথা কম, যন্ত্রণা নেই, তবু হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে খোলা চটি পায়ে। পরে হানয়ে একটা স্ট্র্যাপ লাগানো চপ্পল কিনে হাঁটা অনেক সহজ হয়েছিল।

যাবার আগের দিনও আমরা শহরের নানা অঞ্চল দেখে বেড়ালাম। শহরের অভিজাত অঞ্চলে অনেক স্বাস্থ্যচর্চার কেন্দ্র। আমাদের সাইক্লোচালক বলল, ওরা সবাই নির্মল নয়, ওখানে না যাওয়াই ভালো।

সেদিন আমরা একটা বড় দোকানের সামনে নেমে একটা ভোজনস্থল আবিষ্কার করলাম। এখানে সব খাবার কাচের বাক্সের মধ্যে সাজানো আছে। ইচ্ছেমতো প্লেটে তুলে নিয়ে এক প্রান্তের ক্যাশিয়ারকে দাম দিতে হয়। আক্ষেপের কথা, এখানে কেউ ইংরিজি বুঝতে পারে না। যে পদগুলিকে উদার এবং অতিথিবৎসল মনে হল, তাদেরই খানিক খানিক তুলে নিয়ে দাম দিলাম। দুজনের পাঁচ ডলার লাগল। সুপ সহ। সুপ অবশ্য নুডলের। কিন্তু ভালো লেগেছিল। উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

কাল আমরা হানয় যাব। সন্ধ্যায় শাখা নদী পার হয়ে অপর তীরে হো চি মিন মিউজিয়াম দেখতে গিয়েছিলাম। দ্বিতল ছোট বাড়ি, তিনদিকে সুন্দর বাগান। সামান্য প্রবেশমূল্য লাগে। হো চি মিনের নানা সময়ের ছবি, তাঁর ব্যবহৃত কিছু জিনিস, পরিধানের সস্তার জামাকাপড়, কিছু চিঠিপত্র ইত্যাদি খুব যত্ন করে সাজানো। ইংরিজিতেও কোথাও কোথাও লেখা আছে বলে বুঝতে পারি।

বাড়ির বাইরে হো চি মিনের ব্রোঞ্জের মূর্তি। অনতিদূরে নদীর জেটি। সেখান থেকেই উনিশ বছর বয়সে ১৯১১ সালে হো চি মিন ফ্রান্স যাত্রা করেছিলেন, জাহাজের পর্যটকের সহকারী হয়ে। হো চি মিন দেশে ফেরেন কুড়ি বছর পরে। তখন তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।

সাইক্লোয় চড়ে একটা বৌদ্ধমন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। মুণ্ডিতমস্তক, গৈরিক-বসন কয়েকজন শ্রমণ মন্দিরের কাজ করছেন। বুদ্ধের পাথরের মূর্তি। দর্শক বা ভক্তের সংখ্যা সামান্য। সবাই নীরবে মন্দিরচত্বরে ঘুরছে।

হো চি মিন সিটি ছাড়বার আগে আমরা কুচির সুড়ঙ্গ দেখতে গিয়েছিলাম। হো চি মিন সিটি থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার। এই সুড়ঙ্গ না দেখলে ভিয়েতনামবাসীদের চরিত্র বোঝা যেত না। দক্ষিণ ভিয়েতনাম তখনও স্বতন্ত্র দেশ। উত্তর ভিয়েতনামে হো চি মিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা সংহত গেরিলাবাহিনী তৈরি করেছে। তাদের বিদেশি সাহায্যপুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েতনাম বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। গেরিলাবাহিনী তাই মাটির নীচে বাসস্থান ও লোকচক্ষুর অন্তরালে চলাচলের ব্যবস্থা করেছিল। ওপর থেকে কিছুমাত্র বোঝবার উপায় নেই যে সুড়ঙ্গে কয়েক হাজার লোক তাদের অস্ত্রাদি নিয়ে বাস করছে।

আমেরিকানরা বহুদিন পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব জানত না। পরে যদিও প্রভূত বোমা ফেলে সুড়ঙ্গ নেটওয়ার্কের অনেকটাই ধ্বংস করে দেয়।

এখনও কয়েক জায়গা দিয়ে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করা যায়। বাইরে থেকে প্রবেশপথ বোঝবার উপায় নেই। নীচের আয়োজন অষ্টম আশ্চর্যেরও বেশি। বাসস্থান ছাড়াও, রান্নাঘর, হাসপাতাল, কামারশালা, ছোট কারখানা, কী নেই সেখানে। সুড়ঙ্গ বহু স্থানেই দোতলা, কোথাও কোথাও তিনতলা। শাখাপ্রশাখা মিলিয়ে সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য আড়াইশো কিলোমিটার।

সুড়ঙ্গের মুখ এবং নীচে যাতায়াত পথ অত্যন্ত সরু। এখানে ঢুকতে পারে বোধহয় কেবল ক্ষুদ্রকায় ভিয়েতনামবাসীরা। আমেরিকানদের পুষ্ট, বিশাল শরীর এই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করতেই পারে না।

ওপরে হাল্কা জঙ্গল, নীচে সুড়ঙ্গ। জঙ্গলের মধ্যে নানা ফাঁদ পাতা রয়েছে। অজানা পথে আগন্তুক সহজেই এই ফাঁদে পড়ে যায়। জাঁতাকলে-পড়া আমেরিকান সৈন্যের কথা মনে করে আমাদের গাইড আর হেসে বাঁচে না।

কুচি সুড়ঙ্গে প্রবেশের আগে আমরা একটা মিউজিয়াম দেখলাম। সুড়ঙ্গ নেটওয়ার্কের ম্যাপ, ভিয়েত কং সৈন্যের এবং আমেরিকান শত্রুদের মৃত্যুর খতিয়ান বিশদভাবে দেখানো হয়েছে।

আমার স্ত্রী সুড়ঙ্গে নেমেছিলেন। বললেন, ভেতরে চলাচলের পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ। হাঁটবার সময় দুপাশের প্রায় চেপে ধরে। চার পাঁচশ গজ পরে বেরবার জন্য একটা পথ করা হয়েছে। যতক্ষণ না সুড়ঙ্গমুখে তাঁকে না দেখা গেল, আমার শান্তি ছিল না।

জীবনে নানা স্মৃতিমন্দির দেখেছি, তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছি। সৌন্দর্যবঞ্চিত কুচি সুড়ঙ্গ চিরকাল মনে থাকবে, মানুষের দুর্জয় মনোবল এবং কষ্ট সইবার ক্ষমতার স্মারক হিসেবে।

আমাদের হানয় যাবার উড়ান সকালবেলায়। দেড়-দুঘণ্টার উড়ান। হো চি মিন সিটি বিমানপত্তন দেখে অবাক হয়েছিলাম, এবার হানয় বিমানপত্তন দেখে চমৎকৃত হলাম। এয়ারপোর্ট বিশাল নয়। সর্বত্র মসৃণ উজ্জ্বল গ্রানাইট। হানয় শহর অনেকখানি দূরে। আমাদের নির্ধারিত হোটেল আবার শহরের একপ্রান্তে, পুরনো অঞ্চলে। হোটেলটিও পুরনো। এখন তার পড়ন্ত দশা। বাড়িটা বিশাল, ফরাসি কায়দায় তৈরি হয়েছিল। আমরা না চাইতেই একটা স্যুইট পেলাম তিনতলায়। স্যুইটেরও অধিক। একদিকে কাচে ঢাকা বারান্দা, আর একদিকের বারান্দা খোলা, রেলিং দেওয়া। আসবাব সবই পুরনো দিনের সাক্ষ্য বহন করছে। এমনিতে ভালো লেগেছিল, তবে শহরের কেন্দ্রস্থলের বাইরে বলে কোথাও যেতে হলে ট্যাক্সি অথবা সাইক্লো নিতে হয়।

এই অঞ্চলটা শ্যামবাজার, বাগবাজারের মতো। বাড়িঘর ঘেঁসাঘেঁসি। বারান্দায় বেরলে আশপাশের মধ্যবিত্ত বাড়ির সংসারযাত্রা দেখতে পাই। আমাদের সামনের ফুটপাতে সিগারেট লজেন্সের দোকান, তার পাশে সাইকেল মেরামত হচ্ছে, লন্ড্রির দরজা এখনও বন্ধ। সকাল হল ঠিক কলকাতার মতোই। ধীরে ধীরে জনজীবন শুরু হয়। দোকানি সামনের ফুটপাতের একাংশ ধুয়ে দোকান খোলে। নুডলের ফেরিওলা বসে গিয়েছে এক ধারে। পথচলতি মানুষেরা কেউ কেউ নুডলের ফেরিওলার আতিথ্য নিচ্ছে।

এই রাস্তায় ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। আমরা একটু হেঁটে গিয়ে বড় রাস্তায় ট্যাক্সি পাব। বাঁদিকের মাঝারি রাস্তার এককোণে সিগারেট দোকানের মেয়েটি আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে বলল, ট্যাক্সি? সে এর বেশি ইংরিজি বলতে পারে না। দোকান থেকে উঠে এসে অনেকক্ষণ খালি ট্যাক্সি ধরার বৃথা চেষ্টা করল। আমরা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বড় রাস্তার দিকে না গিয়ে সোজা চলতে থাকলাম। কিছু দূর গিয়েই সামনে একটা মাঝারি মাপের পুকুর। আমাদের হেদো বা গোলদিঘি যেমন, চারপাশে মধ্যবিত্ত মানুষদের বাড়ি। দিনগত কাজকর্ম চলেছে। কয়েকটা ছোট ছেলেমেয়ে পুকুরের ধারে খেলছে, রেলিংগুলো স্থানে স্থানে ভাঙা, মাঝে মাঝে দুয়েকটা রেলিং অনুপস্থিত। ফুটপাতও যেন আমাদের মতো, সিমেন্ট কবেই উঠে গিয়েছে, খানাখন্দে ভরা।

কলকাতার স্বাদ নেওয়ার জন্য তো হানয় আসিনি। আমরা দ্রুত আবার মোড়ে ফিরে গেলাম। পথে ছোটখাটো মনোহারি দোকান। দুয়েকটা কফিখানা।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। দোকানের ও রাস্তার আলো জ্বলেছে। দূরে একটা জলাশয় দেখা গেল, তার ওপর তীরের আলো খেলা করছে। এটা নিশ্চয় ওয়েস্ট লেক। হানয় শহর ছোট বড় জলাশয়ে পূর্ণ। সর্বত্র সবুজ। কেন্দ্রীয় এই অঞ্চলটার

মানুষজন কম, বিস্তীর্ণ ময়দান। আমি হোটেলে ফিরে গেলাম। ট্যাক্সি পেতে কিছুমাত্র অসুবিধা হল না।

ডিনারে যাবার আগে বুঝতে পারিনি, আমাদের হোটেলে পাকশালা নেই, খাবার বাইরে থেকে আনাতে হয়। মেনুকার্ডও নেই। বিস্বাদ চিকেন রোস্ট অকর্মণ্য সালাদ সহযোগে খাওয়া হল। বুঝতে পারলাম এখন থেকে বাইরে খেতে হবে। হানয় ছাড়বার আগে বুঝতে পেরেছিলাম সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল। আমাদের হোটেলে পাকশালা থাকলেও এত বৈচিত্র্যের স্বাদ পেতাম না। আমরা এখন মুক্ত বিহঙ্গ, দুপুর ও রাত্রে বিভিন্ন স্থানে ভোজন করে অপার সুখের স্বাদ পাই।

দ্বিতীয় দিন সকালে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে শহর দেখতে বেরলাম। প্রথম গন্তব্য হো তে বা পশ্চিম লেক। হানয়ের বৃহত্তম জলাশয়। এর ওপর মোটর লঞ্চ যাতায়াত করে। ছোট বড় মিলিয়ে হানয়ে অনেক লেক। হো তে-র দক্ষিণে হো চি মিনের স্মৃতিমন্দির। সারাদিন সেখানে দর্শনার্থীর ভিড় থাকে। এইখানে হো চি মিনের দেহ শায়িত আছে। দর্শকেরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে যায়। বাড়িটাও রাজকীয় এবং দর্শনীয় তার স্থাপত্য। স্মৃতিমন্দিরের পিছনে একদা হো চি মিনের বাসস্থান ছিল। বাড়ির গঠন গতানুগতিক ভিয়েতনামীয় ধারার। বাড়িটি খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে। নিকটেই রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ। বিশাল আধুনিক পাশ্চাত্য ধারায় তৈরি প্রাসাদ দেখতেও প্রচুর জনসমাগম হয়। সমস্ত অঞ্চলটা সযত্ন-রক্ষিত, আকারেও বিশাল, সুসংবদ্ধ গাছের সারি, অজস্র ফুলের সমারোহ। গাড়ির ভিড় সহনযোগ্য।

পাশেই ওয়ানপিলার প্যাগোডা দেখতে নিয়ে গেল গাইড। চার ফুট ব্যাসের একটি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই ঐতিহাসিক কাঠের প্যাগোডা। এক হাজার বছর আগের তৈরি এই প্যাগোডার অনেক ক্ষতি করেছিল ফরাসিরা, ভিয়েতনাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হওয়ার আগে।

নিকটেই ওল্ড কোয়ার্টার বা পুরনো অঞ্চল। এইখানে একদা ফরাসিরা বাস করত। সরু সরু পথ, ছোট বাড়িঘর দোতলা তেতলার বেশি নয়। এই অঞ্চলে ঢুকলেই পুরনো দিনের স্বাদ পাওয়া যায়। অসংখ্য ছোট দোকান, ভিয়েতনামে তৈরি এম্ব্রয়ডারি, কাঠের কাজ, জুতা জামা, প্রায় সব কিছুই পাওয়া যায়। এখনও কোনও কোনও রাস্তা স্বতন্ত্র, হয়তো সেখানে শুধুই জুতোর দোকান, অথবা অন্যত্র সার সার ছাতার দোকান। ভিয়েতনামের চাষিদের টোকাও এখানে বিক্রি হচ্ছিল। অনেক বাড়ির প্রবেশ উন্মুক্ত, অতিথিদের সাদর আহ্বান করা হয়, প্রবেশমূল্য অবশ্যই লাগে। একটা সরু পথের দুধারে শুধুই কফিখানা। ভোজনশালাও অনেক।

দ্বিপ্রহরে আমরা বিদেশি দূতাবাসগুলির কাছে একটি ভোজনশালার আতিথ্য নিয়েছিলাম। সেইখানেই প্রথম পাকশিল্পে ভিয়েতনামের চূড়ান্ত সংযোজন স্প্রিং রোলস গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলাম। এ স্প্রিং রোল যেন অন্য কোনও জগতের। প্রধান বিশেষত্ব হল স্প্রিং রোল ময়দার আবরণে ভাজা হয় না। এই স্প্রিং রোলের আবরণ তৈরি হয় রাইসপেপার দিয়ে। রাইসপেপার ঠিক কোথায় উদ্ভূত হয়েছিল

জানি না, চিন না ভিয়েতনাম। হানয়ের রাইসপেপারের আবৃত স্প্রিং রোল একটা দেবদুর্লভ পদার্থ। দাম এমন কিছুই বেশি ছিল না, যা মনে কাঁটা হয়ে ফুটে থাকবে। পরে, হালং বে-তে আবার রাইসপেপার তৈরির কুটির শিল্প দেখেছিলাম। এই সামান্য সৃষ্টির মধ্যে এত রসের খনি আছে প্রস্তুত-পদ্ধতি দেখে অনুমান করা যায় না।

আমাদের ভোজনের দিকটা উল্লেখযোগ্য ছিল না হো চি মিন সিটিতে। হানয় আমাদের কাছে আরও নতুন সুখের দরজা খুলে দিয়েছিল। এর পরের দিনই আমরা একটি সুদৃশ্য ভোজনশালায় গিয়েছিলাম। সেখানে আখের ফালিতে জড়ানো চিংড়ি মাছ পরিবেশিত হয়েছিল। কী উপায়ে আখের স্বাদগন্ধ চিংড়ি মাছে সঞ্চারিত করে এমন অপার্থিব স্বাদু পদের সৃষ্টি হল, আমাকে ভোজনশালার মালিক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার ওসব জানবার আগ্রহ নেই, ওই তথ্যগুলি অবান্তর আমার কাছে। তাই মনে নেই। কিন্তু পদটির স্বাদ এ জীবনে ভুলব না।

আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভার ইংরিজি বোঝে ও বলে। তাকে আমাদের নবলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা বললাম। সে বলল, আপনার যদি চিংড়ি মাছ ভালো লাগে, তাহলে আরেকটি সজ্জিত কিন্তু ছোট ভোজনশালায় আপনার যাওয়া উচিত। ঠিকানাটা লিখে নিয়েছিলাম।

তারপর কথাচ্ছলে যে খবর দিল ট্যাক্সি ড্রাইভার, তা শুনে আমার সর্বাঙ্গ চমকে উঠেছিল। বলল, চিংড়ির এখানে অনেক দাম। সস্তা হল পোর্ক, সবার চেয়ে কম দাম। তার ওপর বীফ এবং তারও ওপরে চিকেন। সত্যিকার দামি মাংস এখানে হল ইঁদুরের।

ভিয়েতনামে কুকুরও ভোজ্য শুনেছিলাম। পরদিন অনেক যাচাই করে সস্তার মাংস পোর্ক খেয়েছিলাম। ট্যাক্সি ড্রাইভারের দেওয়া ঠিকানা নিয়ে তার সুপারিশের ভোজনশালায় গিয়েছিলাম। সত্যিই তাদের চিংড়ি মাছের পদটি বিশিষ্ট। ডাব চিংড়ি। তবে ডাবের শাঁসে রান্না নয়, রান্না হয়েছে ডাবের জলে। ডাবের জলে নিমজ্জিত গুটিকয় চিংড়ি মাছ খুবই আনন্দ দিয়েছিল। পদটির নাম লিখে এনেছিলাম, যথারীতি হারিয়ে গিয়েছে। থাকলেও খুব লাভ হত না, এদের বানানে আর উচ্চারণে আকাশ-জমির দূরত্ব।

হানয়ে বেড়িয়ে বেড়ালেই বিশ্বভ্রমণের আনন্দ। আমরা তার কার্পণ্য করিনি। এক সন্ধ্যায় ভিয়েতনামের অতি বিখ্যাত জলপুতুলের খেলা দেখে চমৎকৃত হয়েছি। জলপুতুলের নিজস্ব বিশেষ মঞ্চ। মঞ্চের প্রায় সবটাই জলে ভর্তি। সেই জলের ওপর মসৃণগতিতে ভাসতে ভাসতে পুতুলেরা মঞ্চে প্রবেশ করল। অতি সুন্দর উপস্থাপনা, ভিয়েতনামের গীতবাদ্যও এখানে মর্যাদা পেয়েছিল। পরে জেনেছি পুতুল নাচানোর মানুষেরা হাঁটু পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে খেলা দেখায়। তাদের চোখ, কান, মাথা জলের ওপরে পুতুলে এবং তার জামাকাপড়ে ঢাকা থাকে। কে

...চায় জানতে পারা যায় না। বলা বাহুল্য খুবই ভালো লেগেছিল।

...ফেরার দুদিন আগে আমরা হালং বে বা উপসাগরে গিয়েছিলাম। মনে হয় ঘণ্টা ...দুয়েকের যাত্রা। জেটি থেকে বড় লঞ্চে চেপে বিশাল নদীবক্ষে পৌঁছলাম। একটু এগিয়ে মনে হল ভৌতিক কোনও জগতে এসে পৌঁছেছি। এই উপসাগরে তিন হাজার দ্বীপ আছে। অল্প কটিতেই মানুষের বাস। ছোট বড় প্রস্তরময় দ্বীপগুলি আকৃতিতে অন্য জগতের। আমাদের পরিচিত কোনও আকার নয়। কয়েকটি দ্বীপে নামা যায়। কোথাও প্রকাণ্ড গুহা। যদিও কয়েক জায়গায় পর্যটকদের জন্য আলো আছে তবু গা ছমছম করে।

অন্ধকার হবার পর আবার পরিচিত আলোকিত জগতে ফিরে এলাম।

ভ্রমণ' অক্টোবর, ২০০৪

অকল্পনীয় আন্টার্কটিকা

প্রতাপকুমার রায়

চার বছর আগে উত্তরমেরু প্রদেশে গিয়ে বরফ দেখা হয়নি। যে শহরে গিয়েছিলাম তার নাম রোভানিয়েমি। ফিনল্যান্ডের উত্তরতম শহর, মেরু বৃত্ত পার হয়ে আরও উত্তরে। তখন গ্রীষ্মকাল। ২৬ জুলাই মধ্যরাতের সূর্য দেখবার জন্য সেখানে গিয়েছিলাম। সারা দিন চব্বিশ ঘণ্টাই আলো তখন। সূর্য দেখা যায় না, অনচ্ছ কাচের মধ্যে দিয়ে আসা গোধূলি আলো। আমরা মধ্যরাত্রির সূর্য দেখতে পেলাম না। উত্তর আকাশে তাকিয়ে ছিলাম। সূর্য উঠে অল্পকাল পরে বাঁদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে ঈষৎ গিয়েই অস্ত যাবে। আমরা বৃথাই তাকিয়ে থাকলাম। সূর্য কখন উঠল, কখন অস্ত গেল জানতে পারলাম না। মেঘ-চোয়ানো আলোর কোনও তারতম্য হল না।

তখন থেকেই ভেবেছি, এর পরের যাত্রা হবে দক্ষিণমেরুর দিকে, যেখানে শুধু বরফ, সারা দিন-রাত, সারা বছর। রোভানিয়েমিতে শীতও ছিল না।

দক্ষিণমেরু অঞ্চলে যাত্রার আয়োজন সহজ নয়। এক পর্যটক সংগঠনের খবর পেয়েছিলাম, কোয়ার্ক এক্সপিডিশনস। আমেরিকান সংগঠন। পূর্বে কখনও তাঁদের নাম শুনিনি। তাঁদের জাহাজে বারো দিনের সমুদ্রযাত্রার আয়োজন। নির্ধারিত পুরো টাকাটা যাত্রার কয়েক মাস আগে তাঁদের দিয়ে দিতে হবে। তারপর, যদি কোনও কারণে যেতে না পারি, পুরো টাকাটাই বাজেয়াপ্ত হবে। কিছুমাত্র ফেরত পাওয়া যাবে না।

তবু, সাহসে বুক বেঁধে আমাদের মাশুল জমা করে দিয়েছিলাম আগস্ট মাসের মাঝামাঝি। ১০ নভেম্বর যাত্রা। অর্থাৎ, প্রায় তিন মাস জাহাজে না ওঠা পর্যন্ত সুস্থ থাকতে হবে। কোনও পারিবারিক বিপর্যয় ততদিন রুখে রাখতে হবে।

দীর্ঘ যাত্রা। কলকাতা থেকে বম্বে, সেখান থেকে মিলান হয়ে আর্জেন্টিনার বুয়েনোস আইরেস। বুয়েনোস আইরেস থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টার উড়ান উশুয়াইয়া। আর্জেন্টিনার দক্ষিণের শহর। পৃথিবীর দক্ষিণতম জনপদ। সেইখান থেকে আমরা জাহাজে উঠব ১০ নভেম্বর। দীর্ঘ পথে যাত্রার কোনও বিঘ্ন হওয়া অসম্ভব নয়। ১০ নভেম্বর বিকালে উশুয়াইয়া থেকে জাহাজ ছাড়বে। তার আগে উশুয়াইয়া পৌঁছতে হবে। আমরা নির্ঘণ্ট নিশ্চিত পালনের জন্য কলকাতা থেকে ৫

নভেম্বর রওনা হয়েছিলাম। দুদিন আগেই উশুয়াইয়া পৌঁছব। তা হোক, তাতে খরচ বাড়ে সন্দেহ নেই, তবে নিশ্চিত হওয়া যায় যে জাহাজে উঠতে পারবই।

কলকাতা থেকে তিন বাঙালি দম্পতি এই সমুদ্রযাত্রায় চলেছি। সবাই পরস্পরের পরিচিত। এক দম্পতিকে পাঠকরাও চিনবেন। তাঁরা 'ভ্রমণ' পত্রিকার অমরেন্দ্র ও সর্বাণী চক্রবর্তী বাকি দুজন, অনিন্দ্য মিত্র ও নন্দিনী। অনিন্দ্যকেও সবাই চিনবেন, বড় ব্যারিস্টার। তবে সবাই একপথে বুয়েনোস আইরেসে যাইনি। আমরা দুজন গিয়েছিলাম ইতালির মিলান হয়ে, অমরেন্দ্ররা দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ হয়ে, আর অনিন্দ্যরা আমেরিকা হয়ে। বুয়েনোস আইরেসে একদিন বিশ্রামের পর উশুয়াইয়া যাত্রার দিন বিমানপত্তনে তাদের সঙ্গে দেখা হল। ছজন মিলে বাঙালি অভিযাত্রী-বাহিনী। পর্যটক সংগঠন কোয়ার্ক ওই যাত্রাকে সমুদ্রবিহার বলেন না। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন দক্ষিণমেরু প্রদেশ অভিযান। তাঁদের পাঠানো নানা কাগজপত্র পড়ে জেনেছি, এ অভিযান সামান্য নয়। আমাদের নির্দিষ্ট কোনও গন্তব্য নেই। বারোদিনের সমুদ্রযাত্রায় আমরা শুধু কোনদিকে যাব তাই নির্দিষ্ট। আবহাওয়ার দাক্ষিণ্যে ঠিক কোথা থেকে ফেরত যাত্রা হবে, আগে থেকে বলা যায় না। এঁদের কাগজপত্র ভালো করে পড়লে যাত্রায় উৎসাহ না হয়ে দ্বিধা এবং ভয় হবার সম্ভাবনাই বেশি। যে অঞ্চলে যাব আমরা সেটা বরফের রাজ্য, আবহাওয়াই সেখানকার সম্রাট। নিষ্ঠুর জনমানবহীন পরিবেশ, পৃথিবীর শীতলতম, ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত, শুষ্ক মহাদেশ। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই সেখানে। সর্বত্র তুষার।

আমরা পর্যটন সংস্থার সাবধানবাণীতে নিরস্ত হইনি। তাঁদের কথাগুলি পড়ে মনে মনে ভয় পেয়েছি। বেরিয়ে পড়েছি তো। এখন দেখা যাবে কোথায় কত দূর যাওয়া হয়। আমরা ছজন যখন উশুয়াইয়া বিমানপত্তনে নামলাম তখন অপরাহ্নের রৌদ্রে শহরটা ঝলমল করছে। আন্দিজ পর্বতমালার শিখরগুচ্ছ পার হয়ে সমুদ্রের ধারে এই শহরে নেমেছি। বিমানপত্তনের বাড়ির বাইরে এসেই প্রায় ধাক্কা খেতে হল। ঝড়ের আকারে বাতাস দিচ্ছে এবং ওই রোদের মধ্যেও হিমশীতল হাওয়া আমাদের তীরবিদ্ধ করতে লাগল। বুয়েনোস আইরেসের ২৭ ডিগ্রি তাপমাত্রা থেকে পাঁচ ডিগ্রি তাপমাত্রার উশুয়াইয়া। হাড় কেঁপে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে উঠে শীতের যন্ত্রণা লাঘব করলাম।

আমাদের হোটেলটি মধ্যমবর্গের। কোনও সাহায্যের আয়োজন নেই। নিজের মোটঘাট নিজেকে বইতে হয়। দোতলায় তুলতে হাঁফিয়ে গিয়েছিলাম। জানলা থেকে বাইরের নিসর্গ দেখে হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। ছোট শহর উশুয়াইয়া। ঢেউ খেলানো। রাস্তা উঁচুনিচু, তিনদিকে বরফের টুপি মাথায় গর্বিত পর্বতশিখর। একদিকে সমুদ্র। ওইখান থেকে আমাদের জাহাজ ছাড়বে পরশু। আমরা বেশি সাবধান হয়ে দুরাত্রি আগে উশুয়াইয়া পৌঁছেছি। অর্থাৎ, আগামীকাল পৌঁছলেও চলত।

যাঁদের বেশি সময় নেই, তাঁদের দক্ষিণমেরু অঞ্চলে যাওয়া সম্ভব নয়। কখনও

আর্জেন্টিনার বুয়েনোস আইরেস শহরে এলে, অবশ্যই তিন-চারদিনের জন্য উশুয়াইয়া যাওয়া উচিত। এই ছোট ভ্রমণটিও পরিপূর্ণ আনন্দের হবে।

উশুয়াইয়া থেকে বিগল চ্যানেল ধরে দুঘণ্টা চারঘণ্টায় চমকপ্রদ জায়গায় পৌঁছনো যায়। মনে হবে দক্ষিণমেরু যাত্রার উপক্রমণিকা। দেখা যাবে মেরু অঞ্চলের খণ্ডচিত্র। ছ ঘণ্টার জলপথে ঘুরে আসা যায় পেঙ্গুইনদের বাসস্থান। পথে দুপাশের পাহাড়ে বরফ থাকবেই, আর দেখা যাবে ছোটবড় হিমবাহ।

উশুয়াইয়া শহরের আশপাশেও অনেক দ্রষ্টব্য আছে। আমাদের দেড়দিন হাতে ছিল। প্রথম দিন একটা ছোট ট্যুর নিয়ে শহর এবং তার উপকণ্ঠে ঘুরেছি। প্রায় চার হাজার ফুট পাহাড়ি রাস্তা উঠে আন্দিজ পর্বতমালা পার হয়ে ভারি সুদৃশ্য একটি লেক আছে। লেকের ধারে অতি মনোরম ভোজনশালা। সেখানে উত্তম আহারাদির আয়োজন। তার আগে নদীর ধারে একটি বড় বীভার কলোনি। মস্ত মস্ত গাছ কেটে ফেলেছে বীভারেরা। গাইড বোঝাল কেমনভাবে বীভাররা গাছ কেটে নদীতে বাঁধ দিয়ে তার গতিপথ বদলে দেয়। এই ক্ষুদ্র উভচর প্রাণী তাঁদের সমষ্টির শক্তিতে কেমন অসাধ্যসাধন করে।

দ্বিতীয় রাতে আমরা দুজন আর অনিন্দ্য-নন্দিনী ট্যাঙ্গো নাচের আসরে গিয়েছিলাম। এই প্রাণোচ্ছল নৃত্য আর্জেন্টিনার নিজস্ব। পুরুষ ও রমণী জোড়ায় জোড়ায় নাচের আসরে নামে। মনে হবে যেন পদাঘাতে সঙ্গীকে ধরাশায়ী করবার জন্য সঙ্গিনী বদ্ধপরিকর। সঙ্গীও কম যান না, তিনিও পদচালনায় সমান পটু। ট্যাঙ্গো নাচের তালমাত্রা আরও জীবন্ত হয় তার সঙ্গে বাজনার আয়োজনে। আমার চোখে বড় অভিনব ঠেকেছিল। এ যেন ওয়াটজ নাচের বিপরীত। তার মাধুর্য নেই, যেন বাঁশির বদলে কাড়ানাকাড়া। কিন্তু মাতিয়ে রাখে।

পরদিন সকালে জাহাজে ওঠবার সময় পর্যন্ত আমাদের কিছু করবার ছিল না। তাই আমরা দুজন গাড়ি ভাড়া করে জাতীয় সংরক্ষিত অরণ্য দেখতে গেলাম। ছোট বড় জলাধার, বিশাল গাছ, ঘন জঙ্গল, পাহাড়ি রাস্তা। চলে গিয়েছিলাম পেরু এবং আর্জেন্টিনার সীমান্ত পর্যন্ত।

আমাদের দক্ষিণমেরু অভিযানের উপযুক্ত পোশাক-আশাকের বিস্তৃত বিবরণ আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 'দু জোড়া মোজা— এক জোড়া সিল্ক বা সুতির, অন্য জোড়া পশমের; হাতেও তেমনই দুজোড়া দস্তানা। ওপরের দস্তানা চামড়ার হওয়া বাঞ্ছনীয়। দু প্রস্থ অন্তর্বাসের ওপর শার্ট, সোয়েটার, প্যান্ট এবং তার ওপর রেনপ্যান্ট। নৌকো থেকে নামবার সময় পায়ে এক-দেড় ফুট জল লাগবে, কারণ সেখানে কোথাও জেটি নেই। খানিকটা জলের ওপর দিয়ে ডাঙায় উঠতে হবে। সর্বোপরি ওয়েলিংটন বুট। এবং ঊর্ধ্বাঙ্গে পার্কা বা উইন্ডচিটার। স্থলভূমিতে বৃষ্টি এবং তুষারপাত হতে পারে তার জন্য বর্ষাতির কাজ করে এমন উইন্ডচিটার থাকা দরকার। এই সব সরঞ্জাম দিয়ে সাজ করতে অনেক সময় লাগত। নামবার আগে আরও একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল, কানঢাকা টুপি। অতঃপর আমাদের

সত্যিই মেরু প্রদেশের অভিযাত্রী মনে হত। মুখের যেটুকু অংশ দেখা যেত, তাতে মানুষ চেনা কঠিন। ছবিতে দেখা বিখ্যাত মেরু অভিযাত্রী শ্যাকলটন বা আমুন্ডসেনের চেয়ে আমরা কম নই তখন। সব শেষে লাইফবেল্ট বাঁধতে হবে। লাইফবেল্ট ছাড়া নৌকোয় নামা যাবে না।

কিন্তু এসব অনেক পরের কথা। ১০ নভেম্বর বেলা চারটের সময় বাস আমাদের নিয়ে গেল জেটিতে। সেখানে নোঙর ফেলেছে আমাদের জাহাজ এম ভি লিওবভ অরলোভা। জাহাজের গায়ে লাগানো সিঁড়ি দিয়ে পাঁচ নম্বর ডেকে পৌঁছলাম। সেখানে রিসেপশন বা অভ্যর্থনা কেন্দ্র। আমাদের সবাইকে কোনও অজ্ঞাত কারণে পাসপোর্ট জমা রাখতে হল। আমাদের কামরা ছ তলায়। কামরাটি ছোট কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ, সংলগ্ন বাথরুম। ঘরে বড় জানলা— ক্ষুদ্র পোর্টহোল নয়— এখন রৌদ্রোজ্জ্বল উশুয়াইয়া দেখা যাচ্ছে— এরপর সমস্তক্ষণ সমুদ্র দেখতে দেখতে যাব। ছোট একটি টেবিলের ওপর যাত্রা-সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র রাখা। বেশিক্ষণ দেখবার সময় নেই। বলা হয়েছে আধঘণ্টা পরে নীচের বড় লাউঞ্জে লাইফবেল্ট ড্রিল হবে।

লাইফবেল্ট ঘরে রাখা ছিল। তাই নিয়ে পাঁচ নম্বর ডেকে নামলাম। যাত্রীরা সবাই লাইফবেল্ট পরে দলনেতা কিংবা তাঁর সহকারীদের দেখালেন। রীতিমতো হাজিরা নেওয়া হল। এই পরীক্ষায় পাশ করা আবশ্যিক। কিছুক্ষণ পরে ব্রিফিং সেশন আরম্ভ হবে।

ব্রিফিং সেশন শুরু করলেন দলনেতা লরি ডেকস্টার। লরির পেশা অ্যাডভেঞ্চার। দক্ষিণ ও উত্তরমেরুতেই তাঁর অভিজ্ঞতা। নানা ধরনের দলকে অ্যাডভেঞ্চারে নিয়ে যান। এই অঞ্চলে আগেও যাত্রী নিয়ে গিয়েছেন। এবছর সাড়ে তিনমাসে বারোবার অভিযানে যাবেন।

লরি বললেন, আমাদের একটা নির্ধারিত গন্তব্য আছে, একটা ছককাটা ভ্রমণসূচিও আছে। কিন্তু এই নির্বান্ধব দেশে অনিশ্চিতের পাল্লাই ভারি। আমাদের যাত্রাপথ বিপদসঙ্কুল। কিন্তু আমরা সব অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্য তৈরি। ভয়ের কিছু নেই, আবার আছেও। এই যাত্রায় আপনারা যা পাবেন সেটা হল অভাবিতের সঙ্গে পরিচয়। যে দৃশ্য দেখবেন, মনে হবে আগে কখনও দেখেননি। রোজ দেখবেন, আশ মিটবে না। এই যাত্রার কথা আজীবন মনে থাকবে। আমি যতবার এসেছি, প্রতিবারই মনে হয় নতুন কিছু দেখছি।

পৃথিবীর নানা দেশের একশো দশজন যাত্রী চলেছে এই জাহাজে। কয়েকজনের সঙ্গে নাম বিনিময় হল, সামান্য পরিচয়ও পেলাম। নানা বয়সের নানা পেশার স্ত্রী-পুরুষ। একটি ইতালিয়ান বালিকাও আছে, দশ-বারো বছর বয়স, মা-বাবার সঙ্গে এসেছে। আরও দুজন ভারতীয় ছিল, বম্বের বাসিন্দা, গুজরাটি। তারা সদ্য-বিবাহিত, হানিমুনে এসেছে।

অল্প পরেই খাবার ঘরে আসতে হল। জাহাজে সব কাজই ঘড়ির কাঁটায় চলে।

আটটায় ডিনার। বড় ভোজনকক্ষ। সবার একসঙ্গে ভোজন হবে। তার আগে ক্যাপ্টেন স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি রাশিয়ান। বস্তুত এই জাহাজের সব নাবিকই রাশিয়ান। সামান্য ইংরিজি বলতে পারেন। সব ঘরে লাউডস্পিকার আছে। মাঝে মাঝেই রাশিয়ান ভাষায় নির্দেশ শোনা যাচ্ছে নাবিকদের উদ্দেশে। ডিনারের ঘোষণা বা অন্যান্য তথ্য ও নির্দেশ যাত্রীদের জন্য ইংরিজিতে বলা হচ্ছে।

অতি প্রশস্ত ভোজনকক্ষ। একেকটা টেবিলে চারজন, ছজন বা আটজনের জন্য। বুফে টেবিলে নানাপ্রকার সালাদ সাজানো আছে। সেখান থেকে ইচ্ছা-অনুসার সালাদ নিজে নিয়ে আসতে হয়। আমেরিকান রীতিতে সর্বপ্রথম সালাদ ভোজন। তারপর সুপ আসবে। পরিচারকেরা ব্যস্ত দৌড়াদৌড়ি করছেন। ছাপানো খাদ্যতালিকা রয়েছে প্রতি টেবিলে। মাছ, মাংস বা নিরামিষ— যেমন আমরা চাই নির্বাচন করতে পারি। প্রতিদিনের আলাদা ভোজ্যতালিকা। শেষে মিষ্টান্ন। অস্ট্রিয়ান কারিগর মিষ্টান্ন প্রস্তুত করেন, প্রতিদিন, প্রত্যেক ভোজনে ভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন। সবই পরম যত্নে রান্না করা। সুস্বাদু। সবশেষে কফি। সব থেকে সুখের, সর্বদা পরিস্রুত পানীয় জল পাওয়া যায়। কিনতে হয় না। পঞ্চাশ একশো টাকা দিয়ে পানের জল কিনতে আমাদের, অন্তত আমার, বিতৃষ্ণা হয়। অথচ, বিদেশে এটাই এখন চল হয়েছে। পানীয় জল কিনতে হবে।

কখন শান্ত বিগল চ্যানেল পার হয়ে ভয়ঙ্কর ড্রেক প্যাসেজে পড়েছি জানতে পারিনি। হঠাৎ উঠতে গিয়ে মাথা টলে গেল। শঙ্কিত হয়েছিলাম, ব্লাড প্রেসারের কমবেশি হয়েছে বুঝি। আমার স্ত্রী আশ্বস্ত করলেন, ব্লাড প্রেসার নয়, জাহাজ দুলছে। হাঁটতে হয় সন্তর্পণে, হঠাৎ পড়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়।

দ্বিতীয় দিনে সমস্তক্ষণই জাহাজ দুলতে থাকল। শান্ত সমুদ্র হঠাৎ তরঙ্গ-সঙ্কুল হয়ে উঠেছে। বিকালের দিকে সমুদ্রে ছোট ছোট বরফের টুকরো দেখে আমরা যাত্রীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। বরফের রাজ্যে প্রবেশ করছি। নাবিকেরা আমাদের উত্তেজনাকে আদৌ প্রশ্রয় দিলেন না। ও কিছু নয়, প্যাক আইস। অর্থাৎ এবছর শীতে যেখানে সমুদ্রে বরফ জমেছিল, গ্রীষ্মের আগমনে সেই হাল্কা বরফই ভেঙে ভেঙে আসছে। আমাদের উত্তেজনা কিছুমাত্র কমে না, সবাই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। কয়েকজন ডেকে গিয়েছিলেন। বললেন, খুব ঠান্ডা এবং খুব হাওয়া দিচ্ছে। তার ওপর জাহাজের দুলুনি। বাইরে দাঁড়ানো যাচ্ছে না।

মনে মনে বলেছিলাম, জানলা দিয়েই তো সব দেখা যাচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে নতুন কী বা দেখা যাবে, শরীরকে কষ্ট দিয়ে। তৃতীয় দিনেও আমরা ড্রেক প্যাসেজে। শুনতে পাচ্ছি কয়েকজনের সী সিকনেস হয়েছে। আমরা কজন সুস্থ আছি, এখনও। গল্প করে, সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে, লাইব্রেরিতে মেরু অঞ্চল সংক্রান্ত বই ঘেঁটে, অনেক অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলে সময়টা দিব্যি কেটে গেল। ক্রমে দেখলাম ভাসমান বরফের খণ্ডগুলি আকারে বড় হয়েছে এবং তারপর এল আইসবার্গ বা হিমশৈল। অগণিত। আনন্দ ধরে না। গুণীজনেরা

বললেন, এ তো সামান্য, এরপর যখন অট্টালিকা বা পর্বতসমান আইসবার্গ আসবে তখন তাহলে কী করবেন? সন্ধ্যার দিকে অনুভব করলাম জাহাজের দুলুনি কমে এসেছে। সকাল ও সন্ধ্যার বক্তৃতার আসরে সবাই জমায়েত হয়। আজ সামুদ্রিক পাখি সম্বন্ধে বললেন ডেলফিন অরেস। নানা ধরনের ছোট বড় পাখি দেখা যায় দক্ষিণ সমুদ্রে। অ্যালবাট্রস নামটার সঙ্গে আমরা পরিচিত, কোলব্রিজের এনসান্ট মেরিনারের দৌলতে। এখন তাদের সনাক্ত করতে শিখলাম।

এতক্ষণ অসীম সমুদ্রে দিগ্বিদিকহীন ভাসছিলাম। এখন দূরে তুষারময় স্থলভূমি দেখা যাচ্ছে। এগুলির নাম শেতল্যান্ড আইল্যান্ডস। শেতল্যান্ড দ্বীপমালা।

১৩ নভেম্বর অর্থাৎ যাত্রার চতুর্থ দিনে আমরা সমুদ্রের যে অংশে এসেছি, তাকে বলা হয় কনভার্জেন্স। অর্থাৎ সঙ্গম। এই অঞ্চলে আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগর এসে মিশেছে। সমুদ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত, হাওয়াও উদ্দাম নয়। আগের রাতেই ঘোষণা হয়েছে আজ প্রাতরাশের পর নটার সময় আমরা স্থলভূমি স্পর্শ করব। সবাই পাঁচ নম্বর ডেকে বেরবেন ডানদিকের দরজা দিয়ে। সেখানে জোডিয়াক অপেক্ষা করবে। সাবধানে নামবেন, ডেক পিচ্ছিল হতে পারে। জাহাজের গা বেয়ে অস্থায়ী সিঁড়ি দিয়ে সন্তর্পণে নামবেন, নীচে জোডিয়াক অপেক্ষা করবে। প্রত্যেক জোডিয়াকে আট বা দশজন যাত্রী নেওয়া হবে। যেখানে গিয়ে নামবেন আপনারা সেখানেও আপনাদের সাহায্য করবার জন্য আমরা কয়েকজন দাঁড়িয়ে থাকব। শেতল্যান্ড দ্বীপমালার এই দ্বীপটির নাম হাফ মুন আইল্যান্ড।

পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। আজও তাই হল। সব ধড়াচূড়া পরে, তার ওজনে নত হয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ালাম। ডেকে বেরতেই অতি শীতল ও তীব্র ঠান্ডা হাওয়া ধাক্কা দিয়েছিল। এখন হাল্কা বরফ পড়ছে। আশ্চর্য, বরফ এত হাল্কা হয়, যেন পেঁজা তুলোর মতো হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। আমাদের পরস্পরের পোশাক দেখছি, সবাই যেন ছদ্মবেশী স্কট কিংবা শ্যাকলটন। মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বলা চলে।

আমার সামনে খাড়া সিঁড়ি অনেক নীচে রবারের নৌকো জোডিয়াক পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। সিঁড়ির হাতে ধরবার রেলটা দড়ির, তাই ধরে নামতে হবে। ভাবিনি আমি নামতে পারব, জাহাজ থেকে জোডিয়াকে উঠতে পারব। এবার সেই আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। আমি অনায়াসে জোডিয়াকে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। সিঁড়ির শেষে পাটাতনের ওপর এবং জাহাজের গায়ে লাগানো জোডিয়াকের দুজন সাহায্যকারীর জন্যই এটা সম্ভব হল। কোথায় ভেবেছিলাম, নাই বা হল জোডিয়াকে নামা, এই জাহাজের ডেকে বসেই আমি সব দেখব, সেই আমি এখন জোডিয়াকে বসে। পরে বুঝেছিলাম, মাটিতে না নামলে কিছুই দেখা হয় না। আমরা এতক্ষণ যা দেখছিলাম, মনে হয়েছিল অলৌকিকের পর্যায়ের, এখন মনে হল সুখের সপ্তম স্বর্গে পৌঁছেছি।

জাহাজকে মাঝসমুদ্রে, যেখানে জল গভীর; নোঙর করতে হয়। সেখান থেকে গন্তব্য স্থলভূমির দূরত্ব এক মাইল বা বেশিও হতে পারে। সেই জন্য জোডিয়াক। জোডিয়াক যেখানে আমাদের নামাল, পাথর ছড়ানো তীরভূমি। নামতে হল ফুটখানেক জলের ওপর। একটু এগিয়ে মাটির স্পর্শ পেলাম। ইতিমধ্যে তুষারপাত বন্ধ হয়েছে। সামনে পাহাড়ের ধরনের স্থলভূমি সম্পূর্ণ তুষারাচ্ছন্ন। নুড়ি ছড়ানো সৈকত পার হয়ে বরফের ওপরে দাঁড়ালাম। নরম তুষার, পা বসে যাচ্ছে। সামনে একটু জায়গায় দূর থেকে কালো রেখা দেখেছিলাম, সেটা আসলে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েক হাজার চিনস্ট্র্যাপ পেঙ্গুইন। দূরে আমাদের জাহাজ দেখা যাচ্ছে। আকাশ ক্রমশ নীল হয়ে আসছে। সমুদ্রের রং কালচে নীল। আমি বেশি ওপরে না উঠে একটা পাথরের ওপর বসলাম। পেঙ্গুইনরা বেশ চেঁচামেচি করে। তাদের কলরব শুনছি নীচে বসে। আমার নিকটতম পেঙ্গুইনটি কুড়ি-পঁচিশ ফুট দূরত্বে। হঠাৎ দেখি, কয়েকটি পেঙ্গুইন উঁচু থেকে নেমে আমার পাশ দিয়ে, হয়তো দশ ফুট দূরত্ব, আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দুলে দুলে হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের কাছে চলে গেল। সেখানে একটা পাথরের ওপর থেকে একে একে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। তারা শিকারে বেরিয়েছে না সাঁতার প্র্যাক্টিস করবার জন্য বুঝতে পারিনি। পেঙ্গুইনদের চলার ধরন বড় বিচিত্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পায়ে সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুর মতো ঈষৎ টলতে টলতে যাচ্ছে পেঙ্গুইন। কখনও কল্পনা করিনি এত নিকট থেকে এত পেঙ্গুইন দেখব। এই স্থানটা চিনস্ট্র্যাপ পেঙ্গুইনদের বড় বসতি। শুনেছিলাম এখানে এখন হাজার পাঁচেক পেঙ্গুইন আছে।

পেঙ্গুইনদের দেখলে মনে হবে যেন কালো কোট সাদা প্যান্ট পরে উকিলরা চলেছেন। আবার জোড়া পায়ে ছোট ছোট লাফ দেওয়া বড়ই মজার দেখতে। চিনস্ট্র্যাপ পেঙ্গুইনের মাথা সম্পূর্ণ কালো নয়। চিবুকের কাছটা সাদা, সেখানে আবার কালো একটা লাইন, যেন টুপি মাথায় দিয়ে টুপিটার স্ট্র্যাপ চিবুকের ওপর নামিয়ে দিয়ে সুবেশ একটি মানুষ চলেছে।

এরা এই দ্বীপে জড়ো হয়েছে, প্রতি বছরই এখানে আসে প্রজননের সময়। প্রণয় পর্ব চলেছে। জোড়ায় জোড়ায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রণয় নিবেদনের ধারা বেশ কৌতুকের। দুজনই জাপানিদের বাও করার ভঙ্গিতে বারবার মাথা ঝুঁকায়। ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে বুঝি চুম্বন করে।

আশা ছিল এখানে কিছু সিল মাছও দেখা যাবে। কিন্তু তারা আমাদের বঞ্চিত করল। কোনও সিল দেখতে পেলাম না। যে যাত্রীরা বরফ ভেঙে পাহাড়ের ওপরে উঠেছিলেন, তাঁরা এবারে ফিরতে আরম্ভ করেছেন। নামবার সময় বলে দেওয়া হয়েছিল আড়াই ঘণ্টা থাকা হবে এই দ্বীপে। আবার জোডিয়াকে উঠে পড়া গেল। ফিরতে ফিরতে লাঞ্চের সময় হয়ে যাবে।

লাঞ্চের পর আবার মেরু অভিযানের ধড়াচূড়া পরতে হবে। আমরা যাব ডিসেপশন আইল্যান্ডে। এই দ্বীপে নিদ্রিত অগ্নিগিরি আছে। ১৯৭০ সালে শেষ

উদ্‌গিরণ হয়েছিল। আপাতত নিষ্ক্রিয়।

দ্বীপের যে প্রান্তে আমরা নামব, একদা সেটা তিমি শিকারের কেন্দ্র ছিল। পাহাড়ের আড়ালে, জাহাজ নোঙর করবার সুবিধা হত। তীরে নেমে দেখলাম বালি, পাথর সব কালো। আমাদের জোডিয়াকচালক দেখিয়ে দিলেন, মাটিতে হাত রাখলে এখনও উষ্ণতা অনুভব করা যায়। বাঁদিকে মস্ত মস্ত ধাতুর ট্যাঙ্ক, সেখানে তিমির চর্বি জমা রাখা হত। অনেক লোহা-লক্কড়, ভাঙা বয়লার, ভাঙা জাহাজের অংশ ছড়িয়ে আছে। ডানদিকে পাহাড়ের ওপর উঠলে কিছু দূরে গিয়ে দুই পাহাড়ের একটা নিচু জায়গা থেকে দূরে আন্টার্কটিকা মহাদেশ দেখতে পাওয়া যায়। আমি আর ততদূর যেতে পারলাম না।

পৃথিবীর ষষ্ঠ মহাদেশ আন্টার্কটিকা। অস্ট্রেলিয়া বা ইউরোপের চেয়ে বড় ভূখণ্ড। মানুষের বাস নেই সেখানে, সবসময়ে বরফে ঢাকা। স্থলচর কোনও প্রাণীও নেই আন্টার্কটিকায়। সমুদ্র থেকে মাঝে মাঝে উঠে আসে পেঙ্গুইন এবং সিলমাছ।

এখানে সৈকতের সমস্ত দৈর্ঘ্যে নারাঙি রঙের একটা রেখা দেখা যাচ্ছিল দূর থেকে। নেমে দেখেছিলাম ঢেউয়ে ভেসে আসা কুচো চিংড়ি জমা হয়ে আছে, তারই রং। এরা আর জলে ফিরতে পারেনি। একদল স্কুয়া পাখি, অনেকটা বড় মাপের হাঁসের মতো দেখতে, সেই কুচো চিংড়ির মহাভোজ লাগিয়ে দিয়েছে। ইংরিজিতে এই কুচো চিংড়িকে বলে ক্রিল। সমুদ্রে ক্রিলের প্রাচুর্য। তিমি মাছেরা প্রত্যহ টনখানেক ক্রিল খায়। পেঙ্গুইনরাও ক্রিলের ওপর নির্ভর। পেঙ্গুইনরা যথারীতি ঘুরে বেড়াচ্ছে, জলে নামছে, সাঁতার দিচ্ছে, আবার তীরে উঠে দলের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে।

আগ্নেয়গিরির কারণে বালিতে হাত দিলে এখনও গরম লাগে। হয়তো বহুকাল আগে লাভায় ঢেকে গিয়েছিল। এখনও বালি খুঁড়লে উষ্ণ জল বেরোয়। আমাদের জোডিয়াকচালক বললেন, মহাবীরেরা হিমশীতল সমুদ্রে একবার ডুব দিয়ে দৌড়ে এসে এই তপ্তজলে শরীর স্নিগ্ধ করেন। আমাদের সঙ্গী এক যাত্রী জামা খুলে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। তখন নরম বালিতে একটা চৌবাচ্চা খোঁড়া হয়ে গিয়েছে। সমুদ্রস্নান থেকে দৌড়ে ফিরে এসে সেই দুঃসাহসী বীর গরম জলের ভেতর বসে পড়লেন। তাঁর দেখাদেখি আরও দুজন ঠান্ডা ও গরম জলে স্নান করেছিলেন।

১৪ নভেম্বর আমরা নেমেছিলাম নেকো হারবারে। এখানে জেন্টু পেঙ্গুইনদের লীলাক্ষেত্র। জোডিয়াক থেকে নেমে জলে দুপা এগিয়েই বরফ ঢাকা সৈকত। শুনলাম এখানে দশ হাজার জেন্টু পেঙ্গুইন বাসা বেঁধেছে। সঙ্গে বুঝি কয়েকটি দলছুট আদেলি পেঙ্গুইনও ছিল। আমি তাদের সনাক্ত করতে পারিনি। জেন্টুদের বুকের অংশ পা পর্যন্ত সাদা। মাথা এবং ডানা দুটি কালো। মাথার দুপাশে দুটি সাদা ছোপ। সেই একই ভঙ্গি। তেমনই দুলে দুলে হাঁটা, অকারণে দল ছেড়ে জলের দিকে চলে গেল কেউ, কয়েকটা গিয়ে জলে ঝাঁপ দিল একটা পাথরের ওপর থেকে,

ডাইভ করার ভঙ্গিতে। তারপর সাঁতরাতে লাগল সার বেঁধে। মাথা জলে ডোবাচ্ছে একবার, তারপর মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাচ্ছে, আমাদের সাঁতারের ব্রেস্ট স্ট্রোকের মতো। সামনের পাহাড়ে উঠেছেন অনেকে। যেখানে বুঝি জেন্টুদের বড় কলোনি আছে। তুষারে পা ডুবে যাচ্ছে, সন্তর্পণে হাঁটতে হয়, পোশাকের বোঝা নিয়ে ওপরে উঠতে কষ্টই হয়, আমি তাই একটা পাথরের ওপর বসে আছি। পা তুষারে ডোবানো।

আমার স্ত্রী বললেন, আমাদের জাহাজের এক সহযাত্রীর আজ বিয়ে হবে পাহাড়ের মাথায় বরফের সমুদ্রে। তিনি দ্রুত পায়ে ওপরে উঠে গেলেন। পাহাড়ের বরফ ঢাকা চূড়া বেশ গির্জার মতো দেখতে। পরে স্ত্রীর কাছে এই বিবাহের বর্ণনা শুনেছিলাম। বরকনে দুজনই পাহাড়ের ওপরে উঠে শীতনিবারক যাবতীয় বস্ত্রের জঞ্জাল-মুক্ত বিয়ের পোশাক পরেছিলেন। পাদ্রীর কাজ করেছিলেন দলনেতা লরি। তুষারের পটভূমিকায় সাদা কাপড়-পরা পাত্রীকে না জানি কি অপরূপা দেখিয়েছিল। আমি ঘটনাটা দেখতে পেলাম না। অনেকেই অবশ্য দেখতে পাননি। বিয়ের পরে শ্যাম্পেনের গ্লাস ও রুটি থেকেও আমরা বঞ্চিত। স্ত্রী ফিরে এসে সগর্বে তার বর্ণনা করলেন। বরকনে যখন নীচে নামল তখন উভয়েই অভিযাত্রীর পোশাকে। বরকনেকে আর আলাদা করে চেনা যায় না।

যেহেতু আমি বিবাহ দেখতে যাইনি, আমি তুষারাসন ছেড়ে জোডিয়াকে উঠে বসেছিলাম। একে একে অভিযাত্রীরা ফিরল, জোডিয়াকে উঠলেন। জোডিয়াকে বসা সহজ নয়, বসবার কোনও আসন নেই। জোডিয়াকের ধারের দিকে নৌকোর গায়ের ওপর বসতে হয়। আসনটা অতএব খুব আরামদায়ক নয়। জোডিয়াক ছাড়বার আগের মুহূর্তে আরেকজন যাত্রী উঠলেন, তিনি আমার পাশেই আসন নিলেন। জোডিয়াকচালক খবর দিলেন, এদিকটা বিপদসঙ্কুল। বড় বড় ঢেউ হঠাৎ আসতে পারে। আপনারা জোডিয়াকের গায়ে লাগানো দড়ি ধরে বসুন। এর আগে আমি যখন তীরে তখনও বলেছিলেন, এত নীচে থাকা নিরাপদ নয়, হঠাৎ বড় ঢেউ জলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আপনি খানিকটা ওপরে উঠে বসতে পারেন।

এই জোডিয়াকচালকও বললেন, এই অঞ্চলে অনেক গ্লেসিয়ার। তাদের একাংশ ভেঙে যখন জলে পড়ে শব্দও যেমন হয়, ঢেউও হয় তেমনই। হাজার হোক, কয়েক হাজার টন বরফ ওপর থেকে নীচে জলে পড়লে এটা স্বাভাবিক।

আমি এই সতর্কবাণীর পর জোডিয়াকের দড়িটা আরও চেপে ধরলাম। পাশের যাত্রীও সেই দড়ি ধরেই টানছিলেন। হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ শোনা গেল। নিশ্চয় হিমবাহ ভেঙে পড়ল কোথাও। আমার তখন সামান্য ভয়ই করছে। এমনিতে ঢেউ বড় বড়, নানা আকারের ছোট বড় হিমশৈল, আইসবার্গ ভাসছে। তাদের সঙ্গে সংস্পর্শ এড়াতে জোডিয়াক মাঝেমাঝেই তীব্র বাঁক নিচ্ছে। আমার টলে পড়বার অবস্থা। আমি সাঁতার জানি না। অবশ্য লাইফ বেল্ট পরা আছে।

সহকারীরা কেউ বলেছিলেন এই লাইফ বেল্টের ভেতরে এমন রাসায়নিক আছে যা জলে পড়লেই হাওয়ায় ফুলিয়ে দেবে বেল্টকে। আপনার মাথাটা কিছুতেই জলের নীচে যেতে দেবে না। এই বেল্ট পরা থাকলে ডোববার কোনও আশঙ্কা নেই। শুনে আমি আশ্বস্ত হতে পারিনি। দুর্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলাম, ডুবব না বুঝলাম, কিন্তু হিমশীতল জলে কতক্ষণ বেঁচে থাকব বলতে পারেন? কোনও সদুত্তর পাইনি। কতক্ষণ বরফ-ঠান্ডা জলে বেঁচে থাকা যায় তা নাকি নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের ওপর।

এই সব ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত জাহাজের কাছে পৌঁছলাম। নামবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি, আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনলাম, অত তাড়া করছ কেন? তোমার পালা এলে নামবে। সবেতেই তাড়াহুড়ো।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি আমার স্ত্রীই কথা বলছেন, যিনি এতক্ষণ জোডিয়াকের দড়ি নিয়ে টানাটানি করছিলেন আমার সঙ্গে। আমার পাশে বসে, আমি চিনতে পারিনি। এমনই পোশাক ছিল আমাদের।

শীত বাড়ছে কমছে, তুষারপাত হচ্ছে, বন্ধ হচ্ছে কিন্তু আমাদের প্রোগ্রাম বন্ধ হয় না। সকাল ছটায় লরির কণ্ঠস্বর যাত্রীদের ঘুম ভাঙিয়ে সেদিনের কার্যকলাপের বৃত্তান্ত জানিয়ে দেয়।

বিকালে আবার জোডিয়াক বাহিত হয়ে প্যারাডাইস বে-তে নামলাম। সেই তুষারাবৃত পাহাড়ে জায়গা। তিনদিক পাহাড়ঘেরা বলে তিমিশিকারিদের জাহাজ একদা এখানে আশ্রয় নিত। তাই নাম হয়েছে প্যারাডাইস হারবার।

১৫ নভেম্বর সকালে ড্যাঙ্কো হারবার। সকাল থেকে তুষারপাত হচ্ছে। ডেকে বরফ জমে আছে। লাউডস্পিকারে বারবার সাবধানবাণী শোনা যাচ্ছে, ডেক অতিশয় পিচ্ছিল, খুব সাবধানে হাঁটবেন, তবু নামা হল। ঠান্ডা হিমাঙ্কের নীচে নেমেছে। ঝড়ো বাতাস বইছে, ঠান্ডা যেন সব জামাকাপড় ভেদ করে মজ্জায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে।

প্রচুর তুষার জমে আছে। সাবধানে পা ফেললেও হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হয়। কোনও সঙ্গী থাকলে ভালো হত। কিন্তু সবাই এগিয়ে গিয়েছে, সামনে একটু উঁচুতে বিশাল বসতি জেন্টু পেঙ্গুইনদের। তুষারশায়িত অমরেন্দ্র মগ্ন হয়ে ছবি তুলছেন। তাঁকে মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। আমার স্ত্রী, অনিন্দ্য এবং নন্দিনী এগিয়ে গিয়েছেন। আমার দুর্দশা দেখে সাহস করে অনিন্দ্য ফিরে এসে আমাকে তুললেন। তাঁর পায়ের ছাপ ধরে ধরে, সেইখানে পা ফেলে ফেলে বিশাল বসতির সামনে পৌঁছলাম। শুনলাম এখানে দশ হাজার পেঙ্গুইন আসে। অসীম তুষারের মাঝখানে কালো-সাদা পেঙ্গুইনের ছবি কোনওদিন মন থেকে মুছবে না। যা দেখি তাই ভালো লাগে।

একটা গানের কয়েক চরণ মনে এল। কার বন্দনায় কে রচনা করেছিল জানি না।

নব হে নব
নিতুই নব
যেমনই হেরি তেমনই নব
যখনই হেরি তখনই নব
নব হে নব।

প্রতিটি দৃশ্য অভাবিত, নতুন। বারে বারে দেখি আশা মেটে না।

বিকালে সমুদ্রবিহার। সমুদ্র অশান্ত নয়। ঢেউগুলি ছোট ছোট। সমুদ্রের এই অঞ্চলে সংখ্যাতীত আইসবার্গ। তাদের আকৃতি আকার সবই ভিন্ন এবং বিচিত্র। দুয়েকটি হিমশৈল তো বড় ইমারতের সমান। যেন কোনও পরাবাস্তব ছবির মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছি। অনেক হিমশৈলের নীচের অংশ নীল। আমাদের চালক বললেন, অনেকদিনের জমা বরফের ঘনত্ব বাড়ে, তখন সূর্যের আলোয় তার নীল রং বিচ্ছুরিত হয়।

এর পরের দুদিন জাহাজ থেকে আমাদের নামা হল না। আবহাওয়া মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আকাশে সমুদ্রে ভ্রুকুটি। জোডিয়াক নামাতে সাহস হয় না দলনেতার। একবার নামিয়ে ছিলেন, কিন্তু সমুদ্র সহসা এত উত্তাল হল যে জোডিয়াকের চালক বহুকষ্টে জোডিয়াক ফিরিয়ে আনলেন। তাঁরা জাহাজের পাশে না পৌঁছনো পর্যন্ত দলনেতা নিশ্চয় ইষ্টনাম জপছিলেন।

তুষারপাত থামলে হঠাৎ রোদ উঠছে— আবার নীল সমুদ্রে শুভ্র প্রশান্ত পর্বতচূড়া জেগে উঠছে। অলৌকিক হিমশৈল ভেসে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। ডেকে বেরতে পারি না। হাওয়ার তেজ প্রচণ্ড। জানলা থেকে অপরূপ দৃশ্য দেখছি।

আমাদের কঠোর মনোরম যাত্রার শেষপর্ব আসন্ন। জাহাজ আবার সেই ভয়ঙ্কর ড্রেক প্যাসেজে ঢুকছে। দুদিন কষ্টে কাটবে। কাটলও তাই। এতই দুলন জাহাজ যে শেষের দুবেলা অন্তত সিকিভাগ যাত্রী খাবার ঘরে আসতেই পারেননি। তাঁরা সি সিকনেসে ভুগেছেন।

আমার সি সিকনেস হয়নি। কিন্তু আমার ভোজনকক্ষে যাবার সাহস নেই। এক তলা নামতে হবে। তারপর ল্যাইব্রেরি, পানশালা পার হয়ে খাবার ঘরে পৌঁছনো দুঃসাধ্য। আমার স্ত্রী ঘরে ব্রেকফাস্ট না এনে দিলে আমাকে অর্ধাশনে থাকতে হত। তাঁর জেদেই আমাকে লাঞ্চ ডিনারের সময়ে নামতে হয়েছিল। সশঙ্ক চিত্তে, অতি সাবধানে, দেওয়াল ধরে ধরে। তাঁর জেদ মেনে আমার দুঃখ হয়নি। সাবধানী মানুষ, তিনি এ যাত্রায় আসতে চাননি, আমার জেদেই এসেছেন। তাঁর জেদ স্বীকার করাই উচিত।

'ভ্রমণ' জানুয়ারি, ২০০৫

সহজ পথের ধকল

শঙ্খ ঘোষ

জলপাইগুড়ি থেকে দিনহাটা, একে কি ভ্রমণ বলে? বলা যায়? বাসে ওঠো, ঘণ্টাচারেকের পথ, নেমে পড়ো জায়গামতো। এইটুকু তো ব্যাপার।

কিন্তু সহজ এই ব্যাপারটা নিতান্ত সহজ থাকেনি আমাদের কাছে, চুয়াল্লিশ বছর আগে একবার যখন গিয়েছিলাম। চার ঘণ্টার পথকে প্রায় এগারো ঘণ্টা বানিয়ে দিয়ে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে আমরা পৌঁছেছিলাম অনেকরকম অভিজ্ঞতার পর। আমরা মানে চার বয়সের চার মহিলার সঙ্গে আমি। চুয়ান্ন বছরের সুহাসিনী, সাতাশ বছরের ইভা, তার বোন বারো বছরের খুকু, আর আমাদের কন্যা দুবছরের মিঠি, এই হল সেই ভ্রমণের পাত্রীপরিচয়।

সুহাসিনীর এক বোন রমাসুন্দরী থাকেন দিনহাটায়। কিন্তু বিয়ের পর প্রায় চল্লিশ বছর জলপাইগুড়িতে দিন কাটিয়েও কোনওদিন তাঁর যাওয়া হয়নি সেখানে। 'যাবেন আমাদের সঙ্গে?' এ-প্রশ্নের উত্তরে অস্ফুটে উনি বলেন: 'না না, তা কি হয়! বাড়িঘর ফেলে আমি কি যেতে পারি?'

বাড়িঘর ফেলে যাওয়া ছাড়াও তাঁর অন্য একটা সংকট অবশ্য ছিল। মেয়েজামাইয়ের সঙ্গে যাওয়া? সে আবার কীরকম? তাছাড়া, এতটা পথ, এতটা দূর! এখনও কপাল থেকে সবসময়েই দু ইঞ্চি এগিয়ে থাকে তাঁর ঘোমটা, অতিসম্ভ্রান্ত চালচলনে অভ্যস্ত তিনি এখনও কারও চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেন না, তাঁর নিজের শহরের মধ্যেও এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়াবার অভ্যাস একেবারে নেই বললেই চলে। সেই অতিসংকুচিতা ব্রীড়াবনতা আভিজাত্যবন্দিনী মহিলা দিনহাটায় যাবেন বোনের কাছে এতটা প্রকাশ্য পথ ডিঙিয়ে, এও কি কখনও সম্ভব?

কিন্তু সম্ভব হল সেটা, শেষ পর্যন্ত। অনেকরকম সাধনাশেষে মত পাওয়া গেল তাঁর। জলপাইগুড়ি থেকে, পাঁচজনে মিলে, চলে যাব একেবারে দিনহাটায়।

প্রশ্ন শুধু, কীভাবে যাওয়া। বাসে না ট্রেনে? অভিজ্ঞ পরামর্শদাতারা বলেন: না না, ট্রেনে কেন যাবে? সময় লাগবে বেশি, বদল করতে হবে ট্রেন, সময়টাও নয়

সুবিধেজনক। তার চেয়ে বাস কত ভালো। একটানা চলে যাওয়া যায়। এখানে উঠলে আর ওখানে নামলে। কোনও ঝঞ্ঝাট নেই।

বেশ, ঠিক হল তবে বাসেই যাব। রওনা হব সকালে, পৌঁছে যাচ্ছি দুপুরে।

২

সকালে রওনা হবার সময়ে ভাবছি আমাদের যেতে হবে পাঁচ মিনিটের দূরত্বে, জলপাইগুড়ির শহরকেন্দ্র কদমতলার বাস-আস্তানায়।

আরে না না, ওখানে নয়, বাস তো ছাড়বে তিস্তার ধার থেকে। তিস্তা পর্যন্ত আগে চলো তো দুখানা রিকশায় উঠে।

বেশ, চলল তবে রিকশা। নিয়ে এল সে দু মাইল দূরের তিস্তানদীর কূলে, তিন সাহেবের ঘাটে।

কিন্তু এখানে কোথায় বাসস্ট্যান্ড?

এখানে কী করে হবে? এখান থেকে বাস যাবেই-বা কীভাবে, নদী ডিঙিয়ে, তিস্তায় কি ব্রিজ আছে?

তাও তো বটে। তাহলে?

তাহলে আর কী? নৌকো করে ওপারে চলো, বার্নেস ঘাটে, তারপর বাস।

ঠিকই তো। কিন্তু নৌকো কোথায়?

ওই তো দূরে। ও পর্যন্ত তো যেতেই হবে চর পেরিয়ে। তারপরে আর অসুবিধা নেই কিছু।

সুবিস্তারে যতখানি চর পড়ে আছে সামনে, ততটাই যে হেঁটে যেতে হবে সবাইকে, তা নয়। অপারগদের জল পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার জন্য ভালোরকম ব্যবস্থা করা আছে। ওই যে পারাপার করবার কাজে সামনেই আছে একখানা মোটরগাড়ি। চলো যাই, উঠে বসি ওটায়।

শুধু যে আমরাই উঠলাম তা অবশ্য নয়। টিকিট নিয়ে আরও অনেকেই উঠলেন সেই গাড়িতে। জনাদশেক যাত্রী নিয়ে, গাড়ির আধখোলা মরচেধরা দরজাটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে, মচর্ মচর্ শব্দে দুলকি চালে যখন চলতে লাগল সেই গাড়ি— যেন বালির ওপর নৌকো— আর ঠকর্ ঠকর্ করে আমাদের কারও কারও মাথা যখন ছন্দে ছন্দে ধাক্কা দিতে থাকল গাড়ির তুবড়োনো চালে, অনিবার্যতই তখন মনে পড়ল বছরখানেক আগে দেখা 'অযান্ত্রিক' ছবিটার কথা, মনে বিশ্বাস হল যে এই গাড়িটাকেই নিশ্চয় ব্যবহার করেছিলেন ঋত্বিক তাঁর ফিল্মে। কিন্তু গাড়িটা কি জল পর্যন্ত যাবে? যদি-বা যায়, তার অনেক আগেই কি সম্ভব হত না পায়ে হেঁটে পৌঁছনো?

হয়তো হত তা, কিন্তু অতটা হেঁটে যাবার কথা কি বলা যায় সুহাসিনীর মতো কাউকে? ভাবাও কি যায় সেটা?

পায়ের ক্ষত বাঁচিয়ে কিন্তু মাথায় কিছু ক্ষত নিয়ে এবড়োখেবড়ো চরের ওপর

দিয়ে পৌঁছনো গেল জলরেখার ধারে। এখান থেকে নৌকোয় উঠতে আর অসুবিধে কিছু নেই। নৌকোগুলি বেশ সুস্থসমর্থই।

৩

রিকশা-মোটর-নৌকো-অবসানে বার্নেস ঘাটে গিয়ে ওঠা গেল যখন, ততক্ষণে বোঝা গেছে যে দুপুরেই দিনহাটা পৌঁছনোর ধারণাটা অলীক স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু, অন্তত বিকেলের মধ্যেই যাতে সেটা ঘটতে পারে, সেই ব্যাকুলতায় বাস-ড্রাইভারকে বিনীত জিজ্ঞাসায় বারবার অস্থির করতে থাকি আমরা: কত দেরি আর? ছাড়বেন আর কখন?

সময় হলে ঠিকই ছাড়ব। এখনও সময় হয়নি।

এমন সাধু উত্তরের পর 'ডাকঘর' নাটকে অমলের 'কেউ বলে সময় বয়ে যাচ্ছে, কেউ বলে সময় হয়নি' সংলাপটা মনে মনে আওড়ানো ছাড়া কিছুই আর করবার থাকে না আমাদের। সঙ্গের শিশুটির আহারব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে পড়া বরং ভালো।

তারপর কখন যেন সময় হল ওঁদের, চলতে শুরু করল বাস। পিচবাঁধানো পথ বেশ ভালো, যাওয়া যাবে আরামেই। দুপাশে জনবসতির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবাংলার চোখজুড়োনো সবুজের টান। ঘোমটা ঈষৎ সরে গেছে, সুহাসিনী তাকিয়ে আছেন বাইরে। মনে মনে ভাবছি, অন্যায় হচ্ছে কি এইভাবে ওঁকে নিয়ে যাওয়া? এই-যে এতরকমের যানবদল ঘটে গেল এইটুকু সময়ের মধ্যে, তাতে কি বিব্রত করা হল ওঁকে? কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে তেমন তো কোনও বিরক্তিচিহ্ন ক্লান্তিচিহ্ন চোখে পড়ে না, বাইরে তো বরং মেলে আছেন ওঁর উৎসুক চোখ। না, আমাদের খুব বেশি বিচলিত হবার দরকার নেই বোধহয়।

অন্য সঙ্গিনীরাও কেউ তেমন উচ্ছল নন, সবাই নিজের নিজের মধ্যে চুপ। তাই বাইরের দিকে চোখ রাখা ছাড়া বাসের অন্য যাত্রীদের কথাবার্তা লক্ষ করে যাওয়া, এইটুকুই আপাতত আমার কাজ। একজন বলছেন: ওঃ, যে-চালে চলছে বাস, বুড়ি-তোর্সায় পৌঁছতেই সন্ধে করে দেবে এরা।

বুড়ি-তোর্সা? আরও একটা নদী পেরোতে হবে না কি?

তা তো হবেই। তবে সেটা ঠিক নদী নয়, এখন আর নদী কী, জল কোথায় এখন। তবে পেরোতে তো হবেই।

ব্রিজ আছে?

ব্রিজ? ব্রিজ লাগবে কোন কাজে? আরে, এ সময়টায় নদীর বেড খটখটে হয়ে থাকে। বাস চলে যাবে ওর ওপর দিয়ে, ব্রিজ ছাড়াই। বর্ষাকালটা অন্যরকম।

পাশ থেকে অন্য একজন বলে ওঠেন: বলছেন তো মশাই, কিন্তু হঠাৎ যদি জলের তোড় নেমে আসে, কখনও কখনও আসেও তো, তখন কী হবে বুঝতে পারছেন? শুনছি তো ক'দিন ধরে বিকেলের দিকে না কি পাহাড় থেকে নেমে

আসছে জল।

তা এলে কি কন্ডাক্টর আর ড্রাইভাররা জানত না? আপনাদের মশাই প্যানিক করা অভ্যাস।

এসব সংলাপ শুনতে শুনতে আমাদের গতিপথটা একটু অস্পষ্ট লাগে, আরও অস্পষ্ট লাগে ভবিতব্য। কাজেই সেকথা আর না ভেবে বুঝতে চেষ্টা করি এই তথ্য যে এত বেশি কাঁঠালগাছ কেন এখানে। আর কী ফলন সেসব গাছের!

কিন্তু বাসটা এখানে থেমে আছে কেন এতক্ষণ? ওঠানামা তো করছে না কেউ এখানে। কোনও স্টপ নয়, বসতিও নেই কোথাও। তাহলে এখানে এত বিশ্রাম কিসের?

যাত্রীরা কেউ কেউ তাড়া দিয়ে বলেন: বলি হচ্ছে কী এটা? থামিয়ে রেখেছেন কেন এতক্ষণ? আর কন্ডাক্টরই-বা গেল কোথায়?

চালকের কাছ থেকে উত্তর আসে না কিছু। এমনভাবে বসে থাকার আর মানে কী, এই ভেবে খোলা হাওয়ায় ঘুরবার জন্য আমি নেমে আসি পথে।

আর, নেমেই, সহজেই আবিষ্কার করতে পারি হারিয়ে-যাওয়া কন্ডাক্টরকে। বাসের ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, আর ঝুঁকেপড়া কাঁঠালডাল থেকে একটি একটি করে পেড়ে নিচ্ছেন কাঁঠাল। বাসের ছাদে সঞ্চিত হচ্ছে তারা।

এটা কী করছেন? কী হবে এসব?

কী আর হবে! খাওয়া হবে।

খাওয়া হবে? আর খাবেন বলে এতটা দেরি করিয়ে দিচ্ছেন আমাদের? নেমে আসুন তাড়াতাড়ি।

আমার কথার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন সেই কন্ডাক্টর আহরণযোগ্য শেষ কাঁঠালটি পর্যন্ত গাছ থেকে নামাবার পর নেমে আসেন নিজে। অল্প পরে চলতে শুরু করে বাস।

কন্ডাক্টরকে জিজ্ঞাসা করি: এঁরা যে বলছেন বুড়ি-তোর্সাতে জল এসে যেতে পারে হঠাৎ, সে কি সত্যি?

কন্ডাক্টর বললেন: হতেও পারে।

হতেও পারে? তাহলে এসব যাত্রীর কী হবে?

কী আর হবে? নেমে যেতে হবে। তবে ওপারে গেলে আমাদেরই বাস পেয়ে যাবেন আবার।

সে কি কথা? আগে তো জানতাম এই বাসই সোজা চলে যাবে দিনহাটায়।

যাবে যাবে, তাই যাবে। এ সময়ে আসে না জল। আসে বর্ষাকালে।

৪

বিকেল হয়ে আসছে। বুড়ি-তোর্সা এসে গেল প্রায়।

যাত্রীরা বিশেষ কথা বলছেন না কেউ। সবারই একটু অবসাদ-অবসাদ ভাব।

বাস থামল। অমনি সবাই দেখি নেমে যাবার জন্য তৈরি।

কী হল?

এসে গেছে জল। এ বাস আর যাবে না।

তাহলে?

ওপারে চলে গেলেই পেয়ে যাবেন বাস।

স্থানীয় অভ্যস্ত যাত্রীরা অবশ্য প্রশ্ন করেন না কিছু। টপাটপ নেমে যাচ্ছেন সবাই। কেউ কেউ আবার পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে নিচ্ছেন হাতে। জুতো খুলছেন কেন?

উত্তর দেয় না কেউ।

নেমে আসি আমরাও। কয়েকজন কুলি এসে ঘিরে ধরে আমাদের।

এতজন কেন? এইটুকু তো মালপত্র। একজনই তো যথেষ্ট।

বাঃ, মাইজিরা আছেন না? জেনানা লোগকো নিয়ে যেতে হবে না?

নিয়ে যেতে হবে? মানে?

কেউ না ধরলে কি মাইজিরা জলের মধ্য দিয়ে যেতে পারবেন?

জলের মধ্য দিয়ে যেতে হবে না কি? নৌকো নেই?

হাঁ, নৌকো তো জরুর আছে। কিন্তু নৌকো কি সবটা যাবে? জলে তো নামতেই হবে।

সদয় কন্ডাক্টর কাঁঠালকাঁধে নেমে এসে বুঝিয়ে বললেন ব্যাপারটা: হঠাৎ পাহাড়ি জল এসে গেছে বলে বাস আর তাতে যেতে পারবে না। কিন্তু এতটা জল এখনও আসেনি যাতে নৌকো যেতে পারে। পাড়ের নৌকো অল্প একটু এগিয়ে দেবে আপনাদের— ওই-যে বাঁশপোঁতা সীমানা পর্যন্ত। তারপর একটু হেঁটে যাবেন। কিছু অসুবিধা নেই, সবাই যাচ্ছে। ওপারে গেলেই পেয়ে যাবেন আমাদের বাস।

কতটা জল?

কত আর! সামান্য এই কোমরজল। —বলে অদৃশ্য হলেন কন্ডাক্টর।

আমরা গিয়ে উঠলাম নৌকোয়। জল তো আসছেই এখনও, বাড়ছেই তো জল। এর মধ্যে নিশ্চয় পুরো পথ নৌকোয় যাবার মতো অবস্থা একটা হয়ে যাবে।

নৌকোয় আমাদের সঙ্গে উঠে আসে পাঁচজন কুলি। জিজ্ঞাসু চোখে তাকালে তারা বলে: লাগবে লাগবে, আপনাদের পাঁচজনই লাগবে।

সামনে তাকিয়ে দেখি টলটলে সুন্দর এক স্রোত বয়ে চলেছে, আর তাকে ভেদ করে বিস্তর নারীপুরুষ হেঁটে চলেছেন ওপারের দিকে, যেন এর চেয়ে স্বাভাবিক ঘটনা কিছু আর নেই।

আমার হৃৎকাঁপুনি শুরু হল। সত্যি কি ওইভাবে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত? আমার পক্ষে তো ভালোই সেটা, কিন্তু বাকিরা? প্রায় অসূর্যম্পশ্যা বর্ষীয়সী যে মহিলাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছি সঙ্গে, এমন একটা অবস্থায় পড়তে হবে তাঁকে? এর

পর তিনি কি আর ঢুকতে দেবেন তাঁদের বাড়িতে?

ভাবতে ভাবতেই দেখি নৌকো পৌঁছে গেছে তার শেষ সীমায়। মাঝি বলছে: আর যাবে না। নেমে পড়ুন এখানে।

কিছুমাত্র কথা না বলে, জিনিসপত্রের সঙ্গে আমাদের জুতোগুলি পুঁটুলি করে, একজন কুলি নেমে পড়ল জলে। আমাদের উপেক্ষা করেই এগোতে থাকল সে।

তারপর? দ্বিতীয় কুলি এসে দ্বিবর্ষীয়া শিশুটিকে ছিনিয়ে নিল তার মায়ের কোল থেকে। পাঁজাকোলা করে নিয়ে এগোতে চাইছে সে। চার হাত-পায়ের বিপুল বিক্ষেপে আর তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকারে সে জানাতে থাকে তার প্রতিবাদ। ধ্বনিত হতে থাকে তার মায়েরও প্রাণঘাতী আকুতি: ওকে বারণ করো, বারণ করো। পড়ে যাবে, মিঠি তো ছিটকে পড়ে যাবে জলে। কী করছ, বারণ করো ওকে।

কিন্তু ততক্ষণে কুলি এগিয়ে গেছে প্রায় মাঝদরিয়ায়!

জল থেকে নৌকোর দিকে এসে তৃতীয় কুলিটি দ্বাদশবর্ষীয়াকে বলে: দিদিমণি, আমার কাঁধে উঠে আসুন।

ভাবলাম এমন অপমানজনক প্রস্তাবে দিদিমণিটি জলেই না ঝাঁপ দেয়! কিন্তু কিমাশ্চর্যম্, মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না করে সেই দ্বাদশিনী উঠে পড়ল তার ঘাড়ে, কাঁধের দুপাশে দুই পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসে রইল নির্বিকার, আর তৃতীয় কুলি অনুসরণ করতে লাগল দ্বিতীয় কুলিটিকে। দ্বিতীয়কে দেখে মনে হল জন্মাষ্টমীতে শিশুকোলে নন্দ চলেছেন যমুনাজলের মধ্য দিয়ে। আর তৃতীয়টি যেন কাঁধে নিয়ে চলেছেন লক্ষ্মীঠাকরুন।

চতুর্থ এসে বর্ষীয়সীকে বলে: আসুন মাইজি, আমার হাতটা ধরুন। কিছু ভয় নেই, নেমে আসুন। ধরুন হাত।

কী অসম্ভব কথা! উনি ধরবেন কুলির হাত? তাই কখনও হয়? ক্ষীণ স্বরে বলেন: না না, নিজেই পারব।

অগাধ আত্মপ্রত্যয়ে এই কথা বলে নৌকো থেকে তিনি এক পা নামালেন জলে, আর টাল সামলাতে না পেরে অতিসংকুচিতা ব্রীড়াবনতা সন্ত্রান্ত সেই মহিলা উল্টে পড়লেন জলে, দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের মতো।

চতুর্থ এবং পঞ্চম কুলি দুপাশ থেকে দুহাত ধরে তুলে নিল তাঁকে। ধমক দিয়ে বলল: বলছিলাম না যে পারবেন না? চলুন, সামনে এগিয়ে চলুন। আমরা ধরে আছি দুদিকে, চলুন আমাদের সঙ্গে।

বাধ্য বালিকার মতো চলতে থাকলেন তিনি কোমরজল ভেঙে।

পঞ্চমটি আমার দিকে তাকিয়ে দুঃখিত স্বরে বলে যায়: দিদিকে তাহলে আপনিই নিয়ে আসুন।

ঠিক। সকলেরই গতি হয়ে যাবার পর এবার সপ্তবিংশতি।

ভেবেছিলাম, একটু আগেই নিজের চোখে মায়ের দশা দেখেছে বলে সে আমার হাত ধরতে বেশি দ্বিধা করবে না। কিন্তু না, স্থিরভাবে নৌকোয় দাঁড়িয়ে সে তার

দুটোমাত্র দৃপ্ত অভিপ্রায় ঘোষণা করল। প্রথম, সে জলে নামবে না, কিছুতেই না। আর দ্বিতীয়: 'ওদের বারণ করো।'

কী বারণ করব?

ওদের ফিরে আসতে বলো। মিঠি পড়ে যাবে। জলে পড়ে যাবে তো মিঠি। শিগগির ফিরতে বলো ওদের।

এখন আর ফেরা যায় না, ওরা তো এগিয়ে গেছে অনেকদূর। নেমে এসো।

না না, নামব না আমি।

অগত্যা টেনেই নামাতে হয় তাকে, আর প্রবোধবাক্যে বলতে হয়: দেখেছ কেমন ঠান্ডা জল, শরীর জুড়িয়ে যায়! পাহাড়ি জল তো।

কোনও সাড়া আসে না। তার চলৎশক্তিও জাগে না। টেনে নিতে হচ্ছে তাকে। হ্যাঁ, আমারই তো কোমরজল। চলতে চলতে টের পাই জলের তুমুল চোরাটান। সেই টানে কেবলই বেঁকে বেঁকে যাচ্ছি ডাইনে। বুঝতে পারছি ওপারে যদি সোজা যেতে হয় আমাদের, তাহলে চলতে হবে বাঁয়ের দিকে, ধাক্কা খেতে খেতে সেটাই হয়ে যাবে সোজা। সঙ্গিনীকে বোঝাই সেইমতো। বোঝাবার অবশ্য দরকার ছিল না তত, কেননা সে তো নিজে চলছে না। তাই জলের মধ্যে জলের সঙ্গে আর তার সঙ্গে যুগল যুদ্ধ করতে করতে মাঝপথ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছি আমরা। আর ঠিক সেই সময়ে, যুদ্ধজয়ের অর্ধপথে, পাহাড়ি নদীর স্রোতের মধ্যে দৃঢ়প্রোথিত দাঁড়িয়ে সপ্তবিংশতিটি উচ্চারণ করলেন: আমি আর যাব না।

মানে?

মানে আমি যাব না। আমি এখানেই থাকব।

কী মুশকিল, এখানে থাকবে মানে কী?

তাহলে ফিরে চলো এখান থেকে। আমি আর যাব না।

দিশেহারা আমি তখন মাঝনদীতে কোমর জলে দাঁড়িয়ে চোরাটানের ধাক্কা খেতে খেতে জ্যামিতি বোঝাই তাকে। বলি: দেখো, ফিরে যদি যেতে হয়, এই জল ডিঙিয়েই তো যাবে? পিছন দিকে যতদূর যাবে, সামনে যদি ঠিক ততদূরই যাও, তাহলেই আমরা ওপারে পৌঁছে যাচ্ছি। তাই না? সমানই দূরত্ব, সমানই সময়। তাহলে এবার ভাবো, সামনে যাবে না পিছনে।

যুক্তিটা বেশ হৃদয়গ্রাহী হল বলেই মনে হয়। সামনের দিকেই টানা গেল তাকে। জলের স্পর্শগুণ বিষয়ে কথা বলতে বলতে এগোতে থাকি সামনে। বাকিরা সবাই ততক্ষণে উঠে গেছে পাড়ে।

উঠে আসি আমরাও। সামনেই দাঁড়ানো বাস। তার উদার আহ্বান কানে এসে পৌঁছতে থাকে। সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই। কিন্তু এই আধভেজা দশায় উঠতে হবে বাসে? এইভাবে এরা যাবে বাকি পথটা?

না না, তা কেন! সুব্যবস্থার কিছুমাত্র অভাব নেই। দরমা দেওয়া সাময়িক একটা ঘর বানানো আছে কোণে, ওইখানে মহিলাদের কাপড় পাল্টাবার জায়গা।

তার মানে, এটা আজকেরই কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। এইটেই নিয়ম, এইটেই পদ্ধতি। নিয়মিত যাত্রীদের সকলেরই জানা আছে সেটা।

সিক্তবসনারা একে একে ঢুকছেন সেই ঘরে এবং সুবিন্যাসে বেরিয়ে আসছেন আবার, যেন বিকেলের গা-ধোয়া সম্পন্ন করে প্রসাধিত হয়ে নিলেন তাঁরা।

বুড়ি-তোর্সার জল বাড়ছে। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এবার আমাদের বাস চলছে সত্যি সত্যি দিনহাটার দিকে। আর না কি নামতে হবে না কোথাও।

৫

অতিথি হিসাবে নতুন বাড়িতে পৌঁছে ভাবছিলাম জয়-জয়কার হবে আমার, কেননা এতদিনে দিনহাটার বাড়িতে দেখা করিয়ে দিয়েছি সুহাসিনী আর রমাসুন্দরীর। কিন্তু তার বদলে শুনতে হল ধিক্কার: ছি ছি, রাঙাদি বেচারিকে এমনভাবে নিয়ে এলে তোমরা? বাসে করে? এ সময়ে বাসে আসে কেউ? আগে কাউকে জিজ্ঞাসা করোনি? দেখো তো, আমরা সেই দুপুর থেকে বসে আছি! ট্রেন এসে গেছে সেই কখন। কখন এসে পৌঁছতে পারতে, সোজাসুজি ট্রেনে যদি আসতে! ইস, ধকল গেল কত! নাও, এখন জামাকাপড় পাল্টে নাও।

আমি ভাবছি, সোজাসুজি আসায় আর মজা কী! এভাবে এলাম বলেই তো মনে থাকবে অনেকদিন।

আছেও মনে, চুয়াল্লিশ বছর পরেও বেশ ভালোই মনে আছে সেটা।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৩

ভোরবেলার রাহাজানি

শঙ্খ ঘোষ

এ কোনও ভ্রমণকাহিনী নয়। বলা যায় গমনকাহিনী। বা, আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে, আগমনকাহিনী।

কোনও কোনও ভ্রমণশেষে কলকাতায় পা রাখতে রাখতেই মনে হয়, খবরের কাগজে একখানা চিঠি না-লিখলেই নয়। কী-যে হালচাল হয়েছে দেশের, সেসব অভিজ্ঞতার কথা জানাতেই হবে সবাইকে।

বাড়িতে পৌঁছে, কয়েকদিনের বন্ধ দরজার আগল খুলে ঘরে ঢুকতে পাবার আয়েশে, গনগনে সেইসব চিঠির মানসিক মুসাবিদা নিমেষে যায় জুড়িয়ে, লেখা আর হয় না।

একবার যেমন হয়েছিল দূরপথের পাড়িশেষে রাত দশটায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবার পর। দশটাও নয়, ঘড়িতে দেখেছি দশটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি তখনও। ঘড়ি দেখেছি, কেননা শুনেছি দশটার পর থেকে ট্যাক্সি নিয়ে একটা সমস্যা হয় হাওড়ায়, পুলিশ তখন ইতিউতি চলে যায় বলে ট্যাক্সি আর মিটারমতো চলতে চায় না। ট্যাক্সিওয়ালারা তখন দরাজ গলায় হাঁকতে থাকেন: টালিগঞ্জ—দমদম—গড়িয়াহাট—সল্টলেক—। যে-অভিমুখে যাঁরা যাবেন, তাঁদের কাছে একটা থোক টাকা হেঁকে সওয়ারি তুলবেন তাঁরা— রাত দশটার পর এই হচ্ছে কলকাতার দস্তুর। অর্থাৎ রাত দশটার পর কলকাতার আর কোনও নিয়ম নেই, কলকাতা তখন মুক্তাঞ্চল।

মুক্তাঞ্চল হতে আরও পনেরো মিনিট বাকি, লটবহর আর সঙ্গীসাথী নিয়ে হনহনিয়ে চলেছি প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে, ট্যাক্সিসারির দিকে। চলো চলো, এখনও আইন আছে, কারও খামখেয়ালের শিকার হবার হাত থেকে নিষ্কৃতি আছে এখনও। মহিলারা ছাড়াও সঙ্গে একটি শিশুও আছে বলে মন বেশ উৎকণ্ঠায় ভরা। তাড়া দিচ্ছি তাই: চলো চলো—।

কিন্তু ট্যাক্সির লাইনে পৌঁছে দেখি মুক্তব্যবস্থা শুরু হয়ে গেছে তখনই এবং পুলিশেরা উদাসভাবে এ ওর সঙ্গে গল্পে রত। মিটারে কেউ যাবে না শুনে বহুদূর থেকে আসা বিধ্বস্ত যাত্রীদল একে একে মেনে নেন ট্যাক্সিওয়ালাদের দাবি, ফাঁকা হতে থাকে ভিড়। কিন্তু আমাদের কয়েকটা দলের নীতিবোধ এবং আইনপ্রত্যাশা

অত্যন্তই তীব্র হয়ে ওঠায় ওভাবে কিছুতেই যাব না বলে সিদ্ধান্ত নিই আমরা। একের পর এক ট্যাক্সি হাতছাড়া হয়ে ছুটে যেতে থাকে তাই, দল বেঁধে পুলিশের সঙ্গে তকরারে রত হই আমরা, শিশুরা এবং মহিলাদের কেউ কেউ শ্রান্ত হয়ে বসে পড়েন মালপত্রের ওপর, আর পুলিশ নির্বিকার তাকিয়ে থাকে কৃষ্ণাচতুর্দশীর আকাশের দিকে। কাল কালীপুজো, স্টেশনের ঠিক লাগোয়া বহিরঞ্চলে খুদে একটা পুজোর আলোকসজ্জার আয়োজনে মেতে আছে স্থানীয় কিছু মাস্তান, এগিয়ে এসে তারা জানতে চায় ব্যাপারটা ঠিক কী, কিসের এত গোলমাল। সমস্যার স্বরূপ জানবার পর উদারহাস্যে তারা বলে: 'চলে যান দাদা, যেভাবে বলছে চলে যান। এরপর তো কিছুই আর পাবেন না, বালবাচ্চা নিয়ে বিপদে পড়ে যাবেন। পুলিশ? ফুঃ, পুলিশ কী করবে!'

স্বকর্ণে শুনে পুলিশও বেশ সবিনয়ে মেনে নেয় এই তাচ্ছিল্যবচন।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আমাদের দলটাই শুধু পড়ে আছে একা, আর কোথাও কেউ নেই। নীতির প্রশ্নে যারা একত্র হয়েছিল অল্প আগে, বেশ দ্রুতই ভাঙন লেগেছে তাতে। রাত তখন সাড়ে দশ।

তেমন কিছু নয়, মিটারে যেখানে তিরিশ টাকা লাগত, দাবি সেখানে একশো টাকার মাত্র। রাতবিরেতে এ তো হতেই পারে। কিন্তু টাকার পরিমাণটা নয়, আমাদের বিঁধতে থাকে দাবির অন্যায্যতাটা। আমরা ভাবিত হয়ে পড়ি আইনশৃঙ্খলার সুবিন্যাসের প্রশ্নে, জগজ্জীবনের নীতিনিয়মের প্রশ্নে। তারপর যখন 'কেনই-বা যাবেন না' বলে সরোষে একটা ট্যাক্সিকে বীরের মতো পাকড়ে ধরেছি হাতে এবং সেই ট্যাক্সি যখন উত্তরহীনভাবে বিপুলবেগে ধেয়ে গিয়েছে দূরে, সে-বেগের ঘর্ষণে হাতের তালু যখন ছড়ে গিয়ে রক্তমাখা, প্রবলতর নীতিবোধে সেই মুহূর্তে সাব্যস্ত করি যে ফিরবই না আজ বাড়ি, রাতটা আজ কাটিয়ে দেব হাওড়াতেই।

মনে মনে অনেকদিনের একটা সাধ ছিল যে কলকাতারই একটা-কোনও হোটেলে কাটিয়ে দেব দু-একটা দিন। সে-সাধ মিটিয়ে নেওয়ার সুনীতিময় এক সুযোগ এসেছে আজ, মনে হল। ধরা যাক, বেড়ানো আমাদের শেষ হয়নি। ধরা যাক, আজ রাত্রিটা আরও একটা হোটেলবাস। চলো তাহলে যাই, ওই তো সামনেই পড়ে আছে যাত্রীনিবাস।

সকলেই পরম অবসন্ন বলে এতে আর আপত্তি হল না কিছু। পায়ে পায়ে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম হাওড়ার যাত্রীনিবাসে। কোথায় যাচ্ছি আমরা, না-ই যদি যাচ্ছি কোথাও তবে একরাতের জন্য এখানে থাকবার মানে কী, কেন ফিরে যাচ্ছি না নিজেদের ঘরে— এইসব হাজার কৈফিয়ত দেওয়ার পর তিনশো টাকার বিনিময়েই পেয়ে গেলাম একখানা দমচাপা ঘর। তার অপরিচ্ছন্নতা আর ভ্যাপসা গন্ধের মধ্যে বসে রাস্তা-থেকে-কিনে-আনা ঠান্ডা কচুরি খেতে খেতে একজন ক্ষীণ প্রশ্ন তুলল এর চেয়ে একশো টাকা দিয়ে বাড়ি চলে যাওয়াই সংগত হত কি না।

কিন্তু নীতির জয় হল ভেবে আমি তখন শহরের দুর্ব্যবস্থা নিয়ে বিধ্বংসী একখানা চিঠি লিখবার ভাষা তৈরি করছি মনে মনে। ঝুলপড়া সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে তখন আমার খুবই একটা তৃপ্ত মনোভাব।

না লিখলেও হয়তো চলে যে পরদিন সকালে বাড়ি ফিরে আর লেখা হল না সেই চিঠি। শহরের সুব্যবস্থা ফেরাবার আন্দোলনটা নিতান্ত অপূর্ণই থেকে গেল তাই।

২

কিন্তু আমাদের আজকের গল্পটা ঠিক ওই না-লেখা-চিঠি নিয়ে নয়। আরও একখানা চিঠি লিখবার কথা ভেবেছিলাম আজ থেকে বছর কুড়ি আগে, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় ফিরবার পথে, সেইটে নিয়েই বলবার কথা আজ।

একটা কাজের সূত্রে যেতে হয়েছিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফিরে আসছি কাজশেষে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ, সেই সুবাদে টিকিট হয়েছে প্রথম শ্রেণীর। দার্জিলিং মেল। নির্ধারিত কামরার একেকটা খুপরিতে চারজনের শোবার ব্যবস্থা। বারো ঘণ্টার পথ, তার বড় অংশটাই কেটে যাবে ঘুমে। তবু একটা কৌতূহল থাকে কারা হতে পারেন ওইটুকু সময়ের অন্য তিন সহযাত্রী, কতটা ভালো বা মন্দ কাটবে সেই সময়টুকু।

ঢুকেই মন ভালো হয়ে যায়, কেননা সেখানে বসে আছেন আমার অতিপরিচিত দুই সহকর্মী, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় আর যশোধরা বাগচী। ওঁরাও এসেছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েই, এসেছিলেন ইংরিজি বিভাগের কোনও কাজে। দেবব্রতর সব সময়েই প্রসন্ন উজ্জ্বল সহাস্য মুখ, স্বল্পভাষী তাঁর নিচুগলার কথায় কৌতুকের বিভা ফুটে বেরোয় সব সময়। এমন আচমকা তাঁর মতো একজন পথসঙ্গী পেয়ে যাওয়া বেশ একটা ভাগ্যের কথা। সময়টা তাহলে ভালো কাটবে, এই নিয়ে পরস্পর কথা বলছি যখন, ঠিক তখনই পৌঁছলেন খুপরির চতুর্থ সদস্য। দেখেই সমস্বরে আহ্লাদ জানালাম আমরা, কেননা তিনিও আমাদের পরিচিত। তাঁর নাম নির্মল বসু, আমাদের একেবারে সমকালীন ছাত্র-আন্দোলনের অন্যতম নেতা, ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য, তখনকার বামফ্রন্ট সরকারে তিনি প্রভাবশালী এক মন্ত্রী।

দেবব্রত বললেন: 'তাহলে ভালো ঘুম হবে আজ। একজন মন্ত্রী আছেন সঙ্গে, কোনও চিন্তাই আর রইল না।'

'কেন, আপনারা কি খুব চিন্তায় পড়েছিলেন?'

'চিন্তা নয়? পথেঘাটে কত উৎপাত। হঠাৎ যদি ডাকাত পড়ে? এবার আর তাতেও কোনও ভয় নেই। মন্ত্রীশান্ত্রি দেখলে নিশ্চয় পালাবে তারা।'

এ-রকম কথা হলে সে-আমলে বলা হত বামফ্রন্ট বিরোধী ষড়যন্ত্র। দেবব্রতকে বললাম: 'ডাকাত-টাকাত নিয়ে কথা উঠছে কেন, আপনিও আজকাল ষড়যন্ত্রে অংশ নিচ্ছেন নাকি?'

হাসাহাসিতে মুছে গেল কথাটা।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। দূর-থেকে-দেখা তিনসুকিয়ার আলোর বিন্দুগুলি মিলিয়ে গেছে। দেশ রাজনীতি শিক্ষা আর টুকিটাকি গল্প নিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে রাত। নীচের দুই শয়ানে মন্ত্রীমশাই আর যশোধরা, ওপরে দেবব্রত আর আমি। ঘর অন্ধকার হল। তারই মধ্যে দুচারটি স্বর জাগতে জাগতে হঠাৎ একসময় থেমে যায় সব। ট্রেনের ঝিকমিক আওয়াজ আর ছন্দোময় দুলুনিতে ঘুম এসে যায় চোখে। আর, ঘুম ভাঙতে ভাঙতেই তো পৌঁছে যাব শিয়ালদা।

ভোর-ভোর সময়ে, যেন বহুদূর থেকে ভেসে-আসা গলার আবছা কিছু শব্দ, যেন কুয়াশার মধ্য থেকে উঠে-আসা মোছা-মোছা আওয়াজে গম্ভীর চা-গরম চা-গরম ডাক, গভীর ঘুম থেকে তন্দ্রা, তন্দ্রা থেকে জেগে-ওঠা— উঠে বুঝতে পারছি গাড়ি আছে দাঁড়িয়ে।

'কোথায়? বর্ধমান?'

'হ্যাঁ, এই ছেড়ে যাচ্ছে বর্ধমান।'

আবার চলতে শুরু করে ট্রেন। আমরা শুয়েই আছি। যশোধরা উঠে দাঁড়ান, দরজা খুলে বেরিয়ে যান করিডরে।

খানিক পরে শুনতে পাই কারও সঙ্গে যেন উচ্চকণ্ঠ কথা চলছে যশোধরার। আরও পরিচিত কারও দেখা পেলেন কি? একটু যেন তপ্ত স্বর? কোনও সমস্যা হল কি তবে?

ভেবে উঠবার আগেই ঘরে ঢুকে যশোধরা বললেন: 'শুয়ে তো আছেন সবাই। বাইরে গিয়ে দেখুন কী কাণ্ড হচ্ছে! কী হচ্ছে এসব? লোকে কি যাওয়া-আসারও পথ পাবে না?'

'কী হল?'

'উঠে দেখুন না কী হল। সমস্ত পথটা জামাকাপড়ে ভরে ফেলেছে, গোটা ট্রেনটাই খুলে ফেলেছে— কারা এরা?'

কৌতূহলবশে লাফ দিয়ে নামি নীচে। জামাকাপড় মানে? অতখানি লম্বা করিডরে জামাকাপড়ে ভরে দেবে কে?

দরজার সামনে গিয়ে, এপাশে ওপাশে তাকিয়ে, হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় বোধের সঞ্চার হল। ভোরের প্রথম আলোয় এমন সুশোভন দৃশ্য বড়-একটা চোখে পড়ে না সহজে। কামরার সারি সারি জানলার নীচে যে শ্বেত সমর্থ মসৃণ আবরণ, তার ভেতরটা যে এত সুরম্যভাবে ফাঁপা, তা তো কখনও বুঝিনি আগে! ছোটখাটো যন্ত্রপাতি দিয়ে লম্বালম্বি সে-আবরণের সবখানি খুলে ফেলেছে দুটি শক্তপোক্ত যুবা, আর তার মুক্ত অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে রাশিরাশি সুদৃশ্য মূল্যবান বিচিত্র বস্ত্রসম্ভার। দ্রৌপদীরই বসনের মতো তার আর শেষ নেই কোনও। নীরব সহিষ্ণুতায় একটি বস্তার মধ্যে সেগুলি ভরে ফেলছে যুবাদুটি। একজন বার করে আনছে, অন্যজন ভরছে। আমাকে দেখে সৌজন্যভরে পথ করে দেয় তারা:

টয়লেটে যাবেন? চলে যান এই পাশ দিয়ে দিয়ে— কোনও অসুবিধে হবে না।'

'তা তো হবে না, কিন্তু এটা আপনারা কী করছেন?'

'দেখতেই তো পাচ্ছেন কী করছি। একটু পরেই নেমে যাব আমরা। আপনাদের কিছু অসুবিধে হবে না। যাবেন? যান—'

'না, যাবার জন্য নয়, আপনাদের কাণ্ডটা দেখতেই এসেছি।'

বলতেই বলতেই নির্মল বসু এসে দাঁড়ালেন পাশে। আমাদের কথা থেকে যতটুকু আভাস পাচ্ছিলেন তিনি, তার থেকে ব্যাপারটা পুরো তখনও ধরতে পারেননি তিনি। ঘটনাটা চোখে দেখবার পর, ক্ষণিক বিহ্বলতা এল তাঁর। প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠবার পর, গলায় বেশ প্রভুত্বের স্বর নিয়ে হেঁকে উঠলেন তিনি: 'এসব কী হচ্ছে এখানে? ভেবেছ কী তোমরা, হ্যাঁ? কী হচ্ছে এসব?'

তারা উত্তর দিল না। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে চটপট শেষ করতে লাগল তাদের আরব্ধ কাজ। যশোধরা পাশে এসে বলছেন: 'একেবারে মন্ত্রীমশাইয়ের চোখের সামনেই ঘটছে এসব!' যুবাদুটিকে বললাম আমি: 'জানেন ইনি কে?' মন্ত্রী শব্দটা শুনেও জানবার কোনও আগ্রহ দেখাল না তারা। নির্মল বললেন: 'দাঁড়াও। কলকাতায় গিয়ে দেখছি তোমাদের কী করা যায়!' পরম বিরক্তিতে অথচ অসীম প্রত্যয়ে তিনি ঢুকে গেলেন ঘরে। আমরাও।

দেবব্রত ওপর থেকে নামেননি তখনও। গোটা নাটকটার আঁচ পেয়ে মিটিমিটি হাসছেন শুধু। বলছেন: 'সকালবেলায় একটা পুণ্যদৃশ্যই দেখলেন বলুন। মন্ত্রীমশাইয়েরও দেশ দেখা হয়ে গেল।'

নির্মল তখনও ধাতস্থ হতে পারেননি। বলছেন: 'আশ্চর্য! এইরকম চলবে না কি?'

বলি: 'চলছে তো! কোনও জড়তা কি দেখলেন ওদের? কেমন শান্ত আর মিষ্টি স্বভাবের ছেলেদুটি, তাই না?'

যশোধরা জিজ্ঞেস করলেন: 'পুলিশ দিয়ে কি এসব বন্ধ করতে পারবেন ভাবছেন? সহজ হবে বলে মনে হয় না।'

মন্ত্রী বললেন: 'দাঁড়ান। নামি আগে কলকাতায়। তারপর দেখাচ্ছি এদের। সবকটাকে শায়েস্তা করব।'

ওপর থেকে এল দেবব্রতর স্বর: 'ভাবুন একবার কাণ্ডটা! এক গাড়ি চোরাই মাল নিয়ে চলেছেন মন্ত্রীমশাই! আচ্ছা, কলকাতা পর্যন্ত এদের পাবেন তো?'

'পাব না? যাবে কোথায়?'

বিলাপরত আমাদের স্তব্ধ করে দিয়ে ঠিক এইসময়ে যুবাদুটির মধ্যে একজন ঢুকে এল ঘরে। তার সঙ্গে সেই বস্তা, গলায় গলায় তখন ভরে উঠেছে সেটা। গলা মানে শুধু বস্তারই গলা নয়, উঠে দাঁড়িয়ে দেখি আমারও গলা পর্যন্ত তার উচ্চতা। ভেতরে জামাকাপড়ের সম্ভারে সুন্দরভাবে সুগোল হয়ে উঠেছে তার অবয়ব। নধর সেই বস্তাখানা দাঁড় করিয়ে রেখে যুবকটি ওপরের দিকে তাকায়। খুবই

বিনীত স্বরে দেবব্রতকে জানায় সে: 'একবার একটু নেমে আসবেন স্যার?'

'আমি? আমাকে নামতে হবে? কেন?'

'একটু কাজ আছে ওখানে। অল্প সময়েই হয়ে যাবে।'

বিস্মিত দেবব্রত নেমে আসেন নীচে। যুবাটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে যায় ওপরে, আর দেবব্রত যেখানে পিঠ রেখে কাত হয়ে ছিল, খুলে ফেলল সেখানকার একটা চৌকো চাকতি। এও তবে ফাঁপা? হ্যাঁ, ঠিক তাই। ফাঁপা সেই চৌকো গহ্বর থেকে পি সি সরকার-ভঙ্গিমায় ছেলেটি বার করতে থাকে রংবেরঙের কাপড়, আর ভরতে থাকে তার বস্তায়।

আমরা ঠাট্টা করি দেবব্রতকে: 'এই তাহলে ব্যাপার? সারা রাত পিঠের পিছনে এইসব আগলে রেখে কিছু-না-জানা মুখ করে শুয়ে আছেন? এই জন্য উঠছেন না কিছুতেই? বুঝুন মন্ত্রীমশাই, কাদের সঙ্গে চলেছেন!'

আহ্লাদিত দেবব্রত ততক্ষণে আলাপ জুড়ে দিয়েছেন যুবাটির সঙ্গে। একটু পরে আমরাও গলা মেলাই। জানতে চাই কোথা থেকে আসছে এসব, কোথায়-বা যাবে। জানতে চাই, ধরা পড়তে পারে ভেবে ভয় হয় না কখনও? জানতে চাই তাদের দলবলের কথা।

সেসব বলেও যায় সে। বলে যে, জিনিসগুলি ভরে দেওয়া হয় শিলিগুড়ি থেকে। আর সেখানে আসছে লুকোনো-পথে নেপাল থেকে। 'কেন, এসব জানেন না আপনারা? এ তো রোজই হচ্ছে।'

'রোজ? রোজই আপনারা এই ট্রেনে থাকেন?'

'আমরাই যে থাকি তা নয়। আমাদের ডিউটি সপ্তাহে দুদিন করে।'

'তবে যে বললেন রোজ?'

'অন্যদিন অন্যরা করে। ডিউটি ভাগ করা আছে।'

'অন্যরা মানে? আপনাদের বন্ধুবান্ধবরা? কতজন আছেন?'

'বন্ধুবান্ধব নয়। এ-লাইনে চারশোজন অপারেট করে। একেক সময়ে একেকজনের ডিউটি, একেক গাড়িতে। দিন ঠিক করা আছে। কামরা ঠিক করা আছে। ওখান থেকে ভরে দেওয়া হয়। নামিয়ে নেওয়া হয় এখানে।'

'তারপর? কী হয় এসব দিয়ে?'

দেবব্রতর দিকে তাকিয়ে— কেননা শুধু দেবব্রতরই পরনে ট্রাউজার— বলে সে অক্লেশে: 'কেন, আপনারা কেনেন, আপনারা পরেন। দেখলেন না কত ভালো ভালো সুটের কাপড় আছে?'

'কোত্থেকে কেনা যায়?'

'কেন, দেখেননি? ধর্মতলায় মেট্রোর সামনে থেকে শুরু করে গ্র্যান্ড হোটেল পর্যন্ত ফুটপাতে ফুটপাতে ঢালাওভাবে পড়ে থাকে তো এসব। দেখেননি? সেখান থেকে আপনারাই তো স্যার কিনে নেন এসব। সস্তাই হয় তাতে। আপনি যেটা পরে আছেন তাও হয়তো এসব কাপড়েই করা!'

মন্ত্রী জিজ্ঞেস করেন সরোষে: 'আর কতক্ষণ চলবে তোমাদের এসব?'

'কাজ শেষ হলেই নেমে যাব স্যার।' বলে চৌকো ঢাকনাটা বন্ধ করে দিয়ে ওপর থেকে নেমে আসে সে। এসে, উল্টো দিকের আসনে বসে-থাকা আমার দিকে একটু এগিয়ে, একইরকম স্নিগ্ধ বিনয়ে বলে: 'অল্প একটু পাশে সরে বসবেন স্যার?'

এতদূর দেখার পরেও চমক লাগে আমার, পিঠটাও শিরশির করে ওঠে। এখানেও তবে আছে না কি কিছু? সরে বসি। পিঠ ঠেকিয়ে বসে ছিলাম যে জায়গাটাতে, তারও ঢাকনা খোলা হল এবার, তারও থেকে বেরতে লাগল গোছা গোছা কাপড়, আর ঠোঁটের কোণে হাসি এনে দেবব্রত বলে উঠলেন: 'তবে তো আপনিও! আপনিও তো দেখি আগলাচ্ছিলেন সব!'

কাজ শেষ হল তাদের। ঢাকনা বন্ধ হল। বেঁধে ফেলা হল বস্তার মুখ। গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে দক্ষিণেশ্বরে।

অনেকক্ষণ ধরে ঠুকঠাক শব্দ হচ্ছিল করিডরে। বেরিয়ে এসে দেখি, সবই বেশ ছিমছাম। কামরার গা-টা যে পুরোই খুলে ফেলা হয়েছিল, এখন আর তা বুঝবার কোনও উপায় নেই। পরিচ্ছন্ন, চমৎকার এক মুনশিয়ানার কাজ। আমার চোখের দিকে চোখ পড়তেই একজন বলল: 'সব ঠিক আছে তো স্যার? আমাদের কাজে কোনও গলদ পাবেন না। আপনাদের একটু ডিস্টার্ব করলাম, এই যা! কিছু মনে করবেন না স্যার।'

'মনে তো করব না। তবে একেবারে মন্ত্রীর চোখের সামনে তো! একটু হয়তো মুশকিল হবে আপনাদের, পরে।'

যুবাদুটি পরস্পরের দিকে তাকাল, হাসলও একটু। তারপর আমাকেই অভয় দেওয়ার মুদ্রায় বলল: 'কিসসুই হবে না। মন্ত্রী কী করবে? আচ্ছা স্যার, চলি—'

আরে, যাবে কোথায়? চলি মানে কী? এই তো সবে দক্ষিণেশ্বর ছাড়ল ট্রেন। চলন্ত গাড়ি থেকেই ঝাঁপ দেবে না কি এরা? তখনও-পর্যন্ত-আমার-দৃষ্টির-অগোচর দরজার দিকে এগোয় ওরা, আমি ঢুকে আসি ভেতরে, আর তখনই, কোনও-এক অলৌকিক সংকেতে গাড়ির গতি হঠাৎ শ্লথ হতে শুরু করে। এখানে কেন ঢিমে লয়? কী হল এখানে? জানলায় এসে বাইরের দিকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করি কোনও অঘটন ঘটল কি না।

না, কোনও অঘটন নয়। দক্ষিণেশ্বর থেকে অল্প এগিয়ে যেখানে একেবারেই থেমে গেল গাড়ি, ট্রেনলাইনের একটু পর থেকেই জায়গাটা সেখানে ঢালু হয়ে নেমে গেছে অনেক নীচে। নীচের সেই সমতলে কিছু জলজমা জমি, হয়তো-বা পুকুরও আছে তার মধ্যে। ঢালের ঠিক নীচেই দাঁড়িয়ে আছে কয়েকখানা রিকশা। রিকশার চালকেরা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গাড়ির দিকে তাকিয়ে। গাড়ি থেকে নেমে আসছে বস্তা এবং বস্তার অধিকারী যুবকদুটি। তাদের নেমে যাবার সুবিধে করে,

দেওয়ার জন্য নীচে নেমে দাঁড়িয়েছে রাইফেলধারী শান্ত্রি। তাহলে তো পুলিশও ছিল এই কামরায়? হ্যাঁ, তা তো থাকবারও কথা।

কিন্তু অতগুলি রিকশা যে এ-দুটি যুবকেরই জন্য তা নয়। পাশাপাশি আরও কয়েকটা কামরা থেকে আরও কটা বস্তা এল নেমে, নেমে এল আরও কটি যুবা। বস্তাগুলি গড়িয়ে দেওয়া হল ঢালে, পিছনে পিছনে চলল ছেলেরা। বস্তাসুদ্ধ তারা উঠে পড়ছে এক-একখানা রিকশায়। ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছে। উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে রিকশাগুলিও শুরু করেছে চলা, জলাজমির পাশের পথ দিয়ে। জলাজমির ওপারে কয়েকখানা বাড়ি। সে-বাড়ির দরজাগুলি আধ-খোলা। আর অর্ধোন্মোচিত সেই দরজাগুলির পাল্লা ধরে দাঁড়ানো কয়েকটি নারীমূর্তি। যেন তাঁরা প্রতীক্ষা করে আছেন ওই রিকশাগুলিরই জন্য।

যুবকেরা হয়তো ওখানেই যাবে না, যাবে হয়তো তারা অন্য কোথাও। কিন্তু বিলীয়মান সেই অপেক্ষাতুর দৃশ্যটি দেখতে দেখতে মনে হল যেন যুদ্ধশেষে ফিরে আসছে কোনও বীরের দল, আর গৃহতোরণে মঙ্গলশঙ্খ হাতে নিয়ে তাদের ঘরে তুলে নেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছেন বীরজায়ারা।

জানলা থেকে সরে আসতে আসতে ভাবি, কলকাতায় ফিরেই এ নিয়ে বিশদ একটা চিঠি লিখতে হবে কাগজে। মন্ত্রীমশাইয়ের বেদনাতুর মুখের কথাও বলতে হবে তাতে।

না বললেও নিশ্চয় চলে, কোনওকালেই আর লেখা হয়নি সেই চিঠি!

'ভ্রমণ' অক্টোবর, ২০০৪

তুন্দ্রার তৃণ

নবনীতা দেব সেন

পূর্ব কথা

ইচ্ছের শুরু ভূগোল বইতে ইগলু-র ছবি দেখে অবধি। ওই স্বপ্নের দেশে যাওয়া যায় না? ছোটবেলাতে মা-বাবার সঙ্গে গিয়েছিলুম মধ্যরাতের সূর্য দেখতে। নরওয়েতে। মনে আছে সেই অভিজ্ঞতা। অসলো থেকে ট্রেনে প্রথমে নারভিক বলে একটি স্টেশনে। সেখান থেকে আবার আরও উত্তরে। সেখানে এমনি ট্রেন যায় না, আরেকটা বিশেষ ট্রেনে যেতে হয়। জায়গাটার নাম ট্রোমসো, সেটি আর্কটিক সার্কেলের মধ্যে অবস্থিত নর্থকেপ-এ। বাবার তো বেড়ানোর শখ প্রচণ্ড, তাই আমাদের নিয়ে চললেন উত্তরমেরু অঞ্চলে, নিশীথ রাত্রের রোদ্দুর দেখাতে। আমার খুব আশা ছিল এস্কিমোদের দেখা পাব। ইগলু দেখব। কিন্তু না, নরওয়ে-সুইডেনে তারা নেই। আলাস্কাতে আছে। সেজন্য আলাস্কা যেতে হবে। মধ্যরাত্রের সূর্যদেব অবশ্য যেমন আলাস্কাতেও আছেন, তেমনই স্ক্যান্ডিনেভিয়াতেও আছেন, তাঁর কোনও বাছাবাছি নেই। কিন্তু এস্কিমোদের বাস আলাস্কায়, গ্রিনল্যান্ডে, আইসল্যান্ডে— ইগলু দেখতে হলে সেই সব দেশে যেতে হবে। নরওয়ে-সুইডেনে যাঁরা থাকেন তাঁরা নরডিক জাতির মানুষ। তাঁদের অন্য কাহিনী, অন্য গাথা, অন্য সংস্কার। ভাইকিংদের জাহাজ ভাসানোর গল্প তাঁদের।

বাবা-মায়ের সঙ্গে ট্রোমসো-তে রাত্রিবাস করে লাভ হয়নি— সূর্য উঠল না— মেঘে ঢাকাই রইল আকাশ। সূর্য ওঠেনি, তবুও রাত্রিভর দিনের আলোয় চতুর্দিক ঝলমল করছে। ভীষণ ভারি ভারি পর্দা দিয়ে হোটেলের জানলাগুলি তাই ঢাকা থাকে, নইলে রাত্রে ঘুম হবে না। বাইরে কন্‌কনে শীত এবং রোদ্দুর, যদিও গভীর রাত্রি, ঘরের ভেতরে হিটারের গরম, আর পর্দার অন্ধকার। আমাদের শেষ পর্যন্ত মধ্যরাত্রের সূর্য না দেখেই ফেরত রওনা হতে হল। বেরগেন থেকে জাহাজ ধরতে হবে, 'ফিয়োর্ড' দেখতে দেখতে স্কটল্যান্ডে গিয়ে ঠেকব— মন খারাপ করে ফিরছি তিনজনে। কিন্তু সূর্যদেব মাঝে মাঝে সূয্যিমামা হয়ে যান। সেই রাত্রেও হলেন, এবং ট্রেনের মধ্যে মহা উল্লাসে বাবা-মা আমাকে, 'খুকু! ওঠ্! ওঠ্! খুকু, ওই

দ্যাখ!' বলে ঠেলাঠেলি করে তুলে দিলেন। ট্রেনের জানলার ভারি পর্দা বাবা সরিয়ে রেখেছেন, যদি সূর্য ওঠা দেখা যায়? সূর্য দেখা দিলেন। আকাশ জোড়া রঙের খেলার মধ্যে লাল টকটকে সূর্য— বাবা বললেন, 'খুকু, ঘড়ি দ্যাখো! রাত দুটো!' সত্যি সত্যিই রাত দুটোর সময়ে আকাশে সূর্য? —ট্রোমসো থেকে নারভিক ফেরবার পথে ট্রেনে সেই স্বপ্ন-স্বপ্ন অবিস্মরণীয় দৃশ্যটি দেখেছিলুম। আমার তখন বারো বছর বয়েস।

গৌরচন্দ্রিকা

কিন্তু বড় হয়ে বিদেশে এসে অবধি বার বার মনে হয়েছে আলাস্কায় যাব। ইগলু দেখব। এস্কিমোদের দেখব। আমাদের তরুণ বন্ধু প্রবাল যখন কাজে আইসল্যান্ডে গিয়েছিল কয়েক দিনের জন্য, তখন ওকে খুব হিংসে হচ্ছিল। একবার গ্লোরিয়া গেল গ্রিনল্যান্ডে। ওকেও হিংসে হল। জগতে হিংসের দ্বারা মাঝে মাঝে কিছু মহৎ কর্মও সাধিত হয়। অন্তত আমার জীবনে হয়েছে। ফাইনাল হিংসেটা হল যখন যাদবপুরের কোলিগ সুদীপ্তা দক্ষিণ মেরুতে ঘুরে এলেন— রঞ্জনের দাদা শংকরের দলে। অত সুন্দর সুন্দর ছবি বেরুল 'দেশ'-এ। আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি— আবার নতুন করে আগ্রহ জাগল, মেরু অঞ্চল দেখতে যাব। দক্ষিণ মেরু তো হবে না, উত্তর মেরুটাই চেষ্টা করা যাক। আলাস্কা। আমেরিকায় তো এত যাতায়াত, কই কেউ তো আলাস্কা যাচ্ছে বলেও শুনিনি।

মনে রাখতে হবে, বছরটা ১৯৮৪-৮৫ ছিল যখন সুদীপ্তা গিয়েছেন। ১৯৮৬তে আমি একটি চমৎকার সুযোগ পেলুম— ইন্দো-ইউ এস ফাউন্ডেশন থেকে আমাকে নিমন্ত্রণ করল, ভারত উৎসবে যোগ দিতে। আমেরিকায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে, কবিতা পড়া এবং বক্তৃতা করার জন্য। দিল্লিতে সাক্ষাৎকারের জন্য ডেকে পাঠিয়ে আমাকেই জিজ্ঞেস করা হল— 'কোথায় কোথায় যেতে চাও? কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে?' ওঁরা আমার খুশিমতো তালিকা থেকে চয়ন করবেন ওঁদের খুশিমতো জায়গা। আমি হার্ভার্ড, কর্নেল, শিকাগো ইত্যাদি দু-চারটে নাম বলেই বললুম— 'আলাস্কাতে কোথাও আমি যেতে চাই এবং মেক্সিকোর কাছাকাছি যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে— যেখান থেকে আমি এক ছুটে মেক্সিকো ঘুরে আসতে পারব।' মহিলা হেসে ফেললেন। 'মেক্সিকোর কাছে? তাহলে তো টেক্সাস... কিন্তু আলাস্কাতে কি তেমন কোনও বড়সড় বিশ্ববিদ্যালয় আছে? আমি খোঁজ করছি। কিন্তু আলাস্কা কেন?' —'আমি যে নর্থ পোলে যেতে চাই। যাবই। একবার ওখানে পৌঁছোলেই যেমন করে পারি আর্কটিক সার্কেলে চলে যাব ঠিক!' মহিলা অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অনেকটা হেসে বললেন— 'এই শাড়িটাড়ি পরেই যাবেন?' আমিও বললুম— 'নিশ্চয়? কেন নয়? প্লিজ চেষ্টা করুন আলাস্কায় একটা লেকচার ফেলতে।' (মহিলার নিজের দেশ ছিল কলোরাডোতে, তাই ডেনভারেও আমাকে একটি লেকচার দিয়েছিলেন!)

নিমন্ত্রণ যখন এল দেখি মেক্সিকোর কাছাকাছি কোনও লেকচার ফেলতে পারেননি বটে, কিন্তু সত্যিই আলাস্কাতে নিমন্ত্রণ দিয়েছেন। অ্যাংকোরাজ শহরে। আমি তো আহ্লাদে আটখানা। এবারে হবে উত্তর মেরু যাত্রা! আমেরিকাতে পৌঁছে প্রথমে শিকাগো। সেখানে আমাকে খুব যত্ন করে নিজের বাড়িতে অতিথি করে নিয়ে তুললেন শিকাগোতে ভারতবর্ষের কনসাল-জেনারেল, অ্যালেন ন্যাজারেথ— (আমাদের কংগ্রেসি মন্ত্রী মার্গারেট আলভার ভাই তিনি। সেটা অনেক পরে জেনেছি!) গোয়ার মানুষ, খুব ভদ্র। 'আনন্দ' নামে আঠারো বছরের পুত্রটির কেমোথেরাপি চলছিল, মাথা ন্যাড়া করা। তারই মধ্যে বাড়িতে অতিথি নিয়ে তুলছেন! কনসুলেটেরই ওপর তলায় ওঁদের ঘরবাড়ি। সামনে বিশাল লেকের শান্ত জল এবং শিকাগোর স্কাইলাইন। আমার ঘরের মধ্যে জানলায় এই দৃশ্য ছাড়া, ছিল অনেক বই। মোটাসোটা একটি বইয়ের মলাট দেখেই তুলে নিই— উত্তর মেরুর তুষারদৃশ্য। আলাস্কা। সারা রাত্রি ধরে মুগ্ধ হয়ে ওই বইটা পড়ি, ছবি দেখি, আর ভাবি। হবে তো? যাওয়া হবে তো? ন্যাজারেথের সঙ্গে এমনি বন্ধুত্ব হয়ে গেল, তাঁকে বললুম আমার মেক্সিকো যাবার ইচ্ছের কথা। সেখানে দুটি বক্তৃতা ঠিক হয়েছে, একটি এল কলেজিও ডি মেহিকোয়, অন্যটা মিউজিয়াম অব আর্কিওলজিতে। থাকব কোথায়? সেটা জানি না। গিয়ে দেখব। ন্যাজারেথ তক্ষুনি তিনটি কাজ করলেন। মেক্সিকোয় আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন অ্যাম্বাসাডারকে ফোন করে, এবং পাসপোর্টটা চাইলেন ভিসা করে দেওয়ার জন্য। অন্য কাজটি এই— বললেন, 'জাপানে তো যাচ্ছেন, থাকবেন কোথায়? খুব এক্সপেনসিভ জায়গা। গিয়ে ঠিক করবেন? ওঃ— মরবেন। দাঁড়ান আমাদের কবি-বন্ধু মাধবন ওখানে অ্যাম্বাসাডার, আপনাকে খুব আদর করবেন'— ন্যাজারেথ জাপানে ফোন করে টোকিওতেও ব্যবস্থা করে দিলেন অ্যাম্বাসাডারের গৃহেই আতিথ্যের। সেসব গল্প পরে একদিন বলা যাবে। কিন্তু উনি মহা দুঃখিত, আলাস্কার বিষয়ে ওঁর করবার কিছুই নেই।

সূচনা

নিউইয়র্কে মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টে হচ্ছিল ভারত-উৎসবের কবি-সম্মেলন। ভারতবর্ষ থেকে দশজন কবির যাবার কথা ছিল, অমৃতা প্রীতম যাননি বলে ন'জন। বাংলা থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আমি আছি। রাত্রে ডিনারে স্থানীয় কবিদের সঙ্গে আড্ডা হয়। আমি যাকেই দেখি তাকেই জিজ্ঞেস করি— আলাস্কাতে কেউ চেনা লোক আছে? —সবাই একবাক্যে বলে, নেই— যেন রিহার্সাল দিয়ে রেখেছে। একদিন কিন্তু অ্যালেন গিন্সবার্গ বললেন— 'ওই তো গ্যারি আছে। গ্যারি বছরে দুবার করে আলাস্কা যায় আর নেভাডা যায়। ওকে জিজ্ঞেস করলে ঠিক বলতে পারবে। ওর চেনা লোক নেই হতে পারে না। এই তো ফিরল আলাস্কা থেকে গত সপ্তাহেই।'

চেপে ধরলুম ছোট্টখাট্টো গ্যারি স্নাইডারকে। সাদা শার্টের ওপরে মেক্সিকান ওয়েস্টকোট, মাথায় একটা টিকির মতো বিনুনি বাঁধা, গ্যারি মানুষটি হাসিখুশি। কিন্তু আলাস্কা বিষয়ে সাহায্য করতে রাজি ছিলেন না। ওঁর ভয় হল, উনি স্পষ্টই বললেন; এভাবে যদি যদু মধু সব লেখকরাই ওঁর মতো করে আলাস্কা যেতে শুরু করে, তাহলে ওখানে গেলে উনি যে স্পেশ্যাল সুযোগ সুবিধেগুলো পাচ্ছিলেন, সেগুলো পাবেন না। আমি বললুম— 'কিন্তু আমি তো এখানে থাকি না, আমি রোজ রোজ কেমন করে আসব? কেনই বা আসব?' —উনি তবু রহস্য ভাঙলেন না। শুধু বললেন— 'আমি তো হিচহাইক করে যাই। তেল কোম্পানির প্রাইভেট প্লেনগুলো নিয়মিত আর্কটিক অঞ্চলে যাওয়া আসা করে। ওখানে এখনও কমার্শিয়াল বা সরকারি গাড়ি ঘোড়ার বা পুষ্পকরথের ব্যবস্থা হয়নি।

তিন হাজার মাইল দীর্ঘ আইস ফিল্ড আলাস্কার প্রসিদ্ধ বরফের মরু পড়ে আছে তেপান্তরের মাঠের মতো, তাতে গাছপালা নেই, পথঘাট নেই, জনমানব নেই। মাঝে মাঝে মেরু-ভালুক, মেরু-হরিণ, এদের দেখা যায়। আমি যদি আর্কটিক অঞ্চলে যেতে চাই তবে আমাকে কোনও একটা তেল কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। প্রাইভেট প্লেন ছাড়া গতি নেই। ওই প্লেন ধরে হিচহাইক করতে হবে।

আমি ওঁকেই ধরি: 'আপনি তো অনেককে চেনন। একটি নাম দিন না। একটি রেকমেন্ডেশন। ফোনে বলে দিন না কোনও বন্ধুকে। আমি তো যাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হয়ে। আমাকে একটু শুধু মেরু-অঞ্চলে যাবার ব্যবস্থাটুকু করে দিতে হবে।' গ্যারি বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তবে ফোন নম্বরটা তো সঙ্গে আনিনি ভাই— সেই নেভাদাতে পড়ে আছে। আমাকে নেভাদাতে ফোন করবেন, দেব।' কবিদের মন বোঝা সোজা? তারপরে নেভাদার মরুভূমির বালিয়াড়িতে কত বালুঝড় বয়ে গেছে, আমি গ্যারি স্নাইডারকে কত শত ডলারের ফোন করেছি (তখনও ফোন এত সস্তা হয়নি আমেরিকাতেও)— উনি আর ফোন নম্বরটা খুঁজে পাননি। তবু, খবরটা তো দিয়েছিলেন, তেল কোম্পানির প্লেনের!

আলাস্কায়

অ্যাংকোরাজ্ শহরটি তত বড় নয়, ফেয়ারব্যাংকসে নাকি বড়সড় বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তবু, মন্দই বা কী? ওঁরা আমাকে রেখেছেন প্রো-ভাইসচ্যান্সেলরের বাড়িতে, প্রফেসর রঘু বাসি একজন চুলদাড়ি কামানো শিখ। তাঁর স্ত্রী ব্রিজ চমৎকার পাঞ্জাবি রন্ধনপটিয়সী। কলেজপড়ুয়া ছেলেটি অবশ্য পাঞ্জাবি ভাষা বলে না, রাজ আমেরিকান। ওদের বসতবাড়িটি একটি টিউডর কাসলের অনুকরণে নির্মিত, সত্যিই একটি দুর্গ। বিশাল। ভেতরেই গোপন একটি গুরুদ্বার-সদৃশ হলঘর আছে গুরু গ্রন্থসাহিব সমেত, ওপরতলায় লুক্কায়িত, চাবিবন্ধ থাকে। রবীন্দ্রনাথের ১২৫ বছর উপলক্ষে আমি বক্তৃতাটি দিলুম, 'রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় নারী।' প্রচুর শ্রোতা ছিলেন— তার মধ্যে এত ভারতীয় দেখে তো আমি

অবাক। শুনলুম অ্যাংকোরাজে ৬০ ঘর ভারতীয় আছেন, সকলেই নিমন্ত্রিত। বক্তৃতার পরে একটি ককটেইল পার্টি ছিল। এটির হোস্ট ভাইসচ্যান্সেলর স্বয়ং। আমার বক্তৃতা তাঁর খুব ভালো লেগেছে। স্লাইড সহ বক্তৃতার এই সুবিধে, চট করে খারাপ লাগে না। তাঁর কিছু বন্ধু-বান্ধবেরও ভালো লেগেছে, আলাপ করিয়ে দিচ্ছিলেন। ইনি এই বিষয়ের প্রফেসর। ইনি এই কোম্পানির ডিরেক্টর। ইনি ... ইত্যাদি। পার্টির পরে রাতে ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল বাঙালিদের বাড়িতে। এখানে ছয়ঘর বাঙালি বাস করেন— তাঁরা সকলেই এসেছিলেন। তাঁদের বাড়িতে ডিনারে গিয়ে খুব মজা হল। আমারই পুরনো কলেজের ছেলে সবাই— তিনজন যাদবপুর তিনজন প্রেসিডেন্সি। সূর্য-আলোকিত রাত্রি— অ্যাংকোরাজের আশপাশের পাহাড়গুলি অদ্ভুত বেগুনি-গোলাপি-রানিরঙের আলোর আভায় উদ্ভাসিত হয়ে অলৌকিক চেহারা ধরেছে— যেন কোনও দিব্যশিশুর আঁকা। যা খুশি রং। সোনারঙের ছড়াছড়ি। এমন দৃশ্য এঁরা রোজ দেখছেন, প্রত্যেকদিন! পাহাড়ের পিছনে সূর্যের উদয় বা অস্ত কিছু একটা ঘটছে— অথবা সূর্য স্থির হয়ে আছেন— অথবা মেদিনী থমকে গেছেন।

একজনদের বাড়িতেই ছ-জনরা জমায়েত হয়ে খুব আড্ডা, খাওয়াদাওয়া (মাছ-ভাত, অবশ্যই, চচ্চড়িও) এবং হারমোনিয়াম বাজিয়ে চমৎকার গান হল। আমি কেবলই ঘ্যানঘ্যান করছি, কী আশ্চর্য, আপনারা এখানে কেউ তেল কোম্পানিতে একজনও কাউকে চেনেন না? তেল কোম্পানির কেউ একটু বলে দিলেই ওই প্লেনে আমি যেতে পারতুম গ্যারি স্নাইডারের মতো! কিন্তু না, কেউ চেনে না, বঙ্গসন্তানেরা কেউই তেল কোম্পানি বিষয়ে উচ্চবাচ্য করলেন না। বাড়ি ফিরে গেলাম— তখন ভোরবেলা, যদিও সারারাতই ভোরবেলার আলো, সারারাত আড্ডা হয়েছে। আগামীকাল ছুটি। রবিবার।

পরদিন আমার হোস্টের কাছে বসে আমি শোকপ্রকাশ করছি। 'একজনও তেল কোম্পানির লোককে চিনি না বলে প্লেনের খবরটা পেলাম না।' অবিশ্বাসী চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকবার পর, উনি বললেন— 'আপনার বাঙালি বন্ধুরা তো প্রত্যেকেই একেকটা তেল কোম্পানিতে কাজ করে! ওরা বলল না?' একথা শুনে আমার মুখের করুণ চেহারা দেখে ওঁর মায়া হল। তারপর একটু ভেবে বললেন— 'কাল তো আমাদের ভাইসচ্যান্সেলর আপনাকে 'আরকো' তেল কোম্পানির ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তাঁকেই বললেন না কেন? ARCO নামটা দেখি সর্বত্র— সত্যি তো? ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করবার সময়ে খেয়াল করিনি। 'খেয়াল করেননি বোধহয়। দাঁড়ান আজ রবিবার। ওঁকে ঘরে পাওয়া যাবে। ডাকছি। কথা বলুন।' মিস্টার সিং ডেকে দিলেন— 'আমাদের বন্ধু ভারতীয় লেখিকা, প্রফেসর দেব সেন, আপনি ওঁরই লেকচারে এসেছিলেন। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।' আমি তো লম্ফঝম্প করে কেঁদে ককিয়ে বললুম— চাই চাই যেতে চাই মেরুতে এখনই'— উনি বললেন— 'মোস্ট ওয়েলকাম। বি মাই

গেস্ট। আমার প্লেন শ্রমিকদের নিয়ে সপ্তাহে একবার যায় ও আসে। আপনি কাল ভোরেই চলে যান। পরের সপ্তাহে আসবেন। একহপ্তা তুন্দ্রা অঞ্চলে আমার গেস্টহাউসে থাকবেন। বরফে বেড়াবেন, লিখবেন যতখুশি। কিন্তু প্লেন কাল ভোর ৭টায় ছাড়বে, আপনার জন্য একটা সিট রাখতে বলে দিচ্ছি, আবার আগামী সোমবার এই প্লেনেই আসবেন'—। আমার দুর্ভাগ্য, আমার থাকা হবে না। তার আগেই মেক্সিকো যাচ্ছি এখান থেকে। বক্তৃতার তারিখ বাঁধা। কালই ফিরে আসতে হবে, ওই প্লেন যখন ফিরবে সন্ধেবেলায়। একহপ্তা মেরু অঞ্চলে আতিথ্যের স্বর্ণ-সুযোগ হাতছাড়া হল। —'কিন্তু কাল যে মেরু-অঞ্চলে যাবেন, আপনার পোশাক-আশাক কই?'— মিসেস বাসি উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন। 'আমার জামাজুতো প্যান্ট কোট কিছুই তো আপনার হবে না!' আমি ১৯৮৬-তে তন্বী ছিলুম। অগত্যা ফোন করলুম আমার বাঙালি বন্ধুদের। 'তোমরা আমার ভয়ে কেউই তো বললে না— একজনও না— তোমরা প্রত্যেকেই তেল কোম্পানিতে কাজ করো? অত হন্যে হয়ে খুঁজছিলুম একজনকে! যাকগে— ARCO-র চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা হয়েছে ('হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনি তো আপনার লেকচারে এসেছিলেন') তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কাল সকাল ৭টায় তাঁদের প্লেন যাচ্ছে আর্কটিক সার্কেলে— 'প্রুডহো-বে'-তে, যেখানে আলাস্কার পেট্রোলের পাইপলাইন শুরু হচ্ছে— একহপ্তা থাকতে বলেছেন। পরের প্লেনে ফিরব— ততদিন থাকব— নির্ঝঞ্ঝাটে লিখব— ('খবর্দার না! বোর হয়ে মরে যাবেন! ওটা মরুভূমি') কিন্তু আমার ঠান্ডায় যাবার পোশাক নেই। আমাকে তোমাদের বউদের কোট, স্নোবুট, পুলোভার, টাইটস, দস্তানা, মোজা ইত্যাদি ধার দিতে হবে। ফিরে এসে ফেরত দেব।'— বাঙালিনী বউদের জুতো মোজা দস্তানা কোট টুপি সবই আমার গায়ে দিব্যি ফিট করে গেল। সেই রাতেই তাঁরা সবকিছু যোগাড়-যন্ত্র করে আমাকে পৌঁছে দিলেন, অবশ্য একটু সলজ্জভাবে। কিন্তু একদিনেই ফিরছি শুনে নিশ্চিন্ত হলেন সকলে। ওখানে এঁরা কেউই যাননি— এঁদের ওখানে যাবার দরকার নেই। বিনা দরকারে ওখানে কেউ যায় না। শুধু শ্রমিকরা যায়। একটানা সাতদিন একসঙ্গে কাজ করে। তারপর সাতদিন টানা ছুটি ভোগ করে শহরে ফিরে এসে— সপরিবারে। আবার সাতদিনের জন্য চলে যায় ডিউটিতে। ওই প্লেনে করে যাবে নতুন দলটি। আর ফিরে আসবে পুরনো দল। এইভাবেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডিউটি পড়ে। ওখানেই একটানা চিরদিনের পোস্টিং নিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়, তাতে কাজের মান কমে যাবে, শ্রমিকদের মন মেজাজ ভালো থাকবে না— ওটা তো দ্বীপান্তরেই থাকা! 'ওরকম কর্কশ ওয়ার্কিং কন্ডিশান বলে শ্রমিকদের তুষ্ট করতে নানারকম কম্পেনসেশনের ব্যবস্থা আছে।'— বললেন বাঙালি বন্ধুরা। জানে সবই। বলবে না। পাছে কিছু করতে হয়। —'আসলে তেল কোম্পানিতে কাজ করি বটে, কিন্তু ওসব প্লেনে ব্যবস্থা করে দেওয়ার ক্ষমতা তো আমাদের নেই, তাই আর কিছু বলছিলাম না।' কিন্তু তোমরাও তো আমাকে চেয়ারম্যানের ফোন

নম্বরটা দিতে পারতে? কিন্তু তোমরা না বললেই বা, আমার যাওয়া তো হল? রাখে হরি, মারে কে? পরদিন ভোরে মিসেস বাসি সপুত্রক আমাকে প্লেনে তুলে দিলেন। অবশ্যই সানগ্লাস নিয়ে যেতে মনে করিয়ে দিলেন— নইলে বরফে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে সূর্যের ঝলসানিতে।

যাত্রা

প্লেনে সকলেই পুরুষ। কেবল একটি দম্পতি আছে, তাদের দারুণ ফ্যাশনেবল দেখতে। পুরুষটিকে ভীষণ চেনা চেনা লাগছে। ফিল্মস্টার-টাইপের চেহারা। ফিল্মস্টারই হবে হয়তো, আমি তো কেবল গ্রেগরি পেক আর চার্লি চ্যাপলিন ছাড়া কাউকে চিনি না। তাঁদের মধ্যে কেউ নন ইনি। সঙ্গিনী কোনও মডেল-টডেল হবেন। এঁরা কেন যাচ্ছেন? রহস্যময় হয়ে রইল ওঁদের যাওয়াটা— ওখানেও কি শ্যুটিং হয়? তাহলে তাঁদের তো আলাদা প্লেন যাবে— অনেক লোকজন, যন্ত্রপাতি— ওখানে থাকবেই বা কোথায় সব। শ্যুটিং হবে কেমন করে?

পৌঁছতে, আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এলেন দুজন ভদ্রলোক। সেই রূপবান দম্পতিকে ও আমাকে। জানলুম মহিলা সত্যিই মডেল এবং ভদ্রলোকের ফিয়াসেঁ— ভদ্রলোক CBS নামক বিখ্যাত টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিক। খবর পড়েন ও খবর বিশ্লেষণ করেন। তাই মুখচেনা। ওয়াশিংটন ডি সি থেকে এসেছেন, তুন্দ্রা অঞ্চল বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে। সবান্ধবী। —'ইনি ভারতীয় লেখক ইনিও এসেছেন তুন্দ্রা অঞ্চল বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করতে।' তারপর থেকেই নোটবই বের করে (১৯৮৬-তে লোকে নোটবই বের করে নোট নিত) ঘন ঘন নোট নিতে শুরু করলেন সাংবাদিক ভদ্রলোক। আমারও উচিত ছিল। কিন্তু তাহলে মুহূর্তটা যে পালিয়ে যাবে— উপভোগ করা হবে না। আমি তাই নোট নিলুম না। খুব ভুল। ভুলতে আমার জুড়ি নেই।

আমরা তিনজন ছিলুম সেদিনকার গেস্ট। তিনি মিডিয়ার লোক, তাঁর বান্ধবী মডেল, তাঁরা দুজনেই বলা বাহুল্য ভি আই পি — আর আমি? চেয়ারম্যানের পার্সোনাল গেস্ট, আমি তো ভি ভি আই পি! শাড়ি পরেই গিয়েছি ইচ্ছে করে। শার্ট পেন্টুলুন ছিল না তা নয়। কিন্তু ওই যে দিল্লিতে ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, 'এমনি শাড়ি পরেই যাবেন?'— তাই। তাছাড়া ওখানকার লোকজনরাও তো শাড়ি দেখেনি— ওই তুন্দ্রা অঞ্চলের শ্বেত ভাল্লুক, ক্যারিবু হরিণ, মেরু-হাঁস— ওদেরও তো কিছু নতুন দ্রব্য দেখাতে হবে? এস্কিমোরাও দেখুক। হ্যাঁ এই হচ্ছে এস্কিমোদের দেশ। আলাস্কার উত্তরতম জায়গা— দুটির মধ্যে একটির নাম পয়েন্ট ব্যারোজ সেখানে নাকি একটা ছোট ট্যুরিস্ট স্পট হয়েছে— একটা ডে-ট্রিপ আছে, সেই প্লেনটি ওদের ফেয়ারব্যাঙ্কস থেকে ব্যারোজে নিয়ে যায়, সেদিনই ফিরিয়ে দেয়— ওখানে তারা এস্কিমোদের হাতে তৈরি জিনিসপত্তর কিনতে পারে— এস্কিমোদের বাড়িও দেখতে পারে। কিন্তু না। ইগলু সেখানেও নেই। ওখানে কাঠের বাড়ি

বানিয়ে থাকে এস্কিমোরা। ইগলু এসব অঞ্চলে নেই। এই ট্রিপের খবরটা ভাগ্যিস তেমন কেউ জানে না— গ্যারি স্নাইডারও না। তাহলে আমাকে সেটাই বলত। আমিও একটা প্লেন টিকিট কিনে ওই ফেয়ারব্যাঙ্কে গিয়ে সেখান থেকে আরেকটা প্লেনের টিকিট কিনে পয়েন্ট ব্যারোজে যেতুম— যদিও সেই ট্রিপটার প্রচণ্ড বেশি দাম। খুব এক্সপেনসিভ। কেননা খুব কম লোকে যায়, প্লেন খালিই থাকে। লোকে যায় না বলে দামি, আবার দামি বলেও লোকে যায় না। গিয়ে কী হবে? ওখানে দেখবার কী আছে? উইন্টার স্পোর্টসও নেই। আর এস্কিমোদের হাতে তৈরি গিফট? সে তো যে কোনও 'গিফট শপে ট্রাইবল আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস' বিভাগে বিক্রি হয়। তার জন্য অত টাকা খরচ করবে কে?

এই ধরে-বেঁধে হাওয়াই জাহাজে ফ্রি লিফট নেওয়ায় আমার ট্রিপটা হল একদম আলাদা— নতুন! আমাদের প্লেন থেকে নামিয়ে নেওয়া থেকে প্লেনে ফেরত চড়িয়ে দেওয়া পর্যন্ত যারপরনাই মান সম্মান, যত্ন আত্তি করা হচ্ছিল। তুন্দ্রা অঞ্চলে বেশি ভি আই পি সমাগম হয় না সম্ভবত। আমাদের সঙ্গে দুজন (আমার সঙ্গে একজন, ওঁদের সঙ্গে একজন— যদিও আমরা পাঁচজনই সর্বদা একত্রে ঘুরছি ফিরছি খাচ্ছি দাচ্ছি) গাইড, বা হোস্ট— তাঁরা সমানে ব্যাখ্যা করছেন ওখানকার জীবনযাত্রা, ঘরদোর, কাজকর্ম, পশুপ্রাণী-ঋতুবদল, যাবতীয় বিষয়। কোনও লিখিত মেটিরিয়াল তাঁরা দেননি যেহেতু ট্যুরিস্টদের জন্য তাঁদের কোনও প্রস্তুতি নেই— টিভির খ্যাতনামা সাংবাদিকদের জন্যও না— ভারতীয় লেখিকাদের জন্যও না। তিনি ক্যামেরা এনেছিলেন, ছবি তুলছিলেন— আমিও ক্যামেরা নিয়ে গেছি, ছবি তুলেছি। মাসটা জুনের শুরু। তখন ওদেশে সূর্য অস্ত যান না, নিরন্তর রোদ্দুর— কিন্তু সেদিন আকাশে মেঘ ছিল, ছবি আমার সস্তা ক্যামেরায় ভালো ওঠেনি। আমরা যে এয়ারপোর্টে নামলাম তার নামটি ভালো নয়, ডেড হর্স। ওই অঞ্চলে তো ঘোড়াই নেই, জীবিত বা মৃত। এমন নাম কেন? মেলেনি উত্তর।

এয়ারপোর্টে আমাদের জন্য একটা জিপগাড়ি ছিল যেটি তুষারাবৃত মাটিতে, শক্ত বরফে তৈরি রাস্তার ওপরে চলাফেরা করতে পারে। সেইটি করে আমরা ডেড হর্স থেকে 'প্রুডহো বে'-তে এলাম। এটা সমুদ্রতীরে— সমুদ্র মানে আর্কটিক ওশান।বরফের মধ্য দিয়ে এলাম, বরফ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। একটিও ঘরবাড়ি নেই। গাছপালা তো জানতুম থাকবে না।

তিনঘণ্টা ধরে আমরা যে আলাস্কার আইস ফিল্ড পেরিয়ে এলুম প্লেন থেকে তার দৃশ্য যা দেখেছি তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়— শুধু বরফঢাকা জমিন আর তার মাঝে এঁকেবেঁকে চলেছে Yukon নদী, আলাস্কার আদরের নদী। গোড়ার দিকে কিছু কিছু সবুজ পাহাড়-পর্বত ছিল— তারপর আর রং নেই। এখানে নেমেও রং আশা করিনি। গাড়িটির খাঁকি রং। 'প্রুডহো বে'-র ARCO অফিসে এসে, গাড়ি থেকে নেমে সীমাহীন বরফে দাঁড়ালুম। মই-সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে একটা ট্রেনের মতো দেখতে জিনিসের মধ্যে। সেইটেই অফিস। উঁচু-উঁচু খুঁটি বরফে গাঁথা, তার

ওপরে দীর্ঘ দোতলা ট্রেনের কামরা রাখা বলে মনে হচ্ছে। খুবই কৌতূহলী হয়ে ওপরে উঠি। ভেতরে কী দেখব? এটা কেমনতর বাড়ি? সিঁড়ি দিয়ে উঠে, ভেতরে ঢুকে, অবাক কাণ্ড! ভেতরে রাস্তাঘাট, ঘরদোর— রেস্তোরাঁ, সিনেমাহল, খেলার মাঠ, লাইব্রেরি, সবই আছে। হ্যাঁ খেলার মাঠও। সবই ইন্ডোর, বলা বাহুল্য— ওখানে তো আউটডোর কিছুই সম্ভব নয় আর্কটিক সার্কেলের মধ্যে ৩০০ মাইল ভেতরে, আবহাওয়া যেখানে সমুদ্রকে জমিয়ে থমকে বরফ করে রেখেছে। সারি সারি জাহাজে ট্র্যাফিক জ্যাম!

প্লেনে আসবার সময় থেকেই মুগ্ধতা অপার। মনে মনে কোনও বদ্ধ ধারণা ছিল না কী দেখতে পাব। অপার শুভ্র তুষার ছাড়া— জানতাম না কোথায় কাটাব দিনটা। শুধু তুন্দ্রা...তুন্দ্রা... এই শব্দটাই মনের মধ্যে বাজছিল। প্লেনে তিনঘণ্টা যে আইস ফিল্ড দেখতে দেখতে এলুম সেইটেকেই তুন্দ্রা অঞ্চল মনে হয়, যদিও সেটা তুন্দ্রা নয়। তুন্দ্রা অঞ্চল তারও উত্তরে। আরও শীতল, আরও কঠোর। 'প্রুডহো বে' তুন্দ্রাতে অবস্থিত। এখন আমি যেখানে।

ভূগোলে পড়েছি তুন্দ্রা দু রকমের হয়, অ্যালপাইন আর আর্কটিক। অ্যালপাইন তুন্দ্রা অঞ্চল হল ট্রি লাইনের ওপরে উঠে গেলে, হিমালয়ে যেটা অনেকখানিই রয়েছে— যেখানে উদ্ভিদ নেই, চির তুষারের দেশ। তুষার না থাকলেও, গাছপালা নেই— যেমন সেই তিব্বত সীমানায় তাওয়াংয়ে গিয়েছিলাম। সেটা অ্যালপাইন তুন্দ্রা। আর ইনি হচ্ছেন আর্কটিক তুন্দ্রা। এখানে উদ্ভিদ বলতে ঘাস, আর শৈবাল। প্রাণী বলতে গরমকালে নাকি খুব মশা মাছি হয়, আর ক্যারিবু হরিণ, শ্বেতভাল্লুক, আর দুয়েক রকমের হাঁস জাতের পাখি। ওই ঘাসেও কিন্তু ফুল আসে, বসন্ত কি সোজা জিনিস? এই এতদূরে এসেও শীত মশায়ের রক্ষে নেই— যত অল্প সময়ের জন্যই হোক, তাঁকে একবার তল্পি গুটোতেই হবে। তবে ঘাসপাতা কিছুই তো আমার চোখে পড়ছে না— শুধু সাদা মাঠ। তুষারের তলায় কঠিন বরফ পাথরের মতো জমে আছে। এখানে মাটি নেই। মাটির স্পর্শ পাওয়া খুব কঠিন। জো বলল, (জো আমাকে দেখাশুনো করছে) এই জমিটার নাম পার্মাফ্রস্ট, পায়ের নীচে ১৮ ফুট গভীর এই পার্মাফ্রস্টের স্তর। তারও নীচে মাটি। সেই গভীর পার্মাফ্রস্টের স্তর ভেদ করে, মাটি খুঁজে নিয়ে, তার মধ্যে এরা প্রথমে নুড়ি-পাথর দিয়ে একটা শক্ত স্তর তৈরি করে নেয়। তার মধ্যে পাইলিং করে তার ভেতরে প্রোথিত হয়েছে এই খুঁটিগুলো। তারপরেও ছ ফুট শূন্য জায়গা ছেড়ে রেখে, তবে বাড়িঘর বানানো শুরু হয় মাচা বেঁধে। কেন ছ ফুট ছাড়া? দেশে দেখেছি যেসব জায়গায় খুব বন্যা আসে, তারা খুঁটির ওপরে ঘর বানায়। উত্তরবঙ্গে, আসামেও আছে। এখানে তো বান ডাকে না। তবে মাচার ওপর ঘর কেন? এখানে অন্য সমস্যা আছে। বাড়িতে মানুষজন জীবনযাপন করবে— বাড়ি হিটেড হবে— যদি সোজা বরফের ওপরে বাড়ি বানানো হয় তাহলে সেই উত্তাপে বরফ গলতে শুরু করবে, বাড়িও ডুবতে

শুরু করবে। এই ফাঁকা ছ ফুটে, বাড়ির তলা দিয়ে শীতল বাতাস হু হু করে বয়ে যাচ্ছে, পার্মাফ্রস্ট যেমন কে তেমন শক্ত, শীতল, সুস্থসমর্থ থাকছে। বাড়ির কোনও বিপত্তি ঘটবে না এর ফলে। নতুবা বাড়িটাড়ি তো বরফে বসে যাবে। ডুবে যাবে। তাই ছ ফুট উঁচু খুঁটির ওপরে বাড়ি। খুঁটি আবার বরফের নীচে ১৮ ফুট তো নেমে গেছেই। সেই গ্র্যাভেল প্যাড অবধি। গরম ঘরে ARCO-র কর্মীদের কাফেটেরিয়াতে বসে কফি-ডোনাট খেতে খেতে এসব জ্ঞান সঞ্চয় করছি। আরেকজন ভদ্রলোক CBS-এর দম্পতির দেখাশুনো করছেন, এই টেবিলেই। আমি বলেই ফেলি— 'কিন্তু জো, তুমি তো এস্কিমো নও!'

জো হেসে ওঠে। 'না না, আমি এস্কিমো কেন হব, আমি আলাস্কার মানুষই নই, আমি তো সিয়াটল ওয়াশিংটনের ছেলে। তুমি বুঝি ভেবেছিলে এখানে কেবল এস্কিমোই দেখতে পাবে? আছে। অনেক এস্কিমো ছেলে আমাদের সঙ্গে কাজ করে। ডেকে আনছি। দাঁড়াও'— বলতে বলতে দেখি তিব্বতি চেহারার একটি ছেলে ট্রে-তে খাবার নিয়ে যাচ্ছে— জো ডাকল— 'রন— এই যে এই মহিলা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।' আমি তো ... লজ্জার একশেষ! যথাসাধ্য স্মার্ট হয়ে বলি— 'তোমরাও তো শাড়ি পরা ভারতীয় মেয়ে দেখোনি প্রুডহো বে-তে? দেখে নাও। আমিও এস্কিমো দেখিনি কলকাতাতে। তাই দেখতে চাই। কিন্তু তোমার পোশাকআশাক তো এস্কিমোদের মতো নয়? নামও নয়। এস্কিমোদের তো অন্যরকম নাম শুনেছি, 'উক পিক', 'পুক মাক' ... জাতীয়।' রন হেসে পরিষ্কার মার্কিনি উচ্চারণে বলল— 'হ্যাঁ ওই দুটোই এস্কিমো নাম, আমার এটা আমেরিকান নাম। আমাদের সহজ একটা আমেরিকান নামও থাকে। আর সিলমাছের পোশাক? হ্যাঁ সেও আছে— এখানে পরি না— শীতকালে মাঝে মধ্যে পরি। পোশাক মানে, হুডেড জ্যাকেট, আর ওভার-প্যান্টস আর জুতো। যদি বাইরে দ্বীপে-টিপে যাই— তখন হয়তো— কিম্বা প্লেনে করে যাই—' রনকে দেখতে আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের মতো। বা আমাদের দেশের পাহাড়িদের মতো। শুনেছি বহুযুগ আগে এককালে নাকি স্থলপথে এশিয়া থেকে মানুষ হেঁটে হেঁটে চলে গিয়েছিল নর্থ আমেরিকায়। সেই মানুষরাই আমেরিকান ইন্ডিয়ান। আর আলাস্কার এই বিশাল অংশ সেদিন পর্যন্তও ছিল রাশিয়ার অঙ্গ। 'এক পেনিতে এক মাইল' জাতীয় এক অবিশ্বাস্য দরে সেটি প্রায় বিনামূল্যে রাশিয়ার কাছ থেকে নিয়েছিলেন এক মার্কিন সেনাপতি। তখনও জানা ছিল না কারুরই, — না ক্রেতার না বিক্রেতার— যে ওই বিশাল তুষারগর্ভে কী সোনা লুকনো আছে— আছে পেট্রোলিয়াম।

পেট্রোল উদ্ধারের পরে 'প্রুডহো বে' থেকে তিন হাজার মাইল লম্বা তেলের পাইপলাইন টানা হয়েছে সেই ভালডেজ বন্দর পর্যন্ত। ভালডেজ আলাস্কার দক্ষিণ-পশ্চিমে— খুব সুন্দর ছোট বন্দর শহর— সেখান থেকেই জাহাজে ওঠে তেল— বাণিজ্য করতে যায় দেশে দেশে। পরে সেখানেও গেছি। জলপথে জাহাজ চড়ে।

জো আমাদের দেখাচ্ছিল, ওদের বাড়িঘর। ওই খুঁটির ওপরে এই স্থাপত্য বাইরে থেকে দোতলা ট্রেনের কামরার মতো দেখায়— ভেতরে একদম স্বাভাবিক। সিন্দুকের মতো মোটা দরজা খুলে আমাদের ঢুকিয়ে নিয়েই আবার দরজা বন্ধ! বাইরে তুষার-ঝোড়ো বাতাস বইছে, বয়ে যাক, ভেতরে সুন্দর গরম। কোট কেন, সোয়েটারও পরতে হবে না।

ভেতরে জোর আলো জ্বলছে— ঝকঝক করছে সব— দামি হোটেলের মতো। রাস্তার দুধারে ঘরদোর। রাস্তা মানে ঐ মাইল দীর্ঘ করিডর, কর্মীরা সেখানে জগিং করেন। পথটি মাঝখানে, দুধারে ঘর। তার মধ্যে রেস্তোরাঁ আছে, সিনেমা হল আছে, বার, টেনিসকোর্ট, বোলিং অ্যালি সবকিছু আছে। তাছাড়া কন্ট্রোলরুমটি তো আছেই। ইলেক্ট্রিসিটি, sewage সব ব্যবস্থাই ARCO করেছে। Sewage system-এর recycling হয়, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে। আমরা তো দেখে অবাক! আমি গাঁইয়া দেহাতি ভূত, আমি অবাক হচ্ছি তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু আমার দুটি প্রচণ্ড স্টাইলিশ, আধুনিক ঝকঝকে সঙ্গীও আমার সমানই হতভম্ব হয়ে যাচ্ছিলেন কাণ্ডকারখানা দেখে— ভেতরে এতখানি জায়গা আছে, বাইরে থেকে সেটা টেরই পাওয়া যায় না। সকলের রাত্রিবাসের হোস্টেলও এখানেই। লাইব্রেরিও আছে। সবই ARCO কোম্পানির কর্মীদের মনোরঞ্জনের জন্য কোম্পানির তৈরি! এখানে কাজ করতে এসে যাতে মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে না পড়েন কর্মীরা। কাজের বাইরে তাঁদের অবকাশ যাপনের জন্য বিচিত্র বন্দোবস্ত তাই কোম্পানিই করেছে। অবাক হবার কি শেষ আছে। জো আমাকে কন্ট্রোলরুম দেখাতে নিয়ে গেল। একটি হলঘরে গিয়ে দেখি চতুর্দিকে সুইচবোর্ড। ঠিক মনে হল কোনও সায়েন্স ফিকশনের ফিল্মের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। এত বড় ঘরে, এতগুলো সুইচ অপারেট করে কারা? তারা কই? একটি দাড়ি-গোঁফওয়ালা গাইয়ে বাজিয়ে টাইপের আপনভোলা চেহারার রোগাসোগা অল্পবয়সী ছেলে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। জো আলাপ করিয়ে দেয়— এই ঘর থেকে এই ছেলেটি ARCO কোম্পানির সবগুলি অয়েল ফিল্ড একলা কন্ট্রোল করছে! দেখে সত্যি সম্ভ্রম হল— কতটুকু ছেলে কত বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করছে!

প্রসঙ্গত বলি, কদিন ধরে আলাস্কা খুব মনে পড়ছে। সম্প্রতি, আমি একটা ফিল্ম দেখেছি তার নাম 'দ্য ফাস্ট রানার', ছবিটি একজন এস্কিমো ছেলের তৈরি। এটিই এস্কিমোদের তৈরি প্রথম ফিল্ম। এস্কিমোদের জীবনযাত্রা, তাদের নিয়েই করা। ভালো ছবি হিসেবে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক পুরস্কারও পেয়েছে। তাতে প্রাসঙ্গিকভাবে ইগলু তৈরি করা, ইগলুর ভিতর-বাহির ও ইগলুতে বসবাস— সবকিছু দেখে ইগলু বিষয়ে কৌতূহল মিটেছে এবং সেই বিস্তৃত চরাচর ছোঁয়া বরফের জমি দেখে (ছবিটি আলাস্কারই) আবার খুব মন কেমন করছিল 'প্রুডহো বে'-র জন্য। নতুন করে মনে পড়ে যাচ্ছিল ১৯৮৬-র সবকিছু।

আবার সেই তুষার মেরুভূমির উট— জিপগাড়িতে চড়ে আমরা বেরুলাম— এখানে দুটিই মাত্র গাড়ি আছে। একটি মালবহন করে, একটি মানুষ। অয়েল রিগ দেখতে যাব। যে পুণ্য কুয়োতলায় প্রথম পেট্রোলিয়াম পাওয়া গিয়েছিল। সেই রিগটি এখনও অক্ষত, যত্ন করে রাখা আছে, যদিও সেটার ছাদ নেই। একমাত্র সেটিতেই ছাদ ছিল না। আরও দূরে অন্য অন্য নতুন যেসব কূপ খনন করা হয়েছে সেখানে বেশি কর্মশক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি লেগেছে, সেগুলিতে ছাদ আছে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে সেই বিখ্যাত ট্র্যান্স আলাস্কান পাইপ-লাইন। আর্কটিক সার্কেলের মধ্যে তিনশো মাইল গভীরে চলে এসেছি। মোটা মোটা পাইপ পাতা রয়েছে সাদা বরফের ওপরে। কলকাতায় রাস্তায় যেমন বড় বড় পাইপের কাজ হয়, যার মধ্যে আমাদের নামহীন পথবাসীদের ঘরকন্না রোদবৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচিয়ে— তার চেয়েও স্থূল আরও বিশাল বিশাল পাইপ। একটির ধারে একটা স্তম্ভ— সেটি মাইলস্টোন, তাতে 'জিরো-মাইল' লেখা। অর্থাৎ এখান থেকেই যাত্রা আরম্ভ হল। ভালডেজে গিয়ে যাত্রা থামবে। সেখানে মাইলস্টোনের গায়ে '৩০০০ মাইল' লেখা আছে। শুরু দেখলুম, কপালে ছিল, শেষও দেখা। এরপরে আমি 'ভালডেজ'-এও গেছি। অ্যাংকোরাজ থেকে আমি একটি চমৎকার ট্যুরিস্ট ট্রিপ নিয়েছিলুম জাহাজে আর বাসে মিলিয়ে— প্রধানত জাহাজে— তাতেই ভালডেজ পর্যন্ত গিয়েছি। সেখানেই রাত্রিবাস করেছিলাম। একটি এস্কিমো মেয়েও ছিল সেখানে— তারও নামটি সুবিধার জন্য মার্কিনি করা। সেই ট্রিপটিতে আমি যে কী না দেখেছি, কী না শিখেছি। সেটায় অবশ্য এই আর্কটিক ট্রিপের মতো জেদ ধরে শাড়ি পরে যাইনি— জিনস-শার্টই ছিল। আর্কটিকের মানুষজন, জীবজন্তু, উদ্ভিদ যেমন আমি দেখিনি, তারাও তো শাড়িপরা মেয়ে দেখেনি, দেখুক একটু? ফেয়ার-এক্সচেঞ্জ হবে।

তা সেটি হয়েছিল। শাড়ির জন্য কমপ্লিমেন্ট আমরা চিরদিন পেয়ে আসছি। সেই ১৯৫০-এ আমার মা-কে দেখেছিলুম, সর্বক্ষণ পথেঘাটে স্ত্রী-পুরুষের কাছে শংসাপত্র পেতেন। আমিও ১৯৫৯ থেকে সেটি পেতে শুরু করেছি— কিন্তু এখানে সত্যি সত্যি কেউ কোনওদিনও শাড়ি পরিহিত মনুষ্য মূর্তি দর্শনই করেনি। এবং এই অতল নিঃসীম বরফের মধ্যে ফিনফিনে শাড়ি! প্রত্যেকেই এসে প্রশ্ন করছেন, আর ইউ কোল্ড? বাঙালিনীদের দেওয়া কোমর পর্যন্ত লম্বামোজা, মোটা উলের টাইটস পরেছি পেটিকোটের নীচে। তাই ফুরফুরে লাল-সাদা প্রিন্টেড নাইলনের পাতলা শাড়িটি দেখে সকলেই বিভ্রান্ত হচ্ছেন। জানেন না কেউ টাইটসের ওপরেও হাঁটু অবধি স্টকিংস আছে! বেচারি ঠান্ডা ঢুকবে কোথা দিয়ে? এমন কিছু ঠান্ডা ছিলও না— বাতাস না বইলে তো ঠান্ডা কষ্ট দেয় না? হাওয়াটাই যা প্রাণঘাতী, নাকচোখ যেন কেটে ফেলে, তীক্ষ্ণ শান-দেওয়া ছুরির ফলার মতো হাওয়া। হাওয়া না বইলে চমৎকার। ওইদিন আমরা হাওয়ায় তেমন কষ্ট পাইনি। হাওয়া বইলে বাইরে থাকাও যায় না, স্নো ওড়ে, কিছু দেখাও যায় না। দেখার অবশ্য ছিলই বা

কী? — 'ক্যারিবু হরিণেরা এখনও বিশেষ বেরোয়নি খাদ্য খুঁজতে, হাঁসেরাও তেমন উড়ে আসেনি এখনও, ফুলও ফুটছে না ঘাসে ঘাসে।' — বলল জো। ফুল? ঘাসই তো দেখছি না। ঘাস কই? 'ওই যে, ওই তো ঘাস।' ঘাস? কই ঘাস? বরফের ওপরে চৌকো একটুকরো পাপোশ পাতা আছে দেখলাম। ব্রাউন রঙের। যেমন হয়, বনেদী ছোবড়ার পাপোশ। ওখানেই হঠাৎ কেন পাপোশ পাতা? কোনও দরজা তো নেই সামনে। দরজা কেন, কোনও ঘরবাড়িই তো নেই। পাপোশ শুকোচ্ছে একটা বরফের মাঠের মাঝখানে। আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা এ দেশের।

'ওটা তো পাপোশ। ম্যাট তো ওটা।'

'না, ওটাই ঘাস। তুন্দ্রা-গ্রাস্‌। ম্যাটলাইক ভেজিটেশন'—

'আমি নামব। আমি দেখব। কাছ থেকে দেখব। গাড়ি থামাও।' গাড়ি থামতেই— আমি তো লাফিয়ে নেমে হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে পড়েছি পাপোশের ওপরে, ঘাসের ঘাসত্ব দেখব বলে। আরে, সত্যি তো? কুচি কুচি ব্রাউনরঙের ঘন ঘন ঘাসই তো! আমাদের দেশে রোদে শুকিয়ে গেলে ঘাসের যে অবস্থা হয়, তেমনই। শুষ্কং তৃণং তিষ্ঠত্যগ্রে! আমি হাত বাড়িয়েছি, একগুচ্ছ তুন্দ্রার তৃণ তুলে নিয়ে যাব মার জন্য, পিকো-টুম্পার জন্য, মাদুলি করে রেখে দেব জন্মের শোধ— তুন্দ্রার তৃণগুচ্ছ বলে কথা— সবাইকে তাক লাগিয়ে দেব... জো খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেলল সজোরে এবং কঠিন স্বরে বলল, 'এক্কেবারে ছোঁবেন না। স্পর্শ করা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। তুন্দ্রা গ্রাস হচ্ছে অমূল্য জাতীয় সম্পদ— সুরক্ষিত! শুধু ক্যারিবু হরিণরা আর হাঁসেরাই ওতে মুখ দিতে পারে— আপনি হাত দিলেই পুলিশে বিশাল জরিমানা করবে আপনাকে', মাত্র একটাই তৃণের কণা। নিলে কি এমন ক্ষতি হত? তুন্দ্রা-তৃণেরও তো ভারতবর্ষে যাওয়া হয়নি কোনওদিন? এত বড় একটা ঐতিহাসিক— ঘটনা ঘটত, জো, আপনি তাতে বাধা দিলেন? কিন্তু বাধা তো দেওয়া হয়েই গিয়েছে। এবং CBS নায়ক-নায়িকা এতক্ষণে আমার একটা বন্য, গ্রাম্য কর্ম দেখে সত্যিই পরিতৃপ্ত। চোখেমুখে উন্নততর প্রাণী হওয়ার তৃপ্তিসুখ ফেটে পড়েছে এতক্ষণে। সমস্যা হচ্ছিল, এই গাঁইয়া ভারতীয় লেখিকা আর তাঁরা সমান সমান মর্যাদা পাচ্ছিলেন— তাঁরা আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করছিলেন না। ওই একবারই যা ভিজিটিং কার্ড দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল মাত্র। ওদের সঙ্গে আরও একজন গাইড থাকায়, ওদের আর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজনও হচ্ছিল না যদিও আমরা একই গাড়িতে। একই সঙ্গে। এবং ধু-ধু মেরুপ্রান্তরে শুধু আমরা ছাড়া ভিন্ন জনপ্রাণী ছিল না।

আমি সমুদ্রের তীরে যেতে চাইলুম— পাশেই তো আর্কটিক ওশান। সমুদ্রে একটু নামতে হবে না? এটা তো সামার। সেদিন সূর্য ছিল না। যদিও দিবালোক ২৪ ঘণ্টাই। সেদিনটা ছিল মেঘলা। সামারে 'বিচ'-এ যাব না? মেরু অঞ্চলে আছি বলে কি পৃথিবীতে নেই?

জো বলল, 'চলুন বিচ-এ নিয়ে যাচ্ছি। তবে বিচ-এ নয় আমরা সমুদ্রেই ছিলাম

এতক্ষণ। ওই অয়েল-রিগ তো সমুদ্রবক্ষেই।

—'সমুদ্রবক্ষে?'

—'এখন তো সমুদ্র ফ্রোজেন। গলতে গলতে জুলাই-আগস্ট। তারপরই আবার ফ্রিজ করে যাবে। এখানে ষাটদিনের সামার। ষাটদিনের জন্য বসন্ত আসে, ওই ঘাসেই ঘাসফুল জন্মায়, ভারি সুন্দর দেখায়, পাখি আসে, হরিণ আসে। কোথাও কোথাও আর্কটিক অক্স, আর্কটিক ফক্স, আর্কটিক হেয়ার— এসবও আসে, তবে 'প্রুডহো বে'-তে আমি তো শুধু ক্যারিবু, আর হাঁসই দেখেছি নানারকমের'।

—সমুদ্রে জাহাজ লেগেছে। দূর থেকে মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। পর পর অনেকগুলি মাস্তুল। বন্দর।

—'ফ্রোজেন সমুদ্র। তো জাহাজগুলো কেমন করে এল?'

জো হেসে উঠল। 'ওরা কি এখন এসেছে? গত সামারে এসেছিল। এই সামারে ফিরবে। ওরা তো ফ্রোজেন হয়ে আটকে রয়েছে।' 'আমি দেখব! আমি দেখব!' CBS দম্পতি আমার আদেখলে পাগলামি সহ্য করতে না পেরে ঘরে ফিরে যাওয়া মনস্থ করলেন। এর চেয়ে সেখানে একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে বসে দুজনে গল্প করলেও কাজে দেবে। ওঁরা ফিরলেন। আমি চললুম ফ্রোজেন জাহাজ দেখতে।

সত্যি সত্যি জাহাজগুলো পাশাপাশি জমাট বাঁধা বরফের ঢেউয়ের মাঝখানে আটকে রয়েছে, জাহাজের বুক পর্যন্ত বরফে ডোবা। ঠিক যতটা জলে ডোবা থাকে আর কী। আমি বীরগর্বে থপ থপ করে অন্যের বুটজুতো পরে বরফ ভেঙে গিয়ে জাহাজের পাশে ঘেঁসে দাঁড়ালুম। মাঝসমুদ্রে এভাবে জাহাজের পেটে হাত বুলোনোর সুযোগ তো আর পাব না, যেন পোষা বেড়ালের গায়ে, কিম্বা গরুর গলকম্বলে হাত বোলাচ্ছি।

জো-কে দিয়ে আমার ক্যামেরায় বেশ কিছু ছবি তুলিয়েছিলাম নিজের— জিরো-মাইলের পাশে হাস্যবদনে দাঁড়ানো আমি (যেন আমারই কোম্পানির উদ্বোধনী পুজোর দিন), আবার এই বরফ-বন্দী দুর্ভাগা জাহাজদের পাশে— ঠিক বাঘশিকারিদের মুখে যে একটা চাপা, দুর্বোধ্য রহস্যময় অহঙ্কারের হাসি থাকে তেমনই হাসি— হেসে ছবি। পাগলের মতো সব তোরঙ্গ আলমারি তোলপাড় করে বের করেছি আজ সেই ছবি আপনাদের দেখাব বলে— ভালডেজ যাত্রার জাহাজে তোলা ছবিও বেরুল, কিন্তু 'প্রুডহো বে' সেদিন ছায়া ছায়া ছিল। ছবি বড়ই অন্ধকার। ছাপা যাবে না। লাঞ্চের পরে বেশিক্ষণ থাকা হল না, ফিরতি শ্রমিকদের নিয়ে প্লেন ছেড়ে দেবে— সন্ধে ৭টায় নামবে গিয়ে অ্যাংকোরাজে। শ্রীযুক্ত CBS-ও চললেন ফিরে।

কোথায় যে শ্রমিকরা কাজ করে— কীভাবে করে কে জানে? কার্যরত অবস্থায় তাদের কিন্তু দেখা হল না আমাদের। ওদের কাজ কী, আমার না হয় না জানলেও চলে কেননা আমি এসেছি চোখের তৃষ্ণা মেটাতে কিন্তু CBS ভদ্রলোক কী জন্য

এসেছিলেন কে জানে।

ওদের ওই ক্যাম্পে, ওই রেলের কামরা-সদৃশ বাসস্থানে, কিন্তু কোনও দোকান নেই। কোনও স্যুভেনির কিনতে পাওয়া যায় না— তুন্দ্রা-ঘাস তো দূরের কথা, চাবির রিং, বা অ্যাশ ট্রে, যাতে লেখা আছে প্রুডহো বে, 'জিরো-মাইল' (এমনকি পিকচার পোস্টকার্ডও) পাওয়া যায় না ওখানে। ব্যাপারটা তো ট্যুরিস্ট-মুখী নয়, কর্মীমুখী।

জো বলল— 'পয়েন্ট ব্যারোজে চলে যান। সেখানে সবই পাবেন। এস্কিমোদের সাজপোশাকে এস্কিমোরা, তাদের হস্তশিল্প, তাদের বিষয়ে বইপত্তর— ছবি-টবি, স—ব। শুধু ইগলুটা নেই।'

ইগলুই নেই তবে আর যাব কেন? একে তো আমার ওই টিকিট কেনার রেস্ত নেই, কেননা জাহাজে বেড়ানোর প্ল্যান আছে। তার জন্য টিকিট কিনব। আলাস্কার সামুদ্রিক জীবন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। আর্কটিক বলয়ের মধ্যে বেড়াতে পেরেছি, তার মূল্য আলাদা। বরফের মধ্যে দেখে এসেছি তুষার-অনল জ্বলছে— oil flares — পেট্রোলের গ্যাসের আগুন— সে আগুনও নেভে না, আর তাতে বরফও গলে না। অনির্বাণ দীপ্তি। আসামেও তৈলখনির কাছাকাছি এরকম অগ্নিশিখা জ্বলতে দেখেছি। কিন্তু এগুলো জ্বলছে চিরতুষারের কোলে।

আলাস্কার সামুদ্রিক জীবন মানে, দশ হাজার বছরের পুরনো বরফের গ্লেসিয়ার দেখা, ঈগলপাখির সংসার, শুশুকদের খেলাধুলো, তিমিমাছের আহ্লাদেপনা। সিলমাছেদের প্রসূতিসদন এবং শিশুপালন— আরও কত কী দেখা—! মাঝসমুদ্রে বরফের দ্বীপে সিলমাছের আঁতুড় ঘর। মায়েরা সবাই সেখানে এসে সন্তান প্রসব করছেন। আঁতুড়ের ফুল, নাড়ি, এসব পরিষ্কারের ব্যবস্থাও আছে, ঈগলপাখিরা এসে সব সাফসুতরো করে দিয়ে যাচ্ছে— বাচ্চা বা মাকে কিছু করছে না কিন্তু! মায়েরা রোদ পোহাতে পোহাতে পরস্পরের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাচ্চাদের দুদু খাওয়াচ্ছেন— সে যে কী অপরূপ দৃশ্য!

সমুদ্রের ধারে ধারে পাহাড়ে কিছু খুব উঁচু উঁচু প্রাচীন বৃক্ষ আছে— তাদের সবচেয়ে ওপরের ডালে বাসা বাঁধে 'বল্ড ঈগল', সাদা টুপিপরা ঈগল পাখি। বাসাগুলোর সাইজ হয় ৯ ফুট লম্বা ৬ ফুট চওড়া। প্রায় আমার স্টাডির সমান। তাতে ডিম পাড়েন ঈগল জননী। 'কিলার হোয়েল' নাম শুনলেই ভয় করে। দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর। সাইজেও ছোটই। বস্টনের সমুদ্রে যেসব অতিকায় তিমিমাছ দেখেছি, সেখানে লাগে না। চকচকে কালোপিঠ, ধবধবে সাদা বুকপেট, কেবলই ডিগবাজি খেয়ে আমাদের মন ভোলাচ্ছিল তারা, সার্কাস দেখানোর মতো। এতদিন জানতুম শুশুকেরাই এসব কম্মো করে। এখন দেখলুম 'কিলার হোয়েল'-ও ফুর্তিফার্তা ভালোবাসে।

বিরাট সব গ্লেসিয়ার দেখলুম সমুদ্রতীরে। সমুদ্রে ভেসে যেতে যেতে— প্রচুর

তুষারশৈলের শিখর তো দেখা গেলই— এই গ্লেসিয়ারদের বয়স অন্তত দশ হাজার বছর। মাছ ধরবার মতো, খপ করে সমুদ্র থেকে গ্লেসিয়ার ভাঙা বরফ তুলে, কোকাকোলাতে দিয়ে খেলুম— আঃ! দশ হাজার বছর আগের স্বাদ কেমন হয়, একটু তো জেনে নিই? মরলে মরব। মরিনি। কিন্তু এসব হয়েছিল টিকিট কেনা ট্রিপে। —ARCO কোম্পানিতে বিরল আতিথ্যে গিয়েছিলুম অগম্য একটা (দুর্গম?) ঠিকানায়— পয়সা দিয়েও টিকিট কেটে যেখানে যাওয়া যায় না। 'প্রুডহো বে'-তে কোনও কমার্শিয়াল ফ্লাইট নেই। গাড়ি, ট্রেন-তো সম্ভবই নয়— রাস্তা নেই। গ্রেট আলাস্কান আইস ফিল্ড শুয়ে আছে তিন হাজার মাইল জুড়ে। আমার জীবনে তাই 'প্রুডহো-বে ভ্রমণ' একদম অদ্বিতীয় গল্প। তুলনাহীন। চেয়েচিন্তে অতিকষ্টে যোগাড় করেছিলুম স্বপ্নপূরণের মন্ত্র, অনেকদিনের চেষ্টায়, পরিকল্পনায়, নিষ্ঠাভরে প্রাপ্ত এই অভিজ্ঞতাকে ঈশ্বরকৃপা বলব। বরলাভ ছাড়া আর কী? স্বপ্ন পূরণ হল এবং ফ্রি!

প্লেনে হিচহাইক করতে পেরেছে প্লেন হাইজ্যাক না করে, এমন মানুষ জগতে বেশি নেই নিশ্চয়ই?

আমার তাই বেশ একটু গর্ব আছে এই 'প্রুডহো বে' ভ্রমণ নিয়ে। ব্যারোজে মানুষ যায়; এখানে যায় না।

আলাস্কা ভ্রমণ এখন আর অসহজ নেই। পয়সা ফেললেই আমেরিকান কোম্পানির ট্যুর কেনা যায়। এমনকি গ্যালাপাগোস আইল্যান্ডেও— সমস্ত স্বপ্নের দ্বীপেই এখন ট্যুরিস্ট গ্রুপ যায়। শুধু মোহরের থলিটি থাকলেই হল। চাইলে সিল্করুটেও যেতে পারো। আজ সব স্বপ্নই বাস্তবায়িত করা সম্ভব। কিন্তু কে জানে সেটা ভালো, না মন্দ?

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৩

বুনো ঘোড়ার দেশে

নবনীতা দেব সেন

অদেখা কামার্গ

কেম্ব্রিজে, আমার ছাত্রবয়সে, আমাদের ডাক্তারের ওয়েটিংরুমে বসে বসে একটা বিলিতি পত্রিকার পাতা ওল্টাতে গিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলুম একটা ছবি দেখে। ধু-ধু মাঠে একদল সাদা ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে পাশাপাশি, জলাভূমির জল ঘেঁসে তাদের সেই দৌড়— পায়ের দাপটে ফোয়ারার মতো আকাশে ছিটকে উঠেছে নোনাজলের মেঘ— জল আর আকাশের মাঝখান দিয়ে যেন স্বপ্নের মতো ছুটে যাচ্ছে একদল অসহ্য সুন্দর সুঠাম সতেজ সাদা ধবধবে ঘোড়া— কেশর ফুলিয়ে চামরের মতো লেজ দুলিয়ে। স্বভাবত আমি পশুপ্রেমী বটে, কিন্তু খুব একটা অশ্বপ্রেমী ছিলুম না, তেমন অশ্ব দেখিনি বলেই বোধহয়। কিন্তু এই রূপবান ঘোড়ার সারি যেন আমার 'চোখের আঠায় আটকেছে বাঘ, নড়ে বসছে না'!

জায়গাটার নাম কামার্গ, দক্ষিণ ফ্রান্সে অনেকখানি পোড়ো জমি নিয়ে এই অঞ্চল। সেই পত্রিকায় ঘোড়া ছাড়াও ছিল ভয়াল বুনো বাইসনের শিং নিচু করে দৌড়ে যাওয়া, ছিল পরীর মতো গোলাপি ফ্লেমিঙ্গো পাখিদের উড়ে যাওয়ার দৃশ্য। কামার্গের কথা পড়ে আমার খুব হিংসে হয়েছিল সেই সাংবাদিকটির ওপরে, যিনি ওখানে গিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে অপূর্ব ছবিগুলি তুলেছেন এবং প্রবন্ধ লিখেছেন।

ইশ! এদেশে এরা কত কিছু সুযোগ পায়। কত কী দেখতে পায়। কত জায়গায় বেড়াতে যায়। আমার শুধুই ইউনিভার্সিটি আর বাড়ি! বাড়ি আর লাইব্রেরি।

আর বেড়াতে যাওয়া মানেই দেশে যাওয়া। 'ভালোবাসা' আর 'প্রতীচী' এই দুটো বাড়ির মধ্যে ঘুরে ফিরে সময় কাটানো! জীবনে কখনওই দেখা হবে না ফ্রান্সের দক্ষিণের ওই উদ্দাম আরণ্যক বেলাভূমি যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বন্য বাইসন আর বন্য ঘোড়ার দল। ওইখান থেকেই বুনো ষাঁড়ের বাচ্চা ধরে এনে তাদের স্পেনের বুলফাইটের জন্য ট্রেনিং দেওয়া হয়। ওইখান থেকেই ধরে আনা হয় বুনো পুরুষ ঘোড়া, ঘোড়দৌড়ের তেজী ঘোড়াদের বংশবৃদ্ধির জন্য। ফরাসি সরকার ওই অঞ্চলটাকে বন্য রেখেছেন, ইচ্ছে করেই। যাতে ঘোড়াদের ষাঁড়েদের জীবনযাত্রা ব্যাহত না হয়। মানুষের তো অসীম ক্ষমতা নিসর্গকে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়ার। দক্ষিণ ফ্রান্সের নৈসর্গিক দৃশ্যের তালিকায় এই ছুটন্ত বুনো ঘোড়াদের

পায়ের ধাক্কায় ছিটকে-ওঠা সমুদ্রজলের ফোয়ারা একটি অতি জনপ্রিয় দৃশ্য। সারা পৃথিবীর সব পোস্টারের দোকানেই একটা না একটা থাকবে— কামার্গের ঘোড়াদের ছুটন্ত ছবি, নীল আকাশ আর নীল জলের মাঝখানে দুই পা শূন্যে তোলা সাদা ঘোড়া আর সাদা জলের ফেনা, দুটোই ছিটকে উঠছে আকাশে— সেই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে কার না করবে? আমারও করত। কিন্তু কোনওদিন তার সুযোগ আসবে বাস্তবিক ভাবিনি। যেমন আমি জানি আমাদের দেশেও প্রায় এইরকমই বন্য অঞ্চল আছে কচ্ছের 'রান', যেখানে আরবসাগর, আগুনে আকাশ আর নোনা মাটির সন্ধিস্থলে ঠিক এইভাবেই ছুটে বেড়ায় দলে দলে বন্য সাদা গাধার দল। ঘোড়া নয় তারা, কিন্তু খুবই সুদর্শন জীব। কোথাও কিন্তু তাদের পোস্টার দেখি না— তাদের সেই ছুটে যাওয়ার দৃশ্য ট্যুরিস্টদের দেখাতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও দেখি না। ফ্রান্সে কিন্তু আছে। এখন ইচ্ছে করলেই কামার্গের বন্য নিসর্গে ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। ট্যুরিস্ট কোম্পানিদের বাসট্রিপ আছে, যারা কামার্গে নিয়ে যায়। আমি যখন কামার্গের ছবি দেখে কামার্গের প্রেমে পড়ি, আমার তখন কামার্গে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। ছোট ছোট বাচ্চার মা, অতি ব্যস্ত স্বামীর স্ত্রী, এরকম উন্মাদ, উদ্দাম ইচ্ছেই বা তার হবে কেন? কিন্তু না, ইচ্ছে হয়নি তা নয়। সত্যি বলতে কি— ইচ্ছে পূরণের চেষ্টাটা করা হয়নি। সম্ভব নয়, তাই চেষ্টা করিনি। কিন্তু গোপন ইচ্ছেটা স্বপ্নে পরিণত হয়েছিল। ঘন নীল জল আর ঘন নীল আকাশ, তার মাঝখান দিয়ে অদৃশ্য খুরের আঘাতে সাদা ধবধবে ফেনার ফোয়ারা আকাশে ছিটিয়ে সবেগে ছুটে যেত একপাল বুনো সাদা ঘোড়া। ওই পর্যন্তই।

সত্তরের শেষদিকে আমার সেই স্বপ্নদৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ এসে গেল। ঈশ্বরের করুণার সীমা নেই। আমার চাহিদা খুব অল্প— হয়তো তাই যেটুকু চাই তার চেয়ে শতগুণ বেশি করেই তিনি আমাকে দান করেছেন। আমার ঝুলিটা ছোট, তাই সবটা গ্রহণ করতে পারিনি। অনেক, অনেকখানি ফিরিয়ে দিতে হয়েছে গ্রহণযোগ্যতার অভাবে। —হয় আলস্য, নয় স্বাস্থ্য, নয় বিভ্রম, নতুবা অন্য কাজের দায়িত্ব— কিছু না কিছু 'কারণে' অঞ্জলি পাতার সুযোগই হয়নি আমার। ভিক্ষার চালটুকু বিধাত্রীমাতার আঁচলেই রয়ে গিয়েছে বাঁধা। আর আমি থেকে গেছি সেদিনের মতো অভুক্ত।

কিন্তু করুণা সীমাহীন। স্বচক্ষে কামার্গ দর্শনের সুযোগ জীবনে কখনও পাব ভাবিনি। কোথা দিয়ে কখন যে কী পাওয়া হয়ে যায়। ১৯৭৯তে আমি একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রবন্ধ পড়তে aix-en-Province-এ উপস্থিত হয়েছিলুম। আগেও গিয়েছি aix-en-Province-এ— কেম্ব্রিজ থেকে, অমর্ত্যর সঙ্গে। সেবারে ছিল অর্থনীতির সম্মেলন, পেপার পড়ছিলেন তরুণ অমর্ত্য সেন এবং সম্মেলনে ইকনমিক হিস্ট্রিও থাকায়, পেপার পড়লেন তপন রায়চৌধুরী এবং অ্যালিস থরনার ড্যানিয়েল থরনার, এরিক হবসব্যম-এর মতো এখন বিশ্ববিখ্যাত স্কলারেরা। সেবারেও খুব ঘুরে বেড়ানো হয়েছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রতীর ফ্রেঞ্চ

রিভিয়েরায়। ট্যুরিস্টদের ধ্রুপদী স্বপ্নরাজ্যে ঘুরেছিলুম সেবারে আমরা— নীস থেকে নীচে সান রেমো, স্যাঁ রাফায়েল, সান ত্রোপে এইসব চেনা অঞ্চল, লাল রঙের খাড়া পাথরের পাহাড়— সবুজ ঘাসের ঢাল। সোনালি ঝকঝকে সৈকত, নীল জল, নীল আকাশ— সে অন্যরকম স্বপ্নদৃশ্য। সান ত্রোপের তখনও এমন আধুনিকীকরণ হয়নি— এসব অঞ্চলে খাসদখল তখনও কেবল শিল্পীদেরই। আর গ্রীষ্মে পরিযায়ী ট্যুরিস্টদের। আমরা সেবারে গাড়িতে গিয়েছিলাম কেম্ব্রিজ থেকে। সালটা ১৯৬২— দিন দশেক ধরে ওঁদের কনফারেন্স চলেছিল। আমি সেই সময়ে থিসিস নিয়ে খুব ব্যস্ত। পুঁটলি বেঁধে ওখানেও নিয়ে গিয়েছিলুম আমার কাজকর্ম— এইক্সের হোটেলের ঘরে আমি টাইপরাইটারে ঘাড় গুঁজে বসে থাকতুম। তখনও ব্যক্তিগত পি.সি. মাসির দিন আসেনি। টাইপরাইটারই ভরসা। কনফারেন্স থেকে ফেরার পথে আমরা 'লাসকো'র গুহাচিত্র দেখে এসেছিলুম— আদিম মানুষের জীবনযাত্রার চিহ্ন আঁকা— স্ট্যালাকটাইট-স্ট্যালাকমাইট গুহা এই প্রথম দেখলুম। দেওয়ালের গায়ে রক্তিম ষাঁড়ের আশ্চর্য লাইনড্রয়িং। ছুটন্ত হরিণের ছবি। শিকারি পুরুষের ধনুর্বাণধারী ছবি। সেই অমূল্য গুহাচিত্র আধুনিক মানুষের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলে, এখন দর্শক নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে 'লাসকো'য়। সংরক্ষণের কারণে। আমি ভূপালের ভীমবেটকা গুহাতে প্রায় একই ধরনের গুহাচিত্র দেখেছি। দশ হাজার বছরের পুরনো ছবি। জানি না তার সংরক্ষণের জন্য আমরা কী যত্ন করছি। সম্পূর্ণ অসংরক্ষিত, পড়ে আছে দেখেছিলুম।

সেইবারে ১৯৬২তে আমাদের সান ত্রোপেতে শুধু ধনী ইয়ট-বিলাসীদের, নিরীহ ট্যুরিস্টদের, আর রং তুলি-ইজেলধারী ষাটের দশকের হিপি শিল্পীদের সঙ্গেই দেখা হয়েছিল। পরের বারে যখন গেলুম ১৯৭৯তে, তখন সান ত্রোপেতে গিয়ে দেখি সৈকতে সারি সারি আমসত্ত্ব রোদে দেওয়ার মতো, নগ্নমানুষ-মানুষীর রৌদ্রদগ্ধ দেহ বালিতে শুকোচ্ছে।

সেবারে কামার্গ হয়নি—

কপালে যখন আছে, তখনই তো ঘটবে কামার্গ দর্শন? ঠাকুরানি যখন টানবেন ... প্রকৃতিদেবীর দয়া!

কামার্গ দর্শন

এযাত্রাটি অন্য জাতের। সেমিনার শেষ হলে এইক্স থেকেই আমার সোজা দেশে ফেরবার একটুও ইচ্ছে নেই। ইতিমধ্যে খোঁজ নিয়েছি। কয়েকদিনের জন্য ট্যুরিস্ট কোচের ট্রিপে পুরো দক্ষিণ ফ্রান্স ঘুরে আসা যায়— নীস, আভিনিয়ঁ, আর্ল, ভোক্লুজ, দান্তের 'হেল ভ্যালি', লে-বো গ্রাম। এবং পূর্বপরিচিত কৎ দা' জুর, সুনীল সৈকত। এটুকুই আমার আগে দেখা। সেই সান রেমো। সান ত্রোপে, স্যাঁ রাফায়েল। এবং? এবং?? এবং কামার্গ!! প্রত্যেক জায়গায় কত কী যে দেখবার আছে! একটা 'গিদ মিশলাঁ' কিনেছি (Michelin guide) অপূর্ব বই, ফ্রান্সের প্রতিটি দ্রষ্টব্যস্থল তাতে

আছে। দক্ষিণ ফ্রান্সের সব তো আর দেখা হবে না, তবে অনেকখানিই দেখা যাবে। লরা-পেত্রার্কের প্রেমের 'ভোক্লুজ' গ্রামটা দেখতেই হবে— আর দান্তে যে উপত্যকাটি দেখে তাঁর 'নরকের' কল্পনা করেছিলেন সেই 'হেল-ভ্যালি' দেখার সুযোগ কখনও ছাড়া উচিত? এই অঞ্চলটায় এককালে ছিল স্পেন, ইতালি আর ফ্রান্সের মিলিত প্রভাব।— তখনও এভাবে আলাদা আলাদা হয়ে সুস্পষ্ট গড়ে ওঠেনি জাতীয় সংস্কৃতিগুলি— যখন দক্ষিণ ফ্রান্সে ঘুরে ঘুরে গান বাঁধতেন ত্রুবাদুর চারণ কবিরা। আর্ল শহরে রোমান ইতিহাসের চিহ্নের চেয়েও হয়তো জরুরি সেজানের স্মৃতি— সেই গাছপালার রং— আভিনিয়ঁ শহর জরুরি ভ্যান গখের ছবির স্মৃতি জড়ানো বলে। ওখানেই সেই আভিনিয়ঁর সেতু (পঁ দাভিনিয়ঁ) আছে— আছে পোপের বিখ্যাত প্রাসাদ আবে দ্য মঁ মাজুর। সবই তো দেখতে ইচ্ছে— কিন্তু, কপালে থাকলে তো? পকেটটাও তো দেখতে হবে!

দেখা ছিল কপালে। দেখা হল 'আবে দ্য মঁ মাজুর'। দুই যুগে দুই ভাগে তৈরি, একবার ১২ শতকে, একবার ১৭ শতকে। পোপের সাড়ম্বর রাজকীয় প্রাসাদ। ভেতরটা ঠিকঠাক— কিন্তু বাইরে চারিধারে দৈব নয়— মানুষেরই ধ্বংস করার প্রমাণস্বরূপ যেদিকে দৃষ্টি যায়, ধ্বংসস্তূপের চিহ্ন। নিসর্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ভাঙা পাথরের সিঁড়ি, পাথরের কড়িবরগা, সবুজ ঘাসের বুকের ওপরে। চতুর্দিকে উঁকি দিচ্ছে ভাঙা ইমারত, ছোট ছোট কেল্লা আর ছোটবড় প্রাসাদ— কিছু তুর্কি, কিছু রোমান, কিছু ফরাসি— কত যুদ্ধ, কত শত্রুতা, কত রক্তক্ষয় যে ঘটেছে এই সুন্দর নিসর্গের বুকে, কখনও ক্যাথলিকদের কেল্লা জ্বালিয়ে দিয়েছে ইসলামধর্মী তুর্কিরা। কখনও বা প্রটেস্ট্যান্টদের গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে ক্যাথলিকরা। ধর্মোন্মাদেরা সবাই এক।

আবে দ্য মঁ মাজুরের মাটির নীচের তলাতেও একটি গির্জে আছে, ভিত্তি তৈরির সময়েই সেটি প্রস্তুত হয়েছিল। তার মধ্যে আছে এই আবের বাসিন্দা সন্ন্যাসীদের কবরস্থানও। একটি কেন্দ্রীয় গোলঘরে একটিই প্রধান কবর। আর তার চারপাশ দিয়ে সূর্যের ছটার মতো বহু ঘর— প্রত্যেকটিতে একটি করে কবর। সেখানে পৌঁছনোর গলিটিও মনে হল যেন ক্রুশচিহ্নের মতো চারমুখো। যে কেন্দ্রে চারটি গলি মেলে, সেখানেই গোল কবরস্থানটি। আর প্রত্যেকটি গলির দুই দেওয়ালের দুই ধারেই কুলুঙ্গির মতো ঘর কাটা। খোপ খোপ কামরা, সারি সারি তাকের মতো মাচা তৈরি করা আছে তার মধ্যে। সেই তাকগুলো সবই কফিনে ঠাসা। একটিই মাত্র মোম জ্বলছে। রীতিমতো অতিলৌকিক আবহ। যেমন ঠান্ডায় হিহি করছি তেমনই অন্ধকার। যেন কবরের মধ্যেই ঢুকেছি আমিও। ওপরে উঠে এসে, সূর্যের সোনার আলোয় চোখ মেলে, খোলা গরম বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে— আঃ, বাঁচলুম। আগেও আমি ক্যাটাকুম্ব দেখেছি, কিন্তু এখানে নেমে যেন অন্যরকম অনুভূতি হয়েছিল— সম্ভবত একলা হয়ে পড়েছিলুম বলেই। বাসের দলবল নীচের কবরখানা দেখতে নামেনি। আমারই ছিল কৌতূহল বেশি! আমাকে দেখে সবাই

হাঁপ ছেড়ে বাঁচে! এতক্ষণ আমাকেই খোঁজাখুঁজি চলছিল। শাড়িপরা মেয়েটিকে আবে দ্য মঁ মাজুরে ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া কারুরই মনঃপূত হচ্ছিল না।

আমাদের বাসটা দিব্যি একটা নৌকোয় চেপে সরু মতো রোন নদী পেরিয়ে ওপারে এসে মাটিতে নামল। একটি খামারবাড়ি আমাদের গন্তব্য। সামনেই ধু-ধু প্রান্তরের মধ্যে উঁচু টিনের চাল-লাগানো খামারবাড়িতে ঢুকেই দেখি এক বিরাট বড় হলঘর। তার পিছনদিকে খোলা উঠোন উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। উঠোনে পনেরো-যোলটা ছাই-ছাই সাদা রঙের তেজী ঘোড়া কেশর ফুলিয়ে ঘাড় উঁচিয়ে পা ঠুকছে। আর সাদা চামরের মতো রেশমি লেজ ঝামরাচ্ছে। যেন ঠিক রূপকথার পক্ষীরাজ! অপূর্ব দৃশ্য! মনে পড়ে গেল! এই তো, এই ঘোড়াগুলোই তো দেখেছিলুম, বহু বছর আগে, কেম্ব্রিজের সেই ডাক্তারের ওয়েটিংরুমে! ওরা সেইখানে ছুটে যাচ্ছিল সমুদ্রতীর ঘেঁসে পায়ের খুরে সাগরজলের ফোয়ারা আকাশে ছিটিয়ে। আমার ইস্কুল জীবনে দেখা একটি বিদেশি সিনেমার কথা মনে পড়ে গেল, যার ইংরিজি নাম— 'দ্য হোয়াইট স্ট্যালিয়ন'— অবিকল এমনই একটি ঘোড়া, অবিকল এমনই মাঠ, আকাশ, সমুদ্র দেখেছিলুম সেই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবিতে। সেটা কি ছিল তবে এই কামার্গেই? আমার সেসব জানা নেই। আছে শুধু এক বিধুর অনুভূতি— হৃদয়ে বিঁধে আছে এখনও সেই একাকী বালক ও তার প্রিয় ঘোড়ার আমৃত্যু ভালোবাসার তীব্র আবেগের স্মৃতি।

কে বলবে এটা ইয়োরোপ? এখানে মানবসভ্যতার কোনও চিহ্নই নেই আশপাশে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু ফাঁকা মাঠ। খটখটে শুকনো মাঠ, মাঝে মাঝে কাঁটাঝোপ। ফণিমনসা। আকাশ থেকে আগুন ঝরছে— তীব্র রোদ্দুর। প্রচণ্ড গরম, মরুভূমির মতোই।

খামারবাড়ির আতিথেয়তা এখনও ভুলিনি। বাসের ক্লান্ত যাত্রীদের জন্য প্রথমে এল ঠান্ডা বরফ দেওয়া, চমৎকার লেবুগন্ধী শরবত, সবুজ রঙের লেমোনেড। আহ্! তারপরে? বড় বড় টুকটুকে লাল তরমুজের ফালি, পাশেই পাতলা পাতলা গোলাপি হ্যামের স্লাইস, আর চিজ। এটা তো গেল অ্যাপিটাইজার। ফরাসি ওয়াইন তো ছিলই সঙ্গে, সাদা এবং লাল। তারপরে একটা ট্রলিতে করে বিরাট একটি চ্যাপ্টা লোহার কড়াই করে এল 'পায়েইয়া' (Paella) বিখ্যাত স্প্যানিশ পোলাও, হলুদ রঙের ভাতের মধ্যে পশুপাখির মাংসের আর সামুদ্রিক মাছের ছোট ছোট টুকরো আর বড় বড় আস্ত চিংড়িমাছ, টোমাটো, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ কুচি— দারুণ 'দিশি রান্না'র গন্ধ বেরিয়েছিল— সেই স্বাদ গন্ধ এখনও আমি ভুলিনি। প্রচুর লেমন শেরবেট আর আঙুর, টাটকা ক্রিম, আইসক্রিম, এসব দিয়ে ডেজার্ট হল। এদের মরুভূমিতে খাওয়াটা মন্দ নয়! তারপর এল ছোট্ট দেমি-তাস কাপে টার্কিশ কফি। একটু বিশ্রামের পরেই এসে গেল জিপগাড়ি, তাতে চড়ে শোঁ শোঁ করে বেরিয়ে পড়লুম তেপান্তরের মাঠে। রোন নদীর পাড় থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ছড়ানো এই বন্য পোড়ো জমি, যেখানে বুনো ঘোড়ার আর বুনো বাইসনের দল

চরে বেড়ায়, ফরাসি সরকারের সযত্ন সংরক্ষণে। কাউবয়রা তাদের পাহারা দিচ্ছে সর্বক্ষণ।

খামারবাড়ি কখন আকাশে মিলিয়ে গিয়েছে। আমাদের জিপ ছুটছে কামার্গের ধু-ধু প্রান্তরের বুক চিরে— যতদূর চোখ যায় মাঠের পরে মাঠ। আকাশের পরে আকাশ। এ সেই ছোটবেলার কল্পনায় দেখা তেপান্তরের অনুভব— 'চোর কাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে, মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে ... গরু বাছুর নেই কো কোনওখানে ... আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে'— সত্যি সত্যি মাঠভর্তি লম্বা লম্বা চোরকাঁটার মতো আগাছা— আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন দুটি ঘোড়সওয়ার। সে দুজনই আমাদের গাইড— দুজন কাউবয়— গাড়ি তাদেরই সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। এরা নকল করে সাজা কাউবয় নয়, সত্যিকারের কাউবয়— পোশাকেও, কাজেকর্মে, জীবনযাপনেও। হঠাৎ কিছুর গন্ধ পেয়ে ঘোড়াদের গতি কমে গেল। ঘোড়াদের পায়ে পায়ে প্রচুর ধুলো উড়ছে। দূরে কালো কালো ফুটকির মতো কী সব দেখা যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলুম বুঝি কাঁটাঝোপই হবে। কিন্তু কাছাকাছি আসতেই আস্তে আস্তে সেই কালো ফুটকিগুলো বড় হয়ে অগণিত জংলী বাইসনের দল হয়ে দাঁড়াল। অগণিতই, বিশ, ত্রিশ? তিন-চারশো জন্তু একসঙ্গে মাঠ জুড়ে কাঁটাঝোপের মধ্যে চরে বেড়াচ্ছে। কালো শরীর, আর কী বাঁকা, কী সাদা তাদের শিং! সবচেয়ে ভয়াবহ তাদের নিচু করা মুখের সাদা সাদা চোখের চাউনি। এমন দৃষ্টি গরু মহিষের চোখে আগে কখনও দেখিনি। বন্য, হিংস্র চোখ। বন্ধুত্বের লেশমাত্র নেই সেই চোখে। আমাদের দেশের গরু মহিষের শান্তশিষ্ট চোখে কত স্নেহমমতা মাখানো থাকে!

আমাদের দেখে শিং বাঁকিয়ে, চোখ পাকিয়ে, ঘাড় হেলিয়ে এক নিমেষের মধ্যেই 'স্ট্যাচু' হয়ে থমকে দাঁড়াল বুনো বাইসনের দল। ঠিক ঝড়ের আগে গাছপালা যেমন হয়, নিবাত, নিষ্কম্প, স্থির। দৃশ্যটা দেখলেই ভয়ে গা হিম হয়ে আসে, কিছুই যদিও করেনি তারা। লক্ষণটা ভালো না। কাউবয়রা অবশ্য ভীত বলে মনে হল না। তারা জিভ দিয়ে একসঙ্গে 'উর্‌র্‌র্‌র্' করে হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ করে উঠল। বুনো বাইসনের দল স্থির, স্থাণু, পাথরে কোঁদা হয়েই রইল। আক্রমণ করল না। হঠাৎ দুজন কাউবয় ঘোড়া ছুটিয়ে বাইসনদের দুদিকে চলে গিয়ে, মুখ দিয়ে একরকম অদ্ভুত শব্দ করতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেল;— খোলা জিপখানাতে আমাদের চোখেও ঢুকল সেই ধুলো। চোখ মুছে তাকিয়ে দেখি দিগন্তের দিকে দূরে ছুটে চলে যাচ্ছে বুনো বাইসনের দল— 'রাঙাধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে!'

বুনো বাইসনের দেখা পাব এভাবে কে জানত। এটা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে। আমরা চলেছি ঘোড়া দেখতে। জলাজমির দিকে। এখানে অনেক জলাজমি রয়েছে। তারই ধারে ধারে ঘোরে জল খেতে আসা বুনো ঘোড়ার দল। আমরা একটা জলাজমির ধারে পৌঁছতেই দেখি সেখানে আমাদের আসার আগেই এসে গেছেন একদঙ্গল গোলাপি সারস। 'পিঙ্ক ফ্লেমিঙ্গো'! জিপে হর্ষধ্বনি উঠল।

বাইসনের দল দেখে বাক্‌রোধ হয়েছিল, পাখি দেখে বাক্‌স্ফূর্তি হল। ফ্লেমিঙ্গোদের সঙ্গে জলের মধ্যে প্রচুর বকও বসে আছে, টুপটাপ মাথা ডুবিয়ে মাছ ধরছে। গাড়ির শব্দে চমকে উঠে বিশাল গোলাপি ডানা মেলে, বুকের নীচে লম্বা লম্বা লাল ঠ্যাং দুটি সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিয়ে আকাশে উড়ে গেল পিঙ্ক ফ্লেমিঙ্গোর ঝাঁক। বকেরা উড়ল না। চিড়িয়াখানাতে আগে পিঙ্ক ফ্লেমিঙ্গো দেখেছি, দুটি-একটি। কিন্তু পরীর মতো আকাশে উড়তে দেখিনি। এখানে এরা অগুন্তি। চোখকে যেন বিশ্বাস হল না। শুনেছি আমেরিকাতে মায়ামি আর ফ্লোরিডাতেও এই পাখি আছে।

কিন্তু চোখের জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয় আমার— দূর দিগন্ত থেকে ছুটে আসছে একদল সাদা ঘোড়া, পায়ে পায়ে জল ছিটিয়ে, আকাশে যেন বাষ্পের মেঘ সৃষ্টি করতে করতে, আকাশজোড়া সাদা জলের ঝারি উড়িয়ে।— এই ঘোড়াগুলোর পিঠে কোনও কাউবয় নেই। সওয়ারবিহীন। জিন-না-পরানো, সম্পূর্ণ স্বাধীন এই তেজস্বী ঘোড়ার দল আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জলার কিনার ঘেঁসে প্রবলবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমাদের জিপ অনেকক্ষণ থেমে গিয়েছে। আমরা স্তব্ধ হয়ে মনের মধ্যে গ্রহণ করছি কামার্গের এই বুনো ঘোড়া, বুনো বাইসন, কাঁটাঝোপের মাঠ, আর জলাভূমি; কিছু কিছু নোনাজলের (ব্যাকওয়াটার) বিল, আর কিছু কিছু মিঠে জলের দিঘি। ভাগ্যিস!— সেই মিঠে জলই তো এইসব বন্যপ্রাণীদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

এই সমস্ত কাউবয়রা, যাদের নাম কামার্গের 'গার্ডিয়ানস'— এরাও বিশিষ্ট। আকৈশোর এখানকার বিচিত্র জীবনযাত্রা এরা শিখে নেয়— এদের জীবনও আমাদের শহুরে মানুষদের মতো নয়। বাচ্চাবয়সেই বুনোঘোড়া, আর বুনো বাইসনদের ধরা, তাদের বাগ মানিয়ে, পোষ মানিয়ে, আস্তাবলে আর গোয়ালে ভরা— এই সুকঠিন কর্মটি এরা শিক্ষা করে থাকে। এরা প্রধানত দক্ষিণ ফ্রান্সেরই মানুষ, কিন্তু অনেকেই মূলত স্প্যানিশ। এবং বেশ কিছু জিপসি জাতির। দক্ষিণ ফ্রান্সই তাদের দেশ, কিন্তু তারা সবাই ফরাসি নয়। এখানকার ঘোড়াগুলো নাকি জন্মায় কালো, বড় হতে হতে ছাই-ছাই হয়, তারপর সাদা হয়ে যায়।— ছুটন্ত সাদা ঘোড়ার দল একদিক থেকে এসে আরেকদিকের দিগন্তের নীলে মিশিয়ে গেল। আমাদের যা দেখতে আসা, তা পূর্ণ হয়েছে। মনের আনন্দে আমরা খামারবাড়িতে ফিরে যাই। এবারে একটু চা-কফি দরকার।

খামারবাড়িতে আরও দ্রষ্টব্য বাকি ছিল। উঠোনের ওধারে একটা 'রিং' আছে। সেখানে এখন বুলফাইট হবে। দু রকমের খেলা ওখানে দেখানো হয়। এক, বুনোঘোড়ায় চড়ার খেল, কেশর ধরে, বাগ মানিয়ে, বিনা জিনের, বিনা ট্রেনিংয়ের বুনোঘোড়ার পিঠে কে উঠতে পারে, তার প্রতিযোগিতা— ঘোড়া ফেলে দেবে, প্রবল লাথি মেরে পাঁজর ভেঙে দেবে, এসব সম্ভাবনা আছে, তবু ঘোড়া বশ করার খেলাটি খেলবার জন্য দুঃসাহসী লোকের অভাব হয় না। অন্যটি তো বুলফাইট। লাল কাপড় দেখিয়ে ষাঁড়কে খেপিয়ে, তার সঙ্গে যুদ্ধু যুদ্ধু খেলা। আমার সঙ্গীরা

অধিকাংশই আমেরিকান ট্যুরিস্ট— তাঁরা বুলফাইট দেখতে গেলেন। বুলফাইট দেখতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। নিষ্ঠুর, অমানুষিক। মানুষ, পশু দুজনের প্রতিই নির্দয়তার খেলা। প্রথমটি তবু হয়তো বা দেখা যেত, মানুষের সভ্যতার অন্যতম প্রথম পদক্ষেপই তো হল বন্যপশুকে বশ মানিয়ে নিজের কাজে ব্যবহার করা। ঘোড়া পোষ মানানোর খেলাটা দেখতে আমার নৈতিক বাধা নেই, কিন্তু বুলফাইটে এবং মোরগ লড়াইতে আমার প্রবল নৈতিক আপত্তি আছে। আমি চাই এইসব খেলা জগতে নিষিদ্ধ হোক। আমাদের দেশেও কোথাও কোথাও এই জিন না পরানো ঘোড়ায় চড়ার ও ষাঁড়কে খেপিয়ে যুদ্ধ করার প্রচলন আছে। গ্রাম্য মেলায় এধরনের প্রতিযোগিতা হয়। কোনও নিষ্ঠুর খেলাই আমার মনকে আনন্দ দেয় না। ঘুঁষোঘুঁষি কিংবা মোরগ লড়াইয়ের মতো রক্তারক্তি খেলা দেখে কেন শরীর মনকে যন্ত্রণা দেব?

আমি খামারবাড়ির সামনের উঠোনে এককাপ কফি নিয়ে বসে মনে মনে ভাবি— স্বপ্ন তাহলে সত্যি হল? সশরীরে কামার্গে এলুম? শুধু স্যাঁ-মারি-দ্য-লা-ম্যের যাইনি, যেখানে জিপসিদের চার্চ আছে (ভাঙা কেল্লার মতো দেখতে) সেটা এযাত্রায় আর দেখা হল না। অনেকটা দূরে ভূমধ্যসাগরে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই পাথরের গির্জে-কেল্লা, 'সমুদ্রের-সন্ত-মেরি'র প্রাচীন মন্দির। কিংবদন্তি বলে যিশুখ্রিস্টের মৃত্যুর মাত্র ৪০ বছর পরেই নাকি ঠিক এই জায়গায় একটি নৌকো এসে কূলে ঠেকেছিল। সেই পালতোলা নৌকো নাকি সোজা ভেসে এসেছিল প্যালেস্টাইন থেকে, যিশুর সাক্ষাৎ শিষ্যদের একমুঠোকে বুকে নিয়ে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ল্যাজারাস, মারি-মাদলেম, সেন্ট ম্যাক্সিমিল, মারি সালোমে, মারি জাকোবে, আর ছিলেন তাঁদের একটি প্রিয় সখী, নাকি দাসী? সারা। সারা ছিলেন কালো মেয়ে। সারাই জিপসিদের পূজ্য দেবী 'সান্তা সারা'। এই শ্যামবর্ণা সন্তমাতা নাকি তাদেরই স্বদেশবাসিনী— তাদের রক্ষয়িত্রী। প্রতিবছর ওখানে, ধু-ধু এই কামার্গে, জিপসিদের একটা আশ্চর্য মেলা বসে। জিপসিদের ওই ভাঙা গির্জের আশপাশে। দেশবিদেশের জিপসিরা এসে যোগ দেয় অসাধারণ সেই উৎসবে, নানান আচার অনুষ্ঠান হয় তখন। যদি ভবিষ্যতে কখনও আবার কামার্গে যাওয়া হয় আমার— সাঁ-মারি-দ্য-লা-ম্যের'-এর মেলাটা দেখে আসতে হবে।

অস্বীকার করব না, 'ইয়ারো ভিজিটেড' কবিতার কথা স্মরণ করে মনটা উদ্বিগ্ন ছিল, অদেখা কামার্গই যদি বেশি ভালো হয়? কিন্তু বাস্তব কামার্গ মন ভরিয়ে দিয়েছে। স্বপ্নদৃশ্য সত্য হয়েছে— যা ভেবেছিলুম, তার চেয়ে বেশিই পেয়েছি। ধন্য হয়েছি। 'সান্তা সারা'র কৃপাতেই নিশ্চয়। তিনিও তো আমার মতোই একটি কালো মেয়ে ছিলেন!

'ভ্রমণ' অক্টোবর, ২০০৪

নাগজিরার জঙ্গলে

বুদ্ধদেব গুহ

নাগজিরা মহারাষ্ট্রের একটি পুরনো বন। মেলঘাট অথবা আন্ধারি-তাড়োবারই মতো। নাগপুর থেকে যাওয়া যায়, দূরত্ব একশো বাইশ কিলোমিটার। আবার ট্রেনে এলে গন্দিয়াতে নেমেও যাওয়া যায়। গন্দিয়া থেকে দূরত্ব পঞ্চাশ কিলোমিটার। নাগপুর-ভান্ডারা হাইওয়েতে সাকোলি নামের একটি জনপদ থেকে পথ বেরিয়ে গেছে নাগজিরার দিকে। বাইশ কিলোমিটার। অন্য দিকেও ঢোকার গেট আছে। যাঁরা রায়পুর থেকে যাবেন তাঁদের পিটেঝারি থাডেঝারি গেট হয়ে ঢুকতে হবে। থাডেঝারি নামের একটি হ্রদও আছে। পার্কের মধ্যে। আর ওই নামের গ্রামটা বাইরে। নাগজিরার এলাকা দেড়শো বর্গকিলোমিটারের একটু বেশি।

মহারাষ্ট্র এমনিতেই ঊষর, মানে অনেক এলাকাই। তার মধ্যে নাগজিরা আরও ঊষর। এর এলাকার মধ্যে দুটি বড় হ্রদ আছে, সেই হ্রদ দুটিই বন্যপ্রাণীদের তৃষ্ণা নিবারণ করে। এবং অভয়ারণ্যের সৌন্দর্যও বাড়ায়। তবে এ দুটির একটিও স্বাভাবিক নয়, বনবিভাগেরই খনন করা। ওই দুটি হ্রদ থেকে ট্যাঙ্কারে জল পাম্প করে উঠিয়ে বনের মধ্যে নানা জায়গাতে বানানো সিমেন্টের চৌবাচ্চার মধ্যে জল ঢেলে দেওয়া হয়। অধিকাংশ চৌবাচ্চাই পথের পাশে পাশে করা হয়েছে স্বাভাবিক কারণে।

বনবিভাগের কর্তারা নিজেরাই বলেন যে নাগজিরাতে বন্যপ্রাণী দেখার সুবিধা এপ্রিল ও মে মাসে। এপ্রিল-মেতে অবশ্য যে কোনও বনেই বন্যপ্রাণী দেখার সুবিধা কারণ আমাদের পর্ণমোচী বনে তখন পাতা ঝরে যায়। আন্ডারগ্রোথ কম থাকে তাই নজর চলে দূর অবধি। যে সব পার্কে রাতের টহলের অনুমতি মেলে সে সব পার্কে তো বন্যপ্রাণী দেখার সুবিধা হয়ই। তবে আন্ধারি-তাড়োবারই মতো নাগজিরাতেও সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধিই বনের মধ্যে গাড়িতে ঘোরার অনুমতি মেলে। পায়ে হেঁটে যাওয়া বারণ। এটা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। পুব আফ্রিকার সেরেঙ্গেটি ও অন্যান্য পার্কেও গাড়ি থেকে নামা বারণ তবে সেখানে অনুমতি না দেওয়ার কারণ আছে। প্রধান কারণ সেৎসি মাছি। এবং পার্কের গাইডরা বলে, সিংহ এবং গাব্বুন ভাইপার সাপ। এটাও বাড়াবাড়ি। আমরা

বাঘের দেশের লোক, আমাদের ঘিয়ে-ভাজা, স্ত্রীর রোজগারে বসে-খাওয়া সিংহদের নাম করে ভয় দেখানোটা সত্যিই বাড়াবাড়ি। তাছাড়া সাপও তো কম নেই আমাদের দেশে। ট্যারান্টুলা, ব্ল্যাক উইডো, ব্রাউন উইডো এবং অন্যান্য মাকড়শা এবং নানারকম নিওরোটক্সিক, কার্ডিওটক্সিক, হেমোলটিক বিষে ভরপুর বিছেও কম নেই। অত পুতুপুতু করলে জঙ্গলে না আসাই ভালো।

তবে ভারতের বিভিন্ন বনে বেড়াবার উৎকৃষ্ট সময় নভেম্বর থেকে এপ্রিল— শুধু নাগজিরাতেই এপ্রিল-মে কেন তা ঠিক বোধগম্য হল না। পুব আফ্রিকার কেনিয়া ও তানজানিয়ার মাসাইমারা, লেক মানিয়ারা, গোরোংগোরো এবং সেরেঙ্গেটিতে বেড়াবার সময় জুন-জুলাই মাস— পুব আফ্রিকাতে যখন শীতকাল।

নাগজিরাতে পর্যটকদের এপ্রিল-মেতে আসতে বলা হয় বটে— আমিও এপ্রিলেই গেছিলাম কিন্তু এখানের কোনও অতিথি নিবাসেই বিদ্যুৎ নেই। আমার মতোই যাঁরা বন-পাগল তাঁরা ছাড়া অন্যরা গেলে বেশ কষ্ট পাবেন গরমে। সঙ্গে হাতপাখা এবং ব্যাটারিচালিত ফ্যানও নিয়ে যেতে পারেন নইলে দুপুরবেলাটাতে বড় কষ্ট পাবেন। দুপুরে জঙ্গলে ঘোরাও মানা। তখন বন্যপ্রাণীদের বিশ্রামের সময়। এমনটি আর কোনও বনেই দেখিনি।

সন্ধের পর থেকেই কিন্তু আবহাওয়া আস্তে আস্তে মনোরম হয়ে ওঠে। রাতে তো গরম থাকেই না— অন্তত এপ্রিলে থাকে না। শেষ রাতে তো গায়ে চাপা দিতে হয় চাদর বা অন্য কিছু। যদি একটু কষ্ট করে এবং কষ্ট সয়ে গরমে যেতে পারেন নাগজিরা তবে তা মনে রাখার মতো হবে। আমি বলব, একবার ঘুরে আসুন।

মাইকাল ও সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর থেকে বেরুনো গোখুরি হিলস-এর ভাঁজে ভাঁজে খাঁজে খাঁজে এই নাগজিরা অভয়ারণ্য উঁচু নিচু ঢেউখেলানো লালমাটির পথের বাঁধনে ঘেরা। আর পথেরও তো শেষ নেই। রোড সাইনস অবশ্য নেই। সে-তো কলকাতা বা নাগপুর শহরের অধিকাংশ পথেই নেই। তাই আমি নামগুলো বলে দিচ্ছি। যদি যান তবে আপনার গাড়িতে যে গাইড উঠবে তাকে পথের নাম বললে সে চমৎকৃত হয়ে নিয়ে যাবে।

নাগজিরার মধ্যে ও আশপাশে যে সব গ্রাম আছে সেখানের তরুণদের বন ও বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে ক্র্যাশ কোর্স করিয়ে র‍্যাফের মতো পোশাক পরিয়ে তাদের গাইড করে দেওয়া হয়েছে। বিনা গাইডে আপনি বনে ঢুকতেই পারবেন না। এরা প্রধানত আদিবাসী, রাজগোন্দ। পদবী উইকে, ভালওয়াই, মাধার, মাসরাম, সোনান্নে ইত্যাদি। গাইডদের ফি, প্রতিবারের জন্য আশি টাকা।

অতিথি ভবনের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে 'নিলয়'। ভি আই পি গেস্টহাউস। দোতলা। তার সামনেই একটি হ্রদ। তাতে বিকেলের আলো পড়তে পড়তেই নানা Ungulates-এর ভিড় লেগে যায়। Ungulates মানে, ক্ষুরওয়ালা প্রাণী— নানা জাতের হরিণ, অ্যান্টেলোপ, শুয়োর ইত্যাদি। কখনও কখনও তাদের পিছনে পিছনে আসে নরম থাবা ফেলে নিঃশব্দচারী বাঘ বা চিতা। অন্ধকার হতে না হতে

এদের চিৎকারে মাথা গরম হয়ে যায়। তারা নিলয়ের চারধারে ঘুরে খচরমচর করে ঘাসও খায় রাত গভীর হলেই। শেষ রাত অবধি থাকে তারা হ্রদের চারপাশে, তারপর চলে যায় তাদের নিজ নিজ নিলয়ে।

নিলয় ছাড়াও, নিলয়ের কাছেই হ্রদের কাছে আছে লগ হাট। ইউথ হস্টেলও আছে ছেলেদের জন্য, ক্যান্টিনের কাছে। মহিলাদের জন্য আলাদা হস্টেল আছে। যুবতী বসতি গৃহ। কটেজও আছে কয়েকটি। তাদের নামগুলো খুব রোম্যান্টিক, হেমন্ত, শিরীষ, বসন্ত। সবসুদ্ধু আটটা কটেজ আছে— ডাবল বেডরুম সিটিং-ডাইনিং। থাকার জায়গার অভাব নেই। তবে নিলয়ে রান্না করা মানা। কিন্তু চা-টা করা যায়। গ্যাস সিলিন্ডার আছে— খিচুড়ি টিচুড়ি, চিঁড়ের পোলাউ ইচ্ছে করলে চৌকিদারকে বলে করা যায়। সে সাহায্যও করে। ক্রকারি-কাটলারি সব আছে। সিটিং কাম ডাইনিং রুমের লাগোয়া একটি রেলিং ঘেরা বারান্দা আছে। তার সামনেই হ্রদটি। সন্ধের পরে সেখানে বসে লাগাতার বিভিন্ন স্কেলে নানা তৃণভোজীর ডাক শোনা যায়। হ্রদের ধারে ধারে ইকো-সিস্টেমে উৎসাহীজনেরা riparian ইকো-সিস্টেমেরও খোঁজ পাবেন। নাগজিরার প্রাণিবৈচিত্র্য সত্যিই প্রণিধানযোগ্য।

যে পথটা 'নিলয়'কে পাক দিয়ে নিলয়-এর সামনে দিয়ে বনে ঢুকেছে তার নাম চোরখামারা রোড। তারপরে সে পথ বেয়ে অন্য নানা পথে ঘোরা যায় নাগজিরাতে, বোদালকাসা, চিতল রোড। বোদালকাসা রোড মুরদোলি রোড থেকে বেরিয়েছে ফরেস্টারদের কোয়ার্টার থেকে একশো মিটার মতো দূরত্বে। এই পথ, মানে, বোদালকাসা রোড চলে গেছে নাগরদোলার মতো উঠতে নামতে নামতে উঠতে— কয়েকটি ছোট হ্রদের পাশ ঘেঁসে। বনবিভাগের বানানো। এখান থেকে একটি পথ বেরিয়ে গেছে নাগজিরার সবচেয়ে উঁচু জায়গাতে— এখানে একটি ওয়াচ টাওয়ার আছে। আরেকটি পথ গেছে গাউর গাট্টিতে। এটিও খুব চড়াই। কিন্তু গাউর গাট্টিতে পৌঁছেই আবার ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এখানে দুটি খুব বড় বড় খয়ের গাছ আছে যাদের কাণ্ডে বাঘ এবং ভালুকের নখ ধার দেওয়ার চিহ্ন দেখা যায়। যাঁরা সে চিহ্ন কখনও দেখেননি তাঁরা দেখে নিতে পারেন।

এখানে কয়েকটি বিজা আর অইন গাছের ওপরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৌচাক আছে। কিছুতে ভীমরুল আছে, কিছু পরিত্যক্ত। যদি মৌচাক দেখতে যান এবং গাড়ি থেকে নামেন তবে কোনওরকম পারফ্যুম মেখে যেন যাবেন না, বিশেষ করে মেয়েদের বলছি। গেলে প্রাণ সত্যিই বিপন্ন হবে। ভূপালের কাছে আদিম মানুষদের প্রস্তরাশ্রয় এবং তাঁদের গুহাগাত্রের লাল রঙে আঁকা ছবি দেখতে গিয়ে ভীমবেটকাতে অতিকায় মৌচাক থেকে একইসঙ্গে কয়েক হাজার ভীমরুল আমাকে আক্রমণ করে ধরাশায়ী করে দিয়েছিল। কোনওক্রমে গড়িয়ে গড়িয়ে কাছেই পার্ক করানো গাড়ির মধ্যে উঠে পড়েও রক্ষা ছিল না, গাড়ির মধ্যেও কমপক্ষে একশো ভীমরুল ঢুকে পড়েছিল। চারদিন হোটেলে শয্যাশায়ী ছিলাম—

ডাক্তার ইনজেকশন ওষুধ সব করে তারপরে ভূপাল থেকে আসতে পারি। আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষাতে আতর ব্যবহার করি। তখন গ্রীষ্মকাল ছিল— খস্‌স্‌ আতর মেখেছিলাম।

এছাড়াও দেখবার মতো জায়গা আছে অনেক। টাইগার ট্রেইল, হাতিখোদরা, কাথেথুবা উপত্যকা এবং অন্ধারবন। অন্ধারবনে একটা মস্ত অইন গাছ আছে। গাইডরা বলে, ওটিই নাকি মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম অইন গাছ, অচানকমার থেকে অমরকণ্টকের পথে লামনি বনবাংলোর আগে ডানদিকে যে বনপথটি বেরিয়ে গেছে সে পথে যেমন মধ্যপ্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শালগাছটি আছে।

নাগজিরাতে গাছেদের সমারোহ। অইন, শিশু, হলদু, মহুয়া, বিজা, শিমুল, বয়ড়া, জাম, খয়ের, তিয়াস, শিভান এবং ধাওদা। এছাড়াও আছে আম, কিঞ্জাল, আনজানি, হিরদা, গিসা ইত্যাদি। বাঁশ তো আছেই। আছে ঘাসবন, স্বাভাবিক এবং বনবিভাগের তৈরি করা। চোরখামারা নামে একটি গ্রামও আছে থাডেঝারি গেট পেরিয়ে যাঁরা রাজনন্দনগাঁও, গন্দিয়া, রায়পুর ইত্যাদি জায়গা থেকে আসেন তাঁরা চোরখামারা রোড ধরেই আসেন। এই পথে কতগুলি দোলা আছে, ছোট ছোট স্বাভাবিক হ্রদ, যেখানে বাঘ, নানারকম তৃণভোজী এবং শ্লথ বিয়ার জল খেতে আসে।

টাইগার ট্রেইল বেরিয়ে গেছে চোরখামারা রোড-এর পশ্চিম দিকে— এখানে মহারাষ্ট্র সরকার মেডিসিনাল প্ল্যান্ট কনজার্ভেশন এরিয়া (MPCA) করেছেন। নাগজিরা নানা ওষধি গাছ, ঝোপ, লতা ইত্যাদির জন্যও বিখ্যাত।

হাতিখোদরা খাড়া পাহাড়ি এলাকা। উডল্যান্ড ইকোসিস্টেম-এ যাঁরা আগ্রহী তাঁরা অবশ্যই যাবেন। এই অঞ্চলে লেপার্ড ও শ্লথ বেয়ারের আড্ডা।

কাথেথুবা উপত্যকাতে একটি স্বাভাবিক নুনি আছে। সল্টলিক নানা তৃণভোজীরা নুন চাটতে আসে এখানে। ইন্ডিয়ান রক পাইথন এবং স্যান্ড বোয়া সাপও দেখা যায় এখানে।

অন্ধারবন তিন যুগ আগে এমনই ঘন জঙ্গলাবৃত ছিল যে দিনমানেও অন্ধকার হয়ে থাকত। তাই এই নাম। এখনও জঙ্গল নিবিড়ই আছে। বাঁশের জঙ্গলও আছে, ঘন। তবে এই সব বাঁশ এবারে মরে যাবে কারণ বাঁশ গাছে ফুল এসেছে। ফুল আসা অন্য সব গাছের বেলাতেই আনন্দবাহী ঘটনা কিন্তু বাঁশগাছে ফুল এলে তা দুঃখের কথা কারণ ফুল বাঁশের মৃত্যুবাহী। বাঁশ ফুল দেখতে ভারি সুন্দর। হালকা খয়েরি-লম্বা ডাঁটির ওপরে মকরবালার মতো ফুল ফুটে থাকে। মেয়েদের চুলে গুঁজতে ভারি ভালো অবশ্য যদি মেয়েদের চুল বড় থাকে, আধুনিকাদের মতো ছাঁটা না হয়।

নাগজিরাতে অগণ্য গাউর দেখলাম এবং তাদের স্বাস্থ্য অত্যন্তই ভালো। শুয়োরও দেখলাম অনেক, অতিকায় চেহারার। সেদিন বেলা পড়ে আসছিল, আমরা 'নিলয়'এ ফিরছিলাম। অস্তগামী সূর্যের আভা তখনও ছিল তবে লালিমা

ময়রে গেছিল— সাদা আলোর আভাসটুকু ছিল। গাছগাছালির পর্দার আড়ালে একটি তৃণভূমিতে সেই শুয়োরের দল দাঁড়িয়েছিল। ঠিক থিতু হয়ে ছিল না— সম্ভবত মাঠে মূল খুঁড়ে খাচ্ছিল। তাদের শিল্যুট চোখে আঁকা হয়ে গেছে। বসন্তশেষের বনের দাবদাহ দুপুরের পরে রাত আসার সময়ে মিশ্র বনগন্ধের মধ্যে তাদের সেই ছবি মনের থ্রি পয়েন্ট ফাইভ লেন্সে ধরা রইল চিরকালের জন্য, থুরি যতদিন বাঁচি তার শেষ দিন পর্যন্ত।

অত বড় শুয়োর দেখেছিলাম ছেলেবেলাতে বাবার সঙ্গে শিকারে গিয়ে— ঝুমরি-তিলাইয়া থেকে রজৌলির ঘাট পেরিয়ে একটি উপত্যকা ছিল— বিরাট নির্জন উপত্যকা তিনধারে পাহাড় ঘেরা— মাঝে দুয়েকটি কৃষকের ঘর আর চাষের খেত। ওই শিঙ্গার এখন হয়তো ঘন বসতি হয়ে গেছে। আমি বলছি পঞ্চাশের দশকের একেবারে গোড়ার কথা। অত বড় বড় শুয়োর আর শজারু কোনও বনেই দেখিনি।

শুয়োরের কথাতে মনে পড়ে গেল। বছর তিনেক আগে আন্ধারি-তাড়োবাতে এক হেমন্তের ভোরে একটি প্রকাণ্ড দাঁতাল বরাহবাবাজিকে একদল বুনো কুকুর আক্রমণ করল। বুনো কুকুরের ভয়ে বাঘও ডেরা পাল্টায় কিন্তু সেই বরাহবাবাজি প্রচণ্ড বিক্রমে বুনো কুকুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের মধ্যে বেশ কিছুকে আহত করে ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে জঙ্গলের গভীরে চলে গেল। হতবাক বুনো কুকুরের দল ফ্যালফ্যাল করে সেই অপসৃয়মান বরাহপ্রবরের দিকে চেয়ে রইল। আজ অবধি সিমলিপালে, পালামৌতে, সম্বর ও চিতল হরিণকে বুনো কুকুরের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখেছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা তাদের খেয়ে শেষ করে শুধু কঙ্কালটিকে ফেলে রেখে চলে গেছে হতবাক আমাদের সামনে। কিন্তু বুনো কুকুরের দলকে যুদ্ধে পরাজিত করে যে কোনও জানোয়ার অমন ভাবে চলে যেতে পারে তা অভাবনীয় ছিল। অবশ্য তার আঘাতও নিশ্চয়ই কম হয়নি। তবে বনের গভীরে একবার পৌঁছতে পারলে স্বাভাবিক নিয়মে এবং তার প্রাণশক্তির জোরে সে অবশ্যই বেঁচে উঠবে। বুনো শুয়োর আর বড় ভালুক প্রয়োজনে বাঘের সঙ্গে লড়াই করতেও পিছপা হয় না, যেমন হয় না বড় কুমিরও।

চিতল হরিণও অসংখ্য আছে নাগজিরাতে। সম্বর। বার্কিং ডিয়ার, যার জুওলজিক্যাল নাম Munt Jack। লাল রঙা ছোট ছোট হরিণ যখন বনের মধ্যে অ্যালসেশিয়ান কুকুরের মতো ডাকতে থাকে ক্রমাগত তখন সেই ডাক বনে আর গোখুরি পাহাড়ের আনাচে কানাচে প্রতিধ্বনিত হয়। নীলগাইও আছে নাগজিরাতে— তবে প্রান্তিক এলাকাতে। নীলগাই গভীর জঙ্গলের চাইতে ফাঁকা জঙ্গল পছন্দ করে বেশি— হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্ক-এ যে কারণে নীলগাই অনেক দেখা যায়। একটি তরুণ পুরুষ নীলগাইকে দেখা যায় নাগজিরার ক্যান্টিনের হাতাতে ঘুরে বেড়াতে। যার নাম রাজা। সে ট্যুরিস্টদের গাড়ির কাচ খোলা থাকলে খাবারের জন্য মুখ বাড়ায়। আফ্রিকার সেরেঙ্গেটি প্লেইনস-এর

সেরোনারা লজে ব্রেকফাস্ট করার সময়ে প্রায় পোষ মানা জিরাফ যেমন জানালা দিয়ে মুখ বাড়ায়।

এই ক্যান্টিনটি চালায় দুই ভাই। তাদের নাম মধুকর আর সুধাকর। পদবী দাহিকার। এক ভাই রাতে থাকে অন্য ভাই স্কুটারে করে তাঁদের গ্রাম চোরখামারায় চলে যায় আবার সকালে ফিরে আসে। নাগজিরাতে আমিষ খাওয়া মানা। মদ্যপানও মানা। তবে দ্বিতীয় মানাটি অনেক ক্ষেত্রেই মানা হয় না।

নাগজিরাতে এক বিকেলে তিনটি লেপার্ড দেখলাম। মা আর তার দুই প্রায় বড় হয়ে ওঠা বাচ্চা। আমাদের প্রায় নিঃশব্দ ইঞ্জিনের কালিস গাড়ি একটা বাঁক পেরিয়ে তাদের কাছে পৌঁছতেই তারা তিনজনে তিনদিকে দৌড়ল। গাড়ি ব্যাক করে আমরা যখন আবার তাদের দেখবার চেষ্টা করলাম দেখি দলছুট বাচ্চা দুটি লাফাতে লাফাতে মায়ের দিকে আসছে। জায়গাটি তৃণাচ্ছাদিত এবং পাহাড়ি ছিল। বড় গাছ প্রায় ছিলই না সেখানে তাই ভারি আনন্দ হল দেখে। বাঘ বা লেপার্ডের মতো সুন্দর বেড়াল খুব কমই আছে। দেখতে পেলেই ইচ্ছে করে তাদের ঝলমলে কোমল গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিই। তবে এই ঝলমলের নীচে কী থাকে তা যাঁরা চামড়া ছাড়ানো বাঘ কখনও দেখেছেন তাঁরাই শুধু জানেন। চর্বি নেই, তলপেটে সামান্য ছাড়া, শুধুই দড়ির মতো টান টান পেশী। বাঘ যে কত বড় শক্তিমান জানোয়ার তা তাদের চামড়া ছাড়ানো রূপ দেখলেই শুধু বোঝা যায়। ওড়িশাতে বাঘকে বলে মহাবল। কেন বলে, তখনই তা বোঝা যায়।

নেকড়েও আছে নাগজিরাতে যদিও বনবিভাগের আমলারা তার উল্লেখ করেন না। হয়তো সম্প্রতি এসেছে এক জোড়া। কোন জঙ্গল থেকে এল কে জানে। নাগজিরার পুরো ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সটাই একেবারে কোর এরিয়ার মধ্যে। এমনটা সচরাচর কোনও বনেই দেখা যায় না।

নাগজিরার ভালুক বাবাজিদেরও খুবই নাম-ডাক। এখানে যত উইয়ের ঢিবি আছে, বিরাট বিরাট আকারের, তেমনটি কম বনেই দেখা যায়। এত উইয়ের ঢিবি আছে বলেই সম্ভবত ভালুকদের সংখ্যা এখানে বেশি। ঢিবির মধ্যে তাদের সরু মুখ ঢুকিয়ে আমরা যেমন চোঁ চোঁ করে জল খাই তারাও তেমনই চুষে চুষে উই খায়।

বড় বাঘ অবশ্যই আছে। বেশ কটি আছে। কিন্তু আমাদের চোখে পড়েনি। অন্ধারবনে বাঘের খাবার দাগ দেখেছিলাম। ওখানে জলের ওপরে পাহাড়ের গায়ে একটা লোহা দিয়ে বানানো হাইডও আছে বাঘ দেখার জন্য। অন্ধারবনে গাউরও আছে অনেক। সেই হাইডে বিকেল বিকেল গিয়ে বসলে বাঘ হয়তো দেখা যেত কিন্তু দশ বছর বয়স থেকে ভারতের বিভিন্ন বনে এত বাঘ দেখেছি যে বাঘ দেখার জন্য এই বয়সে আর অত কষ্ট করা পোষায় না।

গোখুরি হিলস-এর একেবারে চুড়োতে রাজগোন্দদের মন্দির আছে। কাপালা দেও-এর মন্দির। দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চড়াই উতরাইয়ে গিয়ে সে পথ পৌঁছেছে গিয়ে কাপালা দেওতে। যদি বনবিভাগের অনুমতি পান এবং পাহাড়ের

মন্দিরে যাবার জন্য বনবিভাগের এসকর্ট এবং গানম্যান পান তাহলেই যাবেন। তবে সচরাচর বাইরের ট্যুরিস্টদের অনুমতি দিতে চান না বনবিভাগ। কারও কোনও বিপদ হলে তো ওঁদের বিপদ আরও বেশি হবে। আজকাল কাগজ এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের পাপারাৎজিদের জন্য কোনও কিছু ঘটলেই অঘটন। কথায় কথায় তিলকে বাড়িয়ে তাল। তাই সাবধানী তো তাঁদের হতেই হয়। তবে রাজগোন্দদের যেতে কোনও বাধা নেই। বছরের একাধিক বিশেষ দিনে তাঁরা স্ত্রী-পুরুষে মিলে দলবদ্ধ হয়ে যান। পথের দৃশ্য নাকি খুবই সুন্দর। তা তো হবেই। যে পথে দুর্বুদ্ধিজীবীদের পা রোজ পড়ে না সে পথ সুন্দর তো হওয়ারই কথা।

নাগজিরা অভয়ারণ্য আরও একটি কারণে ভারতবিখ্যাত। সেই কারণটি হচ্ছে এখানের প্রজাপতিরা। দেশ বিদেশের প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ বা Lepidopterists রা প্রতি বছরই এখানে আসেন। ভারতে প্রায় পনেরশো প্রজাতির প্রজাপতি আছে, নাগজিরাতে উনপঞ্চাশ রকমের প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায়। শ্রী এম এস কালাসকার নাগজিরার অ্যাসিস্ট্যান্ট কনজার্ভেটর এবং শ্রীমতী কে এম কালাসকার প্রাণিতত্ত্বে এম এসসি, দুজনে মিলে নাগজিরার প্রজাপতি সম্বন্ধে একটি চটি সংকলন করেছেন, পারলে সেটি সংগ্রহ করবেন। এই সংকলনের পিছনে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের ডঃ এ এম খুরাদেরও অবদান আছে। এই সংকলনে কিছু প্রজাপতির রঙিন ছবিও দেওয়া আছে। প্রজাপতিদের শরীরে তিনটি ভাগ আছে। Head, Thorax এবং Abdomen. তাদের দুজোড়া করে পাখা আর তিনজোড়া করে পা থাকে। এখানে খুব দুষ্প্রাপ্য প্রজাপতি দ্যা ড্যানিড এগফ্লাইও দেখতে পাওয়া যায়। ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজার্ভেশন অ্যাক্টের সিডিউল ওয়ান-এ এই প্রজাপতির উল্লেখ আছে। এ প্রজাপতি ধরলে বা মারলে বাঘ মারার সমান অপরাধ। তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে। প্রজাপতিদের ভারি সুন্দর সুন্দর নাম। Lemon Emigrant, Spotless Glass Yellow, Striped Tiger, Common Indian Crow, Black Rajah, Lime Butterfly, Common Rose, Blue Pansy, Chocholate Pansy, Lemon Pansy, Baronet, Staff Seargent, Commander, Common Sailor, Bamboo Tree Brown, Dark Band Bush Brown আরও কতরকমের। নামগুলি একসঙ্গে দিলাম বটে কিন্তু এরা প্রজাপতির বিভিন্ন প্রজাতির অন্তর্গত।

যাঁরা প্রজাপতি ভালোবাসেন, বা প্রজাপতি নিয়ে পড়াশোনা করেন, পুরোদস্তুর লেপিডপটারিস্ট হোন আর না হোন নাগজিরাতে নানা প্রজাতির প্রজাপতি দেখতে পাবেন। Lepidopterist শব্দটা এসেছে প্রজাপতির প্রজাতি Lepidoptera থেকে। ছারপোকার প্রজাতিকে বলে Heteroptera.

একটু বেশি জ্ঞান দিয়ে ফেলা হল হয়তো। নিজে অজ্ঞ বলেই নানা বিষয়ে জানতে ইচ্ছে করে। রসিকজনে আশা করি ক্ষমা করবেন।

নাগজিরা যদি কখনও যান তবে কাছেই নভেগাঁওতে যেতে ভুলবেন না।

সাকোলি থেকে একটু আগে গিয়ে ডানদিকে যেতে হবে কিছুটা। সাকোলি থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার মতো পথ। তবে শীতকালে এলেই যাবেন। কারণ, নভেগাঁও একটা বার্ড স্যাংকচুয়ারি। যদিও সংলগ্ন সংরক্ষিত বনভূমিও আছে এবং তাতে বড়কা বড়কা শুয়োর এবং চিতাবাঘও আছে। এক মালগুজার কবে এই হ্রদ খনন করিয়েছিলেন ঠিক জানা গেল না, কেউ জানলে, দয়া করে জানাবেন।

ভি আই পি বাংলোটি তিনতলা এবং কাঠের। স্বল্প পরিসর। দুটি ছোট ছোট বেডরুম এবং একটা মনোহরণকারী বারান্দা আছে। দোতলাতে সিটিং-ডাইনিং রুম। ক্রকারি কাটলারি সব আছে। তবে খাবার ক্যান্টিন থেকে আনাতে হবে। ক্যান্টিনের কাছে অনেকগুলো কটেজ আছে। গ্রীষ্মে পাখি নেই। কিছু Common Egrets আর Cormorants। সন্ধের পরে ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ বুকের মধ্যে চমক তুলে ডেকে বেড়ায় Did you do it? Did you do it? Did you do it?

ভি আই পি বাংলোর তেতলার বারান্দাতে দাঁড়িয়ে নভেগাঁও হ্রদের পুরোটা দেখা না গেলেও অনেকখানি দেখা যায়। সামনেই একটি বয়স্ক বোগোনভোলিয়া— ম্যাজেন্টারঙা ফুল ফোটানো— এবং একটি বড় চাঁপা গাছ আছে। এপ্রিল-মে মাসে সাদা চাঁপা ফুলে গাছটা ভরে থাকে এবং পরিবেশ চাঁপার গন্ধে ম ম করে। এখানে বিদ্যুৎ আছে। ঘরে রুম কুলারও আছে। বাথরুমে গিজার। সুখী মানুষেরা সচ্ছন্দে আসতে পারেন। তবে বিকেলে ভোল্টেজ একেবারে নেমে যায়। রাত যত বাড়ে ভোল্টেজ তত বাড়ে। তাছাড়া এপ্রিল-মেতে হ্রদের দিক থেকে একটা হাওয়া ছাড়ে রাত গভীর হলে। শেষ রাতে গায়ে চাপা দিতে হয়।

পারলে, নাগজিরা নভেগাঁও একবার ঘুরে আসবেন। সব অভয়ারণ্যেরই একটি নিজস্ব চরিত্র থাকে, নিজস্ব শব্দজগৎ, নিজস্ব গন্ধ। নাগজিরারও আছে। সে কারণেই প্রত্যেক অভয়ারণ্যই অনন্য— নিজের নিজস্বতায় মাতোয়ারা। নিজে না গেলে পরের মুখে ঝাল খেয়ে মন ভরবে না।

একটা কথা। ওদিকে গেলে, নিজেদের সঙ্গে সর্বক্ষণের জন্য বাহন থাকা খুবই জরুরি।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৪

ব্রাজিল অবরিগাদো

মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়

ব্রাজিল এমন একটি দেশ যার সম্বন্ধে আমাদের বাঙালিদের মনে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালাবাসা এবং আন্তরিকতা আছে। তাই যখন সুযোগ পেয়েছিলাম ওখানে যাবার আর বেশ কয়েক মাস থাকার, তখন প্রথম থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম দেশটাকে যতটা সম্ভব তন্নতন্ন করে দেখব। সাও পাওলো এয়ারপোর্টের মতো সুবিশাল এয়ারপোর্ট আমাদের দেশে একটাও নেই। কথা ছিল ওখানে আমাকে একজন নিতে আসবে। আমার গন্তব্যস্থান হল তাউবাতে, সাও পাওলো থেকে একশো তিরিশ কিলোমিটার উত্তরে। আমাদের উচ্চারণে যেটা সাও পাওলো সেটা পর্তুগিজ উচ্চারণে হবে সাঁ পালো। Sao উচ্চারণ হবে সাঁ, যেমন কারও নাম যদি হয় এডসন, যার বানান হবে edson, তাকে ডাকা হবে এডসোঁ বলে। চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে উচ্চারণ খুব সাধারণ, ফলে অনুনাসিক আওয়াজ হয় প্রচুর, শুনতেও বেশ মিষ্টি। আমরা যেমন ডাকি ওরে পাঁচু, ওরা ডাকে ও এডসোঁ। একটু সুরেলা আওয়াজে ডাকা হয়, অনেকটা বীরভূম বাঁকুড়া জেলার মেয়েদের গলার ডাক, একটু দুলিয়ে, একটু সুরের ছোঁয়া লাগিয়ে।

প্রথম ধাক্কা খেলাম ভাষা নিয়ে। সবার ধারণা ইংরিজি জানলে কোথাও অসুবিধে হয় না। সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কাস্টমস অফিসার ইশারায় ব্যাগ খুলতে বলল, ভাষা জানে না। ইংরিজি না জানা কাস্টমস অফিসার কোনও দেশে দেখিনি। আমি ডিক্লেয়ার করেছি আমার কাছে কোনও ডিউটি লাগার মতো মাল নেই। ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেল ধূপকাঠি, তিন প্যাকেট। আমার মানিব্যাগের মধ্যে মা কালীর ছবি, সঙ্গে ধূপকাঠির প্যাকেট, সুযোগ পেলে আর পাঁচটা বাঙালির মতো পুজো-টুজো করার ইচ্ছে রয়েছে। ধূপকাঠি নিয়ে ভয়ানক সন্দেহ হল তার মনে। যে জীবনে ধূপকাঠি দেখেনি সে কেমন করে জানবে তার রহস্য। আমাকে বলল

—হাসিস?

বললাম— না ভাই হাসিস-টাসিস নয়। গাঁজা খায় শিব ঠাকুর, মা কালী গাঁজা খায় না, ছিঃ অমন কথা বলতে নেই।

তবু তার সন্দেহ যায় না। তখন বার করলাম মা কালীর ফটো মানিব্যাগ থেকে,

বললাম— গডেস উইথ বিগ টাং, কালী-কালী। প্যাকেট ছিঁড়ে একটা কাঠি বার করে ওরই লাইটার দিয়ে ধরালাম। বেশ ধোঁয়া-টোঁয়া বার করে ফটোর সামনে দুপাক ঘুরিয়ে প্রণাম করার ভঙ্গি করলাম। বললাম — পূজা, প্রেয়ার, ওয়ারশিপ, গড। বুঝল সে, ভালো করেই বুঝল, দাঁত বার করে বলল, বুড্ডা-বুড্ডা-ওকে-ওকে।

মনে মনে বললাম, হ্যাঁ ভাই আমি একেবারে খোদ বুদ্ধদেবের বাপের বাড়ির লোক। এখন দয়া করে ছাড়, দেখি কে এসেছে আমাকে নিতে। কাউকে যদি না পাই তো চিত্তির। ও কী করে জানবে একমাত্র বুদ্ধের সামনেই ধূপকাঠিটি জ্বালানো হয় না, অন্য সব দেবদেবীও ধূপের ধোঁয়া পছন্দ করেন। এমনকি খোদ কাস্টমস অফিসারও দুটো ধূপকাঠি নিয়ে শুঁকতে লাগল গন্ধ।

আহা কী আনন্দ! দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি বড় বড় করে মুখার্জি লেখা বোর্ড একটা, অনেক উঁচুতে। কালো মতো একটি নিগ্রো মেয়ে সেটি ধরে রেখেছে। সেই মেয়েটি বড় হতে লাগল আমি যত এগিয়ে আসছিলাম। বড় হতে হতে বিশাল হয়ে গেল, আমার জীবনে অত লম্বা মেয়ে আমি দেখিনি। সাত ফুট নাকি তারও বেশি? আকাশের দিকে মুখ তুলে বুকে হাত রেখে বললাম, মুখার্জি।

—হাই, মাইসেল্ফ রেনাটা, ফ্রম আমেরিকান এক্সপ্রেস। ওয়েলকাম টু ব্রাজিল।

যাক বাবা বাঁচা গেল, মেয়েটা ইংরিজি বলে। সেই বক আর শেয়ালের গল্প আছে না ঈশপের বইয়ে, তেমনই করে বেজায় লম্বা হাত নাড়িয়ে অনেক ঝুঁকে হাত মেলাল। কয়েকটা কথা জেনে নিয়েছিলাম, পর্তুগিজ ভাষায় অবরিগাদো মানে, ধন্যবাদ, থ্যাঙ্ক ইউ। কথায় কথায় যদি লোকে থ্যাঙ্ক ইউ না বলে তাকে জংলী বলবে এদিকে। আমি আর যা হই জংলী হতে রাজি নই। বললাম— অবরিগাদো, মুইতো অবরিগাদো। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।

কুচকুচে কালোমুখ বড় বড় সাদা দাঁত বার করে মধুর হাসল সে। আমার সামান্য পর্তুগিজ ভাষার জ্ঞান তার পছন্দ হল মনে হল। পিছন পিছন চলে এলাম পাঁচতলার আমেরিকান এক্সপ্রেস অফিসে। মেয়েটা আমাকে যার হাতে সমর্পণ করল সে আবার এককোঁটা ইংরিজি জানে না। আমার একটা মোটে ব্যাগ আরেকটা ব্রিফকেস তুলে নিয়ে বিনাবাক্যে চলল সেই সুদর্শন খুব ফর্সা ছেলেটা, নাম তার রিকার্ডো, উচ্চারণ হবে হিকার্দো। এরা 'র' প্রথমে থাকলে তাকে বলবে হ, আর ট ঠ ড ঢ বলতে পারে না, ব্যঞ্জনবর্ণের ওই পুরো লাইনটা নেই। বদলে আছে ত থ দ ধ। নরম ভাব ভাষার মধ্যে প্রকাশিত। মেয়েটা আমার পিছন পিছন এল গাড়ি পর্যন্ত, অনেক দূরে কার পার্কিং জায়গাটা। কত কিছু বোঝাতে এল যার কয়েকটির সার সংবাদ আমার মাথায় ঢুকল, কোথাও জল খেয়ো না, রাতে বাইরে যেও না, মেয়েরা ডাকলে যাবে না, ব্রাজিল অতি নচ্ছার জায়গা, ভেরি ব্যাড প্লেস। চাও চাও, বিজিং বিজিং।

গাড়ি ছেড়ে দিল। ঘুরে ঘুরে গাড়ি হাইওয়েতে। আট লেনের হাইওয়ে, এপাশে চার ওপাশে চার মোট আটটা গাড়ি যাবার মতো রাস্তা। অথচ গাড়ি তো তেমন

নেই। এক ধাক্কায় গাড়ির গতি উঠল আশিতে। একটু পরে লেন পাল্টে গাড়ি উঠল একশো, তারপর একশো কুড়ির লেনে। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে বেল্ট বেঁধেও আমার অস্বস্তি হতে লাগল। আমি এমন আনাড়ি লোক নই যে ভয় পেয়ে যাব অকারণ। তবু একদম অজানা জায়গায় একদম অজানা এক লোকের সঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে যখন একশো পঞ্চাশে তুলল স্পিড, তখন মুখের কথা মুখেই থাকল আমার। জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম, হোয়াট ইজ চাও চাও, বিজিং বিজিং।

মিনিট দশ লাগল ধাতস্থ হতে। ছেলেটার হাত খুব ভালো, সুন্দর চালায় গাড়ি। এইরকম জোরে গেলে একঘণ্টাও লাগবে না তাউবাতে পৌঁছতে। আমার প্রশ্নটা তাকে বললাম, কেননা সেই কালো অত্যন্ত ঢ্যাঙা মেয়েটা চাও চাও বলার পর বিজিং বিজিং বলার সময় দুষ্টুমির হাসি হেসেছিল, যা আবার দেখেছিলাম তার মুখে যখন বলল, মেয়েরা ডাকলেও যাবে না। জানি হিকার্দো ইংরিজি জানে না তবু বললাম, হোয়াট ইজ বিজিং বিজিং, হিকার্দো?

— বিজিং বিজিং, ইংলিশ কিস কিস। চাও চাও— ইংলিশ বাই।

আচ্ছাই মেয়ে, বিদেশি পেয়ে মজা করেছে। আমার পর্তুগিজ জ্ঞানের বহর টেস্ট করেছে। নজর ঘুরছিল বাইরে, সামনে। আশপাশে কোনও ঘরবাড়ি নেই, কারখানা নেই, দূর দূর পর্যন্ত কোনও দোকানঘর চোখে পড়ে না। গাছপালাও তেমন নেই। কেবল চওড়া রাস্তা সামনে, একদম সোজা চলেছে উঁচু-নিচু জমির ওপর দিয়ে। রাস্তার ধারে গাছও লাগায়নি। রাস্তার ডানদিকে গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা আমার নেই। তারপর নজরে পড়ল আপ ডাউন রাস্তার দুটি ভাগের মাঝের অংশে জবা গাছের লাইন। জবা গাছ, জংলী জবা গাছের জঙ্গল সমানে চলেছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। গাছগুলো বেশ উঁচু এবং তাতে প্রচুর ফুল ফুটে আছে। কালীপুজোয় লাগে জবাফুল, রক্তের রং তার অঙ্গে অঙ্গে। অজস্র লাল জবাফুল ভরে রেখেছে আমার বাঁদিক, অথচ এরা মা কালীকে চেনে না।

রাস্তার ধারে ধারে দুচার কিলোমিটার পর পর হেলমেটের মতো দেখতে একটা কিছু টাঙানো রয়েছে। ভাবছিলাম হিকার্দোকে জিজ্ঞেস করব। পরক্ষণেই দেখলাম একটা হেলমেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে একজন টেলিফোনে কথা বলছে। ও হরি, ওগুলো টেলিফোন, পাবলিক টেলিফোন।

হাইওয়েতে কোনও ক্রসিং নেই। রাস্তার নিচ দিয়ে যাও অথবা ওপর দিয়ে। আমরা ডানদিক থেকে আরও ডানদিকে সরে গিয়ে পুলের ওপর দিয়ে হাইওয়ে পার করলাম। দূরে দূরে ঘরবাড়ি চোখে পড়ছে। ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়াল হিকার্দো। একটা সরু রাস্তা ক্রস করেছে, তার জন্য লেখা আছে পারে। ছোট পকেট ডিকশনারিতে দেখলাম পারে মানে হল স্টপ। স্টপ তো স্টপ, গাড়ি থাক বা না থাক দাঁড়াও। কী চমৎকার আইন মেনে গাড়ি চালায় এরা। যারা অত জোর গাড়ি চালায় তাদের আইন না মানলে দুর্ঘটনা, আর দুর্ঘটনা মানে মৃত্যু।

হোটেলের নাম গাভিয়া, গাভিয়া মানে নৌকোর পাল। ছোট ছোট নৌকোয় যে

পাল থাকে তার নাম গাভিয়া। ছোট চারতলা হোটেল, সামনে সবুজ ঘাসের লন, তাতে রংবেরঙের ছাতা টাঙানো রয়েছে। সেই তুলনায় রিসেপশনটি বেশ বড়। ওরা কেউ ইংরিজি জানে না। মন্দের ভালো আমার জন্য ঘর বুক করা ছিল সবচেয়ে ওপরতলায়, দুকামরার স্যুট। এখানে আমাকে কয়েকমাস থাকতে হবে। ভারত সরকারের সঙ্গে ব্রাজিল সরকারের সমঝোতা হয়েছে, সমুদ্রের ভেতর পেট্রোলিয়াম খোঁজার কাজে সহায়তা করবে। সেই সূত্রে আমার আসা, ব্রাজিল সরকারের অতিথি হয়ে।

জল খেতে বারণ করেছিল রেনাটা। কিন্তু আমার যে এখন তেষ্টা পাচ্ছে তার কী হয়। চাইলাম জল, ওয়াটার, অ্যাকোয়া, বুঝল না তারা। ইশারায় জল খাবার ভঙ্গী করে দেখালাম, হল না। ডিকশনারি দেখে বললাম আগুয়া। ও-হো তাই বল, খাবার জল? এবার ওদের মুখ শুকিয়ে গেল। দ্রুত আলোচনা চলল, পরে এল একটি ছোট বোতলে করে জল, পরিষ্কার ইংরিজিতে লেখা, ন্যাচরাল মিনারেল ওয়াটার ফর এক্সটার্নাল ইউজ ওনলি। খাবার জল নয়, বাইরে ব্যবহারের জন্য। কলের জলও বাইরে ব্যবহারের জন্য, তাহলে এই বস্তুটি কী?

ব্রাজিলে কেউ জল খায় নাকি? খায়, পরে দেখেছি খায়, তবে তার জন্য নানারকম কায়দা আছে, আছে আমাদের দেশের মতো ভালো কোম্পানির ফিল্টার করা, বিশেষ শোধনকরা জল। বিয়ার খায় এরা জলের বদলে, পাড়ায় পাড়ায় বিয়ার জয়েন্ট। বৈঠকখানায় বিয়ার ভেন্ডিং মেশিন লাগিয়ে গৃহকর্ত্রী সংসারের কাজে ব্যস্ত। তোমার তেষ্টা পেয়েছে, বৈঠকখানায় ঢুকে বিয়ার মগ নাও একটা, জার্মান বিয়ার স্ন্যাপসের দশলিটারের বোতল লাগানো মেশিনের কল খুলে মগ ভর্তি কর। পান করার পর গ্লাস ধুয়ে রাখবে, তার জন্য কল আছে, কলে জল আছে। মগটি উপুড় করে রেখে দুই ক্রুসাডো পাশে রেখে চলে যাও। কেউ কিছু দেখতেও আসবে না, বলতেও আসবে না। স্টেনলেস স্টিলের বোতলের বিয়ার তামার ফ্রিজিং কয়েলের ভেতর দিয়ে ঠান্ডা হয়ে কুল কুল করে পড়বে মগে। আমাদের গ্যাসের মতো ওদের বিয়ারের সিলিন্ডার মুদিখানায় কিনতে পাওয়া যায়। মেয়েরা বাজার করার সময় সেটি কিনে আনে। সংসার করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুটো পয়সা রোজগার হয়, বাড়ির প্রয়োজনও মেটায়। ব্রাজিলে জলের বদলে সুকো খায় সবাই, সুকো হল ফলের রস, খুব সস্তা।

বিকেলের বিয়ার জয়েন্ট, আমাদের গলির মোড়ের চায়ের দোকানের মতো জমজমাট। বিয়ারের সঙ্গে খাওয়ার জন্য অনেক রকম চাট পাবে। ব্যাঙের ঠ্যাং ভাজা, শুয়োরের নাড়িভুঁড়ি ভাজা, পেঁয়াজ শিকে গেঁথে পোড়ানো। সস্তার সব খাবার জিনিস। হোটেলে এসে ভালো করে চান করে একটা পরিষ্কার ঘুম দিয়ে বিকেলবেলা বেড়াতে বেড়াতে এইসব দেখছিলাম আর এগোচ্ছিলাম। রেনাটা বলেছে রাতে বাইরে যাবে না। তাই বিকেল বিকেল দেখে নিই শহরটা কেমন।

প্রতি শহরে একটা দাউন তাউন থাকবে, তার মানে বাজার এলাকা। বাজার

এলাকাকে কেন ডাউন টাউন বলবে বোঝা মুশকিল। শহরের মিউনিসিপ্যালিটি ওখানে একটা স্কোয়্যার বানাবে, পার্ক বানাবে, চারপাশে দোকানপাট থাকবে। তাউবাতের স্কোয়ারও তেমনই। সেখানে দেখলাম বড় বড় মাইক লাগানো হচ্ছে। হয়তো গান-টান হবে। পিছনদিকে বেশ উঁচু বিল্ডিং পাঁচতলা, নাম লেখা জুম্বো লুত্রো। জুম্বো মানে হাতি, আর লুত্রো মানে ইলেকট্রিক। বেশ কাচ-টাচ লাগানো সুন্দর চেহারা বাড়িটার। অনেক লোক ঢুকছে বের হচ্ছে, আমিও ঢুকলাম। বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স। সমানে এস্কালেটার চলছে, বেসমেন্ট থেকে দোতলা, তিনতলা, চারতলা পর্যন্ত। চলে এলাম সবচেয়ে ওপরতলায়। ঘুরে দেখলাম, ওটা বাচ্চাদের এলাকা। জামা, প্যান্ট, গাড়ি, পুতুল সব বাচ্চাদের। চুষিকাঠি থেকে বিছানা পর্যন্ত রয়েছে। তার নীচের তলায় চামড়ার জিনিস সব, জুতো থেকে জ্যাকেট যা চাইবে পাবে। তারও নীচে এসে মনে হল এই তো পেয়েছি। যত রকম সাবান, স্নো, ক্রিম-টিম, টুথপেস্ট ইত্যাদি, একেবারে এলাহি ব্যাপার। দাড়ি কামানোর ক্রিম খুঁজছি, পাচ্ছি না, কাকে বলি। কর্মচারীদের ড্রেস দেখলে চেনা যায়। সামনে পড়ল একটা পুঁচকে মেয়ে। ইশারায় দেখালাম গালে ফেনা লাগানোর মতো করে রেজার চালানোর প্রক্রিয়া। অবাক হয়ে দেখল আমাকে, যেন এক বিচিত্র মানুষ দেখছে এমন ভাব। তারপর আমার হাত ধরে যাকে বলে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল নীচের তলায়। সেখানেও সেই একই রকমের সাবান, সেন্ট, স্নো, পাউডার, ক্রিম এবং কী আশ্চর্য দাড়ি কামাবার ক্রিমও আছে।

মেয়েটা বোঝাল আমাকে, ভালো করেই বুঝিয়ে দিল। প্রথমে আমার বুকে হাত রেখে বলল ফিলিও, তারপর দেখাল তাকগুলোকে। এবার নিজের বুকে হাত রেখে ফিলিয়া, দেখাল ওপরতলার দিকে। আমি পুরুষ, নীচের তলায়, ওপরে ফিলিয়াদের ডিপার্টমেন্ট। মেয়েদের স্নো ক্রিমের জায়গায় দাড়ি কামাবার ক্রিম কেন পাব? হেসে ফেললাম। বললাম, অবরিগাদো, মুইতো অবরিগাদো। সুন্দর তাচ্ছিল্যের হাসি উপহার দিয়ে চলে গেল সে।

মুখ আঁধার হয়ে এসেছে, এককাপ চা হলে ভালো হয়। রাস্তার ধারে চায়ের দোকান নেই, তাছাড়া এরা চা খায় না, খায় কফি। হোটেলে ফিরলাম চা খেতে। আমার ঘরে এসে দেখি ব্যাগ খোলা, ব্রিফকেস খোলা, একটা মেয়ে সেসব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছে। আমাকে দেখে নিজের ভাষায় অনেক কিছু বলল। রুমালগুলো কাপড় কাচার বিনের মধ্যে ফেলল। দুটো শার্ট ওয়ার্ডোবে রাখল। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম, অন্যের জিনিস কেমন অবলীলায় গুছোচ্ছে, যেন নিজের জিনিস। হঠাৎ একটা গেঞ্জি দেখে আমাকে বলল— এটা কী! তার ভাষা আলাদা, কিন্তু ভঙ্গী, সেটা যাবে কোথা?

নিজের বুকের কাছে শার্ট সরিয়ে দেখালাম গেঞ্জি। মেয়েটা হেসে কুটি কুটি— কামিসোলা —কামিসোলা। সে তো বুঝলাম কামিসোলা মানে গেঞ্জি, কিন্তু তুমি কে হে, আমার ঘরের চাবি খুলে আমার জিনিস নিয়ে টানাটানি করছ? ওর ভাষা না

বুঝেও যদি বক্তব্য বুঝতে পারি আমি, তাহলে আমার বাংলা ভাষা কী দোষ করল? পরিষ্কার বাংলায় বললাম—

—এই যে মেয়ে নাম কী তোর, য়্যাঁ? আমার ঘরে কেন বাবা, মতলবটা কী বল দিকিনি?

—মিউ নোমে? লিজিয়া। —ভোসে নোমে মানিরাতানা।

বুকপকেট থেকে কলম তুলে নিল অবহেলায়, আমারই হাতের চেটোয় নাম লিখল—lidia এরা d কে j উচ্চারণ করে। লিডিয়াকে বলবে লিজিয়া। আবার বলল— মিউ ক্রিয়াদা, এপার্টমেন্তো ক্রিয়াদা। ডিকশনারি খুললাম, এপার্টমেন্তো মানে রুম, ক্রিয়াদা মানে মেড। তাহলে লিজিয়া আমার রুমমেড। তা ভালো কিন্তু এর সঙ্গে কথা বলা খুব মুশকিল হবে। তাই বা ভাবছি কেন, বাংলায় বলেছি, কী নাম তোর, কেমন মিউ নোমে লিজিয়া। কিচ্ছু কঠিন নয় বোঝা।

বিছানায় বসে জুতো মোজা খুলতে খুলতে দেখছিলাম তার কাজ। খুব বেশি হলে সতের আঠের বয়েস হবে, আমাদের হিসেবে স্কুল কলেজে পড়া মেয়ে। কেমন খোলামেলা, কোনওরকম জড়তা বা আড়ষ্টতা নেই। সুন্দর ফর্সা রং গায়ের। মুখ চোখের গড়ন চমৎকার। আমাদের দেশে হলে একে অত্যন্ত সুন্দরী বলা হবে। সন্দেহ হল মনে। এসব হোটেলে উল্টোপাল্টা ব্যাপার নেইতো? কে জানে, বিদেশ বলে কথা। বাথরুমে ঢুকেছে মেয়েটা, কী যেন ঘষামাজা করছে মনে হল। উঁকি মেরে দেখলাম, কলগুলোকে ব্রাসোর মতো কিছু দিয়ে ঝকঝকে করছে। কী ভেবে সে বেরিয়ে এল, টেলিফোন তুলে হুকুম করল কাকে যেন— দয়েস কাফে দো মেনিয়া এপার্টমেন্তো কোয়ার্তোসিনকো দোস।

কী বলল ও, রুম চারশো দশ, কাফে, বেশ বোঝা যায়, আমার জন্য কফি আনতে বলল। বা রে মেয়ে, খেয়াল আছে সব। এরা চাবি কে বলে সাভি, সাবান হল সাবু আর দশ হল দোস। বাথরুমে সময় নিচ্ছে অনেক, আমাদের মতো নয় যে রুমবয় বলবে বাথরুম ধোয়া আমার কাজ নয়। সব কাজই ওর কাজ। একপক্ষে ভালো হল। কাল থেকে সারাদিন বাইরে বাইরে থাকব। জামা কাপড় মোজা কাচা ইস্ত্রি করা, সব এই মেয়েটা দেখতে পারবে। ওই ভাবনা থেকে আমি মুক্ত। কিন্তু করেছে কী, বাথরুমের চেহারা ফিরে গেছে। নিখুঁত পরিষ্কার বলে যদি কিছু থাকে তা হল এই। প্রত্যেকটি জিনিস ঘষেমেজে এত উজ্জ্বল করেছে যে, সত্যি চেনা যায় না। হাত -মুখ ধোব বলে কল খুলতে মায়া লাগছে, মেয়েটার এত পরিশ্রমের পরিষ্কার করা বেসিনটা নোংরা হয়ে যাবে বলে।

একগাদা খাবারসমেত ট্রে নামাল বেয়ারা। এত খাবার খাব কী করে? হাত ধুয়ে এসে গেছে লিজিয়া, এপ্রনে হাত মুছে সই করল হোটেলের বিলে। ছোট টেবিলের সামনে হাঁটুগেড়ে বসে পাতলা টোস্টে মধু লাগাল নিপুণ হাতে, তার ওপর ছড়িয়ে দিল হলুদ রঙের খোয়া ক্ষীরের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো কিছু। দুটো টোস্ট, আলুভাজা আর মনে হল মাংসের পোড়া ধরনের এক টুকরো কিছু। প্লেটটা এগিয়ে দিল

আমার দিকে। নিজের জন্য বানাল একই রকমের জলখাবার। বকবক করছিল লিজিয়া সমানে। হয়তো নিজের কথা বলছিল, কিংবা আজ থেকে এই হোটেলে ওর নিযুক্তি হয়েছে কেবল আমার দেখাশোনা করার জন্য। এসব হয়তো বলছিল যার কিছুই বোধগম্য হল না আমার।

ঠিক করেছি আর যাই করি মাংস-টাংস খাব না। এরা গরুর, শুয়োরের মাংস খায়। ওসব খেয়ে পরে ভুগতে হবে। যদিও আমি নিরামিষাশী নই, তবু বিদেশে বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়। মধু দিয়ে টোস্ট ভালো না লাগবার কারণ নেই। আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তো খুবই পছন্দের। অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না লিজিয়া, খেল পেটভরে। ভালো লাগল আমার, আর যাই হোক, ভনিতার বালাই নেই। কফি ঢালল ছোট্ট ছোট্ট কাপে, খেলাঘরের কাপের মতো। তাতে কুচকুচে কালো রঙের গাঢ় তরল পদার্থ ঢালল সে। বললাম—অবরিগাদো, মুইতো অবরিগাদো।

অমন নির্মল হাসি, কৃতার্থের হাসি, গর্বের হাসি বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু ভাই তেতো কালো কফি যে গলা দিয়ে নামছে না, তার কী করি। ব্রাজিলের কফি ভুবন বিখ্যাত। এই তার নমুনা? ডিকশনারি দেখে বললাম— লেইতে। ইশারায় দেখালাম কফির কাপে দুধ ঢালার মতো। দুধ না হলে এত তেতো কফি খাওয়া যাবে না। ছুটল লিজিয়া, নিচ থেকে গরম দুধ এনে আবার নতুন করে কফি বানিয়ে দিল। এবার অতটা খারাপ লাগল না। সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে চলে গেল লিজিয়া। যাবার আগে বলল, বঁ নয়তে। মানেটা পরিষ্কার—গুড নাইট।

হোটেল থেকে আমাকে একটা গাড়ি দিয়েছে ড্রাইভারসমেত। ড্রাইভারের নাম ফার্নান্দো, সে বোবা এবং কালা। ভালোই হয়েছে, বোবা বলে তার সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই। কিন্তু কালা হলে গাড়ি চালাবে কেমন করে? অন্য গাড়ির হর্ন শুনতে পাবে না। কিন্তু আমার আশঙ্কা অমূলক, তার প্রমাণ খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে গেলাম। কোনও গাড়ি কখনও হর্ন দেয় না, এ এক অদ্ভুত নিয়ম। শব্দদূষণ কথাটা ওই দেশের পক্ষে প্রয়োজন হয় না, বিশেষ করে মোটর গাড়ির ক্ষেত্রে। যতদিন ছিলাম ব্রাজিলে, মাত্র একবার ফার্নান্দো হর্ন বাজিয়েছিল, একটি গৃহপালিত কুকুর রাস্তার মাঝে এসে পড়েছিল হঠাৎ করে তাই।

আমাদের ভারতে যখন দিন ব্রাজিলে তখন রাত, আমাদের যখন শীত ব্রাজিলে তখন গ্রীষ্ম। দিন তিনেক লেগেছিল আমার ধাতস্থ হতে। তারপর আমিও ওদেরই একজন হয়ে উঠেছিলাম। আমার গায়ের রং, উচ্চতা, মাথার চুলের রং, চোখের তারার রং, সব ওদের সঙ্গে মেলে। তিন রকমের মানুষ এবং তাদের মিশ্রণে নানা রকমের মানুষ তৈরি হয়েছে এদেশে। এক হল ইউরোপের মানুষ, পর্তুগিজ, ইটালিয়ান, স্প্যানিস, জার্মান ইত্যাদি সাদা রঙের মানুষ, যারা এখনও নিজেদের উচ্চতর জাতি বলে মনে করে এবং সেটি সযত্নে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট। দুই হল কালো রঙের মানুষ, যারা আফ্রিকা থেকে আখের খেতে কাজ করার জন্য এসেছিল। এসেছিল বলা উচিত নয়, বলা উচিত ধরে আনা হয়েছিল এবং

ক্রীতদাস হয়ে বিক্রি হয়েছিল। সাদা মায়ের কোলে কুচকুচে কালো রঙের বাচ্চা দেখেছি আমি, কেমন কেমন যেন অনুভূতি হয়। এদের সঙ্গে সাদাদের মিশ্রণে নানারকম কম্বিনেশনের মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। তিন হল এদেশি আদিবাসী, যাদের এরা বলে ইনজুন, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান। রেড ইন্ডিয়ান নয়। এদের রং ছিল তামার মতো। মেরেকেটে এখন দুলক্ষ মাত্র আদিবাসী আছে ব্রাজিলে, যাদের রক্তে সংমিশ্রণ ঘটেনি। বাকিরা সব মিশ্রিত জাতি হয়ে গেছে।

কালো চুল, কালো চোখ ইনজুনদের। সাদা আর তামা রঙের মিশ্রণে ব্রাউন রং, অতএব আমি নিজেকে ইন্ডিয়ান বললে ইনজুন বংশধর বলে সবাই মনে করে। আমি ইন্ডিয়া থেকে এসেছি বললে বলবে ইন্ডিয়া, সেটা আবার কোথায়? ইন্ডিয়া কি জাপানের কাছে?

এই দেশে প্রচুর জাপানি আছে। এক সময়ে জাপানে আকাল নেমেছিল। খাদ্য এমনিতেই কম সেদেশে, তার ওপর ঠান্ডা, বরফ, আর অভাবের তাড়নায় দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল তারা। নিজেদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেছে। এরা জাপানি ভাষা বললেও সেই জাপানি শুনলে হাসি পাবে যারা জাপানি ভাষা বোঝে। সেটা একটা পর্তুগিজ উচ্চারণে খিচুড়ি ভাষা হয়ে গেছে। তবু নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে এরাও। জাপানি মূলের লোকেরা পারতপক্ষে অন্য জাতের লোককে বিয়ে করে না। তবে জাপানি রক্তের সঙ্গে ইউরোপিয়ান সংমিশ্রণে যারা হয়েছে, তাদের কি ছেলে কি মেয়ে, অতি সুন্দর সব দেখতে। আমি হেইনখেল নামের একটি মেয়েকে দেখেছি, তাকে প্রথমবার দেখে আমার দেবী প্রতিমার মতো লেগেছিল। অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর সব ছেলেমেয়ে। মায়ের দিক থেকে হেইনখেল জার্মান, বাবার দিকে জাপানি।

ভাবতে অবাক লাগে, মাত্র কুড়ি হাজার বছর আগে ব্রাজিলে মানুষ ছিল না। এক লক্ষ বছর আগে ভারতের মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছিল, তার প্রমাণ আছে অন্ধ্রের গুন্টুরে। আর মানুষ এশিয়া থেকে আলাস্কা হয়ে উত্তর আমেরিকায় আসে, তারপর দক্ষিণ আমেরিকায় এল মাত্র কুড়ি হাজার বছর আগে। ব্রাজিলে যারা এসেছিল তারা কালক্রমে ইনকা বা মায়া সভ্যতার মতো কোনও উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলতে পারল না। তারা নব্য প্রস্তর যুগ পার হবার পর গ্রামভিত্তিক সমাজে নিত্য নতুন আবিষ্কার করতে পারেনি। আমাজনের জঙ্গলের ভেতর এখনও সম্পূর্ণ উলঙ্গ আদিবাসী আছে, যারা আজও খাদ্য সংগ্রহকারী মাত্র। চাষ করা, শস্য সংগ্রহ করে সঞ্চয় করা, হাতে কাপড় বোনা ইত্যাদি কাজ, যা অন্তত দশ হাজার বছর আগে ভারতে শুরু হয়েছিল, এরা আজও তা জানেনি। আমাদের দেশের আন্দামানের জারোয়া জাতির মতো অনেকটা।

ভারতের তুলনায় ব্রাজিল আয়তনে আড়াই গুণ, আর জনসংখ্যা এক তৃতীয়াংশ। এই একটি কারণে ব্রাজিলের দুর্ভাগ্য অনেক কম। প্রচুর জমি পড়ে আছে, দেশের আবহাওয়া বেশ নাতিশীতোষ্ণ। বড় বড় এলাকায় গরু ছাড়া আছে।

তারা নিজেরা যেমন খুশি ঘাস খায়, বংশবৃদ্ধি করে, যেখানে ইচ্ছে ঘুমোয়। তাদের প্রায় অর্ধেকেরই দুধ দোয় না কেউ। এই সব মাইলের পর মাইল ক্যাটল ফার্মের মালিকরা মাঝে মাঝে বেশ কিছু এঁড়ে বাছুর ধরে বিক্রি করে দেয়। সব গরুরই গায় মালিকের চিহ্ন দেগে দেওয়া আছে। ব্রাজিলের বিফ স্টেক বিশ্বখ্যাত। বহু দেশে রপ্তানি হয়। একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম— ছাগল ভেড়া পোষে না কেউ? উত্তর পেয়েছিলাম— পাগল নাকি, একটা পূর্ণ বয়স্ক গরু কতটা মাংস দেয় জানো? তার তুলনায় ছাগল? তাছাড়া বাছুরের মাংস তো খুবই সুস্বাদু এবং দামী।

প্রত্যেকদিন খবরের কাগজ আসে, আমি পড়ি না, তবু দেয়, লিজিয়া পড়ে। রবিবারের সেই কাগজ প্রায় দেড়শো পাতার মতো। তাতে পাতা চল্লিশ আছে গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন, পাতা কুড়ি বাড়ি-ফ্ল্যাট বিক্রির বিজ্ঞাপন। আর চাকরির বিজ্ঞাপনও পাতা কুড়ির মতো। ভাবলাম কী এত চাকরি আছে যার ঝুড়ি ঝুড়ি বিজ্ঞাপন বের হয়। অধিকাংশই ক্যাটল ফার্মের চাকরি। গরুর জন্ম, তার সংখ্যা, তার অসুখবিসুখ, বাচ্চার বয়সের হিসেব, উপযুক্তমতো বড় হলে তাকে ধরে আনা, বিক্রি করা, এবার গরু কাটা, প্রসেস করা, টিনজাত করার কারখানায় কাজ, দুধের থেকে চিজ মাখন তৈরি ইত্যাদি। মোটকথা গরু একটি ইন্ডাস্ট্রি বিশেষ। একেকটি ফার্মে দশ হাজার গরু থাকলেও বিস্ময়ের কিছু নেই।

ঠিক সেইমতো আখের ইন্ডাস্ট্রি। আফ্রিকা থেকে ধরে আনা কালো মানুষেরা আখের খেতে মূলত কাজ করত। আজকাল ব্রাজিলে যত মোটর গাড়ি আছে তার শতকরা আশিভাগই এলকুলে চলে, এলকুল মানে মদ, চিনি থেকে তৈরি মদ। ওদের মধ্যে একটা কথাই আছে, হয় চিনি খাও নয় গাড়ির মদ তৈরি করে তাকে খাওয়াও। আখও তাই মস্ত বড় ইন্ডাস্ট্রি, প্রচুর কাজ পাওয়া যায়। মাছধরাও বিরাট ইন্ডাস্ট্রি। ফলের রস বার করার অনেক কাজ, রপ্তানি হয় রস বিদেশে।

ব্রাজিল খুব একটা শিল্পোন্নত দেশ নয়। মূলত কৃষি, বন এবং সমুদ্রজাত জিনিস প্রচুর পাওয়া যায় এবং অতি সস্তায় সেসব রপ্তানি করে। ব্রাজিলের চিনি আমাদের মতো দানা দানা নয়, সব গুঁড়ো, খুব সস্তা। একটা রূপকথার মতো গল্প শুনলাম যা খাঁটি সত্যি ঘটনা। দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গলে একধরনের মৌমাছি পাওয়া যায়, যারা আমাদের দেশের মৌমাছির মতো ছোট ছোট। এইরকম কিছু মৌমাছি এনে পরীক্ষা করার জন্য আমাজনের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা কয়েক বছরে বেশ বড় বড় চেহারা নিল আর বংশবৃদ্ধি করে এত বেশি হয়ে গেল যে সরকার পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়ল। আজকাল মধুর উৎপাদন এত বেশি হয় যে অতি সস্তা দামে, একরকম বিনা পয়সায় মধু পায় লোকে। হোটেলের টেবিলে প্লেটের ওপর স্তূপ করে মধু এবং ল্যারেঞ্জার জ্যামের স্যাশে রাখা থাকে, যত ইচ্ছা খাও। ল্যারেঞ্জা একধরনের কমলালেবু, জঙ্গলে লক্ষ লক্ষ ফলে আছে, তুলে আনার লোক নেই। সেই চাকরিও প্রচুর। এসব চাকরি লোকে করতে চায় না। উপায় যাদের নেই তারা কিছুদিন করে, তারপর ছেড়ে দেয়।

ব্রাজিলকে বুঝতে পেরেছি যার সাহায্যে তার নাম ভার্জিলিও। সামান্য ইংরিজি বলতে পারে। তার মাথার চুল নিগ্রোদের মতো ছোট ছোট, কালো। গায়ের রং আমাদের দেশের মতো, খুব কালো নয় ব্রাউন। থুতনিতে একটু দাড়ি। সে আমার বন্ধু হয়ে গেল যেহেতু আমাকে ইংরিজিতে ও কিছু কিছু বলতে পারে। ভার্জিলিও ল্যাব টেকনিশিয়ান, ডিপ্লোমা আছে। তার বাড়িতে নেমতন্ন খেতে গেলাম একদিন রবিবার দেখে। ড্রাইভার ফার্নান্দো খুব খুশি হল না যেন বুঝতে পারলাম। ভার্জিলিওর বউ বেশ টুকটুকে ফর্সা, নাম ফাচমা (ফাতিমা), সে হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডোগেঞ্জি পরে আমাকে দরজার কাছে অভ্যর্থনা জানাল। নানারকম রান্না-বান্নাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বউটা। বছর পাঁচের ছেলে বাবার মতো দেখতে— বেশ ময়লা রং, মেয়েটা একটু বড়, ঠিক মায়ের মতো ফর্সা। তার মাথার চুল লাল লাল, চোখের তারা নীল। বাচ্চা মেয়েটার শরীরের নীল নীল শিরা দেখা যায় এত পরিষ্কার রং।

কালো ভাই আর তার সাদা দিদি মিলে আমাকে ওদের বাড়ির উঠোনে রাখা ম্যাকাও দেখাতে নিয়ে গেল। বড় টিয়াপাখি কিন্তু ভারি সুন্দর তাদের রংচং। নীলরঙের ওপর নানারকম রঙের পালক রয়েছে। নীল ম্যাকাও, ব্রাজিলেই পাওয়া যায়, আমাজনের গভীর জঙ্গলে। ওদের দেখে চারটে পাখি, তাদের বিরাট জালঘেরা খাঁচায় কতরকম শব্দ করে উঠল। বাচ্চা দুটো ওদের সঙ্গে কথা বলছিল, ঠিক কথা বলা নয়। যেন কী বলতে চায় সেটা ওরা জানে, তাই বকছিল, দাঁড়া দাঁড়া, বাড়িতে অতিথি এলে অসভ্যতা করা ঠিক নয়। পাখিদের খাবার সময় হয়েছে, ভার্জিলিওর বউ ফাচমা ওদের জন্য খাবার নিয়ে এল। আমাদের দেশে যেমন গরু বাছুরকে আদর করে খেতে দেয় ঠিক তেমনই করে খেতে দিল সে।

ভার্জিলিও আমাকে তার বাড়ি ঘুরিয়ে দেখাল। খুব সস্তার বাড়ি, শহরের একপ্রান্তে। জায়গা প্রচুর, বাচ্চারা অনেক জায়গা নিয়ে খেলাঘর বানিয়েছে। তারা বিশ্বাস করছিল না যে আমার মতো বয়স্ক লোক ওদের ভাষা জানি না। আমরা যখন ইংরিজিতে কথা বলছিলাম বউটাও অবাক হয়ে শুনছিল এবং আমার মনে হল স্বামীর এই নতুন গুণের পরিচয় পেয়ে হয়তো গর্ব অনুভব করছিল। ভার্জিলিও বলল, আমার বউ নাইট ক্লাবে কাজ করত, আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় ওকে কাজ ছাড়তে বলি, আমার কাছে এনেছি, একসঙ্গে আছি। বাচ্চা দুটো আমারই। তোমাদের নিয়মমতো বিয়ে যা, তা আমরা করিনি। ওর কোনও ধর্ম নেই, আমারও নেই। ও কোনও চাকরি করতে চায় না। বাড়িতে থাকে, বাচ্চাদের দেখে। ওর বাবা-মার পাত্তা নেই তো ও কী করবে বল? অল্প বয়স থেকে নিজেকে রোজগার করতে হয়েছে। তোমাকে অনেকেই বলবে আমার বাড়ি কেন এসেছ? সাদা কালোর মধ্যে বিয়ে এখনও কেউ পছন্দ করে না।

সাহস আছে বলতে হবে ওর। নাইট ক্লাবের দেহবেচা মেয়েকে তুলে এনেছে বাড়িতে। বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে, তার মানে অন্তত দশ বছর ধরে ঘর সংসার করছে। ভার্জিলিও বলল— নাইট ক্লাবে যেতাম, ওর দুঃখের কথা বলেছিল আমাকে একদিন।

আমি ওকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিই। এখন আমার বাচ্চাদের জন্য তাদের মাকে আমার খুব দরকার। আমরা দুজনে মৃত্যু পর্যন্ত একসঙ্গে থাকব ঠিক করেছি।

মনটা ভরে গিয়েছিল আমার। আরেকদিন গিয়ে কফি খেয়ে এসেছিলাম, একটি সুন্দর উপহার নিয়ে গিয়েছিলাম ফাচমার জন্য। বাচ্চাদের জন্যও কিছু নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার ড্রাইভার ফার্নান্দো অথবা চেনাজানা সবাই ভালো মনে নেয়নি আমাদের হৃদ্যতা। তাহলে ব্রাজিলের মতো দেশেও ছুঁৎমার্গ জিনিসটা আছে।

শুক্রবারের রাত নটা, রেস্টুরেন্টে খেয়ে ওপরে ঘরে যাচ্ছি, ডাক এল রিসেপশন থেকে। কেউ যেন বলল— আর ইউ সিক মিস্টার মানিরাতনা? চমকে উঠলাম, পরিষ্কার ইংরিজি, মিষ্টি গলা। এগিয়ে এসে দেখলাম একটি সুন্দর সাদা মেমসাহেব মেয়ে আমার দিকে দেখছে। —ইউ স্পিক ইংলিশ?

মেম মেয়েটি বলল, ইয়েস। বসে গেলাম ওর সামনে। নাম মারিয়া, বিধবা, বর পুলিশ সার্জেন্ট ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। কালো লোকেরা এক সুযোগে ঘিরে ধরে খুন করেছে তাকে। মারিয়া অনেক টাকা পেয়েছে কমপেনসেশন, ব্রাজিলে মায়ের কাছে চলে এসেছে। তিন বছরের মেয়ে আছে একটা। সেই জন্য দিনেরবেলা চাকরি করতে পারে না, তখন মা যায় কাজে। ও কেবল রাতে ডিউটি করে, যখন মা মেয়েকে রাখে। রাতে বিশেষ কোনও কাজ থাকে না। আমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল।

—কাল উইকএন্ডে কোথায় যাচ্ছ?

—কোথাও যাবার প্রোগ্রাম নেই। জানিও না এদেশে কাউকে। আমার কথা বলার লোকের খুব অভাব।

—তোমার ড্রাইভারকে বলে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কাল সকালে তুমি যাবে উবাতুবা বিচ। সকাল আটটায় রেডি থেকো।

মাত্র একশো কিলোমিটার দূরে। ব্রাজিলে এসেছ বিচ দেখবে না?

কাকে কী বলল, কী ব্যবস্থা করল জানি না সকালে প্রস্তুত হয়ে চা খেতে নামার সময় লিজিয়া বলল— উবাতুবা? মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। মেয়েটা গড় গড় করে কত কী বলল কিছুই বুঝলাম না। সমস্ত যোগাড় করে দিয়েছে হোটেল, ছাতা, অ্যালুমিনিয়ামের ফোল্ডিং চেয়ার, তোয়ালে, এমনকী সুইমিং ট্রাঙ্ক পর্যন্ত। খাবার জলের বোতল দেয়নি, কেননা বিচে বসে জল খায় কোন উজবুক। বিচে প্রচুর বিয়ার পাওয়া যায়, নিদেনপক্ষে কাসাসা খাও, অথবা ক্যামপারি।

ফার্নান্দো খুব খুশি, পাহাড়-টাহাড় পেরিয়ে সোজা পুবদিকে গাড়ি ঢালু রাস্তায় নামিয়ে এনে গাড়ি থামাল। আজ শনিবার, বিচে ভিড় হবে। পুলিশ গাড়িটা রাখার ব্যবস্থা করে দিল। সকাল সাড়ে নটা মাত্র, ফার্নান্দো চেয়ার-টেয়ার পেতে আমার তোয়ালে সুইমিং ট্রাঙ্ক গুছিয়ে রেখে চলে গেল ওপরের রাস্তার দোকানে।

জলের বদলে সোডা ভালো জিনিস। শুধু সোডা খেতে খারাপ, তাই লাইম দেওয়া হল। আমি সেটাতে এক চামচ চিনি মেশাতে বললাম। ফার্স্ট ক্লাস জিনিস

তৈরি হল। এমনকী ভার্জিলিও পর্যন্ত আমাকে এই ড্রিঙ্কের হদিশ দিতে পারেনি। মদ সহ্য হয় না, নাইট ক্লাবে যায় না এমন বন্ধু নিয়ে কী যে করবে তার খুব ভাবনা ছিল।

বেশ বড় ছাতার মতো মাথা একরকম বেঁটে খেজুর গাছের মতো গাছের সারি দিয়ে বিচ সাজানো। লাইন দিয়ে সাজানো গাছগুলো দেখতে ভারি সুন্দর। ভলিবল খেলা শুরু হয়েছে, বালির ওপর পূর্ণোদ্যমে খেলা চলছে। ভলিবল ব্রাজিলের জাতীয় খেলা। সমস্ত শহরের নিজের টিম আছে। ক্লাব, কারখানা, পাড়ায় পাড়ায় ভলিবল খেলা হয়। ব্রাজিলের মেয়েরা ভলিবলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, ফুটবলে যেমন ছেলেরা। অলসের মতো বসে বসে অনেকটা সময় ভলিবল খেলা দেখলাম। ম্যাচ চলছে, হয়তো দুই শহরের মধ্যে হবে। অনেক উৎসাহী দর্শক জুটেছে, জোর হাততালি পড়ছে প্রত্যেকটা পয়েন্টের সঙ্গে। আমার পাশে আরেকটা চেয়ার নিয়ে এল এক ভদ্রলোক। ছাতাও এল। সদ্যোজাত বাচ্চা প্র্যামে করে নিয়ে তরুণী মা এসে বসল চেয়ারে। বসেই ওদের ভাষায় আমার সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করল। বিনয়ের অবতার হয়ে বললাম— য়্যাও নাও ফালা পর্তুগিজ। আমি পর্তুগিজ ভাষা জানি না। মহিলা বললেন—আমেরিকানোস?

এই এক মজা, পর্তুগিজ যে জানে না এবং ইংরিজি বলে সেই হল আমেরিকানোস। প্রতিবাদ করে লাভ নেই, বললাম—ইয়েস। আমেরিকানদের এক বিশেষ চোখে দেখা হয় এখানে। আমেরিকান মানেই বড়লোক, তারা যে দেশে থাকে সেটা স্বর্গের কাছাকাছি। প্রত্যেকটি ব্রাজিলিয়ান প্রাণপণে আমেরিকান হবার স্বপ্ন দেখে।

নতুন মা-টি যেন প্রশংসার চোখে দেখলেন আমাকে, চেঁচিয়ে ডাকলেন ভদ্রলোককে। উনি এলেন, তাঁকে কিছু বলা হল এবং তিনি হাত বাড়িয়ে করমর্দন করতে করতে বললেন— মিঃ হারুন মুতলিব, ফ্রম লেবানন। আই নো ইংলিশ।

খুশি হলাম, তবু কারও সঙ্গে কথা বলা যাবে। কথাবার্তা হতে লাগল, হারুন মাঝে মাঝে মহিলাকে অনুবাদ করে শোনাচ্ছিল আমার কথা। মহিলা বাপের জন্মে ইন্ডিয়ার নাম শোনেনি। শেষমেশ ইন্ডিয়া যে লেবাননের পাশেই একটা দেশ এই বলে পার পেল সে। আর মহিলা, তিনিও কি পর্তুগিজ শিখেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমার অবাক হবার পালা। ব্রাজিল গরিব দেশ জানতাম, কিন্তু এই রূপের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। হারুনের মুতাহ ওয়াইফ হল ব্যাচে। ইংরিজিতে bate লিখতে হবে, বলতে হবে ব্যাচে। আর মুতাহ বউটা কী জিনিস? কনট্রাক্ট ম্যারেজ। সেটা কীরকম বোঝানো হল আমাকে। যে দেশে বিবাহ ঠিক হয় ঈশ্বরের অনুগ্রহে, সাত জনমের বন্ধন বলে মেনে নেওয়া হয় বিয়েকে, সেই দেশের মানুষের পক্ষে তিন বছরের কনট্রাক্ট করে বিয়ে করা যায় কীভাবে তা বোঝা মুশকিল। ব্যাচে মুসলিম ম্যারেজ নিয়মে তিন বছরের জন্য বিয়ে করেছে হারুনকে। বাচ্চাও তো হয়েছে একটা দেখছি। তারপর কী হবে?

দেশে হারুনের নিজের বউ আছে, ছেলেপুলে আছে। তিন বছরের জন্য

ব্রাজিলে পোস্টিং করেছে ওকে লেবানন সরকার, এম্ব্যাসিতে কাজ করে ফরেন সার্ভিস। অতদিন স্ত্রী বিনা থাকে কী করে? তাই বিয়ে করেছে, যাবার সময় ব্যাচেকে একটা বাড়ি আর টাকা পয়সা দিয়ে যাবে, তারপর? তারপর তো ওর দায়িত্ব নেই। বাচ্চা মায়ের কাছে থাকবে। হারুন বলল— দ্যাখো মানিরাতনা, ব্যাচে রাস্তায় নেমেছিল। ওকে তিন বছরের জন্য বিয়ে করেছি। এই তিন বছর তো ওর চিন্তার কিছু নেই, আমি আছি। এখান থেকে যাবার আগে দেখব যদি কেউ ওকে রাখে। হয়ে গেল কনট্রাক্ট বিয়ে। আইন মেনে কনট্রাক্ট হয়েছে, কারও বলার কিছু নেই। প্রেম ভালোবাসা, ও সব আছে যতদিন তোমার সঙ্গে আইনের বাঁধন আছে। তারপর যে যার রাস্তায় চলে যাও। তুমি কার কে তোমার। বড় আশ্চর্য লাগল আমার। ভালো করে দেখলাম ব্যাচে মেয়েটাকে। আধময়লা রং, কালো চুল, স্বাস্থ্য ভালো। মুখচোখের গড়ন কাটা কাটা এবং যদিও সদ্য মা হয়েছে তবু লাবণ্য কম নয়। বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছে প্যারামবুলেটরে, মুখে যাতে রোদ না লাগে তার জন্য একটা মোটা কাপড় আড়াল করা হয়েছে। মায়ের চোখ বার বার বাচ্চার দিকে ঘুরে যাচ্ছে। আর পাঁচটা মায়ের মতোই ওর ব্যবহার। দেশটাকে চিনতে হলে এসব দেখতে হবে জানতাম না।

একটু পরে ব্যাচে উঠল, পরনের জামা, পাজামা সব আমার সামনেই খুলল, স্রেফ বিকিনি পরে তোয়ালে নিয়ে রোদে পেতে তার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল। লজ্জা তোমার লাগে লাগুক তাতে আমার কী এইরকম ভাব। নাকি সমুদ্রের বিচে এসেছি, এখানে আবার শরম কী? এটা তো রোদ পোহানোর জায়গা। নাকের সামনে চার-পাঁচহাত দূরে ওইরকম ভাবে যুবতী শুয়ে থাকলে আমি বসে থাকি কী করে? উঠলাম, লাল সুইমিং ট্রাঙ্কটা পরে নিলাম, এগিয়ে গিয়ে জলে নামলাম। ব্রাজিল ঠান্ডার দেশ নয়, প্রচুর সূর্যালোক আছে। তবু এখানকার লোকেও রোদে শোয় কেন কে জানে! আমাদের দেশে প্রচুর সূর্যালোক, গায়ে রোদ এমনিতেই লাগে। তার জন্য পয়সা খরচ করে বিচে গিয়ে গা খুলে শোবার দরকার হয় না। একটু একটু করে সাঁতরে সমুদ্রের ভেতর এগিয়ে গেলাম।

সাঁতার আমার সহজাত, গঙ্গাপাড়ের সন্তান। ছোটবেলা থেকে হুগলির গঙ্গা এপার ওপার করেছি বহুবার। ঢেউ অংশটা পার করে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছি, চিত সাঁতার কাটছি অলসভাবে, আকাশে একটা দুটো চিল দেখা যায়, আমারই মতো অলস ভাবে চক্কর কাটছে নীল আকাশে। মনে হল বহু কণ্ঠের চিৎকার ভেসে আসছে। সোজা হয়ে দেখলাম বিচে ভলিবল খেলা বন্ধ, প্রচুর লোক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হলুদ রঙের জ্যাকেটপরা দুজন লোক ইশারা করছে আমাকে ফিরতে। ছ্যাঁৎ করে উঠল মনের মধ্যে। কোনও গোলমাল করে বসিনি তো! খুব সন্তর্পণে ফিরে এলাম, বিচে উঠে আসতে একশোটা লোক একসঙ্গে আমাকে বকতে লাগল। ভাষা বুঝি না বুঝি বকুনি বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু অপরাধটা কোথায় আমার? হলুদ পোশাকের লোকদুটো লাইফ গার্ড, আমাকে

ধরেছে চেপে, বোধহয় গ্রেপ্তার করেছে, শেষে মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম— য়্যাও নাও ফালা পর্তুগিজ। এনিবডি স্পিকস ইংলিশ হিয়ার?

একটা গুঞ্জন উঠল— আমেরিকানোস, আমেরিকানোস। একটি অল্পবয়সী ছেলে বলল চিৎকার করে—আই স্পিক ইংলিশ। বললাম এরা কেন আমাকে ধরেছে বলতে পার? সে বলল— তুমি জানো না এখানে সমুদ্রে স্নান করা বারণ। নোটিস পড়নি? বললাম—আমি কী করে পড়ব, আমি কি ওই ভাষা জানি?

ভিড়টা কেটে গেল, আমি ছাড়া পেলাম, ফিরে এসে চেয়ারে বসলাম। ব্যাচের বক্তব্য অনুবাদ করে শোনাল হারুন, ভয়ানক রকম চোরাস্রোত আছে এই বিচে, অনেক লোক তলিয়ে গেছে এইখানে। ঢেউ পারে ভেঙে জলটা ফিরে যায় এগিয়ে আসা ঢেউয়ের তলা দিয়ে, ওপরে কিছু বোঝা যায় না। নীচের স্রোতটা হঠাৎ কন্টিনেন্টাল সেলফে গড়িয়ে নামে। সমুদ্রের গভীরতা এখানে হঠাৎ খুব বেশি বলে চোরাস্রোত নীচে টেনে নেয় সাঁতারুকে।

আমার গলা শুকিয়ে গেছিল, ফার্নান্দো বড় মগে করে নিয়ে এল আমার ক্যামপারি, সোডা, লেমন আর চিনি দেওয়া কাসাসা ইন্ডিয়ানোস, ভারতীয় কাসাসা। লেবাননের হারুনের ধর্মে মদ খাওয়া মানা, ওকেও কাসাসা ইন্ডিয়ানোস খেয়ে দেখতে বললাম। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, বউ ব্যাচেকে চোখ দেখতে বলল। তার হুইস্কি চাখা মুখে ওটা ভালো লাগল না। লাল ট্রাঙ্ক পরেছিলাম, সেটাই দেখলাম বেস্ট ড্রেস এই পরিবেশে। ভিজে নিকার শুকোল গায়ে। এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ঘুরলাম বিচে। আর পাঁচটা বিচের মতোই দৃশ্য, তবে নানা রকম খেলায় মত্ত অনেকে— যেটা এই দেশের বিশেষত্ব বলা যায়। ফিরে এসে বসেছি চেয়ারে, আমার লাল নিকারের দৌলতে আমি এখন এখানকার এক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছি। যেতে যেতে অনেকে মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখে নিচ্ছে একনজর। ব্যাচে বলল— বিচ যদি যেতে চাও তো রিও যাও। ফ্লামেঙ্গো, বোতাফোগো, কোপাকাবানা, আপরোদর, ঈপানেমা, পেপিনো, কত আর নাম করব। তবে ঈপানেমা উবাতুবার মতোই ডেঞ্জারাস। জানো, ঈপানেমা মানে হল ব্যাড ওয়াটার। আমাদের দেশের প্রায় সব নামই আদিবাসীদের দেওয়া, বেশ সুন্দর সুন্দর মানে আছে সবগুলোর।

যাব যাব, সব জায়গাতেই যাব। আমাজনের জঙ্গল দেখব, পান্তানালের শত শত কিলোমিটার জলাভূমিতে জাগুয়ার এবং হাজার হাজার জ্যাকারে কুমিরদের আস্তানা দেখব। সাম্বা নাচ শেখার স্কুল দেখব। ব্যাসেলিকা দো বম জিসাসের সামনে বারোজন ঋষির পৃথিবী বিখ্যাত ভাস্কর্য দেখব।

হোটেল থেকে দেওয়া খাবার আমরা ভাগ করে খেলাম। তার আগে অবশ্য হারুনকে বলেছিলাম—তোমার বউকে কাপড়-টাপড় পরতে বল, আমার খুব অস্বস্তি হয়, ভালো করে তাকাতে পর্যন্ত পারি না। সকাল থেকে অনেক কিছু দেখলাম, লোকজন দেখলাম, এদেশি লোকাচার দেখলাম, এদেশি ব্যবহার

দেখলাম। তারপর বঁ জিয়া বলে বিদায় নিলাম ব্যাচে আর হারুনের কাছ থেকে। dia মানে দিন, বঁ মানে ভালো; বঁ জিয়া হল গুড ডে। ডি কে এরা জে উচ্চারণ করে।

রাত তখন সাড়ে নটা, ঘরে টেলিফোন বাজল, মারিয়ার ফোন। করেছ কী মানি, সর্বনাশ, আরেকটু হলে কী হত বল দেখি?

বুঝলাম না কী করে ফার্নান্দো বিচের খবর দিয়েছিল ওদের। সে তো বোবা কালা। মারিয়া তক্ষুনি আমার বাড়ির ফোন নম্বর, বউয়ের নাম, ঠিকানা, অফিসের নাম-টাম লিখে নিল। বলল, এবার থেকে একলা ছাড়া যাবে না আমাকে। বেজায় পাজি মানুষ আমি। এমন লোক গান্ধির দেশে পয়দা হয় কী করে? চুপ করে বকুনি শুনলাম। ভালো লাগল, বাড়ি থেকে এতদূরে এসেও আমাকে বকুনি শুনতে হচ্ছে, কপালটা মন্দ নয়। তন্ন তন্ন করে জেনে নিল ব্যাচের নাম-টাম। আধঘণ্টা ধরে জেরার পর বলল—পান্তানাল দেখতে যাবে আমার সঙ্গে? তিনদিনের প্রোগ্রাম। ছোট বিচক্র্যাফট প্লেনে যাব, ফেরার পথে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ওয়াটারফল ইগুয়াসু দেখব, যাবে?

—নিশ্চয় যাব, এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? কিন্তু ব্যাপার কী বলতো, তুমি যাবে পান্তানাল, আর তোমার মেয়ে?

—মেয়েও যাবে। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। আজ আমি একা আছি রাতের ডিউটিতে, আজ শনিবার। কালকেও রাতের ডিউটি করব। দুটো ছুটি পাওনা হয়ে থাকবে। চলে এস নীচে, গল্প করব।

মারিয়ার কথা শুনছিলাম। ব্রাজিলের সর্ববৃহৎ তেল কোম্পানি পেট্রোবাসের এক ইঞ্জিনিয়ার মারিয়া সম্বন্ধে খুব আগ্রহী। সেই ছেলেটির নাম সেরজু, রাশিয়ান রক্ত। বাবার বিশাল ব্যবসা, একটা মাত্র ছেলে। সাও পাওলোর তোলেদো টাওয়ার নামের একটা বাইশ তলা বাড়ির মালিক ওর বাবা। সেই বাড়িটায় অজস্র অফিস, ভাড়া পায় বছরে এক মিলিয়ন ডলার। কে খাবে অত পয়সা, আরও মজার কথা সেরজু তোলেদো একমাত্র ছেলে ওর বাবার। যদিও আরও বার তিনেক বিয়ে করেছিলেন ভলদো তোলেদো কোনও বিয়েই টেকেনি। প্রচুর টাকা নিয়ে তবে তারা ডিভোর্স দিতে রাজি হয়েছে। ওর বাবা মারিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চান। অত বড়লোকের একমাত্র ছেলেকে বশ করেছে মারিয়া, এই তাঁর অভিযোগ। হয়তো সেও ওঁর স্ত্রীদের মতো অনেক টাকা নিয়ে ছেড়ে দেবে, এই আশঙ্কা। বিয়েটা টাকা রোজগারের ফিকির বলে মনে হয়েছে ওই ভলদো নামের ভদ্রলোকের। ঘরপোড়া গরু তো!

ভলদো মানে ভ্লাদিমির, সেরজু মানে সেরগেই, ওরা জারের আমলে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। সেরজুর নিজের কমার্শিয়াল পাইলটের লাইসেন্স আছে। ওদের নিজেদের একটা বিচক্র্যাফট প্লেন আছে। ফলের রস রপ্তানি করে তোলেদো এক্সপোর্টস, মোটর গাড়ির শো রুম আছে। প্রশ্ন করলাম— এতই যখন বড়লোক

সেরজু চাকরি করে কেন?

—ওটা বাবার সঙ্গে মনোমালিন্যের ফল। ওর এক সৎমা ওকে ঘরছাড়া করেছিল নানা চক্রান্ত করে। সে যাক, এখন বল কবে নাগাদ দিন স্থির করতে বলব।

বললাম—আমাকে জড়াচ্ছ কেন, এটা তোমার প্রাইভেট ব্যাপার। তুমি ঠিক করে বলতো, সেরজুকে তোমার কেমন লাগে।

—ও একটা মেয়ের সঙ্গে লিভ টুগেদার করেছিল বছর দুয়েক। মেয়েটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিল। কিন্তু কী বলব, অনেক ছেলে বন্ধু ছিল তার। পরে তার বিচ্ছিরি সব অসুখ ধরা পড়ে। আলাদা হয়ে যায় ওরা। সেরজুকে আমার ভালো লাগে। তোমার কথা বলেছি সেরজুকে। সব দেখে শুনে তোমার মত জানাবে। আমার তো কোনও গার্জেন নেই, প্লিজ চল।

—তুমি কি ওকে ভালোবাস?

—প্রশ্নটা বেশ কঠিন। আমি অনেকবার নিজেকে এই প্রশ্নটা করেছি। ওকে ভালোবাসা খুব সহজ কেননা ওর অনেক টাকা। সেটাই আমার ভাবনার কারণ। আমার মেয়েকে ও খুব ভালোবাসে, মেয়েটাও ওর খুব ন্যাওটা। ও যদি বড়লোক না হত তাহলে সহজ হয়ে যেত সম্পর্ক। আমি ওকে নিজের মতো করে পেতাম। জীবন খুশিতে ভরে যেত।

—তবে তো সহজ জিনিস এটা, খুব সহজ জিনিস। বলে দাও সেরজু মাইনাস বাবার টাকা ইজ মারিয়ার হাজব্যান্ড। তা না হলে যেমন চলছে চলুক।

—যতটা সোজা ভাবছ ততটা নয়। সেরজুকে বলেছিলাম আমি, হয় বাবাকে নয় আমাকে। দুটোর কোনওটাই সে ছাড়তে রাজি নয়। বলছে বাবা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, তিনি তো লোক খারাপ নন। ভয়টা তাঁর অগাধ পয়সা নিয়ে। মজার কথা কী জানো, আমি বিধবা মেয়ে, আমার একটা বাচ্চা আছে, এটা নাকি ওর বাবার খুব ভালো লেগেছে। চাকরি করি হোটেলে, সেটা অবশ্য তাঁর পছন্দ নয়। তোমাকে বলতে বাধা নেই, সেরজু এখনও আমার সঙ্গে শোয়নি কোনওদিন।

রাস্তা পেয়েছি মনে হচ্ছে। বাচ্চারা অনেক জটিল সমস্যা সহজ করে দেয়। বললাম—প্রথমে আমার সঙ্গে সেরজুর আলাপ করিয়ে দাও। আর সোমবার ছুটির দিন, শনি, রবি, সোম তিনদিন পাচ্ছি আমরা। শুক্রবার রাতে তোলেদো টাওয়ারের সবচেয়ে ওপর তলার পেন্টহাউসে থাকব আমরা। শনিবার থেকে পান্তানাল। প্রোগ্রাম পাক্কা, নো চেঞ্জ।

মনে মনে খুব খুশি হয়েছি আমি। পান্তানাল যেতে পারা একজন ভ্রমণকারীর সারাজীবনের স্বপ্ন। মনে করা যাক পুরো উত্তরপ্রদেশটা একটা জলাভূমি। বৃষ্টির জল চারপাশের উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে নামে, বের হবার রাস্তা নেই। বাটির মতো জায়গাটা, জলটা যায় কোথা? আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রায় দুহাজার কিলোমিটার দূরে একটা মহাদেশের মাঝখানের অংশে জল ভরার পর সেটা

আটকে যায়। সমুদ্রতল থেকে মাত্র দেড়শো মিটার উঁচু। নদী আছে, উরুগুয়ে নদী, কিন্তু স্রোত নেই। হবে কী করে, সমুদ্র থেকে উঁচু নয় বলে স্রোত নেই। সামান্য যেটুকু বের হতে পারে তা বাদ দিয়ে বাকি জলটাতে জলের জীব জন্মায়। প্রচুর মাছ, তার সঙ্গে পাখি। পাখির সংখ্যা এবং প্রজাতি দেখার লোভ খালি পক্ষিবিদদেরই নয় সাধারণ মানুষেরও হতে পারে। তারপর জল শুকোয় সূর্যের তাপে। এমনিতেই গভীরতা দু-তিন মিটারের বেশি নয় কোথাও, জল কমতে কমতে ডাঙা বের হয়ে যায় অনেক অংশে, তাতে ঘাস গজায়, ঘাসখেকো জন্তুরা বৃদ্ধি পায়। আর ঘাসখেকোদের খেতে আসে বাঘ, চিতা বাঘ, জাগুয়ার। মাছখেকো কুমির জন্মায় লক্ষ লক্ষ। বিরাট পান্তানাল যখন ছোট ছোট জলাশয়ে পরিণত হয় তখন মাছেরা খাবার অভাবে যা পায় তাই খায়। এমনি করে ভয়াল পিরানা মাছের কাহিনীর জন্ম। বুভুক্ষু পিরানা মাছ তখন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। জলে পড়ে যাওয়া চিতাবাঘকে মুহূর্তের মধ্যে কঙ্কাল করে ছেড়ে দেয় হাজার হাজার পিরানা। জ্যাকারে কুমির ছাড়া আর সব কিছু খেয়ে নেয় সেই আকালের সময়ে।

—আমাকে যদি পিরানা মাছ ভাজা খাওয়াও, তবেই যেতে পারি।

খুশির হাসিতে ভরে উঠল মারিয়ার মুখ। আমি যে যাব ওর সঙ্গে তা ভাবতে পারেনি। সেরজু ওকে বলেছে আমাকে পান্তানালের কথা বললে হয়তো রাজি হতে পারি। আমার অফিসের কাজ যা, তা ঠিক তুলে দেব, কিন্তু এমন সুযোগ ছেড়ে দিই কী করে? বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিলের পাহাড়গুলো চারপাশ থেকে বন্দী করেছে পান্তানালকে, তার অর্ধেকের বেশি ব্রাজিলে, বাকিটা আর দুটো দেশে। বিশাল, বিস্তৃত পান্তানালের মধ্যে না আছে শহর না আছে ভালো গ্রাম। বসতি হবে কী করে, বর্ষায় তো ডুবে যাবে, তলিয়ে যাবে। সেরজুর ছোট প্লেন ছোট ছোট এয়ারস্ট্রিপে নেমে পড়তে পারবে। পান্তানালের চারদিকে এমন ছোট ছোট এয়ারস্ট্রিপ আছে কয়েকটা। কোরুম্বাতে ছোট এয়ারপোর্ট আছে, আর কোরুম্বা হল পান্তানালের দক্ষিণের দরজা। সেখান থেকে প্যারাগুয়ে নদী ধরে উজানে চললে পান্তানালের বুক চিরে যাওয়া যাবে। জলে স্রোত নেই তাই মোটরবোটের গতি ঘণ্টায় ত্রিশ কিলোমিটারেরও বেশি হওয়াও সম্ভব।

ফেরার পথে ইগুয়াসু জলপ্রপাত। পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাত। এদেশে আসার আগে পড়ে নিয়েছিলাম ইগুয়াসু নদীর প্রপাত তিন কিলোমিটার চওড়া যাতে দুশো পঁচাত্তরটি ছোট ছোট জলপ্রপাত আছে। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত সে তুলনায় ছোট, সংখ্যার এবং চওড়ার দিক দিয়ে। আশিমিটার গভীরে পড়ছে ইগুয়াসু নদীর জল যা নায়াগ্রা জলপ্রপাতের চেয়ে গভীর। শুধু তাই নয় এর নয়নাভিরাম রূপ, নায়াগ্রা বা ভিক্টোরিয়ার থেকে অনেক সুন্দর। আদিবাসী তুপি-গুয়ারানি ভাষায় ইগুয়াসু মানে ভয়ানক জল অথবা ভীষণ জল। ইগুয়াসুতেও এয়ারপোর্ট আছে ছোট মতো। বিশ্বাস করতে পারছি না আমার ভাগ্য এত ভালো হবে। মারিয়া বলেছে একটা শর্ত আমাকে আর মারিয়াকে পালন করতে হবে। সেটা হল একটি পয়সা

আমাদের খরচ করা চলবে না। অবশ্য মারিয়া আগে থেকেই সেরজুর এই শর্ত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

জানি ওরা বড়লোক, জানি ওদের নিজেদের প্লেন আছে, জানি সেরজু নিজেই প্লেন চালাতে পারে, তবু একদম নিখরচায় ঘুরব খাব-দাব, কেমন লাগে। ওদের মতো বিরাট বড়লোকের সমাজে আমি কিছুই নই, তবু আত্মসম্মানে বাধে। সেরজু থাকে সান্তোস বন্দর শহরে, সাও পাওলো থেকে সামান্য দূরে সমুদ্রের উপকূলে। মারিয়া তক্ষুনি সেরজুকে ফোন করে বলে দিল আমার রাজি হবার কথা। আমার সঙ্গে সেরজু কথা বলল একটা দুটো, অল্প স্বল্প ইংরিজি জানে কোনওমতে কাজ চালাবার মতো।

ভাবতে ভাবতে ওপরে নিজের ঘরে এলাম। ডায়েরি খুলে লিখতে বসলাম মনের কথাগুলো। প্লেনে করে ঘুরতে যা খরচ, তা করার মতো সঙ্গতি আমার নেই, স্বীকার করছি। পরদিন অফিসে কথাটা বলতে সবাই খুব খুশি। অনেকেই সেরজু তোলেদোকে চেনে। পেট্রোব্রাসের সে সিনিয়ার ম্যানেজার। ঠিক হল এই সপ্তাহের মধ্যে আমাকে একবার সান্তোস ঘুরিয়ে আনবে। কার্লোস আমাদের তাউবাতের কাছে পিন্ডামোইংগাবা অফিসের এবং কারখানার চিফ। সমুদ্রের মধ্যে তেলের খোঁজ করছে যে ইটালিয়ান কন্ট্রাক্টর, টেকনিমন্ট গ্লোবাল, তার চিফ ইঞ্জিনিয়ার। আমাকে তাদের সঙ্গে মিশে তাদের কাজকর্মের টোটাল কোয়ালিটি দেখতে হয়। আমি দুচার দিন অনুপস্থিত হলে অসুবিধে হবে না। পেট্রোব্রাসের সঙ্গে কার্লোসের কোম্পানির চেনাশোনা আছে। সান্তোসে ওদের গেস্টহাউসে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

রাতে ডিনারের পর মারিয়াকে বললাম— তোমার সেরজুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি পরশু, একরাত থাকব ওখানে। ওকে খবর দাও, পেট্রোব্রাস গেস্টহাউসে যেন দেখা করে পরশু রাতে। দিনেরবেলা ওদের ড্রিলিং প্ল্যাটফর্মে থাকব। তার পরদিন সকালে ফিরব।

তখনই খবর পেয়ে গেল সেরজু। একদিন বাদ দিয়ে পরদিন ভোরবেলা ফার্নান্দোর গাড়িতে সান্তোসের হেলিপ্যাডে পৌঁছে গেলাম। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে সমুদ্রের ভেতর ড্রিলিং প্ল্যাটফর্মে। সমুদ্রের ভেতর হাওয়ার বেশ তেজ রয়েছে। আমাদের বম্বে আফসোর অনেক বড় আর প্রচুর তেল তোলা হয় সেখান থেকে, সেই তুলনায় ব্রাজিলের আফসোর নেহাত ছোট। একপক্ষে ভালোই হল, এই সুযোগে এদের কাজের পরিধির সম্যক ধারণা করতে পারলাম। সন্ধ্যায় আর সকলের সঙ্গে ফিরলাম ওদের গাড়িতে গেস্টহাউসে। ফার্নান্দো আমার গাড়ি নিয়ে এল পিছন পিছন।

সেরজু বসেছিল, পরিচয় দিল তার। পাতলা পাতলা গড়ন, মাথায় বেশ লম্বা, মুখে অল্প দাড়ি সামান্য লালচে। মাথার চুল লালচে, চোখের রং নীল। একেবারে অমিশ্রিত ইউরোপিয়ান। যেমন তেমন ইংরিজি বলে, মারিয়ার মতো সড়গড় নয়।

—মারিয়া বলেছে তুমি হার্ড ড্রিঙ্ক পছন্দ কর না। তোমার জন্য একটা ওল্ড ইটালিয়ান ওয়াইন আনতে বলি?

—বল, কিন্তু খুব সামান্য।

—জানি। তোমার ক্যামপারি, লাইম, আসুকার (সুগার) মিশিয়ে ড্রিঙ্কের গল্প শুনেছি, উবাতুবা বিচে।

—সর্বনাশ, তাও জানো।

প্রাণ খুলে হাসলাম দুজনে। সেরজুকে বেশ ভালো লাগল। বয়েসটা মনে হল গোটা পঁয়ত্রিশ হবে। বেশিও হতে পারে। মারিয়াও তো ছোট নয়। বছর তিরিশ তো হবেই। ভালোই মানাবে। বাঙালিদের এই এক দোষ। প্রথমেই দেখবে মানাবে কিনা। লম্বা কতটা, গায়ের রং কেমন, মোটা না পাতলা, এইসব। আমার মতে, এরা মেড ফর ইচ আদার। তাহলে কী হয়, ইংল্যান্ডের রাজকুমারের মতো এনারও বিয়ের পাত্রী নির্বাচনের হাজারটা বায়নাক্কা। সেরজুকে ডিনারে আমাকে সঙ্গ দিতে বললাম। সানন্দে রাজি হল। মনে হল নিঃসঙ্গ মানুষ। আমার সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেল। অনেক রাতে বিদায় নিল সে, একাই ড্রাইভ করে চলে গেল। সেরজু সামান্যই ড্রিঙ্ক করেছে। সেটা আমার নজর এড়ায়নি।

রাতে ফোন এল মারিয়ার, সেরজুর কাছে নম্বর পেয়েছে। বলল

—মানিরাতনা, মাই ডিয়ার, তোমাকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে। আমি জানতাম এটা হবে। তোমার কথা বারবার বলছিল একটু আগে। তোমার সান্তোস যাওয়াটা খুব ভালো হয়েছে। আমি জানি তুমি ইতিমধ্যেই আমার জন্য ভাবতে শুরু করেছ, আই নো ইট। এখন ঘুমোও, সারাদিন ধকল গেছে। বঁ নয়তে, গুড নাইট।

শুক্রবার মারিয়াকে নিতে আসবে সেরজু। ভেবেছিলাম আমার ড্রাইভার আমাকে আর মারিয়াকে পৌঁছে দেবে সাও পাওলোর তোলেদো টাওয়ার। সে গুড়ে বালি, আমাদের কেউ ঢুকতে দেবে না। সত্যি তো, আমরা কে, কী আমাদের পরিচয়? বিনা নেমতন্নে আসছি, কেবল সেরজু চেনে আমাদের, তোলেদোরা তাদের বাড়িতে কেন ঢুকতে দেবে? সাতটার সময় সেরজু এল আমার হোটেলে। মরিয়া আর তার মেয়ে প্রস্তুত হয়ে আমার ঘরে ছিল বসে। লিজিয়া আমার জন্যে একটা ব্যাগ গুছিয়ে দিয়ে ওর মেয়ের সঙ্গে খেলছিল। কোথাকার কে, দুদুটো হোটেল কর্মচারী আমাকে তাদের নিজেদের ঘরের লোক মনে করছে। যেন আমি হোটেলের গেস্ট নই, যেন আমার অনুমতির প্রয়োজন নেই তাদের কোনও বিষয়ে।

ছটার সময় সেরজুর গাড়িতে যাত্রা শুরু। তিনদিন পরে ফিরব, লিজিয়াকে উপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে রেখেছে মারিয়া। রাতের হাইওয়ে অন্য রকম দেখতে। মোহিত হয়ে গেলাম আন্তর্জাতিক মানের সুপার হাইওয়ের সাজ এবং আলোর ব্যবস্থাপনা দেখে। সেরজু বলল— বাবা দেখা করবে মারিয়ার সঙ্গে আটটার সময় ডিনারে। মিস্টার মানিরাতনারও নেমতন্ন ডিনারে, আমার গেস্ট হিসেবে। তবে

কথা তিনি মারিয়ার সঙ্গে বলতে চান।

বুঝলাম আমার উপস্থিতি তিনি খুব পছন্দ করছেন না। আমি বললাম—ঠিক আছে, উনি যতক্ষণ না চাইবেন আমি কথা বলব না। আর মারিয়ার সঙ্গে পর্তুগিজ ভাষায় কথা বললে আমি তার কিছুই বুঝব না। ভয়ের কিছু নেই।

ঠিক একঘণ্টায় সাও পাওলো পৌঁছে গেলাম আমরা, তারপর মস্ত মস্ত বাড়ির মাঝ দিয়ে আলোকমালায় সজ্জিত চওড়া রাস্তা দিয়ে সেরজু নিয়ে এল আমাদের, বলল—এই জায়গাটা ইউনিভার্সিটি আইন কলেজের পিছন দিক।

বিশাল বন্ধ গেটের সামনে গাড়ি দাঁড়াল, সেরজু একটা ছোট ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র বের করল পকেট থেকে, অনেকটা আজকালকার মোটর গাড়ির সেন্ট্রাল লকিং সিস্টেমের মতো। সেটায় নম্বর টম্বর মিলিয়ে টিপে দিতে দরজা খুলে উঠে গেল ওপরদিকে। গাড়ি নেমে এল বেসমেন্টে, চক্রাকারে পাক খেতে খেতে নীচে নেমে গেল অনেকটা, মনে হয় চার নম্বর নীচের তলায়। গাড়ি রয়েছে অনেক, আলো জ্বলছে সব জায়গায়। নিজস্ব জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সেখান থেকে লিফটে উঠে বোতাম টিপল বাইশ তলার।

বাইশ তলাটা ছাদের ফ্ল্যাট, পেন্টহাউস। ঢুকতে হলে দরজার গায়ে লাগানো স্লটে কার্ড ঢুকিয়ে দরজা খুলতে হয়। আমি এমন বাড়ি কোনওদিন দেখিনি, যার দরজা খুলতে এ টি এম কার্ডের মতো কার্ড লাগে। আজকাল এটা অনেক অফিসে চালু হয়েছে কর্মচারীদের আসা যাওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণের জন্য। লিফটের ভেতর সেরজু বলছিল— তাদের পেন্টহাউসে পনেরটা বেডরুম। সেরজুর নিজস্ব একটা দু- বেডরুম, ড্রইংরুমের আলাদা ব্যবস্থা আছে। আজ রাতটা আমরা সেখানে কাটাব। সেরজু অবশ্য অন্যদিকে আরেকটা জায়গায় চলে যাবে।

বড়লোকি অনেক দেখেছি, এত বড়লোকের বাড়ি দেখিনি। কার্পেটগুলো সব ইরান থেকে এসেছে। ফার্নিচার, অন্য আসবাব কী বস্তু দিয়ে তৈরি, বুঝলাম না। যে জিনিসটা দেখছি সেটাই অদ্ভুত সুন্দর। সবচেয়ে আশ্চর্য, মনে হল আমরা আকাশে ভাসছি, কারণ পুরো বাড়িটার বাইরের দেওয়াল বলে কিছু নেই, সব কাচ, কাচের তৈরি দেওয়াল। নীচের রাস্তায় গাড়ি চলছে ছোট ছোট, লাইন দিয়ে। গোটা শহর, তার প্রায় দুকোটি মানুষ যেন পায়ের তলায়। আলোকমালায় সজ্জিত শহর দেখতে কাচের দেওয়ালের কাছে গেলে মনে হয় পড়ে যাব নীচে। পর্দা টেনে ঢেকে দিলে আর ভয় লাগে না।

আমাদের দু কামরার ফ্ল্যাটে এলাহি ব্যবস্থা। ব্যাগগুলো নিয়ে ইউনিফর্ম পরা মেয়েরা রেখে এল জায়গা মতো। সেরজু ওদের হাতে আমাদের গছিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার বেডরুমের পর্দা সরিয়ে দিতে সেই একরকম শহর ভেসে উঠল পায়ের নীচে। মেইডরা জানে আমি আমেরিকানোস, তারা হাসল যখন আমি নিজের হাতে আবার পর্দা টেনে দিয়ে আমার অস্বস্তি চাপা দিলাম। মনে হল গোটা বাড়িটা দুলছে। হতে পারে, এত ওপরে হাওয়ার ধাক্কায় বাড়িটা অল্প অল্প দোলে।

জল চাইলাম, বললাম— আগুয়া পোতাবেল (খাবার জল)।

দুটো মেইডের একটা দৌড়ল, আরেকটা কোণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। আমার ঘরে, অস্বস্তিকর অবস্থা, বলতে জানি না, যে এখন তুমি যাও মামণি, আমি জামাকাপড় পাল্টাব। অফিস থেকে আসার পর ওটা করা হয়নি। তারপর গাড়িতে এসেছি এতটা রাস্তা। মুখে চোখে জল দেব। বাথরুমের দরজা কোনটা বোঝা দায়। আমার অজ্ঞতা জানাতে পারি না মেয়েটাকে। ঘর সাজানোর চোটে আমার মতো পোড়খাওয়া ঝানু মানুষও দিশাহারা। কোটিপতির বাড়ি বলে কথা, অতই সহজ হবে? জল এল, বেলজিয়ান কাটগ্লাসের জগে করে জল আর ট্রের ওপর কাগজ জড়ানো দুটো ফাইন গ্লাস। মেয়েটা একটা গ্লাসের কাগজ খুলে জল ভরে দিল। অবরিগাদো বলে সেটা নিয়ে খেলাম। চোখে পড়ল একদিকে যেন পর্দা কিছুটা অন্যরকম। একপা সেদিকে এগিয়ে যেতে দ্বিতীয় মেয়েটা দৌড়ে বাথরুমের পর্দা সরিয়ে দিল। সুদৃশ্য ক্রোম ফ্রেমে আধুনিক ডিজাইনের ঘষা কাচের দরজা, ওটা খুলব কী করে ভাববার আগেই সে খুলে ধরল দরজা। বাথরুম পেয়েছি, এবার ইশারা করলাম ওদের চলে যেতে। আমার ব্যাগ খুলে সব সাজিয়ে দিয়েছে জামা কাপড়। সেটা আমি দেখেছি কোথায় রেখেছে।

চান-টান করে সুস্থ হলাম। প্রস্তুত হয়ে ভাবছি এবার কী করি। আটটা বাজতে দেরি আছে। বাইরে উঁকি মারতেই আবার দুজন সুন্দরী ঘরে ঢুকে এল, ভাবটা যেন এবার কী হুকুম হয় প্রভু। তাদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বসার ঘরে এসে সোফায় বসলাম। মেয়েদুটো মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে মনে হল। সেরজুর নিজস্ব মেইড এরা, সুন্দরী, সর্বকর্ম নিপুণা। কতদিন পরে তাঁর দেখা পেয়েছে। কিন্তু কোনও সেবাই তাদের করতে দেওয়া হচ্ছে না তাঁর বা অতিথির। এ লোকটা কথা বলতেই জানে না।

মারিয়া এল, চেনা যায় না এমন সুন্দর করে সেজেছে। ভারি ভালো দেখাচ্ছে ওকে। মারিয়ার মেয়ে আমাকে চিনে গেছে। এদেশে বাচ্চাদের কোলে তুলে নেয় না কেউ। আমি প্রথম দর্শনেই তা করেছি গাভিয়া হোটেলে। আমার মুখোমুখি বসল মা মেয়ে। এখন অপেক্ষা কখন ডাক আসে আমাদের। সেরজু মারিয়াকে অনেক কিছু বলেছে, শিখিয়েছে। তাদের বাড়ির নিয়মকানুন, ভালো লাগা মন্দ লাগার কথা।

—ভয় করছে, জানো মানিরাতনা। এরা কত বড়লোক দেখেছ?

—এরাও মানুষ মারিয়া। আর খারাপ কী হতে পারে, উনি তোমাকে পছন্দ করবেন না এই তো। তাতে কী হল? ভয় কর না, বিহেভ নাচ্যারালি। তারপর আমি তো আছি।

সাহস দিলাম আমি ওকে। নিজেও যে খুব স্বস্তিতে আছি তা নয়। কীরকম পরিবেশ একটা। কনে এসেছে নিজে শ্বশুরের কাছে ইন্টারভিউ দিতে, সঙ্গে তার আগের পক্ষের মেয়ে আরেকজন বিদেশি লোক। বসে আছি মিনিট দশেক হল। কারও দেখা নেই। চার-চারটে মেয়ে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের দেখে

মারিয়াকে বললাম— চা খাবে? বল না ওদের একপট চা আনতে।

—তুমি না একটি অমানুষ, এখন লোকে ড্রিঙ্ক নেয়, তুমি চা চাইছ। অবশ্য চা-ও একটি ড্রিঙ্ক। দেখছি আছে কিনা।

মারিয়া নির্দেশ দিল ওদের, এমন ড্রিঙ্কের হুকুম জীবনে শোনেনি বোঝা গেল ওদের মুখ দেখে। তবু দৌড়ে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে চা এল। মারিয়ার সঙ্গে কিছু কথা হল ওদের, হাসতে হাসতে মারিয়া বলল— সেরজু ওদের বলেছিল একজন আসছে ইন্ডিয়া থেকে। ওদের সেফ নাকি গোয়াতে ছিল কয়েক বছর, বলেছে ইন্ডিয়ানরা চা খেতে ভালোবাসে। ভাগ্যি চা পাতা এনে রেখেছিল। না হলে কী বিপদ হত বল দেখি। আমাকে ওদের ভয় নেই, ওদের ভয় তোমাকে নিয়ে। এমন বিদঘুটে মানুষ নিয়ে বড় মুশকিল হয়েছে। আমি ওদের বলে দিয়েছি, ভয় নেই তুমি মাটির মানুষ। তবে সেরজুর খুব বন্ধু তো তাই একটু খেয়াল রেখো।

আমি নিজের হাতে চা বানালাম। চুমুক দিয়ে দেখলাম বেশ হয়েছে। মারিয়াও চা খেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। ওকেও এককাপ দিলাম। সেরজু এল এই সময়ে, সেও আমার হাতের তৈরি চা খেল জীবনে এই প্রথমবার। এমনকী মারিয়ার মেয়েও আমার কাছে প্লেটে করে ফুঁ দিয়ে দিয়ে চা খেল সবার কৌতূহলী চোখের সামনে। আটটা বাজবার কিছু আগে আমরা এলাম একটা বিশাল লিভিং রুমে। অন্তত গোটা কুড়ি নীল রঙের ভেলভেট মোড়া সোফা, তার প্রত্যেকটি দুজন বসার উপযুক্ত। মারিয়া আর তার মেয়ে সান্দ্রা বসেছে একটাতে। অন্যদিকে একটাতে আমি, আমার পাশেরটায় সেরজু। মেয়েদেখার ব্যবস্থা পাকা, এখন পাত্রের বাবা এলেই হয়। মিনিট দুই পরে এলেন তিনি, মিস্টার ভলদো তোলেদো। তোলেদো সাম্রাজ্যের মালিক। আমি উঠে দাঁড়িয়ে পরিচয় দিলাম—মণিরত্ন মুখার্জি, ফ্রম ইন্ডিয়া, প্লিজড টু মিট ইউ।

—হাউ ডু ইউ ডু।

ওঁর করমর্দন আন্তরিক, ইংরিজি পরিষ্কার। ভলদো সত্যি সাহেব, সাহেবদের মতো লাল রং, মাথায় টাক, আমার মতোই মাথায়, আমার মতোই দোহারা চেহারা। গায়ের জামা কাপড়গুলি অত্যন্ত দামি, সেন্টের গন্ধটি সূক্ষ্ম মিষ্টি ফ্রেঞ্চ তাবাক। ভদ্রলোক মনে হয় এইমাত্র দাড়ি কামিয়ে, চান-টান করে টাটকা কাপড়-চোপড় পরে এসেছেন। ছেলের বিয়ের কনে পছন্দ করতে বসেছেন, একটু সাজগোজ তো করতেই হবে। আমার মনে হল কে কোথায় বসবে তা যেন আগের থেকে ঠিক করা ছিল। মারিয়াকে একবার জরিপ করলেন তিনি, তারপর আমার দিকে বেশি করে মনোযোগ দিলেন। আমি দেখে নিলাম মারিয়াও যেন ভদ্রলোককে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে ফুস ফুস করে মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। কী বলেছিল সান্দ্রাকে, মেয়েটা গুট গুট করে সেরজুর কাছে গিয়ে একেবারে তার কোলে উঠে বসল। তোলেদোর দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে কোমল হয়ে গেল।

আমি কেন এসেছি, কতদিন থাকব, কোথায় উঠেছি এসব জানা যেন অত্যধিক

জরুরি। বার বার তোলেদো দেখছিল ছেলেকে এবং তার কোলের মেয়েটাকে। সান্দ্রাকে আমি বলি সান্তরা, মানে কমলালেবু। একে বাচ্চা, তায় অপূর্ব সুন্দর তার কোমল শরীর। ইচ্ছে করেই মনে হল তাকে পরানো হয়েছে সস্তা দামের গোলাপি রঙের সাদা ফ্রিল দেওয়া ফ্রক, পায়ে সাদা মোজা, কালো জুতো, রং মিলিয়ে মাথার চুলে গোলাপি রিবন। রূপ ফেটে পড়েছে তার। আমাদের সবার চোখের সামনে সেরজু ওকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত কাচের দেওয়ালের ওপাশে অনেক নীচে গতিশীল গাড়ির লাইন দেখাতে লাগল। তোলেদো হঠাৎ মারিয়াকে বললেন

—তোমরা কিছু ঠিক করেছ কী?

—কী ব্যাপারে স্যার?

—এই তোমাদের বিয়ের ব্যাপারে।

—আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছি। আপনি ঠিক করে দেবেন তবে হবে বিয়ে, নইলে নয়।

—সেরজুও কি তাই বলে।

—সেই রকমই জানি। ওকে একবার জিজ্ঞেস করতে পারেন স্যার।

—শোন মারিয়া, ক্যান আই কল ইউ মারিয়া?

—সিওর স্যার।

—সেরজু ইজ মাই ওনলি চাইল্ড, অ্যান্ড হি ইজ রিচ, ভেরি ভেরি রিচ। তাই তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম তুমি কেমন মেয়ে, তোমার ব্যাক গ্রাউন্ড শুনে খুব খারাপ লেগেছিল। ভাগ্য তোমার ভালো নয়, বাট আই লাইক ইওর ডটার। মেয়ের ভাগ্যও ইমপরট্যান্ট। ওর আকর্ষণে সেরজু যদি ফিরে আসে বাড়িতে আমি খুব খুশি হব। আমার এত সব সম্পত্তি টাকা পয়সা নিয়ে কী হবে যদি তোমরা ঘরে না ফের।

—আপনাকে খুব কঠোর বলে জানতাম, তা আপনি নন। আপনি বললে তোলেদো পরিবারকে বেঁধে রাখার দায়িত্ব নিতে কুণ্ঠিত হব না, আই প্রমিস।

—দেন লেট দ্যাট বি, আই অ্যাপ্রুভ দিস ম্যারেজ।

বাড়ির কাজের লোকেদের বুঝতে না দিয়ে সব কথাই ইংরিজিতে হল। আমার বোঝার জন্যও ইংরিজি ভাষার দরকার ছিল। এত সহজে সব মিটে যাবে আশা করিনি। শিশু ঈশ্বরের দান, অসম্ভবকে সম্ভব করা ঈশ্বরের কাছে কিছু না। মারিয়া উঠে গিয়ে ভলদোর পা ছুল। অবাক বিস্ময়ে ভলদো সাহেব চেয়ে রইলেন ওর দিকে। মারিয়া এগিয়ে গিয়ে সেরজুকে কিছু বলল, ওরা কাচের দেওয়াল থেকে ফিরল একসঙ্গে। আমি বললাম

—মিস্টার তোলেদো, ডু ইউ নো, ওই যে মারিয়া আপনার জুতো স্পর্শ করল তার মানে কী? তার মানে শ্রদ্ধা জানানো হল আপনাকে। লাইক এ ফাদার আজ থেকে আপনি ওর সম্মানের মানুষ। দিস ইজ ওরিয়েন্টাল ওয়ে। আমাদের দেশের

সিস্টেম, মারিয়া নিশ্চয় শিখেছে সাউথ আফ্রিকার ইন্ডিয়ানদের দেখে।

—আই এম মুভড। সি ইজ ভেরি গুড অ্যাট হার্ট।

ওঁকে বললাম, মারিয়া ভালো মেয়ে, ওর কোনও লোভ নেই তোমার সম্পত্তিতে। ও একটা ঘর চায়, শান্তিতে সংসার করতে চায়। সবাইকে ও ভালোবাসে। আমি কোথাকার লোক, ওর হোটেলে এসেছি মাত্র দু সপ্তাহ, ভাবতে পার কেমন মায়ায় বেঁধেছে আমাকে। ওর পিছন পিছন চলে এসেছি, যদি মেয়েটার কিছু ভালো হয় এই ভেবে। তুমি তো দুনিয়ার মানুষ দেখে বেড়াও, এমন মেয়ে দেখেছ?

মনে হল ঠিক জায়গায় বিঁধেছে কথাগুলো। ডিনারের জন্য উঠতে হল। মারিয়া সান্দ্রাকে দাদুর কোলে দিল। ভলদো তার সঙ্গে কত কী কথা বলতে লাগল যার কোনও মানে আমি বুঝলাম না। বিশাল খাবার টেবিলে বসা হল সবাই মিলে। এরকম এলাহি ডিনার দেখা যায় না, এত চাকর বাকর দেখা যায় না। আমি আর মারিয়া ড্রিঙ্ক নেব না শুনে ভলদো একবার বলল, ওরিয়েন্টে কী কেউ মদ খায় না নাকি। আমি হাসলাম, মিথ্যে কথা তো বলতে পারি না।

খাওয়া দাওয়ার পর মারিয়া আমাকে জিজ্ঞেস করল একান্তে—

ক্যান আই স্লিপ উইথ সেরজু টুনাইট? অনেকদিন ওকে আটকে রেখেছি, আজ আমার ওকে খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে।

মনে মনে হাসলাম। নারীর মন হয়েছে, আমি না বলার কে? বললাম, তা এতে আমার অনুমতির কী দরকার? মনে হল মারিয়া সেরজুকে রাতে তার ঘরে আসার কথা বলে রাখল। এটাই পশ্চিমের নিয়ম, এমনই করে ওরা জীবন কাটাচ্ছে চিরকাল। তবু মারিয়া যথেষ্ট সংযমী মেয়ে।

আমাদের ফ্ল্যাটের বসার ঘরে সান্দ্রা খেলা করছে, দুজন মেইড ওর সঙ্গে আছে। সেরজু বোধহয় বাবার সঙ্গে কথা-টথা বলছে। মারিয়া বলল— তোমাকে আমি চিরদিন মনে রাখব মানিরাতনা। তুমি আমার কী উপকার করলে ভাবতে পারছ না। বললাম— শোন মারিয়া, আমি কিছু করিনি। আমাদের দেশে বলা হয় বিয়ে স্থির হয়ে থাকে হেভেনে। আমরা নিমিত্তের ভাগী। তুমি আমাকে ততক্ষণ ব্রাজিল নিয়ে কিছু শোনাও। কাল সকালে যাবার আগে দেশটার সম্বন্ধে কিছু বল।

—কী শুনতে চাও বল। পুরনো দিনের কথা শুনবে?

আমি শুনতে চাই গল্প, তা সে যে রকমেরই হোক না কেন। মারিয়া বড় শান্ত প্রকৃতির মেয়ে, ঠান্ডা ঠান্ডা গলা। জোরে হাসে না, উঁচু গলায় কথা বলে না। আজ ওর জীবনের মস্ত বড় দিন, অথচ কেমন শান্ত মনে কথা বলছে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। ঘুঁটেকুড়ানি থেকে এক ধাক্কায় রানি হয়ে গেছে সে, তাতেও কোনও উত্তেজনা নেই। হয়তো আছে, বোঝা যায় না বাইরে থেকে। মারিয়া গল্প করতে শুরু করল।

তুপি উপজাতির লোকেরা ব্রাজিলের সব নদী, পর্বত, শহর-গ্রামের সুন্দর সুন্দর নাম দিয়েছে। যেমন তুমি আমার মেয়ের নাম দিয়েছ অরেঞ্জ, সোন্তরা,

তেমনই তুপিদের প্রতিটি নামের ভালো ভালো নাম আছে। পনেরোশো সালে পেড্রো কাব্রাল নামে এক পর্তুগিজ নাবিক রাজার অনুমতি নিয়ে পনেরটি জাহাজ এবং বারোশো লোকসমেত ভাস্কো ডা গামার যাত্রাপথে পশ্চিমের দিকে যেতে থাকে। ভাসতে ভাসতে তারা ব্রাজিলের পোর্তো সেগুরোর কাছে ব্রাজিলে নামে। তারা মাত্র নয়দিন ছিল ব্রাজিলে। কাব্রাল যেখানে নেমেছিল সেখানে একটা ক্রস তৈরি করে পুঁতে প্রার্থনা করেছিল। এই দেশে তখন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ আদিবাসী ছিল, এখন তাদের সংখ্যা মাত্র দু লক্ষ হবে। আদিবাসীরা নানা উপজাতির, নানা রকম সমাজের। তাদের মধ্যে প্রচুর বিভেদ ছিল, মারামারি লেগেই থাকত। কাব্রাল যাদের দেখেছিল তারা কিন্তু ওদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছিল। যেহেতু তারা খুব উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে পারেনি, নিত্যনতুন আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি, তাই ওদের ক্রস বানানোর প্রক্রিয়া দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। করাত, হাতুড়ি, পেরেক এইসব যন্ত্রপাতি তারা প্রথম দেখল। পনেরোশো সালের মানুষ প্রস্তর যুগে পড়ে আছে ভাবতে পার? মাত্র দুজন কয়েদিকে রেখে কাব্রাল ফিরে গেল দেশে। রাজাকে জানাল এই পোড়া দেশে কিছুই পাওয়া যায় না, কোনও বাণিজ্য করার মতো জিনিস তৈরি হয় না। তার চেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার হাতির দাঁত, ভারতের মশলাপাতি অনেক লাভের ব্যবসা। সামান্য কিছু 'পাও ব্রেজিল', অর্থাৎ ব্রাজিল কাঠ নিয়ে গিয়েছিল কাব্রাল লাল রং তৈরি করার জন্য। সেটা কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল পর্তুগালে। কয়েকজন নাবিক লালকাঠ কাটার ব্যবসাও করেছিল কিছুদিন। সে ব্যবসা লাটে উঠতে দেরি হয়নি।

—তোমার ভালো না লাগলে বলতে পার। বন্ধ করে দেব গল্প।

সান্দ্রার খেলা জমে উঠেছে, খিল খিল করে হাসছে মেয়েটা। ওর বড় বড় খেলার সঙ্গীরা ওর পিছনে ছুটতে পারছে না আর। বাচ্চাটা খেলতে পায় না বাড়িতে। খুব মজা পেয়েছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে মারিয়া বলতে লাগল—ইতিহাস নয়, গল্প বলছি তোমাকে। ব্রাজিলের জঙ্গল, এখানকার বুনো মানুষরা আধুনিক জগতকে যখন কিছুই দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না, তখন পর্তুগালের রাজা ব্রাজিলের পূর্ব উপকূলকে বারটি ভাগে ভাগ করে বারোটি রাজ্য বানিয়ে দান করলেন কয়েকজন নিজের লোককে। তারা প্রত্যেকে তিনশো মাইল করে সমুদ্রতীর পেল জায়গির। কয়েকজন জায়গির তৈরি করতেই পারল না, কয়েকটি আদিবাসীরা ভেঙে দিল, দুটি জায়গীর বা কাপ্তেন্সি কাজের হল কেবল। পঞ্চাশ বছর কেটে গেল, এবার রাজা এক হাজার লোক পাঠালেন ব্রাজিলে কলোনি বানাতে। তাদের মধ্যে কয়েকজন পাদ্রী, কিছু সৈনিক, অনেক কয়েদি, আরেকজন গভর্নর ছিল। তারাও সুবিধে করতে পারছিল না। আদিবাসীদের প্রথমে চাষের কাজে লাগানো হল। তারা যখন বুঝল তাদের ক্রীতদাস বানানো হয়েছে, তখন তারা পালাল। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল দেশি ইন্ডিয়ানদের ধরার এবং বিক্রি করার ব্যবসা।

ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে আখের চাষ। ইউরোপে চিনির খুব কদর। আখের খেতে কাজ করতে ইউরোপের লোকেদের কষ্ট হয়, তাই আনো বন্দী করে আফ্রিকার লোকেদের। ঠিক আমেরিকার মতো জাহাজে করে ধরে আনা হত কালো মানুষদের, অকথ্য অত্যাচার হত তাদের ওপর। চিনির খেতে তাদের কাজ করতে হত প্রতিদিন আঠারো ঘণ্টা। পেটের অসুখ, টিবি, টাইফাস, পীতজ্বর আর সিফিলিসে মরে যেত তারা খুব তাড়াতাড়ি। তবু চিনির ব্যবসা চলল অনেকদিন ধরে। তারপর এল গোল্ড রাশ। তুমি চার্লি চ্যাপলিনের গোল্ডরাশ দেখেছ?

—দেখেছি।

কিন্তু সত্যি সোনা পাওয়া গেল, তা জানো? পঞ্চাশ বছর ধরে ব্রাজিলে সোনার খনির কাজ চলেছে। ইউরোপ থেকে প্রচুর লোকে সোনা খুঁড়তে এসে বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে। তবু কিছু লোক সোনার ব্যবসায় ধনী হয়েছে একথা সত্যি। ব্রাজিলের একটা রাজ্যের নাম মিনাস ঝেরাইস, খনি তৈরির দেশ। ওই প্রদেশে একসঙ্গে লক্ষ লোক এসে পড়ায় খাদ্যাভাব থেকে শুরু করে মানুষের ব্যবহার্য প্রতিটি জিনিসের অভাব হল ভীষণ। তারপর একদিন সোনার নুড়ি (নাগেট) শেষ হয়ে গেল। পর্তুগালের রাজা কর হিসেবে কুড়ি শতাংশ সোনার নুড়ি নিলেন এবং তার বিনিময়ে ইংল্যান্ড থেকে ভালো ভালো বিলাসিতার জিনিস কিনে আনলেন। ব্রাজিলের সোনা ব্রাজিলের কোনও উন্নতির কাজে লাগল না। ইংল্যান্ডের ভোগে লাগল শেষ পর্যন্ত।

পর্তুগালের এক পাগল রানি ছিল, তার নাম ছিল দোনা মারিয়া। তাঁর বড় ছেলে দম জঁ গোটা চল্লিশ জাহাজে করে পনের হাজার পর্তুগিজকে নিয়ে ব্রাজিল যাত্রা করল, সেই সুযোগে নেপোলিয়নও পর্তুগাল আক্রমণ করল। ততদিনে রিও ডি জেনিরোতে বন্দর তৈরি হয়েছে, সেখানে নামল দম জঁ, নিজেকে রাজা ঘোষণা করল এবং রিও হল রাজধানী। পরের বছর পাগলি রানি মরে গেলে দম জঁ রাজা হল পর্তুগালের, কিন্তু দেশে ফিরে গেল না। উল্টে রিওকে পর্তুগালের রাজধানী ঘোষণা করে দিল। রিও পুরো পর্তুগাল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাঁচ বছর।

পাঁচ বছর পর ছেলে দম পেদ্রোর হাতে ব্রাজিলের শাসনভার দিয়ে দেশে ফিরল রাজা দম জঁ। একদিন সুযোগ বুঝে দম পেদ্রো স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিল, ব্রাজিল বিনা রক্তপাতে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হয়ে গেল, রাজা হলেন দম পেদ্রো। এই লোকটা অকর্মার ধাড়ি ছিল, কোনও কাজই করেনি সে। সামন্তরা তাঁর শিশুপুত্রকে রাজা বানিয়ে কাজ চালাল অনেকদিন, তারপর সেই শিশু বড় হয়ে নিজের হাতে শাসনভার নিয়ে পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করে। তাঁর নাম দম পেদ্রো (দ্বিতীয়)। তাঁর আমলে দেশে পার্লামেন্ট হল, রাস্তাঘাট, বাণিজ্য, শিল্প সবেরই উন্নতি হয়েছিল।

এরপর চিনির মালিকদের সাহায্যে মিলিটারিরা শাসন কেড়ে নিল দুর্বল রাজার হাত থেকে। মন্ত্রিসভা হল, গণতন্ত্রের এই হল শুরু। তুমি হয়তো জানো না কিছুদিন আগেও ব্রাজিলে মিলিটারি ডিক্টেটর ছিল। তারা যত পারে টাকা ধার করে করে

দেশটাকে দেনায় ডুবিয়ে দিয়েছে। এখন আমাদের সুদ দিতেই দেশের মোট বাণিজ্যে যত বিদেশি মুদ্রা আসে সব ব্যয় হয়ে যায়, আসল আর শোধ হয় না। আমেরিকায় ক্রীতদাসপ্রথা বন্ধ হয়ে যাবার পঁচিশ বছর পরে ব্রাজিলে ক্রীতদাসপ্রথা রদ করে আইন তৈরি হয়। এই হল সংক্ষেপে পুরনো ব্রাজিলের গল্প।

মারিয়া বলল— তোমার ঘুম পেয়েছে মনে হচ্ছে, সারাদিন কাজ করেছ, তারপর এইসব কাণ্ড। যাও শুতে যাও, সকালে যেতে হবে।

বঁ নয়তে বলে নিজের ঘরে গেলাম। সেখানে তখনও আমার জন্য মেইড দাঁড়িয়ে আছে যদি কিছু দরকার হয়। বিছানার ওপর স্লিপিং ড্রেস রাখা আছে, দেখে নিয়ে তাকে বললাম বঁ নয়তে, গুড নাইট। তার মানে এবার তুমি যাও। মেয়েগুলোকে চেনা দায়, সবকটা একরকম পোশাক পরে আছে বলে একইরকম দেখতে লাগে। মারিয়া বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। একটু আগে তা দেখেছি। বিয়ের পর কয়েকটা কোম্পানির ডিরেক্টর হয়ে যাবে। ভালো পার্সোন্যালিটি আছে ওর, কাজকর্ম ভালোই পারবে মনে হয়।

মারিয়ার কাছ থেকে আরও অনেক কিছু জানতে হবে। এমন বহু জিনিস আছে যা বই পড়ে শেখা যায় না। অথচ সহজে জানা যায় কারওর কাছ থেকে। টিভিতে যা দেখেছি, তার মানেগুলো জেনে নিতে হবে। খাদ্যাভাস, সমাজ, খেলাধুলো, আশা-আকাঙ্ক্ষা, রাজনীতি সবকিছু জানতে হবে। একটা জায়গায় এলাম, খেলাম, শুলাম, তাহলেই কী দেখা সম্পূর্ণ হয়ে গেল? মিনাস ঝেরাইস-এর কংগোনহাস ও তার পরিচয় নেব, ব্রাজিলের বিখ্যাত দামী পাথরের বিষয়ে গল্প করব। যখন সেসব দেখব তার আগে তার পরিচয় যদি না জানা থাকে তাহলে দেখার চোখ থাকবে না। এবং সেটা হবে মহতী বিনষ্টি, মহান অপচয়।

আমার বেডরুমের দরজা খোলাই ছিল, ভোর ভোর আমাকে জাগিয়ে দিল মেইড। এরা রাতেও জেগে থাকে নাকি? কে জানে বাবা। খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিলাম, বসার ঘরে এসে দেখি সেরজু বসে কাগজ পড়ছে, মারিয়া তখনও আসেনি। বললাম— বঁ জিয়া, গুড মর্নিং।

আমার ব্যাগটা নিয়ে এল আমার মেইড, আমাকে বলল— ভোসে ফালা পর্তুগুয়েস?

আমার বিদ্যে ওই বঁ জিয়া পর্যন্তই, বোকার মতো হাসা ছাড়া কী করতে পারি। সেরজু তাকে বুঝিয়ে দিল সেটা। আমাকে বলল

—এউ লাইক সা, মর্নিং টি?

মেইড দৌড়ল, চা এল, ভয়ে সেদিকে হাত দিল না ওদের কেউ। ওটা আমার দায়িত্ব, আমি বানালাম। মারিয়া একচুমুক খেয়ে বলল— আমাদের দেশে তেতো কফি খায় সবাই, তোমার চা বোধহয় কেউ পছন্দ করবে না।

তা করুক বা না করুক আমার চায়ের পাতা দরকার, হোটেলে চা পাওয়া যায়

না। সেরজুকে জানিয়ে রাখলাম সে কথা। মারিয়া এল, তার সঙ্গে মেইডের কোলে সান্দ্রা। সবাই নীচে নেমে এলাম লিফটে করে একদম নীচের বেসমেন্টে। গাড়ি চালাবে ড্রাইভার, সে ওখানে প্রস্তুত হয়েই ছিল। সেরজুর গাড়ি এখানে থাকবে। মনে হল খবরটা জেনে গেছে মেয়েরা যে মারিয়া এ বাড়ির পুত্রবধূ হতে চলেছে। আজ সম্মানটা যেন ওকে অন্যরকম ভাবে দেখাচ্ছে ওরা।

সাও পাওলো ফ্লাইং ক্লাবের টারম্যাকে ছিল বিচক্র্যাফট প্রাইভেট প্লেন। তার গায়ে তোলেদো কোম্পানির নাম লেখা। গাড়ি চলে এল প্লেনের কাছ পর্যন্ত। সান্দ্রা কলবল করে কিছু বলল মাকে। মারিয়া হেসে তার উত্তর দিল, তার সঙ্গে সেরজুও হেসে উঠল। আমার কৌতূহল নিবারণ করে মারিয়া বলল— সান্দ্রা বলছে— এটা কি পাখি প্লেন?

প্লেন চালাবে সেরজু, তার পাশে থাকবে আরেকজন পাইলট। ছোট প্লেন চালানো সোজা নয়। আমাদের যাত্রাপথে পর পর ছোট এয়ারপোর্ট পাব, বউরু, আরাকাতুবা, ক্যাম্পো গ্রান্দে তারপর কোরুম্বা। প্যারাগুয়ে আর ব্রাজিলের সীমারেখার ওপর কোরুম্বা বড় শহর মতো জায়গা, হোটেল মোটেল আছে। মাছ ধরার ব্যবসা, চামড়া রপ্তানির এবং অবশ্যই চোরাকারবারীদের আড্ডা আছে। পান্তানালের দক্ষিণের দরজা হল কোরুম্বা। আমাদের পাখি প্লেন হাইওয়ে ধরে চলবে। নীচে চওড়া হাইওয়ে চলে গেছে সোজা কোরুম্বা পর্যন্ত, ঠিক তার ওপর দিয়ে প্লেন চলবে।

ছোট প্লেন, সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না, পাঁচজন মাত্র বসতে পারে। বেশি উঁচুতে ওঠে না। হাওয়ায় বেশ দোলে, জোর হাওয়ার মুখে টলে যায় অন্য দিকে। মোটকথা ভয় ভয় করে। তিন ঘণ্টার পথ। নীচের চওড়া রাস্তাটা পাওয়া গেল। মাঝে মাঝে রেডিওতে কর কর আওয়াজ করে কথা শোনা যায়, আবার চুপ। সান্দ্রা গুট গুট করে হেঁটে বেড়াচ্ছে, চলে গেল ককপিটে সেরজুর কাছে। দেখে এল কী হচ্ছে ওখানে। ককপিটের নীচে একেবারে খোলা আকাশ। মনে হয় শূন্যে বসে আছি। গ্রাম ঘর বাড়ি, একটার পর একটা নদী, কোনওটা ছোট কোনওটা বড়, সব পার হচ্ছি। ছোট বড় পাহাড় টপকিয়ে যাচ্ছি। নিজেকে বেশ দামী মানুষ মনে হচ্ছে, একমাত্র আমার জন্য সেরজুকে রাজি করিয়েছে মারিয়া পান্তানাল যেতে। আর আমি কী দিলাম তার বদলে? কাল মারিয়া আমাকে বলেছে সে চিরদিন আমাকে মনে রাখবে। আমার উপস্থিতির এত দাম?

কফি বার করল ফ্লাস্ক থেকে মারিয়া। ছোট ছোট কাগজের কাপে কফি নিয়ে গুঁড়ি মেরে দিয়ে এল ককপিটে। প্লেনটা দুলছে বেশ। হাওয়ায় ভেসে এদিক থেকে ওদিক চলে যাচ্ছে। পাইলটদের অখণ্ড মনোযোগ ওদিকে। তারা কফি নিয়ে বলল —অবরিগাদা।

জানতাম পর্তুগিজ ভাষায় ক্রিয়াপদের লিঙ্গ বিচার করতে হয়, হিন্দিতে যাতা হ্যায় যেমন স্ত্রীলিঙ্গে যাতি হ্যায় হয়। অবরিগাদো তাই মারিয়ার ক্ষেত্রে অবরিগাদা

হয়েছে। মারিয়া বলছিল আমাকে, আগে তোমাকে বলি পান্তানালের কী অবস্থা এখন। শতকরা নব্বই ভাগ জায়গায় মালিকানা বেসরকারি হাতে রয়েছে বলে ধ্বংস হচ্ছে পান্তানাল। পৃথিবীতে এমন একটিও জায়গা নেই যেখানে পশুপাখির এত বৈচিত্র্য চোখের সামনে দেখা যায়। আমাদের ভাষার নাম হল 'তেরা দে নিনগুয়েম', তার মানে কারও দেশ নয়।

বাস্তবিক এই জায়গায় কোনও আইন নেই, কোনও নিয়ম মানা হয় না। আচ্ছা বল তো, একজোড়া নীল ম্যাকাও আমেরিকার বাজারে দাম কত হতে পারে? পাঁচ হাজার ডলারে বিক্রি হয় জোড়া। একটা জ্যাকারের চামড়া আমেরিকাতে পাঁচশো ডলার। একজন সাধারণ ব্রাঞ্চ কর্মীর মাস মাইনে পনেরো ডলার। কেন তারা চুরি করে বন্যজন্তু পাচার করবে না বল? আমেরিকার মেয়েরা কুমিরের চামড়ার তৈরি হাতব্যাগ, জুতো, বেল্ট, গ্লাভস পরতে খুব পছন্দ করে। ওদের পয়সা আছে তাই দরিদ্র ব্রাজিলের প্রাণীসম্পদ মেরে আনন্দ করে। বছরে পান্তানাল থেকে পাঁচ লক্ষের বেশি জন্তু হত্যা করে তার চামড়া বলিভিয়ার মধ্য দিয়ে আমেরিকা চলে যায়। এই পাঁচ লক্ষের মধ্যে জ্যাকারে কুমিরের সংখ্যাই দু লক্ষের বেশি। ভেবে দেখ, এক বছরে কুড়ি থেকে পঞ্চাশ হাজারের মতো চিতা বাঘ মারা হয়। বর্ষার সময় চারদিকে খালি জল, খুব কম স্থলভাগ বেঁচে থাকে। সেই সময় জাগুয়ারগুলো গাছে উঠে বসে থাকে। নিচ দিয়ে কোনও পাখি বা কাপিবারা (ভালুকের মতো লোম, গিনিপিগের মতো গড়ন) বা পিপীলিকাভুক বা হরিণ যেতে দেখলে লাফ দিয়ে ধরে। ওদের শত্রু মানুষ, যদি দেখতে পায় জাগুয়ার গাছে চড়ে আছে, তাহলে নীচে একটা বল্লম রেখে তাকে রাগাবে। ওই জন্তুটা বেশিক্ষণ ক্রোধ সামলাতে পারে না। যেই লাফাবে ঠিক তার নীচে রাখা বল্লমের ওপর পড়বে। হৃদয় ফুটো হয়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

ওসব খারাপ কথা থাক। এখন তোমাকে বলে রাখি, তোমার জন্য পিরানা মাছ ভেজে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছে সেরজু। তুমি কি জানো, নানারকম পিরানা মাছ হয়, সব জাতগুলো কিন্তু রাক্ষুসে নয়। ছোট জাতের গুলো খুব বড় হলেও এক কিলো পর্যন্ত হয়, আর বড় জাতের গুলো সাত-আট কিলোও হতে পারে। ফুড চেন ভেঙে যাচ্ছে কেমন ভাবে জানো? জ্যাকারে কুমির মেরে দেওয়াতে তাদের খাদ্য পিরানা বেড়ে যাচ্ছে, রাক্ষুসে পিরানারা অন্য ছোট মাছ খেয়ে নিচ্ছে। ছোট মাছ কমে যাওয়ার পাখিদের খাবারে টান পড়ছে।

কঁক কঁক কর কর করে আওয়াজ হল রেডিওতে। পাইলট সেরজু কথা বলল কিছু। মারিয়া নীচের দিকে তাকিয়ে বলল— ক্যাম্পো গ্রান্দের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। আরও এক ঘণ্টা লাগবে কোরুম্বা পৌঁছতে।

সান্দ্রার জন্য খাবার বার করল মারিয়া। গুছিয়ে খেতে দিল মেয়েকে। ফ্লাস্ক থেকে কালো কফি ছোট কাগজের কাপে আরেকবার দিয়ে এল পাইলট দুজনকে। এবার দেখলাম সিট পাল্টে অফিসের পাইলট প্লেন চালাচ্ছে। আমি কালো কফি

আর খাব না জেনে নিয়ে নিজে একটু নিল। এরা তেতো কফি খায় যখন তখন, সামান্য দু ঢোঁক, ছোট ছোট কাপে।

—কী করে জানলে নীচের শহরটা ক্যাম্পো গ্রান্দ্রে?

—খুব সোজা, ওপর থেকে পরিষ্কার দেখা যায় দুটো হাইওয়ে উত্তর-দক্ষিণ আর পূর্ব পশ্চিম থেকে এসে মিলেছে এই শহরে। আচ্ছা, যা বলছিলাম তোমাকে, পান্তানালের অনেকগুলো অংশ আছে, তাদের নামও সব আলাদা। আমরা এখনই পান্তানাল দো রিও নেগ্রোর ওপর দিয়ে যাব। নেগ্রো নদীর সঙ্গে এই এলাকার যোগ রয়েছে। এর উত্তরে রয়েছে পান্তানাল দো তাকুয়ারি। আরও উত্তরে পান্তানাল দো লাউরেঙ্কো। সব নদীর নামে নাম। যদিও পান্তানালে নদী আছে মাঝে মাঝে, বর্ষার সময় সব একাকার। তখন কোথায় নদী কোথায় কী, সব জলে থই থই। গরমের সময় পান্তানাল দেখায় মজা আছে। হাজারে হাজারে জ্যাকারে শুয়ে আছে চারদিকে দেখতে পাবে। ওদের ভয় পাবার কিছুই নেই কারণ ওরা মানুষকে আক্রমণ করে না। ওদের খাদ্য মাছ। তবে যদি তুমি কোনও একলা একটা জ্যাকারে দেখ খবরদার ওদিকে যাবে না। সেখানে হয় ডিম, নয় বাচ্চা আছে নির্ঘাত। তবে সেও তোমাকে কামড়াবে না, তাড়া করবে খুব জোরে। তাই অন্য জ্যাকারেরাও সেদিকে ঘেঁসে না। দেখবে এদেশি লোক কেমন জলে নেমে মাছ ধরছে আর তার পাশেই দশ বিশটা জ্যাকারে অলস ভাবে শুয়ে আছে। পান্তানালে কোনও শহর নেই, উঁচু জায়গায় যাও বা গ্রাম আছে এক আধটা, তাও খুব কম। এত বিশাল এলাকা কেবল পাখি আর মাছেদের জন্য, ভাবতে পার? নীচে দেখ কেমন দেখায় পান্তানাল।

অদ্ভুত লাগল দেখতে। বিশাল থই থই জলের মাঝে গাছ রয়েছে, যা থাকার কথা নয়। মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের মতো ডাঙা জায়গা। সেখানে আরও গাছপালা, তার মাঝে লাল রঙের টালি ছাওয়া একটা বাড়ি। দূর দূর জল শুধু জল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে একটা ডাঙা। আসামের চায়ের বাগানে চায়ের গাছের মাঝে মাঝে একেকটা বড় গাছ থাকে, ঠিক তেমনই জলরাশির মাঝে এক আধটা ছোট সবুজ জমি।

কোরুম্বাতে নামল আমাদের পাখি প্লেন। এবার বোঝা গেল আমার জন্য কীরকম আয়োজন করে রেখেছে সেরজু। বিশাল লিমুজিন গাড়ি চলে এল প্লেন পর্যন্ত। ভেতরটা বেশ ঠান্ডা, অনেক জায়গা। গাড়ি নিয়ে এল আমাদের একটা হোটেলে। মাত্র সকাল দশটা বেজেছে। সকালের জলখাবার খেয়ে মোটর বোটে উঠব। তারপর থেকে পান্তানালের ভেতর দিয়ে জলবিহার। এলাহি ব্যাপার করেছে সেরজু। বড়লোকি দেখাতে হবে এমন কোনও কথা নেই। সেরজু এখনও তার বাবার পয়সা নেয় না। মারিয়াকে অল্পবিত্ত বলাই উচিত। থাকতে পারলাম না, বললাম

—সেরজু, দিস ইজ নট গুড, ওয়েস্টেজ অব মানি।

মারিয়া বুঝিয়ে দিল কী বলতে চাইছি। মারিয়াই উত্তর দিল সমস্ত আয়োজন ওর বাবা করেছে, নাতনি যাচ্ছে, তার যেন কোনও কষ্ট না হয়। তাছাড়া মানিরাতনার অনুরোধে এইসব আয়োজন তিনি নিজে করেছেন। সাও পাওলোতে একজন ম্যানেজার প্রতি মুহূর্তের খবর রাখছে। রাজা মহারাজার মতো আয়োজন করেছে ভলদো সাহেব। এই লোকটাকে এতদিন মারিয়া ভয় পেয়েছে কত। পাইলট লোকটি সেরজুর বাবার কর্মচারী, সে প্লেন নিয়ে ফিরে যাবে। আমাদের দায়িত্ব নিল একজন, সে গত রাতে এক হাজার কিলোমিটার গাড়িতে করে এসে সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আছে কিনা দেখে নিয়েছে। ট্র্যাভেল এজেন্টের লোক এসে মারিয়ার কাছে জেনে নিয়েছে আমার বিষয়ে সব খুঁটিনাটি। চায়ের অভ্যাসের কথা জেনেছে আগেই। তবে এখানে চা পাওয়া যায়। এটা ট্যুরিস্টদের জায়গা এবং বহু ট্যুরিস্টই চা চায়। এই হোটেলে আমাকে বেশ ভালো চা খাওয়াল।

প্যারাগুয়ে নদীর ধারে সুন্দর ঘাট, জল টলটল করছে, এত পরিষ্কার জল যে নীচের শ্যাওলা দেখা যায়। বেশ চওড়া নদীটা, তার চেয়েও অপূর্ব সুন্দর মোটর বোটটা। বুঝতে পারছি সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থাটি আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছে ভলদো তোলেদো। ভেতরের পরিপাটি আয়োজন করে রেখেছে একটি মেয়ে। আমাদের দেখে বলল বঁ জিয়া। মারিয়া তাকে কিছু জিজ্ঞেস করল। মেয়েটা অতিরিক্ত বিনয়ের সঙ্গে মারিয়াকে যা দেখাল তা হল মশারির মতো নেটের পর্দা সমস্ত বোটটাকে ঘিরে রেখেছে। এখন অবশ্য তা তোলা রয়েছে।

—পান্তানালের মশা পৃথিবী বিখ্যাত। সন্ধেবেলা এই নেটের কাজ দেখতে পাবে।

আমি মশা মাছিকে ভয় পাই। আমাজনের জঙ্গলে মাছির কামড়ে লোক মরে যায় শুনেছি। কত রকমের পোকামাকড় আছে। আর এখানে মশার কামড়ে ইয়োলো ফিভার এবং ডেঙ্গু ফিভার হয় জানি। সুতরাং সাধু সাবধান। বোটটা বেশ বড়, ওপর তলায় বসার জন্য সুদৃশ্য ছাদ ঢাকা বসার জায়গা, তার চারদিক খোলা। নীচে পর পর তিনটি ঘর। পর্দা দেওয়া এয়ার কন্ডিশনার লাগানো একেবারে হোটেলের মতো বেডরুম। কাশ্মীরের ডাল লেকের হাউস বোটের মতো অনেকটা, কিন্তু তার চেয়েও অনেক ভালো ব্যবস্থা। সবচেয়ে নীচে ইঞ্জিন রুমে জেনারেটর আছে। আলো, পাখা, এ সি সবই আছে।

এগারোটায় ছাড়ল বোট, ঘড়ি দেখলাম আমি। নিথর জলরাশি কেটে লাক্সারি মোটর বোট চলেছে নিখুঁত ছন্দে। আমরা ছাদে বসে আছি সোফায়, দেখছি চারদিক তাকিয়ে। বোটে বসে নদী ছাড়া অন্য কোনও জলাশয়, লেক বা বিরাট সমুদ্রের মতো কিছু এখনও দেখা যায় না। প্যারাগুয়ে নদীর দুই পারের মাঝখান দিয়ে বোট চলেছে, আমাদের বাঁ দিকটায় বলিভিয়া দেশ, তার ভেতরেও আছে পান্তানাল, আর ডানদিক থেকে ছোট ছোট নদী এসে মিশেছে। পান্তানালকে দুভাগে ভাগ করা যায়, উত্তর আর দক্ষিণ। দক্ষিণ পান্তানাল প্যারাগুয়ে আর আর্জেন্টিনার ভেতর

পড়েছে প্যারাগুয়ে নদীর দুপাশে। উত্তর দিকের বেশি অংশ ব্রাজিলের ভেতর রয়েছে।

একটু পরে হঠাৎ অনুভব করলাম আমাদের চেনা নদীটা আর নেই, আমরা এক সুবিশাল হ্রদে এসে পড়েছি। তার পাড় নেই, কুল নেই। বোটের লোকেরা জানে কোনটা নদী আর কোনটা নয়। আমাদের গন্তব্যস্থান পোর্তো এলেগ্রো। আড়াইশো কিলোমিটার দূর যেতে ঘণ্টা পাঁচ-ছয় লাগবে বলল সেরজু। আমরা চার ঘণ্টা পরে প্যারাগুয়ে নদী ছেড়ে ডানদিকের লাউরেঙ্কো নদী ধরব। এই নদী ধরে কুইয়াবা নদীতে গিয়ে পড়ব। পোর্তো এলেগ্রো কুইয়াবা নদীর ধারে, পান্তানালের গভীরে। আমরা চলেছি সোজা উত্তর দিকে। পোর্তো এলেগ্রো নামে দক্ষিণ ব্রাজিলের আরও একটা বিশাল বন্দর শহর আছে। আমরা যাচ্ছি কুইয়াবা নদীর ধারের পোর্তো এলেগ্রোতে, যা পান্তানালের মধ্যেকার এক ছোটখাটো গঞ্জ এবং ভ্রমণকারীদের থাকার আর পান্তানালের পণ্যের ব্যবসার কেন্দ্র।

এসে গেছি পৃথিবী বিখ্যাত পর্যটনস্থল পান্তানাল। দেখতে পাচ্ছি আমাদের বাঁদিকের গাছের তলায় সারি দিয়ে শুয়ে থাকা জ্যাকারে কুমিরের দল। ঠিক যেন লাইন দিয়ে গাছ কেটে শুইয়ে রাখা আছে। তারা নড়ছে না, অলসের মতো স্থির হয়ে পড়ে আছে। তাদের পিঠের ওপর, আশপাশে ঢাউস সারসের দল নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোটের স্পিড চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার হবে প্রতি ঘণ্টায়। ঘণ্টাখানেক পরে বোটের স্পিডকে খুব কম করে দেওয়া হল, প্রায় দাঁড়টানা নৌকোর মতো আস্তে আস্তে চলছে।

একজন বোটের লোক কিছু বলতে লাগল জঘন্য রকমের ইংরিজি ভাষায়। সে নাকি আমাদের গাইড। মারিয়া কানে কানে বলল— ও যা বলছে সেই কথাগুলো আমি পরে বলে দেব, তুমি ভেব না। এখন কেবল দেখে যাও।

দেখলাম দ্বীপের মতো জায়গায় গাছপালা, তার মাঝে একটা বাড়ি, চারদিকে মজবুত বেড়া, গরু বাছুর অনেকগুলি, জলের ধারে ঘাট, ঘাটে মোটর লাগানো নৌকো বাঁধা। বিরাট জলের বুকে একখানি স্থিরচিত্র, অপূর্ব পরিবেশ। বাঁদিকটা সমানে ডাঙা, দূর পর্যন্ত ঘাসে ঢাকা জমি নানারকম জীবজন্তু কিছু ঘরবাড়ি, পরিচিত ছবি কোনও নতুনত্ব নেই।

মারিয়া বলল— এবার বাঁদিকে দেখ দূরে বলিভিয়ার পাহাড়ি এলাকা। ওদিককার জল সব নেমে এসে এদিকের নদীতে পড়ে। একটু পরে পাহাড়গুলো এসে যাবে কাছে। কিছু কিছু জঙ্গলও দেখবে, সামান্য হলেও অসামান্য, কারণ সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ওগুলোর যোগদান প্রচুর। আমাদের বাঁদিকে এবার শুকনো জমি উঁচু হয়ে যাচ্ছে। তার গায়ে সব ফাজেন্দা, যাকে তোমরা বল ফার্ম হাউস। ডানদিকের জমি আরও নিচু হয়ে গেছে, ওদিকটায় জলাজমি রয়েছে। ডানদিকে নজর কর ভালো করে। গাছের ওপর জাগুয়ার দেখা যাবে। আর অনেক রকমের সুন্দর সুন্দর পাখি দেখবে অজস্র। তারা দলে দলে গাছের ওপর থাকে, আর আওয়াজে ভরিয়ে রাখে

শব্দহীন পান্তানাল। রঙের ফোয়ারা তাদের গায়ের পালকে।

সান্দ্রা মাকে বলল কিছু, বাঁ দিকে দেখাল। একটি কাপিবারা পরিবার, দুই পূর্ণবয়স্ক এবং তাদের চারটি বাচ্চা। গিনিপিগের মতো অনেকটা কিন্তু বেশ বড়সড়, গায়ে প্রচুর লোম। জলেও থাকতে পারে ভোঁদরের মতো। আমাদের দেখে মোটেও সন্ত্রস্ত হল না। মনে হয় এই রাস্তায় সব সময় মোটরবোট চলাচল করে বলে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

মারিয়া বলল— কাপিবারারা নিরামিষভোজী। জলের মধ্যে ওদের খাবার হল জলের উদ্ভিদ, শ্যাওলা ধরনের জিনিস। মজা দেখ, ওরা যদি জলের ওইসব জিনিস না খেয়ে নিত তাহলে পান্তানাল কবে বুঁজে যেত। মনে মনে ভাবছিলাম যদি কিছু কাপিবারা শ্রীনগরের ডাল লেকে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে কী ভালো হয়। ডাল লেক বুঁজে যাচ্ছে জলের তলাকার উদ্ভিদের ঠেলায়।

খুব আস্তে চলছে বোট, নীচে ডাক পড়ল আমাদের। ইঞ্জিন রুমে বেশ গরম। একটা দিকে দর্শকদের জন্য পুরু কাচের জানলা লাগানো রয়েছে। আমরা জলের নীচে চলে এসেছি। নীলচে জলের মাঝে নানা রঙিন মাছের ঘোরাঘুরি দেখা যায়। ওরা আমাদের পিরানা মাছ দেখাবে বলে ডেকেছে। দেখলাম, বেশ ভালো করেই দেখলাম। নিতান্ত সাধারণ তেলাপিয়া মাছের মতো, হলদেটে, কোনও কোনওটার পিঠের দিকটায় লালের আভা। আমাদের দেশের পাকা রুই মাছের মতো রং। ঝাঁক বেঁধে ঘুরছে, মোটেই রাক্ষুসে ভাব নেই। একেকটা বেশি হলে আধ কিলো মতো হতে পারে। এগুলো ছোট পিরানা মাছ, জ্যাকারে কুমিররা খায়।

আমাকে যা আশ্চর্য করল তা জলের নীচের গাছপালা। বড় বড় পাতাওলা এক ধরনের গাছ রয়েছে, যাদের পাতায় রং আমাদের পাতাবাহার গাছের চেয়েও বেশি সুন্দর। মনে করা যাক শাল সেগুন গাছের মতো বড় বড় পাতার রংগুলো যদি লাল, সবুজ বা হলুদের নানা ডিজাইন দিয়ে তৈরি হয় তো কেমন লাগবে। সমস্ত তল্লাটটা রঙে রঙে ছয়লাপ হয়ে আছে। তার মাঝে মাঝে বিচিত্র সব মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে নিশ্চিন্তে। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। কে বলে জলের নীচে রং নেই? কেবল কোরাল বা প্রবাল দ্বীপই জলের নীচের রঙের জন্য বিখ্যাত ছিল জানতাম।

মারিয়া বলল, এখানে জলের স্রোত প্রায় নেই, হ্রদের মতো জায়গা। আমাদের বাঁদিকে বিশাল মান্দিরও লেক, যার পুরোটাই বলিভিয়ার মধ্যে। সামান্য একটু, মানে নদীর দিকটায় আমরা রয়েছি।

একদল ভোঁদর ঘুরছিল আমাদের নাকের সামনে। বোধহয় দেখতে এসেছিল আওয়াজ করছে কী জিনিস। যেমন এসেছিল তেমনই মিলিয়ে গেল। মনে পড়ল এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব জলের মাঝের স্তন্যপায়ী জীব দেখলাম সবকটাই উভচর। কুমির, ভোঁদর, কাপিবারা। পান্তানালে বন্যা আর খরা পালাক্রমে আসে প্রতি বছর। তাই বোধহয় এরাই টিকে গেছে প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য রেখে।

আবার বোটের ছাদে এসে বসা হল সবাই মিলে। এবার গতি বাড়াল বোটের

লোকেরা। ঘড়ি দেখলাম, একটা বেজে গেছে কখন বুঝতে পারিনি। খাবার যোগাড় হল। প্লেটে করে খেতে দিল ভাত, রাজমার তরকারি, বিফ স্টেক, স্যালাড আর সুকো (ফলের রস)। সঙ্গে সঙ্গে মারিয়া উঠল, ওদের কিছু বলল। আমাকে বলে গেল খেও না, ওরা তোমাকে বিফ দিয়েছে। নীচে নেমে গেল। তারপর আমার জন্য নিয়ে এল ফ্রাঙ্গো, মানে চিকেন। তৈরি করাই ছিল। জঙ্গলের ফাউল প্রচুর পাওয়া যায় বিনাপয়সায়। দামও অনেক কম, গরিব লোকের খাদ্য। পোলট্রিতে মুরগি সাধারণ লোকে পালন করে না। এদেশে ডিম পাওয়া যায়, মুরগির ডিম নয়, একটু নীলচে রং, ছোট ছোট, পাখির ডিমের মতো। কম লোকেই খায়, দামও বেশি। ওগুলো জংলী ফাউলের ডিম, নাম ওভা।

এক ঘণ্টা আরও গেল। আমাদের বোট ঢুকল ডানদিকের জলাজমিতে। অথৈ জল চারদিকে, সমুদ্রের মতো, কেবল ঢেউ নেই। পড়ন্ত রোদে চিকচিক করছে জল, আর কী আশ্চর্য জলের মাঝে মাঝে লম্বা গাছ উঠেছে একেকটা। থই থই জলের মাঝে একটা গাছ উঠে গেছে আকাশের দিকে, অদ্ভুত দেখতে লাগে। বোঝা যায় জল এখানে বেশ অগভীর। গাছের দিকটায় নদীর পাড় আছে মনে হয়। মারিয়ার কথা রেখে বাঁ দিকের পাহাড়টা এগিয়ে এল আমাদের কাছে। মান্দোর হ্রদের দিক থেকে যেন নেমে এল আমাদের কাছে।

চমৎকার ঘাসে ভরা মাঠ, তার অনেক পিছনে টিলার মতো পাহাড়, গাছপালা। কাছাকাছি মনে হয় ইনজুনদের গ্রাম আছে, কেননা প্রচুর গরু বাছুর রয়েছে ছাড়া। আর কী আশ্চর্য! প্রচুর জ্যাকারে শুয়ে আছে গৃহপালিত পশুদের মাঝে। শয়ে শয়ে বললে ঠিক হবে না, বলা উচিত হাজারে হাজারে। এত জ্যাকারে দেখতে পাচ্ছি যে ওই জিনিসটা আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। গাছের ওপর বসে থাকা জাগুয়ার দেখা যায়নি এখনও, কিন্তু তার জন্য ডাঙা চাই, ডাঙার ওপর গাছ চাই। তার পরেও খাদ্য চাই তাদের, পিপীলিকাভুক (আর্মাডিলো), অথবা কাপিবারা অথবা বাঁদর, যারা গাছের তলায় ঘুর ঘুর করবে। পিঁপড়ে খেকোদের চোখের দৃষ্টিশক্তি খুব কম, তারাই আসল খাদ্য। নিদেনপক্ষে বড়সড় সারস পাখিও চলতে পারে। একরকমের বাঁদর দল বেঁধে রয়েছে দূরে, যারা আমাদের দেশের মতো নয় মোটেই। ছোট ছোট গড়ন আর কাঠবেড়ালের মতো লেজ। বাঁদিকের ডাঙা অঞ্চল শেষ হয়ে আবার জল শুরু হয়েছে। বাঁদিকে আরেকটা বড় হ্রদ আছে বলিভিয়ার দিকে, তার নাম গাইবা লেক। অনেক দূরে রয়েছে, কিন্তু পাহাড়ি জলের যোগানদার। এখান থেকে ব্রাজিলের সরকারি পান্তানাল ন্যাশনাল পার্ক শুরু হল। এই জায়গায় কেউ জ্যাকারে বা আর্মাডিলো কিংবা জাগুয়ার মারতে পারে না। সবচেয়ে আনন্দের খবর জাগুয়াররা গরু বাছুর মেরে খায় না। অদ্ভুত এবং আশ্চর্য সহাবস্থান। কখনও কখনও অবশ্য শোনা গেছে অশক্ত কিংবা রুগ্ন গবাদি পশু মেরে খেয়েছে জাগুয়ার।

না হয় পশুমাংস খাওয়া জাগুয়ারের প্রকৃতিদত্ত অধিকার। কিন্তু মারিয়া যখন

বলল, মানুষে জাগুয়ার মেরে খায় তখন বিশ্বাস করতে পারিনি। জাগুয়ার মারা হয় তার চামড়া দিয়ে ফার কোট বানিয়ে আমেরিকান বিলাসিনীরা পরবেন বলে। বাকি রইল মাংস, তা সেটা মানুষে খুব আনন্দের সঙ্গে রেঁধে খায় পৌরুষত্ব বৃদ্ধি হবে বলে, এফ্রোসিডিয়াক। পশু-পাখি বড় মাছ জ্যাকারে অথবা বিফ তৈরি করতে নিহত গরু, সব কিছুরই বর্জ্য অংশ নদীতে লোকে ফেলে দেয়, পিরানা মাছে খায় সে সব। ডানদিকে এবার এক আধটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে কখনও কখনও। একটা বেশ বড়, বেশ কিছু বড় গাছ আছে সেটায়। তেমনই একটা গাছে আরামে বসে আছে জাগুয়ার, বায়নাকুলারে দেখে সবাইকে দেখাল সেরজু। একে একে সকলে দেখল জ্যান্ত জাগুয়ার, আমিও দেখলাম, লম্বা লেজ দুলিয়ে বাবাজি বসে আছেন গাছের ডাল আর কাণ্ডের সংযোগস্থলে। ভাবখানা যেন দেখবি তো দেখ, আমার কী। আমাদের দিকে দেখেও তার কোনওরকম চাঞ্চল্য হল না একটুও। তবে একটা কথা ঠিক এভাবে দেখে সখ মেটে না। তবু তো বলতে পারি জাগুয়ার দেখেছি আমি পান্তানালের জলা জায়গায়।

মারিয়া বলল, পান্তানালের সূর্যাস্ত অতি সুন্দর, জীবনের এক অমূল্য অভিজ্ঞতা। ন্যাশনাল পার্কের পিছনে দিগন্তবিস্তৃত জলের ওপর সূর্য ডোবার সময় রঙের খেলার যা শোভা তার সমতুল্য অন্য কোনও জায়গা আমার জানা নেই। মজা হল জল যদিও দিগন্ত পর্যন্ত, তার মাঝে মাঝে বড় বড় গাছগুলো এক অনির্বচনীয় পরিস্থিতি বয়ে আনে। গাছ আমাদের চেনা, জলও আমাদের চেনা, কিন্তু এমন জল কোথাও পাওয়া যাবে না যার মাঝে গাছ আছে। বন্যার সময় ছাড়া এমন চেহারা দেখা যাবে না কোথাও। পান্তানালে সব সময়েই বন্যা।

পোর্তো এলেগ্রো যাবার দেরি আছে। ওরা বলছিল পাঁচ ছ ঘণ্টায় পৌঁছব আমরা, কাজের বেলা তা হল না। পাঁচ ঘণ্টার বদলে এখন মনে হয় সাত ঘণ্টা বা তার বেশি লাগবে। ভালোই হল, আমরা আজই কুইয়াবা নদীর বুকের ওপর থেকে পান্তানালের সূর্যাস্ত দেখতে পাব আরেকটু পরে।

সান্দ্রা ঘুমিয়ে পড়েছে, ওকে নীচে শুইয়ে বোটের চারদিকে মশারি ফেলতে বলে দিল মারিয়া। এই একটা মজার জিনিস দেখলাম। পান্তানালের বিখ্যাত মশা আটকানোর জন্য মশারির ঘেরাটোপ আছে যাতে বোটের ভেতর মশা না ঢোকে। ফিরে এসে বসল আমার পাশে মারিয়া। বলল, তোমার বোধহয় তেমন ইন্টারেস্টিং লাগছে না?

—তোমার এমন মনে হবার কারণ?

—মুখের মধ্যে সেই ভাবটা দেখছি না।

—তুমি জাপানিদের মুখে কোনওদিন উত্তেজনা দেখেছ? ওটা ওদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, আমারও তেমনই, চেষ্টাকৃত ভাব তুমি দেখছ। আসল ভাব গোপন করার চেষ্টা করছি।

—কাল বিকেলে আমরা ইগুয়াসু দেখতে যাব, দেখবে খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে।

পাখিরা ফিরছে ঘরে, কলরব তুলেছে প্রচণ্ড রকম। ভীষণ উত্তেজনা ওদের মধ্যে। ছোট্ট লাউরেঙ্কো নদীর দুপাশে ঘন হয়ে এসেছে ঝোপঝাড়, গাছপালা। নদী জল গাছগাছালি নিয়ে বাংলার চিত্র নিখুঁত। একটা শাখা নদী কুইয়াবা থেকে লাউরেঙ্কোতে মিলেছে, সেটা দিয়ে আবার আমরা কুইয়াবাতে পড়লাম। অনেকটা পথ শর্টকার্ট হল। আর একঘণ্টা লাগবে।

আমি বুঝতে পারছি না এরা ঘাঁটিতে পৌঁছতে এত ব্যস্ত কেন? রাতের পান্তানালও তো নতুন জিনিস আমাদের জন্য। কথাটা বললাম মারিয়াকে। ও বোঝাল, একটু পরে লক্ষ লক্ষ মশা আসবে, কেউ এখানে বসতে পারবে না। তখন ঘরে ঢুকে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া তোমার কোনওরকম অসুবিধে হলে ওদের কপালে দুঃখ আছে।

এল, মশারা চলে এল দেখতে দেখতে। সত্যি এখানে বসা কষ্টকর হয়ে উঠল। ছাদের বসার জায়গায় মশারির ব্যবস্থা নেই। নীচে নেমে আসতে বাধ্য হলাম আমরা। বেডরুম থেকে অস্তগামী সূর্যের রূপ দেখেই পরিতুষ্ট হতে হল। এত মশা হয় কেন? জল এখানে আটকে পড়েছে বহু জায়গায়, স্রোত নেই। জল বেশি ঠান্ডাও নয়, খাদ্য প্রচুর, মশার বংশবৃদ্ধির পক্ষে আদর্শ জায়গা। খায় কী ওরা? কেন পান্তানালে আমিষ নিরামিষ দু ধরনের খাদ্যই তো প্রচুর। লক্ষ লক্ষ টন মাছ পচে পান্তানলে, খাদ্যের অভাব কোথায়? সবার জন্যই খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছে প্রকৃতি এখানে।

পোর্তো এলেগ্রোর সবচেয়ে ভালো হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। চারদিক থেকে বন্ধ হোটেলে মশার অত্যাচার নেই। রাতটা ভালো ভাবে না কাটার কারণ নেই। সকাল সকাল ফেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে ফেরার তিনটে উপায় আছে। প্রথম, সোজা উত্তর দিকে কুইয়াবা শহর পর্যন্ত নদীপথে গিয়ে সেখান থেকে প্লেনে করে ফেরা। দুই নম্বর যেপথে এসেছি সেই পথে ফেরা। তিন নম্বর রাস্তা হল লাউরেঙ্কো নদী ধরে পুবদিকে রন্দোনোপোলিস গিয়ে সেখান থেকে প্লেনে করে ফেরা।

আমাদের বোটের কর্মচারীরা কোরুম্বা ফিরে যেতে ইচ্ছুক। তাই হল, যে পথে এসেছি সেই পথেই ফিরলাম আমরা। আগের বার যে হোটেলে খেয়েছিলাম সেই হোটেলেই লাঞ্চ খাওয়া হল। লাঞ্চে খেলাম পিরানা ফ্রাই। কোরুম্বা ট্যুরিস্ট শহর, পিরানা ভাজা তাদের জন্য মজাদার খাবার। আমার কিন্তু তেমন মনে হল না। কোন বাঙালি আর তেলাপিয়া ভাজা খেয়ে আনন্দে নৃত্য করেছে। আমি একটা ভাজা মাছের মুখটা খুলে দাঁতের সারি দেখব ভেবেছিলাম, হল না, কেননা এরা মাথা কেটে বাদ দিয়ে ভেজেছে।

বেলা দুটোর সময় আগের পাইলট আমাদের নিয়ে উড়ল, এবার গন্তব্য ইগুয়াসু, ফজ দো ইগুয়াসু। দুঘণ্টা উড়বে প্লেন। একটু আগেই সে সাও পাওলো থেকে উড়ে এসেছে কোরুম্বা। মারিয়া আবার আমার কাছে বসেছে। তাকে

বললাম, আমার কিছু প্রশ্ন আছে, যদি কিছু সেই প্রসঙ্গে উত্তর দাও ভালো হয়।

—বল তোমার প্রশ্ন, জানা থাকলে নিশ্চয়ই বলব।

—তোমাদের দেশের ফুটবল প্লেয়ার পেলেকে নিয়ে আমাদের দেশে খুব শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালোবাসা আছে। তাঁর সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু জানি না।

—পেলে নয় বল পেল্যা, ওটা ওর ডাকনাম। ওই নামেই প্রসিদ্ধ হয়েছেন তিনি। এদেশে বলা হয় উনি যদি প্রেসিডেন্ট হবার জন্য ভোটে দাঁড়ান তাহলে সব ভোট তিনিই পাবেন। জীবনে কোনওদিন সিগারেট খাননি, মদ খাননি, ড্রাগস নেননি, মেয়েদের নিয়ে মজা করেননি। আসল নাম এডসোঁ আরান্তোস দো নাসিমেন্তো, মিনার ঝেরাইস প্রদেশে জন্ম। ফুটবল খেলাকে এদেশে ফুতবল বলা হয়, সেই খেলার রাজা ছিলেন। ব্রাজিলকে ফুটবলের শীর্ষস্থানে নিয়ে গেছেন। সেকথা বড় নয়, বড় হল দেশে খ্যাতির চূড়ায় আছেন তিনি। চিরকাল তিনি খেলাধুলোর মন্ত্রী থাকবেন, অথচ কোনওদিন ভোটে দাঁড়াবেন না।

—আরেকটা খেলা দেখলাম টিভিতে। নাম দিয়েছে মিনিবক্স, ওটা কীরকম ফুটবল খেলা।

—সবকিছুই ফুটবলের মতো, কেবল ছোট মাঠ, ছ জন খেলোয়াড় আর কম সময়ের খেলা বলে অত্যন্ত দ্রুতগতির খেলা। মিনিবক্স হল মিনি ফুটবল, অনেকটা ওয়ান ডে ক্রিকেটের মতো, দারুণ জনপ্রিয়।

আর বিচ ফুটবল? তার কী নিয়ম?

—ওটা ভারি মজার খেলা। নিয়ম নেই কিচ্ছু, কেবল বল কন্ট্রোল করার খেলা। বালির ওপর পড়লে গড়াবে না, সেখানেই ধপ করে বসে যাবে। সুতরাং বল যত পারা যায় শূন্যে তুলে রাখতে হবে। পাশ দিতে হবে উঁচু করে, ধরতে হবে উঁচুতে এবং বালিতে পড়া চলবে না। বলকে মাটিতে পড়তে না দেওয়ার কতরকম কসরত দেখা যায়, মাথায় রাখা, থাইয়ে রাখা, বুকে রাখা, কাঁধে রাখা, দেখতে ভারি চমৎকার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলা চলবে। দলের কোনও নিয়ম নেই, যে কেউ যে-কোনও দলের হয়ে খেলতে পারে। একদলে পনেরজন আর একদলে বিশজন হলেও আপত্তি নেই। যদি তুমি মনে কর ক্লান্ত হয়েছে, তো বসে পড়, এক মগ বিয়ার পান কর, আবার খেলা শুরু কর। মজা কী জান, বালিতে দৌড়তে পারা যায় না, বেশ শক্তি খরচ হয়। তারপর দুদিকের গোলের দূরত্ব বাড়ানো কমানো যায় ইচ্ছে মতো। এটা হল হুল্লোড় করার খেলা, শরীর ঘামানোর খেলা। যখন ম্যাচ হয় তখন অবশ্য অন্য ব্যাপার। তখন একটা নিয়ম-টিয়ম আছে। বিয়ারের ক্যান নিয়ে বিচ ফুটবল যে না দেখেছে সে বিশ্বাস করতে পারবে না যে একটা টিনের কৌটো নিয়ে কী সুন্দর খেলা করা যায়। একটা পয়সা খরচ নেই।

আমার মনে এল বাতাবি লেবু দিয়ে ছোটবেলায় আমরাও বল খেলেছি। আমাদেরও ডাংগুলি, অথবা বুড়ির ছুঁ (গোল্লাছুট) খেলা বেশ মনোরঞ্জনের খেলা। তাতেও পয়সা খরচ হয় না। কিন্তু তাতে এত সৌন্দর্য নেই।

সামনের আকাশে ধোঁয়ার মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। ওই তো ইগুয়াসু ফলস। আমাদের প্লেনটা ঠিক জলপ্রপাতের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। জানালা দিয়ে দেখলাম যতটা পারি। জলপ্রপাতের সামনে দিয়ে উড়ে যাবার সময় বিশালত্ব টের পেলাম। জলপ্রপাতটা অর্ধবৃত্তাকার মতো, তিনটি দেশের মধ্যে এর অংশ রয়েছে। ব্রাজিলের মধ্যে কম অংশ, কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর। আর্জেন্টিনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অংশ আর প্যারাগুয়ের মধ্যে কিছু পড়েছে। ব্রাজিলের মধ্যের অংশটিকে ট্যুরিস্টদের জন্য বেশ যত্ন করে নানা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এয়ারপোর্ট, হোটেল, বোট সার্ভিস, হেলিকপ্টার সার্ভিস, সব মিলে মহাসমারোহ। উত্তর দিক থেকে আসা পারানা নদীর সঙ্গে পূর্বদিক থেকে আসা ইগুয়াসু নদী যেখানে মিলেছে সেখান থেকে পনের কিলোমিটার দূরে ইগুয়াসু নদীর ওপর জলপ্রপাত, আর পারানা নদীর ওপর পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে পৃথিবীর বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। দুটোই দর্শনীয় স্থান।

এয়ারপোর্টে প্লেন থামার সঙ্গে সঙ্গে ঢাউস গাড়ি চলে এল প্লেনের দরজা পর্যন্ত, নিয়ে গেল হোটেলে। সেখানে একপ্রস্থ কফি-টফি হবার পর আবার গাড়িতে চড়ে একেবারে জলপ্রপাত দেখার পুলের সিঁড়ির কাছে। টিকিট করা ছিল ওদের কাছে, আরও দুজন সুটেড-বুটেড তোলেদো কোম্পানির লোক সঙ্গ নিল আমাদের। লোহার পুল, তলা দিয়ে জল যাচ্ছে ঘূর্ণির মতো, প্রচণ্ড আওয়াজে কথা বলা যায় না। সান্দ্রা ভয় পেয়ে উঠে পড়েছে সেরজুর কোলে। একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা গারগান্তা দো দায়াবোলো অর্থাৎ শয়তানের গলার দিকে। প্রায় গোলাকার জায়গাটা, গোল হয়ে জল ঝরে পড়ছে গভীর গর্তের মধ্যে। সত্যি মনে হয় শয়তানের গলা। সূর্যের উল্টোদিকে জলের বিন্দু দিয়ে তৈরি মেঘের ওপর রামধনু, মুখে উড়ে এসে লাগছে গুঁড়ো গুঁড়ো জলের ঝাপটা। পুলের নিচ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে জল যাচ্ছে গর্জন করতে করতে। পায়ের নীচে লোহার পুল মনে হচ্ছে যে-কোনও সময় ভেঙে পড়বে। আমাদের সামনে প্রকৃতির অপূর্ব লীলা, জল ঝরে পড়ছে সবসময়। মাথা ঝিম ঝিম করতে আরম্ভ করল। শরীরে ঝিম ধরে আসে এমন সম্মোহনের অনুভূতি হচ্ছে। প্রচণ্ড শব্দ, ঘূর্ণায়মান জলস্রোত, ভিজে জলকণার ঝাপটা, অনেকগুলো রামধনুর রং, সব মিলে সম্মোহিত হবার মতো অনুভূতি হয়।

কে দেখাল জানি না তবে এক অদ্ভুত দৃশ্য অবাক করল আমাদের। ছোট ছোট টিয়াপাখিরা জলপ্রপাতের পিছনে পাথরে চলে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে নির্ভয়ে। পড়ন্ত জলের সামনে উড়তে উড়তে পোকামাকড় কিংবা ছোট মাছ কিছু ধরছে, সেটা মুখ করে ফিরে যাচ্ছে জলধারার পিছনের পাথরের দেওয়ালে। সেখানে মনে হয় ওদের বাসা আছে, বাচ্চা আছে। ওরা যদি জলের ধারার মধ্যে পড়ে তো আছড়ে পড়বে নীচে, তলিয়ে যাবে জলের ঘূর্ণির মধ্যে। কিন্তু ঠিক এমন কোনও ফাঁক ওদের জানা, সেখান দিয়েই যাতায়াত করছে।

ফিরে এলাম হোটেলে। এখন বিকেল, কাজ ফুরিয়েছে আমাদের। এখান থেকে সাও পাওলো পাখি-প্লেনে মাত্র দু ঘণ্টা। তারপর তাউবাতে যেতে আরও এক ঘণ্টা। রাতটা তোলেদো টাওয়ারে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু ভলদো সাহেব সেই অনুরোধ জানিয়েছেন। মারিয়ার নাইট ডিউটি কাল রাত থেকে, আর আমাকে অফিস যেতে হবে কাল সকালে। সেরজু প্রস্তাব দিল মারিয়াকে রাতে থেকে যাবার। আমাকে জিজ্ঞেস করল মারিয়া— তোমার অসুবিধে হবে না তো?

আমি ভাবছিলাম শাপে বর হল, ভদ্রলোককে একবার ধন্যবাদ দেওয়া দরকার। যাঁর বদান্যতায় এমন অভিজ্ঞতা হল আমার জীবনে, তাঁর সঙ্গে দেখা করে একবার বলা উচিত যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি তাঁর আতিথেয়তায়।

বললাম—কোনও অসুবিধে হবে না।

—তাহলে ডিনার অ্যাট এইট বলে দিই।

তাই হল, আবার ডিনার সেরজুর বাবার সঙ্গে। তার আগে এখন প্রচুর সময়। আর্জেন্টিনার দিকের ইগুয়াসু দেখা যাবে প্লেন থেকে। ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার দিকের রেন ফরেস্ট দেখা যাবে। তারপর পারানা নদীর ড্যাম, হাইডেল প্রজেক্টও দেখা যাবে ওপর থেকে। সবটা দেখতে তিনদিন লাগে। আমাদের সেটা আধ ঘণ্টার হাওয়াই দর্শনে তুষ্ট হতে হবে।

মারিয়া বলল— সেরজু বলছে আরেকটা ভালো করে ট্রিপের ব্যবস্থা ও করে দেবে তোমার জন্য, মিনাস ঝেরাইস, অউরো প্রেতো আর বেলো হরাইজন্টে দেখাবে তোমাকে।

মনে মনে হাসলাম, কী আমার ভাগ্য! তবে রইল বাকি আমাজনের জঙ্গল, নদী, এসব দেখা। তা সেটা অন্য ট্যুরিস্টের মতো আমি নিজেই করে নিতে পারব।

কিন্তু আমার তো আর্জেন্টিনার ভিসা নেই, ওদের দেশের ওপর দিয়ে যাব কী করে? উত্তর পেলাম মাটিতে না নামলে ভিসা লাগে না। তাছাড়া ট্যুরিস্টদের জন্য সব মাফ।

আকাশ থেকে আরেকবার পুরো ইগুয়াসু জলপ্রপাত দেখলাম, আর্জেন্টিনার ওদিকে সুন্দর জঙ্গল দেখাল সেরজু খুব নিচ দিয়ে প্লেন চালিয়ে। ঘুরে এসে আবার জলপ্রপাতের ওপর দিয়ে প্লেন উড়ে গেল ব্রাজিলের দিকে পাহাড় জঙ্গলের ওপর দিয়ে। আবার ঘুরে গেল পারানা নদীর ওপর। ইতাইপু ড্যামের ওপর দিয়ে উড়ে গেল একবার; একবার উড়ল বাঁধের ওপাশে বিশাল জলাধারের ওপর দিয়ে। তারপর সাও পাওলোর দিকে চলল।

দেখলাম পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ কারখানা এবং তার বাঁধ, জলের বিরাট হ্রদ। এসব ওপর থেকে দেখা মানে কেবল আন্দাজ করে নেওয়া। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো হল ব্যাপারটা। তাই বা মন্দ কী!

'ভ্রমণ' অক্টোবর, ২০০৪

লুপ্ত সরস্বতীর সন্ধানে

মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়

থর মরুভূমির প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছিসেটা বোঝা যায়। এটাই নাকি আজাসর গ্রামের বাসস্ট্যান্ড। বাসটা আমাদের নামিয়ে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। দুপাশে ধু ধু বালির প্রান্তর। যতদূর চোখ যায় আকন্দ গাছের এলোমেলো ছাড়া ছাড়া ঝোপ ভিন্ন আর কিছু চোখে পড়ছে না। আছে, রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে ছোটখাটো গাছপালার মধ্যে কয়েকটা ঘরবাড়ি। সবারই মাটির দেওয়াল আর ঘাসের ছাউনি। বাসস্ট্যান্ডের ওপাশে কুঁড়েঘরের মধ্যে চায়ের দোকান। এমন জায়গাতেও চা পাওয়া যায়? দোকানির সহৃদয় আপ্যায়নে কেউ চায়ের অর্ডার দিল। সে-ই খবরটবর সব দিল। ওই কয়েকটা মাটির ঘরের সমষ্টির নামই আজাসর। ওখানেই স্কুলবাড়ি আছে। থাকার মতো জায়গা পাওয়া যাবে, জলও পাওয়া যাবে। কেরু এখান থেকে অনেক দূর।

যে যার রুকস্যাক পিঠে তুলে গ্রামের দিকে হাঁটা দিলাম। পিচের রাস্তা পেরিয়ে বালিতে পা রেখে বোঝা গেল হাঁটা সহজ ব্যাপার হবে না। জুতোসমেত পা বসে যাচ্ছে। পাহাড়ে, পর্বতে জঙ্গলে হাঁটা একরকম আর মরুভূমির বালিতে হাঁটা আর একরকম, আমাদের যেতে হবে কম করে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে তাডানা নামে একটি গ্রামে। তাডানা কেন যাচ্ছি পায়ে হেঁটে সে সম্বন্ধে একটু বলে নেওয়া দরকার এইখানে। থর মরুভূমির মধ্যে এই গ্রামটি একটি উপত্যকার কাছে। এমনিতে থর মরুস্থলীর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কমবেশি একহাজার ফুট। তার ওপর বালির টিপি বা ছোট ছোট পাহাড়গুলির উচ্চতা আরও শ-দুয়েক ফুট হবে। যে জায়গাটা এমন বালির টিপি দিয়ে ঘেরা সেখানে বর্ষার অল্পস্বল্প বৃষ্টির জলও চারপাশ থেকে এসে জড়ো হয় মধ্যিখানে। সেখানে কুয়ো খুঁড়লে জল মেলে, আর ডিপ টিউবওয়েল হলে তো কথাই নেই। রাস্তায় কেরু নামের আরেকটি গ্রাম আছে, সেটিও বহু যুগ ধরে মরুপথচারীদের আশ্রয় দিয়ে এসেছে। এসব নিজের চোখে দেখতে যাচ্ছি।

আজ সকালে আমরা ছিলাম বিকানিরে। ভোর ছটায় বাস ধরে এসেছি রামদেওড়া নামে একটি ছোটখাটো শহরে। বিকানির-জয়সলমিরের বাস রামদেওড়ার পাশ দিয়ে চলে যায়। ভেতরে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত যায় না। আমাদের

অনুরোধে এবং কুড়ি টাকা টিপস দিতে ড্রাইভার ঢুকিয়ে দিল বাস, যেখান পর্যন্ত গেলে আমাদের সুবিধে হবে। পাঁচ লিটার সাইজের খাবার জলের গোটাকয় বোতল নামল, তাঁবু নামল, রান্নাঘরের সরঞ্জামসমেত বস্তা নামল। যে যার নিজের স্যাক নামিয়ে নিলাম। এই জায়গাটার মাহাত্ম্য গোটা রাজস্থান জুড়ে। দূর দূর থেকে ভক্তরা আসে মনস্কামনা পূর্ণ করতে। ধর্মশালা অনেকগুলি। গলিরাস্তায় দোকানপাট, তাদের সামগ্রীগুলোর দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই। শিশুদের খেলনাগুলি নেহাত যেমন তেমন। পুঁতির মালা, প্লাস্টিকের নানা দেবদেবীর মূর্তি, তামা পেতলের পুজোর বাসন, এইসব।

রামদেওড়ার মন্দির রামদেবজির নামে উৎসর্গীকৃত। কে এই রামদেবজি? না, ইনি অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র নন। এই তল্লাটের একজন বড় জমিদার ছিলেন, নাম ছিল আজমলজি, তাঁর ছেলে। তীর্থ করতে দ্বারকা গিয়ে আজমলজি জানতে পারেন তাঁর ঘরে দ্বারকাধীশ অবতার হয়ে জন্মাবেন ভাদ্র মাসের দুতারিখে। ঠিক তাই হল, রামদেবজির জন্ম হল নির্ধারিত দিনে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে উনি পোখরান গ্রামের ভৈরব নামের দৈত্যকে হত্যা করেন গুরুর আদেশে এবং রুনিচা নামে একটি নগর পত্তন করেন। সেখানে রামসাগর নামে একটি সরোবরও তৈরি করান। রামদেবজির বিয়ে হয় অমরকোটের রাজা দলজির কন্যা নেতলদে-র সঙ্গে। এসব ঘটনা প্রাচীন কালের নয়, মাত্র ১৫৮০ সালের। তারপর একদিন সকলকে ডেকে রুনিচার রাজা রামদেব সরোবরের তীরে সমাধি নিলেন। তাঁর শিষ্য হরজি ভাটি গান গেয়ে সকলের কাছে রামদেবের কথা প্রচার করেন, মন্দির তৈরি হল, রামদেব রাজা থেকে দেবতায় উত্তীর্ণ হলেন।

দুপুর দুপুর রামদেওড়া থেকে সব খবর-টবর নিয়ে বাসে করে আমরা আজাসর চলে এসেছি। এখান থেকে কাল পায়ে হাঁটা শুরু হবে। স্কুল বাড়িটা ইটের ব্যারাক ধরনের। প্লাস্টার, চুনকাম ভালো নয়, সরকারি বাড়ি হলে যা হয় আর কি। ছাত্ররা মেঝেতে বসে চট বিছিয়ে, কোনওরকম বেঞ্চের বালাই নেই। উটের গাড়িতে করে জল এনে স্কুলের কুয়োতে ঢেলে দেওয়া হয়। ওটা ঠিক কুয়ো নয় বরং চৌকো, গভীর, ঢাকা দেওয়া চৌবাচ্চা বলাই ঠিক। পাশেই দড়ি বালতি রাখা আছে। জল বেশ ঠান্ডা এবং সুস্বাদু। আমাদের পশ্চিমবাংলার চেয়ে অনেক ভালো এদের ব্যবস্থাপনা। আমরা আশা করিনি স্কুলের দরজা জানালাগুলো বন্ধ করা যাবে। শুধু তাই নয়, সরকারি পয়সায় কেনা জল আমাদের বিনামূল্যে যত ইচ্ছা ব্যবহার করতে দেবে সেটাও ভাবা যায়নি।

মাস্টারজি এসে দেখে গেলেন, খবরটবর নিলেন। ততক্ষণে আমাদের স্টোভ বেরিয়েছে, কেরোসিন তেল বেরিয়েছে। প্রেসার কুকার, ডেকচি, কড়া সব স্কুলের উঠোনের বালি দিয়ে মাজামাজি চলছে। চায়ের সঙ্গে ব্যাসনের ভাজাভুজি খাওয়া হবার পর রাতের রান্না চড়ল। একটা মেয়েদের ঘর, আরেকটা ছেলেদের। লিডার বলেছে চান করা চলবে না, হাত মুখ ধুতে পারা যাবে। জল পেয়েছি বলেই যত

ইচ্ছে খরচ করা উচিত হবে না। আমি চার মগ জল পেলাম আর তাতেই চান করলাম মাথায় ঢেলে।

আমাদের সাতজনের দল, তিনজন মহিলা। বেড়ানো ছাড়া কাজও কিছু আছে, তবে সেটা সবার জন্য নয়। দল পাকিয়ে চলতে যা মজা, একা একা ভ্রমণে তা পাওয়া যায় না। মিসেস অশ্বিনী চিত্রে পেশায় আর্কিটেক্ট, নিজের গরজে আসেন, দেশে দেশে ঘুরে কতরকম আইডিয়া পান। বেশ ভালো অভিজ্ঞ ট্রেকার। সবচেয়ে কনিষ্ঠ অনুরাধা, আমি গেলেই সঙ্গ নেয়। এখনও ছাত্রী, ইতিহাস পড়ে লেডি শ্রীরাম কলেজে। সোনালিকে আমি ডেকে এনেছি। পাঞ্জাবি মেয়ে, সুন্দর স্বাস্থ্য। দৌড়ে পাঞ্জাব স্টেট চ্যাম্পিয়ন। এখন একটা স্কুলে চাকরি করে। সজল দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়, ভূগোলের লেকচারার। ওর একটা কাজ আছে এই অঞ্চলে, কিছু খরচ দেবে ইউনিভার্সিটি। ওর সঙ্গে আমি এসেছি, আমার পিছন পিছন অনু, আর আমার আগ্রহে মিসেস চিত্রে আর সোনালি। বাকি দুজন আমাদের ক্লাবেরই কমল এবং পঙ্কজ। এবারে পঙ্কজ আমাদের লিডার। আমরা আগেও একসঙ্গে বেরিয়েছি, সবাই সবাইকে খুব ভালোভাবে চিনি, জানি। এবং এইসব অল্পবয়সীদের মধ্যে আমি ব্যতিক্রম, পঞ্চাশ পেরিয়ে আসা পদযাত্রী। একটা সরকারি অফিসে চাকরি করি।

পড়ন্ত আলোয় বাচ্চারা সব খেলছিল স্কুলের বালির মাঠে। বিজলি নেই তাই আমাদের মোমবাতি ভরসা। আমি আর অনু গ্রামীণ জীবনের কয়েকটা ছবি তুলে আনলাম, ঘরবাড়ি, উট এইসব।

সকাল হল ডাকাডাকিতে। একটা মোটরগাড়ির চাকা লাগানো উটের গাড়িতে জলের ট্যাঙ্ক বসানো, সেই গাড়িটা করে একজন আহত লোককে এনেছে। পায়ের ওপর গাড়ি পড়ে বেশ জখম হয়েছে। প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। গজাল ধরনের মোটা পেরেক ঢুকে গেছে পায়ের পাতায়। টিটেনাস টক্সয়েড ইনজেকশন দেওয়া উচিত। সে যাই হোক উপস্থিত ফার্স্ট এইড দিলাম, রক্ত বন্ধ হল। পেন কিলার খাইয়ে ড্রেস করে দিলাম। বললাম ওকে রামদেওড়া নিয়ে গিয়ে টিটেনাস ইনজেকশন দেওয়ার কথা।

চা তৈরি হয়ে গেছে। পায়েসের মতো সুজির লপসি, তাতে প্রচুর কাজু, কিসমিস এবং গুঁড়োদুধ মিশিয়ে জলখাবার তৈরি হয়েছে। সঙ্গে আছে রাস্ক বিস্কুট। রান্নাঘর গোছানো চলছিল, বড় প্লাস্টিকের বস্তায় ঢুকে গেল স্টোভ, প্রেসার কুকার। দূর দূর থেকে বাচ্চারা পড়তে আসছে স্কুলে। তাদের অতিথিদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে উত্তেজিত কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম। দুটি মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। একজনের বাঁহাতের বাহুর হাড় ভাঙা। হিউমারাস বোন মাল্টিপল ফ্র্যাকচার হয়েছিল। শুনলাম মাস আষ্টেক-দশ আগেকার ঘটনা। জুড়ে গেছে যেমন তেমন ভাবে, ঠিকমতো সেট হয়নি। পুরো জীবনটা পড়ে রয়েছে বাচ্চাটার। দুঃখ হল এমন করেই আজও এদের জীবন কেটে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে

আমরাও যোগ দিলাম প্রার্থনায়। তারপর যাত্রা শুরু। কেরু পর্যন্ত উটের গাড়ি যাবার রাস্তা আছে, হারিয়ে যাবার উপায় নেই। এখন পর্যন্ত গ্রামীণ কোনও মহিলার দেখা পাইনি। মনে হয় এরা খুব পর্দা মানে। বাইরের পুরুষের সামনে বের হয় না। অনুকে বললাম সেকথা। খবর পেলাম ওরা কাল সময় করে একটা বাড়ি দেখে এসেছে। ঘরের ভেতরটা বেশ পরিচ্ছন্ন। বৃষ্টি কম হওয়ায় নোংরা হয় না মোটে। জল যেমন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয় তেমনই পচাতেও পারে। এদিকে জলই নেই তাই নোংরামি নেই।

বাসের রাস্তাটা পার হয়ে কালকের চায়ের দোকানটার পাশ দিয়ে দুধারে সারিবন্দি আধশুকনো আকন্দ গাছের মধ্য দিয়ে এগোলাম। উটের গাড়িটা আগে আগে চলছে জলভর্তি ট্যাঙ্ক, তাঁবুর বস্তা, রান্নার সরঞ্জামের বস্তা ইত্যাদি নিয়ে। দু-তিন কিলোমিটারের মধ্যেই আকন্দ গাছের পালা শেষ হয়ে ছোট ছোট তুলো গাছের সারি শুরু হল। ঝোপ ঝোপ গাছ, তাতে ভর্তি ছোট ছোট তুলোর বল। অনেকটা বনকুলের সাইজ। যেখানে ঝোপগুলো রয়েছে সেই জায়গাটা সাদা হয়ে আছে। সজল বলল, এর তুলো দিয়ে এদিককার লোকেরা লেপ তৈরি করে। প্রকৃতির অকৃপণ দান, পয়সা লাগে না এদের।

দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, আধপোড়া মাটির রঙের রাস্তার রেখা ঢেউয়ের মতো দুলে দুলে চলে গেছে দিগন্ত পার হয়ে। তুলোর গাছের দেখা পাওয়া গেল না আর। কেবল মাঝে মাঝে ছাড়া ছাড়া ঘাসের চাবড়া, আর ধুলো ধুলো মাটি। এখনও বালির রাজত্বে আসিনি মনে হচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকেই দূরে গুম গুম আওয়াজ পাচ্ছিলাম। পোখরানের দূরত্ব এখান থেকে খুব বেশি হলে সাত-আট কিলোমিটার হবে। মিলিটারিদের কামান ছোড়ার প্র্যাক্টিস হয় ওখানে, তারই আওয়াজ আসছে। পোখরানের নাম শুনলে অনেকের আণবিক বোমা পরীক্ষার স্থল হিসেবেই মনে পড়বে। পোখরানের কথা উঠলে আমার অবশ্য সত্যজিৎ রায়ের সোনার কেল্লায় পোখরান স্টেশনে জটায়ুর উটের পিঠ থেকে নেমে হাত পা ছুড়ে এক্সারসাইজ করার দৃশ্যটি মনে পড়ে।

গরম লাগছে এবার। কেরু এসে গেল মনে হচ্ছে। দূরে একটা আধটা বড় আকারের ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছে, তার মাঝে ভাঙা ঘরের দেওয়াল। ঠিক বোঝা যায় না। কিছু এগিয়ে আন্দাজ ঠিকই মনে হল। কেরু একটা গ্রাম, পরিত্যক্ত গ্রাম। জলের অভাবে পরিত্যক্ত হয়নি, জল আছে এখনও। একটি গভীর কুয়ো আছে, কাঁটা গাছের ডাল দিয়ে ঢাকা। রাখালবিহীন একদল গরু আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল অজাসরের দিকে। ওদিকে খুব সম্ভবত খাদ্য আছে, শুকনো ঘাস, গাছপাতা। গরু মানেই দুধ, দুধ মানেই ঘি, পনির, মাখন। রাজস্থানে বিখ্যাত গাওয়া ঘি আর খোয়া। কিন্তু গরুরা তো উট নয়, তাদের দিনে দুবার জল খেতেই হবে। এত জল কোথায়?

কেরু পৌঁছে গেলাম। ছাড়া ছাড়া কয়েকটি বাড়ির দেওয়াল, বৃষ্টিহীন রাজ্যে

এখনও দাঁড়িয়ে আছে। আশপাশে আগাছার মতো কিছু শুকনো কাঠি কাঠি ঝোপ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গুটি দশ-বারো ঘর ছিল। হাউইটজার কামান, বোফর্স কামান, ১৫৫ মিলিমিটার কামান পরীক্ষার এলাকার মধ্যে পড়ে যাওয়ায় কেরুকে খালি করিয়েছে। আমাদের চলে যাওয়া উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখন থেকে। ওইসব কামানের পাল্লার মধ্যে রয়েছি, যদি কোনও গোলা এসে পরে। টিপির মতো জায়গা থেকে নেমে যা প্রথমে চোখে পড়ল তা হল একটা সমতল বিশাল মাঠ অনেকটা ফুটবল মাঠের মতো। সেই মাঠে ছড়িয়ে আছে গোবর আর ছাগলনাদি, অজস্র। অজস্র বললে ঠিক হল না, আজকালকার মেশিনে তৈরি গুল, যাকে ব্রিকেট বলে, সেগুলো শুকোবার জন্য যেমন সারি সারি রাখা হয়, তাদের যেমন দেখতে হয় ঠিক তেমনই অনেকটা পুরো মাঠটা দেখাচ্ছে। তার মধ্যে কুয়োর অস্তিত্ব বোঝা যায়। গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে মাঠটার মাঝামাঝি পাথর কাঠ আর কাঁটা গাছের বাহুল্য দেখে জানা গেল ওটাই কুয়ো।

কুয়োর পাড় থেকে অগুনতি ছাগলনাদি ছড়িয়ে রয়েছে দূর দূর পর্যন্ত, কতদিন ধরে বিস্তীর্ণ ময়দানে। সব খটখটে শুকনো, বৃষ্টি নেই, তাহলে জমির উর্বরতা বাড়ত। কুয়োর দুপাশে ইংরিজি ওয়াই অক্ষরের মতো দুটো মোটা গাছের ডালের ওপর শুয়ে আছে আর একটা মোটা ডাল। তিনটি কাঠের টুকরোর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কারও সন্দেহ হবার কথা নয়। বিশেষ করে দড়ির ঘষা খেয়ে মাঝের ডালটার ক্ষয়া অংশটা দেখে মনে হয় এটাকে যাদুঘরে রাখা যেতে পারে। প্রাচীন কুয়ো, বহু নীচে জল। উঁকি মেরে দেখলাম টাকার মাপে চকচক করছে জল কত নীচে কে জানে, মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। উটের গাড়ি থেকে ঘটি আর দড়ি এনে আমাদের গাড়োয়ান পাপ্পু জল তোলার ডিমনস্ট্রেশন দিল। পাতলা নাইলনের দড়ি, ঘটির মুখে বেঁধে কাঠের ওপর দিয়ে নামাল নীচে। জল তুলে ঢেলে দিল একটা পাথরের তৈরি নালায়। গড়িয়ে জল চলে গেল অনেকটা দূরে পাথরের চৌবাচ্চার মতো জায়গায়। আমাদের উট গাড়িসমেত এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল জল খেতে সেখানে। পাপ্পু জল তুলে ঢেলে চলল, উটও জল খেতে লাগল। একসময় আমার মনে হল ঘটিটা ঘটি না হয়ে বালতি হতে পারত, তাতে কিছু বেশি জল উঠত। কী জানি যে দেশের যা নিয়ম। তবে উটের পিঠে বালতির বদলে ঘটি হয়তো বেশি শোভন। শুনলাম এদেশের লোক চামড়ার থলি কুয়োয় নামিয়ে জল তোলে।

ওইটুকু জল চেটে চেটে খেয়ে উটের মনে হল বেশ পছন্দ হয়েছে, বিশেষ করে ওর জলখাবার ব্যবস্থাটা সম্পর্কে। পাপ্পু বলল, এরপর থেকে আর কোথাও জল পাবে না। জায়গাটা যেন মরুভূমির গেট, এখান দিয়ে মানুষ, উট, অন্য পশুরা ঢুকবে মরুস্থলীতে জলটল খেয়ে। মাটির রং পোড়া তামাটে, বালি কম, ভূপৃষ্ঠ বেশ শক্তপোক্ত। আমাদের সাতজনের রুকস্যাক গাড়িতে তুলে নিল সে। তবে বাপধন এতক্ষণ ধরে আমাদের দিয়ে বওয়ালে কেন? অবাক করে দিয়ে বলল,

—জানোয়ার হ্যায় সাব, বহুৎ গুসসা করতা হ্যায়।

সত্যিই তো, প্রাণী মাত্রেরই আনন্দ, শোক, রাগ থাকবেই। সেটা বুঝবার ক্ষমতা তাদেরই যারা ওদের সঙ্গে ঘর করে। আমরা তার কী বুঝব? কয়েক ঘটি জল খেয়ে তার তৃপ্তি হয়েছে এবং উপস্থিত নিশ্চয়ই প্রসন্ন আছে। এখন আরও বোঝা বাড়িয়ে দিলেও কিছু বলবে না।

—গোবরগুলো কতদিনকার পুরনো হতে পারে সজল?

—দু-তিন বছরের বেশি হবে না নিশ্চয়ই। ওয়েদারিং হয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। তবে এত ড্রাই ওয়েদারে কোনও জিনিসই চট করে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেরি হবে। দেখছেন না কেরু গ্রামের দেওয়ালগুলো কেমন দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের লিডার পঙ্কজ, হিমাচলের সারাহানের লোক। চাবুক স্বাস্থ্য, খুব ডিসিপ্লিন মেনে চলে। হুকুম করল আর বসা নয় এবার চল সবাই। মাথার ওপর সূর্য, আবরণ নেই কোনও। তাপ যথেষ্ট অথচ ঘাম হচ্ছে না। আমি রোদ থেকে বাঁচতে মাথার ওপর সাদা গামছা ঢাকা দিয়ে বেদুইনদের মতো বিড়ের বদলে একটা ক্যাপ চড়িয়েছি। সারা শরীর ঢাকা পোশাকে মোজার ভেতর প্যান্টের পা ঢোকানো, তার মধ্যে বালি ঢুকেছে। গভীর বালি পাইনি বলে চলার অসুবিধে অত হয়নি। গলার কাছে ঝুলছে প্লাস্টিকের বোতলে জল, স্কুলে ভরেছি। সে জল এখন বেশ গরম হয়ে উঠেছে।

চলে যাবার আগে কুয়োটার ছবি তোলা হল। কিছুটা গিয়ে খানিকটা উঁচু জায়গা থেকে আরেকবার কেরু গ্রামটা দেখলাম। গভীর বালির রাজত্ব শুরু হয়ে গেল। চারপাশে বালি ছাড়া আর কিছু দেখছি না। ডেজার্ট বুশ আছে দূরে দূরে। বহু রকম প্রাণী আছে বালির নীচে, সাপ, টিকটিকি, ইঁদুর এইসব। আশপাশে হরিণ আছে অনেক— চিঙ্কারা, ব্ল্যাক ব্যাক্। তারা সব গ্রামের কাছাকাছি থাকে। তেমনই একটা ছোট বুশ, কাঠি কাঠি ডালের গাছ অতি সহজেই উপড়ে নিয়ে এল অশ্বিনী, শেকড়বাকড় সমেত।

—ঠিক স্যান্ড কালার, সুন্দর ক্যামোফ্লেজ কিয়া হ্যায় মুখার্জিদাদা।

কাঠির ভেতর সামান্য রসের সন্ধান পাওয়া গেল। রস আসে কী করে? বালিতে তো জল নেই। সবাই একটা করে কাঠি ভেঙে ভেঙে দেখতে লাগল। সত্যি রস পায় কী করে, অধ্যাপক সজলের অভিমতটা কী?

—কাল ভোরে নিজেরাই দেখতে পাবেন।

—ঠিক আছে তুমি বলেই ফেল না আমাদের।

—মরুভূমির হাওয়াতে কিছু না কিছু জল আছে। রাতে ঠান্ডা পড়লে ডালগুলোতে ওস্ বা শিশির জমে। কাঠিগুলো সেই শিশির শুষে নেয়। ওরা শেকড় দিয়ে রস টানে না, ডাল দিয়ে চোষে। শেকড়টা বালির মধ্যে নিজেকে আটকে রাখার জন্য। ছাগল গরুতে কাঠিগুলো খায়। তাতেই তাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা সব মেটে। হয়তো কাঠি থেকেই আরেকটা গাছ জন্মায়।

কথা বলতে বলতে চলেছি, বালির মধ্যে আমাদের গতি অনেক কমে গেছে।

আরও একটা বালিয়াড়িতে উঠে দেখা গেল ওদিকে সমতল জায়গায় উটের গাড়ি থেমেছে। উট বাবাজীবন হাঁটুগেড়ে বসে গেছে, মুখের কাছে বস্তার মধ্যে খাদ্য পেয়েছে। আমরা নেমে আসার পর পঙ্কজ বলল, পহলে টেন্ট লাগাইয়ে সব মিলকর।

পাঁচটা তাঁবু এসেছে, দুজন দুজন করে থাকা চলে এমন। চেপেচুপে তিনজনও শোওয়া যায়। অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেমের তাঁবু টপাটপ লাগিয়ে ফেলা হল। পাপ্পু ততক্ষণে কয়েকটা কাঠির ঝোপ তুলে এনেছে। বালির মধ্যে নালার মতো গর্ত করে আগুন জ্বালিয়েছে। তার ওপর মস্ত একটা ঢাউস কেটলি বসে গেল, চা হবে। এই গরমে চা?

বালির মধ্যে তাঁবুর গজাল সব ভস ভস করে ঢুকে গেল। পাহাড়ে চড়ার তাঁবু মরুভূমিতে কী করে খাটানো যাবে? একটু হাওয়া এলে উড়ে যাবে। তবে মরুভূমিতে হাওয়া কোথায়, হাওয়া মানেই তো ধুলোর ঝড়। তাঁবুর মধ্যে বসে জুতো মোজা খুলে ধুলো পরিষ্কার করলাম। শরীরেও যথেষ্ট ধুলো, ঝেড়ে নিলেই হবে। আজ থেকে চান নেই, জলের রেশন চালু হয়ে গেছে, কেউ কাউকে রেশনের জল দেবে না, টয়লেট পেপার ব্যবহার করতে হবে, আর রান্নার জল আসবে উটের গাড়ির দুশো লিটার ট্যাঙ্ক থেকে। সাতজনের জন্য সাতটা খাবার জলের জার এসেছে। তিনদিনের রেশন জনপ্রতি পাঁচ লিটার। পাপ্পুর হিসেবটা ছিল না, আর ছিল না উটের হিসেব। উটের হয়তো লাগবে না, সাতদিন জল না পেলেও চলবে। কিন্তু তার মালিকের তো চাই।

আলো পড়ে আসছে। গরম ভাবটা কমছে। সজলের হিসেব অনুযায়ী বালি ঠান্ডা হচ্ছে দ্রুত। অপূর্ব পরিবেশ, রান্না করতে বসে গেছে পঙ্কজ আর কমল। যোগাড় দিচ্ছে সোনালি। আমি ঘুরে এলাম এদিক ওদিক খানিকটা। ভস ভস করে পা ডুবে যায় এমন বালি। হাতে তুলে দেখলাম ভারি মোলায়েম, সুন্দর সরু ধারায় ফেললে সব পড়ে যায়, হাতে লেগে থাকে না কিছু। হাতটা পরিষ্কার করারও দরকার করে না। জৈবিক জিনিস অথবা হিউমাস একেবারে নেই বালিতে, আর নেই ময়েশ্চার বা আর্দ্রতা।

সজল বলেছিল আরব দেশের মরুভূমির বালির সূক্ষ্মকণা ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যায় এবং পূর্বদিকে উড়ে আসে। ভারত পাকিস্তানের ওপর পাঁচ থেকে নয় কিলোমিটার উঁচুতে ভেসে থাকে। কণাগুলির ওজন এক মাইক্রন বা তারও কম হওয়ায় দিনের পর দিন ভেসে থাকতে পারে। তাদের জন্যই থর আজও মরুভূমি হয়ে আছে আরও কতদিন থাকবে তার ঠিক কী? থর মরুভূমির বয়স কত? সবচেয়ে আগে যেটা মনে এল তা হচ্ছে একদিন এই অঞ্চলটা স্নিগ্ধ শ্যামল নদী অধ্যুষিত আদি মানবের বাসস্থান ছিল। এসব প্রমাণিত সত্য। গুহা মানবের ছোটখাটো পাথরের যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে মরুভূমিতে। হিমাচল থেকে উৎপন্ন হয়ে হরিয়ানা হয়ে ঘাগর নদী রাজস্থানের গঙ্গানগর থেকে আজকের পাকিস্তানে

ঢুকেছিল। সেখানে তার নাম ছিল হাকরা। হাকরা নদী সিন্ধু নদীতে মেশার বদলে ফিরে আসে দক্ষিণ-পূর্বদিকে- এবং লুনি নদীর সঙ্গে মিলে কচ্ছের রন এলাকায় আরবসাগরে মেশে। এইসব বানানো কথা নয়, প্রমাণিত হয়েছে। আমেদাবাদের একটি গবেষণা সংস্থা এই নদীকেই লুপ্ত সরস্বতী নদী বলতে চাইছেন। এই বিশাল ঘাগর নদীটির ধারা রাজস্থানে কোনও কোনও জায়গায় চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার চওড়া। ঘাগর আজও বর্ষার সময় জেগে ওঠে। পোখরান জয়সলমিরের মাঝে কোথাও নদীর ধারা না জানি কত মিটার বালির নীচে চাপা পড়ে গেছে।

বালির ওপর সভা বসেছে। সজল বক্তা, কমল আর অনু শ্রোতা। আমিও বসে পড়লাম। সজল বলছে, কুয়েতের তিনশো তেলের খনিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল ইরাক। সেগুলো একটি একটি করে নেভাতে প্রায় চারমাস সময় লেগে যায়। প্রতিদিন পঞ্চাশ লক্ষ ব্যারেল তেল পুড়েছে, ফলে ওই সময় ছয় মিলিয়ন টন কালো কার্বন কণা ইরানের ওপর দিয়ে উড়ে এসেছে ভারতের দিকে।

—ভারতের মরুভূমি বাড়ছে না কমছে, তোমার কী মত?

—ভারতের মরুভূমি প্রতি বছর আধ কিলোমিটার করে বাড়ছে, এটা প্রমাণিত। তবে তার মধ্যে কথা আছে। পশ্চিমের হাওয়াতে বালি উড়ে এসে উত্তরপ্রদেশের আগ্রা জেলায় আর মধ্যপ্রদেশের কিছু অঞ্চলের ক্ষতি করছে। কিন্তু এসব অঞ্চলে মানুষের বসবাস প্রচুর এবং জলও পাওয়া যায়। তাই কিছু না কিছু চাষ-আবাদ হচ্ছে। ফলে মরুভূমির অগ্রগতি খুব বিরাট আকার ধরতে পারেনি। ইদানিং স্যাটেলাইট থেকে ছবি তুলে দেখা গেছে মোট মরুভূমির পরিমাণ ঘাটতির দিকে। বিশেষ করে ইন্ডিয়া পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর পাকিস্তানের ক্যানেল হাকরা, আর ভারতের ইন্দিরা গান্ধি ক্যানেলের প্রচুর জল এসে যাওয়ায় মরুস্থলী সবুজ হয়ে আসছে।

অন্ধকার নেমে এল, তার সঙ্গে তারা ফুটল এক আকাশ। একেবারে ঝকঝক করতে লাগল। একটু পরেই স্যান্ড ডিউনের পিছনে চাঁদ ওঠার আয়োজন হচ্ছিল আকাশটাকে লালে লাল করে। যদিও আজ পূর্ণিমা নয়, অর্ধেক চাঁদেই আলো হল যথেষ্ট। টর্চের দরকার নেই। অন্ধকারে উটটা জাবর কাটছে, কষের দাঁত দিয়ে চিবোবার কট কট আওয়াজ পাচ্ছি পরিষ্কার। যে যার থালা বাটি চামচ নিয়ে বালির ওপর খেতে বসে গেলাম।

আজকের মতো যে যার তাঁবুতে ঢুকে গেলাম। মেয়েরা একটা তাঁবুতে ঢুকে গেল। একলা অচেনা জায়গায় তাঁবুতে থাকতে চায় না কেউ। ঠিক ভয়ের ব্যাপার নয়, কেননা সাহসের অভাব আছে এই অপবাদ আমি অন্তত দিতে পারব না কাউকেই। পাপ্পু একটা টেন্ট পেয়ে গেল, কম্বল নিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে ফেলল। দেখলাম উটের পিঠেও একটা কাঁথা চাপা দেওয়া হয়েছে। উটটা গাড়ির পাশে বসে আছে। লাঠি সোঁটা দিয়ে একটা ছাউনি মতো করেছে পাপ্পু উটের পিঠের

ওপরটায় প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে। টর্চ জ্বেলে দেখলাম উটের গায়ে ছাপ ছাপ ভেজা দাগ। পাপ্পু বলল, ওটা ওর ঘাম, ওর নাকি প্রতি রাতে জ্বর আসে।

—বহোত কমজোর হো গয়া সাব।

সর্বনাশ করেছে, এখন একটা রুগ্ন উট নিয়ে বিপদে না পড়তে হয়। উটের ওষুধ তো নেই, মানুষের ওষুধ দিতে পারি।

—দবা খিলাওগে?

—জি।

আটার সঙ্গে গুড় মিশিয়ে চারটে লাড্ডুর সঙ্গে চারটে ক্রোসিন ট্যাবলেট খাওয়ানো হল উটকে। মানুষের যদি একটাতে কাজ হয়, উটের তাহলে চারটেতে নিশ্চয়ই কাজ হবে। ক্ষতি নিশ্চয়ই হবে না আর যাই হোক। দুর্গা স্মরণ করে শুতে গেলাম। গরম নেই বরঞ্চ একটু শীত শীত ভাব রয়েছে। স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে যেতে তেমন অসুবিধে হল না।

ভোরের দিকে তাঁবুর কাপড়ে হাত ঠেকায় ভিজে ভিজে লাগল। সাবধানে তাঁবুর চেন টেনে বাইরে এলাম। বেশ ঠান্ডা, তাঁবুগুলো ভিজে সপসপে হয়ে আছে। চুপসে গেছে সব। সজল ঠিকই বলেছিল— সকালে দেখবেন। ভোরের আলো দেখা দিয়েছে পুবদিকে। রাতে ধ্রুবতারা দেখে উত্তরদিক চেনা গিয়েছিল, এখন ঊষার আলো দেখে পূর্বদিকটা বোঝা গেল। আকাশে একটি মাত্র তারা দপদপ করছে, একটু পরে সেটাও নিভে যাবে। সাবধানে টেন্টের ভেতর থেকে জলের বোতল, টয়লেট পেপার ইত্যাদি নিয়ে অনেক দূর চলে গেলাম। ট্রেকারদের নিয়ম হল টেন্ট থেকে বাঁয়ের দিকটা মেয়েদের এবং ডাইনের দিকটা পুরুষদের। যতটা সম্ভব ডানদিকে চলে গেলাম। হাওয়া নেই অথচ একটা কনকনে ভাব রয়েছে। দিগন্তবিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে আধো আঁধারে আমি দুটো স্যান্ড ডিউন পেরিয়ে গেলাম।

ফিরে আসার পথে পাপ্পুকে পেলাম। বলল তার উট নাকি বলেছে, ও ভালো হয়ে গেছে। উট বলেছে? উট আবার কথা বলে নাকি?

—বোলতা হ্যায় সাব, বাত সে নেহী, আওয়াজ সে।

পাপ্পুকে দেখে নাকি এমন আওয়াজ করেছে যে সে বুঝে গেছে সংবাদ।

একে একে সবাই উঠে পড়ল, চায়ের কেটলি বসে গেল কালকের উনুনে। ততক্ষণে ক্যাম্পের পিছনে সূর্যোদয় হচ্ছে, ভারি সুন্দর সকাল। মরুস্থলীতে আরেকটি দিনের শুরু হল। ভিজে টেন্ট না শুকোলে গোটানো যাবে না, তার জন্য রোদ চাই। অতএব দেরি হবে। তাহলে আমরা জলখাবার খেয়ে দুপুরের জন্য রুটি তরকারি তৈরি করে তবে যাত্রা শুরু করব। আজ আমরা একটা ইন্টারেস্টিং জায়গায় থামব। উপত্যকা মতো জায়গাটায় জল জমে বর্ষায় সময়, গাছপালা আছে যাহোক কিছু। আর আছে লাইম স্টোন অর্থাৎ চুনা পাথরের বিশাল ভান্ডার, অথচ সেখানে গ্রামীণ মানুষ ছাড়া খনি তৈরি করার অসুবিধে। আমাদের মধ্যে

একমাত্র সজল দেবই কী জানি কী দেখতে চায় ওখানে জানি না, আর সবাই ঘুরতে এসেছি, কেবল দেখতে এসেছি মরুভূমি কাকে বলে। দুপুর দুপুর ওখানেই খাওয়া হবে রুটি, আলু পেঁয়াজের তরকারি, মুলোর টুকরো আর টক আচার। সেটা আমের না পাতিলেবুর তা এখনও ঠিক হয়নি।

তাঁবু খুলে বালির ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হল শুকোবার জন্য। এমন সুন্দর সকালবেলা মরুভূমির মধ্যে বসে লালচে সূর্যের আলোয় আমরা খেলাম ম্যাকারোনির সঙ্গে টমেটো কেচাপ মেখে পেটভরে। তারপর মগে করে একমগ চা, তাতে পাপ্পুর কল্যাণে প্রচুর গুঁড়োদুধ মেলানো হয়েছে। আমার কাজ পাঁচটা তাঁবু গোটানো, প্যাক করা। মিসেস চিত্রে আর অনু রুটি বানাতে বসে গেছে।

সাতটা বাজার আগাই তাঁবুটাবু সব শুকিয়ে খটখটে। এর নাম মরুভূমি।

উটের গাড়ি এগিয়ে গেল। গাড়ির সঙ্গে গেল পঙ্কজ। তাডানার ওপারে ভ্যালি মতো জায়গায় কেঁকর গাছের নীচে সুবিধেমতো গাড়ি রাখবে। লাঞ্চ ওর কাছেই থাকবে। মরুভূমিতে কেঁকর গাছ একটি অদ্ভুত জিনিস। তেঁতুল গাছের মতো ঝাঁকড়া, নীচের দিকটা উট যতটা গলা যায় ততটা খেয়ে নেয়, তাই মনে হয় কেউ যত্ন করে কাঁচি দিয়ে ছেটে দিয়েছে নিখুঁতভাবে। গাছটা ঠিক টুপির মতো মনে হয় কাণ্ডের ওপর বসানো হয়ছে। তলাতে গোবর, ছাগলনাদি ছড়ানো সব শুকনো খটখটে। হালকা ওজন, যেন উনুনে দিলেই সুন্দরভাবে জ্বলবে।

আমরা গাড়ির চাকার দাগ ধরে হাঁটছি সবাই। বালির উঁচুনিচু ঢিপি এবং কদাচিৎ একটা আধটা ঝোপঝাড়। টুকটাক খাবার আছে সঙ্গে প্রত্যেকের আর জলের বোতল। চোখে পড়ল কাঠির ঝোপ। ছাগলে কাঠি খাচ্ছে কটকট করে। চিবোচ্ছে বেশ কটর কটর আওয়াজ করে। বালির ঢিপি বেয়ে একটা লোক নেমে এল। হাতে লাঠি। রোদে পোড়া লোকটা আমোদের দেখে চওড়া করে হাসল বিরাট গোঁফের ফাঁক দিয়ে। তার পাগড়ি আর বেশবাস বেশ দর্শনীয়। সোনালি দেখাল তিনটে চিতল হরিণ অবাক হয়ে আমাদের দেখছে দূর থেকে। কী ভেবে তারা চলে গেল, হয়তো সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করতে এসেছিল কাঠির ঝোপে।

আপকা নাম কেয়া হ্যায়?

—বিষণ সিং।

বয়স বলল ৩৫ বছর, অথচ দেখে মনে হয় কম করে ষাট। মুখের অজস্র আঁকিবুঁকি আর কাঁচাপাকা দাড়িটা দেখে তাই মনে হয়। ওর বাড়িতে এগারোজন পুরুষ আর মাত্র তিনজন মেয়েমানুষ। রাজস্থান বিখ্যাত হয়ে আছে নবজাত কন্যা হত্যার জন্য। অদ্ভুত নিষ্ঠুরভাবে শিশুর বাবা কাকারা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে নবজাতিকাকে হত্যা করে এবং তার জন্য তাদের বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। ফলে পুরুষ এবং মহিলার ভারসাম্য রক্ষা হয় না। অনেক রাজস্থানি ছেলের বৌ জোটে না। তবু এরা এই প্রথাটা ছাড়তে পারেনি। যেমন পারেনি সতী হওয়া বন্ধ করতে। যোধপুরের মেহরানগড় কেল্লায় ঢোকার মুখে মহারাজা মান সিংয়ের সঙ্গে এক

চিতায় সতী হয়েছিল এমন পনেরোজন রানির হাতের পাঞ্জার ছাপ আছে দেওয়ালের গায়ে। আজকের যুগেও সেই ছাপের ওপর মেয়েরা সিঁদুর ইত্যাদি দিয়ে পুজো করে।

বোঝা গেল ছাগল ভেড়া চড়াতে চড়াতে পশুপালকরা পনেরো-কুড়ি কিলোমিটার পর্যন্ত চলে যায়। এবং ছাগলেরা পৃথিবীর আবরণ শেষ করে দিয়ে প্রচণ্ড ক্ষতি করে। পাহাড়ি এলাকায় ভূস্খলন এবং এখানে বৃষ্টির অভাব সৃষ্টি করতে এরা অদ্বিতীয়। এইসব ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গেলাম।

পরিষ্কার চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছি, অতএব হারিয়ে যাবার ভয় নেই। রোদ উঠেছে, মুখের চামড়া বাঁচাবার জন্য তোয়ালে চাপা দিলাম মাথায়, তার ওপর হলুদ রঙের ক্যাপ। আমি, অনু, অশ্বিনী, সজল আর সোনালি একসঙ্গে চলেছি বকবক করতে করতে। কমল গেছে গাড়ির সঙ্গে। ঢিলে বালির ঢিপিতে উটের গাড়ি ঠেলে তুলতে হলে পাপ্পু ছাড়া আরও দুজন লাগতে পারে তাই। আসলে কমলের ভালো লাগছে না মরুভূমিতে। হরিয়ানার অল্পবয়সী ছেলে নাচ গান হৈ চৈ নেই, ধু ধু বালির মধ্যে এসে দমে গেছে। এখানে কী কারণে ও এসেছে তা ওর বুদ্ধির অগম্য। সজলের চোখকে বলিহারি দিতে হয়। একটা বালিয়াড়ি থেকে নামার পর ছোট্ট ছোট্ট শামুকের খোল কুড়িয়ে নিয়ে দেখাল। গোল হয়ে ওকে ঘিরলাম সবাই। সত্যি সত্যি শামুকের খোল, মেয়েদের গলার মালার পুঁতির মতো। এরা তো জলের জীব, মরুভূমিতে এল কেমন করে? আরও রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সবাই এক-আধটা কুড়িয়ে পেল। সজল বলল, বর্ষায় জল জমে ছোট ছোট গর্তে, সেখানে জন্মায় এরা অসংখ্য।

ডিম আসে কোথা থেকে?

এক বর্ষার আয়ু, মাটিতে ডিম থাকে, জল পেয়ে বেঁচে ওঠে। আশ্চর্য নয়?

টিপটিপ সাদা সাদা গুঁড়ি শামুকের খোল একথাই বলছে এখানে জল ছিল, এখানে তার মানে জল আছে, ওপরে না হয় নীচে আছে। এক নজর চারপাশে বুলিয়ে নিয়ে সজল বলল, দেখুন মুখার্জিদা, এই জায়গাটার অবস্থান অনেকটা বাটির মতো। বালির ঢিপি চারদিকে, তিন কিলোমিটার লম্বা ও প্রায় এক কিলোমিটার চওড়া অঞ্চল। পুরো তিন স্কোয়ার কিলোমিটার জায়গায় সবচেয়ে নিচু অংশে আমরা শামুকের খোল পেলাম। একটা দুটো কেঁকর গাছও রয়েছে। আমার ধারণা এখানে জল থাকতে পারে যদি ভূ-স্তরের গঠনটা উপযুক্ত হয়। এইরকমই জায়গা একটা আরও আছে সেটাই আমার গন্তব্য। জায়গাটা তাডানা গ্রাম পেরিয়ে। তাডানা আর ছে-টিব্বার মাঝে সুবিশাল ভ্যালি, তিন থেকে চার কিলোমিটার চওড়া। লম্বা অনেক, যেন নদীর মতো এঁকেবেঁকে গেছে। হতে পারে যুগ যুগ আগে সত্যি নদী ছিল। গোটা চারেক বোরিং (খনন) করতে পারলে বোঝা যেত ভূ-স্তরের গঠন।

বারো কিলোমিটার চলা হল, উটের গাড়িটা অনেক এগিয়ে গেছে। চাকার দাগ

বালির ওপর, তারই ধারে একটা কেঁকর গাছের ছায়ায় দুটি বালক বসে আছে একটা দুধের ডিবে নিয়ে।

—ছাস হ্যায়, পাপ্পু নে বোলা বৈঠনেকো।

ছাস হল মাখন তোলার পর যে ঘোলটা থাকে তাই। গাছটার তলায় শুকনো গোবর আর ছাগলনাদি ভর্তি। সেসব সরিয়ে বসার জায়গা হল। আঙুল দেখাল একজন যেদিকে ওদের থাকার ঝোপড়ি আছে। ভোরে মালিকের গাই দুয়ে গরুগুলোকে ছেড়ে দেয়, দুধ থেকে মাখন তুলে বালতিতে রাখা থাকে। সক্কালবেলা সেই মাখন নিতে আসে মালিকের লোক, সঙ্গে আনে উটের পিঠে ট্রাক্টর টিউবের মধ্যে জল। গরুরা সব ছাড়া থাকে, তাদের জন্যে দড়ি গোঁজের কোনও ব্যবস্থা নেই। একজন মালিকের একশ দেড়শ গরু থাকা খুব স্বাভাবিক। মালিক মাখন থেকে ঘি বানিয়ে শহরে পাঠায়।

ছাস খেতে খেতে এই সব শুনছিলাম। ছেলে দুটো জলের বদলে ছাস খেতে অভ্যস্ত। অশ্বিনী জিজ্ঞেস করল, উমর কিতনা হ্যায়?

—ম্যায় বারহ ঔর ইয়ে দশ।

মুখ দেখে অন্তত কুড়ি মনে হয়। রোদে বয়েসের ছাপ পড়ে খুব তাড়াতাড়ি। অনু আমার কানে কানে বলল, ছেলেরা না হয় জলের বদলে ছাস খায়, চান করে কিসে?

—তুমি গত চব্বিশ ঘণ্টায় চান করার সুযোগ পেয়েছি কি? ওরা মাসে একবার চান করে কিনা সন্দেহ। কথা বলে দেখো।

অনুর হয়ে সোনালি কথাটা বলেই ফেলল ওদের। হেসে উঠল দুজনেই।

—আস্নান, নেহী, নেহী করতা। বরসাত মে করতা।

ছেলেদুটো যাবার আগে সজল আর আমি দুজনেই ওদের পাঁচটি করে টাকা বকশিশ দিয়েছি। ওরা নিতে চায়নি, পঙ্কজ আগেই দাম দিয়েছে। বালির রাজ্যে এবং এমন অসুবিধের মধ্যেও ছেলেদুটো কেমন হাসি খুশি। আসলে আনন্দটা অনেকটা মনের ব্যাপার। ওরা ভাবতেই শেখেনি এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা কিছু হতে পারে বা হওয়া সম্ভব। এইটুকু বয়েস থেকে মাকে ছেড়ে কতদিন ধরে ঝুপড়ি ঘরে রয়েছে।

তিন চার কিলোমিটার চলার পর গ্রাম দেখা গেল। বাঁ দিকে দেখলাম সারি সারি বালির টিপিগুলোর ওপর নকশা কেটেছে হাওয়া। অদ্ভুত, মনোরম, অবিশ্বাস্যরকম সুন্দর। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, ঢেউয়ের পর ঢেউ এক ইশারায় কেউ স্ট্যাচু করে দিয়েছে।

জয়সলমিরের কাছে স্যা'ম ডিউনে এইরকম নকশাকাটা বালির ঢিপি দেখতে যায় অনেকে। সেখানকার বালির ঢেউয়ের দিগন্তে সূর্যাস্ত দেখাও একটা অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমরা যা দেখছি তার কাছে স্যাম ডিউন নাবালক শিশু মাত্র। এখানে কোনও ট্যুরিস্ট আসে না, তাই প্রকৃতি অকৃপণ হাতে এঁকেছে বালির ওপর

নকশা। আমাদের ডাইনে বাঁয়ে বিভিন্ন আকারের ঢিপি অনেকগুলো, তার গায়ে নকশা নানারকম। কোনওটার ঢেউগুলো ঘন ঘন। কোনওটার নকশা তারই মধ্যে বড়। একটার নকশা নীচের দিকটা বেশ বড় বড় হলেও ওপরদিকটা ক্রমশ সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। স্যাম ডিউনে যা নেই তা হল ঢিপিগুলোর সামনে প্যারাবোলার মতো গর্ত। লাইন দিয়ে সারি সারি পনেরোটা এত সুন্দর নকশা কাটা বালির ঢিপি আমরা অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম।

বাচ্চা মেয়ের মতো দৌড়ল সোনালি, পা দিয়ে মাড়িয়ে ভঙ্গুর ভাস্কর্যগুলো ভেঙে ভেঙে উঠে গেল একটায়। বালির ঢিঁপিটা ধসে ধসে পড়ছিল। এত সুন্দর কাজটা ভেঙে ফেলাটা বেশ হৃদয়হীনতা বলে আমার খারাপ লাগল। অনু বলল, এ মা, সব ভেঙে দিল।

—কাল দেখবে আবার সব তৈরি হয়ে গেছে। দুঃখ করো না।

বালি এত সূক্ষ্ম ও হালকা যে সামান্য বাতাস সহজেই আবার গড়ে দিতে পারবে চিত্রকলা। কাছে গিয়ে আমরা সবাই হাত দিয়ে অনুভব করলাম বালির কাজগুলি। রোদ্দুর বাড়ছে, আর দেরি করা উচিত নয়। গ্রামের দিকে এগোলাম। তাডানাতে আমরা দাঁড়াব না, এগিয়ে যাব আরও খানিকটা। ছে টিব্বা আরও ষোলো কিলোমিটার। ছটা জমে যাওয়া বালির পাহাড় পাশাপাশি। তাডানাতে দুয়েকটা ইটের বাড়ি রয়েছে আর আছে ট্রাক্টর। বালির ওপর ট্রাক্টর বেশ ভালোই চলতে পারে। বিশাল চাকা অথচ ওজনে কম, জল কাদা, বালি সবেতেই সমান গতি। ট্রাক্টরের সাহায্যে জল এনে এনে ভর্তি করা হয় মস্ত কুয়ো। কুয়ো তো নয়, বাঁধানো চৌবাচ্চা।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় অনেক বাচ্চা-কাচ্চা ভিড় করে আমাদের দেখতে এল। তাদের পিছন পিছন এল একটা গাইয়ে-দল, বাপ আর তার দুই ছেলে। আমরা যত বলি আমাদের সময় নেই, তারা তত চেপে ধরে আমাদের। রোজ রোজ কি আর গ্রামের মধ্যে এমন শ্রোতা মেলে? অতএব বসা হল গোল করে। মাথার বিশাল পাগড়ি গুছিয়ে বেঁধে নিল লোকটা। ততক্ষণে আমরা তার নাম জেনে নিয়েছি। গাইয়ের নাম ভূতনাথ, সার্থক নাম, সত্যি ভূতের মতোই গায়ের রং। বড় ছেলেটার নাম দেওনাথ, বছর বারো বয়েস আর ছোটটা জোয়ারনাথ, দশ বছর হবে। লোকটার চারটে ছেলে, সবচেয়ে বড়দুটো গুজরাটে আছে, কাজকর্ম করে।

ভূতনাথের হাতে একটা একতারা ধরনের যন্ত্র, খোলটা লাউয়ের নয়, কাঠের। অনেকটা ছোট তানপুরার মতো, কেবল দুটো মাত্র তার। বাঁ হাতে দুটো লোহার আংটি, খোলের গায়ে ঠক ঠক করে তাল দেওয়ার জন্য। দু ছেলের হাতে দু জোড়া করতাল। পরপর চারটে গান করল ওরা। গ্রামীণ গীত, সুর যেমন তেমন, তবু তো আসল লোকগীত। একটা অনু নোট করে নিল। মানেটাও জিজ্ঞেস করে নিলাম আমি—

আমাকে লহড়িয়ো, লহড়িয়ো, আমায় লহড়িয়ো এনে দাও
নশ টাকা দাম, আমায় লহড়িয়ো এনে দাও।
মেন্দ্রা শাহ আমার চার পাল্লার ঘুঙুর
শাহ আমাকে এনে দাও, আমাকে লহড়িয়ো।
আমার শ্বশুর তারাদের মধ্যে চাঁদ—
শাশুড়ি আকাশের মাঝে বিদ্যুৎ
আমাকে লহড়িয়া এনে দাও।
আমার ভাসুর বীরদের মাঝে রাজা
বড় জা মেলনির রানি
ভাসুরপোরা শাহজাদা বীর, এনে দাও লহড়িয়া।
আমার লহড়িয়া মুমল বাইয়ের প্রিয়তম আনবে
আমায় লহড়িয়া এনে দাও।

এত যে শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাসুর, জায়ের প্রশংসা সেই লহড়িয়া জিনিসটি কী? ন'শ টাকা দাম কার? ও হো বুঝেছি চার পাল্লার শাড়ি, ঘুঙুর বাঁধা। প্রশ্ন করতেই কুচকুচে কালো মুখে সাদা দাঁত বার করে হাসল ভূতনাথ। সাহেব ঠিক ধরেছেন, একখানি ভালো শাড়ির জন্যে বায়না ধরেছে মুমল বাই তার বর মেন্দ্রা শাহ-এর কাছে। প্রত্যেকটি গানের জন্য পাঁচটাকা করে পেল ভূতনাথ। আমি খুঁটিয়ে দেখলাম ছোট ছেলেটার মুখশ্রী। কালো পাথর কেটে তৈরি এমন কচি সুন্দর মুখটা আমার খুব ভালো লাগল। ওর হাতে আরও দশ টাকা দিলাম। দুভায়ে ভাগ করে নিতে বললাম।

অশ্বিনী সবকটা বাচ্চাকে একটা করে টফি দিল। মেয়ে কটার থুতনিতে হাত দিয়ে আদর করে নিল। আবার চলা শুরু হল আমাদের ছে টিব্বার দিকে। ঘণ্টাদুয়েক দেরি হয়ে গেছে আমাদের শামুক খুঁজতে, বালির ওপর হাওয়ায় কারুকাজ দেখতে আর গান শুনতে গিয়ে। সজল তাগাদা লাগালো সবাইকে।

তাডানার একদিকে যেমন শিফটিং স্যান্ডের বালিয়াড়ি, অন্যদিকে তেমনই শক্ত বালির ঢিপি। উঠে গেলাম সেইদিকে যেদিকে গেছে আমাদের উটের গাড়ি। একটা বেশ উঁচু বালির ঢিপি পার হয়ে আর একটা, সেটা পার হয়ে অনেক কটা চাকার দাগ দেখা গেল। বালির ওপর আমাদের জলের গাড়ির চাকার দাগ পরিষ্কার। শুধু তাই নয়, কিছু পুরনো দাগও রয়েছে। ওগুলো সম্ভবত ট্রাক্টরের চাকার দাগ। গ্রামে তাহলে ট্রাক্টর আসে। ঠিকই তো, ছাস নিয়ে আসা ছেলেদুটো বলেছিল, তাডানা মাখন আর দুধের কেন্দ্র। সজল হাতে করে দুয়েকটা সাদা পাথর দেখাল আমাকে।

—লাইম স্টোন মুখার্জিদা। এইসব ঢিপিগুলো সব লাইম স্টোনের মনে হয়।

সজলের চোখ সতর্ক হয়ে উঠল। বালির ওপর গ্রামের রাস্তাটা সোজা ঢুকে গেছে মরুস্থলীর মাঝে। চলেছি সকলে, ধুলোবালি ভর্তি পথের ওপর দিয়ে, কখনও তারই মধ্যে শক্ত জমি। সামনে আমাদের কোনও আকর্ষণ নেই, নেই কোনও ছায়াদাত্রী গাছ। অনেক দূরে মনে হয় আবার বালির ছোট টিলা। আর

ভালো লাগে না বালি, ভালো লাগছে না কিছু না থাকা এই শব্দহীন ধু ধু প্রান্তর। চোখের খাদ্য থাকলে মন ভালো থাকে, আর মন ভালো থাকে মনের খাদ্য পেলে। এখন কিন্তু কারও গল্প করার বা গল্প শোনার মুড নেই।

অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখে সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম। পথের ধারে এক বিরাট ভেড়ার পাল, কিন্তু কারও মাথা দেখা যায় না। গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি দাঁড়িয়ে আছে, কেবল মাথাটা আর একজনের পেটের তলায় ঢোকানো। শুনলাম প্রচণ্ড গরমে রোদ থেকে মাথা বাঁচাতে ভেড়ারা ওইরকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। টপাটপ কয়েকটা ফটো তোলা হল, কিন্তু ভেড়ারা কোনওরকম নড়াচড়া করল না। শুনলাম সারাদিনে এরকমভাবে কয়েকবারই মাথা ঠান্ডা করে নেয় ওরা। গায়ের মোটা উল শরীরকে বাইরের উত্তাপ থেকে রক্ষা করে, মাথাটা ব্যতিক্রম তাই ছায়া প্রয়োজন। এমন অদ্ভুত ব্যাপার অন্য দেশের ভেড়াদের মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ।

সজল বলল, থর মরুভূমিতে জনসংখ্যা বেশ ভালোই। সাহারাতে গড়ে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র তিনজন বাস করে। থরে সেই জায়গায় গড়ে একশো তেইশজন বাস করে। এই মরুস্থলীতে অবশ্য কম, গড়ে একষট্টি জন।

—মরুস্থলী কথাটা বরাবরই শুনলাম। ওটার কি আলাদা অর্থ আছে?

—মাড়োয়ার অর্থে মরবার, অর্থাৎ মরে যাবার জায়গা। দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থান মরুভূমির সবচেয়ে খারাপ অংশ। মরুস্থলী বলতে সাধারণত এই জায়গাটিকে বোঝায়। আমরা সেখান দিয়েই যাচ্ছি এখন।

ছে টিব্বার দিকে বালিভর্তি প্রান্তরে দাগের ওপর দিয়ে চলেছি, রোদ্দুর ভালোরকম কষ্ট দিচ্ছে। দেরি করাটা একদম উচিত হয়নি। কিন্তু আশপাশের দিকে নজর না দিয়ে, চোখ মুখ বন্ধ রেখে তো আমরা চলতে আসিনি। তাহলে বাড়িতে বসে থাকলেই তো হত। মিসেস চিত্রে যা বলছিল হিন্দিতে তার বাংলা করলে এইরকম হবে, রাজস্থানে মেয়ে হয়ে জন্মানো খুব দুর্ভাগ্যের। পুরনো দিনের কথা নয়, আজও প্রায় একরকম অবস্থা রয়েছে। রূপ কুনোওয়ারকে সতী হতে প্ররোচনা দিয়েছিল এরাই। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে গলা টিপে হত্যা করে বালিচাপা দিয়ে আসে এরাই। আবার মেয়ে না হলেও চলে না, রুটি বানাবে কে, দূর দূর থেকে জল বয়ে আনবে কে। অন্য প্রয়োজনের কথা না হয় বাদই দিলাম। ঠাকুর আর রানাদের রাজত্বে মেয়েদের কঠোর পর্দা প্রথা মানতে হতো। একেক জনের আটটা দশটা করে বিবি ছিল, আর ছিল বেশ কয়েকজন রক্ষিতা।

আরও এক ঘণ্টা চলতে হবে। বেলা দুটো হবে পৌঁছতে।

পৌঁছলাম সবাই। জায়গাটা কিরকম যেন, না আছে বালির উঁচু নিচু টিবি, না আছে শক্তপোক্ত মাটি। হালকা ঝুর ঝুর ধুলোর মতো বালির সুবিশাল ময়দান। যেদিক থেকে এলাম সেই তাডানার লাইম স্টোনের টিলার চিহ্ন দেখা যায় না। সামনে অনেক দূরে মনে হয় উঁচু নিচু কিছু রয়েছে। আন্দাজ পাঁচ কিলোমিটার সমতল জমি। সজল বলে উঠল,

—এটাই লুপ্ত সরস্বতীর খাত মনে করা হচ্ছে মুখার্জিদা।

চমকে উঠলাম। সজল ম্যাপ খুলে দেখাল, হাতে করে সম্ভাবিত লুপ্ত সরস্বতীর গতিপথ এঁকে এনেছে। ম্যাপটা জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার, তাতে উত্তর রাজস্থানের ঘাগর নদী থেকে পাকিস্তানের ভেতর হাকরা নদী হয়ে দক্ষিণ রাজস্থানের লুনি নদী পর্যন্ত পুরো মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি ঠিক হয়, মানে আমেদাবাদের রিসার্চ গ্রুপের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে বলতে হবে আমরা এখন নদীগর্ভে রয়েছি। জায়গাটার ভৌগোলিক অবস্থান সেইরকমই ইঙ্গিত করছে। এখান থেকে জয়সলমির বাঁদিকে চল্লিশ কিলোমিটার, সামনে পাকিস্তান বর্ডারও প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার। এই জায়গাটা দেখতেই আসা। থাকব এখানে আমরা পুরো একটা দিন। তারপর ছে টিব্বা পার করে চলে যাব তানোট বর্ডার পর্যন্ত। ওটাই আমাদের গন্তব্যস্থল। মাঝে একটা জায়গা পাব মোহনগড়, সেখানে জল ভর্তি করা হবে ট্যাঙ্কে।

তানোট পর্যন্ত একইরকম রুক্ষ শুষ্ক বন্ধুর মাড়োয়ার মরুস্থল পাওয়া যাবে। তবু আমরা পায়ে হেঁটে দেখতে চাই। নিজের চোখে না দেখলে ঠিক বুঝতে পারা যাবে না কার নাম থর মরুভূমি। পাকিস্তান বর্ডার তানোট থেকেও কিছু দূরে। ওখানেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি অংশ ঘটেছিল এবং সেটাও আমার কাছে নোট করা আছে। সময়টা ১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর দিনেরবেলা। হৈ হৈ করে সাঁজোয়া গাড়ি কামান-টামান সব নিয়ে ঢুকে পড়ল পাকিস্তানি বর্ডার পার করে। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। তানোট পৌঁছে থমকে গেল তারা, আটকে গেল অগ্রগতি। তানোট পোস্টের দায়িত্বে ছিলেন মেজর জয় সিং রাঠোর, ১৩ নম্বর কুমায়ুন রেজিমেন্টের মাত্র ৩৩ জন সৈন্য ছিল সঙ্গে। তাঁদের সামনে একটা ছোট্ট টিলার ওপর দেবী মাতেশ্বরী তানোট রায়জির সামান্য ছোট্ট সাদা রঙের মন্দির, পাথর বালি এইসব দিয়ে তৈরি। মাথার ওপর লাল তিনকোনা পতাকা উড়ছে।

তিনদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে শত্রুসৈন্য। একমাত্র রাস্তা পিছনে হটে আসা অথবা উঁচুতে মন্দিরের আড়াল থেকে প্রতি আক্রমণ। রাঠোর রাজপুতের পক্ষে পিছনে হঠার চেয়ে জীবন দেওয়া সোজা কাজ। তিনজন নিহত, আরও তিনজন আহত হয়ে রয়েছে। গোলা ফাটছে চারদিকে, মাথা বাঁচিয়ে নিচু হয়ে আছে সৈন্যরা। মেজর জয় সিং এগিয়ে যাবার জন্যে বললেন। মাতা তানোট রায় রক্ষা করবেন ভয় কী! প্রথমে নিজেই যাবেন সঙ্গে আরেকজন সৈন্য আরেকটা মেশিন গান নিয়ে। পৌঁছে গেলেন তিনি সাহস মাত্র ভর করে। একে একে বাকিরা এসে গেল। রুখে যাওয়া শত্রুসৈন্য অবাক হয়ে গেল ওদের আহাম্মকির বহর দেখে। মাত্র একটা কামানের গোলায় উড়ে যাবে মন্দির আর তার সঙ্গে ভারতীয় সেনার ছোট দলটি। শত্রু এগোবার চেষ্টা করলেই অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলি চলে মন্দির থেকে। শেষ পর্যন্ত কামান দাগল তারা। একটার পর একটা গোলা এসে পড়ে কিন্তু ফাটে না। একটাও পাকিস্তানি গোলা ফাটল না মন্দিরচত্বরে। অলৌকিক ব্যাপার দেখে

মেজর সাহেব বিস্মিত হয়ে ভাবলেন মা যার সহায় তার কোনও ভয় নেই। সন্ধ্যা নাগাদ জয় সিং শুনলেন, শত্রুরা বলাবলি করছে আগামীকাল দিল্লিতে গিয়ে নাস্তা করা হবে, রাতটা যাক না।

খুব সকালে তাদের ঘিরে ফেলল বিভিন্ন দিক থেকে এসে পড়া ভারতীয় সেনা। ভয়ানক ক্ষয়ক্ষতি হল তাদের, বাকিরা ধরা পড়ল, বন্দী হল। আরেকটু হলেই দিল্লিতে জলখাবার খেতে বসছিল ওরা, যেন দিল্লি তানোটের কাছেই। যেসব গোলা ফাটেনি সেগুলি সব সাজিয়ে রাখা আছে মন্দিরের মধ্যে। মাতা তানোট রায়ের মন্দির ভারতীয় সৈন্যদের শ্রদ্ধার দানে এখন অনেক বড় করে তৈরি হয়েছে শুনেছি। আমরা যাব সেখানে, একবার স্যালুট করব সেই সব নাম না জানা যোদ্ধাদের।

আমরা সত্যই কি সরস্বতী নদীবক্ষে রয়েছি? বেদে উল্লিখিত নদীটা গঙ্গা নদীর চেয়েও বিশাল ছিল, তারপর এমন কী হল যে সেটা লুপ্ত হয়ে গেল? আসবার সময় ট্রেনে সজল আমাদের যত্ন করে বুঝিয়েছে নদী লুপ্ত হয়নি। অতবড় নদী নিখোঁজ হবে কী করে? ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে যমুনা তিনবার নিজের জায়গা থেকে সরে এসেছে পশ্চিমদিকে। কারণ আর কিছুই নয়, ভূমিকম্প। আবার ভূমিকম্পও কারণ নয়, সিম্পটম। আরাবল্লি পর্বতমালা রাজস্থানের পূর্বদিকে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে বিস্তৃত। সেটাই আরও উত্তরে বাড়বার চেষ্টা করেছিল কোনও সময়। দিল্লি থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত একটা পাহাড় তৈরি হল, কালে সেটা মাটির নীচে চাপা পড়ল। যমুনাকে পশ্চিমদিকে সরতে হল। এই প্রক্রিয়ায় তিনবারের বার যমুনা গ্রাস করল সরস্বতীর জায়গাটা। যমুনা আর সরস্বতীর মিলন হয়ে গেল। আর সরস্বতীর জলধারা? সেটা হিমাচল প্রদেশের থেকে হরিয়ানা হয়ে ঘাগর নাম নিয়ে রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলার অনুপগড়ের কাছে পাকিস্তানে ঢুকে গেল, সেখানে নাম হল হাকরা। হাকরা বেশ বড় নদী, শতদ্রু নদীর মতো সিন্ধু নদীতে না পড়ে ফিরে এল আবার রাজস্থানে। বলা হচ্ছে যে সেই হাকরা নদীই মোহনগড়ের কাছ দিয়ে এসে লুনি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল গুজরাটের পচভদ্রের কাছে। ওখানে এখনও একটি শাখানদীর নাম সরস্বতী। আসলে লুনি ছিল হাকরা নদীর শাখা নদী। এই জায়গায় যে একটা বিশাল নদী ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তা না হলে কচ্ছের রনের মতো অত বড় মোহনার কোনও মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। সবাই মিলে আবার ম্যাপ দেখতে লাগলাম। এতবড় নদী যখন আগে ছিল তখন তার চিহ্ন তো কিছু এখনও পাওয়া যাবে। ধরা যাক, তিন হাজার বছর আগে ছিল নদীটা, সব চিহ্নই কি লুকিয়ে পড়েছে বালির নীচে? মনে হয় না। বললাম,

—এটাই যদি নদীর ড্রাইবেড হয়, তাহলে এখানে ড্রিল করলে পাললিক ধরনের মাটি বা পাথর পাওয়া যাবে।

—ঠিক তাই। ভৌগোলিক চিহ্নগুলি তাই বলে। মনে করুন আমাদের সামনে

সিন্ধু নদী আর পিছনে আরাবল্লি পর্বত উঁচু হচ্ছে ধীরে ধীরে। তাহলে এখানে খুঁড়লে জল পাবেন না, জল গড়িয়ে চলে গেছে পশ্চিমে। ঠিক সেই কারণে থর মরুভূমির পশ্চিমদিকটায় জল পাওয়া যায়। ইন্দিরা গান্ধি ক্যানেলটাও ওই দিকে।

একটা কেঁকর গাছের নীচে শুকনো গোবর-টোবর সরিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। হাত ধুয়ে প্রথমেই সবাই মিলে রুটি তরকারি খেয়ে, জল খেয়ে একটুখানি গড়িয়ে নেওয়া হল। এতটা হেঁটে সবাই অল্প বিস্তর ক্লান্ত। তাঁবু টাঙানো হবে পরে। পাপ্পু বোধহয় চা খেতে খুব ভালোবাসে, নিজেই উদ্যোগী হয়ে আগুন জ্বালিয়ে চায়ের কেটলি বসাল। অল্প অল্প হাওয়া আছে, আরামে চোখ বুজে আসার উপক্রম। আমরা তাডানার কাছে লুপ্ত সরস্বতী নদীর বুকে শুয়ে বিশ্রাম করছি। আমেদাবাদ কেন্দ্রের প্রকাশিত ম্যাপ অনুযায়ী আমাদের জায়গাটা ঠিক নদীর ওপর। দু-পাঁচ কিলোমিটার এদিক ওদিক হলেও বলার কিছু নেই। আরামে চোখ বুজে কল্পনা করতে দোষ কী যে আজ থেকে তিন-চার হাজার বছর আগে আমার ওপর দিয়ে একটি গভীর খরস্রোতা নদী বইত। আমি যেখানে রুকস্যাকের ওপর মাথা রেখে পা ছড়িয়ে বসেছি তার ওপর আর চারপাশে গভীর জল। কত ছোট বড় মাছেরা খেলা করছে। নদীর বুকে কাঠের তৈরি বিরাট ষোলো দাঁড়ের পালতোলা নৌকো চলেছে বাণিজ্যে। গুজরাটের রনের মধ্যে দিয়ে আরবসাগরে পৌঁছে যাবে, তারপর সমুদ্র পার হয়ে যাবে হয়তো মিশর অথবা মেসোপটেমিয়া।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলে মস্কো থেকে ব্লাডিভস্টক

হরপ্রসাদ মিত্র

ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথে— মস্কো থেকে ব্লাডিভস্টক ৯,২৮৯ কিলোমিটার। ছয় থেকে আট দিন সময় লাগে।

ছয় থেকে আট দিন বললাম বটে কিন্তু সেটা সাধারণ ট্রেনে। যাদের কাজ হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে দেওয়া। আমাদের স্পেশ্যাল ট্রেনে থামতে থামতে দেখতে দেখতে যেতে পুরো চোদ্দ দিন লাগল। মস্কোতে ২৪ ঘণ্টা, সেন্ট পিটার্সবার্গে ৩৬ ঘণ্টা আর ব্লাডিভস্টকে ২৪ ঘণ্টা— এই তিনটি হল প্রধান বিরতি। এসব জায়গায় হোটেলে রাত্রিবাস। এছাড়াও পথে কয়েকটি নামকরা শহরে ট্রেন ছয় থেকে বারো ঘণ্টা দাঁড়ায়। যাত্রীদের বাসে করে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়ে আনা হয়।

ফেরার ব্যবস্থা ব্লাডিভস্টক থেকে উড়ান। যাত্রীদের কেউবা মস্কো হয়ে পশ্চিম ইউরোপের কোথাও না কোথাও গেল। আবার কিছু যাত্রী টোকিও হয়ে আমেরিকায় ফিরে গেল। এই সমস্ত ভ্রমণটির মায় ফেরার উড়ান পর্যন্ত ব্যবস্থা হয়েছিল দুটি সংস্থার মিলিত উদ্যোগে। যাত্রীদের দেখাশোনা আদর-অভ্যর্থনার ভার ছিল একটি ইংরেজ সংস্থার হাতে। মস্কো থেকে ব্লাডিভস্টক ট্রেনটিও এঁদের আয়োজন। এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন একটি আমেরিকান কোম্পানি যাঁদের সমস্ত রাশিয়ার প্রধান প্রধান শহরে নিজেদের অফিস আছে। স্থানীয় দ্রষ্টব্যস্থলগুলি এঁরা দেখালেন। ট্রেনটি অবশ্য রাশিয়ান রেলওয়ের সম্পত্তি। এবং ট্রেনের কর্মচারীরা সবাই রাশিয়ান রেলওয়ের লোক। ট্রেন কোন পথ দিয়ে যাবে, কোথায় কতক্ষণ থামবে সেসব নির্ঘণ্ট রাশিয়ার রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়।

এখানে আমাদের ট্রেনটির সম্বন্ধে কিছু বলাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রোলেটারিয়েট রেভেলিউশনের পর রাশিয়ায় যখন শ্রেণীবিভাগহীন সমাজ স্থাপিত হল, তখন সেই ধাক্কায় জার আমলের ট্রেনের শ্রেণীবিভাগও তুলে দেওয়া হল। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল যে শ্রেণীসর্বস্ব বা শ্রেণীবিভাগহীন যে সমাজই হোক না কেন, অরওয়েলের মহাবাণী সর্বদা সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ সবাই সমান হলেও ওর মধ্যে কিছু লোক একটু 'বেশি সমান'। আবার এই 'বেশি সমান'দের মধ্যেও

কিছু লোক 'আরও বেশি সমান'। এরপরে তিমিঙ্গিলের মতো, তিমিঙ্গিলের পরে যতগুলো দরকার 'গিল' জুড়ে যেতে পারেন, এই গিলদের দাবি মেটাবার জন্য রাশিয়ার রেল কর্তৃপক্ষেরা প্রধানত দুই ধরনের বগি তৈরি করালেন।

তিমিঙ্গিলদের জন্য তৈরি হল নয় কামরাওয়ালা বগি। প্রতিটি কামরায় দুটি করে লোয়ার বার্থ, যেগুলি রাতের শয্যা এবং দিনে সোফা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি বগির একপ্রান্তে দুটি করে টয়লেট। অন্যপ্রান্তে দুটি কামরা। তাতে থাকেন একজন বা দুজন খিদমদগার, যাত্রী কামরার লিনেন বালিশ জাতীয় জিনিস রাখবার ব্যবস্থা, চা কফি তৈরি করার সরঞ্জাম, যেখানে ইলেক্ট্রিক সামোভারে জল সর্বদাই ফুটছে। স্নান আহারাদির ব্যবস্থা থাকত আলাদা বগিতে। তিমিঙ্গিল গিলদের জন্য সেই একই বগিতে চারটি কামরা, প্রত্যেক কামরার সঙ্গে সংলগ্ন স্নানঘর, টয়লেট। শোয়া বসার জায়গা বেশি, আসবাবপত্রও উন্নত ধরনের, প্রত্যেক বগির নিজস্ব খাবার জায়গা, বার ইত্যাদি। এঁদের ওপরের গিল যাঁরা তাঁদের জন্য আলাদা চার চাকা, আট চাকা, বারো চাকার সেলুনের বন্দোবস্ত ছিল। গিলোত্তমরা স্পেশ্যাল ট্রেন ব্যবহার করতেন। এই সমস্ত ট্রেনই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। চার কামরা বগি এবং সেলুন কারগুলিতে প্রত্যেকের নিজস্ব শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত ছিল।

কালক্রমে গিলরা সবাই ট্রেনের বদলে প্লেন ব্যবহার শুরু করলেন। তখন এইসব বিশেষভাবে নির্মিত বগি, সেলুনগুলো বেবাক অনাদৃত অবস্থায় রেলওয়ে ওয়ার্ডে পড়ে রইল। কারণ সাধারণ লোকের পক্ষে এত দামি গাড়ি ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। আমাদের ভ্রমণসংস্থা এই বাতিল বগি সেলুনগুলোকে সাফসুতরো রিপু করে নিজেদের ট্রেনগুলি দাঁড় করিয়েছেন। ইঞ্জিন একটি বা দুটি— ইলেক্ট্রিক। তবে যাত্রীদের মনোরঞ্জনের জন্য কোনও কোনও ট্রেনে স্টিম ইঞ্জিনও চালু করা হয়।

প্রত্যেক ট্রেনেই থাকে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছটি বগি। অফিস বগি, কর্মচারীদের বগি, রেফ্রিজারেশন বা জেনারেটর বগি, রেস্টুরেন্ট বগি, বার বা লাউঞ্জ বগি ও স্নানঘর বগি। স্নানঘর বগিটিতে ছয়টি আলাদা ধারাস্নানের কামরা ছাড়াও একটি কাপড় কাচা ঘর এবং খিদমদগারদের জন্য দুটি কামরা থাকে। এছাড়া যাত্রীসংখ্যা অনুযায়ী চার থেকে ছয়টি নয় কামরাওয়ালা বগি। অন্তত একটি চার কামরাওয়ালা বগি এবং কখনও বা একটি সেলুন কারও জোড়া হয়। রাশিয়ান ট্রেনের রং নীল তবে আমাদের ট্রেনে কোনও কোনও বগি নীল আর লালে মেশানো ছিল। হয়তো এগুলো গিলগিলদের জন্য।

যাত্রা শুরু হল মস্কো থেকে। প্রথম দিন শেষ-বিকেলের আলোয় আমরা কয়েকজন লন্ডন থেকে উড়ে মস্কো পৌঁছলাম। সেখান থেকে আমাদের অভ্যর্থনা করে হোটেলে নিয়ে গেল ভ্রমণসংস্থার লোক। রাত্রিবাস হোটেলে। পরদিন যতটা সম্ভব মস্কোর দৃশ্যাবলি দেখিয়ে আবার শেষ বিকেলে লেনিন গ্রাডস্কি স্টেশনে

আমাদের ট্রেনে তোলা হল। ঝকঝকে করে ধোয়া নীল আর লাল নীল মেশানো বিশাল লম্বা ট্রেনটি স্টেশন আলো করে দাঁড়িয়েছিল। সামনে দুই বিরাট ইঞ্জিনের গায়ে বিদ্যুতের দীপ্তি। এর তুলনায় অন্য অন্য প্ল্যাটফর্মে অন্য অন্য সাধারণ ট্রেন যেন অনাথ ছেলেমেয়ে। লোকলস্কর, রেল কর্মচারী, যাত্রী, ফিরিওয়ালাদের গাড়ি সব নিয়ে প্ল্যাটফর্ম গমগম করছে। আমাদের যে যার বগিতে তুলে দিয়ে বলে দেওয়া হল যেন ছটার সময় বার কারে সমবেত হই। ওখানে শ্যাম্পেন দিয়ে যাত্রীদের অভ্যর্থনা করা হবে এবং সেইসঙ্গে রেলভ্রমণ সংক্রান্ত কিছু খবরও দেওয়া হবে।

নিজেদের কামরায় ঢুকে জিনিসপত্র কোনটা কোথায় রাখব বিপন্নভাবে দেখছি, এমন সময় দরজার পর্দা সরিয়ে মাইকেল এসে দাঁড়াল। মোটাসোটা ছাঁটা গোঁফ হাসিমুখ চোখে কৌতুক, অপটু ইংরিজি এবং মুখ হাতের ভঙ্গিতে বলল, 'আমি মাইকেল, আমি এবং আমার জুড়িদার এই চোদ্দদিন ট্রেনে তোমাদের দেখাশোনা করব। যখন যা দরকার ঘণ্টি বাজালেই আমরা হাজির।' আমরা একটু ঘ্যানঘ্যান করতে গেলাম, এ কামরায় তো দেখছি ওয়ার্ডোব নেই। জামাকাপড় কোথায় রাখব! স্যুটকেশ দুটোই বা কোথায় যায়! মাইকেলের বরাভয়, কোনও চিন্তা করো না। সব ঠিক করে দিচ্ছি। গাড়ি ছাড়তে দাও। দিলও তাই। ওয়ার্ডোব নেই তো কী! জামাকাপড় স্যুটকেশেই থাকবে এবং স্যুটকেশ রাখার যথেষ্ট জায়গা আছে মাথার ওপরে একটা লফটে। যতবার দরকার হবে মাইকেল বা তার জুড়িদার এসে স্যুটকেশ নামিয়ে এবং উঠিয়ে দেবে। দিনের জামাকাপড়ের জন্য এই দুটো বড় হুক, বইপত্র খুচোখাচা কামরার গায়ে লাগানো দড়ির জালে রাখো, দুটো বার্থের মাঝখানে জানলার তলায় একটা খুদে টেবিলও আছে যেখানে টুকিটাকি জিনিস, চায়ের গ্লাস (কাপ নয়) প্রভৃতি রাখা যায়। এই তো হয়ে গেল। ওদের মুখের কথাই ছিল 'নো প্রবলেম' এবং কথা ও কাজে ওরা এক।

ইতিমধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিল। কোনও ছুটোছুটি নেই। হুটোপাটি নেই, বাঁশি ভেরি ঘণ্টা কিছুই বাজল না— হঠাৎ দেখি স্টেশনটা যেন আস্তে আস্তে পিছনদিকে পিছলে যাচ্ছে। ঘড়িতে প্রায় ছটা। বার কারে শ্যাম্পেন মিটিংয়ের সময়। জামাকাপড়ে একটু ভদ্রস্থ করে ট্রেনের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো বিস্তৃত টানা করিডর ধরে বার কারে পৌঁছে দেখি সেখানে মেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। ফটাফট শ্যাম্পেনের বোতল খুলছে দুজন পরিবেশক, টগর ফুলের মতো উচ্ছলিত শ্যাম্পেনের গ্লাস হাতে যাত্রীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এ ওর সঙ্গে আলাপ করছেন, সমস্ত ব্যাপারটির ওপর নজর রাখছেন এবং হোস্টের ভূমিকা নিয়েছেন দুজন। একজন পুরুষ। বয়স ষাটের কাছে ঘেঁসলেও শক্তসমর্থ পাকানো চেহারা, মধ্যম উচ্চতা। ইংরিজি নাম লেসলি ম্যাকএলিস্টার। অন্যজন সুন্দরী তরুণী। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। রাশিয়ান, তবে ইংরিজিতে যথেষ্ট সড়গড়। নাম তামারা। এঁরা দুজন কোম্পানির কর্মচারী। বরাবর যাত্রীদের সঙ্গে থাকবেন। তাদের সুখসুবিধা

দেখবেন এবং বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানে যাত্রীদের তালিম দেবেন।

গালগল্পের ফাঁকে ফাঁকে এঁরা যাত্রীদের কয়েকটি বিশেষ ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন। যেমন বিরতিস্থলগুলো ছাড়াও যেসব স্টেশনে ট্রেন স্বকীয় প্রয়োজনে দাঁড়াবে সেখানে নামবার আগে দেখে নেবেন ট্রেন কতক্ষণ দাঁড়াবে এবং সেই সময় বুঝে যা করতে চান তা করবেন। নাহলে হঠাৎ দেখবেন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে আর আপনি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন। মস্কো থেকে ব্লাডিভস্টক সাতঘণ্টা এগিয়ে আছে। মানে মস্কোতে যখন রাত বারোটা ব্লাডিভস্টকে তখন পরদিন সকাল সাতটা। অথচ রাশিয়ার পুরো ট্রেন সিস্টেম চলে মস্কো সময় অনুযায়ী। কাজেই পথে কোথাও স্টেশন থেকে বেরিয়ে যদি দেখেন শহরে ঘণ্টাঘরের ঘড়িটা ঘোড়ার মতো দৌড়চ্ছে অবাক হবেন না। হিসাব মতো সময় ট্রেনের সময়ের সঙ্গে জুড়ে নেবেন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি দুটো ঘড়ি রাখেন। একটাতে থাকবে রেলের সময় অন্যটাতে স্থানীয় সময়। আজকাল অবশ্য বিশেষভাবে নির্মিত এমন ঘড়ি পাওয়া যায় যাতে একই ঘড়িতে একসঙ্গে দুটো বা ততোধিক সময় দেখা যাবে। আরেকটা কথা। ট্রেন যত পুবদিকে এগোবে ততই স্থানীয় সময়ের সঙ্গে তাল রাখার জন্য নিজেদের ঘড়ি একঘণ্টা করে এগিয়ে দিতে হবে। এ সম্বন্ধে নির্দেশ প্রতিদিন নৈশভোজনের পরে দেওয়া হবে। ঘুমকাতুরেদের পক্ষে শুভ সংবাদ নয়। কারণ মাঝে মাঝেই ২৪ ঘণ্টার জায়গায় ২৩ ঘণ্টার দিন হবে।

শ্যাম্পেনের সঙ্গে সঙ্গে আলাপচারীও চলছে। ডেভিড আর মার্গারেট হোয়াইটের সঙ্গে পরিচয় আগেই হয়েছিল। ওরা আমাদের সঙ্গে একই প্লেনে মস্কো এল। বয়স্ক স্বামী-স্ত্রী। দুজনেরই বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। বেশভূষা সাধাসিধে। হয়তো একটু গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। এয়ারপোর্টের হুটোপাটিতে ওরা একটু বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। একটি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক মেয়ে একাই যাচ্ছে। এবারবোম্বি এবং কেন্ট নামে বিখ্যাত ভ্রমণসংস্থার হয়ে ও দেখতে যাচ্ছে যে ওরা ওদের ক্লায়েন্টদের জন্য এরকম একটি রেলভ্রমণ আয়োজন করতে পারে কিনা। ওলগা, আমাদের ডাক্তার। সুমুখী তরুণী মেয়েটি, বছর চারেক হল পাশ করে বেরিয়েছে। ওর প্র্যাক্টিসও হবে আবার বেড়ানোও হবে। লেনা— মধ্যবয়স্কা পিয়ানিস্ট। বার কারে আমাদের পিয়ানো বাজিয়ে শোনাচ্ছেন। আমেরিকান ফটোগ্রাফার মার্ক। তিন দিনের রাস্তা নভোসিবিরিস্ক পর্যন্ত যাবেন ফটো তুলতে তুলতে। যে ফটো আমাদের ভ্রমণসংস্থার পরের ক্যাটালগে ব্যবহার হবে। সকলের চেয়ে বেশি চোখে পড়ল ক্ষীণ দীর্ঘকায় এক ইংরেজ বৃদ্ধা মেরী। বয়েস তিরাশি। চোখে ভালো দেখেন না। কানে আরও খাটো। আর্থারাইটিসে হাত-পা পুরো সচল নয়। তবু এই দুস্তর রাস্তায় একাই বেরিয়ে পড়েছেন। পথের সহায় পথেই পাওয়া যাবে।

ককটেল শেষ হতে হতে ডিনারের সময় এসে গেল। লম্বা করিডর ধরে টলমল করে এগোলাম। যতই সাফসুতরো রিপু করুক পুরনো দিনের গাড়ি চলার সময় বেশ দোলে। তবুও ট্রান্স-সাইবেরিয়ানের ঊর্ধ্বতম বেগ হল ঘণ্টায় ৭৫

কিলোমিটার, গড়পড়তা ৫৫ থেকে ৬০-এর মতো। এক বগি থেকে অন্য বগিতে যাওয়ার যে ঢাকা প্যাসেজ তার লোহার পাটাতনগুলো একের ওপরে আরেকটি মসৃণভাবে ফেলা নয়। সেখানে সতর্ক না হলে হোঁচট খাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। স্নানের বগিটা আমাদের বগির ঠিক পরে হলেও বার বা খাবার বগির জন্য তিন-চারটে বগি পেরোতে হত। সৌভাগ্যের বিষয় যে এই বাবদ কোনও দুর্ঘটনা হয়নি। বোধহয় যাত্রীদের শতকরা আশিভাগ ষাটের ওপরে হওয়ায় সতর্কতার অভাব ছিল না।

খানা কামরায় ঝলমলে আলো। একসঙ্গে বাহান্ন জন বসতে পারে, দুদিকে দুই সারি, মাঝখানে রাস্তা। একেক সারিতে ছটা বা সাতটা টেবিল। প্রতি টেবিলে চারজন করে বসে। ধবধবে সাদা সদ্য কাচা ইস্ত্রি করা লিনেন, সাদা বোন চায়নার ক্রকারি, আলো ঠিকরানো কাচের গ্লাস, কাটগ্লাসের সুরাপাত্র, ঝকঝক করছে স্টেনলেস স্টিলের কাটলারি গ্লাসের ওপরে ফুলের মতো সাজানো ন্যাপকিন আর ফুলদানিতে ফুল তো আছেই। সব মিলিয়ে এক এলাহি ব্যাপার এবং প্রত্যেকদিন তিনবার এইভাবে টেবিল সাজানো। পরিবেশক মাত্র দুজন। ইউজিন চটপটে ছোটখাটো মানুষটি আর গ্যালেনা সদা হাস্যমুখী সুরূপা নম্র ধীর স্থির মেয়েটি। বাহান্নজন লোককে তিনবেলা কোর্স বাই কোর্স খাওয়াবার ভার এদের। এবং শুধু খাওয়া নয়। খাদ্য পানীয় দুই-ই। বলে রাখি যে এই ট্রেনে সারাদিনে চা, কফি, ঠান্ডা পানীয়ের জন্য আলাদা পয়সা দিতে হয় না। মধ্যাহ্ন এবং নৈশভোজনের সময় বিয়ার এবং ওয়াইনও বিনামূল্যে। অন্য সময়ে সুরাজাত পানীয় বার থেকে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। বাহান্ন জন লোককে দিনে তিনবার এইভাবে খাওয়াবার জন্য দুটি মাত্র পরিবেশকের কী পরিশ্রম এবং ক্ষিপ্রতার দরকার হয় ভেবে দেখুন। কিন্তু কখনও এদের মুখে অসন্তোষের চিহ্নমাত্র দেখিনি। সমভাবে সকলের সেবা করে গেছে।

খাওয়ার আড়ম্বর যতটা, খাওয়াদাওয়া কিন্তু সেই মাপের নয়। কারণটা পরে জানলাম। এরা পুরো ট্রেনটাকে লোকলস্করসুদ্ধু রাশিয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিজ নিয়েছে। পাচকরা সব রেল কর্মচারী এবং তাদের রন্ধন পটুত্ব সীমাবদ্ধ। তাছাড়া চলন্ত ট্রেনে সব সময় টাটকা জিনিস পাওয়াও যায় না। খাওয়ার ব্যাপারটা এই রকম। ব্রেকফাস্টে টেবিলের ওপর ডিশে করে ফল সাজানো থাকত। আপেল, কমলালেবু, কলা, আনারস, আঙুর ইত্যাদি। তারপরে একটা পরিজ বা কোনও সিরিয়াল। পরে ছোটখাটো রোলস, টোস্ট এবং তার সঙ্গে ডিম স্ক্র্যামবলড বা ওমলেট। ওমলেট ফ্লাফি নয়। আমাদের মামলেটের মতো। কখনও কখনও সসেজ থাকত। বার দুই মাছ পেয়েছিলাম। অবশ্য মাখন, জ্যাম, মার্মালেড এসবও থাকত। মাঝে মাঝে প্যানকেক আসত। চা বা কফি তো ছিলই। ফলের রস— কমলালেবু, আনারস, কিন্তু সবই সিন্থেটিক। আসল নয়।

দুপুরে এবং রাতের খাওয়ার সময় টেবিলে সাজানো থাকত কাঁচা সবজি

স্যালাড— বিট, শশা, গাজর, কখনও বা লেটুস। তারপরে আসত স্যুপ। টমাটো বা চিকেন, কখনও বা রাশিয়ার বিখ্যাত বিট রুট স্যুপ বর্শ। এর পরের কোর্স মাছ দুপুরে আসত না, কেবল রাতে সেদ্ধ বা প্যান ফ্রায়েড ওদেশি মাছ, অম্বল, ট্রাউট কখনও বা স্ট্রারজন যার ডিম কাভিয়ার নামে পৃথিবীখ্যাত। মাছগুলো সমুদ্রের নয়, নদী বা মিঠে জলের লেকে ধরা। অম্বল মাছ তো বৈকাল হ্রদের, আমাদের বাঙালি মুখে ভালো লাগারই কথা। কিন্তু ওরা রাঁধতে জানে না, না মশলার বাহার, না ভালো সস। ওই একরকম সাদা সস বা টমেটোর সসে চোবানো। পরের কোর্স চিকেন বা পর্ক। কদাচিৎ বিফ, রোস্ট বা চপ জাতীয় জিনিস। শেষ কোর্স মিষ্টান্নের সময়, কখনও ফল, কখনও স্যামোলিনা পুডিং বা সুজির পায়েস, কখনও সুফলে বা প্যানকেক থাকত। মাঝে মাঝে মুখ বদলবার জন্য পাসতা থাকত বা হাঙ্গেরির গুলাস। খাওয়া একটু একঘেয়ে হলেও কোনও অপ্রতুল বা অভাব ছিল না। তাছাড়া ১৪ দিনে অন্তত আটবার বাইরের হোটেল রেস্টুরেন্টে ভালোই খাওয়া হয়েছে।

প্রথম দিন সকলের আগে চিলড শ্যাম্পেনের সঙ্গে ক্যাভিয়ার পরিবেশিত হল রাশিয়ান স্টাইলে। ক্যাভিয়ারের স্তূপ রইল আগেকার এক টাকা সাইজের ছোট ছোট প্যানকেকের ওপর। ওদেশি নাম হল ব্লিনি। শ্যাম্পেন এবং ক্যাভিয়ার এর পরে আরও তিনবার পাতে পড়েছে। যাত্রার শেষ দিনে এবং দুজন যাত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে। সেদিন আমাদের টেবিলে অপর দুজন ছিলেন লিজ রলিং— মধ্যবয়স্কা একাকিনী ভদ্রমহিলা, ইংরেজ, স্বামী কয়েক মাস আগে গত হয়েছেন, সুরূপা, সুবেশিনী, হাস্যকৌতুকে উজ্জ্বল— আর সাবিনো আলটুনা আমাদের দলের একমাত্র স্প্যানিয়ার্ড— ইনিও মধ্যবয়স্ক, আমুদে কর্মঠ। ইনি জলনিকাশি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পারদর্শী এবং সেই উপলক্ষে সারা দুনিয়ার গম্য অগম্য নানা দেশে ঘুরে বেড়ান, স্ত্রী পুত্র কন্যা সব মাওরকায় থাকে। প্রথম দিন এঁদের দুজনের উচ্ছলিত আনন্দ দেখে মনে হল এঁরা বোধ হয় সাময়িকভাবে জোড় বাঁধার চেষ্টায় আছেন কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখলাম তা নয়। লিজ এখনও শোকাহত এবং বাড়িতে টিকতে পারেন না বলে এই লম্বা ভ্রমণপথে পাড়ি দিয়েছেন। উনি ট্রেনে আরও সময় কাটাবার জন্য আর সবাইয়ের মতো ব্লাডিভস্টক থেকে উড়ে ফিরবেন না। ট্রেনেই ফিরবেন, তবে ট্রেনটি ফিরবে বৈকাল হ্রদের উত্তরদিক দিয়ে বৈকাল আম্বর লাইনে। এই নতুন লাইন পাতা সম্পূর্ণ হয়েছে সবে ১৯৯১ সালে। উদ্দেশ্য পুবদেশে যাওয়ার জন্য একটি বিকল্প রাস্তা। দুটি রাস্তাই ট্রান্স-সাইবেরিয়ান লাইনের মাঝামাঝি জায়গা টায়সেটে এসে মিলেছে। ব্লাডিভস্টকে তিন রাত কাটিয়ে লিজ বাড়ি ফিরবেন ৩২ দিন পর।

প্রথম দর্শনে মানুষের সম্বন্ধে কত ভুল ধারণাই না হতে পারে। যেমন লিজ তাঁর অন্তরের বিষণ্ণতা বাইরে হাসিখুশি দিয়ে ঢেকে রাখেন। সাবিনো যেন একটু বিরক্তিই ঘটিয়েছিলেন, বড্ড বেশি কথা বলেন, বড্ড হামবড়াই। পৃথিবীর ১২৯টি

দেশে পা রেখেছেন। সেই গল্প— নানা জায়গায় কত কী দেখেছেন, কত বিপদের সময় কাটিয়েছেন। ওঁর কাছে পর্যটক হিসাবে আমরা নস্যাৎ হয়ে গেলাম। হ্যাঁ, এই ট্রান্স-সাইবেরিয়ান ট্রিপটি ওঁর শখের ঘোরা। এখানে কোনও কাজ নেই। ওঁর স্ত্রী এসব শ্মশানে মশানে ঘোরা পছন্দ করেন না। তিনি বুঝি মাওরকাতে কোনও স্কুলে পড়ান। তাই নিয়ে আছেন। সাবিনোর সঙ্গে দু-চারদিন কাটানোর পর দেখলাম যে কথা একটু বেশি বলেন বটে কিন্তু সেটা ল্যাটিন জনোচিত খোলামেলা স্বভাবের জন্য। ঘুরেছেন অনেক। আফগানিস্তানের পাহাড়ে, ইন্দোনেশিয়ার জঙ্গলে, আফ্রিকার মরুভূমি, আন্দিজের উপত্যকা অঞ্চল এবং সেসব গল্প কথার মধ্যে এসে পড়ে কিন্তু তা নিয়ে বড় একটা অহঙ্কার নেই। অন্যদিকে সহজে সকলের সঙ্গে মিশতে পারেন। 'স্মল টক' মানে 'টুকরো কথা'য় পারদর্শী। আমাদের লম্বা ট্রেন ভ্রমণের সীমিত গণ্ডির মধ্যে সাবিনোর মতো একজন লোকের খুব দরকার ছিল।

খাওয়াদাওয়া চলছে। ট্রেনও চলছে। মস্কোর আওতা অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে এসেছি। এখন দুদিকে ফাঁকা মাঠ, বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। আকাশে এখনও সূর্যাস্তের মৃদু আলো। মাঠের সবুজ ধূসর হতে শুরু করেছে। চারদিক যেন বড় নির্জন বিষণ্ণ, তার মধ্যে আমাদের ট্রেনই একমাত্র আলোর স্ফুলিঙ্গগতি। মাঝে মাঝে এককেটা স্টেশন সট সট করে বেরিয়ে যাচ্ছে, গুমগুম শব্দ ব্রিজের ওপর, ওপাশ দিয়ে ঝড়ের মতো আরেকটা ট্রেন বেরিয়ে গেল, আমাদের গাড়ি সেন্ট পিটার্সবার্গে গিয়েই থামবে। এমন সময় গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে এল। একটা নগণ্য স্টেশনের পাশে স্থির হয়ে দাঁড়াল সেই দুর্দান্ত মস্কো-পিটার্সবার্গ এক্সপ্রেস। একটু পরেই বুঝতে পারলাম যে পিছনে একটা ইঞ্জিন লাগল। গাড়িকে চড়াই ভাঙতে হবে। কিন্তু মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ তো আসানসোলের পরে বাংলাদেশের মতো। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা— পাহাড়ের ঔদ্ধত্য তো কোথাও নেই!

পরে রহস্যটা ভেদ করেছিলেন সেরজাই সিগাচিয়োভ, যিনি সাইবেরিয়া এবং বিশেষ করে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেল বিশেষজ্ঞ। ইনি এবং এঁর সহকারী ও দোভাষী ডিমিট্রি আমাদের সঙ্গে খাবারোভস্ক পর্যন্ত ছিলেন এবং বার কারে বেশ কটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়েছিলেন সাইবেরিয়া এবং ট্রান্স-সাইবেরিয়ান ট্রেন সম্বন্ধে। এঁরা বললেন যে ১৮৪০ সাল নাগাদ যখন সেন্ট পিটার্সবার্গ-মস্কো রেললাইনের পত্তন হল তখন রাশিয়ান রেলের কর্তারা লাইনের একটা ম্যাপ পাঠালেন জারের কাছে তাঁর অনুমোদনের জন্য। জার প্রথম নিকোলাস দেখলেন যে লোকগুলো কী বোকা। সটান সোজা না গিয়ে এক জায়গায় লুপের মতো ঘুরে গেছে। তিনি বাক্যব্যয় না করে একটি রুলার দিয়ে লুপের দুটো প্রান্ত সরলরেখায় জুড়ে দিলেন। কিন্তু ম্যাপে লুপটা যে করা হয়েছে একটা টিলা ঘুরে যাওয়ার জন্য তা দেখানো হয়নি। কিন্তু তখন জারকে সে কথা কে বলবে? কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে? রেলের কর্তারা ঠিক করলেন যে ওই টিলার ওপর দিয়েই সোজা পথে ট্রেন যাবে।

কেবল একটি অধিকন্তু ইঞ্জিনের প্রয়োজন হবে গাড়িটিকে টিলায় তুলতে এবং নামাতে।

খানা শেষ করে নিজের কামরায় এসে দেখি যে ইতিমধ্যে মাইকেল বা বোরিস বিছানা পেতে বালিশ সাজিয়ে জানলার পর্দা টেনে ঘরটিকে শয়নকক্ষ করে গেছে। পোশাক বদলাতে বদলাতে মাইকেল ছুটে এল, চা বা কফি চাই কিনা। আমাদের কিছু চাই না এখন। এক ঘুমে রাত কাবার। কাকভোরে ঘুম ভেঙে দেখি যে ট্রেন সেন্ট পিটার্সবার্গের এক বিষণ্ণ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশটা ঘোলা ঘোলা, টিপ টিপ বৃষ্টিতে ইলেক্ট্রিক আলোগুলো ভিজছে, স্টেশন জনশূন্য। আমাদের গাড়িতেই যা একটু নড়াচড়া। কামরায় কামরায় আলো জ্বলে উঠছে। খিদমদগাররা করিডরে আনাগোনা করছে চা কফির পাত্র নিয়ে। লন্ডন থেকে আমরা রওনা হয়েছি ৩১ আগস্ট। আজ ২ সেপ্টেম্বর। আজকের দিনরাত কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত সেন্ট পিটার্সবার্গে থাকা। হোটেলে রাত্রিযাপন। ৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় (ভ্রমণপঞ্জির চতুর্থ দিনে) আমাদের আসল যাত্রা হল শুরু। লক্ষ্য সূর্যোদয়ের ওপারের দেশ ব্লাডিভস্টক। ভ্রমণের দেবতা আমাদের সহায় হউন। আজ ঘড়ি একঘণ্টা এগিয়ে দিলাম।

৪ সেপ্টেম্বর, ভ্রমণের পঞ্চম দিন। সকালের আলোয় ঘুম ভেঙে গেল। জানলার পর্দা সরিয়ে দেখি যে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। চারদিকে মেঘে ঢাকা। ছাড়া ছাড়া জংলি গাছ। পাইনই বেশি। মাঝে মাঝে ফার এবং অন্য গাছও আছে। কেমন যেন শ্রীহীন বন্ধ্যা মাটি। প্রথম শরতের বিবর্ণ ঘাস। মাইকেলকে ডাকলাম। পুরু কাচের গ্লাসে গরম চা দিয়ে গেল। সঙ্গে লেবু এবং দুধ দুইই আছে আর চিনি। চা খেতে খেতে কালকের পুরনো কাগজটা ওল্টাচ্ছি। এরপরে নদিন আর কাগজ নেই। ট্রেনে কোনও নিউজ বুলেটিনও দেয় না। আমরা যেন পৃথিবীর বাইরে কোনও গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাচ্ছি। পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ শুধু স্টেশনে যখন থামব এবং ট্রেন কর্মীদের কারোর কাছে হয়তো একটা রেডিও টেলিফোন আছে।

ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে আসছে। একটা কোথাও থামল। পর্দা তুলে বৃষ্টিভেজা কাচের মধ্য দিয়ে দেখি নিতান্ত নগণ্য একটা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়েছে। সিরিলিক হরফে লেখা নাম। পাশের বার্থে গৃহিণী উশপাশ করছেন। মাইকেল চা দিয়ে গেল। ট্রেন কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছাড়ল। পাশের লাইনে বিরাট একটা মালগাড়ির খোলা ওয়াগনে মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি নীরবে ভিজছে। আমি জামাকাপড়, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নিয়ে স্নানের ঘরে গেলাম। তোয়ালে সাবান ওখানেই পাব। আজ সারাদিন গাড়িতেই থাকা হবে।

স্নানের ঘরে সুন্দর বন্দোবস্ত। ছটি কামরার কোনও না কোনওটি খালি থাকেই এবং প্রত্যেকবারই কোনও যাত্রীর ব্যবহারের পর কামরাটি ধুয়ে মুছে কাচা তোয়ালে, নতুন সাবান দেওয়া হয়। এরজন্য দুজন পরিচারক সর্বদা হাজির। ফিরে আসতে আসতে উনি তৈরি। হেলতে হেলতে টলতে টলতে খানা কামরা।

ব্রেকফাস্ট। এই সময়ে বৃদ্ধ মেরীকে আবার দেখলাম। ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন। এক বগি থেকে অন্য বগিতে যেতে যথেষ্ট সতর্ক সাবধানতা। কিন্তু কারোকে অবলম্বন করতে নারাজ। এত বয়সেও দীর্ঘাঙ্গী মহিলার ঋজু মেরুদণ্ড। লাঠির ওপর ভর দিয়ে হাসিমুখে সবাইকে রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছেন।

ব্রেকফাস্টের সময় কিছুটা তাৎকালিক গল্প হল। কে কেমন ঘুমিয়েছে। প্রথম রাতে অনেকের নানা অসুবিধা যেমন ট্রেনটা বড্ড বেশি নড়ে, চাকার আওয়াজ, কিন্তু কারোর মনে অসন্তুষ্টি নেই। ট্রেন চলেছে। বাইরের দৃশ্য একই রকম। বৈচিত্র্যহীন। সেই ছাড়া ছাড়া ডাঙা জমি, মাঝে মাঝে জঙ্গুলে গাছ, পাহাড় জঙ্গল ঝরনা, নদী কিছুই নেই। মানুষের তৈরি শুভ্র প্রাসাদ মিনার তাজ, শহর গ্রাম তাও নেই। এ সব জায়গায় মানুষের অবারিত আনাগোনা, বসবাস শুরু হয়েছে এই সেদিন ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ খোলার পরে। উরাল পাহাড় পৌঁছনো পর্যন্ত এরকমই চলবে। অবশ্য আজ বিকেলে ভল্গা নদীর ব্রিজ পেরোব। সে অপেক্ষায় সবাই উদগ্রীব হয়ে আছি। লেসলি আমাদের ইংরেজ গাইড একটা টাইম টেবিল দিয়ে গেল কিন্তু স্টেশনের নামগুলো সিরিলিক হরফে লেখা।

এগারোটার সময় আমরা মানে অর্ধেক যাত্রীরা বার কারে তামারার রাশিয়ান ক্লাসে গেলাম। বাকি অর্ধেক একই ক্লাস করবে বারোটায়। সব যাত্রীর একসঙ্গে স্থান সংকুলান হওয়া মুশকিল। তামারা আমাদের কয়েকটা অবশ্য প্রয়োজনীয় রাশিয়ান বাক্য শেখাল। ব্ল্যাকবোর্ডে সিরিলিক বর্ণমালার পাশাপাশি রোমান অক্ষর বসিয়ে দুটোতে তফাত বোঝাবার চেষ্টা করল। একজন জিজ্ঞাসা করল যে মস্কো সেন্ট পিটার্সবার্গ সব জায়গায় পথেঘাটে যে সাইনবোর্ডটি দেখা যায় Pectopah, তার মানে কী? তামারা বললে যে ওটা মোটেই পেক্টোপা নয়। সিরিলিক অক্ষরে লেখা কথাটায় যদি রোমান বর্ণমালার উচ্চারণ প্রয়োগ করা হয় তাহলে কথাটা হবে Restorahn মানে রেস্তোরাঁ। এই নিয়ে খুব খানিকটা হাসাহাসি হল।

সওয়া বারোটায় ট্রেন ভ্লাদিমির স্টেশনে থামল এবং আমাদের পনেরো মিনিটের জন্য প্ল্যাটফর্মে নেমে হাত পা ছাড়াবার অনুমতি পাওয়া গেল। ভ্লাদিমির মস্কোর চেয়েও পুরনো শহর। ১১০৮ সালে প্রিন্স ভ্লাদিমির— যিনি পরে ওই নামেই রাশিয়ার প্রথম সম্রাট 'জার' হন, শহরের ভিত্তিস্থাপনা করেন। এখানে বেশ কয়েকটি মধ্যযুগীয় গির্জা, পুরনো প্রাসাদ প্রভৃতি আছে, কিন্তু সে তুলনায় স্টেশনটা কিছু নয়। নিচু নিচু প্ল্যাটফর্ম যেটা ট্রান্স-সাইবেরিয়ানের প্রায় সর্বত্র, চটা ওঠা টিনের চাল। রংচটা দেওয়াল। স্টেশনে কয়েকটা স্টল। জিনিসপত্রে ঠাসা কিন্তু সবগুলোই বন্ধ। বোধহয় লাঞ্চ আওয়ার।

একটায় লাঞ্চ। তার আগে বার কারে একপাত্র ভদকা হল। বেশ ঝাল ঝাল ভদকা। চিলি ভদকা। এ যাত্রায় ভদকার নানা রূপ দেখলাম। ঝাল, টক, নেবুগন্ধী, স্মোকি। কামসকাটকাতে তৈরি এক বিশেষ ভদকা যা রঙে এবং স্বাদে ব্রান্ডির মতো। খানা কামরায় সাথী হলেন পিটার আর ক্যাথরিন টিমিন্স। বৃদ্ধ দম্পতি।

ইংরেজ। ভদ্রলোক নাক, কান গলার ডাক্তার। এখন অবসর নিয়েছেন। ট্রেন অনেকক্ষণ আগে চলতে শুরু করেছে কিন্তু দুপাশের দৃশ্যে বিশেষ কোনও পরিবর্তন নেই। ভ্লাদিমির শহর ছাড়িয়ে কিছুটা লোকালয় পাওয়া গিয়েছিল। সারবাঁধা এক কামরা দু কামরা কাঠের বাড়ি হলুদ নীল রং, রোদে-জলে মলিন, টালি বা টিনের চাল। সামনে এক টুকরো করে বাগান— ফুলের কেয়ারি। মাঝখানের জমিতে সারবাঁধা ফলের গাছ। আপেল, ন্যাসপাতি— লাল সাদায় মেশামেশি।

নিজনী নভ্র গোরড— যার সোভিয়েট নাম ছিল গোর্কি— স্টেশনে গাড়ি ১৫ মিনিটের জন্য দাঁড়াল। ম্যাড়মেড়ে বিবর্ণ স্টেশন, যেন ভ্লাদিমিরের আরেক ভাই। এখানে আর নামলাম না যদিও কলকারখানা বিশেষ করে হেভি ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে মস্কোর পরেই গোর্কির স্থান। প্রায় ষোল লক্ষ লোকের বাস। বিখ্যাত লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির জন্মস্থান বলে সোভিয়েত রাজ পুরনো নাম বদলে নতুন গোর্কি নাম রেখেছিল। স্টেশন ছেড়ে দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই ভল্গা নদীর ওপর বিরাট সেতু। গঙ্গার দেশের লোকের ভল্গা দর্শন হল। ইউরোপিয়ান রাশিয়ার প্রাণ প্রবাহিনী ভল্গা এখনও এই নদীর ওপর দিয়ে যাবার সময়ে পুরনোপন্থী রাশিয়ানরা টুপি খুলে নদীকে অভিবাদন করেন। ইউরোপের দীর্ঘতম নদী (৩,৫৩০ কিলোমিটার) ভল্গা এখানে কমবেশি এক কিলোমিটারের মতো চওড়া, কিন্তু নদীর দুধারে ডক এবং কলকারখানায় ভর্তি। অনেকটা কলকাতার গঙ্গার মতো।

বিকেল পাঁচটায় বার কারে আমাদের ঐতিহাসিক গাইড সেরগাই সিগাচিয়োভ ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলের ওপর তাঁর প্রথম বক্তৃতাটি দিলেন। সারা রাস্তায় তিনি এরকম কয়েকটি ভাষণ দিয়েছিলেন কিন্তু মুশকিল ছিল যে উনি ইংরিজি জানেন না। উনি রাশিয়ান ভাষায় বললেন এবং তামারা থেমে থেমে সেগুলি ইংরিজি অনুবাদ করল, ফলে বক্তব্য বিষয়ের যথেষ্ট রসহানি নিশ্চয় হয়েছিল। তবু যেটুকু শুনলাম এবং এখানে ওখানে যা পড়লাম তার একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব এখানে দিয়ে রাখি।

সাইবেরিয়া কথাটি এসেছে তাতার শব্দ সিবির থেকে যার মানে ঘুমন্ত দেশ। উরাল পাহাড় থেকে প্যাসিফিক পর্যন্ত ৭,০০০ কিলোমিটারের বিস্তৃতি, প্রস্থে আর্কটিক থেকে মঙ্গোলিয়া ৩,৫০০ কিলোমিটার। রাশিয়ার তিন-চতুর্থাংশ স্থলভূমি জুড়ে সাইবেরিয়া ১৩০ লক্ষ স্কোয়্যার কিলোমিটারের আয়তন, লোকসংখ্যা কুল্লে ৩৩০ লক্ষ। বেশিরভাগ লোকেরই বসবাস ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ ঘেঁসে।

সাইবেরিয়ার ভেতর দিয়ে রাশিয়ার পূর্ব উপকূল পর্যন্ত একটা রেলপথের কথা ১৯ শতকের মাঝামাঝি থেকেই চলছিল। জল্পনাকে রূপ দিলেন জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ১৮৮৬ সালে। তাঁর আদেশে রেলপথ তৈরি শুরু হল ১৮৯১ সালে। কাজ তাড়াতাড়ি করার জন্য সমস্ত পথটি কয়েক ভাগে ভাগ করে নেওয়া হল এবং প্রত্যেক ভাগের কাজ একই সঙ্গে চলতে লাগল, যাতে এক সময়ে সব ভাগগুলি জুড়ে ট্রেন এই সুদীর্ঘ পথের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত চলতে পারে।

১৯০০ সালে মস্কো থেকে ব্লাডিভস্টক পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হল কিন্তু সে ট্রেন মস্কো থেকে আসত পোর্ট বৈকালে। এখানে যাত্রীরা ট্রেন ছেড়ে স্টিমারে উঠে বৈকাল হ্রদ পেরিয়ে মায়াসোভনা বন্দরে আসতেন। সেখান থেকে আবার ট্রেনে ব্লাডিভস্টক। একবার শীতকালে বৈকালের জমাট বরফের ওপর লাইন পেতে পুরো ট্রেনটাকে ওপারে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু মাঝপথে বরফ ভেঙে পুরো ট্রেনটা বৈকালের জলে তলিয়ে যায়। অবশ্য এ ট্রেন পরীক্ষামূলক বলে এতে কোনও যাত্রী ছিল না, কয়েকজন ইঞ্জিনচালক ফায়ারম্যান ছাড়া। লোকে বলে যে সে ট্রেন এখনও নাকি হ্রদের তলায় পড়ে আছে। ফেরির ঝামেলা এড়াবার জন্য ১৯০১ সালে বৈকাল হ্রদ ঘুরে লাইন পাতা শুরু হয়। ১৯০৪ সালে সেই লাইন দিয়ে ট্রেন মস্কো থেকে সোজা ব্লাডিভস্টক পৌঁছল।

সন্ধেবেলা বারে বসে কিছুক্ষণ গল্পগুজব। ডিনার। তারপরে নিজের কামরায় এসে রাতের ঘুম। আজকের ঘুম প্রথম দিনের চেয়ে অনেক ভালো হল।

৫ সেপ্টেম্বর, ষষ্ঠদিন। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি বাইরের দৃশ্য বদলে গেছে। এখন আর সেই বিবর্ণ বন্ধ্যাভূমি নয়। ট্রেনের সঙ্গে সমানে চলেছে বেশ চওড়া একটা নদী। দূরে দূরে পাহাড়ের আভাস। বুঝলাম আমরা উরাল পর্বতশ্রেণীর কাছাকাছি এসে পড়েছি। নদীর নাম চেপ্টসা। এখানে ২৫০ কিলোমিটার নদীটি ট্রেনের পাশে পাশে থাকে। অথবা বলতে পারেন যে নদীর অববাহিকা ধরে রেলের লাইন পাতা হয়েছে। একটু পরেই চেপ্টসা স্টেশন। গাড়ি থামে না। এখানে ব্রিজের ওপর দিয়ে নদী পার হলাম। নদী লাইনের বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে এল। ছোট ছোট চাষির কুঁড়ে। কাঠের বাড়ি। টিনের চাল। বাড়ির সামনে বাগান। শস্যখেত। এখন ফসল উঠে গেছে। জায়গায় জায়গায় কাঠের খুঁটি ঘিরে স্তূপ করে রাখা খড়। আরেকটা স্টেশন গেল চেইকোভোস্কায়া, বিখ্যাত রাশিয়ান কমপোসার চেইকোভোসকির নামে স্টেশনের নাম। তিনি এই স্টেশন থেকে ১৮০ কিলোমিটার দূরে কোনও গ্রামে জন্মেছিলেন।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে পার্ম এসে গেল। উরাল পাহাড়ের তলায় মস্ত শহর। লোকসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। ইন্ডাস্ট্রিয়াল শহর। কলকারখানা ধুলো ধোঁয়া। আমরা অবশ্য এসব কিছুই দেখিনি। আমরা দেখলাম দুটি স্টেশন— পার্ম (১) আর পার্ম (২)-এর মাঝখানে ৩-৪ কিলোমিটার লম্বা বিশাল রেলওয়ে ইয়ার্ড। অনেকটা লিলুয়া থেকে হাওড়ার মতো। ইয়ার্ডের ওপর দিয়ে লোক চলাচলও রয়েছে। এক ছোকরা সিগারেট ধরিয়ে ট্রেনটা বেরিয়ে যাবার অপেক্ষা করছে। দুটো বাচ্চা— ভাই বোন হবে, পিঠে স্কুলের বোঁচকা বেঁধে লাইন ধরে লাফাতে লাফাতে যাচ্ছে, পিছনে ওদের মা হবে। দুনম্বর পার্ম স্টেশন ছাড়িয়ে কিছুটা গেলেই কামা নদীর ওপর এক কিলোমিটার লম্বা ব্রিজ। শহর তারপরেও চলছে কিন্তু অতটা বুক চাপা নয়। বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে মাঠ, গাছ, ছোট ছোট পুকুর দেখতে পাওয়া যায়। এক জায়গায় একজন লোক নিবিষ্ট মনে মাছ ধরছে। গাড়ি ক্রমশ ওপরে উঠতে শুরু

করেছে। গতি মন্থর হয়ে এল।

উরাল পর্বতশ্রেণী ইউরোপ আর এশিয়ার সীমানা। নিচু পাহাড়। লম্বায় ২,০০০ কিলোমিটার হলেও সর্বোচ্চ শিখর মোটে ১,৯০০ মিটার। আমাদের ট্রেন যেখান দিয়ে উরাল পার হল সেখানে উচ্চতা ৫০০ মিটারের মতো। পাহাড় যেমন তেমন হলেও এর খনিজ সম্পদ প্রচুর। সোনাও পাওয়া যায়। একটা ছোট্ট স্টেশন গেল। কডন। লাল উইন্ডচিটার পরে একটা লোক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ট্রেন দেখছে। আমাদের বলে দেওয়া হয়েছিল যে ১,৭৭৭ কিলোমিটারের মাথায় রাস্তার ধারে একটা ওবেলিসক ইউরোপ এশিয়ার সঠিক সীমানা নির্দেশ করবে। তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে আমরা সবাই করিডরে লাইন দিলাম ওবেলিসক দেখব বলে। মনে ভয় যদি ঠিক ওই সময়ে উল্টোদিক থেকে একটা ট্রেন এসে পড়ে তাহলে ওবেলিসক দেখা হবে না। যা হোক আমাদের ভয় অমূলক প্রমাণ করে যথা সময়ে ওবেলিসক এল। ইউরোপ থেকে এশিয়ায় ঢুকলাম। এখান থেকে সোজা দক্ষিণদিকে যদি একটা সরলরেখা টানা যায় তো সে রেখা ইরান আফগানিস্তানের সীমানা বরাবর পৌঁছবে। ওবেলিসক কিন্তু নিতান্ত সাধারণ। রেললাইন থেকে ৫০ মিটারের মতো দূরে ১৫-২০ ফুট উঁচু স্তম্ভ। সিমেন্টের গাঁথুনি মনে হল।

উরাল থেকে দুদিকের দৃশ্য বদলে গেল। গভীর জঙ্গল। প্রধানত পাইন, কিছু বার্চ, আসপেন, ম্যাপল প্রভৃতি অন্যান্য গাছও আছে। রাশিয়ানরা এ জঙ্গলকে বলে টায়গা এবং ২ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত এ জঙ্গল চলবে। পৃথিবীর সমস্ত গাছের এক-তৃতীয়াংশ এই টায়গার বাসিন্দা। প্রায় দুহাজার কিলোমিটার সমতলের পরে পাহাড়, জঙ্গল, ঝরনা, নদীর দৃশ্য বড় মনোরম লাগল। তখন আবার গাছের রং বদলাচ্ছে। সবুজ, সোনালি, ম্যাজেন্টা পাহাড়ের গায়ে কত রঙের বাহার।

বিকেল চারটে নাগাদ ইয়েকেটারিনাবার্গ। আরেকটি শিল্পকেন্দ্রিক শহর। লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ। এখানে আমরা সবাই ট্রেন থেকে নামলাম। বিরাট স্টেশন সৌধ। পাঁশুটে প্রায় সাদা দেওয়ালের সামনে মোটা মোটা থাম উঠে গেছে। স্টেশনের ভেতরটা মেরামতের অভাবে জীর্ণ। চটা ওঠা দেওয়াল মেঝে। স্টেশনের বিপর্যয় ভিড় কাটিয়ে আমাদের বাসে তোলা হল। ইয়েকটারিনাবার্গেই রাশিয়ার শেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাস এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের হত্যা করা হয়েছিল ১৯১৮ সালের ১৬ জুলাই। যে বাড়িতে তাঁরা আবদ্ধ ছিলেন এবং হত্যার পরে যে কুয়োর ভেতর তাঁদের মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়েছিল সে সবের কিছুই নেই। পরবর্তী সোভিয়েত নেতা ইয়েলৎসিনের আদেশে জার হত্যার সমস্তরকম নিদর্শন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইয়েলৎসিনের জন্মও এই শহরে। তিনি জন্মভূমির কলঙ্ক দূর করলেন। তবু আমাদের বাসে করে সেই জায়গাটি দেখানো হল, এখন যেখানে ক্ষুদ্র একটি উদ্যানের পাশে একটি ছোট্ট গির্জা। কয়েক বছর আগে নতুন রাশিয়ান জমানায় হতভাগ্য জার এবং তাঁর পরিবারবর্গের অস্থি এখান থেকে সেন্ট

পিটার্সবার্গ নিয়ে গিয়ে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে সমাহিত করা হয়েছে। সাড়ে সাতটার সময় ট্রেনে ফিরে আহার ও নিদ্রা।

৬ সেপ্টেম্বর, সপ্তম দিন। সকালে উঠে দেখি গাড়ি সমানে চলছে। রাতে আমরা উরাল পাহাড় থেকে নেমে এসেছি। এখন আবার সেই পুরনো গাছের সারি, মাঝে মাঝে ফসল তোলা চযাখেত। কাঠের বাড়ি টিনের চাল! এক জায়গায় মস্ত একটা চারকোনা পুকুর। একপাশে একটা মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে। লোকজন নেই বললেই চলে। কিলোমিটার পোস্ট দেখলাম ২,৬৭২। ২,৮০৬-এ আসবে ইরটিস নদী, ৩,০০০ কিলোমিটার লম্বা নদীটা চিন থেকে বেরিয়ে রাশিয়ার উত্তরবাহিনী ওব নদীতে মিশেছে। তারপরেই ওমস্ক, সাইবেরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। সেখানে গাড়ি দশ মিনিট থামবে। তাড়াতাড়ি স্নান করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে তৈরি হলাম। তবে সাইবেরিয়ার শহর বলতেই কলকারখানা-শিল্পকেন্দ্রিক শহরের শ্রীহীন বিরাট বিরাট অট্টালিকা। হবে না কেন? শিল্পপ্রসারের জন্যই এসব শহর তৈরি হয়েছিল। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বহু বড় বড় কারখানা পশ্চিম রাশিয়া থেকে এইসব দুর্গম অঞ্চলে সরিয়ে আনা হয়েছিল যাতে করে শত্রুর বিমান আক্রমণে এগুলো ধ্বংস না হয়।

ওমস্কের পরে শুরু হল কুখ্যাত বারবারা স্টেপিস। ছশো কিলোমিটার পর্যন্ত চলবে এই জলাজমি। কোথাও ঘাসের চাপড়া, কোথাও বা নলখাগড়ার বন। জমাট মাটিও আছে, তবে কম। সেখানেও ঘাস। কখনও কখনও একটা একানে গাছ। ট্রেন থেকে মনে হয় দূরে যেন একটা গভীর জঙ্গলের রেখা। লেসলি বললে যে ওটা মোটেই জঙ্গল নয়। এই রকমই জলাজমি, কেবল দূরের একানে গাছগুলোকে গাছের সারি বলে মনে হয়। বারাবিনসক স্টেশনে (৩,০৪০ কিলোমিটার) গাড়ি দাঁড়াল। স্টেশনে বেশ লোক। ওদিকের প্ল্যাটফর্মে আরেকটা ট্রেন দাঁড়িয়েছে। বহু ফিরিওয়ালা। পুরুষ মেয়ে দুইই। জামাকাপড়, শীতবস্ত্র, লোমের পোশাক, ফারক্যাপ থেকে শুরু করে নানারকম খাবার জিনিস, ভাজা বা স্মোকড মাছ, সসেজ, প্যানকেক বিক্রি হচ্ছে। আমাদের ট্রেনের কেউ কিছু কিনল না বটে কিন্তু অন্য ট্রেনের রাশিয়ান যাত্রীরা টপাটপ জিনিস কিনছে খাচ্ছে, পোশাক তুলে তার দরদাম করছে। আমি স্টেশনের স্টল থেকে দুবোতল বিয়ার কিনলাম। ট্রেনে বসে খাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে জানলাম যে রাশিয়ার সর্বত্র অঢেল ভদকা পাওয়া গেলেও, রেলস্টেশনে বিয়ারের চেয়ে কড়া কোনও ড্রিংক পাওয়া যায় না।

সন্ধ্যার ঝোঁকে ওব নদীর বিশাল ব্রিজ পেরিয়ে নভোসিবিরিসক স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াল। ওব ৪,০০০ কিলোমিটার লম্বা বিরাট নদী। চিনের আলতাই পাহাড় থেকে নেমে আর্কটিক সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। নভোসিবিরিসক পশ্চিম সাইবেরিয়ার রাজধানী এবং সাইবেরিয়ার বৃহত্তম নগর। লোকসংখ্যা ১৬ লক্ষ। এখানে আমাদের নামিয়ে শহরে নিয়ে যাওয়া হল। নীল সবুজ কাচের সিলিংয়ের তলায় ঝলমলে স্টেশন। বাইরে গিয়ে দেখলাম সমস্ত স্টেশনটি একটা বিরাট রেল

ইঞ্জিনের আকারে তৈরি। আধুনিককালের শহর। চওড়া রাস্তা। সার বাঁধা ঋজু অট্টালিকা। শহরের মাঝখানে লেনিন স্কোয়্যার। মস্ত বড় পার্ক। তারমধ্যে ওয়্যার মেমোরিয়াল। মেমোরিয়ালের বিশেষত্ব এই যে এখানে যুদ্ধকে বিজয় অভিযান বা দেশপ্রেমের নিদর্শন বলে দেখানো হচ্ছে না। মেমোরিয়ালের প্রতীক সৈনিকেরা মর্মর মূর্তিটি দৃপ্তভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে নেই। মূর্তির পরনে পুরো সামরিক পোশাক। হাতে বন্দুক কিন্তু সে মাথার টুপি মাটিতে রেখে, মাথা পিছনে হেলিয়ে বসে আছে। ক্লান্ত বড় ক্লান্ত। বিরাট অপেরা হাউসের পাশ দিয়ে আমাদের বাস গেল। একসঙ্গে ৫,০০০ লোক বসতে পারে। ওব নদীতে আমাদের দলকে স্টিমারে করে ঘুরিয়ে আনা হল। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। স্টিমারঘাটায় কয়েকটি রেস্টুরেন্ট। আলো, গান, বাজনা, স্থানীয় লোকেদের আনাগোনা। নদীর বুকে আলো নেই কিন্তু দুপারের আলোয় যা দেখলাম তাতে মনে হল এটা ডক এরিয়া। নদীযাত্রার পর শহরের এক রেস্টুরেন্টে নৈশাহার। চার-পাঁচতলা বিরাট রেস্টুরেন্ট। পুরো কাঠের তৈরি। মেঝেতে, সিঁড়িতে কার্পেট। দেওয়ালে বিভিন্ন পশুচর্ম টাঙানো। ওদেশি খাওয়া। মোটামুটি ভালো। গাড়িতে ফিরতে রাত এগারোটা বাজল।

৭ সেপ্টেম্বর সকালে উঠে দেখি দৃশ্য বদলেছে। দূরে দূরে নিচু পাহাড়। গাড়ি যাচ্ছেও ছোট ছোট টিলার পাশ দিয়ে। টিলা ঘিরে ঘন গাছের বাহার। এখানে বার্চই বেশি। মাইকেল চা দিয়ে গেল। কাচের গ্লাসে। গ্লাসগুলো সাদা ধাতব ফ্রেমের মধ্যে বসানো। এখানে চা দেওয়ার রীতিই এই। বেশ ভালো চা। ব্রেকফাস্টের পরে নিজের কামরায় ফিরে এসে বই পড়ছি। আজ সারা দিনরাত গাড়ি চলবে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখি। একটা ছোট্ট স্টেশন গেল। তারপর সুন্দর একটা কটেজ। লাল দেওয়াল। সবুজ ছাদ। পাহাড়গুলো যেন কাছে এগিয়ে আসছে। গাছগুলোতে শরতের রং— হলুদ, কমলা, লাল। পাতার ওপর আবির খেলা করেছে কেউ। অনেকটা তৃণভূমি। সেখানে গরু চরছে কিন্তু মানুষগুলো কোথায়! ওদের বাড়িগুলো কি গাছের আড়ালে? লাঞ্চের সময় এল। বাইরে মাইলপোস্টে দেখলাম ৪৪,০১৪ কিলোমিটার। এখনও অর্ধেক রাস্তা আসিনি।

লাঞ্চের পরে ক্র্যাসনোইয়ারসক। ওয়েস্টার্ন সাইবেরিয়ার শেষ শহর। এখানে ট্রেন কয়েক মিনিটের জন্য থামল কিন্তু স্টেশনে নামা হয়নি। স্টেশন ছেড়ে ইয়েনেসি নদীর ওপর এক কিলোমিটার লম্বা ব্রিজ। বিরাট নদী, দৈর্ঘ্য ৫,২০০ কিলোমিটার। এখানকার অন্যান্য নদীর মতো দক্ষিণে মঙ্গোলিয়া থেকে বেরিয়ে আর্কটিক সমুদ্রে পড়েছে। আমরা এখন মোটামুটি বর্মার ওপর দিয়ে যাচ্ছি। ইয়েনেসি পেরিয়ে আমরা পূর্ব সাইবেরিয়ায় ঢুকলাম। সন্ধেবেলা কানসক শহরে গাড়ি আবার থামল। এই স্টেশনে প্রথম দেখলাম মঙ্গোলিয়ান ফেরিয়ালারা নানারকম চিনের জিনিস বিক্রি করছে। পোশাক পরিচ্ছদ, স্যুটকেশ, প্লাস্টিক ইত্যাদি। হঠাৎ এত চিনে চেহারা কোথা থেকে এল জিজ্ঞাসা করায় তামারা বলল, এরা রাশিয়ান সীমানার মধ্যেই ব্যুরিয়াট অন্তঃরাষ্ট্রের লোক। রাশিয়ার বিরাট

বিস্তৃতির মধ্যে এমন বেশ কয়েকটা অন্তঃরাষ্ট্র রয়েছে, যাদের কিছুটা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আছে। ব্যুরিয়াটরা বহুকাল আগে মঙ্গোলিয়া থেকে সাইবেরিয়ায় এসে বাসা বেঁধেছিল। এখন রাশিয়ান প্রজা হলেও চিনের সঙ্গে ওদের নাড়ির টান বেশি।

৮ সেপ্টেম্বর সকালে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দেওয়া হল। কারণ নটার সময় ট্রেন ইরখুটস্ক (৫,১৮৫ কিলোমিটার) পৌঁছবে। সেখানে সারাদিনের প্রোগ্রাম। ইরখুটস্ক সাইবেরিয়ার সবচেয়ে নামী শহর এবং এক সময়ে সারা সাইবেরিয়ার রাজধানী ছিল। সেই সূত্রে জারের অসন্তুষ্টি ভাজনের জন্য রাশিয়ান অভিজাত বংশীয়দের এখানে নির্বাসনে পাঠানো হত। এঁদের অবশ্য সাধারণ কয়েদিদের মতো পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখা হত না। দেশে ফেরবার অনুমতি না থাকলেও এঁরা সাইবেরিয়ায় নিজেদের পয়সায় যথেষ্ট আরাম এবং বিলাসের জীবন কাটাতেন। এঁদের হাতে ইরখুটস্কের এমন উন্নতি হয়েছিল যে উনিশ শতকের শেষের দিকে ইরখুটস্ককে পূর্ব দেশের প্যারিস বলা হত। ১৮২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর সেন্ট পিটার্সবার্গে জার প্রথম নিকোলাসের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ হয়। এর হোতা রাশিয়ার অভিজাতবংশীয়েরা এবং রাজকুলের একটা অংশ। এঁদের বলা হয় ডিসেম্বরিস্ট। বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার ফলে এঁদের কয়েকজনের প্রাণদণ্ড হয় এবং বাকিদের ইরখুটস্কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এঁদের কথায় পরে ফিরে আসব।

দুটো বাস ভর্তি করে আমরা শহর দেখতে বেরলাম। কিন্তু সে ইরখুটস্ক আর নেই। পুরনো দিনের কাঠের বাড়িগুলো রং চটা, মেরামতের অভাবে কাঠ ঝুলে পড়ছে। এখনকার বাড়িগুলো সাইবেরিয়ার অন্য জায়গায় যেমন সার বাঁধা এক ধরনের অট্টালিকা। জায়গায় জায়গায় আমাদের নামানো হল। ওয়্যার মেমোরিয়াল। গোটা দুই ক্যাথিড্রাল। ওর মধ্যে সবুজ ডোম দেওয়া একটা সুদৃশ্য গির্জা। এরপর ইনট্যুরিস্ট পাঁচতারা হোটেলে কফি খেতে নিয়ে যাওয়া হল। দুয়েকটা স্যুভেনির কিনলাম। কফির পরে ব্যুরিটা মিউজিয়াম। ব্যুরিয়াটদের সম্বন্ধে নানা কথা। ওদের তৈরি গয়না পোশাক। একটার সময় স্থানীয় রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ। খাওয়া ভালোই হল।

লাঞ্চের পরে ডিসেম্বরিস্টদের পুরনো বাড়িগুলি দেখতে গেলাম। বিরাট এক কম্পাউন্ডের মধ্যে পর পর কয়েকটি কাঠের অট্টালিকা। প্রথমটিতে থাকতেন ট্রুবেটস্কিয়া স্বামী-স্ত্রী। ওঁদের বাড়িটি এখনও সেই সময়ের মতো সাজানো। তখনকার দিনের খাট-পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, বিছানার সঙ্গে পরিচয় হল। অন্য বাড়িটিকে বলে মেরিয়া ভলকনসকির বাড়ি। মেরিয়ার স্বামী এখানে নির্বাসিত হবার পরে মেরিয়া স্বামীর সঙ্গে স্বেচ্ছানির্বাসন মেনে নেন। এই বাড়ি সে সময় নির্বাসিত ডিসেম্বরিস্টদের আড্ডা ছিল। এই বাড়ির একটি হলে আমাদের জন্য একঘণ্টার একটি সঙ্গীত বৈঠক হল। বিলাতি সঙ্গীত এবং বাদ্যের সঙ্গে সবিশেষ

পরিচয় না থাকলেও বুঝলাম যে অনুষ্ঠানটি বেশ উঁচুদরের, বিশেষ করে এক সুরূপা মহিলার আশ্চর্য কণ্ঠস্বর এবং পিয়ানো ভায়োলিনের এক যুগলবন্দী। অনুষ্ঠান শেষে দর্শকদের শ্যাম্পেন দেওয়া হল। পানীয় পরিবেশকের মাথার উইগ থেকে পোশাক, পায়ের জুতো পর্যন্ত সব সেই সময়ের মতো। উনিশ শতকের গোড়ার দিক।

ইরখুটস্কের বাজারটি জমজমাট। একটা পুরো ব্লক জুড়ে পাঁচতলা বাড়ি। নীচের দুটো তলা নিয়ে বাজার-দোকান। ওপরের তলায় অফিস, ফ্ল্যাট সবই আছে। বিরাট বাজার নানা অংশে ভাগ করা। একেক অংশে একেক রকমের জিনিস। চামড়ার জিনিস, পোশাক-আশাক, বাসনকোসন, চিনামাটি, টিনড গুডস আরও কত কী। সবচেয়ে প্রাণবন্ত কাঁচাবাজার, মাছ-মাংসের স্টলগুলি। প্রাণবন্ত বটে তবে আমাদের বাজারের মতো চেঁচামেচি নেই। মেঝেগুলো পরিষ্কার। কাদাজলে ভেজা নয়। ফলের দোকানে সব পসারিনী। দাঁড়িয়ে তাদের রংবেরঙের জামাকাপড় দেখছি, একজন চেঁচিয়ে উঠল, ইন্ডিয়ান? ইন্ডিয়ান? আমরা হ্যাঁ বলাতে ও নিজেকে দেখিয়ে বলল, তাসখন্দ। এরা সব উজবেকি মুসলমান। ইরখুটস্কের বাজারে কাঁচা সবজি, ফলপাকুড় আসে চিন বা উজবেকিস্তান থেকে। সবই দেশি ফল। আম, আনারস, পেঁপে, কলা আবার আপেল, বেদানাও আছে। হঠাৎ চোখ পড়ল একটা টুকরিতে আমাদের চিরপরিচিত ধনেপাতা। এবার ট্রেনে ফিরে যাওয়া। রাস্তায় কয়েকটা আগেকার দিনের কাঠের বাড়ি। এখনও লোক বসবাস করে। সন্ধ্যা হয়ে এল। টিপ টিপ বৃষ্টি। ভিজে রাস্তা। কোথাও কোথাও জল জমে কাদা। একশো বছর আগে জারিস্ট রাশিয়ার সে সাজানো গোছানো ইরখুটস্ক আধুনিক রাশিয়ায় হারিয়ে গেছে।

ট্রেন ছেড়ে দিল। এবার সারা ট্রেন জুড়ে একটা চাপা উত্তেজনা। কারণ আর দুঘণ্টার মধ্যে আমরা পোর্ট বৈকাল পৌঁছব। সেই অনেক শোনা, অনেক স্বপ্নে দেখা বৈকাল হ্রদ। কিন্তু সে রাতে বৈকালের দেখা পাওয়া গেল না। রাস্তায় ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেল। ইরখুটস্ক থেকে অন্য ইঞ্জিন এসে গাড়ি চালু করতে করতে প্রায় সকাল। রাতে দেরি করে শোওয়ার ফলে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালের আলোয় দেখি গাড়ি চলছে। ওপরে নীল আকাশ আর নীচে নীল জল, যে জল কূলের কাছে এসে গভীর হতে হতে প্রায় কালো জল। দূরে জল ঘিরে নিচু পাহাড়ের ঘের। বৈকাল হ্রদ। কতদিনের কত স্বপ্নের নাম। আজ চোখের সামনে।

কয়েকদিন আগে এক সহযাত্রী আমেরিকানকে প্রশ্ন করেছিলাম যে এত জায়গা থাকতে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান কেন এলে? এককথায় ওর জবাব, বৈকাল। বুঝলাম যে একা আমি নয়। আমার মতো বহু লোক পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে বৈকালের কুহকে মুগ্ধ হয়ে ছুটে আসে। কিন্তু কী সে কুহক? প্রথম এবং প্রধান কথা হল বৈকালের দূরত্ব। পৃথিবীর বৃহত্তম স্থলভাগের কোনও প্রত্যন্ত প্রদেশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বিরাট এই ৩১৫ মাইল লম্বা এই হ্রদ যা চওড়াতে ৫০ মাইল পর্যন্ত আছে। তার

কূলে কূলে টলমল করছে মিষ্টি জল। সাধে কী আর বৈকালকে সাইবেরিয়ার মুক্তবিন্দু বলা হয়।

হ্রদের ধারে ট্রেন চলেছে। অন্যদিকে পাহাড়ের বেড়া। প্রায়শই সে বেড়া হ্রদের ওপর উপচে পড়েছে। সেখানে টানেল। ছোট বড় নানা রকমের। রোদ না থাকলেও আকাশ পরিষ্কার। হ্রদে ছোট ছোট নৌকো ভাসছে। জেলেদের নৌকো। দুয়েকটা মোটর লঞ্চও আছে। রেললাইন আর হ্রদের মাঝখানে অল্প একটু জায়গা। সেখানে জেলেদের এক কামরা দুকামরা বাড়ি। বাইরে জাল শুকোচ্ছে। করিডরে দাঁড়িয়ে হ্রদ দেখছি। লেসলি এসে বললে যে একটু পরে হ্রদের ধারে একটা ছোট্ট বেলাভূমি দেখবেন। ওইখানে আমাদের বারবিকিউ হবে যদি তখনও আকাশ পরিষ্কার থাকে। এখন বেলা দশটা। আরও এক ঘণ্টা আমাদের গাড়ি বৈকালের ধারে চলে আবার এখানেই ফিরে আসবে। আপনারা যাঁরা বৈকালের জলে ডুব দিতে চান তাঁরা সাঁতারের পোশাক তোয়ালে নিয়ে নামবেন। এক ঘণ্টা পরে গাড়ি যখন ঘুরল তখন ইঞ্জিন ড্রাইভাররা বলে পাঠাল যে জনাপ্রতি দু-ডলার করে দিলে ওরা আমাদের ইঞ্জিনের সামনে চড়তে দেবে। গৃহিণীর ইঞ্জিন চড়ার শখ নেই কিন্তু আমি সবেতেই রাজি। ব্যস আমরা দশজন গিয়ে ইঞ্জিনের সামনে পাটাতনটায় দাঁড়ালাম। দুটো বিরাট কুকি দিয়ে ট্রেন ধীরগতি চলতে শুরু করল।

জানলার বেড়া দিয়ে এতক্ষণ আমরা কেবল একটা কিনারা দেখছিলাম। এমন মুক্তদৃষ্টিতে সমস্ত বিস্তৃতিটা পাহাড়, জল, আকাশ একসঙ্গে চোখে পড়ল প্রায় বিশ্বরূপ দর্শনের মতো। লেকের দুদিক ঘিরে সবুজ পাহাড়, যার গায়ে জায়গায় জায়গায় ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের মতো জলধারা। এই রকম ৩৩৬টি ছোট বড় ঝরনা এবং নদী বৈকালের আগম প্রবাহ। নিগম কিন্তু একটি। বেশ চওড়া নদী এঙ্গারা। লেসলি আমাদের সঙ্গে ছিল। বললে যে এঙ্গারা নদীর মোহনা খুব কাছে এবং বিকেলে আমরা স্টিমারে ওই নদী পেরিয়ে ওপারে লিস্টভিয়াংকা গ্রাম দেখতে যাব। এই সূত্রে লেসলি এদেশে প্রচলিত একটা রূপকথা বলেছিল। ওই ৩৩৬টি প্রবাহ হল বৈকালের ৩৩৬টি পুত্রসন্তান। কিন্তু কন্যা মাত্র একটি এঙ্গারা। বৈকাল মেয়ের জন্য যে পাত্র ঠিক করেছিল, এঙ্গারার তাকে পছন্দ হল না। সে বিয়ে করতে চায় মহানদ ইয়েনেসিকে। বৈকাল রেগেমেগে মেয়েকে তালা বন্ধ করে রেখে দিল কিন্তু এক ঝড়ের রাতে সে তালা ভেঙে মেয়ে তার প্রিয়তমের কাছে পালাল। নিষ্ফল ক্ষোভে বৈকাল মেয়েকে একটা আস্ত পাহাড় ছুড়ে মেরেছিল। কিন্তু মেয়ে ততক্ষণে পগারপার। গল্পটা যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে বৈকালের ধারে লিস্টভিয়াংকা গ্রামে যান। সেখানকার লোকেরা যত্ন করে আপনাকে বৈকালের ছুড়ে দেওয়া জলমগ্ন পাহাড়ের চুড়োটা দেখাবে। ওর নাম হল শাথান পাহাড়।

সামনে একটা টানেলের মুখ দেখা যাচ্ছে। তার আগেই ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল। লেসলি বলল, ডানদিকে চেয়ে দেখ। দেখি যে প্রায় ২০০ ফুট পাহাড়ের নীচে হ্রদের

ধারে সরু একফালি বেলাভূমি। সেখানে বেশ কিছু লোকজন। যেন কোনও উৎসবের আয়োজন হচ্ছে। লেসলি বললে যে ওসবই ওদের লোক। আমাদের জন্য বারবিকিউ লাঞ্চের বন্দোবস্ত করছে। এবং আমরা যারা খাবার আগে বৈকালের জলে ডুব দিতে চাই তারা যেন তৈরি হয়ে নামে। কী করি? তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তা বলে বৈকালের এত কাছে এসে শুকনো ফিরে যাব। ধুত্তোর বলে, নিজের কামরায় ফিরে গিয়ে গরম জামা কাপড়ের তলায় সুইমিং কস্টিউম পরে নিলাম আর কাঁধে চাপালাম একটা তোয়ালে। গৃহিণী জলে নামতে রাজি হলেন না তবে ক্যামেরা নিয়ে সঙ্গে চললেন। ট্রেন থেকে নেমে দেখি ট্রেনের সব যাত্রী মায় কর্মচারীরা পর্যন্ত পিঁপড়ের সারের মতো লেকের কানা বেয়ে নামছে। কয়েকজনের হাতে তোয়ালেও দেখলাম। যাক আমি একা নই।

নীচে পৌঁছে দেখি এলাহি ব্যাপার। চার-পাঁচটা বড় বড় চারকোনা উনুনের ওপর কাঠ কয়লার আগুনে শিকের প্রস্তুতি চলছে। প্রত্যেকে উনুনের পাশে নানারকম মাংস, সসেজ এবং কাঁচা আনাজের স্তূপ। যাত্রীরা জড়ো হলেই গরম গরম পরিবেশন হবে। অন্য একটা লম্বা টেবিলের ওপর পানীয়। ভদকা, বিয়ার, কোকাকোলা, লেমোনেড যে যা চায়। আমরা যে কজন স্নান করব ইতিমধ্যে অঙ্গবস্ত্র ত্যাগ করে সুইমিং কস্টিউম পরে এসে দাঁড়ালাম। কী ঠান্ডা রে বাবা। তবু তো এখনও কাঁধে তোয়ালে আছে। হাত-পা কালিয়ে যাচ্ছে যে। পালাব না কি? কিন্তু ততক্ষণে সমবেত জনতার হাতে তালি পড়ে গেছে এবং কয়েকজন সহযাত্রিণী ভদকার পাত্র হাতে বীরদের সংবর্ধনা করতে এগিয়ে এসেছেন। এখন আর 'ফিরিবার পথ নাহি'।

এক চুমুকে ভদকার পাত্রটি নিঃশেষ করে তোয়ালেটা একদিকে ছুড়ে দিলাম এবং প্রায় ছুটে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মাথাটা এক কোপে কাটাই ভালো। পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাটার দরকার কী? কিন্তু আশ্চর্য! জল তো অত ঠান্ডা নয়। গোটা কয়েক ডুব দিলাম। হাত-পা ছুড়ে একটু সাঁতার কাটলাম। সবসুদ্ধ সাত মিনিটের বেশি হবে না। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে কিনারায় উঠতেই আবার পটাপট হাততালি, ক্যামেরার ক্লিক, ভদকার পাত্র হাতে হাতে হাজির। তারপর খাওয়া যা জমল সে আর কী বলব!

বেলা দেড়টা নাগাদ বারবিকিউ সেরে আমরা আবার ট্রেনে ফিরে এলাম। বিকেল চারটে নাগাদ ট্রেন পোর্ট বৈকালে ফিরে এল। স্টেশনের পাশেই ফেরিঘাট। আমরা দলবেঁধে স্টিমারে উঠলাম, এঙ্গারা নদীর মোহনা পেরিয়ে ওপারে লিস্টভিয়াংকা গ্রাম। তা বলে হেঁজিপেঁচি গ্রাম নয়। এখানে চারদিকে বড় মানুষির ছাপ। রংচঙে কাঠের বাড়ি। বিরাট বাগান। ইরখুটস্কের সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিজস্ব প্রমোদ উদ্যান, ওদের ভাষায় ডাচা। স্টিমার থেকেই পাহাড়ের গায়ে এক হ্যানসেল গ্রেটেল জাতীয় কেল্লা চোখে পড়ল, সাদায় লালে মিনারে গম্বুজে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। গাইড বলল, ইনি হলেন হোটেল বৈকাল। আমেরিকার

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের আগমন উপলক্ষে তৈরি হয়েছিল।

ফেরি থেকে নেমে আমরা বাসে চড়ে প্রথমে গেলাম ওখানকার একটি গির্জা দেখতে। ছোট্ট কাঠের গির্জা, কোনও বিশেষত্ব চোখে পড়ল না। গির্জার বাইরে এক বুড়ি সস্তা আইকন বিক্রি করছে। আমরাও একটা কিনলাম। আহা, ছেঁড়া কাপড় পরা বুড়িটা। সেখান থেকে গ্রাম ঘুরিয়ে আমাদের একটা খোলামেলা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল, মস্ত এক চত্বর ঘিরে দোকান পসার স্যুভেনির, কফিখানা, লোকজন। চত্বরের ওপর বেঞ্চি পাতা। সেখান বসে ভোজনানন্দ চলছে— মাছ পোড়া, শিক কাবাব আর তার সঙ্গে বিয়ার। বৈকাল হ্রদের ধারে এত মানুষের জটলা বেশ লাগল। এরপর বৈকাল ইকোলজিক্যাল মিউজিয়াম। কিন্তু তার আগে সামান্য ভূমিকার প্রয়োজন।

বৈকাল যে কেবল পৃথিবীর গভীরতম লেক (১,৬৩৭ মিটার) তা নয়। বৈকাল প্রাচীনতমও বটে। এর বয়স প্রায় পাঁচ কোটি বছর। হ্রদের জল মিষ্টি আগেই বলেছি এবং সেই জলে অক্সিজেনের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি থাকায় আর চারপাশের মাটি, জলহাওয়ার বিশুদ্ধতায়, বৈকালের জলে কোনও দোষ নেই। এর জল গঙ্গোত্রীর গঙ্গাজলের মতো পবিত্র। গত একশো বছরে মানে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান বসার পর থেকেই এ অবস্থা পাল্টাচ্ছে। হবে না? যত মানুষের আনাগোনা, লেকের ধারে গ্রাম শহর কলকারখানা, লেকের জলে তত বাতিল আবর্জনা বাড়ছে। সান্ত্বনার বিষয় এই যে গত ২০-২৫ বছর ধরে কলঙ্কিত বৈকালকে নিয়ে ওদেশে খুব আন্দোলন হচ্ছে। মানুষের আনাগোনা কমানো যাবে না বরং বাড়বে কিন্তু তাদের বর্জিত পদার্থ জলে ফেলবার আগে পরিশুদ্ধ করা যায়। সে চেষ্টা চলছে। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হল এই মিউজিয়াম, যা আমরা দেখতে এলাম।

পণ্ডিতেরা বলেন যে বৈকালের জলে যে সব প্রাণী, কীট, জলজ শৈবাল প্রভৃতি পাওয়া যায় তার শতকরা আশিভাগ পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নমুনা স্বরূপ বলা যায় মিষ্টি জলের সিল বা গোলোমিয়াঙ্কা নামে এক খুদে মাছ যার শরীর প্রায় পুরোপুরিই কাচস্বচ্ছ স্নেহ পদার্থে তৈরি, এ মাছ রোদ্দুরে ফেলে রাখলে ঘিয়ের মতো গলে যাবে। আর সে মাছ বাস করেন হ্রদের দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত গভীরে। এইসব প্রাণী জীবন্ত দেখার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয় কিন্তু মিউজিয়ামে তাদের শরীর দেখে তাদের সম্বন্ধে কিছু ধারণা হয় বৈকি। হ্রদ ছাড়াও, হ্রদের চারপাশের পাহাড়ে যে সব জন্তু-জানোয়ার ঘুরে বেড়ায় তাদেরও মিউজিয়ামে রাখা আছে। এখানেই উলভারাইন নামে জন্তুটার চেহারা প্রথম দেখলাম। ছোটখাটো ভালুকের মতো, ওজন বারো থেকে আঠারো কেজি কিন্তু কী হিংস্র চোখমুখ। যেন এখুনি কাঁচা খেয়ে ফেলবে। আরও তাগড়াই দেখায় বড় বড় লোমের জন্য সে লোমও আবার সারা গায়ে গাঢ় বাদামি, শুধু কানের পাশ থেকে লেজ পর্যন্ত দুসারি সাদা লোম দুদিকে। আসলে কিন্তু জন্তুটা অত ভয়ঙ্কর নয়। তবে

আমাদের ভামের মতো ভীষণ পেটুক আর সর্বভুক। সর্বদাই খাই খাই করছে। ওদের নিবাস হল সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা থেকে উত্তর কানাডা, আলাস্কা পর্যন্ত। এবং সেখানেও ওদের দেখা পায় খুব কম লোক। আরেকটা জন্তু দেখলাম। আমাদের অতি পরিচিত হিমালয়ের ভালুক। মিশকালো লোমের গলায় সাদা রঙের ইংরিজি বর্ণমালার 'ভি' চিহ্নটি সুস্পষ্ট।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে আবার বাস, ফেরি— পোর্ট বৈকাল। ট্রেনে উঠতে উঠতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। প্রাণটা এক গ্লাস চায়ের জন্য আঁকপাক করছে কিন্তু মাইকেল বললে চা পেতে আধঘণ্টাটাক লাগবে। জানলাম যে ট্রেন যখন অনেকক্ষণ দাঁড়ায় তখন ব্যাটারির শক্তি বাঁচাবার জন্য ইলেক্ট্রিক সামোভারগুলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। এখন ট্রেন চলতে শুরু করলেই তবেই জল গরম করা যাবে। তার চেয়ে তোমরা বার কারে যাও। ভদকার অভাব নেই। তাই গেলাম। বারের পরে ডিনার শেষ করে নিজের কামরায় ফিরে গেলাম। শরীর ক্লান্ত। বিশ্রাম দরকার। গাড়ি ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে।

সে রাতে গাড়ি অনেকক্ষণ ধরে বৈকালের কিনারা ঘেঁসে চলতে লাগল আর আমার মনের ভেতর টলমল করতে লাগল বৈকালের সুদূর বিস্তারী নীল জল— কূলে ভেঙে পড়া ছোট ছোট ঢেউ, আর তাকে ঘিরে সবুজ পাহাড়ের মাথায় তখনও মানে এই সেপ্টেম্বর মাসেও বরফের ঝিকিমিকি। জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নীল আকাশে পেঁজাতুলোর মতো খণ্ডমেঘ। বৈকালের ধারেপাশে কাটানো এই অপূর্ব দিনটার কথা আমার সারাজীবন মনে থাকবে। আবার সেই বৈকালেই যখন ঝড় ওঠে, সে ঝড় ক্যারিবিয়ানের সাইক্লোন, চিনের টাইফুনের সঙ্গে পাল্লা দেয় আর শীতকালের চার মাস বৈকাল আট ফুট বরফের আস্তরণের নীচে নির্বিবাদে ঘুমোয়। শামানরা বৈকালকে দুর্বাশার মতো রুক্ষ পুরুষ মূর্তি দিয়েছে কিন্তু আমার মতে ওটা ভুল। বৈকাল হল চিরন্তনী নারী। তবে তার দশ মহাবিদ্যা রূপ দেখতে গেলে, পুরো একটা বছর তার সাহচর্য করতে হয়। সে আমাদের মতো শৌখিন ট্যুরিস্টদের জন্য নয়।

১০ সেপ্টেম্বর সকালে উঠে দেখি রাতের স্বপ্ন রাতেই মিলিয়ে গেছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে আর ট্রেনটা চলেওছে কেমন যেন জংলি জলা জমির মাঝখান দিয়ে। বড় বড় কাঁধছোঁয়া ঘাস, ডোবা, পুকুর। কোনওদিকে লোকবসতির চিহ্ন নেই। বই দেখে বুঝলাম যে সেরেঙ্গা নদীর বদ্বীপে এসে পড়েছি। নদী মজে গিয়ে এখানে তৈরি হয়েছে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ সিক্তভূমি। তাহলে তো উলান উডে আসতে আর বেশি দেরি নেই। ব্রেকফাস্ট খেয়ে সাড়ে আটটার মধ্যে নামবার জন্য তৈরি হতে হবে। উলান উডে ব্যুরিয়াট অন্তঃরাষ্ট্রের রাজধানী। লোকসংখ্যা চার লক্ষের মতো। তার মধ্যে ব্যুরিয়াট এক লক্ষের বেশি হবে না। বাকি সব রাশিয়ান। একশো বছর আগেও সাইবেরিয়ার বন্ধ্যা কাঁকুরে জমিতে যতটুকু চাষবাস হয় তাই এবং পশুপালনই ছিল এদের জীবিকা। এখন

ট্রান্স-সাইবেরিয়ানের কল্যাণে অনেক কারখানা বসেছে তার মধ্যে প্রধান হল ৩৫ কিলোমিটার দূরে বিরাট রেলওয়ে মেরামত কারখানা। হালে এরা ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন তৈরি করেছে। এ অঞ্চলে বেশ কতকগুলো সামরিক ঘাঁটি আছে বলে বহুদিন পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া বিদেশিদের এ দেশে ঢোকা বন্ধ রেখেছিল। ১৯৯০ সালে সে নিগড় ভাঙল যখন ব্রিটেনের প্রিন্সেস অ্যান (ANNE) এক ট্রেন ভর্তি ট্যুরিস্ট নিয়ে ব্যুরিয়াট ঘুরে গেলেন। উলান উড়ের লোকেরা বলে ১২৩৯ সালে চেঙ্গিস খানের অভিযানের পর থেকে এত উত্তেজনা উলান উডেতে আর কখনও হয়নি।

সাইবেরিয়ার অন্যান্য স্টেশনের তুলনায় উলান উডে রেলস্টেশনটি বেশ সাজানো গোছানো। চকচকে গ্র্যানাইটের প্ল্যাটফর্ম, দেওয়ালগুলিতে সবে কলি ফেরানো হয়েছে, কাচের ছাদ দেওয়া ওভারব্রিজটি পরিষ্কার, শুনলাম যে এই কদিন আগে উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মস্কো যাবার পথে এখানে নেমেছিলেন। শহরটা এমন কিছু নয়। আমাদের বিহার, ইউ পি-র মফস্বল শহর যেমন হয়। চার-পাঁচতলা অট্টালিকার পাশেই মালগুদাম, করাতকল। সামনে মাঠ ভর্তি গাছের গুঁড়ি পড়ে রয়েছে। দেখবার জিনিসের মধ্যে গোটা দুই গির্জা আর গোটা চারেক মিউজিয়াম। তার মধ্যে সময় থাকলে ইতিহাসের মিউজিয়ামটি দেখতে পারেন। এখানে তিব্বতের বুদ্ধ উপাসনা সংক্রান্ত বহু মূল্যবান সম্পদ, বুদ্ধমূর্তি, পুরনো পুঁথি, তাংখা প্রভৃতি সংরক্ষিত আছে। হ্যাঁ, শুনে অবাক হলাম যে ব্যুরিয়াটরা যে কেবলমাত্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তা নয়, ওদের দীক্ষাগুরু এসেছিলেন তিব্বত থেকে এবং আজও নির্বাসিত দলাই লামাই ওদের ধর্মপ্রধান। আমাদের গাইড বললেন যে এখন আমরা বাসে চেপে ব্যুরিয়াটদের প্রধান মঠ ইভলোজিনিস্কি ডাটসানে যাব। ৩৫ কিলোমিটার রাস্তা।

বৃষ্টি থেমে ততক্ষণে সদ্য বিধবার ম্লান হাসির মতো একটু ফিকে রোদ উঠেছে কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ কীরকম ধূসর। অনুর্বর কাঁকুরে জমি, দূরে এক সারি নেড়াপাহাড়, বৃক্ষ, বিটপির সাড়া নেই, কোথাও সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। রাস্তাটাও এবড়োখেবড়ো, খানাখন্দ প্রচুর আর তার মধ্য দিয়ে বাসটি টিকির টিকির করে চলছে তো চলছেই। একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। একটা বিষম ঝাঁকানি খেয়ে চোখ মেলে দেখি যে একটা দোকান বাজারের জটলা কাটিয়ে বাস ডানদিকে ঘুরছে আর তারপরেই সেই মেঘলা আকাশ, বিষণ্ণ পৃথিবীর পটভূমিকায় যা চোখে পড়ল, তা আমি কল্পনায় বহুবার দেখেছি।

মঙ্গোলিয়ার মরুভূমির মধ্যে কুবলাই খানের প্রাসাদ উদ্যান ছাড়া আর কিছুর সঙ্গেই মধ্য সাইবেরিয়ার রুক্ষ ছাইরঙা পরিবেশের মাঝখানে আলো ঝলমলে বৌদ্ধমন্দির প্যাগোডাগুলির তুলনা করা যায় না।

মন্দিরগুলির বিরাট চৌহদ্দি ঘিরে মানুষপ্রমাণ কাঠের সাদা বেড়া, সে তুলনায় প্রবেশদ্বারটি সংকীর্ণ। তোরণ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি দূর পর্যন্ত ছড়ানো ছোট বড় নানা রকম প্যাগোডা, ঘর, লামাদের থাকবার সারবন্দী বাড়ি, সবসুদ্ধ

সাতাশটা স্ট্রাকচার। শুনলাম, তার পিছনে আছে লামাদের খেলাধুলোর বন্দোবস্ত এবং তারও পরে চাষবাসের জমি। শিক্ষার্থী লামাদের চাষবাসও শেখানো হয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদি মঠের কাজে লাগে। প্রবেশদ্বারে আমাদের গাইড বললেন যে আপনারা ঘুরে ফিরে দেখুন, চল্লিশ মিনিট আমি এইখানে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব। বলে সে একটা চায়ের স্টলে ঢুকল। ভালোই হল, এরকম জায়গায় দলানুবর্তী না হয়ে নিজের ইচ্ছা মতো ঘুরে বেড়াতেই ভালো লাগে। নানারকম বাড়িঘর দেখতে দেখতে শেষের দিকে এক জমকালো প্যাগোডার সামনে এসে দাঁড়ালাম। জুতো খুলে রেখে মন্দিরে ঢুকলাম। সমস্ত মেঝেজুড়ে কার্পেট— দেওয়ালে তাংখার আবরণ, বুদ্ধ চরিত্র, জাতকের গল্প। বিরাট পাটাতনের ওপরে বুদ্ধের ভূমিস্পর্শ উপবিষ্ট মূর্তি, ধূপের সৌরভ, সামনে কাষ্ঠাসনে বসে মুণ্ডিত মস্তক এক বৃদ্ধ লামা ডানহাতে ধর্মচক্র ঘোরাচ্ছেন। বুদ্ধমূর্তির তলায় বড় বড় সোনালি অক্ষর জ্বলজ্বল করছে 'ওঁ মণিপদ্মে হুম' পরিষ্কার দেবনাগরীতে লেখা। কেমন একটা অপূর্ব অনুভূতি নিয়ে মন্দির থেকে বেরোলাম। স্বাজাত্যাভিমান। দেশপ্রেম— না না অত বড় বড় কথায় কাজ নেই। অনেক দিন বাইরে বাইরে ঘুরে এখন বাড়ির জন্য মন কেমন করছে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে নানা জিনিস দেখে বেড়াচ্ছি। এমন সময় এক যুবক লামা বয়স ২৫-২৬ হবে, লম্বা একহারা ঋজু চেহারা বিনীতভাবে এসে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি ভারতবর্ষের লোক কিনা। একটু ভাঙা ভাঙা ইংরিজি কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না। উত্তরে আমি হ্যাঁ বলাতে লামা জানালেন যে আগামী ডিসেম্বর মাসে বৌদ্ধশাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষার জন্য উনি ধরমশালা যাবেন ছ মাসের জন্য, এখন কথা হল কীরকম জামাকাপড় দরকার হবে? পাহাড়ের ওপর ধরমশালা কি খুব ঠান্ডা? আমি একটু হেসে জানালাম যে সাইবেরিয়ার বাসিন্দার কাছে ধরমশালার ঠান্ডা কিছু নয়। উনি যা পরে আছেন তাই যথেষ্ট। তারপর ভারতে পৌঁছে কীভাবে ধরমশালা যাওয়া যায় সে সম্বন্ধে দু-চার কথা হল, ইতিমধ্যে আমাদের দল মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, আমিও তাড়াতাড়ি ওদের পিছু নিলাম।

বাইরে ততক্ষণে নাচের বাজনা শুরু হয়ে গিয়েছে। উলান উডে থেকে এক নাচের দল এসেছে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে পঞ্চাশ-ষাট জন হবে। স্ত্রীলোকই বেশি, তারা আমাদের ওদেশের নাচ দেখাবে। ওদের নানা রঙের বিচিত্র পোশাক— সব সিল্ক, নৃত্যভঙ্গি, হাবভাব, কলাকুশলতা দেখে বুঝতে পারলাম যে এরা বড় একটা কেউকেটা নয়। ওদের যিনি প্রধান মধ্যবয়স্ক প্রায় বৃদ্ধ ক্ষীণকায় ব্যক্তিটি তাঁর চলনে বলনে রাজার আভিজাত্য। সব মিলিয়ে এক ঘণ্টার প্রোগ্রাম। প্রত্যেকটি নাচের সময় আছে দশ মিনিটের মতো। শেষের বিষয়টি নাচ নয়। ওদেশি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে একটি অর্কেস্ট্রা। নাচগুলির বিষয়বস্তু আমাদের সংক্ষিপ্ত ইংরিজিতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু নোট নিতে পারিনি বলে তার কিছুই এখন মনে নেই। তবে

বৌদ্ধমন্দিরে অনুষ্ঠিত হলেও এগুলো জাতকের গল্প ছিল না। বোধহয় নাচগুলো ওদেশের কল্পকথা অবলম্বন করে। সাইবেরিয়ার ছাইরঙা পরিধির মধ্যে, তিনটে জমকালো সোনালি লাল প্যাগোডার পটভূমিতে। বহু বেশভূষামণ্ডিত সুদৃশ্য সুগঠিত নরনারীগুলির অপূর্ব অঙ্গসঞ্চালন, চলন এবং নৃত্যভঙ্গি যে কল্পজগৎ তৈরি করল তার কথা কখনও ভোলবার নয়। শেষের দিকে মহেশ্বরের প্রসন্ন নয়নের মতো মেঘের ফাঁক দিয়ে এক ফালি রোদ্দুর কুশীলবদের ওপর পড়ল। চারদিকে ছবি তোলার ধূম।

নাচের শেষে পুরো দল সারবেঁধে দাঁড়িয়ে আমাদের অভিবাদন করলেন। দেখলাম দলের সামনে ফুটফুটে একটা বাচ্চা। বছর তিন-চার হবে। গৃহিণীকে বললাম বাচ্চাটাকে এক প্যাকেট চকোলেট দিয়ে এসো। কিন্তু ওঁকে তার দিকে এগোতে দেখে বাচ্চাটা একটা হরিণ ছানার মতো ওদের তাঁবুর দিকে দৌড়ল। গৃহিণী ছুটে গিয়ে ওকে ধরে ফেললেন। তখন ওর মুখটা দেখবার মতো।

মঠ মনাস্ট্রির পালা শেষ করে সাড়ে বারোটা নাগাদ ট্রেনে ফিরে এলাম। লাঞ্চ তৈরি। আজ আমাদের লাঞ্চের সঙ্গী ছিল আমাদের অন্যতম গাইড তামারা। অনেক গল্প হল। তামারা বলল, এখন তিনদিন তিন রাত আর কোনও বিরতি নেই। গাড়ি সমানে চলবে। ১৪ দিনের দিন বেলা বারোটা নাগাদ ব্লাডিভস্টক। তবে আর কিছুক্ষণ পরে সেরেঙ্গা ডেল্টার এই একঘেয়ে দৃশ্য পাল্টাবে। আবার ঢেউখেলানো পাহাড়, নদী, জঙ্গল। পাহাড় পেরোবার জন্য ট্রেন কয়েকবার ইউ টার্ন নেবে তখন সারা ট্রেনের ফটো নেওয়ার সুবিধা। তাছাড়া এখানে জঙ্গলে এখনই শরতের রং লেগেছে। পাহাড়ের গা জীবন্ত রঙে রঙিন হয়ে আছে, আবির সিঁদুর থেকে ভায়োলেট পর্যন্ত কত রঙের বাহার। সত্যিই তাই। দেখছি আর ভাবছি যে এই জনমানবহীন দেশে এত শোভা কে দেখে?

বড় নির্জন বড় নিরিবিলি এই জায়গা। উরালের জঙ্গলে তবু দূরে দূরে একটা দুটো কাঠের কুঁড়ে দেখতে পাওয়া যায়। যারা জঙ্গলে কাঠ বা জঙ্গলের অন্য সম্পদ আহরণ করে তাদের আশ্রয়। এখানে কেউ কোথাও নেই। এখানকার ছোট ছোট স্টেশনের কর্মচারীদের চলে কী করে? একটা এয়ারপোর্ট গেল। স্টেশনের নাম বাডা (৫,৮৮০ কিলোমিটার), ছোটখাটো লোকবসতি। আমরা এখন ইয়াব্লোনভি গিরিশ্রেণী ধরে উঠছি। সোখোন্ডোতে পাহাড় টপকে ওপরে গেলে চিটা শহর, ব্যস হয়ে গেল। এখন দুদিনের মধ্যে আর কোনও শহর নেই। সেই আসুর নদীর ধারে খাবারোভস্ক পৌঁছতে পরশু সন্ধ্যা। ১৮৯১ সালে সাংবাদিক জর্জ কেনান লিখেছিলেন যে সমস্ত আমেরিকাকে সাইবেরিয়ার মধ্যে বসিয়ে দিলেও এত জায়গা পড়ে থাকবে যে সেখানে ভাগ ভাগ করে আলাস্কা এবং ইউরোপের রাশিয়া ছাড়া বাকি দেশগুলো ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। তবুও তিন লক্ষ স্কোয়ার কিলোমিটার জায়গা ফালতু পড়ে থাকবে। কী পেল্লায় ব্যাপার ভেবে দেখুন। উরাল পাহাড় থেকে প্রশান্ত মহাসাগর অবধি সাইবেরিয়ার দৈর্ঘ্য ৭,০০০

কিলোমিটার, প্রস্থে আর্কটিক থেকে চিনের সীমানা ৩,৫০০ কিলোমিটার। এই বিরাট ভূখণ্ডে লোকসংখ্যা হল কুল্লে ৩.৩ কোটি।

খিলোক নদীর অববাহিকা ধরে ট্রেন চলেছে, বিস্তৃত উপত্যকা ঘিরে পাহাড়ের পর পাহাড়। বিকেলের দিকে একটু রোদ ফুটেছে। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় পাহাড়ের গায়ে কী অপরূপ রঙের খেলা। চিরসবুজ, পাইন, বার্চ, এসপেন গাছের ঘন বিন্যাসের পটভূমিকায় অন্যান্য গাছের রং পাল্টাচ্ছে, নীচে ঠাসবুনুনি ঘাসের রং ফিকে হলদে থেকে গাঢ় বাদামি। আমরা পুবদিকে চলেছি আর পশ্চিমের কনে দেখা আলোয় সমস্ত বনানী যেন রঙের নেশায় কাঁপছে, দুলছে। এ দৃশ্য কথায় বোঝানো যায় না। ফটোতেও এর পরিচয় নেই। বোধহয় সঙ্গীতের সুরের মতো এ সৌন্দর্য বোঝবার জিনিস নয়। আলো কমে আসছে। পথের ধারে ইলেক্ট্রিক বাতিগুলো এক এক করে চলে গেল। খিলোক স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াল না। খিলোকের পরে নদী দূরে সরে গিয়ে অনেকটা মাঠ দেখা গেল। এখানে বোধহয় চাষবাস হয়। একটু লোকালয় দেখা যাচ্ছে, একটা গির্জা আর তার সংলগ্ন সমাধি স্থান চলে গেল। এবার উঠে ডিনারের জন্য তৈরি হতে হয়। আজ ডিনারের প্রারম্ভে লেসলির অনুরোধে আমরা এক মিনিটের নিস্তব্ধতা পালন করলাম। গতবছর এইদিনে আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে যারা নিহত হয়েছিল তাদের স্মরণার্থে এই অনুষ্ঠান। অবশ্য তারপরেই আনন্দের কোলাহল। লুইস মুর নামে এক বৃদ্ধ আমেরিকানের জন্মদিন। শ্যাম্পেন ক্যাভিয়ার তো এলই, তারপরে কেক কাটা হল 'হ্যাপি বার্থ ডে' গানের সঙ্গে।

আজকেও সারাদিন ট্রেনে কাটাব। রাস্তাতেও এমন কিছু দেখবার নেই। আসলে আমরা এখন যাচ্ছি রাশিয়ান তুন্দ্রার দক্ষিণ ঘেঁসে। এখানে লোকবসতি থাকার কথা নয় আবার প্রকৃতিও এখানে কৃপণ। কিন্তু মানুষকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। এই রিক্ততার মাঝখানেও যেখানেই একটা ছোট নদী, একটু চাষের মাঠ সেখানেই ছাড়া ছাড়াভাবে একটা-দুটো পরিবার কুঁড়ে বেঁধেছে। একটু ফলের বাগান, হয়তো একটা গরু চরছে, পুকুরের ধারে বসে ছিপ ফেলেছে কেউ। এছাড়া ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ের ছোট ছোট স্টেশন, ইয়ার্ড, কোথাও বা একটা লোকো কারখানা— এ সব তো আছেই।

৬৯০৬ কিলোমিটারের মাথায় মোগোচা স্টেডিয়াম, বেলা সাড়ে বারোটা। এখানে গাড়ি নিজের প্রয়োজনে ১৫ মিনিট থামবে। স্টেশনের চেহারা দেখে নোংরা নিচু প্ল্যাটফর্মে নামতে ইচ্ছে করে না। তবু একটু পা ছড়ানো দরকার। অন্য অন্য কামরা থেকেও কিছু লোক নামল। স্টেশনে লোকজন নেই। দুটো স্টল— তাও বন্ধ। বোধহয় স্টলওয়ালারা খেতে গেছে। কাঁকরের ওপর কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে আবার ট্রেনে উঠে পড়লাম। কী কুৎসিত স্টেশন আর শহর বলাতে লেসলি বললে, এখানে যে আদৌ মনুষ্য বসবাস হয়েছে তা কেবল ট্রান্স-সাইবেরিয়ার কল্যাণে। এ হল পারমাফ্রস্ট বা চির বরফের দেশ। শীতকালে

তাপমাত্রা মাইনাস ষাট ডিগ্রি পর্যন্ত নেমে যায়, তাতে শুধু জল কেন মাটি পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে যায়। নিতান্ত কঠিন-প্রাণ কিছু উদ্ভিদ ছাড়া সব প্রাণ মরে যায় সে ঠান্ডায়। তোমরা এখন যে কিছু সবুজ দেখছ তা কেবল সবে গ্রীষ্মকাল গেল বলে, যখন ওপরের দশ সেন্টিমিটারের মতো মাটি সূর্যতাপে সামান্য সরস হয়। তখনও নিস্তার নেই। গরমকালে এখানে তাপ দিল্লিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। সেই উত্তাপে অনেক জায়গায় কচি ঘাসগুলো শুকিয়ে যায়।

মোগোচা থেকে খাবারোভস্ক ১,৬১৫ কিলোমিটার রাস্তা ট্রেন একেবারে চিনের গা ঘেঁসে চলে। আসল চিন নয়, রাস্তার প্রথম অংশের জুড়িদার অন্তর্মঙ্গোলিয়া, দ্বিতীয় অংশে মানছরিয়া দুটোই অবশ্য মহাচিনের অন্তর্গত। ট্রেনের ডানদিকে আবার ঢেউখেলানো নিচু পাহাড়ের সারি। ওর ওপারে বয়ে যাচ্ছে বহুখাতে আমুর নদী। চিন এবং রাশিয়ার সীমানা। ভাবতে অবাক লাগে যে মোটে একশো বছর আগে বাঘের উপদ্রবে এখানে রেললাইন পাতা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই বিখ্যাত সাইবেরিয়ান বাঘ। এখন সে বাঘেরা প্রায় নির্মূল। কেবল এ অঞ্চলের সংরক্ষিত বনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটা পড়ে আছে। নদীর যত কাছে যাচ্ছি গাছপালা লোকালয় বাড়ছে। হবে না! জলই তো জীবন। একটা মাঝারি গোছের স্টেশনে সিগনাল না পেয়ে গাড়ি থামল। কামরার দরজা খুলে দেখি যে স্টেশন ভর্তি চিনে মুখ। সবাই কিছু না কিছু বিক্রি করছে। বিশেষ করে নানা রকমের ফল এবং অন্যান্য চিনা খাবার। লেসলি বললে যে ওখান থেকে আমুর নদী মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার এবং তার ওপারে মহাচিন। রাশিয়া এবং চিনের মধ্যে ভাব ভালোবাসা থাকুক আর না থাকুক, ওরা কখনওই এই বহু পুরনো সীমানা-বাণিজ্য বন্ধ করেনি। নদীর দুপাশে বাসিন্দারা অক্লেশে এ ওর দেশে যেতে পারে। শুল্ক ইমিগ্রেশন নিয়ন্ত্রণ নামমাত্র।

বিকেল পাঁচটায় ইয়োরোফেল পাভলোভিচ স্টেশন ৭,১১৯ কিলোমিটার। স্টেশনের নাম হয়েছে ১৬৫০ সালের এক রাশিয়ান বণিকের নামে যে বাণিজ্য করতে এসে এখানকার অধিবাসীদের ওপর এমন অত্যাচার করেছিল যে সে কথা স্বয়ং জারের কানে পৌঁছয়। জার বণিককে ডেকে পাঠান কিন্তু চতুর বণিক অনেক দামি জিনিস জারকে উপহার দিয়ে তাঁকে বোঝায় যে সে তো ব্যবসা করতে যায়নি। বরং জারের অনুগত প্রজা হিসাবে তাঁর রাজত্ব বাড়াবার চেষ্টা করছে। তবে ওদেশের বাসিন্দারা বড় ত্যাঁদোড়। মাঝে মাঝে কড়কে না দিলে চলে না। জার বুঝে গেলেন। তখন আমুর অঞ্চলের লোকেরা মাঞ্চুদের গিয়ে ধরল তাদের বাঁচাবার জন্য। ব্যস বেধে গেল ঝটাপটি। যার ফলে ১,৬৮৯ সালে দুদলের মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হলে আমুর নদী দুদেশের সীমানা নির্দেশ করে। স্টেশনটি বেশ বড় এবং গাড়ি এখানে পঁচিশ মিনিট থামবে। ইঞ্জিন বদল হবে। গার্ড, ড্রাইভারও বদলাবে। আমরা স্টেশনে নেমে একটু হেঁটে নিলাম। গাড়িতে ফিরে এসে প্রথমে বার কারে আড্ডা। ডিনার এবং শয়নে পদ্মনাভঞ্চ।

১২ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। আজ আমাদের গাড়িতে শেষ দিন। সমুদ্র ক্লান্ত যাত্রীদের যেমন বন্দরে পৌঁছবার আগ্রহ থাকে তা আছে আবার প্রায় দুসপ্তাহের পরিচিত পরিবেশ, সহযাত্রী, ট্রেনকর্মীদের (যাদের সঙ্গে হয়তো জীবনে আর কখনও দেখা হবে না) ছেড়ে যেতে হবে বলে মনে একটু ব্যথাও আছে। আরও লক্ষ করলাম যে আজকে সকলের প্রাণেই যেন একটু বেশি অন্তরঙ্গতার ছোঁয়া লেগেছে। প্রত্যুষে ঘুম ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে দেখি যে পশ্চিম আকাশে সপ্তর্ষি জ্বলজ্বল করছে। তার পাশে মিথুন রাশির দুটি তারা। এদের জ্যোতিকে ম্লান করে একটা গ্রহ স্থির দ্যুতিতে জ্বলছে কিন্তু কোন গ্রহ তা বুঝতে পারলাম না। একটা ছোট স্টেশনে একাকী এক রেলকর্মী সবুজ আলো হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

সকালের আলো ফুটে উঠছে। মাইকেল চা দিয়ে গেল। এখন আর মরু পর্বত জঙ্গল নয়। দুপাশে শস্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে ফলের বাগান, মনুষ্যবাস, কাছাকাছি গ্রামের পর গ্রাম। সকাল সাড়ে সাতটা। বিরাট জিয়া নদীর পুল বেয়ে গম গম করে গাড়ি চলে এল। এবার সভোবোডনি শহর (৭,৮১৫ কিলোমিটার), লোকসংখ্যা ৭০,০০০। চলন্ত ট্রেন থেকে যেটুকু দেখলাম তাতে বেশ সুদৃশ্য শহর মনে হল। সাইবেরিয়ার পরে চোখ একটু মুখবদল করল। হ্যাঁ সাইবেরিয়া ছাড়িয়ে এসেছি। চির বরফের রাজ্য শেষ। এখান থেকে ব্লাডিভস্টক পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলটায় গাছপালা খেতখামার গ্রাম শহর সবই উত্তর ইউরোপের কথা মনে করিয়ে দেয়। ঠান্ডাও এখানে কমে যায় যদিও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ির ভেতর থেকে আমরা বাইরের পরিচয় এখনও পাইনি। রেললাইনের পাশাপাশি একহারা নীচের রাস্তা। একটা দুটো মোটরকে অনেকটা আমাদের ফিয়াটের মতো দেখতে, পেরিয়ে গেলাম।

সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে বেলোগরস্ক স্টেশনে (৭,৮৭৩ কিলোমিটার) গাড়ি দাঁড়াল। কুড়ি মিনিটের স্টপেজ। আমরা প্ল্যাটফর্মে নামলাম। রেলস্টেশন। ছবি নিলাম: সামনে লেনিনের মূর্তি। বেলোগরস্ক ছোট্ট শহর। ৭০,০০০ লোক, কিন্তু এইখান থেকেই একটা শাখা লাইন অল্পদূরে আমুর নদীর ধারে ব্লাগোভেশচেনেস্ক শহরে গেছে। শিল্পকেন্দ্রিক বড় শহর। প্রায় দুলক্ষ লোকের বাস। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেও ব্লাগোভেশচেনেস্কের বেশ নাম আছে। নদী পেরোলেই ওপারে মাঞ্চুরিয়ার 'হেই হেই' এবং দুই শহরের মধ্যে মাল পণ্যের লেনদেন সর্বদাই চলছে। আজ প্রাতঃভোজনের সঙ্গী ছিলেন আমেরিকার হুইটনি এবং জিন। দুজনেই মধ্য আমেরিকার বাসিন্দা, একসঙ্গে থাকেন। জিনের চেহারার সঙ্গে ক্যাথরিন হেপবার্নের কোথায় যেন একটা মিল আছে। এত বয়সেও ভদ্রমহিলা বেশ তন্বঙ্গী। ভদ্রলোক খাজা আমেরিকান। প্রেসিডেন্ট বুশের 'দুনিয়া বাঁচাও' প্রোগ্রাম নিয়ে খানিকটা তর্কাতর্কি হল তাঁর এবং আমার গৃহিণীর মধ্যে। শেষকালে অবশ্য পরস্পরকে মশলাও খাওয়ানো হল।

দুপুর বারোটা। বার কারে বসে একটু সুরা পান হচ্ছে আর তার সঙ্গে দুপাশের

দৃশ্য দেখছি। ঘাসে ঢাকা সম্পূর্ণ সমতল ভূমি। মাঝে মাঝে গ্রাম। দূরে এক সারি পাহাড়ের রেখা। এক জায়গায় আট দশজন লোক একটা চারপাশ খোলা খড়ের চালার নীচে বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছে। বড্ড নিজের দেশের কথা মনে পড়ল। একটা খুব লম্বা টানেলে গাড়ি ঢুকল। টানেলের দুপাশেই সশস্ত্র পাহারাদার। টানেলের ওপারে আবার পাহাড় জঙ্গল। ঘোড়ার খুরের মতো লম্বা লম্বা বাঁক। বার্চ, পাইনের জটলা। ক্ষীণকায় একটা নদী। সুন্দর দৃশ্যাবলি। দুপুরের খাওয়ার সাথী হলেন র‍্যাশেল এবং সিডনি। ইংরেজ দম্পতি। তাঁদের এক মেয়ে বিলেত প্রবাসী একটি দাড়ি কামানো শিখ ছেলেকে বিয়ে করেছে এবং এই সূত্রে ভারতবাসীদের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ। নিজেরাও একবার জাহাজে প্রমোদভ্রমণ সূত্রে বম্বে আর কোচিন দেখেছেন। বম্বে সম্বন্ধে ভদ্রলোকের সেই পুরনো প্রশ্ন 'এত লোক রাস্তায় ঘুমোয় কেন? আর পথঘাট এমন নোংরা'। কী আর বলব! ভাবলাম তবু তো সাহেব কলকাতা দেখেননি।

বেলা গড়িয়ে আসছে। বিকেল সাড়ে তিনটের সময় বাইরে মাইলপোস্টে দেখলাম ৮,২৬৫ কিলোমিটার। এক জায়গায় পাথর ভেঙে খোয়া তৈরি হচ্ছে। ছোট একটা গ্রামের পাশ দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে। স্বামী স্ত্রী বাগানে কাজ করছে। দুটো ছোট বাচ্চা। ওদেরই হবে, একটা কাঠের তক্তার ওপর বসে আছে, অন্যটা দড়ি বেঁধে তক্তাটাকে টানছে। স্লেজ স্লেজ খেলছে বোধহয়। মাইকেল চা দিয়ে গেল। বিকেল পাঁচটায় আবার মাঠ। দূরে পাহাড়ের রেখা। আমুর নদীর দিকে যত এগোচ্ছি তত ঘন ঘন গ্রাম। বিরোবিডঝান স্টেশনে (৮,৩৫০ কিলোমিটার) গাড়ি দাঁড়াল, যদিও এখানে থামবার কথা নয়। বেশ বড় স্টেশন। জানলার বাইরে দেখি যে স্টেশনের নাম সিরিলিক অক্ষরে তো আছেই, তার তলায় নামটা আরেকবার লেখা হয়েছে কোনও অপরিচিত হরফে। একজন সহযাত্রী বললেন, ওটা হিব্রু। এখন আমরা রাশিয়ার মধ্যেই ইহুদিদের স্বয়ংশাসিত রাজ্যে আছি। বিরোবিডঝান সে রাজ্যের রাজধানী। তারপর একটু হেসে বললেন, এখন কজন ইহুদিই বা আছে। সব তো আমেরিকায় কিংবা ইজরায়েলে পালিয়েছে। একটু অবাক হলাম। স্বয়ংশাসিত যখন, তখন ইহুদিরা পালাল কেন? ভদ্রলোক বললেন যে রাশিয়ার স্বয়ংশাসিত রাজ্যগুলি ওই নামেই স্বয়ংশাসিত। আসল কলকাঠি সব ক্রেমলিনের হাতে।

ডিনার প্রায় শেষ হয়ে আসছে এমন সময় ট্রেন আমুর নদীর ব্রিজে উঠল। বিরাট চওড়া নদী। দোতলা ব্রিজটা ২.৬ কিলোমিটার লম্বা। নদী পেরোলাম বলে আমরা কিন্তু চিনে ঢুকলাম না। নদীটাই বরং এখানে বেঁকে রাশিয়ার রাজত্বে ঢুকে পড়েছে। আমুরের মোহনা আরও উত্তরে রাশিয়ান এলাকায়। এখানে একটা কথা বলে রাখি এবং ম্যাপ দেখলে জিনিসটা ভালোভাবে বোঝা যাবে। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান তৈরি করার সময় রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল মস্কো থেকে ভ্লাডিভস্টক যাওয়া। কিন্তু তার জন্য সমস্ত মাঞ্চুরিয়া ঘুরে যাবার দরকার ছিল না। চিনের সঙ্গে

সন্ধি করে রাশিয়ার চিটা স্টেশন থেকে মাঞ্চুরিয়ার হারবিন হয়ে নাক বরাবর লাইন গেল ব্লাডিভস্টক। রাশিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য যে সমস্ত মাঞ্চুরিয়া এবং কোরিয়ায় আধিপত্য বিস্তার তা বুঝতে পেরেও দুর্বল চিন রাশিয়ার সন্ধি প্রস্তাবে না বলতে পারল না। কিন্তু রাশিয়ান ভাল্লুক ছাড়াও জাপানি নেকড়েও ছিল মাঞ্চুরিয়া কোরিয়ার ওপর। ১৯০৫ সালে রাশিয়া-জাপানিজ যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে রাশিয়ার চরম পরাজয়ের কথা সবাই জানেন। তখন রাশিয়ার কর্তাদের চেতনা হল যে পরের সোনা কর্ণমূলে ধারণ করতে নেই। তৈরি হল আমুর রোপওয়ে মাঞ্চুরিয়া ঘুরে।

ট্রেনে এই আমাদের শেষ রাত। ক্যাভিয়ার শ্যাম্পেন সব হল। একজন সহযাত্রী ওদের খাতায় কর্মচারীদের প্রশংসা করে সুন্দর কয়েক লাইন লিখলেন। আমরা সবাই সই করলাম। রাত সাড়ে নটায় ট্রেন যখন খাবারোভস্ক স্টেশনে ঢুকল তখন আমরা আমাদের কামরায় শোবার বন্দোবস্ত করছি আর খাবারোভস্ক স্টেশন এমন কিছু দেখবার জিনিস নয়। দশ মিনিটের জন্য স্টেশনে নেমে কোনও লাভ নেই।

সকাল সাতটায় মাইকেল চা দিয়ে গেল। চা খাচ্ছি আর জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছি। একটা স্টেশন গেল। নাম পড়তে পারলাম না। মাইলপোস্টে দেখলাম ৮,৯৯১ কিলোমিটার। আর ঘণ্টাপাঁচেক মানে বারোটা-সাড়ে বারোটা নাগাদ ব্লাডিভস্টক। বাইরের দৃশ্য অতি মনোরম। পাহাড় জঙ্গল নদী। এখানে ট্রেন প্রায় বরাবরই উসুরি নদী বা তার শাখাপ্রশাখার পাশ দিয়ে চলেছে। উসুরি নদীই এ অঞ্চলে রাশিয়া আর চিনের সীমানা। জঙ্গল গভীর। চলন্ত ট্রেন থেকেও এখানে গাছপালার বৈচিত্র লক্ষ করছি। এই পাহাড়ের তলায় চওড়া পাতার গাছ। আবার একটু ওপরে উঠলেই কনিফেরাসের দঙ্গল। কত রকমের ফুল ফুটে আছে ঘাসের বুক জুড়ে। কিন্তু বসে বসে খালি শোভা দেখলেই তো চলবে না। ব্লাডিভস্টক এল বলে। সব গোছগাছ করে নিতে হবে তো।

বেলা সাড়ে এগারোটা। সব গোছগাছ হয়ে গেছে। সাজগোজ করে আমরা বসে আছি, কখন ব্লাডিভস্টক আসবে। শহরতলির নোংরামি শুরু হয়ে গেছে। ঢাউস ঢাউস টিনের কারখানার ছাদ, চিমনির ধোঁয়া, রেলসাইডিং, জং ধরা ইঞ্জিন, মালগাড়ি— ডানদিকে মাঝে মাঝেই সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, ডক ইয়ার্ড, বড় বড় ক্রেন অতিকায় বকের মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে— মাইকেল একবার ঘুরে গেল আমাদের কিছু চাই কিনা? রেলের দোতলা সিগনাল কেবিন। বারান্দায় কেউ একজন দাঁড়িয়ে আমাদের ট্রেন দেখছে। তারপর সাইডিংয়ের ঘটাং ঘটাং আওয়াজ ট্রেনকে এক লাইন থেকে অন্য লাইনে চালান দেওয়া হচ্ছে, গাড়ি প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। সিরিলিক অক্ষরে বড় বড় হরফে লেখা ব্লাডিভস্টক।

ট্রেন থেকে যাত্রীরা দলে দলে নামছে। লেসলি আগেই বলে দিয়েছিল যে স্টেশনে নেমে আমরা যেন ওদের জন্য অপেক্ষা করি। সব মালপত্র নামিয়ে

আমাদের জড়ো করে বেরোতে একটু সময় লাগবে। প্রথমে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল প্ল্যাটফর্মের ওপরেই সেই বিখ্যাত মাইলপোস্টে যার তলায় ব্লাডিভস্টকের দূরত্ব ৯,২৮৯ কিলোমিটার লেখা আছে। সেই মাইলপোস্টের সামনে দাঁড়িয়ে যাত্রীদলের ফটো তোলা হল। তারপর বাসে চড়িয়ে শহর দেখাতে নিয়ে যাওয়া। ব্লাডিভস্টক সুন্দর সাজানো গোছানো শহর এবং পৃথিবীর অপরপ্রান্তে সানফ্রান্সিসকোর কথা মনে করিয়ে দেয়। সেইরকম পাহাড়ে উঁচু নিচু রাস্তা ট্রাম—চারদিকে ঘেরা সমুদ্র। এখানে ঠান্ডা অনেক কম। শুনলাম যে রাশিয়ার পূর্ব উপকূলে যত বন্দর আছে তার মধ্যে ব্লাডিভস্টকই সবচেয়ে কম দিন (গড়ে ৭৮ দিন) বরফে বন্ধ থাকে। ঘণ্টাখানেক ঘোরা হল। এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে হলদে রঙের সুন্দর একটা বাড়ি দেখিয়ে গাইড বললে ইউল ব্রেনারের বাড়ি। এক খোলা বাজারে নানারকম ফল দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এত সব ফল কি এখানে হয়? 'পাগল! এখানে কিছু হয় না। সব চিন থেকে আসে।'

শহর দেখে আবার স্টেশনে ফিরে এলাম। সেখানে বিরাট সুদৃশ্য রেস্টুরেন্টে আমাদের লাঞ্চের আয়োজন। সেখানে সেই যে বুশভক্ত খাজা আমেরিকান ভদ্রলোকটি আমাদের এই সদ্যসমাপ্ত ভ্রমণের ওপর একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা পড়লেন।

লাঞ্চের পর আবার বাস। কয়েকটি দ্রষ্টব্য জিনিস দেখতে হবে। কিন্তু আমাদের সময় মোটে আধবেলা। থলির মধ্যে কি হাতি পোরা যায়? এ সব জায়গা এক সময়ে চিন সাম্রাজ্যের ভেতর ছিল কিন্তু ১৮৬১ সালে রাশিয়ান সৈন্যেরা দুর্বল চিনের হাত থেকে এই অংশটা ছিনিয়ে নেয়। ব্লাডিভস্টক শহর এবং বন্দরের পত্তন তারাই করে। তারপর থেকে শহরটি বহু উত্থান পতনের ভেতর দিয়ে গেছে। ১৯০৫ সালে রুশ জাপান যুদ্ধের জাপানি গোলার আঘাতে শহরের তিন-চতুর্থাংশ ভেঙে পড়েছিল। ১৯১৯ সালে কমিউনিস্ট বিপ্লবের সময়ে তিন বছরের জন্য শহরটি শত্রুপক্ষের হাতে চলে গিয়েছিল। ১৯২২ সালে যখন লাল সেনা আবার শহরটি দখল করল তখন লেনিন বলেছিলেন 'বহু দূরের কথা হলেও শহর এখন আমাদের।' তার কারণ ছিল। ব্লাডিভস্টক নামেই তার পরিচয়। কথাটার মানে হল 'পূর্ব দেশের শাসক'।

ব্লাডিভস্টক ভালো করে দেখতে গেলে অন্তত তিনদিন সময় থাকা উচিত। আমাদের আধবেলায় প্রথমে গেলাম সাবমেরিন মিউজিয়াম। একটা পুরনো সাবমেরিনের ভেতরে সাবমেরিন সংক্রান্ত নানা জিনিস সাজিয়ে রাখা আছে। কয়েকজন সাবমেরিনের ভেতরে গেল। আমরা যাইনি। এখান থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল ঈগলের বাসা নামে ছোট একটা টিলার মাথায়। ফুনিকুলার করে উঠতে হয়। এখান থেকে অনেকটা প্যাসিফিক কোস্ট এবং রাশিয়ার গৌরব ওদের প্যাসিফিক নৌবাহিনীর বন্দর দেখা যায়। এখনকার দিনে এমনি ফটো নিতে কোনও বাধা নেই তবে টেলিফটো লাগালে আপত্তি হতে পারে। এরপরে

আরসোনভ ইতিহাস মিউজিয়ামে এক চক্কর ঘুরিয়ে আমাদের হোটেলে নিয়ে যাওয়া হল। তখনও দিনের আলো আছে। হোটেলে রাত্রিবাস। পরের দিন প্রাতরাশের পর উড়ানে মস্কো।

আমাদের হোটেলের সামনে চওড়া রাস্তাটা সিঁড়ি হয়ে নীচে এক বাগানে নেমে গেছে। কাজেই এ রাস্তা দিয়ে গাড়ির আনাগোনা নেই। হোটেল পর্যন্ত গাড়ি আসে আবার সেই দিকেই ফিরে যায়। ফলে এখানে একটা চত্বরের সৃষ্টি হয়েছে যেখানে নানারকম টুকিটাকি— ভেঁপু, বেলুন, বাঁশি, ফেরিওয়ালাদের বয়ে আনা খাবার বিক্রি হয়। ভিড় না হলেও, লোকের যাতায়াত আছে, নানারকমের লোক এবং স্ত্রীলোক। কখনও একা কখনও জোড়ায়। কয়েকজন মা পেরাম্বুলেটর ঠেলে বেড়াচ্ছে। প্র্যামের পিছনে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আরও একটি বা দুটি। অফিস ফেরত ক্লান্ত এক ভদ্রলোক একটা সসেজ রোল কিনে খেতে খেতে চলে গেল। বাচ্চাদের ঝোঁক লেবেঞ্চুস, টফির ওপর। এক তরুণ যুগলমূর্তি হাত ধরাধরি করে একটি আইসক্রিম বার কিনলেন। কাছেই বেঞ্চিতে বসে দুজনে দুজনের মুখে ওই একটি বার তুলে ধরছেন। কী হাসি! কত গল্প! দেখলাম ব্লাডিভস্টকই হোক আর কলকাতাই হোক, সারা পৃথিবীতে সেই এক মানুষ এক দেশ।

নয় ঘণ্টার পথ ব্লাডিভস্টক-মস্কো যাওয়ার সময় প্লেনটি আর্কটিক বৃত্ত ঘেঁসে যায়। তখন অত উঁচু থেকে উত্তর মেরুর সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা আচ্ছাদনটি দেখা যায়। ভাগ্যবান যাঁরা তাঁরা প্লেনের ডানদিকে বসেছিলেন এবং এঁদের কেউ কেউ সেই মেরুকেন্দ্রের বরফে ঢাকা মূর্তি দেখেছিলেন। বাকিরা জানলা বন্ধ করে ঘুমোলেন। আমরা স্থান পেয়েছিলাম প্লেনের বাঁদিকে এবং জেগেই ছিলাম। কিন্তু ডানদিকের কেউ একবার ডেকে বললেন না, 'এসো এসো দেখে যাও'। এখানে সবাই নিজ নিজ বাড়ির নিরিবিলিতে বাস করে এবং বিনা অনুমতিতে অপরের দরজায় করাঘাত করে না।

'ভ্রমণ' অক্টোবর, ২০০৪

আমার প্রথম বিলেত ভ্রমণ

হরপ্রসাদ মিত্র

বিলেতভ্রমণের ইতিকথা

১৯৪৩ সালে বি এসসি পরীক্ষা দিয়ে, ফল বেরোবার আগেই এক পিতৃবন্ধুর আনুকূল্যে তখনকার এক যুদ্ধ দপ্তরে চাকরির ইন্টারভিউ পেয়ে গেলাম। সে দপ্তরে সাহেবের ছড়াছড়ি। কোনও সাহেবের কাছে ইন্টারভিউ হবে। পিতৃবন্ধু বললেন যে একটা স্যুট পরে এলেই ভালো হয়। অন্ততপক্ষে শার্ট, ফুলপ্যান্ট আর টাই পরলেই চলবে। স্যুটের তো কথাই ওঠে না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ফুলপ্যান্ট একটা যোগাড় হল না। প্যান্ট একটা করিয়ে নেওয়া যেত কিন্তু যদি চাকরি না হয় সে মিছিমিছি গুনাগার কে দেবে? টাইয়ের কথাই ওঠে না। আমার পিতৃপুরুষের কালে কেউ কখনও টাই পরেনি। অতএব, তখন প্রচলিত কাবুলি ফ্যাশনে ধুতি মালকোচা মেরে পরে তার ওপরে শার্ট চড়িয়ে সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পিতৃবন্ধু কটমট করে তাকালেন, কিন্তু চাকরি হয়ে গেল।

এবার প্যান্ট তৈরি করিয়ে শার্ট প্যান্ট পরে কাজে যোগ দিলাম। আমার পদনাম অর্থাৎ ডেজিগনেশন হল টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। যদিও বাসের রড ধরে ঝুলে যাওয়া বা বাজারের পয়সা থেকে সিগারেটের জন্য দু- এক পয়সা সরানোর বাইরে আর কোনও টেকনিক আমার জানা ছিল না। অ্যাসিস্ট্যান্ট হলাম এক হৃদয়বান সাহেবের। সাহেব যুদ্ধের আগে এদেশে ব্যবসা সূত্রে এসেছিলেন। এখন যুদ্ধের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ। কাজেই এই অফিসে দিনগত পাপক্ষয় করছেন। যুদ্ধ যদি কখনও থামে (তখন তাই মনে হত) আবার ব্যবসায় ফিরে যাবেন।

সাহেবের তালিমে বছর তিনেকের মধ্যে আমি যখন মানুষ হলাম তখন একদিন যুদ্ধের অবসান হল। অনেক ছাঁটাই হল আমাদের অফিসে এবং হ্রস্বাকারে অফিসটি দিল্লি চলে গেল। আমিও সেই সঙ্গে দিল্লি বদলি হলাম। বরাবর কলকাতায় মানুষ আমি, দিল্লিতে যেন জলের মাছ ডাঙায়। খাবি খেতে খেতে বছর দেড়েক কাটল। তারপর একদিন আমার পুরনো সাহেব ব্যবসাসূত্রে দিল্লি এসে আমার খোঁজ নিলেন। বললেন যে 'আমি কলকাতায় অফিস খুলব। তুমি কি আমার সঙ্গে আসতে চাও?' আমি তো হাতে চাঁদ পেলাম। চাকরি যেমনই হোক কলকাতায় যেতে পাওয়াটাই মস্ত কথা।

কলকাতা এসে দেখলাম যে কলকাতার অফিস বলতে পুচকে একটা পার্টিশন দেওয়া ঘরে কেবল সাহেব আর আমি। একটা বেয়ারা পর্যন্ত নেই। চিঠি খামে ভরে পোস্টেজ স্ট্যাম্প মেরে আমিই পোস্ট করে আসতাম। কাজকর্ম নেই বললেই চলে। তখনও কলকাতায় হিন্দু- মুসলমান রায়টের জের কাটেনি, ব্যবসা বাণিজ্য খুব ঢিলে। একদিন সাহেবকে সে

কথা বলতে তিনি বললেন, তা নিয়ে তোমার চিন্তা কেন? ব্যবসা আজ নেই, কাল হবে। এবং তার জন্য তৈরি হয়ে বসে থাকতে হবে। তুমি সেই তৈরি হও। চিঠিপত্র যা আসে-যায় পড়। বাজারে ঘুরে খোঁজখবর নাও কী অবস্থা।

তারপর একদিন আমাকে ডেকে বললেন যে, দেখ, এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য আরও কিছুদিন ঢিলেই চলবে। তাই ভাবছি যে তোমাকে কয়েকমাসের জন্য আমাদের লন্ডন অফিসে পাঠিয়ে দেব। কাজকর্ম শেখার জন্য। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা বিদ্যুতের স্রোত বয়ে গেল। লন্ডন! কখনও কি ভাবতে পেরেছি যে আমি মুচিপাড়া, পটোপাড়ার হেলা-ফেলার ছেলে লন্ডন যাব! আমাকে নিরুত্তর দেখে সাহেব বললেন, কি তোমার কোনও আপত্তি নেই তো? —আপত্তি! আমাকে কাল বললে কালই চলে যাই।

কিন্তু কাল বলতে কালই যাওয়া হল না। নানা কারণে বছরদেড়েক সময় চলে গেল। এর মধ্যে আমার সাহেব চলে গিয়ে নতুন এক সাহেব এলেন মিঃ ব্রাউন। বছরখানেক থেকে তিনি চলে গেলেন, এলেন মিঃ ফোরম্যান। ফোরম্যান সাহেবের আমলে ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার প্রথম বিলেত যাত্রা। তখন লন্ডন যেতে ভারতীয়দের ভিসা লাগত না। পাসপোর্ট থাকলেই হল। তারপর টিকিট কাটা আর প্লেনে বা জাহাজে উঠে পড়। রওনা হবার আগে বিলাতের ঠান্ডা থেকে বাঁচবার জন্য ফোরম্যান সাহেব লিন্ডসে স্ট্রিটে গোলাম আলির দোকান থেকে কোম্পানির খরচে আমার কিছু শীতবস্ত্র করিয়ে দিলেন, সে দোকান অবশ্য এখন আর নেই।

এসব প্রায় ৬০ বছর আগের কথা। তখন কলকাতা-লন্ডন উড়ান চালু হয়েছে কিন্তু সে প্লেন এখনকার মতো এক লাফে লন্ডন যেতে পারত না। এবং যদিও তখনকার প্রোপেলর প্লেন এখনকার ৭৪৭ থেকে অনেক ছোট, সে প্লেন নামবার মতো রানওয়ে কলকাতায় তৈরি হয়নি।

দু-পাশে দুটি লম্বাটে বয়ার ওপর নির্ভর করে কলকাতায় প্লেন নামত বালি ব্রিজের কাছে ভাগীরথীর বুকে। প্লেন রাত্রিতে উড়ত না। আমাদের যাত্রা শুরু হল, প্রথম দিন করাচি। প্লেন সমুদ্র কিনারায় নামল। সেখানে হোটেলে রাত্রিযাপন। পরদিন করাচি থেকে কায়রো। প্লেন নামল নীলনদের ওপরে। কেমন যেন গা শিরশির করে উঠল। এই সেই নীলনদ। গল্প, ইতিহাস, ভ্রমণ কাহিনী, পুরাতত্ত্বের বইতে কত পড়েছি। সেখানেও রাত কাটল হোটেলে। হোটেলে একটি বেয়ারা আমাকে ইজিপ্টের বেলি ড্যান্সে নিয়ে যাবে বলল কিন্তু গেরস্তপোষা বাঙালি বাড়ির ছেলে আর পয়সাকড়িও তেমন হাতে নেই। সাহস করলাম না।

পরদিন সকালে উড়োজাহাজে ওঠবার আগে ব্রিটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কোম্পানি— তখন ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের এই নাম ছিল— যাত্রীদের পিরামিডআর স্ফিংস দেখাতে নিয়ে গেল। কায়রোতে তার পরেও কয়েকবার গেছি কিন্তু সেই প্রথম দর্শনের বিস্ময় আজও অম্লান হয়ে আছে। তার অন্যতম কারণ হল যে তখনও পিরামিডগুলি খোলামেলার মধ্যে ছিল। আজকের মতো শহর অতদূর ছড়িয়ে পড়েনি। নীলনদ পেরিয়ে সামান্য পথ গিয়েই গাছপালা, বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল তিনটি পিরামিড যেন তিনটি ছোটখাটো পাহাড় আকাশ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। মনে পড়ল আর একদিনের কথা। তখনও কলকাতার ট্রেন

পূর্ব পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে সোজা দার্জিলিং যেত এবং আবহাওয়া ভালো থাকলে শিলিগুড়ির অনেক আগে সমতল থেকে চোখে পড়ত আকাশ ফুঁড়ে ওঠা কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশিখর। সে কী অবাক বিস্ময়। পৃথিবীর কোনও জিনিস কি এত উঁচু হতে পারে। জানি না ফরাক্কার পথে এখনও সে বিস্ময় আছে কিনা, কিন্তু কায়রোতে তা আর নেই। এখন কায়রোতে বহুদূর পর্যন্ত তিনতলা চারতলা বাড়িগুলো পিরামিডকে ঢেকে রাখে, তারপর ক্রমে ক্রমে চূড়া থেকে ভিত পর্যন্ত পুরোটা দেখা যায়। হঠাৎ একটা বিরাটের দেখা পাওয়ার বিস্ময় তাতে থাকে না।

কায়রো থেকে রোম। এখানে আমার স্মৃতি আমার সঙ্গে কিছুটা কৌতুক করে। কায়রোতে কি আমরা প্লেন বদল করলাম না ওই একই প্লেনে বয়ার তলায় চাকা লাগানো ছিল! কেন না, রোমে আমরা ডাঙার এয়ারপোর্টেই নামলাম। তখনকার দিনে প্লেনে দুটি ক্লাস— ইকনমি আর ফার্স্ট। এর মধ্যে ভাড়ার তফাত দশ পার্সেন্টের মতো ছিল। আমি কোম্পানির পয়সায় ফার্স্ট ক্লাসেই যাচ্ছি। সারা পথ মাতিয়ে রেখেছিলেন এক ভারতীয় ভদ্রলোক। বেশ ফর্সা দোহারা-চেহারা, বয়েস ৪০-৪২ হবে। রোমে প্লেন থেকে নামবার সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম আপনার নামটা জানা হল না। তিনি যেন খানিকটা অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন। আমি, আমি তো ওই ন্যাভাল টাটা। জে আর ডি-র ভাই এবং টাটা কোম্পানির অন্যতম কর্ণধার।

আমি রোমেই নেমে গেলাম। তিনদিন থাকব। প্লেন লন্ডন অভিমুখে উড়ল, আরও ঘণ্টাতিনেক লাগবে। তার মানে এখন যে রাস্তা দশ ঘণ্টায় হয়, তখন তাতেই দু রাত্রি-তিনদিন লাগত। কারণ প্রোপেলর প্লেনের অপেক্ষাকৃত কম গতি এবং রাত্তিরে প্লেন উড়ত না।

এখন একটু খাওয়া-দাওয়ার কথা বলি। কারণ এই প্লেনেই আমার প্রথম খাস বিলাতি খানার এবং খাবার পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয়। তার আগে অনাদি কেবিন এবং চাচার হোটেল পর্যন্তই আমার দৌড় ছিল। প্রথম যখন আমার বিলেত যাওয়ার কথা উঠল তখন বহুবিধ প্রশ্নের মধ্যে আমার সাহেবকে আমি সসংকোচে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আমি তো কখনও বিলাতি হোটেলে খাইনি। কী দিয়ে কী করতে হয় কিছুই জানি না। সাহেব বললেন যে ওর জন্যে চিন্তা কর না, ছুরি কাঁটাগুলো টেবিলে যার পরে যা আসবে সেই পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে একটু নজর রেখ আর সুপের পাত্রটা নিজের উল্টো দিকে কাত করে সুপ পান করতে হয়। চা, কফি প্রভৃতি কাপ থেকেই খাবে। কদাপি ডিশে ঢালবে না। সেই সঙ্গে সাহেব আর একটা কথা বলেছিলেন, লিফটে একাধিক ব্যক্তি থাকলে আগে কে বেরোবে বলতো? আমি বললাম, বা রে যে দরজার সব চেয়ে কাছে সেই তো সকলের আগে বেরুবে। সাহেব বললেন, উঁহু, আগে মহিলাদের বেরোতে দেবে, তারপর বয়োবৃদ্ধদের। সাহেবের উপদেশ আমার খুব কাজে লেগেছিল।

প্লেনে প্রথম খাওয়াটা বোধহয় লাঞ্চ ছিল। তাতে আমি যে প্লেটটা চাইলাম তার

প্রধান কোর্স ছিল ভিল। বিলাতি এয়ারহোস্টেস আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'জানতো ওটা গোমাংস'? কিন্তু তখন নবযুবক আমি আর পিছন ফিরতে পারি না। বুক ফুলিয়ে বললাম 'জানি বই কি।' আর একটা কথা। ডিশটি আমার ভালোই লাগল। এই উড়ানেই আর কয়েকটি বিলাতি তথা ইংরিজি খাবারের সঙ্গে পরিচয় হয়। সসেজ বেকন আমি সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ করলাম। খালি ওদের ফেটানো ডিমের ওমলেট আমাদের মামলেটে অভ্যস্তদের ভালো লাগবার কথা নয়। কয়েক মাস লেগেছিল ওটাকে ভালো লাগাতে। আর একটা জিনিসের সঙ্গে আমার প্রথম আস্বাদনেই প্রেম হল। সেটা হল চিজ। পরে জেনেছিলাম যে ওটা ইংলিশ চেডার চিজ, বেশ মাইল্ড। কামেমবেয়ার্ট, গরগনজোলা, রকফোর্ট প্রভৃতি কুলীন চিজের কদর করতে অনেক পরে শিখেছি।

তিনদিন রোমে কাটিয়ে একদিন সকালে লন্ডন যাত্রা। ঘণ্টা দুই পরে লন্ডন পৌঁছলাম। ইমিগ্রেশন, কাস্টমস পেরিয়ে মোটঘাট নিয়ে বাইরে এসে দেখি ব্রাউন সাহেব দাঁড়িয়ে। ওঁর গাড়িতে চড়ে বসলাম। প্রথম কিছুদূর দু-দিকে ফাঁকা মাঠ, ছোট ছোট খেত। বসবাসের বাড়ি ঘন হয়ে এল, মাঝেমাঝে দোকান, পাব, বহির্লন্ডনের মাঝখান দিয়ে গাড়ি চলেছে। এলিভেটেড হাইওয়ে এম ৪ তার অনেক পরে।

দুদিকে সারি সারি লাল রঙা বাড়ি। আকাশ মেঘে ঢাকা। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় লোকজন কম, যারা আছে তারা কালো ছাতায় মাথা মুখ ঢেকে ত্রস্ত পায়ে চলে যাচ্ছে, মনটা কেমন যেন দমে গেল। এই সেই সখের লন্ডন! সাধের লন্ডন! রৌদ্রকরোজ্জ্বল রোমের রাস্তায় ভিড়, কোলাহল, কাফে-বারের পরে কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে মনে হল।

ক্রমে ক্রমে শহরের চেহারা বদলে গেল। দু-দিকে গায়ে গায়ে লাগা চারতলা পাঁচতলা বাড়ি। সাদা, বাদামি, ধূসর পেন্ট করা। একটা চওড়া রাস্তার দুদিকে পরের পর হোটেল, ছোট ছোট ব্রেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট হোটেল— রাস্তার নাম দেখলাম ক্রমওয়েল রোড। ব্রাউন সাহেব গাড়িও চালাচ্ছেন, আবার নানা গল্প করে যাচ্ছেন। লন্ডনের বিভিন্ন জায়গার পরিচয় দিচ্ছেন। এবার গাড়ি বিরাট এক ময়দানের মধ্যে এসে পড়ল। সাহেব বললেন, হাইড পার্ক। ময়দান পেরিয়ে বেজওয়াটার নটিং হিল এবং আরও কিছুটা পরে বাঁদিকে আরেকটা ময়দান। সাহেব পরিচয় দিলেন, লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড। তখন অবশ্য কলকাতায় ফুটবলই রাজা। ক্রিকেট নিয়ে আমাদের মানে বাঙালিদের অত মাতামাতি ছিল না। সাহেব বললেন, প্রায় এসে গেছি। একটা বাদামি রঙা তিনতলা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে, সাহেব নিজেই আমার ভারি স্যুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে চললেন, আমি তো অবাক। ছোটখাটো মোটঘাটগুলো আমি সামলে নিলাম।

যেখানে উঠলাম তাকে লন্ডনের ভাষায় বলে ডিগস। তবে মিসেস ম্যাকাফির বইতে পড়া লন্ডন ডিগসের মালকানিদের মতো অমন ঢিলে ঢালা মানুষ ছিলেন

না। তাঁর কোনও যুবতী কন্যাও ছিল না। অধিকন্তু একজন মিঃ ম্যাকাফির ওই বাড়িতেই থাকতেন। তবে তাঁকে বিশেষ দেখা যেত না। মধ্যবয়সী মিসেস ম্যাকাফির ইস্ত্রি করা স্কার্ট ব্লাউজ পরে খটমট করে ঘুরে বেড়াতেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি বোর্ডিং হাউস বলতেন। মিঃ ব্রাউন আর আমাকে দেখে মিসেস ম্যাকাফির হেসে দুজনের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন মিঃ মিত্রের ঘর আমি তৈরি রেখেছি। উনি নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে চাইছেন। মিঃ ব্রাউন সময়োচিত কুশল প্রশ্নাদির পর মিসেস ম্যাকাফিরের হাতে আমাকে সমর্পণ করে চলে গেলেন। বলে গেলেন যে পরদিন সকালে এসে আমাকে অফিসে নিয়ে যাবেন।

মিসেস ম্যাকাফির আর আমি পাতলা কার্পেট মোড়া কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় আমার নির্দিষ্ট ঘরে গেলাম। এবার স্যুটকেস আমার হাতে। অন্য জিনিসগুলি মিসেস ম্যাকাফির সামলালেন। বেশ বড় ঘর তবে সে তুলনায় আসবাবপত্র না থাকায় ঘরটা যেন একটু খালি দেখাচ্ছে। কাঠের মেঝে ঝকঝকে পরিষ্কার— ঘরের মাঝখানে একক শয্যার ওপর ধবধবে বিছানা। পাশে একটা আলমারি আর একটা সাইডবোর্ড। একটা হুক লাগানো কাঠের স্ট্যান্ড— তাতে কোট বা ওভারকোট ঝুলিয়ে রাখা যায়। সংলগ্ন বাথরুমটিও ভালো। সেখানে বেসিন, বাথটব, টয়লেট ছাড়াও আর একটি জিনিস ছিল যা আমি কখনও দেখিনি। মিসেস ম্যাকাফিরকে জিজ্ঞেস করতে তিনি মুখ লাল করে বললেন— ওটা তুমি মিঃ ম্যাকাফিরকে জিজ্ঞেস কর। কিছুদিন পরে জেনেছিলাম যে বস্তুটির নাম বিদে।

ঘর দেখাতে দেখাতেই মিসেস ম্যাকাফির তাঁর বোর্ডিং হাউসের নিয়মকানুন বলছেন। সকাল আটটা থেকে ন-টা ব্রেকফাস্ট। লাঞ্চ যার যেখানে সুবিধা বাইরে খাবে, এখানে কোনও ব্যবস্থা নেই। সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ডিনার। ডিনার সাড়ে ছটায়? কলকাতায় দশটা সাড়ে দশটার আগে খাবার কথাই ওঠে না। কিন্তু কী আর করা যাবে 'পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।' কিন্তু ঘুম থেকে উঠে এক বাটি চা। তার বন্দোবস্ত নেই। খুব অবাক হলাম। আমার ধারণা ছিল যে সকালে এক কাপ চা না খেলে সাহেবরা আড়মোড়া ভাঙতে পারেন না। মিসেস ম্যাকাফিরকে সে কথা বলতে তিনি বললেন যে এখানে কেউই সকালে চা খায় না। কিন্তু তুমি যদি চাও তো আমি ব্যবস্থা করতে পারি। তবে তারজন্য আলাদা পয়সা লাগবে। তাই সই। মিসেস ম্যাকাফির আরও বললেন যে দিনে একবার মেড এসে ঘর এবং বাথরুম পরিষ্কার করে যাবে এবং সপ্তাহে একবার বিছানার চাদর ইত্যাদি বদলে দেবে। মর্নিং টি ছাড়া থাকা-খাওয়া সব মিলিয়ে খরচ পড়বে সপ্তাহে পাঁচ পাউন্ড। আমাদের দেশেও সে সময়ে চার টাকায় একমন চাল পাওয়া যেত।

মিসেস ম্যাকাফির বললেন, ব্রেকফাস্ট তুমি নিশ্চয়ই আগেই খেয়েছ। এখন চানটান করে একটু বিশ্রাম কর। তারপর বাইরে গিয়ে লাঞ্চ খেয়ে আসবে। এই

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে দু-তিন মিনিট গেলেই ফিঞ্চলি রোড। তার মোড়ে বেশ কয়েকটা খাবার দোকান আছে। পাবও আছে যদি চাও। এই নাও সদর দরজার চাবি। হারিও না যেন। আর এই যে দেখছ গ্যাস বার্নারের মতো জিনিসটা, এটা ঘর গরম করবার জন্যে। পাশের বাক্সটায় পেনি ফেললে উনুনে গ্যাস আসবে। তবে এখন দরকার নেই। আরও শীত পড়ুক। দুপুরে খেয়ে দেয়ে এসে লম্বা একটি ঘুম দিলাম।

সন্ধ্যাবেলায় খাবার সময় বাড়ির অন্য বোর্ডারদের সঙ্গে দেখা হল। দুটি ছেলে, চার পাঁচটি মেয়ে। সবাই সঙ্গীতের ছাত্র-ছাত্রী। আরও কয়েকজন আছে কিন্তু ওরা সেদিন খেতে আসেনি। ছেলেদুটির মধ্যে একজন হ্যারি। সে এদের সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ। লম্বা দোহারা চেহারা। রংটা একটু লাল মেশানো সাদা। বেহালা বাজায়। ইহুদি। বেশ দেখতে। কিন্তু উপস্থিত মেয়েরা দেখছিলাম যে ওর দিকে বিশেষ ঝোঁকে না। বয়েস বেশি বলে, না ওর অন্য কোনও বান্ধবী আছে বলে, তা শেষ পর্যন্ত জানতে পারিনি। অন্য ছেলেটি জন, বয়স আর সকলের মতো। রং খড়ির গুঁড়ো মাখা সাদা। উল্টানো ব্রাউজ চুল। লম্বা একহারা মুখে সব সময়েই একটা দুষ্টু হাসি। খাঁটি ইংল্যান্ডের ইংরেজ। চেলো বাজায়। এই দেখলাম আমাদের বোর্ডিং হাউসের হিরো। মেয়েরা সব গোপিনী— তবে মনে হল যে শ্রীরাধিকা এখনও অবতীর্ণা হননি।

মেয়েদের মধ্যে প্রথমেই মরিনের নাম করতে হয়। দেখতে এমন কিছু আহামরি নয়। ওদেশের তুলনায় ছোটখাটো মানুষ। ফ্রেকলড চামড়া, কোঁকড়ানো বাদামি চুলের নীচে জ্বলজ্বল চোখদুটো মজায় ভরপুর, এদিকে সকলের সঙ্গে সহজে ভাব করে নিতে পারে। ওয়েলসে বাড়ি। পিয়ানো বাজায়। রুথের বাড়ি আমেরিকায়। খাস নিউইয়র্ক। ইহুদি। উচ্চতা সাধারণ বাঙালি মেয়ের মতো। গোলগাল। সবসুদ্ধ বেশ সুন্দর দেখতে এবং সেই সৌন্দর্যের ওপর ওর নিজের কারুকার্যও কিছু কম নয়। এরও বেহালা। দু বছরের জন্যে লন্ডন এসেছে। একদিন কথায় কথায় রুথ বলেছিল যে আমার বয়েস মোটে ষোলো হতে পারে কিন্তু আমি ২১-২২ বছরের মেয়েদের মতোই পাকাপোক্ত। চার-পাঁচ বছর পরে রুথের সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়েছিল নিউইয়র্কে। তখন ওর বিয়ে হয়ে গেছে, বেশ ছেলেটি। কিন্তু ও কীরকম রোগাটে মেরে গেছে। যৌবনের সে লাবণ্য আর নেই। মিসেস ম্যাকাফিরের বোর্ডিংয়ে আর একটি মেয়ে ছিল, নাম কেট। একেবারে গ্রামের মেয়ে। সাদামাঠা। এমনকী লিপস্টিকও ব্যবহার করে না। মিডলান্ডসের ওদিকে কোথায় যেন তার বাড়ি। ভায়লা বাজাত।

পরদিন সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়ে তৈরি হয়ে বসে রইলুম। ব্রাউন সাহেব এসে আমায় অফিসে নিয়ে যাবেন। ন-টার সময় সাহেব এলেন এবং প্রথমেই পকেট থেকে বার করলেন একটি প্যামফ্লেট আর একটি পুস্তিকা। প্রথমটি লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড বা টিউবের ম্যাপ। দ্বিতীয়টি লন্ডনের পথ পরিচয়। আন্ডারগ্রাউন্ড

বুঝতে সময় লাগল না কিন্তু পথ পরিচয় ব্যবহার করতে কয়েক সপ্তাহ লেগেছিল। ব্রাউনের সঙ্গে বেরিয়ে সুইস কটেজ স্টেশন। সেখানে আর এক বিস্ময়। এসকেলেটর। চলন্ত সিঁড়ি। সিঁড়ি দাঁড়িয়ে থাকে আর আমরা চলি তাই বরাবর দেখে আসছি। কিন্তু এখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি আর সিঁড়ি চলছে। আজব ব্যাপার।

অফিসে প্রথম দিনেই কোম্পানির সেক্রেটারি মিঃ ব্রডবেন্ট— ধীর, স্থির, বৃদ্ধ, কথা এত আস্তে বলেন যেন শোনাই যায় না— আমাকে ডেকে বললেন যে অফিসে লাঞ্চ তোমাকে পয়সা দিয়ে খেতে হবে না। আমরা তোমাকে কুপন দেব যার বিনিময়ে নীচে রাস্তায় কয়েকটা রেস্টুরেন্ট তোমাকে খেতে দেবে। কুপন পেলাম সাড়ে তিন শিলিং (মেয়েদের তিন শিলিং), কিন্তু তাতেই একটা মেন কোর্স একটা মিষ্টি ডিশ বা চিজ এবং এক কাপ চা বা কফি পাওয়া যেত। চিজ, ডিম, মাখন এবং আরও কয়েকটা জিনিসে তখনও ইংল্যান্ডে কড়াকড়ি রেশন। আমরা অফিসের কজন খেতে যেতাম এক বেসমেন্টে ডিকের রেস্টুরেন্টে। সেখানে এক বুড়ি পরিবেশিকার আমাকে খুব পছন্দ হল। একেই বলে কপাল, না হলে ডিকের আড্ডায় কয়েকজন তরুণীও ছিলেন। যাই হোক, প্রার্থিত চিজ না পেয়ে আমার মুখে হতাশার চিহ্ন দেখে বুড়ি একেক দিন আমার জন্যে চিজ আলাদা করে রেখে দিত। আমি রেস্টুরেন্টে ঢুকতেই বুড়ি একমুখ হেসে বলত, আজ তোমার জন্যে চিজ রেখে দিয়েছি। তখনকার দিনে লন্ডনের প্রায় সব অফিসই নিম্নমানের কর্মচারীদের লাঞ্চ কুপন দিত। সব কুপনই একরকম দেখতে এবং কুপনের মাঝখানে কালো আর সবুজ রঙের ঘরের মধ্যে বড় বড় করে লেখা থাকত LV অর্থাৎ Lunch Voucher। সারা লন্ডন শহর জুড়ে অনেক খাবার জায়গায় দরজা বা অন্য কোনও চোখে পড়ে এমন জায়গায় এই কুপনের ছবি দেওয়া থাকত যাতে খদ্দেররা বুঝতে পারে যে এই সব দোকান কুপনের বদলে খাবার দেয়। এখন সে প্রথা আর নেই। সে কুপনের ছবি আর দেখা যায় না। সে দামও নেই।

একটি অতি লক্ষণীয় প্রতিষ্ঠান লন্ডনের রাস্তা থেকে একেবারে উঠে গেছে, সেটি হল লায়নস কর্নার হাউস। এটি ছিল একটি চেইন রেস্টুরেন্ট। মধ্য লন্ডনের সর্বত্র দেখা যেত দুটি বড় রাস্তার আড়াআড়ি ছেদের কোনও একটি কোণে। সেই জন্যেই নাম কর্নার হাউস। বিশাল এরিয়া নিয়ে সাজানো গোছানো রেস্টুরেন্ট। ছড়িয়ে বসার মতো চেয়ার, টেবিল। চা, কফি খাদ্যাদি সব পাওয়া যেত। এদিকে দামে মধ্যবিত্ত। সর্বদাই লোক সমাগমে ভরপুর। কারুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে লোকে বলত অমুক কর্নার হাউসে এতটার সময়। লন্ডনের আর একটি প্রতিষ্ঠানের চেহারা আগাগোড়া বদলে গেছে। সে হল বিলাতের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান পাব বা পাবলিক বার। তখনও লন্ডনের পাবগুলো বইতে পড়া পাবের মতো ছিল। কাঠের দেওয়াল, কাঠের মেঝে, তাতে বহু জায়গায় করাত কলের গুঁড়ো ছড়ানো। মোটাসোটা হাস্যমুখী বারমেড। পাবের খদ্দেররা বেশিরভাগই

পাড়ার লোক। তাদের সঙ্গে মদ্য পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা চলছে। প্রায় প্রত্যেক পাবের নিজস্ব মালিক পেট্রন। তার সঙ্গে নিয়মিত খদ্দেরদের সকলের চেনাশোনা। সমস্ত মিলিয়ে বেশ একটা আপনাআপনি ভাব। কলকাতায় সে সময়ের সাঙ্গুভ্যালি চা-খানার মতো। এখনও কয়েকটি জায়গায়, সেকালের পাবকে দেখবার জিনিস হিসেবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। এখন স্টিল, ক্রোমিয়াম, নিওন সাইনের নতুন পাবগুলোতে— যারা সবাই কোনও চেইনের অন্তর্গত— সে পুরনো দিনের অন্তরঙ্গতা আর বেঁচে নেই।

সুইস কটেজ থেকে অক্সফোর্ড সার্কাস বিকারলু লাইন। এখানে ট্রেন বদলে সেন্ট্রাল লাইনে ব্যাঙ্ক স্টেশন। আমাদের অফিস ওখান থেকে পাঁচ সাত মিনিটের হাঁটা পথ।

এমন কিছু বড় অফিস নয়। একটা হল আর চার পাঁচটা ঘর। ছেলেমেয়ে মিশিয়ে ৩০-৩৫ জন। ব্রাউন সাহেব আমাকে হলে এবং ঘরে ঘরে নিয়ে গিয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন মায় স্টেনোগ্রাফার মেয়েদের সঙ্গেও। আমার পক্ষে এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা। কারণ ভারতে সরকারি অফিসে এবং হয়তো বা বেসরকারি অফিসেও এরকম কোনও প্রথা ছিল না। বহু জায়গায় এখনও নেই। দেখলাম যে অফিস দেখতে আমার যতটা আগ্রহ ছিল, আমাকে দেখতে ওদের কৌতূহলও তার চেয়ে কিছু কম ছিল না। তখন লন্ডনে ভারতীয়দের সংখ্যা এত বেশি ছিল না। বিশেষ করে ব্যাঙ্ক বা বনেদি অফিস অঞ্চলে ভারতীয় কমই দেখা যেত। মনে হয় যে আমার সহকর্মীদের অনেকেই বাসে, ট্রেনে, টিউবে ভারতীয় দেখলেও এত কাছাকাছি থেকে ভারতীয়দের কাউকে দেখেননি। ব্যতিক্রম ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল। তিনি তাঁর রেজিমেন্টের সঙ্গে পেশোয়ারে কিছুদিন কাটিয়েছেন। আমার সঙ্গে দু-চারটে হিন্দি কথা বললেন। আমার জায়গা হল হলঘরের একদিকের চেয়ারে, যেখানে জাহাজে মাল ওঠা নামার হিসেব রাখা হয়।

সন্ধ্যাবেলা অফিস ছুটি হলে নিজে নিজেই বাড়ি ফিরে এলাম। টিউবের কল্যাণে সহজ রাস্তা। লক্ষ করলাম যে ব্যাঙ্ক স্টেশনে ট্রেন এলে মাইক্রোফোনে কী একটা কথা বার বার বলে যায়। বেশ কিছুদিন পরে বুঝতে পারলাম যে, ও বলছে, মাইন্ড দ্য গ্যাপ। প্ল্যাটফর্ম এবং ট্রেনের পাদানির মধ্যে একটু ফাঁক আছে, তাই এই সতর্কতা। খুব ভালো লাগল। এই গ্যাপ এবং এই সাবধানবাণী এখনও আছে। বাড়ি ফিরে ডিনার। অল্পস্বল্প গল্প। তারপর যে যার ঘরে চলে গেল। আমাদের বোর্ডিং হাউসে কোনও কমনরুম বা অন্য বসবার জায়গা ছিল না। থাকলে আমার মতো নবাগতদের পক্ষে ভালো হত। অন্য বোর্ডারদের সঙ্গে আলাপ করার একটা জায়গা থাকত। এখন খাওয়ার পর নিজের ঘরে গিয়ে বই পড়া ছাড়া অন্য কোনও পন্থা ছিল না। তখনও টিভি চালু হয়নি। আমার রেডিও নেই।

কিন্তু বই আর কাঁহাতক পড়া যায়। মানুষের সঙ্গ, আড্ডাও দরকার। কয়েকদিন

পরে লক্ষ করলাম যে রাত্তিরে ডিনারের পরে কোনও কোনওদিন ওপরের একটা ঘরে বোর্ডারদের আড্ডা জমে কিন্তু সেখানে আমি যাই কী ছুতোয়? বিশেষ করে ওরা সবাই আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। সপ্তাহের দিনগুলো তবু অফিস থাকে কিন্তু সপ্তাহান্তটা কাটতে চায় না। লন্ডন শহরে আমার বা আমাদের জানাশোনা কারুর আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই। কী করি? কোথায় যাই? একদিন দোতলা বাসের মাথায় চড়ে, বাসের শেষ পর্যন্ত গেলাম আবার সেই বাসেই অন্যপাশে বসে ফিরে এলাম। কন্ডাক্টর তো অবাক। তখন বাসের দোতলায় অঢেল সিগারেট খাওয়ার অনুমতি ছিল। রাস্তার দোকানপাট, লোকজন দেখতে দেখতে সময়টা মন্দ কাটল না। কিন্তু তা বলে রোজ তো বাসে চড়ে খামোকা ঘুরে বেড়ানো যায় না।

এই সময় মিসেস ম্যাকাফির আমাকে একদিন বললেন যে তুমি রোজ রোজ ডিনারের পরে নিজের ঘরে বসে কী কর? ইয়ং ম্যান, সন্ধ্যাবেলা এখানে ওখানে যাবে, সপ্তাহান্তগুলো নিজের ঘরে বসে না কাটিয়ে কোথাও বেড়াতে যাবে, না হয় লন্ডনে এতগুলো মিউজিয়াম, ছবির গ্যালারি, রবিবার হাইড পার্কে, স্পিকার্স কর্নার কত কী দেখবার আছে, সেগুলো দেখ। পাড়ায় কয়েকটা পাব আছে। সন্ধ্যাবেলা সেখানে যেতে পার। না হলে, সারাক্ষণ ঘরে বসে থেকে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে। সশ্রদ্ধ বিনয়ে তাঁকে জানালাম যে লন্ডনে আমি আপিসের বাইরে কাউকে চিনি না। পাবে আমি একদিন গিয়েছিলাম। কিন্তু এত গোলমাল হই চই আমার ভালো লাগে না। উনি বললেন যে পাবে তুমি বোধহয় সাধারণ বারে গিয়েছিলে। সেলুন বারে ঢুকে দেখ দু-এক পেনি দাম বেশি পড়ে বটে কিন্তু আবহাওয়া অনেক শান্ত। ওখানে ছেলেদের অতিথি হিসেবে মেয়েদেরও যেতে দেওয়া হয়। কাজেই সকলের ব্যবহারই ভদ্রতর। তখনকার লন্ডনে পাব একান্তভাবে ছেলেদের আড্ডা ছিল। কোনও কোনও পাবের দরজায় লেখা থাকত পুরুষ সঙ্গী বিনা মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ। আজকের দিনে কেউ এরকম প্রভেদমূলক আচরণ করতে সাহস করবে না। এছাড়াও এই গলির মোড়ে একটা কাফিখানা আছে, সেখানেও ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যার পরে আড্ডা দেয়। সপ্তাহান্তে আমাদের জগদ্বিখ্যাত মিউজিয়াম, ছবির প্রদর্শনীগুলো দেখ। লন্ডনে অনেক থিয়েটার। এই তো আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটার ওপারে একটা ছোট থিয়েটার আছে। সিনেমাও দেখতে পার। এই করেই তো লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। না হলে, নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকলে কেউ কি আর যেচে আলাপ করতে আসবে?

মিসেস ম্যাকাফিরের কথা শুনে একদিন পাড়ার থিয়েটার দেখে এলাম। বেশ লাগল। কিন্তু ওয়েস্ট এন্ডের বড় বড় থিয়েটার আমার তহবিল নিয়ে দুঃসাধ্য ছিল। সিনেমা দেখতে পারি কিন্তু সিনেমার ইংরিজি কথাবার্তা অনেক বুঝি না। সে অসুবিধা এখনও আছে। তবে ব্রিটিশ মিউজিয়াম আর ন্যাশনাল গ্যালারি আমার

চোখে দুটো নতুন জগৎ খুলে দিল। আর দুটোর কোনওটাতেই পয়সা লাগত না। পয়সা এখনও লাগে না। তবে কর্তৃপক্ষ দর্শকদের অনুরোধ করেন যেন প্রতিষ্ঠানদুটির রক্ষণার্থে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তারা সম্প্রদান বাক্সে কিছু পয়সা দিয়ে যান। বিদেশের যত মিউজিয়াম বা ছবির প্রদর্শনী আমি দেখেছি তার কোথাওই এই বিনামূল্যে প্রবেশ নেই। এদিক দিয়ে লন্ডন অনন্যসাধারণ। এই সময়েই আমি ন্যাশনাল গ্যালারিতে রেনেসাঁস যুগের ছবি সম্বন্ধে পরপর আট-দশটা বক্তৃতা শুনি। এটাও বোধহয় বিনামূল্যে ছিল। ছবির সম্বন্ধে সেইটুকু উপলব্ধি পশ্চাৎ জীবনে অনেক কাজে লেগেছে। এখনও লাগে।

ইতিমধ্যে অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় হয়েছে। আমি যদিও অতিশয় নিম্নপদস্থ লোক, একমাত্র ভারতবর্ষীয় হিসেবে অফিসে আমার একটা বিশেষ মূল্য ছিল। ভারতবর্ষীয় ব্যবসা সম্বন্ধে কখনও দুই ম্যানেজার এবং অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীরা আমার পরামর্শ চাইতেন। এমনকী দুই ভাই ডিরেক্টরও যাতায়াতের পথে আমাকে কুশল প্রশ্নাদি করতেন। এমনই এক সময় সার্জ, মানে অফিসে যে লোকটি চিঠিপত্র পাঠাবার চার্জে ছিল, সে একদিন আমাকে তার বাড়িতে সান্ধ্যভোজের নেমতন্ন করল। সার্জ কথাটা এসেছে সার্জেন্ট থেকে। যুদ্ধকালীন সেনাদলে সার্জেন্ট হয়েছিল। নাতিদীর্ঘ দোহারা চেহারা, লাল মুখে দাড়ি-গোঁফ কামানো, খাস লন্ডনের আসল বাসিন্দা। চিঠি পাঠানো সম্বন্ধে তার কতগুলো আজব মতবাদ ছিল। আমার নিজের চিঠিতে হাতে লেখা খামের বাঁদিকের কোণে নিজের ঠিকানা দিতাম বলে সে বলত, এ আবার কী? দেখ চিঠি তোমার কাছে ফেরত আসবে। কার্ডিফ-এ আমার এক বাল্যবন্ধু থাকত। তাকে এয়ারমেল মার্কা খামে চিঠি দিলে সে বলত, কার্ডিফে এয়ারমেল নেই। দেখ এ চিঠি যাবে না। পোস্ট অফিসেই পড়ে থাকবে। পোস্ট অফিসের কর্মচারীদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে তার এইরকম অশ্রদ্ধা ছিল। যদিও আমার কোনও চিঠি ফেরত আসেনি। কার্ডিফের চিঠিও যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছেছে।

নির্ধারিত দিনে সন্ধ্যাবেলা সার্জের সঙ্গে তার বাড়িতে গেলাম। লন্ডনের কোনও ঘিঞ্জি পল্লিতে মধ্যবিত্ত এলাকায় গায়ে গায়ে লাগানো সেমি ডিটাচড বাড়ি। তারও সামনে পোস্টেজ স্ট্যাম্প সাইজের জমিতে একটু বাগান। ওপরের জানালায় ফুলের টব। বাড়ির ভেতর বেশ সাজানো গোছানো। বুঝলাম যে সার্জপত্নী বিত্তবতী না হলেও রুচিশীলা। এক নিমেষে শান্ত বাড়িটা সার্জের হাঁকডাকে গরম হয়ে উঠল। রান্নাঘর থেকে অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে সার্জপত্নী ছুটে এলেন। স্বাস্থ্যবতী হাস্যমুখী পূর্ণযৌবনা মহিলা। করমর্দন, কুশল প্রশ্নাদি হল। সার্জ ততক্ষণে আমার হাতে এক গ্লাস পেল এল ধরিয়ে দিয়ে নিজে এক গ্লাস নিয়েছে। তখন বিলেতে সাধারণ লোকের মধ্যে কন্টিন্টোল বিয়ার খাওয়ার চল ছিল না। মেয়েরা খেত সাইডার (গাঁজানো আপেলের রস)। বউকে বলল, খাবার কত দেরি? মহিলা হেসে বললেন সব তৈরি, তোমরা এসে বস।

খাবার জায়গাটি বসবার ঘর থেকে আলাদা। ছোট টেবিল ঘিরে চারটে চেয়ারই থাকে। আজ পাঁচটি লাগানো হয়েছে। টেবিলে বসে সার্জ বউকে জিজ্ঞেস করল, সে দুটো কোথায়? বউ বলল, ওই তো সিঁড়ির কোণ থেকে উঁকি মারছে। চেয়ে দেখি দুটি ছেলে। বয়স আট আর দশ হবে। বাবার ডাকে ওরা লাজুক মুখে টেবিলে এসে বসল কিন্তু বসার আগে ছোট ছেলেটি বাবার কানে কানে কী যেন বলল। সার্জকে হাসিতে ফেটে পড়তে দেখে আমি ওর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলাম। হাসি সামলে সার্জ বলল যে ওরা খুব আশাহত। এ আবার কী রকম ইনজন! মাথায় পালক দেওয়া টুপি নেই! গায়ে রংবেরঙের জামা নেই! সাজপত্নী লজ্জায় মুখ নিচু করে বললেন, ও কথা যাক। আমি বললাম, তাতে কী হয়েছে। একদিন না হয় আমি পালকওয়ালা টুপি পরে ওদের সঙ্গে দেখা করতে আসব। পরিতাপের বিষয় যে সার্জের বাড়িতে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। খাওয়া-দাওয়া ভালোই হল। ইংল্যান্ডের ঘরোয়া রান্না। তার স্বাদই আলাদা। রাত দশটা নাগাদ সার্জ আমাকে নিকটবর্তী টিউব স্টেশনে পৌঁছে দিল।

এরপর মাঝে মাঝে ম্যানেজার এবং অন্য সহকর্মীদের বাড়িতে সান্ধ্যভোজের নেমন্তন্ন হত। তবে আমার সাহেব বা ব্রাউন সাহেবের বাড়িতে কখনও যাইনি। কারণ ওঁরা তখনও অবিবাহিত। দুজনেই অবশ্য বাইরে খেতে নিয়ে গেছেন। সব চেয়ে মনে আছে সহকারী ম্যানেজার ইসি নয়বার্গারের বাড়ি এক শনিবারের দুপুরে লাঞ্চ খেতে যাওয়া। ভদ্রলোকের চেহারাটা অবিকল সুকুমার রায়ের আঁকা হাতুড়ের মতো। ওই রকমই বেঁটে মোটা চেহারা। একমাথা টাক আর একমুখ হাসি। ওই রকমই স্যুটের ওপর একটা অ্যাপ্রন পরে অফিসে ঘুরে বেড়াতেন যাতে স্যুটে কোনও দাগ না লাগে। ওঁরা কট্টর ইহুদি। পিতৃভাষা জার্মান। ওঁর বাড়িতে পৌঁছতেই উনি বললেন, দেখ আজ শনিবার আমাদের বাড়িতে ধূমপান নিষেধ। আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না। উনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিলেন যে অফিসে আমি ঘন ঘন সিগারেট খাই। তখন তাতে কোনও পাপবোধ ছিল না। ওঁরও মুখে চিরাচরিত পাইপটি দেখলাম না।

ইসি বিপত্নীক কিন্তু তাঁর অবিবাহিতা তিনটি কন্যা— কেউই নবযুবতী নন— খুব আদর আপ্যায়ন করলেন। ওখানেই আমি বোধহয় প্রথম ওয়াইন খেলাম। খাবার আগে সবাই গল্পগাছা করছি, এমন সময় টেলিফোন বাজতে শুরু করল। কেউ উঠে ফোন ধরে না। আমাকে একটু অস্থির দেখে ইসি বললেন যে শনিবার আমাদের ফোন করা বা ধরার নিয়ম নেই। সেই সময়ে মানে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার পর্যন্ত ইহুদিদের সাবাথ। বিশ্রামের দিন। তার নিয়মকানুনের কথা শুনে আমার তো চক্ষুস্থির। এর এক বছর পরে আমি তখন কলকাতায়, ইসি ব্যবসাসূত্রে কলকাতায় এসেছিলেন। সেখান থেকে করাচি যাবেন। আমি সঙ্গে গেলাম। তখনও ভারতীয়দের পক্ষে পাকিস্তানে যাওয়ায় কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না। করাচিতে আমাদের এক শনিবার পড়ল। সকালে ব্রেকফাস্টের সময় ইসি আমায়

বললেন যে পরিবেশকদের বকশিশ তুমি দিও। আমি আজ পয়সা ছোঁব না। তারপর আমি আমার সেই সমধর্মীর বাড়ি যাব। সে আফগানিস্তানের লোক। করাচিতে থাকে। আগেই আমরা খবর নিয়েছিলাম যে সে ভদ্রলোকের বাড়ি আমাদের হোটেল থেকে মাইল তিনেক। বললুম, কী করে যাবে? আজ তো তুমি গাড়ি চড়বে না। হেঁটেই যাব। কী আর করা যাবে। তাছাড়া এ শহরে আমাদের একটি মাত্র সিনাগগটাও ওই অঞ্চলে। সেদিন আমার মাথায় টুপি থাকলে আমি টুপি খুলে বৃদ্ধকে সেলাম করতাম। ভদ্রলোক তিন মাইল হেঁটে যাবেন এবং হেঁটে ফিরবেন কিন্তু নিয়ম ভাঙবেন না।

কিন্তু এ সব যাতায়াত-খাওয়া-দাওয়া তো লৌকিকতা মাত্র। নিজের আখড়ায় বসে নিজের ভাষায় আড্ডা দেওয়ার অভাব তাতে কী করে মিটবে? তাছাড়া আরেক অসুবিধা। স্ত্রী সংসর্গের অভাব। যদিও আমরা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের নায়কদের ছাঁচে গড়া রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের ছেলে। আমাদের সেই চল্লিশ দশকের কলকাতাতেও বন্ধুর বোন, বোনের বন্ধু, পাড়াতুত মেয়েদের কারু কারুর সঙ্গে একটু আধটু মন ছোঁয়াছুঁয়ি কি হয়নি? এই সূত্রে পণ্ডিত জওহরলালের আত্মজীবনীর একটা কথা মনে পড়ে। তিনি লিখেছিলেন যে জেলখানার জীবনে কোনও স্ত্রীলোক সংস্পর্শ না থাকা একটা অন্যতম কষ্টকর অবস্থা। আমার এই কষ্টের অবসান হল নিকোলাস নিসকোর সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে।

পাড়ার কাফিখানায় তখন আমি যেতে শুরু করেছি। একদিন ঢুকে দেখি সব টেবিল ভর্তি, কেবল একটি টেবিলে এক ছোকরা বসে আছে। অনুমতি নিয়ে, অন্য একটা চেয়ারে বসতে সে আলাপ শুরু করল— প্রায়ই দেখি যে তুমি এখানে একা একা বসে কফি খাও। এই পাড়াতেই থাকো নাকি? আলাপ থেকে পরিচয়। নিকোলাসের বাবা ইটালিয়ান, মা ইংরেজ। মা মারা গেছেন। বাবা ফিরে গেছেন ইটালিতে। নিকোলাস একেবারে নিমস্তক হয়ে লন্ডন চষে বেড়াচ্ছে।

এক হইতে বহু। নিকের মাধ্যমে আমি বেশ কয়েকটি দলের সঙ্গে পরিচিত হলাম। মাঝে মাঝে মিশ্র স্ত্রী-পুরুষের আড্ডা, নৈশভোজনের নেমন্তন্নও হতে থাকল। এ সব দলে সবাই প্রায় অবিবাহিত। এক আধজন নব বিবাহিতাও ছিল। আড্ডা সাধারণত বসত মেয়েদের বা নববিবাহিতদের বাড়িতে। আমরা ছেলেরা মদ্যাদি নিয়ে যেতাম। কখনও কখনও স্ন্যাকসও নিয়ে গিয়েছি। এই সব পার্টির কল্যাণে মেয়েদের সঙ্গে মেশামেশি হলেও আমার ক্ষেত্রে বিশেষ ঘেঁসাঘেঁসি হতে পারেনি। তার প্রধান কারণ আমার সে দিনের মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের রক্ষণশীল মনোভাব। তা ছাড়া আমি জানতাম যে লন্ডনে আমার অল্পদিনের মেয়াদ। কী হবে বিস্তৃত শিকড় নামিয়ে।

এক মাস দু মাস করে আট মাস লন্ডনে কেটে গেল। তারপর একদিন বড় সাহেব আমাকে ডেকে বললেন যে তুমি তো যথেষ্ট কাজ শিখেছ। এবার তোমার

ফেরার ব্যবস্থা করি। ইতিমধ্যে আমি ইউরোপের অন্যত্র কয়েকবার গেছি। ডুসেলডর্ফ এবং আমস্টারডামে এদের অফিস ছিল, সেখানে এবং একবার ডুসেলডর্ফ থেকে লন্ডন আসার পথে কোপেনহেগেনে দিনতিনেক থেকে এসেছি আমার লন্ডনে পাওয়া এক ড্যানিশ বন্ধুর বাড়িতে। এখানে একটা কথা আমার আজও মনে আছে। বন্ধুনি যে কেবল আমার জামা কাপড় কেঁচে ইস্ত্রি করে দিতেন তা নয়, একদিন দেখি তিনি আমার জুতোটা পালিশ করছেন। আমাদের দেশে এ কথা ভাবাও যায় না।

বড় সাহেবকে বললাম, যে হ্যাঁ এবার গেলেই হয়, তবে আমার ইচ্ছা জাহাজে ফিরব। নানা দেশ দেখতে দেখতে। সাহেব বললেন, তাই যদি হয় তাহলে যাত্রীবাহী জাহাজে না গিয়ে মালের জাহাজে যাও। আমি বললাম, খুব ভালো কথা। আমার প্যাসেজ বুক করা হল একটি ছোট মালবাহী জাহাজে, যাতে গোনাগুনতি বারোটি কেবিন আছে প্যাসেঞ্জারের জন্য।

জাহাজ লন্ডন থেকে ছাড়লেও আমি জাহাজ ধরব জেনোয়ায়। লন্ডন থেকে জেনোয়া ট্রেনে যাব। আমি সাহেবদের কাছে বায়না করলাম যে ট্রেনেই যখন যাব তখন রাস্তায় একটু প্যারিস দেখে যাই না। দয়াবান সাহেবরা বললেন, তথাস্তু। প্যারিস যাব শুনে আমার লন্ডনের বন্ধুরা জাঁকিয়ে বসলেন। প্যারিসের মতো জায়গায় মন্টুর মতো না-লায়েককে তো একা ছেড়ে দেওয়া যায় না। ওর একজন গার্জেন দরকার। অনেক বিবেচনা এবং অনেক গ্লাস পেল এলের পর ঠিক হল ওদেরই একজনের প্যারিসবাসিনী ফরাসি কাজিনকে চিঠি দেওয়া হবে এবং আমি প্যারিস পৌঁছে তাঁকে ফোন করব। পরপর কয়েকটি বিদায় অভিনন্দন পার্টি হল, তারপর একদিন সকলের, বিশেষ করে নিকোলাস নিসকোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্রেনে চড়ে বসলাম। গন্তব্যস্থল প্যারিস। ডেভারে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে এখন মনে পড়ছে না যে ওপারে আমরা অন্য ট্রেনে উঠেছিলাম না সমস্ত ট্রেনটাই ভাগ ভাগ করে ফেরি পার হয়েছিল। ক্যালে থেকে প্যারিস। কয়েক ঘণ্টার পথ।

প্যারিসে প্রথম দু-তিনদিন দ্রষ্টব্য দেখে কাটলো। সাঁজলিজে, আর্ক দ্য ত্রিয়াম্ফ, ইনভ্যালিড (নেপোলিয়নের সমাধি) ইফেল টাওয়ার আরও কত কী? সব ট্যুর বাসে। একদিন সকালটা কাটালাম ল্যুভর্এ। একদিন ভার্সাই গেলাম। ভার্সাই বাসে আমার পাশে বসে এক বাঙালি ভদ্রলোক। মধ্যবয়স্ক। তিনি বাসে উঠেই ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর বাস যেখানেই থামে তিনি জিজ্ঞেস করেন, এ সব কি গাছ চারদিকে বলতো হে? বৃক্ষতত্ত্বে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বাস চললেই তিনি উত্তরের অপেক্ষা না করে ঘুমিয়ে পড়তেন। ওঁর অনুরোধে ফেরার সময় ওঁদের হোটেলে (আমার হোটেলের কাছেই) চা খেতে ঢুকলাম। সেখানে আরও দু-তিনটি বাঙালি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হল। ওঁরা ঠিক করেছেন সেদিন ট্যুরবাসে রাত্রিকালের প্যারিস দেখবেন। আমিও ভিড়ে পড়লাম।

ডিনারের পর রাত ন-টায় ট্যুর শুরু হল। প্রথমে রাস্তার আলো। আলোকিত

বাড়ি এবং মূর্তিগুলো। তখন অবশ্য সদ্য যুদ্ধমুক্ত প্যারিস এখনকার মতো সাফসুতরো হয়নি এবং আলোও এত উজ্জ্বল ছিল না। তবুও আমরা মুগ্ধ হলাম। ছোট ছোট দু-জায়গায় জিপসিদের গান আর ম্যাজিক দেখা হল সঙ্গে বিনামূল্যে দু-এক গ্লাস ওয়াইন। তারপর বাস এসে থামল জগদ্বিখ্যাত ফোলিস বেরজিয়ারের সামনে। আমরা যে যার আসন নিলাম, একেবারে সামনে না হলেও স্টেজ থেকে খুব দূরে নয়। বসে পড়ার পরেই কয়েকজন পরিবেশিকা আমাদের সকলের সিটের সঙ্গে ঘেঁসা ছোট্ট টেবিলে একটি করে ছোট বোতল এবং স্ফীতোদর গ্লাস রাখলেন। তারপর ফটাস করে বোতলটি খুলে একটু ফেনপুঞ্জ তরল পদার্থ গ্লাসে ঢালতে শুরু করলেন। দলের একজন বললেন, শ্যাম্পেন। নামটা শোনা ছিল। এখন চুমুক দিয়ে দেখি কেমন যেন টক টক। খুব ভালো লাগলো না। সামনে স্টেজের পর্দা উঠল। সে কী অজস্র আলো! বিপুল স্টেজ। দৃশ্যের পর দৃশ্য। স্বল্পবাস তরুণীদের নৃত্য। আদিরসাত্মক কৌতুক, ক্রীড়া। ভাষা না বুঝলেও অঙ্গভঙ্গিতে সবই প্রকট। পাশে বসে আমার নবলব্ধ দাদাটি খালি বলছেন, ইস লাজ-লজ্জার মাথা একেবারে খাইচে। আমি কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম ওদের ঐন্দ্রজালিক স্টেজক্রাফট দেখে।

ভার্সাই যাবার দিন সকালে ওদের সেই ফরাসিনী কাজিনকে ফোন করেছিলাম। নাম কোলেত। ঠিক করলাম পরদিন সকালে দেখা হবে। কিন্তু কোথায়? কেন জানি না ওকে আমার হোটেলে আসতে বলতে আমার মন চাইল না, আর ওর বাড়ি খুঁজে বার করা আমার সাধ্য নয়। আমার মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি এল যে, অমুক সময়ে ইফেল টাওয়ারের পশ্চিম দরজায় দেখা করলে কেমন হয়? কেননা ইফেল টাওয়ার সবাই চেনে আর আমার মতো ভারতীয় কালা আদমি প্যারিসেও তখন গণ্ডায় গণ্ডায় নেই। ইফেল টাওয়ার আমার হোটেলের কাছে। দু পা এগোলেই চূড়াটা দেখা যায়। হোটেলের অফিসে জিজ্ঞাসা করলাম ইফেল টাওয়ার কী করে যাব? —ইফেল টাওয়ার? চোখ কপালে তুলে ও বলে সেটা আবার কী? আমি নানা চেষ্টা করলাম। এক হাত ওপরে তুলে, দু হাত ওপরে তুলে মন্দিরের চূড়ার মতো জুড়ে, কিছুতেই কিছু হয় না। কাউন্টারে কর্মচারীদের জটলা বেঁধে গেল। কিন্তু ইফেল টাওয়ার-এর নাম কেউ শোনেনি। এমন সময় ওদের কাউন্টারে একটা ছবি আমার চোখে পড়ল। হাত দিয়ে সেটা দেখাতে সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল তুরাফেল। ফরাসি ভাষায় ত্যুর মানে টাওয়ার এবং ইফেল নামটি ত্যুরের পরে আসে। দুয়ে মিলে 'তুরাফেল'। শহরের মধ্যভাগের একটা ম্যাপ টেনে কলমের রেখা টেনে দেখিয়ে দিল কী করে যেতে হয়, হাঁটাপথে মিনিট পনেরো লাগে।

কোলত বেশ ইংরিজি বলে এবং দুদিন ধরে বাসে এবং হাঁটাপথে প্যারিসের অনেক কিছু দেখাল, যেমন লেফট ব্যাঙ্কের অলিগলি রাস্তা। নদীর ধারে রেলিং ঘেঁসে পুরনো বইয়ের দোকান— ঠিক কলেজ স্ট্রিটের মতো— ল্যাটিন কোয়ার্টারে

যে সব জিনিস খাস প্যারিসিয়ান। ট্যুর বাসে বসে যা দেখা যায় না। খাওয়া-দাওয়াও হল ছোটখাটো রেস্টুরেন্টে যেখানে দাম কম কিন্তু খাদ্য অতি উত্তম। আরও বুঝলাম যে ইংরিজি আহারের তুলনায় ফরাসি খানা অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং শীলিত। একদিন আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গেল চা খেতে। ওর বাবা-মা-র সঙ্গেও আলাপ হল কোলেতের মাধ্যমে। তারপর একদিন প্যারিস এবং কোলেতের কাছে বিদায় নিয়ে ট্রেনে চড়ে বসলাম। গন্তব্য জেনোয়া।

রাত্তিরের ট্রেন। মাঝপথে একদল ইটালিয়ান গাড়িতে উঠে পড়ল। চেঁচামেচি হই হই-গান-নাচে তারা সমস্ত বগিটাকে মাতিয়ে তুলল, সবাই ঈষৎ মদোন্মত্ত এবং এ সবই একটি বেশ দেখতে নবীনাকে ঘিরে। ক্রমে ক্রমে শুনলাম যে এরা সবাই ইটালির কোনও গাঁয়ের লোক এবং এরা জেনোয়া যাচ্ছে নবীনাটিকে আউসট্রোলিয়া-র জাহাজে তুলে দেওয়ার জন্য। নবীনা নববিবাহিতা। ওর বর আগেই অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে। ওরা এখন থেকে সেখানেই বসবাস করবে। জেনোয়াতে প্রচুর করমর্দন গণ্ডচুম্বনের পর বিদায় নিয়ে নিজের স্যুটকেসটি হাতে করে ট্যাক্সি করে হোটেলে পৌঁছলাম। হোটেল পৌঁছে স্যুটকেস খুলতে গিয়ে দেখি, এটি আমার স্যুটকেশ নয়। এদিকে আমার জাহাজ পরদিন ছাড়বে। জামাকাপড় না হয় আমার প্রধান লাগেজ, যা জাহাজে আসছে, কিন্তু দাড়ি কামাবার জিনিস চিরুনি ইত্যাদি কোথায় পাব। হোটেলে সে কথা জানাতে ওরা বললে যে তুমি এখনি গিয়ে ওসব জিনিস কেন, কারণ আজ শনিবার, আজ দুপুরের পরে দোকান যে বন্ধ হবে, সোমবারের আগে আর খুলবে না।

সবেগে বেরিয়ে গেলাম। জিনিসপত্র কিনে ফিরে এসে শুনি, যাঁর স্যুটকেস আমি ভুলে নিয়ে এসেছিলাম, তিনি এসে তাঁর নিজেরটি নিয়ে গেছেন এবং আমারটি দিয়ে গেছেন। স্যুটকেসের ওপর আমার নাম লেখা ছিল। ইতিমধ্যে হোটেলও আমার অনুরোধে জাহাজ অফিসে খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে জাহাজটি মার্সেইতে আটকে গেছে। তিন চারদিন পরে জেনোয়ায় আসবে। মনে মনে ভাবলাম ভালোই হল। রোম, যাবার সময় দেখে গেছি। এখন ভেনিসটাও দেখে নিই।

খোঁজখবর নিয়ে পরদিন সকালে জেনোয়া স্টেশন থেকে ভেনিসের ট্রেনে চড়লাম। এক রাত্তির থাকা। কাজেই সঙ্গে একটা অ্যাটাচিকেসে রাত্তিরে শোবার কাপড়, টুথব্রাশ, চিরুনি ইত্যাদি। ট্রেন কিছুক্ষণ চলার পর মনে হল যে, সহযাত্রী কাউকে জিজ্ঞেস করি ঠিক ট্রেনে উঠেছি কিনা। ভেনিস কত দূর জিজ্ঞেস করতে সে বলল, সে কী? ইল র‍্যাপিডো। রোমা। অর্থাৎ এটাতো এক্সপ্রেস ট্রেন। রোম যাচ্ছে। আমার দূরবস্থার কথা শুনে আর একজন সহযাত্রী যিনি ইংরিজি জানেন, পরামর্শ দিলেন যে সামনে পিসা আসছে। সেখানে নেমে ফিরতি ট্রেনে জেনোয়া চলে যাও। সেখান থেকে ঠিক ট্রেনে চড়ে ভেনিস। তবে আজকে কি আর ভেনিসে পৌঁছতে পারবে? তখন ভাবলাম যে ভেনিস না হয় নাই হল। পিসাতে নেমে

হেলানো বুরুজটাই দেখে যাই। পিসা স্টেশনে একটা সস্তা বাড়িওয়ালির খোঁজ করে সেখানে যেতে বাড়িওয়ালি বললেন ঘর আছে। তোমার মালপত্র কোথায়? হাতের অ্যাটাচিটা দেখাতে তিনি বললেন— ঠিক আছে। এই ঘরের চাবি দোতলায়। তবে ভাড়াটা অগ্রিম দিয়ে যাও।

পিসা শহর হেলানো বুরুজ এবং আরও কিছু দেখে জেনোয়া পৌঁছলাম পরদিন সন্ধেবেলা। হোটেলের লোকেরা বলল কোথায় গিয়েছিলে? তোমার জাহাজ আজ জেনোয়ায় মাল তুলছে। কাল সকালে ছাড়বে। জেনোয়া ছেড়ে জাহাজ ইটালির উপকূল ধরে ভূমধ্যসাগরের দিকে চলতে শুরু করল। সেই দিন বা পরদিন এক বিষণ্ণ বিকেলে যখন ইটালির বুটের ডগা আর সিসিলির মাঝখানে অপ্রশস্ত মেসিনা প্রণালী দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে, আমি ডেকের রেলিংয়ে ভর দিয়ে দেখলাম একটা হেলিকপ্টার ইটালি থেকে সিসিলি উড়ে যাচ্ছে। মনে যেন একটা আগ্রহ মিশ্রিত অবসাদ এল— বিদায় ইউরোপ। আর কি কখনও এ পথে আসা হবে? উত্তরজীবনে আমার প্রাণের সে আকুতি ঈশ্বর শুনেছিলেন।

ছোট জাহাজ। বোধহয় ছ-হাজার টন। বারোটা কেবিনেই লোক ছিল কিনা এখন মনে নেই। কেবল একটি অস্ট্রেলিয়ান দম্পতির সঙ্গে বিশেষ আলাপ হয়েছিল। ওঁরা ইংল্যান্ডে দু-বছর কাটিয়ে এখন স্বগৃহে ফিরছেন। পথে থামতে থামতে ওঁদের যাত্রা দু-মাসের। কলকাতাতেও মাস দুই কাটাবেন। আর আলাপ হল জাহাজের কয়েকটি নবীন নাবিকের সঙ্গে। খাবার ঘর একটিই। তারই একপাশে ক্যাপ্টেন এবং চিফ ইঞ্জিনিয়ার সমেত আমরা কজন যাত্রী। অন্যদিকে অন্য টেবিলে সাদা নাবিকেরা। কালো আদমি বা লস্করদের জন্য সম্পূর্ণ অন্য ব্যবস্থা। সাদা নাবিকদের একটা আলাদা বসবার ঘর ছিল আর যাত্রীদের জন্য বসবার ঘর এবং বার একসঙ্গে। জাহাজের জীবন মোটেই উত্তেজনাপূর্ণ নয়। আর ভিক্টর হুগো যদিও এক বছর স্রেফ সমুদ্র দেখে কাটাবেন বলেছিলেন— আমার সে মনন শক্তি নেই।

পোর্ট সৈয়দের পোর্টত্ব যথেষ্ট থাকলেও ইজিপ্টত্ব একেবারেই নেই। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে সুয়েজ খাল। শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির মানুষ আমার কাছে দু-দিকের বালি-কাঁকর ন্যাড়া পাথরের মরুভূমি বেশ নতুন লাগছে। এক জায়গায় রংচঙে কাপড় পরা এক বেদুইন মেয়ে ছাগল চরাচ্ছে। জাহাজ থেকে তার দিকে ক্যামেরা তুলতেই সে চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে ফেলল। সুয়েজ বন্দরে দাঁড়াতেই জাহাজ ঘিরে ধরল নানারকম ছোট বড় নৌকো। ওরা যাত্রীদের কাছে সওদা বেচতে এসেছে। একটা লগির ডগার থলিতে জিনিস ভরে জাহাজে পাঠাচ্ছে আবার ওই থলিতেই পয়সা সংগ্রহ। জাহাজও এখানে মাঝদরিয়া থেকেই মাল ওঠানো নামানো করল।

সুয়েজের পরে এডেন। এখানে জাহাজ একদিন থাকবে। আমি ব্রেকফাস্টের পর একটু শহর বেড়াতে গেলাম। কিছুই দেখবার নেই। বন্দরের কাছে ঘিঞ্জি বসতি। রাস্তার দু-ধারে দোকান, বার, রেস্টুরেন্ট। প্রচণ্ড গরম। ১৫ মিনিটের

মধ্যেই ঘামে ভিজে সপসপে হয়ে গেলাম। ঠান্ডা হবার জন্যে একটা বারে ঢুকে এক গ্লাস ঠান্ডা বিয়ারে চুমুক দিচ্ছি, আমার টেবিলের ওধারে এক আফ্রিকান মহিলা এসে বসলেন। বয়েস ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথাকার লোক? ভারতীয় শুনে বললেন, তুমি কি এখানে থাক? আমি বললাম, না আমার জাহাজ বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি এখনি চলে যাব। কেমন যেন আর্তস্বরে মহিলা বললেন, সবাই চলে যাবে। খালি আমি এই নরকে পচে মরব।

এডেনের পর কলম্বো। তীরে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে বেরোচ্ছি এমন সময়ে দেখি চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব জাহাজের রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কলম্বোতে নামবে না? একটু হেসে বললেন তিরিশ বছর ধরে এইসব সমুদ্রে বন্দরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর ভালো লাগে না। অবশ্য সেবার আমারও কলম্বো দেখা হয়নি। জাহাজে ফিরে এসে শুনলাম আমাদের লন্ডন অফিস থেকে তার এসেছে (তখন ই-মেল, ফ্যাক্স কেন, টেলেক্সও ছিল না) যে কলকাতায় ফোরম্যান সাহেব অসুস্থ। আমি যেন কলম্বো থেকে উড়ে কলকাতা চলে যাই। জাহাজের পার্সারের কাছে প্রয়োজনীয় অর্থও তারা পাঠিয়েছেন। অতএব পরদিন মাদ্রাজ, ভুবনেশ্বর হয়ে কলকাতা চলে এলাম।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

তলোয়ার থেকে নেতাজির পত্নীগৃহে

কৃষ্ণা বসু

দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবার সময় হঠাৎ এমন একটা সুন্দর কোনও জায়গায় এসে পড়া যায় যে মনে হয় যখন কর্মজীবন থেকে অবসর নেব তখন এখানে এসেই বসবাস করব। আমার ও আমার স্বামী শিশিরকুমার বসুর জীবনে এমন মাঝে মাঝেই ঘটেছে। একবার আমাদের বিশেষ পছন্দ হল ছোট একটি জার্মান পাহাড়ি শহর উইসবাডেন। ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দর থেকে উইসবাডেনের পথে যেতে চোখে পড়ল পথের দুধারে আপেল গাছের সারি। আপেলের ভারে গাছ নুয়ে পড়েছে। লাল আপেলে ঢেকে গেছে গাছের সবুজ পাতা। গাছের তলায় কুড়িয়ে নেওয়ার অপেক্ষায় গড়াগড়ি খাচ্ছে অসংখ্য আপেল। আমাদের জার্মান বন্ধু ফ্রাঙ্ক বলেছিলেন তাদের আপেলে অরুচি। উইসবাডেনে ফ্রাঙ্কদের বাড়ির পিছনে ছোট বাগানে ছিল পিচ গাছ। বাগানে পায়চারি করে করে গল্প করতে করতে হাত বাড়িয়ে পিচ ফল ছিঁড়ে খাওয়া হত।

উইসবাডেন একটি সবুজ মখমলের গালিচার মতো উপত্যকা। দুধারে পাহাড়ের গায়ে ছবির মতো ঘরবাড়ি, আর উষ্ণ জলের প্রস্রবণ বা স্পা। দুধারে আছে কুরহাউস। কুরহাউস অনেকটা ক্লাবের মতো। সেখানে উষ্ণ জলের ঝরনা থেকে জল পান করা যায়, উষ্ণ জলে স্নানের ব্যবস্থাও আছে। দুটিই স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। যদি কেউ পড়াশোনা করতে চান তবে আছে লাইব্রেরি, সঙ্গীত-প্রেমিকদের জন্য কনসার্ট বা ব্যান্ড। গ্যাম্বল করার ব্যবস্থাও আছে যদি কেউ জুয়া খেলায় উৎসাহিত হন।

পরিবেশ দূষণ কথাটা এখানে অজানা। কলকারখানা করার অনুমতি নেই। শহর থেকে দূরে রাইন নদীর তীরে একটি মাত্র শ্যাম্পেন তৈরির কারখানা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন নেই উইসবাডেনের বুকে। বোমা পড়েনি এ শহরে। যদিও কাছেই ফ্রাঙ্কফুর্ট বিধ্বস্ত হয়েছিল। ফ্রাঙ্কের মত ছিল এ শহর আমেরিকানদের আগেই পছন্দ হয়েছিল। তাই আর বোমা ফেলে হতশ্রী করেনি। যুদ্ধের পর ওরা একটা আমেরিকান এয়ারফোর্সের শিবির করেছিল এ শহরে।

একদিন আমরা রাইন নদীর তীরে স্টিমারঘাটা থেকে স্টিমারে চড়ে বাডগোডেসবার্গ রওনা হয়ে গেলাম। উইসবাডেন থেকে বাডগোডেসবার্গ—

রাইন নদীর ওপর জলযাত্রা স্মরণীয় হয়ে আছে। কানে বাজছে ডেকের ওপর যাত্রীরা গান ধরেছেন 'Warum ist es am Rhein so schon–' why is it so beautiful on the Rhein?

অবসরগ্রহণের জন্য যাওয়া হয়নি। কিন্তু পার্লামেন্টারি কাজে পরে আবার গিয়েছিলাম উইসবাডেন। দেখে এলাম তেমনই মায়াময় সৌন্দর্যের শহর রয়েছে উইসবাডেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা মত বদল করেছি। ফ্রান্সের একটি ক্ষুদ্র শহর পছন্দ করে ফেলেছি আমরা। নাম তার তালোয়ার।

সুইস এয়ারের বিমানে লন্ডন থেকে এসে জেনেভাতে নামলাম। যদি কেউ তালোয়ার যেতে চান জেনেভাতে চেনা লোক থাকা প্রয়োজন। আমাদের জন্য দাঁড়িয়েছিল সুগত। নেমেছি সুইজারল্যান্ডে, গন্তব্য ফ্রান্স। দু-দেশের সীমানাতে গাড়ি থামিয়ে পাসপোর্ট ভিসা চেক হল। খুব কড়াকড়ি ছিল না। আমরা আনেসি শহর পার হলাম। এরপর তালোয়ার। পুরনো ইউরোপিয়ান শহর যেমন হয়। আঁকাবাঁকা পাথরে বাঁধানো সরু গলিপথ, তার দুধারে পুরনো ধাঁচের ঘরবাড়ি। আমাদের গাড়ি এসে থামল ছোটখাটো দোতলা বাড়ির সামনে। নেমে চোখ জুড়িয়ে গেল। সামনে বিশাল হ্রদ— লেক আনেসি। সোনালি রোদ্দুরে নীল জল টলমল করছে। চারিদিকে ঘন সবুজ পাহাড়। সবুজের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে ঝকমক করছে দু-একটি বরফে ঢাকা চূড়া। তালোয়ার থেকে যে বরফের চূড়া বারবার চোখে পড়ে তার নামটি আমার একেবারেই পছন্দ হল না। এমন স্বর্গীয় পরিবেশে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত নাম ডেভিলস টিথ। কেমন একটু এবড়োখেবড়ো দেঁতো হাসির ভাব আসে বটে, তাই বলে এই নাম!

আমাদের বাগানে পৃথিবীর সব গোলাপ ফুটে আছে। নানা রং, তবে রক্তগোলাপই বেশি। সারাদিন বাগানে বসে হ্রদের নীল জলের দিকে চেয়ে দিন কাটে। সন্ধ্যায় ফোল্ডিং টেবিল পেতে ডিনার বাগানেই পরিবেশন করি। অন্ধকার নেমে এলে লেক আনেসির অপর পারে আনেসি শহরের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। মনে হয় যেন দীপাবলির রাত।

কোনওদিন হাঁটতে বেরলাম যে পথে তার নাম Monks Lane। বাংলায় কী বলব? সন্ত সরণি? খুব নীরব নির্জন পথের শেষে দাঁড়ালে তালোয়ারের চমৎকার ভিউ দেখা যায়। জলে নৌকো ভাসছে যেন ছোট ছোট অসংখ্য বিন্দু। আকাশে স্কাই ডাইভিং অনুশীলন করছেন কেউ।

লেকের অপর পারে আনেসি শহরে বেড়াতে যাই মাঝে মাঝে। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে খাল, এপার-ওপার করার ছোট ছোট সেতু। ফুল ফুটে আছে খালের দুধারে। রঙিন ছাতার নীচে চেয়ার টেবিল সাজানো। চা-কফি খাচ্ছে জলের ধারে বসে মানুষজন। কোনওদিন কি আমাদের টালির নালাকে এমন সাজিয়ে তোলা যাবে! আনেসিতে লেকের ধারে সুন্দর রেস্তোরাঁ, সুপার

প্যানোরামা। খোলা আকাশের নীচে ডিনার খেতে খেতে লেকের সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। কিন্তু একটু পরেই শীত শীত করতে লাগল। তাই কফি আর ডেজার্ট রেস্তোরাঁর ভিতরে বসে খাওয়া হল।

একদিন গাড়ি করে তালোয়ার থেকে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। ফ্রান্স থেকে আবার সুইজারল্যান্ড আর সুইজারল্যান্ড থেকে জার্মানির আউগসবুর্গ শহর। সকালে রওনা হয়ে দুপুরে পৌঁছলাম বার্ন শহরে। এই শহরে ছাত্র অবস্থায় শিশু চিকিৎসার পাঠ নিয়েছিলেন ডাঃ শিশিরকুমার বসু। পুরনো স্মৃতি মনে পড়ল তাঁর। একটা কফি হাউসে ঢুকে দুপুরের খাওয়া সেরে নিচ্ছিলাম। যে ওয়েটার পরিবেশন করছিল মনে হয়েছিল সে ভারতীয়। কিন্তু দেখা গেল সে শ্রীলংকার লোক। জাফনা থেকে এসেছে কাজের সন্ধানে।

এবার জুরিখ পার হলাম। তারপর বিচিত্র শব্দধ্বনিময় রাস্তার নাম শোফহাউজেন, সিনগেন। লেক কনস্ট্যানস-এর পাশ দিয়ে দীর্ঘপথ চলে গেছে লিনদো অবধি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পার হয়ে সন্ধ্যা নাগাদ সুগত গাড়ি ড্রাইভ করে পৌঁছে দিল আউগসবুর্গ। আউগসবুর্গে স্বজনদের সঙ্গে কয়েকদিন কেটে গেল। সেখানে আছে অনিতা, মার্টিন, তাদের ছেলেমেয়েরা ও আমাদের কাকীমা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের পত্নী এমিলিয়ে। একটি বিশেষ কারণে এবারের আউগসবুর্গ আসা স্মরণীয় হয়ে রইল। রাতে ডিনার টেবিল ঘিরে সবাই বসেছি, কাকীমা এমিলিয়ে খুব গম্ভীর মুখে বললেন, আজ যখন পরিবারের অনেকে উপস্থিত আছে আমি একটি বিশেষ ঘোষণা করতে চাই। খাবার পরিবেশন করতে করতে অনিতা বলল, মা, তুমি এমন সিরিয়াস মুখ করে বলছ, ব্যাপার কী! কিসের ঘোষণা, বিবাহের ঘোষণা নয় তো? আমরা হেসে উঠলাম। কিন্তু এমিলিয়ে গম্ভীর মুখ করেই রইলেন। তিনি শিশিরকুমার বসুর দিকে ফিরে বললেন, শিশির, আমার কাছে তোমাদের আঙ্কেল যত চিঠি লিখেছিলেন আমি আজ তা তোমাকে প্রকাশ করার অনুমতি দিলাম। টেবিল ঘিরে একটা হর্ষধ্বনি উঠল। সুভাষচন্দ্র ১৯৩৪ সাল থেকে শুরু করে তাঁর স্ত্রীকে যে দেড় শতাধিক চিঠি লিখেছিলেন, এমিলিয়ে সেগুলি যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছিলেন। সেদিন তিনি তা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে খুলে দিলেন।

এবার তালোয়ারে ফিরবার পালা। আর লেক কনস্ট্যানসের পাশে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা নয়। আমরা বিশাল কনস্ট্যানস হ্রদ পার হলাম ফেরিতে। মোটর গাড়ি, মানুষজন সবই স্টিমারে। ওপারে পৌঁছবার পর বেশ বৃষ্টি শুরু হল। সাবধানে গাড়ি চালিয়ে বেশ রাতে আমরা তালোয়ার পৌঁছে গেলাম।

তালোয়ারের চারপাশে সুন্দর সব জায়গা আছে বেড়াতে যাবার মতো। একদিন গেলাম অ্যালবার্টভিল। এখানে ১৯৯২ সালের শীতকালের অলিম্পিক হয়েছিল। আর একদিন গেলাম ভারি সুন্দর এক গ্রাম। নাম তামি। সেখানে প্রাচীন এক মনাস্টেরি। মনাস্টেরির সাধুরা খুব সুন্দর চিজ বানান। আমরা চিজ কিনলাম

আত্মীয়বন্ধুদের জন্য। অবশ্য দেশে নিয়ে যেতে পারব কিনা সংশয় রইল। আমাদের এক পরিচিতজন চিজ নিয়ে যাবার সময়ে মুশকিলে পড়েছিলেন। দেশে ইমিগ্রেশন অফিসার হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই প্যাকেটে কী আছে। উনি সরলভাবে বলেছিলেন, চিজ হ্যায়। তাতে অফিসার বললেন, আরে, চিজ তো হ্যায়, লেকিন ক্যায়া চিজ হ্যায়। এই চিজ কথাটির ওপর অনেকক্ষণ বাকযুদ্ধ চলেছিল।

একদিন থোন শহর হয়ে চলে গেলাম মাউন্ট আরাভিস। মাউন্ট আরাভিস থেকে চমৎকার দেখা গেল আল্পস পাহাড়ের সবচাইতে উঁচু চূড়া মঁব্লাঁ।

যখন যেখানেই বেড়াতে যাই না কেন মন পড়ে থাকে লেক তালোয়ারের পাশে আমাদের ছোট বাড়িটির বাগানে। শুধু বাগানে কেন শোবার ঘর থেকে দেখা যায় লেক আনেসির জল ছলাৎ ছলাৎ করছে। দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির দিকে চেয়ে সংসারের ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে মন চলে যায়। 'যত্রৈব চিত্তে সমুদেতি ভক্তিস্তত্রৈব গশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম।'

জেনেভা থেকে প্লেন ধরতে হবে। একদিন তালোয়ার থেকে জেনেভার পথে রওনা হয়ে পড়লাম। চিত্তে প্রশান্তি আর স্মৃতিতে রইল লেক আনেসি।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

সমুদ্রযাত্রীর ডায়েরি

কৃষ্ণা বসু

অনেক, অনেকদিন পর সমুদ্রযাত্রা করলাম। কলম্বো বন্দরে আমাদের জাহাজ ভিড়লে পর শুনলাম সুনামি দুর্যোগের পর এটি দ্বিতীয় যাত্রীজাহাজ বন্দরে প্রবেশ করল। প্রথমে আমাদের 'গল'-এ নোঙর করার কথা ছিল। কিন্তু বন্দর শহর গল এখনও সুনামির বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই গলে না থেমে সরাসরি জাহাজ কলম্বোতে এসে তরী বাঁধল। ভারতবর্ষের দক্ষিণ উপকূল দিয়ে জাহাজে কয়েকদিন ঘুরতে যাব এমন পরিকল্পনা চলছিল। সুনামির পর মনে হয়েছিল যাত্রা নিশ্চয় বাতিল হবে। কিন্তু তা হল না। শেষপর্যন্ত চেন্নাই বন্দর থেকে জাহাজ যথাসময়ে সমুদ্রে ভেসে পড়ল।

জাহাজ তো নয়, এক বিশাল প্রাসাদ জলে ভাসছে। আটতলায় আমার ছোট্ট কেবিনটি বেশ পছন্দ হল। কেবিনের সঙ্গে লাগোয়া ক্ষুদ্র বারান্দা। বারান্দায় পাতা চেয়ারে বসলে চোখে পড়ছে ভারত মহাসাগরের অনন্ত জলরাশি। দিগন্তবিস্তৃত ঈষৎ নীলাভ, শান্ত, সমাহিত সেই সমুদ্র। কে বলবে মাত্র অল্পদিন আগে দারুণ আক্রোশে ফুঁসে উঠেছিল সমুদ্রের ঢেউ, আছড়ে পড়েছিল সমুদ্রতটে আর ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মানুষের প্রাণ আর তার ক্ষুদ্র সংসার।

আমরা জাহাজে বসবাস শুরু করেছি। কিন্তু ক্যাপ্টেন সাহেব জানালেন দিনদুয়েক তরী চেন্নাই বন্দরে বাঁধা থাকবে, আমরা দরকারে শহরে ঘুরে আসতে পারি। মনে হল পাহাড়ে ওঠার আগে যেমন বেসক্যাম্পে কয়েকদিন থাকতে হয় এ তেমনই জলে ভাসার আগে শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি। ক্যাপ্টেন সাহেব যখন যা নির্দেশ দেন তা আমাদের কেবিনে ধ্বনিত হয় টিভি পর্দার মাধ্যমে। একটু বাদেই আবার ক্যাপ্টেনের ঘোষণা, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে জাহাজে বিপদ সংকেত বেজে উঠবে, নিজেদের লাইফ জ্যাকেট হাতে নিয়ে সবাই পাঁচতলার ডেক লাউঞ্জে সমবেত হবেন। এই বিপদসংকেত যদিও সত্যিকারের নয় কিন্তু এতে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।' হাতের কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি লাইফ জ্যাকেট খুঁজতে লাগলাম। তারপর সব যাত্রীদের সঙ্গে পড়িমরি করে সিঁড়ি ভেঙে আটতলা থেকে পাঁচতলায় অবতরণ। সমবেত ড্রিল হল। মাথা গলিয়ে জ্যাকেট পরে, কোমরে বেঁধে নিলাম। একপাশে হুইসল আছে, অন্য পাশে ঝুলছে আলো, জলে পড়লে আপনি জ্বলে

উঠবে। জাহাজ দুর্ঘটনায় পড়লে কী করতে হবে উপদেশ শুনে নিলাম। ভাবলাম, প্রথমদিন জাহাজে উঠেছি, এরকম ভয় না দেখালে কী চলত না! আমার ডানদিকের সাহেব টাইটানিক ডুবে যাবার কথা তুললেন। আমি প্রসঙ্গ বদলাবার চেষ্টা করছি। ওপাশের মেমসাহেব শাড়ি কী করে পরে আর পরতে কতক্ষণ লাগে, ঘণ্টাখানেক না আরও বেশি, জানতে চাইলেন।

জাহাজভর্তি বিদেশি ট্যুরিস্ট। সবাই ইন্ডিয়া দেখবেন বলে চেন্নাই শহরে ঘুরতে বেরিয়ে পড়লেন। জাহাজ থেকে বার হবার ও আবার প্রবেশের সময় বেশ কড়াকড়ি ও নিয়মকানুন আছে। দিনকাল ভালো নয়, নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সব ব্যবস্থা। জ্যোতি আমাদের নিতে এল তার গাড়িতে চেন্নাই ঘুরিয়ে দেবে। জাহাজ থেকে বেশ দূরে গাড়ি পার্ক করে অপেক্ষা করছিল। জ্যোতি চেন্নাইয়ের প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপিকা। ওর মতো প্রাণচঞ্চল মহিলা আমি খুব কম দেখেছি। ও গাড়ি চালাচ্ছে, আমি বসেছি পাশে। বললে, সরি, সিট বেল্টটা ছিঁড়ে গেছে বুঝেছ। তা যাক। কিন্তু গাড়ি চালাতে চালাতে মাঝে মাঝেই সে পিছনে বসা দুই সহযাত্রীর সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে গল্প করছে। গাড়ি চলেছে আপন মনে সামনের দিকে। আমার অবস্থা সঙ্গীন।

'ওই দেখো তোমার বাঁদিকে মেরিনা বিচ, সব রাজনৈতিক সমাবেশ হয় এখানে', জ্যোতির রানিং কমেন্টারি চলেছে। মনে পড়ল এমন দুয়েকটি সমাবেশ আমি দেখেছি। আমরা যেমন শহিদ মিনার বা ময়দানে দুপুরবেলা জমায়েত করি, এদের হয় সন্ধ্যার পর। একটি বিশাল সমাবেশে আমি উপস্থিত ছিলাম, তা শুরু হয়েছিল রাত দশটায়। মাউন্ট রোডের ওপর দেখেছি বিশাল রাজনৈতিক মিছিল আর রাস্তার ওপর উঁচু মঞ্চে সে সময়কার ভারতবর্ষের শীর্ষ নেতৃত্ব। জ্যোতি হঠাৎ বলে উঠল, দেখো, দেখো, নেতাজির স্ট্যাচুর ওপাশে একটা নৌকো উল্টে পড়ে আছে, আর ওই দিকে আরও একটা। সুনামির পর পরিষ্কার করা হয়েছে সমুদ্রতট তবু এখনও পড়ে আছে প্রকৃতির তাণ্ডবের কিছু নিদর্শন। গান্ধিজির স্ট্যাচুর কাছে বেশ কিছু লোকজনের ভিড়। কেউ বাদাম খাচ্ছে, কেউ বা কাটা ফল। ছোট ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে বিচের মাঝখান দিয়ে যে রাস্তা গেছে তার ওপর। সেই অভিশপ্ত ২৬ ডিসেম্বরেও বাচ্চারা ক্রিকেট খেলায় মেতেছিল। মর্নিং ওয়াক করছিল অনেকে। অকস্মাৎ সমুদ্র ক্ষিপ্ত হয়ে ধেয়ে এসেছিল তাদের দিকে।

জ্যোতি বললে, চেন্নাই তোমাদের চেনা শহর। সাধারণ দ্রষ্টব্য না দেখিয়ে চলো তোমাদের অন্য চেন্নাই দেখাই। ইতিমধ্যে সে আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজ ঘুরিয়ে দিয়েছে। এবার নিয়ে এল একটি সুন্দর দোতলা বাড়ির সামনে। বারান্দায় বসেছিলেন গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী রাঘবন। আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। ভেতরে প্রবেশ করে আমাদের চক্ষুস্থির। প্রতি ঘরে অতি সুন্দর পুরনো দিনের শিল্পের কালেকশন। মূর্তি, ছবি, নানারকম টুকিটাকি জিনিস। শ্রীমতী রাঘবনের বিশেষ সংগ্রহ মেয়েদের বসনভূষণ, সাজসজ্জার জিনিস। মাথার চিরুনি, সুপুরি কাটার

জাঁতি, অলঙ্কার, পদযুগল ঘষবার কারুকার্য করা পাথর। মিনিয়েচার ছবিতে নানা ভঙ্গিমায় নারী অথবা রাগরাগিণী। এত চমৎকার ব্যক্তিগত আর্ট সংগ্রহ খুব কমই দেখা যায়।

এবার আমরা এলাম একটা পুরনো কলোনিয়াল বা ঔপনিবেশিক যুগের বাড়িতে। গাড়ি বারান্দা, সার সার বিশাল দরজা জানলা। বিরাট হলঘরটি এখন একটি চমৎকার রেস্তোরাঁ। সাদা-কালো শ্বেতপাথরের মেঝের ওপর টেবিল পাতা। লোকজন কফি খাচ্ছে, গল্পগুজব করছে। অন্যান্য ঘরগুলিতে নানা ধরনের বুটিক। মালা, হাতের চুড়ি, জামাকাপড়। ক্রেতার ভিড়ও মন্দ নয়। আমাদেরও একটু কেনাকাটা হয়ে গেল।

আমরা জ্যোতির বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ করব। ওর ছিমছাম সুন্দর ফ্ল্যাট। সেখানেও পুরনোদিনের ফার্নিচার, মূর্তি, চোঙাওয়ালা গ্রামোফোন। ঘরের একপাশের বিশাল দোলনাটি বুফে টেবিল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভাত, মাছ, তরিতরকারি সাজানো। জ্যোতি গান করে, গানের সরঞ্জাম রয়েছে একদিকে। বসবার ঘরে বসে আছেন তার গুরুজি। আপনি কী কর্নাটকি সঙ্গীত করেন? আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন, না, আমি হিন্দুস্থানি গান করি। চেন্নাইতে এ আর রহমানের সঙ্গে কাজ করি। অতি সম্প্রতি শ্যাম বেনেগালের 'নেতাজি' ছবির জন্য কাজ করেছি। খাওয়া শেষ হতেই ধরলাম গান শোনাতে হবে। হারমোনিয়াম নিয়ে বসে গেলেন। শোনালেন ওর নিজের লেখা ও সুর দেওয়া নেতাজি ছবির একটি গান। আফগানিস্তানের উপজাতি এলাকায় সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়েছে এই গান। আমাদের জাহাজে ফিরতে হবে। আজ সন্ধ্যায় ছাড়বে জাহাজ। আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে ঠিক সময়ে না ফিরলে জাহাজ কিন্তু অপেক্ষা করবে না।

তীর থেকে চলে গেলে মোবাইল ফোন কাজ করবে না। তাই দুয়েকটা জরুরি ফোন সেরে নিচ্ছিলাম। জাহাজ দুলে উঠল। ডেকে দাঁড়িয়ে অনেকে দেখছেন বন্দর মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। আমার কেবিনের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখলাম সমুদ্র তত শান্ত নেই, বেশ তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ করছে। আর তরতর করে চলেছে জাহাজ। হঠাৎ মনে হল সি-সিকনেস অর্থাৎ সমুদ্রপীড়া হবে না তো! কোথায় যেন পড়েছি রবীন্দ্রনাথের সাগরদোলা সহ্য হত না। কত যে জাহাজে ঘুরেছেন কবি আর লিখেছেন ডেকে বসে অজস্র কবিতা ও গান।

প্রথম জাহাজে চড়ে পাড়ি দিয়েছিলাম আটলান্টিক মহাসমুদ্র। সেবার সাগরদোলায় কাবু হয়েছিলাম মনে পড়ল। সে এতদিন আগের ঘটনা, মনে হয় গতজন্মের কথা। তখন আমি তরুণী বধূ, সঙ্গে স্বামী, বালক পুত্র, শিশু কন্যা। নিউইয়র্ক বন্দর থেকে 'এস এস ইউনাইটেড স্টেটস' জাহাজে চড়ে ইংল্যান্ডের পথে রওনা হয়েছিলাম। কোন জাহাজে চড়ব তাই নিয়ে গভীর আলোচনা চলেছিল। ব্রিটিশ জাহাজ 'কুইন এলিজাবেথ' হতে পারত। আমি পছন্দ করলাম আমেরিকান জাহাজ 'ইউনাইটেড স্টেটস'। সেবার থ্যাংকসগিভিং পালিত হল

উঠবে। জাহাজ দুর্ঘটনায় পড়লে কী করতে হবে উপদেশ শুনে নিলাম। ভাবলাম, প্রথমদিন জাহাজে উঠেছি, এরকম ভয় না দেখালে কী চলত না! আমার ডানদিকের সাহেব টাইটানিক ডুবে যাবার কথা তুললেন। আমি প্রসঙ্গ বদলাবার চেষ্টা করছি। ওপাশের মেমসাহেব শাড়ি কী করে পরে আর পরতে কতক্ষণ লাগে, ঘণ্টাখানেক না আরও বেশি, জানতে চাইলেন।

জাহাজভর্তি বিদেশি ট্যুরিস্ট। সবাই ইন্ডিয়া দেখবেন বলে চেন্নাই শহরে ঘুরতে বেরিয়ে পড়লেন। জাহাজ থেকে বার হবার ও আবার প্রবেশের সময় বেশ কড়াকড়ি ও নিয়মকানুন আছে। দিনকাল ভালো নয়, নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সব ব্যবস্থা। জ্যোতি আমাদের নিতে এল তার গাড়িতে চেন্নাই ঘুরিয়ে দেবে। জাহাজ থেকে বেশ দূরে গাড়ি পার্ক করে অপেক্ষা করছিল। জ্যোতি চেন্নাইয়ের প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপিকা। ওর মতো প্রাণচঞ্চল মহিলা আমি খুব কম দেখেছি। ও গাড়ি চালাচ্ছে, আমি বসেছি পাশে। বললে, সরি, সিট বেল্টটা ছিঁড়ে গেছে বুঝেছ। তা যাক। কিন্তু গাড়ি চালাতে চালাতে মাঝে মাঝেই সে পিছনে বসা দুই সহযাত্রীর সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে গল্প করছে। গাড়ি চলেছে আপন মনে সামনের দিকে। আমার অবস্থা সঙ্গীন।

'ওই দেখো তোমার বাঁদিকে মেরিনা বিচ, সব রাজনৈতিক সমাবেশ হয় এখানে', জ্যোতির রানিং কমেন্টারি চলেছে। মনে পড়ল এমন দুয়েকটি সমাবেশ আমি দেখেছি। আমরা যেমন শহিদ মিনার বা ময়দানে দুপুরবেলা জমায়েত করি, এদের হয় সন্ধ্যার পর। একটি বিশাল সমাবেশে আমি উপস্থিত ছিলাম, তা শুরু হয়েছিল রাত দশটায়। মাউন্ট রোডের ওপর দেখেছি বিশাল রাজনৈতিক মিছিল আর রাস্তার ওপর উঁচু মঞ্চে সে সময়কার ভারতবর্ষের শীর্ষ নেতৃত্ব। জ্যোতি হঠাৎ বলে উঠল, দেখো, দেখো, নেতাজির স্ট্যাচুর ওপাশে একটা নৌকো উল্টে পড়ে আছে, আর ওই দিকে আরও একটা। সুনামির পর পরিষ্কার করা হয়েছে সমুদ্রতট তবু এখনও পড়ে আছে প্রকৃতির তাণ্ডবের কিছু নিদর্শন। গান্ধিজির স্ট্যাচুর কাছে বেশ কিছু লোকজনের ভিড়। কেউ বাদাম খাচ্ছে, কেউ বা কাটা ফল। ছোট ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে বিচের মাঝখান দিয়ে যে রাস্তা গেছে তার ওপর। সেই অভিশপ্ত ২৬ ডিসেম্বরেও বাচ্চারা ক্রিকেট খেলায় মেতেছিল। মর্নিং ওয়াক করছিল অনেকে। অকস্মাৎ সমুদ্র ক্ষিপ্ত হয়ে ধেয়ে এসেছিল তাদের দিকে।

জ্যোতি বললে, চেন্নাই তোমাদের চেনা শহর। সাধারণ দ্রষ্টব্য না দেখিয়ে চলো তোমাদের অন্য চেন্নাই দেখাই। ইতিমধ্যে সে আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজ ঘুরিয়ে দিয়েছে। এবার নিয়ে এল একটি সুন্দর দোতলা বাড়ির সামনে। বারান্দায় বসেছিলেন গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী রাঘবন। আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। ভেতরে প্রবেশ করে আমাদের চক্ষুস্থির। প্রতি ঘরে অতি সুন্দর পুরনো দিনের শিল্পের কালেকশন। মূর্তি, ছবি, নানারকম টুকিটাকি জিনিস। শ্রীমতী রাঘবনের বিশেষ সংগ্রহ মেয়েদের বসনভূষণ, সাজসজ্জার জিনিস। মাথার চিরুনি, সুপুরি কাটার

জাঁতি, অলঙ্কার, পদযুগল ঘষবার কারুকার্য করা পাথর। মিনিয়েচার ছবিতে নানা ভঙ্গিমায় নারী অথবা রাগরাগিণী। এত চমৎকার ব্যক্তিগত আর্ট সংগ্রহ খুব কমই দেখা যায়।

এবার আমরা এলাম একটা পুরনো কলোনিয়াল বা ঔপনিবেশিক যুগের বাড়িতে। গাড়ি বারান্দা, সার সার বিশাল দরজা জানলা। বিরাট হলঘরটি এখন একটি চমৎকার রেস্তোরাঁ। সাদা-কালো শ্বেতপাথরের মেঝের ওপর টেবিল পাতা। লোকজন কফি খাচ্ছে, গল্পগুজব করছে। অন্যান্য ঘরগুলিতে নানা ধরনের বুটিক। মালা, হাতের চুড়ি, জামাকাপড়। ক্রেতার ভিড়ও মন্দ নয়। আমাদেরও একটু কেনাকাটা হয়ে গেল।

আমরা জ্যোতির বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ করব। ওর ছিমছাম সুন্দর ফ্ল্যাট। সেখানেও পুরনোদিনের ফার্নিচার, মূর্তি, চোঙাওয়ালা গ্রামোফোন। ঘরের একপাশের বিশাল দোলনাটি বুফে টেবিল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভাত, মাছ, তরিতরকারি সাজানো। জ্যোতি গান করে, গানের সরঞ্জাম রয়েছে একদিকে। বসবার ঘরে বসে আছেন তার গুরুজি। আপনি কী কর্নাটকি সঙ্গীত করেন? আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন, না, আমি হিন্দুস্থানি গান করি। চেন্নাইতে এ আর রহমানের সঙ্গে কাজ করি। অতি সম্প্রতি শ্যাম বেনেগালের 'নেতাজি' ছবির জন্য কাজ করেছি। খাওয়া শেষ হতেই ধরলাম গান শোনাতে হবে। হারমোনিয়াম নিয়ে বসে গেলেন। শোনালেন ওর নিজের লেখা ও সুর দেওয়া নেতাজি ছবির একটি গান। আফগানিস্তানের উপজাতি এলাকায় সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়েছে এই গান। আমাদের জাহাজে ফিরতে হবে। আজ সন্ধ্যায় ছাড়বে জাহাজ। আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে ঠিক সময়ে না ফিরলে জাহাজ কিন্তু অপেক্ষা করবে না।

তীর থেকে চলে গেলে মোবাইল ফোন কাজ করবে না। তাই দুয়েকটা জরুরি ফোন সেরে নিচ্ছিলাম। জাহাজ দুলে উঠল। ডেকে দাঁড়িয়ে অনেকে দেখছেন বন্দর মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। আমার কেবিনের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখলাম সমুদ্র তত শান্ত নেই, বেশ তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ করছে। আর তরতর করে চলেছে জাহাজ। হঠাৎ মনে হল সি-সিকনেস অর্থাৎ সমুদ্রপীড়া হবে না তো! কোথায় যেন পড়েছি রবীন্দ্রনাথের সাগরদোলা সহ্য হত না। কত যে জাহাজে ঘুরেছেন কবি আর লিখেছেন ডেকে বসে অজস্র কবিতা ও গান।

প্রথম জাহাজে চড়ে পাড়ি দিয়েছিলাম আটলান্টিক মহাসমুদ্র। সেবার সাগরদোলায় কাবু হয়েছিলাম মনে পড়ল। সে এতদিন আগের ঘটনা, মনে হয় গতজন্মের কথা। তখন আমি তরুণী বধূ, সঙ্গে স্বামী, বালক পুত্র, শিশু কন্যা। নিউইয়র্ক বন্দর থেকে 'এস এস ইউনাইটেড স্টেটস' জাহাজে চড়ে ইংল্যান্ডের পথে রওনা হয়েছিলাম। কোন জাহাজে চড়ব তাই নিয়ে গভীর আলোচনা চলেছিল। ব্রিটিশ জাহাজ 'কুইন এলিজাবেথ' হতে পারত। আমি পছন্দ করলাম আমেরিকান জাহাজ 'ইউনাইটেড স্টেটস'। সেবার থ্যাংকসগিভিং পালিত হল

জাহাজে। সে যাত্রায় একদিন সকলে সাগরদোলায় পীড়িত হয়ে পড়েছিলাম। ডাইনিং রুম, ডেক সব খালি হয়ে গেল। মাথা তুলতে পারছি না। স্টুয়ার্ডেস এসে বিছানার পাশে যে কফি আর রোল রেখে গিয়েছিল তা তেমনই পড়ে ছিল চব্বিশ ঘণ্টা। পরদিন আটলান্টিক মহাসাগর শান্ত হলে পর দুর্বল পায়ে বাইরে ডেকচেয়ারে বসলাম। গরম স্যুপ দিয়ে গেল। এক চামচ মুখে দিয়ে মনে হল অমৃত।

আমাদের এই জাহাজটি ব্রিটিশ। আমি কাগজপত্র পড়ে আবিষ্কার করলাম এককালে এ জাহাজ ছিল সোভিয়েত স্পাই জাহাজ। একটু গা ছমছম করে উঠল। কাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করত? সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাবার পর জেনোয়া বন্দরে জাহাজটি নতুন করে ব্রিটিশ যাত্রীবাহী হিসাবে সাজানো হয়। অবশ্য প্রথমে প্রস্তাব ছিল এটি কয়েকটি সাবমেরিনের 'মাদারশিপ' হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

দীর্ঘ সময় সমুদ্রে থাকলে যদি ক্লান্তি আসে, যদি মনে হয় 'জল শুধু জল দেখে দেখে চিত্ত মোর হয়েছে বিকল' তাই যাত্রীদের মনোরঞ্জনের ও ব্যস্ত রাখার সব ব্যবস্থা আছে। নয় তলায় সুইমিং পুলে অনেকে সাঁতার কাটছেন। সুন্দরী মহিলারা চলেছেন বিউটি সালোঁতে। কেউ চুলে নতুন স্টাইল করছেন, কেউ মুখে প্যাক লাগিয়ে শুয়ে পড়েছেন। অনেক মহিলা ও পুরুষ জিমে ভিড় করেছেন। নানারকম যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যায়াম করছেন তাঁরা। লাইব্রেরিতে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশোনা করছেন কেউ। অনেকে দেখলাম ইন্ডিয়া নিয়ে পড়াশোনা করছেন। জাহাজে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আনুষ্ঠানিক বক্তৃতার ব্যবস্থা আছে। বলছেন ভারত বিশারদ বক্তারা। একদিন খোলা ডেকে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছি, আমার টেবিলে এসে বসলেন এক ইংরেজ দম্পতি। ভদ্রলোক ছিলেন দিল্লিতে ব্রিটেনের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত। তিনিও দুদিন বক্তৃতা দিলেন।

জাহাজে ভারতীয় বলতে আমার মতো দু-চারজন হাতে গোনা ব্যক্তি। তাই আমাদের ঘিরে মাঝে মাঝে স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনা বা আড্ডা বসে যায়। নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। একদিন ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা উঠে এল। ত্রিশ লক্ষের ওপর মানুষ অনাহারে মারা গেল কিন্তু তখনকার পৃথিবী বিশেষ কিছু জানতে পারল না, দেশে বা বিদেশে প্রতিবাদ হল না কোনও, এসব কথা শুনে আজকের আন্তর্জাতিক শ্রোতারা স্তম্ভিত। অনেকে বললেন, আনুষ্ঠানিক বক্তৃতার চাইতে এই হঠাৎ বসে যাওয়া আড্ডা তাদের ভালো লাগছে। জাহাজের অলিখিত আইন অনুসারে যাত্রীরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে মৃদু হাসবেন, অস্ফুটে হ্যালো বলবেন তা সে পরিচিত বা অপরিচিত যাই হোক না কেন। পরিচয়ের পরিধি বেড়ে চলে প্রতিদিন। সকালে খোলা ডেকে প্রাতরাশ করতে করতে আলাপ হয় কারও সঙ্গে। লাঞ্চের সময় ডাইনিং রুমে লম্বা টেবিলে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে পরিচয় জমে ওঠে। একটা জিনিস লক্ষ করলাম সাহেবরা সারাদিন হাফপ্যান্ট পরে থাকেন, মেমসাহেবদেরও স্বল্পবাস। কিন্তু সন্ধ্যায় দশতলার দুটি ফ্যাশনেবল

রেস্তোরাঁতে ডিনার খাবার সময় ছেলেদের পরনে স্যুট ও টাই আর মেয়েদেরও কালো বা গাঢ় রঙের পোশাক তার ঝুল নেমেছে হাঁটুর নীচে।

এদিকে আমাদের জাহাজ ধীরে ধীরে পুরো শ্রীলঙ্কা প্রদক্ষিণ করল। জাফনা, ট্রিংকোমালি পার হয়ে গেলাম। তামিল টাইগারদের ক্ষতি হয়েছে সুনামিতে। ওদের নিজস্ব নৌবাহিনী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শোনা গেল। তবে গল পার হয়ে ধীরে জাহাজ কলম্বো বন্দরে প্রবেশ করল। যতবার জাহাজ তীরে আসে অথবা তীর ছেড়ে যায় যাত্রীদের মধ্যে দেখা দেয় মহা চাঞ্চল্য। সাধারণত ডেকে ভিড় করেন সবাই। মনে মনে গুনগুন করছিলাম, একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়/একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়।

কলকাতা ছেড়ে আসার সময় আমার অনেকদিনের সেবিকা বলেছিল, মা, ভুলে যেও না, যেখানে সীতাকে বন্দী করে রেখেছিল সেই অশোকবনের ছবি তুলে এনো। আর রাবণের রাজপ্রাসাদেরও একটা ছবি চাই। ওকে বলা হয়নি বাস্তবে এসব নেই। মনে ভাবলাম ওকে একটা রবি বর্মার প্রিন্ট কিনে দিতে হবে, অশোকবনে বন্দিনী সীতা।

আমাদের জাহাজে বসবাস যেমন চলছিল, চলবে। তবে আমরা মাঝে মাঝে শহরে ঘুরতে যাব। একদিন সারাদিন ক্যান্ডি যাওয়া হবে স্থির হল। শ্রীলঙ্কার ঐতিহাসিক রাজধানী ছিল অনুরাধাপুর। সম্রাট অশোক তার পুত্র মহেন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য। ভগবান বুদ্ধের মহানির্বাণের পর তাঁর একটি দাঁত নিয়ে এসে মন্দিরে রাখা হয়। কীভাবে দাঁতটি নিয়ে আসা হয় তা নিয়ে প্রচলিত কাহিনী আছে। কলিঙ্গের কোনও রাজকন্যা তার চুলের মধ্য নিয়ে এসেছিলেন এই অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন। শেষপর্যন্ত ক্যান্ডির একটি মন্দিরে রক্ষিত হয় এই পুণ্য নিদর্শন। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন ক্যান্ডির 'টেম্পল অব টুথ'-এ আছে ভগবান বুদ্ধের সেই দাঁত। প্রতি বছর উৎসব হয় জুলাই-আগস্ট মাসে। আর পাঁচবছরে একবার খোলা হয় সোনার পদ্মের ওপর রাখা মণি-মাণিক্যখচিত দাঁতের কৌটো। ক্যান্ডি শহরটি পাহাড়ের ওপর একটি বিরাট জলাশয় ঘিরে গড়ে উঠেছে। পাহাড়ে ওঠা শুরু হওয়ার আগে আমরা পিনাওয়েলা নামে জায়গায় থামলাম। সেখানে আছে শিশু হাতিদের অনাথ আশ্রম। যেসব শিশু হাতি মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, হারিয়ে যায়, তাদের নিয়ে আসা হয় এই অনাথ আশ্রমে। আমরা যখন পৌঁছলাম হাতিশিশুরা নদীর জলে স্নান করছিল। একদল মানুষের আগমন ও তাদের ছবি তোলার ধুম দেখে বিরক্ত হয়ে তারা জলের মধ্যে ছপছপ করে দূরে সরে গেল। দুয়েকজন শুঁড় তুলে ছোটখাটো হুঙ্কারও দিল। প্রখর রৌদ্রের তেজ। পথের দুধারে বেতের টুপির দোকান। ঝটপট বিক্রি হয়ে গেল অনেক, সকলের মাথায় টুপি।

এরপর পাহাড়ের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ক্যান্ডিতে উঠে যাওয়া। এ যেন অনেকটা দার্জিলিংয়ের পথে তিনধারিয়া যাবার মতো। পাহাড় শুনে ভেবেছিলাম ঠান্ডা হবে।

তা নয়, রৌদ্রের প্রচণ্ড তেজ। এরপর হোটেলে বিশ্রামের জন্য বিরতি। সকলে লাঞ্চ খেতে বসেছি, গুমগুম করে ড্রাম বেজে উঠল। হোটেলের প্রশস্ত লনে শুরু হয়ে গেল ক্যান্ডি নৃত্য। বিদেশি দর্শকেরা লাঞ্চ খেতে খেতে ক্যান্ডি নৃত্য দেখে মুগ্ধ।

রবীন্দ্রনাথও একদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন এই নাচ দেখে। বহুদিন পরেও মনে করে লিখেছিলেন কবিতা 'ক্যান্ডীয় নাচ'—

'সিংহলে সেই দেখেছিলেম ক্যান্ডিদলের নাচ
শিকড়গুলোর শিকল ছিঁড়ে যেন শালের গাছ
পেরিয়ে এল মুক্তি মাতাল খ্যাপা,
হুংকার তার ছুটল আকাশ ব্যাপা।'

ক্যান্ডির রয়্যাল বটানিক গার্ডেন না দেখলে আমাদের ক্যান্ডিভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকত। পেরেদেলিয়া অঞ্চলে এই বটানিক্যাল গার্ডেনটি দেখে আমার কলকাতার জন্য শোক উথলে উঠল। আমাদের ছেলেবেলায় কী সুন্দর ছিল কলকাতার বটানিক্যাল গার্ডেন। ক্যান্ডির এই বাগানও নানা ধরনের গাছপালায় সমৃদ্ধ। আমাদের গাইড নানাবিধ ল্যাটিন নাম বলে গাছপালার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। গর্বের সঙ্গে জানালেন এ বাগান লন্ডনের কিউ গার্ডেনের মতো। কিছুদূর চলার পর আমি একটি বেঞ্চে বসলাম। আমার সামনে বেশ কিছু বাচ্চা ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে পিকনিক করতে এসেছে। খেতে খেতে আমাকে তারা কৌতূহলের সঙ্গে দেখছিল। সাহস করে কয়েকজন কাছে এল, ভাঙা ইংরিজিতে নাম কী, দেশ কোথায় জানতে চায়। আমার জবাবে একটি বাচ্চা বললে, তার নাম প্রবোধা। স্কুলের মিস ওদের বাড়ি যাবার সময় হওয়াতে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিল। আমার সঙ্গে তাদের বেশ ভাব জমে উঠেছিল। লাইনে মার্চ করে যেতে যেতে তারা হাত-নেড়ে ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া বলতে বলতে চলে গেল।

কলম্বোতে আমাদের হাইকমিশনার এখন নিরুপমা। ওঁর সঙ্গে দিল্লিতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি। আমি ছিলাম বিদেশমন্ত্রকের পার্লামেন্টারি কমিটির চেয়ারপার্সন, নিরুপমা তখন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র বা স্পোকসপার্সন। ওঁকে ঘন ঘন দেখা যায় টিভির পর্দায়।

নিরুপমা বলে পাঠিয়েছিল, ম্যাডাম, আমার সঙ্গে একটা দিন কাটিয়ে যান। ওঁর সুন্দর বাড়ি, সঙ্গের বাগানটি ছোটখাটো বটানিক্যাল গার্ডেন। আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে আরও কিছু অতিথিকে ডেকেছিল নিরুপমা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাংবাদিক এন রাম আর প্রাক্তন বিদেশ সচিব রাসগোত্র। সকলেই পরিচিত, জমিয়ে আড্ডা হল।

জাহাজের ডেকে হঠাৎ বসে যাওয়া আড্ডাতে তামিল টাইগারদের কথা উঠে পড়ল একদিন। আশির দশক থেকেই আত্মকলহে মগ্ন শ্রীলঙ্কায় শান্তি নেই। সত্তরের দশক থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল তামিল হোমল্যান্ডের দাবিতে তামিল টাইগারদের আন্দোলন। সিংহলি ভাষাকে একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসাবে চাপিয়ে

দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। ভাষা যে মানুষের মনে কতখানি ভালোবাসার জায়গা সে কথা মনে থাকে না অনেক সময়। শ্রীলঙ্কায় সিংহলিরা সংখ্যাগুরু, জনসংখ্যার শতকরা চুয়াত্তর ভাগ। ধর্মে বৌদ্ধ। অপরদিকে সংখ্যালঘু তামিল অধিবাসী। বেশিরভাগ হিন্দু হলেও তাদের মধ্যে আছে মুসলমান ও খ্রিস্টান। বৌদ্ধভিক্ষুরা সুসংগঠিত, অনেকটা চার্চের মতো। রাজনীতিতে তাদের মতামত প্রাধান্য পায়। সিংহলি ও তামিল টাইগারদের মধ্যে বড় বড় যুদ্ধ হয়েছে দ্বীপের উত্তর অংশে। হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে সারা দেশে। আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন নেতৃবৃন্দ। আমরা যে দন্তমন্দির ক্যান্ডিতে দেখে এলাম তার ওপর আত্মঘাতী হামলা হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। নরওয়ের মধ্যস্থতায় দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর মনে হয়েছিল এবার শান্তি ফিরে আসবে এই দ্বীপে। কিন্তু ২০০২ সালের সফল শান্তি আলোচনা ভেঙে গেল পরের বছর। এখন দ্বীপ অপেক্ষাকৃত শান্ত। কিন্তু কলম্বোর বন্ধুরা বললেন, এ হল কেমন যেন অস্বস্তিপূর্ণ শান্তি।

নিরুপমা তার গাড়ি ও শতগুণাকে একদিন সঙ্গে দিয়েছিল। সে আমাদের কলম্বো শহর ঘুরিয়ে গির্জা, মন্দির, বাজারহাট, পার্লামেন্ট সব দেখিয়ে দিল। বন্ধুরা বলে দিয়েছিলেন কলম্বোর সমুদ্রের ধারে গল ফেস হোটেলে একবার অবশ্যই যেতে হবে। তাই গল ফেস হোটেলের বারান্দায় বসে সিলোন টি পান করতে করতে সমুদ্রের দৃশ্য দেখলাম একদিন।

অবশেষে কলম্বো ছেড়ে জাহাজ পাড়ি দিল তুতিকোরিন বন্দরের দিকে। আমি অন্তত স্বদেশে ফিরছি। বিদেশি যাত্রীরা ভারতবর্ষ দেখবে বলে রোমাঞ্চিত হচ্ছে। স্থির হয়ে গেল ভোরবেলা জাহাজ তুতিকোরিন বন্দরে পৌঁছনো মাত্র গাড়ি করে চলে যাওয়া হবে মাদুরাই। সেখানে আছে বিশাল মীনাক্ষী মন্দির। ভোর সাড়ে পাঁচটায় জাহাজ থেকে নেমে লাক্সারি বাসে চড়তে হবে শুনে আমি ঘোষণা করে দিলাম যে আমি এর মধ্যে নেই।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন খাট ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে। আসলে জাহাজ তুতিকোরিন বন্দরে নোঙর করল তারই মৃদু দোলা লাগল। জেগে উঠে মনে হল মীনাক্ষী মন্দির আহ্বান করছে, যাই একবার ঘুরে আসি। দশ মিনিটে তৈরি হয়ে নীচে নেমে দেখলাম সহযাত্রীরা বাসে উঠে পড়েছেন। আমাকে দেখে হর্ষধ্বনি উঠল, তাহলে মত পরিবর্তন হয়েছে তোমার।

মীনাক্ষী মন্দিরের গোপুরম বা প্রবেশদ্বারে বিশাল উঁচু তোরণ। বহিরাগত আক্রমণকারীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এইসব প্রবেশতোরণ। মন্দিরের দ্বারে একটা পুজোর ডালি নিলাম। নারকেল, কলা, ফুলের মালা, কর্পূর, ধূপ ইত্যাদি সাজানো আছে। সকালে যখন ঘুম চোখে জাহাজ থেকে বন্দরে নেমে এলাম আমাদের বরণ করার জন্য দাঁড়িয়েছিল একটি সুসজ্জিত হাতি আর চুলে বেলফুলের মালা জড়ানো একদল তরুণী। তারা আমাদের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিয়েছিল আর হাতে দিয়েছিল কলা, হাতিকে খাওয়াবার জন্য। হাতি শুঁড়

দুলিয়ে আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছিল।

মন্দিরচত্বরে দুটি মন্দির। প্রথমটি শিবের দ্বিতীয়টিতে দেবী মীনাক্ষী। আমার ডালি পুরোহিতের হাতে দিলাম। তিনি শিবকে অর্ধেক উৎসর্গ করে বাকি অর্ধেক মীনাক্ষীকে দিতে বললেন। সাধারণত আমাদের দেশের কোনও তীর্থে বা মন্দিরে গেলে আমার ভক্তিভাব চলে যায়। পাণ্ডাদের কোলাহল আর ভিখারির উপদ্রবে। তুলনায় দাক্ষিণাত্যের মন্দির অনেক বেশি সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। তিরুপতি মন্দিরে শৃঙ্খলা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। শুধু দেবতার চোখ আচ্ছাদিত, দৃষ্টি বিনিময় সম্ভব নয়। মীনাক্ষী মন্দিরে ভালোভাবে পুজো দেওয়া গেল। আমার বিদেশি সহযাত্রীরা ততক্ষণ মন্দিরের স্থাপত্য ও কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হলেন। মাদুরাইয়ের অপর একটি স্থাপত্যের নিদর্শন দেখে জাহাজের পথে ফেরা হল। এটি হল থিরুমালাই নায়ক প্রাসাদ। এই রাজপ্রাসাদ ইন্দো-সারাসেনিক স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

আমরা সমুদ্রে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। জলে ভেসে থাকি দিগন্তের দিকে চেয়ে দিন কেটে যায়। বন্দরে থাকলে ফেলে আসা জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র ফিরে আসে। জলে মোবাইল স্তব্ধ, কূলের কাছাকাছি এলে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তখন শুনতে চাই বা না-চাই নানা খবর ভেসে আসে দেশ থেকে— গোয়া, বিহার, ঝাড়খণ্ড।

সহযাত্রীদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে। দেশ-বিদেশের অনেক দম্পতি। ফার্স্ট নেম সম্পর্ক হয়েছে অনেকের সঙ্গে— জর্জ আর ববি, গ্যারি আর ক্যারোলিন, ওয়ালটার আর লিনডা। মেরি অ্যান-এর স্বামী মারা গেছেন গতবছর, সে এসেছে তার বৌদিদি বার্নিকে নিয়ে। পৃথিবীর সব মানুষই মোটের ওপর একরকম সুখে-দুঃখে, শোকে-প্রেমে।

জাহাজ কন্যাকুমারীর কাছে ঘুরে গেল তুতিকোরিন থেকে কোচির দিকে। হঠাৎ মনে হল কেপ কমোরিন পার হয়ে সুমাত্রার দিকে গিয়েছিলেন সাবমেরিনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। পরিচালক হেমেন গুপ্ত নেতাজি নামে একটি ফিল্ম করেছিলেন সেখানে একটি দৃশ্য ছিল সাবমেরিনের ছাদে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের উপকূলের দিকে চেয়ে আছেন সুভাষচন্দ্র, পিছনে হেমন্তকুমারের গলায় গান 'জন্মভূমি মা'।

কোচিতে জাহাজ থামল সন্ধ্যার দিকে। তখন জাহাজের কার্ডরুমে আমাদের হঠাৎ বসে যাওয়া আড্ডা চলছিল। আমরা কেরালা রাজ্যে প্রবেশ করলাম। আমাদের দেশের সবচেয়ে অগ্রসর রাজ্য। কিন্তু কেমন করে তা হল! জবাব একটাই, শিক্ষার প্রসার। আমাদের একদলের মনে হল রোজ আমরা একঘেয়ে খাবার খেয়ে চলেছি। মেনু খুব ভালো কিন্তু সবই পাশ্চাত্য রান্না। কেরালায় এসে পাশ্চাত্যের খাবার খাওয়ার মানে হয় কোনও? অতএব আমরা নেমে পড়লাম বন্দরে। তাজ মালাবার হোটেল খুব বেশি দূরে নয়। সেখানে আছে বোট রেস্তোরাঁ

একেবারে সমুদ্রের ওপর। আমাদের শেফ ডেকে নিয়ে বললেন কী মাছ খাবেন পছন্দ করে দিয়ে যান। মাছ পছন্দ করার পর তিনরকমের কেরল রান্না করে তারা পরিবেশন করল। আমি বসেছি সমুদ্রের ধারে জানলা ঘেঁসে। চেয়ে দেখি স্বল্প আলোকে একটি লোক বুক জলে দাঁড়িয়ে জাল ছড়িয়ে দিচ্ছে আর মাছ ধরছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম সে এই রেস্তোরাঁর জন্যই মাছ ধরছে, সেই মাছই সাজানো আছে, পছন্দমতো রেঁধে দেওয়া হচ্ছে। শেষপাতে খেলাম দারচিনি দেওয়া আইসক্রিম, খুবই সুস্বাদু।

জাহাজ আরও দুয়েকটি বন্দর ঘুরবে। আমরা দু-তিনজন কোচিন থেকে বিদায় নেব ভাবলাম। মাঝপথে তাদের ছেড়ে যাব শুনে সহযাত্রীরা কোলাহল করলেন। তাদের কাছে বিদায় নিয়ে জাহাজ ছেড়ে এলাম। বন্দরের সিকিওরিটি এলাকার কাছে শান্ত্রিদল পথ আগলে দাঁড়াল, যেতে নাহি দিব। আমাদের এগিয়ে দিতে এসেছিল ফিলিপ আর মুকুল। তারা দৌড়োদৌড়ি শুরু করল। জাহাজে ঢুকতে ও বেরতে নানাবিধ কড়া নিয়মকানুন মানতে হয়। নানা কাগজপত্র দেখাতে হয়। কী যেন একটা কাগজ কমতি হয়েছে আমার। যা হোক, ফিলিপ আর মুকুল জট ছাড়িয়ে আনার পর বন্দরের সিকিওরিটির গেট খুলে গেল।

কলকাতার পথে এরোপ্লেনে বসে কেমন যেন আজব লাগল সব। এই ছিলাম সমুদ্রে ভাসমান। এখন উড়ে চলেছি আকাশে। মানুষ জলে বা আকাশে যেখানেই থাক তার নিবিড় যোগ মাটির সঙ্গে। জাহাজ যখনই বন্দরে পৌঁছত ডেকে দাঁড়ানো যাত্রীদের করতালি আর হর্ষধ্বনির মধ্যে ছিল তার পরিচয়।

'ভ্রমণ' জুন, ২০০৫

মিসিসিপি, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?

পবিত্র সরকার

মিসিসিপি নদীকে যখন দু-চক্ষেও দেখিনি, তখন তার নাম কোথায় পেয়েছিলাম? কোথায় আবার, আপনাদের সকলের মতো নিচু ক্লাসের ভূগোলের বইয়ে। ভূগোলের বইয়ে আপনাদের মতো আমিও জেনেছিলাম যে, মিসিসিপি আর মিসৌরি (ওদেশে কোথাও কোথাও বলে 'মিসৌরা') দুইয়ে মিলে পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী, প্রায় ৪,২০০ মাইলের মতো, যদিও একা মিসিসিপি অত নয়।

আসলে 'মিসিসিপি' নামটা আমার অদ্ভুত লাগত, কানে শুনতে, মুখে বলতে। মি-সি-সি-পি— এই চারটে দল বা সিলেবল জিভে-ঠোঁটে বারবার উল্টে-পাল্টে বলতাম, মুখে লজেন্স নিয়ে যেমন বাচ্চারা সামনে পিছনে এনে খেলা করে। শব্দটা একেবারে অচেনা, আমাদের ভাষার শব্দের সঙ্গে তার কোনও মিলই নেই— কী তার মানে, কে এমন গানের মতো নদীর নাম তৈরি করল, কিছুই তখন জানতাম না। পরে, বুড়োবয়সে, এই সেদিন জানলাম যে, 'মিসি' মানে 'বড়', আর 'সিপি' মানে 'নদী'— ওটা উত্তর আমেরিকার অ্যালগংকিয়ান রেড ইন্ডিয়ানদের ভাষায়। শুনে একটু আশ্চর্য লাগল, তার কারণ আমাদের কেরালার 'পেরিয়ার' নদীও 'পের ইয়ার' অর্থাৎ বড় নদী। 'গঙ্গা' থেকে 'গাঙ' কথাটা এসেছে বলে আমরা জানি, আর 'গাঙ' মানে যে নদী— তা কে না জানে, ইংলিশ-মিডিয়াম বাঙালিরা ছাড়া? অথচ কী আশ্চর্য, কোরিয়াতে গিয়ে শুনে এলাম তাদেরও ভাষায় 'গাঙ' মানে নদী। কে জানে উল্টো পথে গাঙ থেকেই 'গঙ্গা' হয়েছে কি না! তার মানে গঙ্গা মানেই নদী। গ্রামাঞ্চলে এখনও বড় গঙ্গা বা বড় গাঙ মানে বড় নদী।

এই দেখুন, শুরু করেছিলাম মিসিসিপি দিয়ে, তারপর কোত্থেকে কোথায় চলে এলাম। কেরালা, কোরিয়া বাংলার গ্রাম। একেই বুড়ো বয়সের বকুনির বদস্বভাব, তার ওপরে ভাষাতত্ত্ব। এসব শুনলেই লোকে 'পালাই পালাই' করবে। যাক, মিসিসিপিতে ফিরে যাই।

আরেকটু বড় হয়ে, কলেজ জীবনে পল রোবসনের গান শুনলাম 'ওল্ ম্যান রিভার।' শুনলাম সে গান মিসিসিপিকেই নিয়ে। আহা, এমন যে-নদী, এমন মরমি কথা তার সুর তৈরি করে দেয় রোবসনের কণ্ঠে, সে তো শুধু আর ভূগোলের ম্যাপে একটা আঁকাবাঁকা রেখামাত্র হয়ে থাকে না, সে হয়ে ওঠে একটা সুবিস্তীর্ণ

অঞ্চলের মানুষের জীবন-সংস্কৃতির এক প্রধান উৎস, তার সুখদুঃখ প্রাপ্তি-বঞ্চনার সাক্ষী। সত্যিই মিসিসিপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের গরিব ও বঞ্চনাপীড়িত, এককালে সাদাদের কাছে ঘৃণিত কালো মানুষদের জীবনের সমস্ত যন্ত্রণার নির্বাক সাক্ষী। তারা নদীরই কাছে অভিযোগ জানায়, নদীর কাছেই তাদের বেদনা আর আক্রোশ উগরে দেয়। আপনারা যাঁরা ভূপেন হাজারিকার মুখে 'ওল ম্যান রিভার'-এর বাংলা 'ও গঙ্গা তুমি বইছ কেন' শুনেছেন তাঁরা ওই যন্ত্রণা আর অভিযোগের সুরটা নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন। তোমার রাগ দুঃখ তুমি সব নদীকে জানাও। আমাদের মা-মাসিদের কাছে শুনেছি, গ্রামদেশের মেয়েরা যখন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে নানা জ্বালাযাতনা সহ্য করত, তখন কলসি নিয়ে নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়ে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে তারা নদীর কাছে তাদের দুঃখ-বেদনার কথা উজাড় করে দিত। যেন তাদের আশা— উজানে বা ভাঁটিতে যেদিকেই তাদের বাপের বাড়ি থাক, নদী সেখানে তাদের কথা পৌঁছে দেবে। শচীনকর্তার সেই গানটা মনে পড়ছে তো— 'পদ্মার ঢেউ রে, মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা নিয়ে যা রে।' মার্কিনি কালো মানুষেরা— হয়তো পৃথিবীর সব দেশের সব দুঃখী মানুষেরা— নদীর কাছে তাদের মনের কথা এভাবেই বলত। কথায়, কবিতায়, গানে।

তার আরেকটু পরে মার্ক টোয়েইনের বইগুলি পড়লাম। তাঁর সমস্ত লেখাতেই মিসিসিপির কথা প্রচুর আছে, কিন্তু 'মিসিসিপির জীবন' বা লাইফ অন দ্য মিসিসিপি বলে তাঁর আস্ত বইই আছে একখানা। তাতে মিসিসিপির ওপর নানা শহরে স্টিমারের যাতায়াত, সারেংদের 'রাডার' বা স্টিয়ারিং ঘোরানো থেকে চর বাঁচিয়ে নদীর গভীর অংশ দিয়ে অতি সুকৌশলে জাহাজ চালানো, খালাসিদের দড়ি ডুবিয়ে জলের গভীরতা মেপে তা চিৎকার করে ঘোষণা, চারপাশের সাদা ও কালো মানুষের জীবনের অজস্র কাহিনী-কিংবদন্তী-কৌতুক নিয়ে সে এক আশ্চর্য বই। সে বই থেকে মিসিসিপি নদীর জন্য কীরকম একটা ব্যাকুলতা তৈরি হত। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি কোনওদিন মিসিসিপির সঙ্গে দেখা হবে।

কালো মানুষের 'ওল্ ম্যান রিভার' মিসিসিপি, আর লাল মানুষেরও নদী ছিল এই মিসিসিপি। আগেই বলেছি, মিসিসিপি নামটা তাদেরই ভাষার। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেড ইন্ডিয়ানরা প্রায় উৎখাত হয়ে গেছে। সেই সরল, সৎ ও বীর যোদ্ধার জাতিকে সাদা মার্কিনিরা প্রায় তিন-চার শতাব্দী ধরে তাড়িয়েছে, কারণে-অকারণে গুলি চালিয়ে শেষ করেছে, শেষে সভ্যতা ও নগরজীবনের সমস্ত কেন্দ্র থেকে ভাগিয়ে 'রিজার্ভেশন' নামক একরকমের ত্রাণশিবিরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সেই প্রায়-নিশ্চিহ্ন জাতি কিন্তু সারা মার্কিনদেশে স্থান আর নদীর নামে তাদের অক্ষয় চিহ্ন রেখে গেছে। তাই এক সাদা মার্কিন কবি, শ্রীমতী লিডিয়া হান্টলি সিগুর্নি (১৭৯১-১৮৬৫) তাঁর Indian Names কবিতায় এমন কয়েকটি লাইন লিখে গেছেন—

You say they all have passed away,
That noble race and brave;
That their light canoes have Vanished
From off the crested wave;
That mid the forests where they roamed
There rings no hunter's shout;
But their name is on your waters;
Ye may not wash it out.

হ্যাঁ, রেড ইন্ডিয়ানদের দেওয়া নামগুলি ধুয়ে মুছে দিতে পারেনি সাদারা। কী সব নাম— Alleghery, Tallahassee, Susquehanna, Kalamazoo, Chicago, Monongahala, Mississipi। উনিশ শতকের মার্কিন দেশের মস্ত কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান শেষ নামটির ধ্বনিগুণে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠেছিলেন, 'আহা! Mississipi ... the word winds with chutes- it rolls a stream three thousand miles long!...এ যেন তিন হাজার মাইল লম্বা এক আঁকাবাঁকা শুট (পার্কে ছেলেমেয়েরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে পিছলে নামার 'স্লাইড')।

নামের মধ্যে চিহ্ন অক্ষয় করে রেখে গেছে সেই দুর্ধর্ষ যোদ্ধার জাতি, কিন্তু এ নাম বদলাবার চেষ্টাও যে হয়নি তা নয়। ১৫৪১-এ ডি সোটো নাকি আবিষ্কার করেছিলেন এ নদী। হায়! মানুষের হাজার বছরের ধাত্রী নদীকে পশ্চিমের একজন সাদা লোক প্রথম দেখল, তাতেই তার 'আবিষ্কার' হয়ে গেল। এর নাম এক সময় 'ইংলিশ রিভার'-ও ছিল, সম্ভবত এই কারণে যে দীর্ঘকাল ধরে এ নদী ইংরেজিভাষী আমেরিকানদের বসবাসের পশ্চিম সীমানা হয়ে ছিল, এর পশ্চিমে যেতে তারা অনেকদিন সাহস করেনি। আগে স্প্যানিয়ার্ড আর ফরাসিরা এর নানা নাম দিয়েছিল— রিয়ো গ্রাঁদ্ (তার মানেও 'মস্ত নদী'), বুয়াদে, রিভিয়ের দ লা কঁসেপশিঁয়ো (কল্পনার নদী?')। কখনও এর নাম হল 'দ কোলবার্ট', কখনও 'দ সেন্ট লুইস'। কিন্তু নিউ মেক্সিকোর গভর্নর পেঞ্চেলোসা সেই ১৬৬১-তে যেই শুরু করলেন মিসিসিপি নামে এ নদীকে ডাকতে, তারপর থেকে ওই নামই তার বহাল হয়ে গেল। পেঞ্চেলোসার বানানটা ছিল Mischipi। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের গোড়াতেই Mississipi বানান স্থায়ী হয়ে গেল।

এই দেখুন, লিখতে বসেছি ভ্রমণ-কাহিনী, তা না লিখে একগাদা শুকনো ঐতিহাসিক খবর আপনাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছি। আপনারা এসব মনে রাখবেন না। ভ্রমণ-কাহিনীতে ফিরে আসি, নইলে সম্পাদিকা রাগও করতে পারেন।

২

ভ্রমণ-কাহিনী মাত্রেই জীবনস্মৃতির এক টুকরো। এতে জীবনের কথা আসবে, লোকজনের কথা আসবে, ছোটখাটো খুনসুটি ঘটনা-দুর্ঘটনার কথা আসবে। শুধু ট্যুরিস্ট-গাইড তৈরি করে দিতে পারি না। 'ভ্রমণ'-এর পাঠকেরা তো এ ধরনের

লেখাতে খুবই অভ্যস্ত, আমাদের মতো কয়েকজনকে তাঁরা বছরের পর বছর সহ্য করে আসছেন।

তাই এবার জীবনের কথাতে আসি। এ লেখাটা মিসিসিপির উৎস নিয়ে, কিন্তু আমরা মিসিসিপিকে দেখা শুরু করেছিলাম প্রায় মোহনা থেকে, উৎস থেকে নয়। আমরা, মানে আমার স্ত্রী মৈত্রেয়ী আর আমি। আমরা ১৯৭২-এর মাঝামাঝি একবার আমেরিকা দেশটা দেখতে বেরিয়েছিলাম। তখন শিকাগো শহরে থাকি। আমার বছর তিনেক আর মৈত্রেয়ীর বছর দুয়েক কেটেছে সে দেশে। যদিও আমি ছাত্র, সামান্য স্টাইপেন্ডের টাকা পাই আর ও একটা ফিজিক্সের ল্যাবরেটরিতে কাজ করে অল্প মাইনেতে, বয়স দুজনেরই কম বলে ঠিক করলাম 'দুত্তোর' বলে গ্রীষ্মের ছুটিতে বেরিয়ে পড়া যাক।

তখন বেড়ানো বেশ সস্তাই ছিল। বেড়াব তো বাসে, গ্রেহাউন্ড নামে বিশাল বাসলাইনে, যার জাল আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক শহরে ছড়িয়ে আছে। তখন নিরানব্বই ডলারে একুশ দিনের একটা বেড়ানোর টিকিট পাওয়া যেত। যেখানে খুশি ওঠো, যেখানে খুশি নামো, শুধু একুশ দিনের মাথায় তোমার ও টিকিটে বেড়ানোর মেয়াদ শেষ হবে। আমেরিকায় বাসে বেড়ানোর একটা সুবিধা এই যে, বাস-টার্মিনাসগুলো শহরের একেবারে মধ্যিখানে, ওরা যাকে 'ডাউনটাউন' বলে সেখানে। প্লেনে গেলে এয়ারপোর্ট থেকে শহরে পৌঁছতেই অনেকক্ষণ লেগে যায়। আবার রাতেও চলবে বাস, ফলে রাতে বাসে উঠে নাক ডেকে ঘুমোও, আর সকালবেলায় জেগে নেমে জায়গাটা তন্নতন্ন করে দেখে নাও। তাই পয়সার কারণে, এবং এসব সুবিধার জন্য বাসে চেপে বসলাম একদিন।

ভেতরে প্লেনের চেয়েও ভালো আরামদায়ক সিট, ভাঁজ খুলে নিলে দিব্যি শয্যা হয়ে যায়, পাদানিটিও পাদুটিকে সুখ দেওয়ার জন্যই তৈরি। শিকাগো থেকে বেরোবার পরই তুমুল বৃষ্টি নামল বলে মনে পড়ছে, ফলে তার মধ্যে ঘুমটা যে খুব প্রগাঢ় আরামের হয়েছিল সেটা আপনারা অনুমান করতে পারেন। এয়ারকন্ডিশনড বাস, সামনেকার বিশাল উইন্ডশিল্ডে দুটো মস্তবড় ওয়াইপার খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে জলধারা মোছবার চেষ্টা করে যাচ্ছে, আবার নতুন বৃষ্টিধারা এসে তাদের চেষ্টাকে উপহাস করছে— এই দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সকালে উঠে মিসৌরি রাজ্যের রাজধানী সেন্ট লুইসে প্রথম দেখলাম মিসিসিপিকে। বেশ বড় নদী, কিন্তু আমাদের কলকাতার গঙ্গার চেয়ে বেশি চওড়া নয়। জলটা অবশ্যই বেশি নীল। এই নীল রং-ই এ নদীর মাহাত্ম্য বাড়িয়ে দিয়েছিল আমার চোখে। কলকাতার গঙ্গাকে আমার শহরের চাপে খানিকটা ম্রিয়মাণ ও লজ্জিত মনে হয়, যেন শহরের বিবর্ণতার সঙ্গে সে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু মিসিসিপি তার দরাজ নীল স্বাতন্ত্র্য রেখেই বয়ে চলেছে, অজস্র সেতুতে বাঁধা পড়লেও, বুকে অজস্র নানা সাইজের স্টিমার, স্টিমবোট ইত্যাদি দাপিয়ে বেড়ালেও, পারের শহরগুলিকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না।

সে শুধু চোখেরই আলাপ মাত্র। সেন্ট লুইসের পর থেকে মিসিসিপি আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চলল। তারপর কেন্টাকির 'খেরো' (বানান কিন্তু Cairo) থেকে আমরা যখন মিসিসিপির জ্যাকসনের দিকে ঘুরে গেলাম, তখন তাকে হারিয়ে ফেললাম আমরা। কিন্তু ও মা! আরেকটা সকাল হল, লুইজিয়ানায় এসে পড়লাম, তখন দেখি আবার সেই মিসিসিপি। প্রথমে বাতোঁ রুজ বা ব্যাটন রুজ শহরে তাকে পেলাম, তারপর একেবারে নিউ অর্লিন্স-এ, দক্ষিণ মার্কিন দেশের ফরাসি ধরনের উনিশ শতকীয় স্থাপত্যের চমৎকার শহরে— যা দেখে আমাদের উত্তর কলকাতার কথা খুবই মনে পড়ছিল। কারণ বারান্দায় লোহার নানা ডিজাইনের রেলিং, লোহার থাম। আর ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর কাঠগোলাপ গাছ।

সেইখানে মোহনার কাছাকাছি মিসিসিপিকে আমরা প্রাণভরে দেখলাম। এবার সে-নদী একটু এগিয়ে মেক্সিকো উপসাগরের শরীরে গিয়ে মিশে যাবে। এখানে নদী আরেকটু প্রশস্ত, এখানেও সে নীল, কিন্তু পদ্মার মতো এপার-ওপার হারানো বিস্তার সে পায়নি। সেখানেও তাকে বেশ ভালোই লাগল।

এর দুবছর পরে আমরা গিয়ে বসত করলাম মিসিসিপিরই এক শহরে। আসলে যমজ দুই শহর, ইংরিজিতে যাকে বলে 'টুইন সিটিজ'। এ শহরদুটির নাম মিনিয়াপোলিস আর সেন্ট পল। সেন্ট পল হল আমেরিকার উত্তরে মিনেসোটা রাজ্যের রাজধানী। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পড়ানোর কাজ, সেটি মিনিয়াপোলিস শহরে। থাকি সেন্ট পলে। মিসিসিপি নদী অনেকটা অংশে দুটি শহরকে ভেদ করে বেরিয়েছে, ফলে আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তায় দুবেলাই মিসিসিপি পেরোতে হত।

তখন আমাদের দুজনের সংসারে একটু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে, আমার বড় কন্যা বসুধিতির বয়স তখন এক বছরের সামান্যই বেশি। আমার স্ত্রীও একটা বুড়োবুড়িদের বৃদ্ধাশ্রমে একটি কাজ পেয়েছে, ফলে মেয়েকে বেবিসিটারের কাছে জমা রেখে যেতে হয়। কাজে যাবার সময় সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ আমরা তিনজনেই বেরিয়ে পড়ি। একটা ১৯৬৭-র ডজ ডার্ট গাড়ি ছিল তখন আমার। ড্রাইভার আমিই, আমার পাশে একটা বেঁধে রাখা সিটে মেয়ে বসত। দুবেলা মিসিসিপি পেরোনো তার কাছে একটা ভয়ঙ্কর উত্তেজনার ব্যাপার ছিল। বাঁধা সিট থেকে সে লাফিয়ে লাফিয়ে ব্রিজের দুপাশের বালুচড়াসুদ্ধ নীল জলের মিসিসিপিকে দেখার চেষ্টা করত, আর দুহাত দুদিকে নাচাতে-নাচাতে বলত— 'এ মিমি! ও মিমি!' যার বাংলা অনুবাদ হল— 'এদিকেও মিসিসিপি, ওদিকেও মিসিসিপি!'

দক্ষিণের মিসিসিপি মূলত সমতলের নদী। কিন্তু মিনিয়াপোলিসের মিসিসিপি বেশ খাদ তৈরি করে এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে। তবু তাকে দেখার কোনও অসুবিধা ছিল না। আমাদের আস্তানা, দোকানবাজারের খুব কাছেই ছিল সে, তার সঙ্গে ব্রিজ পেরোনো ছাড়াও বেশ কয়েকবার আলাপচারিতা চলত।

৩

তদ্দিনে মিনিয়াপোলিসে আমাদের বেশ কিছু বাঙালি বন্ধুবান্ধবও জুটেছে। তাদের মধ্যে দুজন, এক দম্পতি, আমাদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার দীপক সেনগুপ্ত, যার ডাকনাম গোরা, আর তার স্ত্রী কৃষ্ণা। আমার মেয়ে গোরাকে মামু বলে ডাকে। ওখানে, মানে মিনিয়াপোলিসেই আগের ডিসেম্বরে মেয়ের অন্নপ্রাশন হয়েছিল, গোরাই তাকে প্রথম ভাত খাইয়েছিল।

এই গোরাই মিনিয়াপোলিস থেকে আমাদের যত রকম ভ্রমণের প্রধান চক্রান্তকারী। তার একেবারে 'উঠল বাই তো কটক যাই' মেজাজ। 'পবিত্রদা, চলুন ফল কালার দেখে আসি!' 'পবিত্রদা চলুন, মাউন্ট রাশমোর যাবেন!' 'পবিত্রদা, চলুন অমুক লেকে মাছ ধরতে যাই এই শনিবার!' 'পবিত্রদা, চলুন শিকাগো থেকে ইলিশ মাছ (ওখানকার শ্যাড মাছ) কিনে আনি!' এই হল গোরার সর্বক্ষণের স্লোগান। আমার সেই ডজ ডার্ট আর গোরার একটা লজঝরমার্কা প্লিসাথ গাড়ি ছিল, আমরা বিনাবাক্যব্যয়ে বেরিয়ে পড়তাম 'উঠো মুসাফির বান্ধো গাঁধোরি' বলে। মাঝে মধ্যেই সঙ্গী জুটে যেত আরও কেউ কেউ। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে আরও দুই ডাকাবুকো বিবাহবিরোধী মহিলা ছিল, অতসী আচার্য— যে ওদেশেই সমাজকল্যাণমূলক কাজে থেকে গেছে, আর বীথি সরকার— যে পরে ফিরে এসে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে এখানে শ্রীশিক্ষায়তন কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছে এবং অবসর নিয়েছে। ছিল শামসুল আলম বা সন্টু, আমাদের বন্ধু শামসুল বারির ভাই এবং সুপ্রিয়ার দেওর। সুপ্রিয়া গোরার দিদি। সন্টুকে আমার মেয়ে 'সিনাকু' বলে, সেটা সন্টুকাকুর সংক্ষিপ্ত এবং নাচার রূপ।

গোরাই আমাদের মিসিসিপির উৎস সন্ধানের মূল ষড়যন্ত্রী। সে একদিন বলল, 'কী রোজ রোজ একঘেয়ে মিসিসিপি দেখেন পবিত্রদা, চলুন এবার মিসিসিপির আদত উৎস দেখে আসি।'

আমি বললাম, 'সেটা আবার কোথায়?'

গোরা বলল, 'কিছুই খবর রাখেন না দেখছি! সেটা এই আমাদের মিনেসোটাতেই, উত্তরে, আইটাস্কা বলে একটা জায়গায়। চলুন এসপ্তাহেই সামনে একটা লং উইক-এন্ড (অর্থাৎ শুক্র-শনি-রবি তিনদিন) ছুটি। চলুন শুক্রবার সকালেই বেরিয়ে পড়ি। মাত্র ছ-সাত ঘণ্টার ড্রাইভ।'

গোরা এমনভাবে, 'আমাদের মিনেসোটা' বলল যাতে মনে হল গোটা মিনেসোটা রাজ্যটা তার পারিবারিক সম্পত্তি, এবং এ রাজ্যে আমরা যেখানেই যাই সেখানেই আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, রাজকীয় আরাম ও সংবর্ধনার গ্যারান্টি সে তৈরি করে রেখেছে। যাই হোক, সে একটা কিছু ধরে বসলে তার থেকে বেরিয়ে আসব, এমন ব্যক্তিত্ব আমার কোথায়? কাজেই একদিন সক্কালবেলা বেরিয়ে পড়লাম উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত I-94 অর্থাৎ আই নাইন্টিফোর এক্সপ্রেসওয়ে বা দৌড়পথ ধরে। 'আই' মানে হল ইন্টারস্টেট অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি আন্তঃরাজ্য

সরণি। আমরা দুটি পরিবার এবং সেইসঙ্গে লক্ষ্মণ ভাইয়ের মতো সন্টু।

১৯৭৪-এর আগস্ট মাস। উত্তর আমেরিকার বৃষ্টির ঋতু মোটামুটি শেষ, আকাশে উজ্জ্বল রোদ আর ক্বচিৎ-কখনও সাদা মেঘের টুকরো। নভেম্বর তখনও বেশ দূরে— ওই নভেম্বর থেকে মিনিয়াপোলিসের বিচ্ছিরি শীত এসে যাবে, যমজ শহর, পুরো রাজ্য— প্রায় ছ-মাস বরফে ঢেকে থাকবে। ফলে এই সময়টাই মিনেসোটা রাজ্যে বেরিয়ে পড়ার পক্ষে প্রশস্ত সময়।

এমনিতেই মিনেসোটার খ্যাতি 'আ স্টেট অব টেন থাউজ্যান্ড লেক্স' অর্থাৎ দশ হাজার হ্রদওয়ালা রাজ্য হিসাবে। কথাটা মোটেই অতিরঞ্জন নয়, হয়তো সংখ্যা আরেকটু বেশিই হবে। শুনেছি এসব লেকই তৈরি হয়েছে হিমবাহ গলে। এরকম একাধিক লেকে শনি-রবিবার বেরিয়ে গিয়ে হুইল-লাগানো ছিপ ফেলে আমরা মাছ ধরেছি। বড় যে লেকটার নাম সবাই জানে, লেক সুপিরিয়ার— তারও উত্তর-পশ্চিমে তুলনায় অকিঞ্চিৎকর আয়তনের ওই লেক আইটাস্কা। সম্ভবত আইটাস্কা কথাটার মানে 'লিটল এল্‌ক' বা ছোট্ট এক জাতীয় হরিণ। এটাও অ্যালগংকিয়ান ইন্ডিয়ান শব্দ।

আই নাইন্টিফোর ধরে বেশ খানিকটা উত্তরে গিয়ে সেন্ট ক্লাউড শহরে গিয়ে আমরা এখান থেকে ইন্টারস্টেট হাইওয়ে ছাড়লাম, ঢুকে পড়লাম স্টেট হাইওয়েতে, অর্থাৎ মিনেসোটা রাজ্যের নিজস্ব হাইওয়েতে। আইটাস্কা হ্রদ অ্যাটলাসের হিসাবে ৪৭.১৩ অক্ষাংশ আর ৯৫.১৪ দ্রাঘিমার সংযোগস্থলে, কিন্তু ভূগোলের এই শুকনো অঙ্কে তার চরিত্র কিছুই বোঝানো যাবে না। সেন্ট ক্লাউড থেকে মিসিসিপি নদী উত্তরদিকে এঁকেবেঁকে উঠে পশ্চিমে অনেকটা বেঁকে গিয়েছে। আসলে কথাটা উল্টো করে বললাম— আইটাস্কা থেকে সে অনেকটা পুবে এসে তারপর দক্ষিণে নেমেছে। যাই হোক, আমরা রাস্তা বদল করে চলতে লাগলাম।

মিনেসোটা মূলত কৃষিভিত্তিক রাজ্য, আর এর হ্রদ আর অরণ্যসম্পদেরও তুলনা নেই। আমাদের পথে আসছে ছোট ছোট গ্রাম— চাষিরা রাস্তার ধারে তাদের বাড়ির সামনে 'ফার্মার্স মার্কেট' অর্থাৎ চাষির বাজার সাজিয়ে বসেছে। সুন্দর বাক্সে বাক্সে আপেল, স্ট্রবেরি, টোম্যাটো, বাঁধাকপি, আলু, গাজর, সেলেরি গাছ, ফুলকপি ইত্যাদি নানা ফল ও সবজি সাজানো— প্রত্যেক বাক্সে একটা গুঁজে রাখা কাঠির মাথায় দাম লেখা, দাম বেশ সস্তা। মাঝে মধ্যেই গ্রামীণ ড্রাগস্টোর জাতীয় দোকান। ড্রাগস্টোর মানে শুধু ওষুধের দোকান নয়, অল্পস্বল্প ওষুধ থেকে পিকচার পোস্টকার্ড, খাবারদাবার, চকোলেট টফি, টুকিটাকি উপহারের জিনিস, ড্রিংক্স— সবই পাওয়া যায়। বেশ কয়েকটা খামার চোখে পড়ল, তাতে গরু, বাছুর, ঘোড়া চরছে, দেখতে বেশ ভালো লাগে। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই ঘোড়ার আস্তাবল।

পথের দুধার অসম্ভব সবুজ। কত রকমের সবুজ তা বলে বোঝানো যায় না। এই আগস্ট মাসটা আসলে সবুজের চূড়ান্ত ঋতু, সেপ্টেম্বর থেকে পাতা-ঝরা

গাছগুলির পাতার রং বদলাতে শুরু করবে, অক্টোবরের শেষে পাতা ঝরাই শুরু হয়ে যাবে। পাতার ওই রং বদলের নাম 'ফল কালার' (ফল মানে হেমন্ত), তার কথা অন্য কোনও এক উপলক্ষে লেখা যাবে।

সবুজের কথা একটু বলি। রাস্তার ধারে মূলত বার্চ গাছের সারি। বার্চ গাছের কাণ্ডগুলো অনেকটা ইউক্যালিপ্টাসের গুঁড়ির মতো সাদা রঙের, কিন্তু পাতা সবুজ, ফাঁকে ফাঁকে ওক আর মেপল গাছের অন্য ধরনের সবুজ পাতা, ওকের সবুজ একটু বেশি। হিকরি জাতীয় গাছও অনেক, ঝাঁক বেঁধে প্রচুর পাইন। মাঠের শেষে দিগন্তে কোথাও কোথাও পাইনের জঙ্গলকে সারিবাঁধা সৈন্যবাহিনীর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সবচেয়ে জ্বলজ্বলে শোভা ছিল ঘাসে মোড়া সবুজের ঢেউখেলানো ওই মাঠ বা 'মেডো'গুলির। একে তাদের নিজেদের মোলায়েম সবুজ ঢেউ, তারপর রোদ আর ছায়ার ঢেউও খেলে যাচ্ছিল তাদের ওপর। সেদিকে তাকালে চোখের আয়ু একশো বছর বেড়ে যায়, আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। আমরা ছবি অনেক তুলেছিলাম, কিন্তু কোনও ক্যামেরাই সে সবুজের রং ধরে রাখতে পারে কিনা সন্দেহ।

যাব শেষ পর্যন্ত একটা হ্রদেই, কিন্তু রাস্তার ধারে ওই দশ হাজার হ্রদের কোনও কোনওটা আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। তাদের জলে প্রাক-শরতের নীল আকাশ তার পুরো রংটা উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে, তাতে বাতাসের তৈরি ছোট ছোট অগণন ঢেউয়ের গায়ে সূর্য ঠিকরে পড়ছে, মনে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ উজ্জ্বল রুপোলি মাছ গা-খেলিয়ে ভেসে যাচ্ছে। ওই নীল, তার সঙ্গে অজস্র রুপোলি মাছের শরীরদ্যুতি, আর তার সঙ্গে সবুজের হালকা থেকে গাঢ় নানা ছোপের বুনোট— সব মিলিয়ে সে এক দেখার অভিজ্ঞতা বটে।

দুপুরের প্রান্ত দিন ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি, আমরা পৌঁছে গেলাম আইটাস্কার কাছাকাছি একটা শহরে। সেখানেই একটা মোটেল বুক করে এসেছিলাম মিনিয়াপোলিস থেকে, তারা খুশি হয়ে অভ্যর্থনা করল। ছ-সাত ঘণ্টার ড্রাইভে আমরা সবাই একটু ক্লান্ত ছিলাম। দুপুরের লাঞ্চ নমো নমো করে সারা হল, বিকেলটা মোটেলের পিছনে তারই নিজস্ব হ্রদের ধারে আড্ডা মেরে কাটালাম, ছবিটবি তোলা হল। রাতে খাওয়াদাওয়াতে খুব স্পেশ্যাল কিছু হয়নি; সেটা হল পরদিন, ফলে তার কথা পরে লিখছি।

পরদিন অর্থাৎ শনিবার সক্কালবেলা জলখাবার খেয়ে আমরা আইটাস্কার দিকে বেরিয়ে গেলাম। কিছু দূরে গিয়েই আইটাস্কা হ্রদ আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে আরম্ভ করল— বনের ফাঁকে ফাঁকে সে দেখা দিচ্ছে আর লুকিয়ে পড়ছে। এমনিতে শুনেছি এ হ্রদ খুবই স্থির, কিন্তু সূর্য উঠলে নাকি এর জলে একটু চাঞ্চল্য জাগে। এমনিতে এ হ্রদ খুব গভীর নয়, যদিও বেশ খানিকটা লম্বা, প্রায় ত্রিভুজের মতো— ওখানকার লোকেদের কথায় 'অ্যারোহেড' বা তীরের ফলার মতো। খুব গভীরও নয় এ হ্রদ, মাঝে মধ্যেই বুনো ঘাসের ঝাঁক জলের ভেতর থেকে মাথা

উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, তারাও তৈরি করছে নীলের মধ্যে সবুজের দ্রোহভূমি। প্রচুর বুনো হাঁস উড়ে যেতে দেখলাম আমরা, আরও নানা জলচর পাখি। সকালের রোদে লাফিয়ে লাফিয়ে ভাসছিল ফড়িং আর প্রজাপতি। রাস্তায় কাঠবেড়ালিরা দৌড়ে পার হয়ে সড়াৎ করে পাইন গাছের মগডালে উঠে যাচ্ছে, কেউ বা পাইনের শুকনো ফল দু-হাতে ধরে গাড়ির মধ্যে বসে থাকা আমাদের জরিপ করে যাচ্ছে।

আইটাস্কা মূলত রেড ইন্ডিয়ানদের অঞ্চল— কাছাকাছি কয়েকটা রিজার্ভেশনও বোধ হয় আছে তাদের। এখানকার প্রধান শস্য বুনো চাল বা 'ওয়াইল্ড রাইস'। এই কালো-কালো দাগওয়ালা লম্বা চাল খুব সুস্বাদু, কিন্তু আমেরিকানরা নিয়মিত এ চাল খায় না। যখন তারা রুটি ছেড়ে ভাত খায় তখন আমাদের মতো ধবধবে চালের ভাতই তাদের প্রিয়। নভেম্বরে তাদের থ্যাংক্সগিভিংয়ের পরবে তারা এই চালের ভাত খায়, সঙ্গে টার্কি পাখির মাংসের রোস্ট আর ক্র্যানবেরি সস।

এই তীরের ফলার মুখটা থেকে বেরিয়েছে মিসিসিপি। আমাদের গাড়ি পার্ক করতে হল বেশ খানিকটা দূরে। আমরা হাঁটলাম খানিকটা, মেয়েকে তার মা তার স্ট্রোলারে ঠেলে নিয়ে চলল। প্রথমে পড়ল একটা ছোট ফুটব্রিজ, কাঠের তৈরি, রেলিং দেওয়া পদচারীদের জন্য পুল। তার নিচ দিয়ে যে নালাটা বয়ে যাচ্ছে সেটাই নাকি মিসিসিপি। দেখে তাজ্জব হতে হল।

ব্রিজ পেরিয়ে খানিকটা ঝোপঝাড়, তারপর পাইন জঙ্গলের পটভূমিকায় হঠাৎ খুলে গেল একটা বালুময় প্রশস্ত অঙ্গন। সেখানে কিন্তু নালাটি খানিকটা ছড়িয়ে গেছে। সেখানেই চাক্ষুষ করলাম একটি নদীর জন্ম। বাঁদিকে প্রশস্ত হ্রদ ডানদিকে মিসিসিপির ক্ষীণতনু জলধারা— মাঝখানে পাথরের টুকরো ফেলে চিহ্নিত করা হয়েছে নদীর জন্মরেখা। আমেরিকানরা নদীর জলে নেমে পড়েছে, যদিও এ জলে গোড়ালির গিঁট পর্যন্ত ডোবে কিনা সন্দেহ। তবু গঙ্গোত্রীতে স্নান করার মতো এই উৎসধারায় জল ছোঁয়ারও নিশ্চয়ই একটা মাহাত্ম্য আছে।

সন্টু মেয়েকে কোলে নিয়ে একবার পাথরের টুকরোগুলির ওপর দিয়ে টালমাটাল হয়ে পেরিয়ে গেল, তাতে আমাদের একটু গা শিরশির করছিল। মেয়ে মনে হল মোটামুটি উপভোগ করল বিষয়টা, কারণ সিনাকুর টলোমলো ভঙ্গিতে সে খিলখিল করে হাসছিল। তবে এই যে তার 'মিমি'র উৎস সেটা সে কতদূর বুঝতে পেরেছিল সন্দেহ। পরে আমরাও একটু সাহস সঞ্চয় করে সেই উপলসেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াত করলাম, তাতে বসে মেয়েকে কোলে নিয়ে সদ্যোজাত মিসিসিপির জলে পা ডুবিয়ে ছবিও তুললাম। তারপর নিউ অলিন্স, সেন্ট লুইস, মিনিয়াপোলিস ইত্যাদি সব জায়গার মিসিসিপিকে জড়িয়ে নদীটার দৈর্ঘ্যপ্রস্থের একটা হিসাব নেওয়ার চেষ্টা করলাম। হিসেবটা মাথায় ঢুকিয়ে দিল পাথর-সীমানার একপাশে মাটিতে পুঁতে দাঁড় করানো দু-মানুষ মাপের একটা গাছের গুঁড়ি, যার একদিকটা চেঁছে তাতে এই কথাগুলি লেখা—

Here, 1475 feet above the ocean, mighty Mississipi begins to flow on its winding way to 2562 miles to the Gulf of Mexico.

পাথর ফেলা জায়গাটার ধারেই এই গাছের গুঁড়ি দাঁড় করানো। তার আশপাশে রেড ইন্ডিয়ানদের নানা স্থানীয় নিদর্শন সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একটু খোলা জায়গায় কিছু পাইন গাছ, তার সামনে সাজানো আছে একটা 'টিপি' বা রেড ইন্ডিয়ানদের তাঁবু। তার পাশে একজন রেড ইন্ডিয়ান সর্দারও তার পালকের টুপি মাথায় পরে রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। যে-কেউ ইচ্ছে করলে তাঁকে এক ডলার দিয়ে তার সঙ্গে ছবি তুলতে পারে, চাই কী, তার দু-তিনটে স্পেয়ার পালকের টুপি মাথায় পরেও নিতে পারে। আমরা বাঙালরা সে সুযোগ ছাড়ব কেন? সবাই টিপি-র সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম, কিন্তু সেগুলি দেখিয়ে আপনাদের হাসির উদ্রেক করতে চাই না। জায়গাটাতে ঘুরে দেখার আর বিশেষ কিছু ছিল না, তবে একটা 'ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি' বা চিড়িয়াখানা মতো ছিল। তার একটি বাইসন খুব কাছে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ জামানোর চেষ্টা করছিল। মাঝখানে তারের বেড়া ছিল বলে রক্ষা।

এই হল 'মিসিসিপি, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ' এই প্রশ্নের সীমানা। তারপরে আমাদের গল্প একটু বলি।

মোটেলে ফিরে এসে দৌড়ে গেলাম তার নিজস্ব হ্রদে— মোটেলটা ওই হ্রদেরই ধারে অনেকটা সবুজ অঞ্চল নিয়ে খাড়া হয়েছে। আমার মেয়ে, যে এখন একটি বালিকা বিদ্যালয়ে জবরদস্ত শিক্ষিকা এবং স্কুল থেকে 'ভ্রমণ' সম্পাদিকার প্রাণের বন্ধু (সেই কারণেই 'ভ্রমণ'-এ আমার এত খাতির), সে একটা ছড়ানো পাইন গাছের নীচে বসে হ্রদের শোভা দেখতে লাগল; আর আমরা মোটেলের ডিঙি নৌকো চড়ে একটু মাছ ধরতে বসলাম— ছিপটিপ মোটেলই সরবরাহ করল। মহিলারা জলের ওপর কাঠের পাটাতনে দাঁড়িয়ে আমাদের মাছ ধরা নিয়ে নানা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে লাগলেন, কারণ কয়েকটি অতিশয় তরুণ পার্চ মাছ ছাড়া বঁড়শিতে প্রায় কিছুই উঠল না। দ্রুত সন্ধ্যা হয়ে আসায় বেশি মাছ ধরার আশাও বেশি অবশিষ্ট রইল না।

লেকের ধারেই একটা ছাউনিতে মাছের আঁশ ছাড়ানোর আর কাটাকুটি করার জায়গা, সে সব মোটেলের অংশ। তারাই ছুরি-টুরি রেখে দিয়েছে। মাছ পরিষ্কার করে আস্ত আস্ত ভাজা হবে— এই সুখকর পরিকল্পনা করা হল।

রাতে মোটেলের স্যুইটে যে রান্নাঘর তাতে যখন রান্নার আয়োজন হচ্ছে তার গন্ধ পেয়ে শুধু আমরা কেন, নিশ্চয়ই পুরো শহরটার জনবসতি চনমনে হয়ে উঠেছিল। কে জানত যে দুই গৃহিণী মিলে নিয়ে এসেছে বরফে জমানো চিংড়ি মাছ, ভারতীয় দোকান থেকে মুগডাল, আর টিনবন্দী পটল। স্থানীয় দোকান থেকে আলু কিনে যখন চিংড়ি সহযোগে আলু-পটলের ঝোল তৈরি হতে লাগল তখন

মোটেলের লোকেরা কীরকম উতলা হয়েছিল সে খবর আমরা রাখিনি। পটল আমেরিকায় পাওয়া যায় না, এবং তাই পটলের ইংরিজি ওদের অভিধানে নেই— এর জন্য আমরা ওদের বেশ কৃপার চক্ষে দেখতাম। মিনিয়াপোলিস শিকাগোতেই যা পাইনি তা আইটাস্কাতে সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে, তা ভাবতেই আমাদের গা শিউরে-শিউরে উঠছিল।

এর মধ্যে একটুখানি নেতিবাচক ঘটনা হল, আলু-পটলের ঝোলের জন্য কৃষ্ণা আলু কেটেছিল, তাতে সে আমার গৃহিণীর বিলক্ষণ বকুনি খেল। গৃহিণী বললেন, এক-এক তরকারির আলু এক-এক সাইজে ও চেহারায় কাটতে হয়। কৃষ্ণা নাকি আলু-ঝিঙে-পোস্তর সাইজে আলু কেটেছে, আলু-পটলের ডালনার আলু কাটেনি। যাই হোক, কৃষ্ণাও জিনিসটা সারা জীবনের জন্য শিখে নিল, আমরাও।

সেদিনকার মুগডাল, পার্চ মাছ ভাজা, আলু-পটল-চিংড়ির ডালনা— এসব দিয়ে খাওয়াটা খাদ্যসংস্কৃতির কোন উচ্চতম শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল তার বর্ণনা করে আপনাদের স্থায়ী কষ্টের মধ্যে ঠেলে দিতে চাই না।

হ্যাঁ, আমাদের বেড়ানোটা তখন ওইরকমই ছিল। চোখের তোয়াজ তো করবই, বেড়ানো মানেই তাই, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে জিভ আর পেটকে হেলাফেলা করারও প্রশ্ন ওঠে না। আপনারাও নিশ্চয়ই এই দর্শনে বিশ্বাস করেন।*

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৩

সাইগনের যুদ্ধক্ষেত্রে এক দিন

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

ভিয়েতনাম বিমান হো চি মিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মাটি স্পর্শ করল সকাল আটটা বেজে ত্রিশ মিনিটে। শুল্ক বিভাগের গণ্ডি পার হয়ে এপারে আসতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে চলেছি। সামনেই একটা পর্যটক তথ্যকেন্দ্র। কাউন্টারের মেয়েটিকে বললাম, 'একটা কম দামের হোটেল চাই। অতি সাধারণ হোটেল। এ সি দরকার নেই। তবে ব্রেকফাস্ট থাকলে ভালো হয়।' মেয়েটি বলল, 'এখানে সব হোটেলেই এ সি আছে।'

টেলিফোনে কথা বলে মেয়েটি বলল, লাম বিন হোটেল, দু শয্যার ঘর, ভাড়া দিনে ১৫ ডলার, এ সি আছে। কিন্তু ব্রেকফাস্ট নেই। এর থেকে কম দামে আর হোটেল নেই।'

হোটেলের কার্ড, শহরের ম্যাপ দিয়ে মেয়েটি বলল, 'একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিন, চার ডলার ভাড়া নেবে।'

পাশেই একটা ব্যাঙ্ক দেখে টাকা ভাঙাতে যাচ্ছিলাম। মেয়েটি বলল, 'এখান থেকে ডলার না ভাঙিয়ে শহরে গিয়ে ভাঙান, ভালো দর পাবেন।'

কিন্তু ট্যাক্সি ভাড়া দেব কী করে? জিজ্ঞেস করলাম।

মেয়েটি বলল, কোনও অসুবিধে হবে না। ট্যাক্সি ভাড়া ডলারেই দিতে পারবেন। হোটেলেও ডলার নেবে। কেনাকাটাও করতে পারবেন ডলারে। দোকানদাররা ডলার বেশি পছন্দ করে।

বিমানবন্দরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এই সেই ভিয়েতনাম। মনে পড়ে যৌবনের দিনগুলির কথা, যখন এই নাম স্মরণ করে গর্ববোধ করে বলতাম, 'তোমার নাম আমার নাম, ভিয়েতনাম।' এই সেই সাইগন শহর যেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক বাহিনীর পতন ঘটল আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে। মনে পড়ে সেই ঐতিহাসিক দিনটাকে, ৩০ এপ্রিল, ১৯৭৫, ধর্মতলায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের গ্রন্থাগার USIS-এর সামনে কলকাতার উল্লসিত জনতা ধ্বনি তুলেছিল 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, চাচা হো জিন্দাবাদ।' সেই জনতায় আমিও ছিলাম একজন। ভরা যৌবনের সেই দিনগুলিতে রাশিয়া, চিন, ভিয়েতনাম আর কিউবা ছিল আমার কাছে স্বপ্নরাজ্য। সেই চার

স্বপ্নরাজ্যের এক রাজ্যের মাটিতে এখন দাঁড়িয়ে আছি। রাশিয়ার পর আজ ভিয়েতনাম। কী আনন্দ, কী আনন্দ!

লাম বিন হোটেল, ১৮, বুই থাই জুয়ান স্ট্রিট। এগারোতলা বাড়ির ছ তলায় ১৪ নম্বর ঘর আমাদের জন্য। দুজনের জন্য উপযুক্ত ঘর। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, নরম গদির ওপর দুধসাদা চাদর, নরম লেপ, চেয়ার, টেবিল, ওয়াড্রোব, টেলিফোন, টিভি, ঠান্ডা-গরম জল, বাথটাব, সাবান, শ্যাম্পু, চিরুনি, পেস্ট, ব্রাশ, ছোট-বড় দু জোড়া তোয়ালে, সব পরিপাটি করে সাজানো, কোথাও কোনও ত্রুটি নেই। দিনে ১৫ ডলার ভাড়ায় এতটা সুব্যবস্থা আশা করিনি। কদিন আগেই তো কাম্পুচিয়ায় কাটিয়ে এলাম। নমপেনের ১৫ ডলারের 'মোরাকাত' হোটেলের থেকে 'লাম বিন'-এর আভিজাত্য বেশি বলেই মনে হল। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার শহরগুলিতে ১০ বা ১৫ ডলারে ডর্মিটরি পাওয়া যায়, স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘর পাওয়া যায় না।

জিনিসপত্র ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে লাঞ্চব্যাগ থেকে কিছু খাবার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে নীচে নেমে এলাম। আমার লাঞ্চ ব্যাগের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় থাকা দরকার। যাঁরা অল্প ব্যয়ে বিদেশ ভ্রমণ করতে চান তাঁদের উপকার হতে পারে। অবশ্য অন্যদের কাছে এটা হাসির খোরাকও হতে পারে। যাঁদের হাসি পায় তাঁরা প্রাণ খুলে হাসুন। আর যাঁরা সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে বিদেশ ভ্রমণের বাসনা মেটাতে চান তাঁরা আমাকে অনুসরণ করুন।

আমার লাঞ্চ ব্যাগ বিদেশ ভ্রমণে আমার চিরসঙ্গী। এতে থাকে ছাতু, চিঁড়ে, চিঁড়েভাজা, চালভাজা, চানাচুর, ডালমুট, বিস্কুট, পিঁয়াজ, ভাজা লঙ্কা, চিনি, নুন। সব মিলিয়ে ওজন হয় ১২ থেকে ১৫ কেজি। এতে আমার দিনে একবেলা করে ২৫-৩০ দিন চলে যায়। বিদেশে গিয়ে এক বেলার খাওয়া খরচ বাঁচানো মানে দারুণ ব্যাপার। এটি হল আমার স্বল্পব্যয়ে বিদেশ ভ্রমণের একটা গোপন তথ্য। পাঠকের কাছে আরও একটা গোপন তথ্য প্রকাশ করি— আমি ট্র্যাভেল এজেন্টকে দিয়ে ভিসা করিয়ে নিই, প্লেনের টিকিট কেটে নিই। কিন্তু অগ্রিম হোটেল বুক করি না কখনও। যে শহরে যাই সেই শহরে পৌঁছে নিজেই হোটেল খুঁজে নিই। এতে দু ভাবে লাভ হয়। প্রথমত, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে অনেক সস্তায় হোটেল খুঁজে নেওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, আমি সেইসব হোটেল পছন্দ করি যেসব হোটেলে বুফে পদ্ধতিতে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা থাকে। বিদেশে এরকম বহু হোটেল পাওয়া যায় যেখানে সকালে জলখাবারের ব্যবস্থা থাকে বুফে পদ্ধতিতে এবং এর জন্য আলাদা দাম দিতে হয় না, ঘর ভাড়ার মধ্যেই এটা ধরা থাকে। আমিষ, নিরামিষ, ভাত, রুটি, কেক, ফল, ফলের রস, চা, কফি, দুধ, সব মিলিয়ে ১৫-২০ কিংবা তারও বেশি রকমের খাদ্য পানীয় টেবিলের ওপর সাজানো থাকে। ডিশ নিয়ে নিজের পছন্দমতো যত খুশি খান। আমি সকাল নটা-দশটার সময় ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে যতটা সম্ভব খাই। নতুন বাড়ি তৈরির সময় ভিত শক্ত করবার জন্য খোয়া ফেলে

যেমন দুরমুশ দিয়ে পেটানো হয়, আমি ঠিক সেই ভাবে দুরমুশ পেটাইয়ের মতো করে আকণ্ঠ খাই। উপরন্তু কলা-আপেলের মতো একটা কী দুটো ফল হাতে নিয়ে নিই। এতে কেউ আপত্তি করবে না, লজ্জারও কোনও কারণ নেই। আমি ইচ্ছে করলে ওখানে বসেই তো ফল দুটো খেতে পারতাম। না খেয়ে হাতে করে নিয়ে যাচ্ছি। এরপর জলের বোতল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি সারাদিনের জন্য। সারাদিন আর কিছু খাওয়ার দরকার হয় না। রাতে হোটেলে ফিরে এসে ছাতু কিংবা চিঁড়ে-চিনি দিয়ে ডিনার। দু বেলার খাওয়া খরচ বেঁচে গেল।

হোটেলের কাছেই পেলাম ব্যাঙ্ক। ১০০ ইউ এস ডলারের বিনিময়ে পেলাম ১৫,১৮,০০০ ডং (Dong)। ডংকে ভিয়েতনামবাসীরা বলে ভিয়েতনাম ডলার। বিনিময় হার ১ ইউ এস ডলার ১৫,০০০ ডং-এর সামান্য বেশি। প্রকৃতপক্ষে পাওয়ার কথা ১৫,১৮,৩১৪, কিন্তু ৩১৪ দিল না। ব্যাঙ্ক কাউন্টারের মেয়েটি বলল, 'too small'। ডংয়ের বিনিময় মূল্য খুব কম হওয়ায় এ দেশে ধাতু নির্মিত মুদ্রার প্রচলন আর নেই, শুধুই কাগজি নোট। তাও ৫০ ডংয়ের কম মানের নোট পাওয়া যায় না। ১৫,১৮,০০০ টাকা! আরে ব্বাশ! এত টাকা দিয়ে কী করব? গুনতেই অনেক সময় লেগে গেল। হোটেলে ফিরে এসে বুঝলাম এত টাকা খরচ হতে বেশি সময় লাগবে না। পাঁচ দিনের হোটেল ভাড়া ৭৫ ডলার, ১১,১৫,০০০ ডং অগ্রিম মিটিয়ে দিলাম। ১,২৪,০০০ ডং দিলাম Hoan Hao Tour কোম্পানিকে আগামীকাল সারাদিন ভ্রমণের জন্য।

হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। এ রাস্তাটা খুব বড় নয়। রাস্তার দুধারে নানান পসরার দোকান। দুটো-একটা হোটেল আছে। আমরা দেখছি দোকানগুলো, দোকানের শো কেসে সাজানো জিনিসগুলো, দেখছি কেনাবেচায় ব্যস্ত মানুষগুলিকে, দেখছি পথচারীদের, দেখছি ওদের সাজপোশাক। হঠাৎ যেন ওদের কাজকর্মে, চলাচলে একটু ছন্দপতন ঘটল। সবার দৃষ্টি পড়ল আমার দিকে। কৌতূহলী দৃষ্টি, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। পথচারীরাও দেখছে আমাকে, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সবাই দেখছে, বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছে। আসলে ওরা আমাকে দেখছে না, দেখছে আমার ধুতি আর পাঞ্জাবিকে। আমার পাশে যে একজন শাড়িপরা মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রতি এদের দৃষ্টি নেই। ওদের বিস্ময় দেখে মনে হয় এ পোশাক ওরা অতীতে কখনও দেখেনি। আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে একটি পনেরো-ষোল বছরের মেয়ে। আমার দিকে দেখতে দেখতে যাচ্ছে। মুখে হাসিহাসি ভাব। তার সঙ্গে সামান্য একটু হাসির বিনিময় করতেই সে এক রাশি মিষ্টি হাসি উপহার দিল আমাকে। সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছু বলতে চায়। বুঝতে পারি কী বলতে চায়। নিজেই বলি, 'ইন্ডিয়া'।

—'ইন্ডিয়া'! মেয়েটির বিস্ময়সূচক জিজ্ঞাসা। আর কিছু বলতে পারে না। 'বাই' বলে চলে যায় হাত নাড়তে নাড়তে।

হাঁটতে হাঁটতে রাস্তাটা ছাড়িয়ে এসে পড়লাম বড়, রাস্তায়। শহরের প্রধান

রাস্তা, অনেক বড় অনেক ব্যস্ত রাস্তা। দু-চার দণ্ড পথ চলে বুঝলাম, বয়স নির্বিশেষে মেয়েদের কৌতূহলই বেশি। সবার দৃষ্টি আমার পায়ের দিকে, মানে ধুতির দিকে। কলকাতার পথে কোনও অপরিচিতা তরুণী বা প্রৌঢ়ার দিকে অকারণ চেয়ে থাকা কিংবা হাসা আমাদের সমাজে নিতান্তই অসভ্যতা। বিনিময়ে অবজ্ঞা বা অসম্মান জুটতে পারে, কটু মন্তব্য শুনতে হতে পারে, আবার তার থেকেও বেশি কিছু ঘটে যেতে পারে। আজ ক্ষণিকের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি হল, ভারত আর ভিয়েতনাম এই দুই দেশের মানুষের মধ্যে বহু যোজন দূরত্ব! ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার শহরগুলিতে পথচারীদের কাছ থেকে অযাচিতভাবে অনেক সাহায্য পেয়েছি, বিপদের বন্ধু হিসেবে পেয়েছি, কিন্তু এমন প্রাণ জুড়ানো নির্মল হাসি হো চি মিনবাসীদের কাছ থেকেই পেলাম।

সন্ধে হয়েছে, পথের আলো জ্বলছে, যানবাহন চলাচল বেড়েছে। বাস, মোটর গাড়ির থেকে মোটর বাইকের সংখ্যাই বেশি। প্রত্যেক বাইক চালকের পিছনে একজন বা দুজন করে যাত্রী আছে। বাইকের এত জনপ্রিয়তার জন্যই বোধহয় পথে পায়ে চলা পথিকের সংখ্যা খুব কম। হাঁটতে হাঁটতে এক পাঁচ রাস্তার মোড়ে এসে পড়লাম। যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য লাল-সবুজ আলো আছে বটে কিন্তু পথচারীদের পথ পারাপারের জন্য কোনও আলোকসংকেত নেই। গাড়িগুলো, বিশেষ করে বাইকগুলো লালের পর সবুজ সংকেত পেলেই এত জোরে ছুট দিচ্ছে যে পাঁচ রাস্তার কোন দিক থেকে কোন দিকে গাড়ি বাঁক নেবে, তা বুঝতেই পারছি না। এ ব্যাপারে আমার স্ত্রী আমার থেকে অনেকটা এগিয়ে আছে। সে নমপেন থেকেই বুঝে নিয়েছে যে, এ দেশে নিরাপদে পথ পারাপারে পথচারীর নিজের যতটা দায়িত্ব, গাড়ি চালকের দায়িত্ব তার থেকে অনেক বেশি। নিয়ম না মেনে রাস্তা পার হতে গেলে পথচারীকেই খুব সাবধানে রাস্তা পার হতে হবে। এখানে যেন নিয়মটা উল্টো। অর্থাৎ গাড়ির চালক পথচারীকে রাস্তা পারাপারের সুযোগ দিয়ে অতি সাবধানে গাড়ি চালাবে, দরকার হলে গাড়ি থামিয়ে দেবে। এই সুযোগ নিয়েই আমার সঙ্গিনী ডাইনে-বাঁয়ে না তাকিয়েই সোজা ঢুকে পড়ল রাস্তার মাঝখানে। জানে, এর পরের দায়িত্ব গাড়ি চালকের। এইভাবে সে ওপারে পৌঁছে গেছে অনেকক্ষণ, আমি পারছি না। আমার অসহায় অবস্থা বুঝে এক ভদ্রমহিলা আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে এলেন ওপার থেকে এপারে।

এই জায়গাটায় দোকানপাট অনেক বেশি, আলোর রোশনাই বেশি, কর্মব্যস্ত মানুষের ভিড়, কোলাহল বেশি। ফুটপাত জুড়ে অনেক দোকান বসেছে। শামুক আর ঝিনুকের মাংসের বড়া, শুয়োরের মাংসের স্যান্ডউইচ, পোড়া কলা— এই সবের দোকানই বেশি। সবই দরিদ্র মানুষের খাবার। দীর্ঘকালের ফরাসি ও বিশ বছরের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণে দারিদ্র্য এ দেশের মানুষের চিরসঙ্গী হয়েছে। আমাদের দেশের মতোই। কমিউনিস্ট শাসনে অবস্থার

পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে বটে কিন্তু সে কেবল সচ্ছলতার আস্তরণ মাত্র। এখনও কৃষিপ্রধান দেশ, বেকার সমস্যায় জর্জরিত। স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবুও এরা সংযত, জাতীয় ঐতিহ্যকে একেবারে হারিয়ে ফেলেনি। মেয়েরা আঁটসাঁট পোশাক পরে। অবাধ মেলামেশা আছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের নগ্নতা এদের গ্রাস করেনি। দারিদ্র্য এদের মনুষ্যত্বকে কলুষিত করতে পারেনি। মুখে হাসি বিনম্র ভাষা এদের স্বভাববৈশিষ্ট্য। মেয়েরা লাবণ্যময়ী, সদাহাস্যময়ী, স্নেহশীলা। এরা কখনও রাগ করে না। একটু লক্ষ করলে বোঝা যায় এ দেশে মেয়েদের প্রাধান্যই বেশি। ফুটপাথের খাবারের দোকান থেকে শুরু করে বাজারে বড় বড় দোকান— সবই মেয়েরা চালাচ্ছে। মেয়েরা গাড়ি চালায়, অফিসে চাকরি করে, পথ ঝাঁট দেয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে রিকশা। এরা বলে 'সিক্লো'। রিকশাগুলি দেখতে সুন্দর, কলকাতার রিকশার থেকে একটু সরু কিন্তু লম্বা। যাত্রীদের আসন সামনে, চালকের আসন পিছনে। রিকশা চালকদের মধ্যে নাকি অনেককে খুঁজে পাওয়া যাবে যাঁরা অতীতে শিক্ষক অথবা অধ্যাপক ছিলেন।

দেখতে দেখতে পথ চলতে ভালোই লাগছিল। নিরাপত্তার কোনও অভাব বোধ করছি না। বিদেশি দেখে এক রিকশাচালক সামনে এসে দাঁড়াল। 'সিক্লো' বলে আমাদের রিকশায় উঠতে ইঙ্গিত করল। আমি জানতে চাইলাম ভাড়া কত। সে হাতের আঙুল দেখিয়ে বোঝাল পনেরো। তার মানে পনেরো হাজার ডং। আমি বললাম, 'না'। এবার সে দু হাতের দশটা আঙুল দেখাল। মজা করার জন্যই আমি পাঁচটা আঙুল দেখালাম। সে দুয়েকবার একটু আপত্তি জানিয়ে শেষে রাজি হয়ে গেল। এ রিকশায় একজন আরামে বসতে পারে, দু জন বসতে একটু কষ্ট হয়।

স্ত্রীকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আমি আবার বড় রাস্তায় ফিরে এলাম। এক মহিলা কিছু খাবার তৈরি করে বিক্রি করছিল। ওটার প্রতিই ছিল আমার আকর্ষণ। এতক্ষণ শুধু দেখেছি, খাওয়া হয়নি। স্ত্রী সঙ্গে থাকলে এসব খাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় না। তার অনেক বাছবিচার আছে। মহিলা যা যা তৈরি করছিল সব রকমই খেলাম।

পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় ঘর থেকে নীচে নেমে এলাম। হ্যাপি ট্যুরের গাড়ি এল একটু পরেই। ছোট গাড়ি, ছোট মিনি বাস বলা যায়, ১০ জন বসতে পারে। আমরা দুজন, আর সাতজন সুইডেনবাসী, চারটি ছেলে তিনটি মেয়ে। সকলেই স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষামূলক ভ্রমণে এসেছে। আরেকজন, ট্যুর গাইড, একটি যুবক ছেলে, নাম সুই।

গাড়ি থামল কাও দাই টেম্পল থেকে একটু দূরে। চওড়া রাস্তা বেশ পরিষ্কার। এখান থেকে মন্দির পর্যন্ত পথটুকুতে গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ। শুধু মন্দির দর্শনার্থীরাই হেঁটে হেঁটে যেতে পারবে মন্দিরে। রাস্তার বাঁ ফুটপাতে উঁচু লম্বা রেলিং। রেলিংয়ের ওপাশে কিছু কিশোর-কিশোরী রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে হাত

বের করে হাঁকাহাঁকি করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছিল। ওদের প্রত্যেকের হাতে দুটো-একটা খেলনা, মালা, কাঠের বা ব্রোঞ্জের মূর্তি। বোঝা যায় ওরা সব হকার। রাস্তার এই অংশটুকুতে হকারদের বেচাকেনাও নিষিদ্ধ। তাই ওরা এইভাবে পর্যটকদের ডেকে ডেকে কিছু বিক্রি করবার চেষ্টা করছে।

কাও দাই ভিয়েতনামের একটি অতি আধুনিককালের সৃষ্ট ধর্ম। পুরো নাম কাও দাই তিয়েন অং। কনফুসিয়ান, তাও, বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিস্ট এবং মুসলিম ধর্মের সমন্বয়ে সৃষ্ট— এটি একটি লোকায়ত ধর্ম। ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চিন্তাধারা কাও দাই পন্থীদের মধ্যে সদাজাগ্রত। এই ধর্মের প্রতীক হল ত্রিকোণাকৃতি এক চক্ষু। মন্দিরের বাইরে প্রবেশদ্বারের ওপরে প্রতীক আঁকা আছে। সুই বলল, সব ধর্মের দেবতাই যে এক তারই প্রতীক হল এক চক্ষু। আমরা এই মন্দিরকে বলি কাও দাই হোলি সি টেম্পল।

নাটমন্দিরটি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় বেশ বড়। নাটমন্দিরের শেষপ্রান্তে দেবস্থান। বেলা বারোটায় মধ্যাহ্নের উপাসনা শুরু হবে, তার প্রস্তুতি চলছে। এই বর্ণাঢ্য উপাসনা দেখার জন্য দর্শকদের খুব ভিড় হয়। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেলাম সবাই। এখানে কোনও ঘর নেই, চারদিকেই ব্যালকনি। এখান থেকেই দেখতে হবে উপাসনা। আমাদের আগেই বহু দর্শকের সমাগমে চারটি ব্যালকনি পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আমরা কোনওরকমে একটু জায়গা করে নিলাম। ভক্তরা দলে দলে নাটমন্দিরে প্রবেশ করছে। প্রত্যেক দলের ভিন্ন ভিন্ন আলখাল্লা। নাটমন্দির ভক্তে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সারিবদ্ধ হয়ে সকলে উপবেশন করল। তারপর শুরু হল উপাসনা।

মন্দিরের বাইরে উত্তর ও পুবে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণসংলগ্ন ঘরগুলি ভক্তদের বাসস্থান। কয়েকজন বৃদ্ধা ঘরের দাওয়ায় বসে নিপুণ হাতে সূক্ষ্ম সূচিশিল্পের কাজ করছেন।

হোলি সি টেম্পল থেকে যাওয়া হল বেন ডুক টেম্পল। হো চিন মিন শহরের ঐতিহাসিক সংস্কৃতির নিদর্শন এই মন্দিরটি অতি আধুনিককালের, নির্মিত হয়েছে ১৯৯৫ সালে। এই মন্দিরের ভেতর একটি প্রস্তর ফলকে পঞ্চাশ হাজার শহীদের নাম খোদাই করা আছে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। ভূগর্ভে একটি প্রদর্শনী ঘর আছে যেখানে রাখা আছে যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাবলির ছবি, নকশা ইত্যাদি।

মধ্যাহ্নভোজনের বিরতির পর গাড়ি থামল এক জঙ্গলের পাশে। সুই বলল, এই জায়গার নাম কুচি জেলা। এখানে দেখতে পাবেন ভিয়েতকং গেরিলা যোদ্ধাদের সুড়ঙ্গ পথ, বিখ্যাত কুচি টানেল। দেখতে পাবেন আমাদের বীর যোদ্ধারা কীভাবে এই সুড়ঙ্গের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে, কীভাবে মার্কিন সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আমরা এখন ঢুকব জঙ্গলের মধ্যে। টিকিট ঘর থেকে প্রত্যেকে টিকিট কিনে নিন। একেকজনের লাগবে ৬৫,০০০ ভিয়েতনাম ডলার।

টিকিট ঘরের দুপাশে খোলা জায়গায় রাখা আছে কিছু নাপাম বোমা। সুই বলল, মার্কিন সৈন্যরা পালিয়ে যাওয়ার পর এইগুলি সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এগুলো থেকে এখনও কী বিস্ফোরণ ঘটতে পারে?'

সুই বলল, 'না'। আমি বোমার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেখলাম।

সামনে একটা লম্বা দোচালা ঘর। চারপাশ খোলা। একটা টেবিলের ওপর একটা টিভি আছে। তার সামনে কিছু বেঞ্চ পাতা। বেঞ্চে কিছু দর্শক বসে আছে। টিভির পাশে একটা ম্যাপ ঝোলানো। একজন বর্ষীয়ান ব্যক্তি তাঁর লম্বা ছড়িটা দিয়ে ম্যাপে আঁকা ছবিগুলি দর্শকদের দেখাচ্ছেন এবং বর্ণনা দিচ্ছেন। আমরা ওখানে গিয়ে বসলাম।

—এই যে দেখছেন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে সরু পথ চলে গেছে, এর নাম হো চি মিন ট্রেল। এই পথে যুদ্ধের সময় উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়ার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করত গেরিলা যোদ্ধারা।

—এই দেখুন ভিয়েতকং গেরিলা যুদ্ধক্ষেত্র সুড়ঙ্গ পথ, কুচি টানেল। এর দৈর্ঘ্য ছ হাজার কিলোমিটার। কোনও উন্নত আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই দেশীয় ছোট মাটি কাটার কোদাল দিয়ে হাতে কেটে তৈরি করেছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরিয়ান ফ্রন্ট-এর গেরিলা যোদ্ধারা। এই সুড়ঙ্গ পথ তিনটি ধাপে তৈরি হয়েছে। এই দেখুন এর প্রথম ধাপ। এর থেকে নীচে এই হল দ্বিতীয় ধাপ, তার থেকে আরও গভীরে এই হল তৃতীয় ধাপ। এই হল সুড়ঙ্গে ঢোকার গোপন পথ। এইগুলি শত্রু সৈন্যদের জন্য পাতা ফাঁদ। এটা কমরেডদের আলোচনার ঘর, এখানে আহত কমরেডদের চিকিৎসার ঘর, এটা রান্নাঘর, উনুনের ধোঁয়া গোপনে বের করে দেওয়ার জন্য এটা গোপন পথ। এটা গভীর নলকূপ, পানীয় জল এখান থেকে তোলা হত। এটা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাতাস প্রবেশের পথ। এই হল বিপদের সময় পালাবার পথ। এই পথ মেকং নদীর মোহনা পর্যন্ত চলে গেছে।

ভাষ্যকার একটু থামলেন। তারপর বললেন, এখন আমি টিভি চালু করব। দেখতে পাবেন সুড়ঙ্গ পথের যুদ্ধক্ষেত্রটা।

টিভির সুইচ অন হল।

গভীর জঙ্গল। সরু পায়েচলা পথ দিয়ে জঙ্গলের গভীর থেকে আরও গভীরে এগিয়ে চলেছে পাঁচজন ভিয়েতকং গেরিলা যোদ্ধা। হাতে রাইফেল, তার নিশানা ওপরের দিকে, ডাল-পাতার ফাঁক দিয়ে যেখানে একটুখানি আকাশ দেখা যাচ্ছে সেই দিকে। মুখে ভাষা নেই, দৃষ্টি সজাগ—ডাইনে বাঁয়ে ওপরে। চলতে চলতে ওরা হারিয়ে গেল গভীর জঙ্গলের মধ্যে।

সাইগন শহরের ওপর বোমা বর্ষণ চলছে। এক ঝাঁক বোমা, যেন এক মুঠো খই, মার্কিন বোমারু বিমান থেকে ছুড়ে দেওয়া হল। বাড়িগুলি ধসে পড়ছে, আগুন জ্বলছে চারদিকে। শহরবাসীরা দলে দলে পালাচ্ছে শহর ছেড়ে। পথে যারা ধরা

পড়ছে মার্কিন সৈন্যদের হাতে, তাদের ওপর চলছে অমানুষিক অত্যাচার। মেয়েরা, শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না সে অত্যাচার থেকে। উঃ! কী ভয়ঙ্কর! মানুষ মানুষের প্রতি এত নির্মম হতে পারে! এ যে দেখা যায় না, এর বর্ণনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না।

মার্কিন সৈন্যরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে সাহস করছে না। ওদের চোখেমুখে আতঙ্কের ছায়া, কোনদিক থেকে গেরিলা আক্রমণ আসে। ট্যাঙ্ক নিয়ে এই গভীর জঙ্গলে ঢোকা অসম্ভব। কোথায় মাইন পাতা আছে জানা নেই। তাই ওরা পায়ে হেঁটে ঢুকতে পারছে না। হেলিকপ্টারে সন্ধান চলছে গেরিলাদের। জঙ্গলের ওপর প্রায় গাছের মাথা ছুঁয়ে চক্কর খাচ্ছে গোটা কয়েক হেলিকপ্টার। গেরিলা যোদ্ধারা সুড়ঙ্গ পথের সরু মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে একে একে। ঠিক যেন একটা ছোট্ট মাটির গর্ত থেকে এক দল পিঁপড়ে বেরচ্ছে। হাতে হাতে রাইফেল। এদের মধ্যে অর্ধেক মেয়ে। বয়স সবার কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে। একে একে মাটিতে শুয়ে পড়ে পজিশন নিল সবাই। রাইফেল উঁচিয়ে ধরল আকাশের দিকে। গাছের ফাঁক দিয়ে লক্ষ রাখছে হেলিকপ্টারের দিকে। দুটো হেলিকপ্টার চক্কর খেতে খেতে অনেকটা নীচে নেমে এসেছে, প্রায় গাছের মাথার ওপর। কমরেডরা লক্ষ্য স্থির করছে। উঃ! কী ভীষণ উত্তেজনা। আমার শরীরের শিরায় ধমনীতে চঞ্চল রক্তের ছুটোছুটি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি, হৃৎপিণ্ডের ওপর হাতুড়ি পেটাইয়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, বক্ষপিঞ্জরের অশান্ত ওঠানামা সংযত হতে চাইছে না। এক, দুই, তিন... গুরুম! একসঙ্গে এক লয়ে গর্জে উঠল দুজন কমরেডের রাইফেল। অব্যর্থ নিশানা। একটা হেলিকপ্টার ডিগবাজি খেতে খেতে হুড়মুড় করে পড়ল একটু দূরে।

দুজন কমরেড একটা বাঁশ নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ওই দিকে। আরেকজন মেয়ে কমরেড ওদের পিছন পিছন যাচ্ছে। বাকিরা সুড়ঙ্গের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারের মধ্য থেকে একটা তাজা নাপাম বোমা বাঁশের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে এল ওরা দুজন। আর মেয়ে কমরেড কয়েকজোড়া চপ্পল সংগ্রহ করে নিয়ে এল। কী করবে, ওরা পাবে কোথায়? এইগুলিই ওরা পরবে।

টানেলের মধ্যে এক জায়গায় রান্নাঘর। একজন মেয়ে কমরেড রান্না করছে, একজন ছেলে কমরেড তাকে জিনিসপত্র যোগান দিচ্ছে। আরেকজন মেয়ে কমরেড একটা টানেল কেটে চলেছে। নিড়ানির মতো একটা ছোট হাতিয়ার ওর হাতে। লোহার ফলকটা ছ ইঞ্চি লম্বা, আর চার ইঞ্চি চওড়া হবে। একফুট কাঠের বাঁট। একজন আহত কমরেডের চিকিৎসা করছেন একজন ডাক্তার, এক মেয়ে কমরেড তার সেবা করছে।

নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে ওরা। কেউ কাউকে নির্দেশ দিচ্ছে না। সব যেন ছকে বাঁধা। কারও মুখে আতঙ্ক নেই, মৃত্যু ভয়ের লেশমাত্র নেই। যেন কোনও উৎসবের প্রস্তুতি চলছে নীরবে, নির্ভয়ে, হাসি মুখে। এক দণ্ড বিরামের সময় নেই কারও।

টিভির সুইচ অফ হল। বর্ষীয়ান ভাষ্যকার বললেন, 'এই ছিল আমাদের সুড়ঙ্গ পথের যুদ্ধক্ষেত্র। পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিশালী যুদ্ধদানবের সঙ্গে ছিল আমাদের লড়াই। আমরা যে চাচা হো-র নামে শপথ করেছিলাম, এক অখণ্ড দেশ আমরা গড়বই, মার্কিন দস্যুরা যতই শক্তিশালী হোক আমাদের মাতৃভূমি থেকে তাদের বিতাড়িত করবই। অকৃত্রিম দেশপ্রেম, আর অটুট মনোবল— এই ছিল আমাদের বড় ভরসা। আমি গর্বিত, আমি এই মুক্তিযুদ্ধের একজন সৈনিক হতে পেরেছিলাম।'

একটু থেমে ভাষ্যকার বললেন, এখন আপনারা জঙ্গলের মধ্যে যান। সুড়ঙ্গ পথ দেখতে পাবেন। সহকর্মী থাও আপনাদের নিয়ে যাবে।

থাও সবার সামনে। আমরা ওকে অনুসরণ করে চলেছি জঙ্গলের সরু পথ দিয়ে। এক জায়গায় থাও থামল। সামনে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা মস্ত বড় গর্তের মতো, ওটা কী কেউ বলতে পারেন?

সবাই নির্বাক, থাওর দিকে তাকিয়ে আছি।

থাও বলল, 'ওখানে নাপাম বোমা পড়েছিল। এরকম অনেক গর্ত দেখতে পাবেন।'

আবার এগিয়ে চলেছি। একটা গাছের গোড়ায় মাটির ঢিপি দেখা যাচ্ছে। থাও জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী বলুন তো?'

—উই পোকার বাসা। আমি চটজলদি জবাব দিলাম।

থাও হেসে বলল, হল না। এটা একটা নকল মাইন।

নকল মাইন! আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম।

থাও বলল, হ্যাঁ, নকল, মানে আসল মাইন নয়। এর মধ্যে আছে লঙ্কার গুঁড়ো আর একটা স্বয়ংক্রিয় চাকা। এর গায়ে হাত দিলেই চাকাটা ঘুরতে থাকবে, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখেমুখে লঙ্কার গুঁড়ো ঢুকে যাবে। আপনার মতো মার্কিন সৈন্যরাও ভুল করত। মাইনটা সরিয়ে দিতে যেত, আর চোখ জ্বালায় ছটফট করত। সেই সুযোগেই লুকিয়ে থাকা একজন গেরিলা সৈনিক তাকে খতম করত।

দলের একটি মেয়ে বলল, 'এ তো বাচ্চাদের খেলা।' সবাই হাসল।

থাও বলল, হ্যাঁ, এইরকম খেলার ছলে মার্কিন সৈন্যদের নাস্তানাবুদ করা হত। আরেকটা খেলার গল্প শুনুন। মার্কিন সৈন্যদের ঘাঁটির চারদিকে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা থাকত। গ্রামবাসীরা ওদিকে কখনওই যেত না। সন্ধের সময় গ্রামের ছোট ছোট ছেলেদের একটা করে জ্যান্ত ব্যাঙ দিয়ে দেওয়া হত। ব্যাঙের গলার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হত গুঁড়ো লঙ্কা। ছেলেরা খেলার ছলে চলে যেত ওই কাঁটাতারের বেড়ার কাছে। তারপর গোপনে ব্যাঙগুলোকে কাঁটার সঙ্গে আটকে দিয়ে পালিয়ে আসত। গুঁড়ো লঙ্কার জন্য ব্যাঙের গলা জ্বালা করত, তখন খুক খুক করে কাশত। ওই কাশির শব্দ ঠিক মানুষের কাশির শব্দের মতো। মার্কিন সৈন্যরা মনে করত নিশ্চয়ই ভিয়েতকং গেরিলারা আক্রমণ করতে আসছে। অন্ধকারে কাউকে

দেখতে না পেয়ে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়ত। এইভাবে ওদের যেমন কিছু গুলিগোলা খরচ করানো গেল, তেমনই সারারাত জাগিয়ে রাখা গেল। ফলে দিনেরবেলা আসল লড়াইয়ের সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ত।

—'এ যেন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা।' আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

—হ্যাঁ, এইরকম আরও কত খেলার ছলে মার্কিন সৈন্যদের আমরা নাস্তানাবুদ করতাম সে গল্প আমি আপনাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা শোনাতে পারি। থাও থামল, ওর হাতের মুঠি শক্ত হল, চোয়ালটা একটু দৃঢ় হল, চোখের দৃষ্টি যেন অনেক দূর ছড়িয়ে দিল। আমরা ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

নকল মাইনের পাশে একটা গাছতলায় কিছু শুকনো পাতা সরিয়ে থাও বলল, 'এই দেখুন একটা ফাঁদ। এই যে লোহার ঢাকনাটা দেখছেন, এটা খুব আলগা, একটা সরু কাঠির ওপর বসানো আছে। এর নীচে আছে গভীর গর্ত। চলতে চলতে এর ওপর পা পড়লেই শরীরটা গর্তের মধ্যে ঢুকে যাবে। ওখান থেকে উঠে আসা কোনওরকমেই সম্ভব হবে না। মৃত্যু নিশ্চিত।

আবার চলতে চলতে একটা ঝোপের কাছে আমরা দাঁড়ালাম। থাও শুকনো পাতা সরিয়ে দিল। এখানেও একটা লোহার ঢাকনা। সেটাকে হাত দিয়ে তুলে থাও বলল, 'সুড়ঙ্গ পথে ঢোকার গোপন পথ এটা। শুকনো পাতায় চাপা থাকায় শত্রু সৈন্য কোনও রকমেই বুঝতে পারবে না। আমি এর মধ্যে ঢুকব। আপনারা দেখুন।'

থাও গর্তের মধ্যে পা দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে দুহাতে মাটিতে ভর রেখে শরীরটাকে আস্তে নামিয়ে দিল। গর্তটা এত সরু যে হাত পা সোজা রেখে শরীরটাকে গলিয়ে দেওয়া যায়। একটু স্থূল দেহ হলে ঢোকানো যাবে না। বুক পর্যন্ত থাওর শরীরটা গর্তের মধ্যে চলে গেছে। তারপর থাও ঢাকনাটির ওপর কিছু শুকনো পাতা ছড়িয়ে দিয়ে দুহাতে ঢাকনাটা উঁচু করে ধরে জলে ডুব দেওয়ার মতো হাত দুটো উঁচু রেখে গর্তের মধ্যে বসে পড়ল। ঢাকনাটি গর্তের মুখে আটকে গেল। এরপর আর কোনও সাড়া নেই। মিনিট চার-পাঁচ পরে থাও আমাদের পিছন দিক থেকে এগিয়ে এল হাসতে হাসতে। যেন ম্যাজিক খেলা দেখছি।

থাও বলল, কে এই সুড়ঙ্গ পথে নামতে চান বলুন। ১২০ মিটার পথ যেতে পারবেন।

সবাই চুপ। কেউ সাহস করে না।

আমি বললাম, আমি নামব।

'Very good. This old man is courageous. Come.'

ধুতিটাকে মালকোঁচা দিয়ে থাওর মতো শরীরটাকে ঢুকিয়ে দিলাম গর্তের মধ্যে। বুক সমান শরীর ঢুকে যেতে মাটিতে পা পড়ল। থাও বলল, 'এবার ঢাকনাটার ওপর কিছু পাতা ছড়িয়ে দিন। তারপর দু হাতে ঢাকনাটা উঁচু করে ধরে আস্তে আস্তে বসে পড়ুন। ঢাকনাটা গর্তের মুখে পড়লে এগিয়ে যাবেন। ভয়ের কিছু নেই, ভিতরে একটি ছেলে আছে, সে টর্চ দিয়ে আপনাকে পথ দেখিয়ে দেবে।'

থাওর নির্দেশমতো সব করলাম। গর্তের মুখ বন্ধ হল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। দাঁড়িয়ে হাঁটা যাচ্ছে না। সামনে একটু আলো দেখা যাচ্ছে। ওই আলোর দিকে নিচু হয়ে এগিয়ে চলেছি। সুড়ঙ্গ পথ সোজা নয়, অসংখ্য বাঁক। নিচু হতে হতে এক সময় বসে পড়তে হল। এক জায়গা এত সরু যে বসেও যাওয়া যাচ্ছে না। পা দুটো এগিয়ে দিয়ে প্রায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে ঘষে ঘষে এগোতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে টের পেলাম আমার পিছনদিক থেকে অনেকে এগিয়ে আসছে। আমায় দেখে ওরা ভরসা পেয়েছে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য এভাবে নিচু হয়ে বেশিক্ষণ যেতে আমার একটু কষ্ট হচ্ছিল। ওরা সবাই আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল, আমার স্ত্রীও। একটা প্রশস্ত জায়গা পেয়ে আমি একটু বিশ্রাম করে নিলাম। ওরা সবাই অনেক দূরে চলে গেছে। টর্চের আলোকে অনুসরণ করে চলতে চলতে সুড়ঙ্গের মুখে এসে দেখি দেওয়ালে একটা বড় কাঁকড়া বিছে। ওটা জ্যান্ত কি মরা বোঝা যাচ্ছিল না। আমি ভাবলাম এটাও বুঝি মার্কিন সৈন্যদের নাস্তানাবুদ করবার কোনও কৌশল হবে। দেওয়ালে দুবার চাপড় মারতেই বিছেটা নড়ে উঠল। সর্বনাশ! ভয় করছে। চিৎকার করে ডেকে কারও সাড়া পাওয়া গেল না। ওটার গায়ে যাতে ছোঁয়া না লাগে খুব সাবধানে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম। এরপর সুড়ঙ্গ পথের উচ্চতা বেশি। হেঁটে হেঁটে যাওয়া যায়। অনেকটা প্রশস্ত জায়গায় এসে দলের সঙ্গে মিলিত হলাম। এখানে দেওয়ালে লেখা আছে 'অপারেশন থিয়েটার'। খানিকটা এগিয়ে আরও একটা চওড়া জায়গা। একটা বড় টেবিল। লেখা আছে ডাইনিং রুম। একজন কিছু খাবার নিয়ে এল আমাদের জন্য। বিপ্লবী ভিয়েতকং গেরিলা যোদ্ধাদের ব্যবহার করা টেবিলে বসে সবাই খেলাম। তারপর বেরিয়ে এলাম সুড়ঙ্গ থেকে।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ওপারে দেখলাম দখল করা দুটো হেলিকপ্টার, একটা ট্যাঙ্ক, দুটো মোটর গাড়ি, কিছু নাপাম বোমা। ফেরার পথে গাড়িতে বসে শুধু সুড়ঙ্গ পথের ছবিই ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। হোটেলে ফিরতে সন্ধ্যা হল।

পরদিন মেকং ডেল্টা ভ্রমণ। আমাদের সঙ্গী আজ চারটি চিনা ছেলেমেয়ে, গাইড এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, নাম Nia Fa ভিয়েতনামের ইতিহাস তাঁর কণ্ঠস্থ। ফরাসি শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্য ১৯৪১ সালে হো চি মিন-এর ভিয়েত মিন বাহিনী (ভিয়েতনাম মুক্তি ফৌজ) গঠনের ইতিহাস থেকে শুরু করে দিয়েন বেন ফু-এর যুদ্ধে ১৯৫৪ সালে ফরাসিদের সম্পূর্ণ পরাজয়, ওই বছরেই ভিয়েনা চুক্তি অনুসারে ১৭ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ বরাবর সমান্তরাল রেখা (Seventeenth Parallel) টেনে ভিয়েতনামকে উত্তর ও দক্ষিণ দুই রাষ্ট্রে বিভাজন, দক্ষিণ ভিয়েতনাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ছত্রচ্ছায়ায় Dinh Diem-এর পুতুল সরকার গঠন, ১৯৭৫ সালে ভিয়েতনাম মুক্তি ফৌজ (Viet Minh) এবং ভিয়েতকং গেরিলা (Viet Nam Cong San) বাহিনীর মিলিত আক্রমণে দক্ষিণ ভিয়েতনামের

পুতুল সরকারের পতন, মার্কিন সামরিক বাহিনীর পরাজয়, ১৯৭৬ সালে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের পুনর্মিলনে এক অখণ্ড সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Socialist Republic of Vietnam) গঠন পর্যন্ত ইতিহাসের দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে নিয়া ফা শ্রোতাদের উদ্দেশে একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'বলতে পারেন, হো চি মিনের আসল নাম কী?'

এটা আমার জানা ছিল। বললাম, 'Nguyen That Thanh'।

'ঠিক বলেছেন। তবে Nguyen Ai Quoc নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধে তিন দশকের অবিসংবাদিত নেতা এবং এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান পুরোধা ছিলেন হো চি মিন। সমস্ত ভিয়েতনামবাসীর তিনি চাচা হো (Uncle Ho)।' ফা বললেন।

আধঘণ্টা পর গাড়ি থামল মেকং নদীর পারে। গাড়ি থেকে নেমে আমরা নৌকোয় উঠলাম। একেবারে খাঁটি বাংলার নৌকো, ছই আছে। তফাত শুধু ছইয়ের ভেতর চেয়ার পাতা যাত্রীদের বসার জন্য। নৌকো চলল মাঝদরিয়া দিয়ে। এই সেই মেকং নদী, যার কাল্পনিক রূপকে গঙ্গার সঙ্গে মিলিয়ে কলকাতায় জ্যৈষ্ঠের পিচগলা রাস্তায় মিছিলে মিছিলে বজ্রমুষ্টি আকাশের দিকে ছুড়ে দিয়ে সমবেত ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করেছি— 'গঙ্গা মেকং এক হ্যায়।' সত্যি কী গঙ্গা আর মেকং এক? ঘোলা জল, চওড়া মেকংয়ের দুপাশে কখনও গ্রাম, কখনও ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নারকেল গাছ, কখনও ঘন জঙ্গল। ডিঙি নৌকোয় মাছ ধরছে জেলেরা, জেলের আত্মজ হাত নেড়ে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। বাবুঘাট থেকে সুন্দরবন গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণে আমরা এইসব দৃশ্যই তো উপভোগ করি। তফাত শুধু মেকংয়ে ইলিশ মাছ নেই, মড়া গরু-কুকুর ভেসে যায় না, মেকংয়ের জল লোনা নয়।

মূল নদী থেকে ডাইনে ঘুরে একটা উপনদীতে ঢুকে নৌকো থামল এক ছোট দ্বীপে। নৌকোঘাটায় পাতার ছাউনি দেওয়া দোচালা বিশ্রাম-ঘরে আমরা বসলাম। একজন দ্বীপবাসী ফল ভর্তি কয়েকটা ডিশ এনে রাখল টেবিলের ওপর। দুজন মধ্যবয়সী পুরুষ এল বাদ্যযন্ত্র নিয়ে, দেখতে বেহালার মতো, ছড় টেনে বাজাতে হয়। চারটি ছেলেমেয়ে দাঁড়াল বাজিয়েদের পাশে। ওদের বয়স ৫ থেকে ১০-এর মধ্যে, মিষ্টি, হাসিহাসি মুখ। বাজনার সঙ্গে ওরা নেচে নেচে গান গাইল। অনুষ্ঠান শেষে আমরা বাচ্চাগুলির হাতে দুটো-একটা নোট গুঁজে দিলাম। ওরা কিন্তু চায়নি।

অন্য একটা দ্বীপে আমাদের খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। নদীর কূল ঘেঁসে কাঠের পাটাতনের ওপর ছোট্ট রেস্টোরেন্ট। দ্বীপের ফসল, দ্বীপবাসীদের রান্না, নতুন স্বাদ। তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া হল। মধ্যাহ্ন পার হয়ে গেছে, রোদের তেজ কমেছে, আকাশে মেঘে রোদে লুকোচুরি খেলা চলছে। মাঝে মাঝে দুটো একটা নৌকো আমাদের উল্টোদিকে চলে যাচ্ছে। দুই নৌকোর যাত্রীরা হাত নেড়ে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। চওড়া নদীটা পার হয়ে আমরা বাঁক নিলাম বাঁদিকে। অসংখ্য

উপনদী, অসংখ্য দ্বীপ। এঁকেবেঁকে নৌকো যত এগোচ্ছে, নদীর প্রস্থ ততই সরু হয়ে আসছে। এখন আর নদী বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন খাল। আমি ছইয়ের বাইরে এসে একেবারে গলুইয়ে গিয়ে বসলাম। একটা সাপ একূল থেকে ওকূলে চলে গেল। সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'সাপ সাপ'। দ্বীপের আর পার নেই। জলের কিনারায় গাছগুলির গোড়া জলের মধ্যে। নারকেল গাছের পাতার মতো লম্বা পাতাগুলি গাছের একেবারে গোড়া থেকে বেরিয়ে ওপর দিকে উঠে আধা গোল হয়ে ঝুঁকে পড়েছে নীচের দিকে। ডগার পাতাগুলি আমার মাথায় পরশ দিয়ে যাচ্ছে। আমি যেন জন্মভূমিকে ফিরে পেলাম। সে তো এখন বিদেশ। অর্ধশতাব্দীর বেশি হয়ে গেছে, তাকে আর দেখার সুযোগ হয়নি। তবু শৈশবের জন্মভূমির স্নেহের পরশ, তাকে তো ভোলা যায় না। বর্ষার দিনে বাড়ির উঠোনে ভিড়িয়ে মাঝি হাঁক দিল, 'ক...ই...ই...।' সব বাড়ির ছেলেরা শ্লেট বই বগলে নিয়ে ছুটতে ছুটতে নৌকোয় এসে উঠলাম। কাঠের তক্তার ওপর বই শ্লেট রেখে ঝুঁকে পড়ে একটা আঙুল দিয়ে নদীর জলে দাগ কাটতে কাটতে যাওয়া, মাঝে মাঝে একটা শালুক ছিঁড়ে নেওয়া, ধান গাছের মাথাগুলি নুয়ে পড়ে যেন নৌকোর পথ করে দিতে, নৌকোর সঙ্গে তাদের ঘর্ষণে খসখস শনশন শব্দ, মাঝে মাঝে একটা হিজল গাছের ঝুরি এসে মাথায় ঠেকে, একটা দুষ্টু ছেলে ঝুরিটা ধরে কয়েক মুহূর্ত দোল খেয়ে নেয়, ... উঃ! আমার শরীরের ওপর দিয়ে রোমাঞ্চের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে।

নৌকো থামল একটা দ্বীপের পারে। এটা একটা কুটির শিল্পকেন্দ্র। মৌমাছি পালন হয়, নারকেলের লজেন্স, কলার লজেন্স তৈরি হয়। ওরা আমাদের মধু আর লেবুর চা খাইয়ে আপ্যায়ন করল। নদীর অন্যপারে আরেকটা দ্বীপে তৈরি হচ্ছে পাথরের মূর্তি, ঘর সাজাবার জিনিস। শিল্পকেন্দ্রের বাইরে একটা গাছতলায় একটি লোক কাঁধের ওপর একটা পাইথন নিয়ে কেরামতি দেখাচ্ছে। আমাদের ডাকছে পাইথনটাকে হাতে নেওয়ার জন্য। আরে ব্বাশ! ও তো দেখলেই ভয় করে, কে নেবে হাতে! তবুও ভরসা করে আমি লোকটির পাশে গেলাম। পাইথনটা আস্তে আস্তে আমার গলায় পাক খেয়ে হাতে এসে থামল।

এবার ফেরার পালা। উপনদী ছেড়ে নৌকো মূল নদীতে এসে পড়ল। জেলেরা বাড়ি ফিরেছে, ওপারের গাছগুলি রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। চারদিকে নীরবতার প্রশান্তি। উজান বেয়ে নৌকো চলেছে, ছোট ছোট ঢেউয়ের সঙ্গে তার সংঘর্ষে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ মাঝে মাঝে নীরবতা ভঙ্গ করছে। সম্মোহিতের মতো বসে আছি।

আরও দুদিন আছি এখানে। হোটেলের রিসেপশনিস্ট মেয়েটির নির্দেশমতো হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম হো চি মিন ওপেন ইউনিভার্সিটি। তিন তলায় অর্থনীতি বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানলাম আজ কোনও অধ্যাপক আসবেন না। একটি পুস্তিকা সংগ্রহ করে নীচে নেমে আসছিলাম। পথ আটকালো দুটি মেয়ে। অনেকক্ষণ ধরে আমার ধুতি আর পাঞ্জাবি দেখল।

—কোন দেশ থেকে এসেছেন?

—ইন্ডিয়া।

—ইন্ডিয়া। ইংরিজির ছাত্রী Nguyen আর Mai Mai, দুজনেরই বিস্ময়। শুনেছে ভারত অনেক বড় দেশ, সুন্দর দেশ। দেখার খুব ইচ্ছা। অনেকক্ষণ ধরে গল্প হল ওদের সঙ্গে। আমি আমার ঠিকানা দিয়ে বললাম, যখন ইন্ডিয়া যাবে আমাকে জানাবে।

Nguyen-এর মাথায় একটা টুপি ছিল। সেটা খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এটা আমার উপহার, আপনি নেবেন তো?

আমি টুপিটা আমার মাথায় পরে ওর হাত দুটো ধরে ধন্যবাদ জানিয়ে নীচে নেমে এলাম।

হাঁটতে হাঁটতে এলাম The War Remnant Museum. ৩০,০০০ ডং দিয়ে দুটো টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকলাম। মার্কিন সৈন্যরা ব্যাপক গণহত্যার জন্য যে সব বোমা ব্যবহার করত (CBU-SSB, Seismic, Napalm, Fragbomb) সেগুলি রাখা আছে খোলা জায়গায়। একটি ঘরে বিকলাঙ্গ শিশুদের ছবি। বিষাক্ত রাসায়নিক বোমার প্রভাবে যুদ্ধোত্তরকালে এই বিকলাঙ্গ শিশুরা জন্মেছে। আরেকটি ঘরে যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি। মার্কিন বোমারু বিমান থেকে গোলাবর্ষণ হচ্ছে, হেলিকপ্টার থেকে ধানখেতের ওপর, জঙ্গলের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ এজেন্ট অরেঞ্জ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে জমিতে ফসল ফলবে না, গাছের পাতা সব শুকিয়ে পড়ে যাবে, ভিয়েতকং গেরিলা যোদ্ধাদের খুঁজে বের করা সহজ হবে। আরেকটা ঘরে আছে যুদ্ধোত্তরকালের ছবি, বিজয় উৎসবের ছবি। লাল পতাকায় সুসজ্জিত বর্ণাঢ্য মিছিল চলেছে সাইগনের রাস্তা দিয়ে। সমস্ত শহরটা লালে লাল হয়ে গেছে। টিভিতে দেখানো হচ্ছে বিজয় উৎসব। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা হো চি মিনকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। গান গাইতে গাইতে মিছিল চলেছে '...হো চিন মিন, ভিয়েতনাম, হো চি মিন, ভিয়েতনাম'। গানের শেষে কলিটুকুই শুধু মনে পড়ছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান রিউনিফিকেশন প্যালেস। মার্কিন সামরিক বাহিনীর পরাজয়ের পর দুই ভিয়েতনামের পুনর্মিলনের স্মারক এটি। প্রাসাদের বর্ণাঢ্য কনফারেন্স হল-এ হো চি মিন-এর স্মরণীয় ঘোষণাটি লেখা আছে: 'The country of Vietnam is one, the people of Vietnam are unique, Rivers may be dry, mountains may be worn out, but that truth should be unchanged for ever.' মনোরম চারতলা প্রাসাদের ৯৫টি ঘরে সংরক্ষিত আছে মূল্যবান চারুকলা, কারুশিল্পদ্রব্য এবং যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর বিজয়-উৎসবের ছবি। ভারত-ভিয়েতনাম মৈত্রী বন্ধনের স্মারক হিসেবে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভিয়েতনাম ভ্রমণের ছবি এখানে সংরক্ষিত আছে।

বেন থান মার্কেট এ শহরের কেন্দ্রীয় বাজার। এরই আশপাশে ছড়িয়ে আছে ন্যতর দ্যম ক্যাথিড্রাল, সিটি অপেরা হাউস, পিপল কমিটি হল, সেন্ট্রাল পোস্ট অফিস এবং আর্ট মিউজিয়াম। পরদিন হাঁটাপথেই দেখা হল গির্জা, অপেরা, পোস্ট

অফিস ইত্যাদি। এরপর আর্ট মিউজিয়ামে ঢুকলাম ২০,০০০ ডং দিয়ে দুটো টিকিট কেটে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের শিল্পদ্রব্য এখানে সংরক্ষিত আছে। একটি অভিনব বুদ্ধমূর্তি এখানে আছে, রঙিন মূর্তি, জড়াগ্রস্ত বুদ্ধ, বুকের পাঁজরগুলি গোনা যাচ্ছে। এই বুদ্ধের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই।

দিনের বাকি সময়টা কাটল বাজার ঘুরে, জিনিসের দর কষাকষি করে। সামান্য কেনাকাটাও হল। কোনাকাটার সময় দর কষাকষি অবশ্যই করতে হবে। একটি দামি জিনিসের জন্য অসম্ভব রকম কম দাম দিতে চাইলেও দোকানদার রাগ করে না, কটু কথা শোনায় না। হাসিমুখে বলে, 'No, I lose'। দুটি মেয়ে কারুকার্য করা হাত পাখা বিক্রি করছিল। দু জনেরই বয়স দশ থেকে বারোর মধ্যে হবে। একজনের কাছ থেকে পাঁচটা পাখা কিনলাম। অন্য জনের মুখ ভার হল। আমাদের পিছন পিছন ঘুরছিল আর বারবার বলছিল, 'Buy one ... take one'. লাবণ্যময়ী মুখখানা করুণ দেখাচ্ছিল। অভিমানে ঠোঁট দুটো ফুলে ফুলে উঠছিল, কান্নার আগে শিশুদের ঠিক যেমন হয়। আমার মনটা দুর্বল হল। ওর কাছ থেকে আরও পাঁচটা পাখা, ভিয়েতনামের প্রসিদ্ধ হস্তশিল্প দ্রব্য শঙ্কু আকৃতির টুপি দুটো কিনলাম। হাসিমুখে চলে গেল মেয়েটি।

এ কদিন শহরের পথে চলার সময় আমার নজর থাকত রাস্তার আনাচকানাচে, গলিঘুঁজির দিকে। যেখানেই দেখেছি উঁচু পাঁচিল বা দেওয়াল অথবা গাছের আড়াল, আলো পৌঁছচ্ছে না, সেখানেই গিয়ে দেখেছি মাটি ভিজে কিনা, ফুটপাথ দিয়ে জল গড়িয়ে যাওয়ার দাগ দেখা যাচ্ছে কিনা, নাকে রুমাল চাপা দিতে হচ্ছে কিনা। আজ ভিয়েতনামে শেষ দিন। তীক্ষ্ণ নজর রেখে হেঁটে চলেছি হোটেলের দিকে। না পাইনি কোথাও। কলকাতাবাসীদের মতো অসভ্যতা এরা শেখেনি। পাইনি পচা দুর্গন্ধময় আবর্জনার স্তূপ। তবে কলকাতার একটি পরিচিত দৃশ্য নজরে পড়ল। হঠাৎ দেখি ফুটপাতের ফেরিওয়ালারা জিনিসপত্র তুলে নিয়ে ছুটোছুটি করছে। কেউ গলিপথে ঢুকে লুকোবার চেষ্টা করছে, কেউ বড় দোকানের মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছে। ফুটপাত একেবারে ফাঁকা। একটু পরেই একটা পুলিশের গাড়ি এল। দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড দাঁড়াল, তারপর চলে গেল। ফুটপাত আবার আগের চেহারা ফিরে পেল।

হোটেলে ফিরতে একটু রাত হল। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কালকের জন্য প্রস্তুতি সেরে রাখলাম। সকাল দশটার মধ্যে বিমানবন্দরে পৌঁছতে হবে। ব্যাংককের প্লেন ছাড়বে বেলা বারোটায়।

'ভ্রমণ' অক্টোবর, ২০০৪

সেলামাত দাতাং

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

শহরের পথে চলতে চলতে মাঝে মাঝেই দেখা যায় ছোট বড় বোর্ডে লেখা সেলামাত দাতাং! এক শহর হয়ে আরেক শহরে ঢোকার সময় বাসে বসেই নজরে পড়ে, সেলামাত দাতাং! বড় বড় দোকানের দরজায় পা দিতেই বিনম্র অভিবাদন সেলামাত দাতাং!

'সেলামাত দাতাং' মানে স্বাগত, শুভাগমন। বড় মিষ্টি শব্দ, 'ওয়েলকাম' থেকে অনেক বেশি শ্রুতিমধুর। সাত দিনে এত দেখেছি, এতবার শুনেছি যে, শব্দটাকে আর বিদেশি বলে মনে হচ্ছে না। মানে বুঝে নিতে অসুবিধে হয়নি। কোন সে দেশ, যে দেশের মাটিতে পা রাখলেই এমন মিষ্টি অভ্যর্থনা পাওয়া যায়!

সে দেশের নাম মালয়শিয়া। মালয়ের সঙ্গে এশিয়া যুক্ত করে হয়েছে মালয়শিয়া। মালয়শিয়াই প্রকৃত এশিয়া (মালয়শিয়া ইজ ট্রুলি এশিয়া) এমন একটা কথা চালু হয়েছে। প্রাচীনা মালয় হয়েছে নবীনা মালয়শিয়া। এই মালয়শিয়াকে ভালো করে দেখব বলে সিঙ্গাপুর থেকে স্থলপথ পছন্দ করলাম। লিটল ইন্ডিয়া থেকে মেট্রো ট্রেনে তানজিওন পগার, সেখান থেকে বাসে রেলস্টেশন। স্টেশনের নাম 'মালয়শিয়া রেলস্টেশন', শুধু মালয়শিয়া যাওয়ার জন্য এই স্টেশন।

সন্ধে আটটায় রেলস্টেশনে পৌঁছে দেখি দীনবন্ধুরা আগেই এসে গেছে। থাইল্যান্ডের ফুকেত বিমানবন্দরে আলাপ হয়েছিল বেহালার আইনজীবী দীনবন্ধু চৌধুরীর সঙ্গে। সস্ত্রীক বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছে। ওদের ইচ্ছাতেই ওদের সঙ্গে এক বিলাসবহুল হোটেলে কাটিয়েছি সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুরে এসেই ৭৫ ডলার দিয়ে দুটো ট্রেনের টিকিট কেটে রেখেছিলাম মালয়শিয়া যাওয়ার জন্য। ঘটনাক্রমে তাও একই দিনে একই ট্রেনে হয়ে গেল। ট্রেন ছাড়বে রাত দশটায়। হাতে অনেক সময়। স্টেশনের মধ্যে ব্যাঙ্ক নেই, বিদেশি টাকাপয়সা কেনাবেচার একটা ছোট দোকান খুঁজে পাওয়া গেল। এখান থেকেই জানতে পারলাম, এইখানে ডলার বিনিময় করলে কুয়ালা লামপুর থেকে কিছু বেশি রিঙ্গিত পাওয়া যাবে। সুতরাং বিনিময়ের কাজটা সেরে নিলাম। প্ল্যাটফর্মে বিস্তর খাবারের দোকান। দীনবন্ধুর পছন্দমতোই খাওয়ার ব্যবস্থা হল রুটি, মাংস, আর মুখসুদ্ধিতে ঘোল।

সাড়ে নটায় প্ল্যাটফর্মে ঢোকার গেট খুলল। সিঙ্গাপুর থেকে বিদায় নেওয়ার

ছাড়পত্র চটপট পাওয়া গেল। ট্রেন ছাড়ল ঠিক দশটায়।

ভোর না হতেই ট্রেন পৌঁছে যাবে কুয়ালা লামপুর। রাতে ঘুমিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। দোতলা আসন, ওপরে একজন নীচে একজন শুতে পারবে। গদির ওপর দুধ সাদা চাদর পাতা। পর্দা টাঙিয়ে শুয়ে পড়লে একেবারে নিশ্চিন্ত। জিনিসগুলো রইল চলার পথের পাশে। তালাচাবি দেওয়ার কোনও বালাই নেই, উদ্বেগেরও কোনও কারণ নেই।

আধঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটেছে। ট্রেনের গতি মন্থর হল। কামরার মধ্যে মাইক্রোফোনে ঘোষণা হল, 'চেক পয়েন্টে এখন ট্রেন থামবে। এখানে মালয়শিয়ার অভিবাসন দপ্তর। যারা বিদেশি তাদের এখান থেকে মালয়শিয়ায় প্রবেশের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে। প্রত্যেকে যে যার পাসপোর্ট হাতে নিয়ে নেমে একটু এগিয়ে যান, প্ল্যাটফর্মের পাশেই অভিবাসন দপ্তর পাবেন। জিনিসপত্র সঙ্গে নেওয়ার দরকার নেই, যেমন আছে তেমনিই থাকুক।'

বিদেশিরা একে একে নেমে পড়লাম। মনটা খুঁতখুঁত করে, জিনিসগুলো রেখে যাব, কিছু হবে না তো? আমাদের যেমন স্বভাব আর কি, কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না।

দীনবন্ধু বলল, 'চলুন না, সবাই তো যাচ্ছে।'

সত্যিই তো, সবাই যাচ্ছে। তাছাড়া সুটকেসে আছে তো পাঁচদিনের জন্য গোটা কয়েক ধুতি পাঞ্জাবি আর শাড়ি, যা এ দেশের কোনও মানুষের কাজে লাগবে না। আর লাঞ্চ ব্যাগে আছে দুজনের একবেলা করে পাঁচদিন চলবে সেই পরিমাণ ছাতু, চিঁড়ে, চানাচুর, বিস্কুট।

অভিবাসন দপ্তরের সামনে দু-তিনটে লাইন পড়েছে। একে একে সবার পাসপোর্ট জমা পড়ল। বিমানবন্দরের মতো মাসুল বিভাগের নজরদারি এখানে নেই, কোনও জিজ্ঞাসাবাদ নেই। এক নজরে পাসপোর্টে চোখ বুলিয়ে সই করছে, ছাপ লাগাচ্ছে, ছেড়ে দিচ্ছে। আধঘণ্টায় কাজ শেষ হয়ে গেল। ট্রেন ছাড়ল আরও আধঘণ্টা পর। শুয়ে শুয়ে কাচের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন চোখ বুজে গেল।

সকাল সাড়ে ছটায় ট্রেন থামল কুয়ালা লামপুর স্টেশনে। দিনের আলো তখনও ভালো করে ফোটেনি। ট্যাক্সি বা অন্য কোনও যানবাহন নজরে পড়ছে না। অনুসন্ধান অফিসও খোলেনি। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

একটু পরেই দীনবন্ধুর ট্যুর গাইড এসে গেল। ওরা বেরিয়েছে প্যাকেজ ট্যুরে। কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে, কী দেখবে, কীভাবে দেখবে, সব আগে থেকে ঠিকঠাক। এতে বেড়ানোটা আরামের হয়, নিরুদ্বেগে, নির্ঝঞ্ঝাটে হয়। কিন্তু প্যাকেজ ট্যুর মানেই ব্যয় বেশি, আর নিজের মতো করে সব দেখা যায় না। জীবনে প্রথমবার বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলাম প্যাকেজ ট্যুরে। তারপর আর না। একটি শহরের বিমানবন্দরে পৌঁছিয়ে সস্তার হোটেল খুঁজে নিই, কী দেখব, কেমন

করে যাব, সব ঠিক করে নিই। তাতে প্লেনভাড়া বাদ দিয়ে আর সব কিছুর খরচ অর্ধেক কিংবা তারও কমে হয়ে যায়। এতে একটু ঝুঁকি থাকে। ঠিক ঝুঁকি নয়, একটু উদ্বেগ, একটু অনিশ্চয়তা, একটু ঝঞ্ঝাট থাকে বটে, কিন্তু তার বিনিময়ে অনেক বেশি কিছু পাওয়া যায়। সে দেশটাকে অনেক বেশি জানা যায়, বহু মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পাওয়া যায়, মানুষ চিনতে সুবিধে হয়, সে দেশের সমাজটাকে জানা যায়।

দীনবন্ধুর ইচ্ছা এদেশেও আমরা ওদের সঙ্গে থাকি।

—'কিন্তু ভায়া, আমার যে ট্যাঁকের জোর কম।'

—'চলুন না এক সঙ্গে, দেখা যাক না, সস্তায় কিছু ব্যবস্থা হয় কি না।'

ওর অনুরোধ ফেলতে পারলাম না। উঠলাম ওদের গাড়িতে। আধঘণ্টার মধ্যে গাড়ি থামল এক হোটেলের গাড়ি বারান্দায়। গাড়ি থেকে নেমে মেঝেতে পা রেখেই বুঝলাম এ মাটিতে আমার পা থিতু হবে না।

ওরা যে ঘরে থাকবে তার ভাড়া ১৯৮ রিঙ্গিত। খোঁজ নিয়ে জানা গেল এর থেকে কমে এখানে ঘর নেই। দীনবন্ধুকে বললাম, 'তোমার গাইডকে একটু অনুরোধ করে দেখ না, যদি আমাদের কোনও কম দামের হোটেলে পৌঁছে দেয়।'

ভদ্রলোক একবারও আপত্তি করলেন না, অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন না, দুটো হোটেল দেখে তৃতীয় হোটেলের সামনে গাড়ি থামিয়ে বললেন, 'আপনি বসুন, আমি খোঁজ নিয়ে আসি'।

ফিরে এসে বললেন, '৩০ রিঙ্গিত, চলবে?'

—'নিশ্চয়ই চলবে। ১৯৮ এর জায়গায় মাত্র ৩০, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনাকে কত দেব?'

—'কিছু না।'

—'আপনার পেট্রোল খরচ হল তো।'

—'তা হোক।'

বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কিছু নিলেন না। বিদায় জানিয়ে গাড়ি ছাড়লেন। মানুষে মানুষে কত তফাত। সিঙ্গাপুরে চাঙ্গি বিমানবন্দরে দীনবন্ধুর অনুরোধে ওর প্যাকেজ ট্যুরের গাড়িতে করে ওদের হোটেলে গিয়েছিলাম। দশ ডলার ভাড়া দিতে হয়েছিল।

হাইটেল বাজেট ইন। দোতলার ওপর ঘর। ঘর জুড়ে একটা খাট, দুজনে কোনওরকমে ঘুমনো যায়। জানলা তো দূরের কথা একটা ঘুলঘুলিও নেই। ছোটখাটো জতুগৃহ আর কি। খবরদারি করছে এক যুবক। তাকে বললাম, 'আর একটু ভালো ঘর নেই' জানলা আছে এমন ঘর?'

ছেলেটার নাম শান। সে জবাব দিল হিন্দিতে, 'তিনতলায় একটা ঘর আছে। বড় একটা জানলা আছে, ঘরটাও একটু বড়। ভাড়া ৩৫ রিঙ্গিত।'

হোটেল ভাড়ায় কখনও দরাদরি চলে না। তবুও মনে হল একটু বাজিয়েই দেখা

যাক না। বললাম, 'একটু কম করলে হ্‌ত না?'

শান বলল, 'ঠিক আছে, ৩৩ দেবেন। লিফট নেই কিন্তু।'

সিঙ্গাপুর থেকে কেনা কেক আর রুটি দিয়ে জলযোগ সমাপন হল। ১০টা বাজে। দুপুরের জন্য চিঁড়ে ভাজা চানাচুর ডালমুট বিস্কুট লাঞ্চব্যাগ থেকে বের করে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

জায়গাটা ছোটখাটো বাজার অঞ্চল। পথের দুপাশে শুধু দোকান, কিছু হোটেল, ওয়াই এম সি এ হোস্টেল আছে। কাছে কোথাও লাউড স্পিকারে তামিল গান বাজছে। তামিলদের এখানে বেশ আধিপত্য দেখছি। ডাইনে বাঁয়ে হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। পথের ওপর দিয়ে লম্বা উড়াল পুল চলে গেছে। তার নিচ দিয়ে অবিরাম গাড়ি ছুটে চলেছে। একটু দাঁড়িয়ে থাকতেই বুঝলাম এটা উড়াল পুল নয়, আকাশ রেলপথ, ব্যাংককের মতো। আকাশ রেলের নিচ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে পড়লাম একটা রেলস্টেশনে। স্টেশনের নাম কুয়ালা লামপুর সিটি সেন্টার, সংক্ষেপে কে এল সি সি। স্টেশনটা বেশ বড়। দোতলা স্টেশনের এক তলায় অনেক রকম জিনিস সাজানো অনেক আকর্ষণীয় দোকান। দোতলায় রেলগাড়ি সংক্রান্ত সবকিছু। অনেকগুলো ট্যুর কোম্পানির অফিস আছে। পছন্দ করে একটার অফিসে ঢুকে পড়লাম। হলিডে ট্র্যাভেল কোম্পানি। কিছু ম্যাপ এবং ভ্রমণসূচি এগিয়ে দিয়ে মেয়েটি বলল, 'চলুন কুয়ালা লামপুরের সব থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা জায়গা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।'

আমি বললাম, 'কুয়ালা লামপুরের একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে শুনেছি, তোমার কি সেটা জানা আছে?'

—'হ্যাঁ, চলুন না, কুয়ালা লামপুরের জন্মস্থান দেখিয়ে নিয়ে আসব।'

উঠে বসলাম ওদের গাড়িতে। আধঘণ্টা পর গাড়ি থামল এক মসজিদের পাশে।

এই মসজিদের নাম মাসজিদ জামেক। এটাই হ্‌ল এই শ্‌হরের প্রাচীনতম মসজিদ, তৈরি হয়েছে গোম্বক আর ক্লাং নামে দুটো নদীর সঙ্গমে। নদী দুটো এখন একটু দূরে সরে গেছে। আর এটাই হল সেই ঐতিহাসিক জায়গা যেখানে কুয়ালা লামপুর নামের উৎপত্তি হয়েছে। মালয়শিয়ার জাতীয় ভাষা বাহাসা মেলায়ু ভাষায় 'কুয়ালা' কথার মানে দুই নদীর সঙ্গমস্থল বা মোহনা, আর 'লামপুর' মানে কর্দমাক্ত। দুশো বছর আগে চিন দেশীয় কিছু ব্যবসায়ী এখানে মাটির নীচে টিনের গন্ধ পেয়েছিল। সেই টিন মাটি খুঁড়ে তুলে এনে ব্যবসা শুরু করল। তার জন্য ছাউনি বানাল এই কাদা ভরা নদীর মোহনায়। সেই থেকেই এ জায়গার নাম হল কুয়ালা লামপুর। সেই দুশো বছর আগের কাদামাখা টিনের ছাউনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আজকের কুয়ালা লামপুর শহর।

গাড়ি চলতে চলতে থামল এক চৌরাস্তায় ছোট বাগানের পাশে। সামনে দেখা যাচ্ছে অনেক লম্বা পাশাপাশি দুই ইমারত। এদের অনেক লম্বা চূড়া দুটো যেন চাঁদ

আর তারার দেশ ফুঁড়ে ওপর দিকে সোজা উঠে গেছে। যারা কোনও কালে কুয়ালা লামপুর আসেনি তারাও এই চূড়াযুগলের নাম জানে পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার, পৃথিবীর দীর্ঘতম ইস্পাতে তৈরি কাচে মোড়া চূড়াযুক্ত ইমারত, ৪৫২ মিটার উঁচু। চূড়ার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে ডগা দুটো দেখতে হলে পথের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। সকাল ৯টা থেকে ওপরে ওঠা শুরু হয়, কোনও দর্শনী দিতে হয় না। ৮৮তলা বাড়ি দুটোর ৪১ তলায় একটা সেতু আছে দুই ইমারতের মধ্যে যোগাযোগের জন্য। এই পর্যন্তই লিফট যাবে, তারপর আর না।

হাঁটতে হাঁটতে চলেছি।

জায়গাটার নাম দাতারাং মারদেকা। পুরনো কালের স্মৃতি জড়ানো ইতিহাসের সঙ্গে নতুনের মিশ্রণ ঘটেছে এখানে। ১৯৫৭ সালের ৩১ আগস্ট মালয়শিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করে ইউনিয়ন জ্যাক শেষবারের মতো নামিয়ে নিয়ে স্বাধীন মালয়শিয়ার পতাকা তোলা হয়েছিল এখানে। একটু দূরে একটা সুদর্শন ইমারত দেখা যাচ্ছে। অনেক দূর থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল বাড়িটা। আমাদের জয়পুরের রাজপ্রাসাদের গায়ের রঙে রঙিন। কোনও রাজপ্রাসাদ হবে নিশ্চয়।

—'ওটা কিসের বাড়ি?'

—'এটার নাম সুলতান আব্দুল সামাদ বিল্ডিং, শহরের সব থেকে সুন্দর বাড়ি। ওইটা হল সব থেকে পুরনো, সব থেকে বড় মদের কারখানা রয়্যাল সেলাঙ্গোর। আর ওই দিকে সেন্ট মেরির গির্জা।'

আবার গাড়ি ছুটল। শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে ছোট একটা পাহাড়ের কাছে এসে গাড়ি থামল। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে সিঁড়ি। ২৭২টি সিঁড়ি বেয়ে উঠে পাওয়া গেল বাটু কেভস। ছোট ছোট গুহার মধ্যে পুরনো কালের হিন্দু মন্দির। পাহাড়ের পায়ের কাছে একটা বড় হনুমানের মূর্তি।

বিকেল বিকেল ফিরে এলাম কে এল সি সি। স্টেশনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে নজরে পড়ল আরেকটা ভ্রমণ কোম্পানি গালোর হলিডেস। কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভেতরে বাহারে পোস্টার লাগানো 'আগামীকাল সারাদিন মেলাকা ভ্রমণ'। ঢুকে পড়লাম কাচের দরজা ঠেলে। ব্যবস্থা হল মধ্যাহ্নভোজন সহ দুজনের জন্য লাগবে মোট ২০০ রিঙ্গিত।

কুয়ালা লামপুর শহর ছাড়িয়ে গ্রামের পথে ছুটেছে বাস। ঘণ্টাখানেক পর মেলাকা স্বাগত জানাল সেলামাত দাতাং। বাসে বসে বসেই মেলাকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে গাইড লিন।

প্রাচীনকালের মালাক্কা নগর-রাষ্ট্র বর্তমানের মেলাকা শহর। অতীত অনেক চমকে ভরা।

বলা হয় মালয়শিয়ার ইতিহাস শুরু ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে, ঠিক যখন সুমাত্রার রাজকুমার পরমেশ্বর মালাক্কা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, তখন থেকে।

সুমাত্রার হিন্দু রাজবংশের সন্তান পরমেশ্বর জাভাদের আক্রমণ থেকে নিজের

রাজ্য পেলাম্বাং রক্ষা করতে না পেরে পালিয়ে আসে তুমাসিক (এখনকার সিঙ্গাপুর)। কিছুদিন সেখানে থাকার পর স্থায়ীভাবে চলে আসে মালয় উপদ্বীপের উপকূলে মৎস্যজীবীদের এক ছোট্ট গ্রামে। এই অচিন দেশে এসে বিশ্রাম নিয়েছিল এক গাছের ছায়ায়। সেই গাছের নাম ছিল মালাক্কা। সেই থেকেই জায়গাটার নাম হল মালাক্কা। মালাক্কায় রাজ্য স্থাপন করে পরমেশ্বর মুসলিম হল, নাম নিল সুলতান ইসকান্দার শাহ। কাছেই একটা পাহাড়ে চিনের মিং রাজকন্যা হ্যাং লি পোহ্ পর্যটনে বেরিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। মিং রাজার সেনাধ্যক্ষ চেং হো, যে কিনা 'ত্রিরত্ন খচিত খোজা রাজকুমার' নামে পরিচিত, রাজার নির্দেশে রাজকুমারীর সঙ্গে সুলতানের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এল। চেং হো সেই সঙ্গে সুলতানকে আরেকটি লোভনীয় উপহার দিল— শ্যাম এবং মুসলমানদের আক্রমণ থেকে মালাক্কাকে রক্ষা করবার মিং রাজার নিশ্চিত আশ্বাস। আসলে মালাক্কাকে ঘাঁটি করে পশ্চিমের সঙ্গে বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্যে এটা ছিল মিং রাজার মোক্ষম রাজনৈতিক চাল।

এরপর মালাক্কায় সুলতানদের শাসনকালের অবসান হয় ১৫১১ সালে পর্তুগিজদের আক্রমণে। তারপর ১৬৪১ সালে মালাক্কা যায় ওলন্দাজদের দখলে। সবশেষে ইংরেজরা দখল করল ১৮২৪ সালে।

বাস থামল।

'ছোটবেলায় যারা ইতিহাসে বারবার ফেল করতেন তাদের আমার এই ইতিহাসের ক্লাস নিশ্চয়ই ভালো লাগছে না', লিন মুচকি হেসে বলল, 'তাদের জন্য একটা ভালো উপহার আছে। চলে আসুন আমার পিছন পিছন'।

সামনেই মেলাকা সুলতানের রাজপ্রাসাদ। মালয় অ্যানালস-এ সুলতানের রাজপ্রাসাদের যেমন বর্ণনা দেওয়া আছে তার অনুকরণে রাজপ্রাসাদের প্রতীক তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণ কাঠ দিয়ে। বর্তমানে এটি মেলাকা সাংস্কৃতিক সংগ্রহশালা।

প্রবেশদ্বারে দর্শকদের প্রত্যেককে একটা করে পলিথিন ব্যাগ দেওয়া হল। পায়ের জুতো এর মধ্যে নিয়ে খালি পায়ে ভেতরে যেতে হবে। সংরক্ষণশালাকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এই ব্যবস্থা।

সুলতানদের ব্যবহৃত রাজপোশাক, রত্ন-মণি-মুক্তাখচিত অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে কালের ক্রমে। একটা ঘরে সুলতানের দরবারকে তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সেকালের পোশাকে সজ্জিত পূর্ণাঙ্গ মূর্তি সহ রাজদরবারের নিখুঁত প্রতিকৃতি। রাজা সিংহাসনে আসীন। বিচারাধীন বন্দী রাজদণ্ডের অপেক্ষায় নত মস্তকে দণ্ডায়মান। ইতিহাস যেন কথা বলছে।

সংরক্ষণশালার গায়েই ১৫২১ সালে তৈরি পর্তুগিজদের সেন্ট পলস গির্জা। সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়র-এর মৃতদেহ এখানে রাখা ছিল ১৫৫৩ সালে গোয়ায় স্থানান্তরণের আগে পর্যন্ত। প্রাচ্যে প্রতীচী স্থাপত্যের নিদর্শন এটা। পরবর্তী কালে ওলন্দাজরা এই গির্জাকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাধিক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে।

গির্জার পাশে রাস্তার ওপর কয়েকটা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে আমাদের রিকশার মতোই। তফাত, নানা রঙের কাগজের ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। বারবার দেখতে ইচ্ছে করে।

রাস্তার নাম আলফোনসো ডি আলবুকার্ক স্ট্রিট। পথ দিয়ে চলতে চলতে মনে হয় কালের উল্টো স্রোতে হাঁটছি। ছোট ছোট একতলা বাড়িগুলির টালি বসানো ছাদ ঢালু হয়ে নেমে এসেছে, কাচের জানলায় হালকা রঙের আভা, সামনে ফুলগাছে ঘেরা ছোট আঙিনা— যেন খড়িমাটির রঙে পটে আঁকা সারি সারি বাংলো বাড়ি।

এটাই পর্তুগিজ পল্লি। সামনে একটু দূরে রাস্তাটা থেমে গেছে। শেষ প্রান্তে একটা হলুদ রঙের বড় তোরণ। তোরণের নিচ দিয়ে হেঁটে গিয়ে পাওয়া গেল একটা ছোট বাজার। জায়গাটার নাম পর্তুগিজ স্কোয়্যার। পাশাপাশি কয়েকটা দোকান, জীর্ণ অবস্থা, অনেকগুলোর ঝাঁপ বন্ধ। দুটো একটা কাফে। সবগুলোতেই ক্রেতার অভাব। এ পল্লিতে জীবনের গতি বড় ধীর। আমাদের দেখে দোকানিরা একটু নড়ে চড়ে বসল। আধুনিকতার উচ্চনাদে কল্লোলিত স্বাধীন মালয়শিয়ায় মেলাকা এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তির নীড়।

পথ দিয়ে চলেছে এক বৃদ্ধা তেচাকা সাইকেলভ্যান চালাতে চালাতে। ভ্যানে নানারকম আনাজ। আমাদের দেখে ভ্যানের গতি মন্থর হল। ছোটখাটো চেহারা মহিলার। হালকা রঙের আপাদলম্বিত গাউন পরেছেন। মাথায় পাখির পালক শোভিত টুপিতে অর্ধেক ছায়াবৃতা লাবণ্যময়ী মুখমণ্ডল রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। সেকালের পর্তুগিজ জীবনধারার জীবন্ত প্রতীক সামনে পেয়ে ক্যামেরা খুলতে খুলতে এগিয়ে গিয়ে ইঙ্গিত করলাম একটু থামতে। মহিলা আঙুল দিয়ে ভ্যানে সাজানো সবজি দেখিয়ে মিটি মিটি চোখে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিল— আগে সবজি কেনো, তারপর ফটো তোল, সবজি কিনবে না তো ফটোও হবে না। ভ্যানের গতি বাড়িয়ে দিয়ে মহিলা চলে গেল। হতাশ হয়ে বাসে উঠলাম।

বাস ডাইনে বাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে জোস্কার স্ট্রিটে ঢুকল। এ পথটা একেবারেই অন্যরকম। যেন পর্তুগিজদের দেশ ছেড়ে ভুল করে এসে পড়েছি অন্য এক দেশে। কোনও মিল নেই দুই দেশের মধ্যে। পথের দুধারে ছোট ছোট পুরনো কালের বাড়ি। খোদাই করা কাঠের দরজা জানলায় ঘন নীল, আকাশী নীল, হলুদ, নানা রঙের কাচের শার্সি লাগানো। ছোট ছোট দোকান ঘর। যেন চলন্ত ছবি দেখছি।

—'দেখ, দেখ, কি সুন্দর দেখতে!' ছেলেমানুষের মতো সামনের দিকে আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। ভুলেই গেলাম, আঙুল দিয়ে কিছু দেখানো মালয়শীয়দের সামাজিক আচরণবিরুদ্ধ কাজ। গাইড লিন বক্তৃতা শুরু করল: 'এই জায়গাটা হল বাবা চাইনিজপাড়া। সেই যে চিনের মিং রাজাদের রাজত্বকাল থেকে বাণিজ্যের জন্য চিনাদের মেলাকায় আসা শুরু হয়েছিল তা থেমে যায়নি। আর যারা এসেছিল তারা ফিরেও যায়নি কোনওদিন। এই গ্রামকে ভালোবেসে ফেলেছে, এখানকার

মেয়েদের বিয়ে করে সংসার পেতেছে। এদেশের ভাষা, পোশাক পরিচ্ছদ, সংস্কৃতি রপ্ত করে নিয়েছে। কালেকালে এইভাবে চিন-মালয় মিশ্রণে এক নতুন মানব গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে এখানে। এদেরকেই বলা হয় বাবা চাইনিজ। এই সমাজের সংস্কৃতিকে বলে বাবা নিওন্যা সংস্কৃতি। এই যে ছোট ছোট দোকানগুলো দেখছেন এগুলিকে বলে বাবা নিওন্যা দোকান আর ওই দিকে দেখুন মেলাকা বাবা নিওন্যা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংগ্রহশালা।'

বাস এগিয়ে চলল। আবার দৃশ্যান্তর। এবার এসে পড়লাম পশ্চিমের কোনও পুরনো শহরে। পথের দুধারে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দেওয়া গাছের সারি, পেটাই লোহার তৈরি সেকেলে ল্যাম্পপোস্ট, চার-পাঁচ দশক আগে কলকাতার পথে ওই ল্যাম্পপোস্ট দেখা যেত। বাস থামল ফিকে গোলাপি রঙের একটা বাড়ির সামনে। ১৭ শতকে তৈরি ওলন্দাজ স্থাপত্য নিদর্শন 'স্ট্যাডথুয়াস' ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শাসনকালে এটা ছিল গভর্নরদের বাসভবন। বর্তমানে মেলাকার ইতিহাস ও সাহিত্যের সংরক্ষণালয়। এর পাশেই ওলন্দাজদের তৈরি গম্বুজাকৃতি গির্জা, এর নাম ক্রাইস্ট চার্চ।

বেলা একটা বাজে। এখন একটু বিশ্রাম। মধ্যাহ্নিকের কাজ সারা হল এক চিনা হোটেলে। চিনাদের রন্ধন প্রণালী প্রশংসনীয়, খাদ্য তালিকায় থাকে অভিনবত্ব, স্বাদে অতুলনীয়। একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গেল।

আবার বাস ছুটল। থামল আ ফামোসা দুর্গের সামনে। ১৫১১ সালে তৈরি পর্তুগিজ গির্জা। দুর্গের সামনে একটি কামান বসানো আছে। ভেতরে আছে ধ্বংসাবশেষ।

আরও কিছু দেখার আছে মেলোকায়। এক পাহাড়ের ওপর আছে চিনাদের সব থেকে পুরনো এবং সব থেকে বড় সমাধিক্ষেত্র, মিং রাজকন্যা এবং পরে সম্রাজ্ঞী হ্যাং লি পোহ-র নামে একটি কূপ। এই কূপ সম্পর্কে জনশ্রুতি হল, এটা পর্যটকদের ইচ্ছা পূরণের কূপ। শহর থেকে একটু দূরে আরও একটি প্রবাদকূপ আছে। তার নাম হ্যাং তুয়ার কূপ। এই কূপে নাকি সুলতানের সময়ের এক মালয়-বীর-যোদ্ধার আত্মা এখনও ঘাপটি মেরে আছে। চিনা মন্দির চেং হুন, সুমাত্রার স্থাপত্যশৈলী পুরনো মসজিদ কামপাং এবং আরও কিছু প্রাচীন কালের স্মৃতি আছে এখানে। সব দেখা সম্ভব হল না। এক নজরে সেন্ট জোনস দুর্গ আর সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গির্জা দেখে প্রত্যাবর্তন হল। কে এল সি সি পৌঁছতে সন্ধে হল।

মালয়শিয়ায় শেষ দিন। যা কিছু ইচ্ছাপূরণ করে নিতে হবে আজ। সকাল সকাল চলে এলাম কে এল সি সি স্টেশনে।

অনেককাল বিদেশ বেড়াচ্ছি, কিন্তু ঘরে সংগ্রহশালার আলমারি সাজাবার জন্য সব দেশের স্মৃতি হিসেবে টুকিটাকি কেনাকাটা ছাড়া শখের জিনিস কিছু কিনিনি কোনওদিন। এবার বড় সাধ একটা ক্যামেরা কিনব। সিঙ্গাপুরে এক ক্যামেরার দোকানে ফিল্ম কিনতে গিয়ে ক্যামেরার দর করতে চিনা দোকানদার আমার

ক্যামেরায় ফিল্ম লাগাতে লাগাতে বললেন, 'দেখুন, আপনার চুল সাদা হয়েছে, আমারও। একটা সৎ পরামর্শ দিচ্ছি, এটা মনে রাখবেন। ক্যামেরা ঘড়ি এসব যদি কিনতে হয় তো কুয়ালা লামপুর থেকে কিনবেন, এখান থেকে নয়। ওখানে জিনিসটা ভালো পাবেন, দামও ন্যায্য পাবেন।'

কে এল সেন্ট্রালে একটা ক্যামেরার দোকান আগেই দেখেছি। ঢুকে পড়লাম আজ সেই দোকানে। এ কদিন বেড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই ক্যামেরার দর যাচাই করেছি। একই মডেলের ক্যামেরা এই দোকানে অনেক কম দাম চাইছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জিনিসটা খাঁটি কিনা। বিশ্বাস তো একটু করতেই হবে। অবিশ্বাস করে ঠকার থেকে বিশ্বাস করে ঠকা ভালো। দোকানের বিক্রয়কর্মী জোয়ে মেয়েটির কথাবার্তা ভালো বলেই মনে হচ্ছে। গ্যারান্টি কার্ড হাতে দিয়ে বলল, 'কিছু ছবি তুলে দেখুন না কেমন ছবি হয়, দুটোর মধ্যে দিয়ে যান, বিকেলে ছবি পেয়ে যাবেন।'

নতুন ক্যামেরা হাতে চলেছি ছবি তুলতে তুলতে। চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়তে হল, সামনেই নিগারা মিউজিয়াম, মালয়শিয়ার জাতীয় মিউজিয়াম। ২ রিঙ্গিত প্রবেশ দক্ষিণা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। বেশ কিছু মজার জিনিস সংগ্রহ করে রাখা আছে এখানে। একটা হাতির কঙ্কাল আছে। এই হাতিটা নাকি একটা রেলগাড়িকে বেলাইন করে উল্টে ফেলে দিয়েছিল। একটা লম্বা দড়ি ঝুলছে একটা ঘরের দেওয়ালে, তার এক মাথায় বঁড়শির মতো কাঁটা লাগানো। কী ব্যাপার! এটার নাম 'পাগল ধরা' (অ্যামোক ক্যাচার)। যেসব পাগল রাস্তায় ছুটোছুটি করে বেড়ায়, ধরে রাখা যায় না, তাদের ধরার জন্য বঁড়শি গাঁথা এই লম্বা দড়িটাকে কাজে লাগানো হয়। এক ঘর থেকে আর এক ঘর, তারপর আরেক ঘর, এমনি করতে করতে একটা ঘরে এসে পড়লাম। এ ঘরে কিছুই দেখার নেই, ফাঁকা ঘর। এর পাশের ঘরটায় বোধ করি কিছু বহু মূল্যবান জিনিস রাখা আছে, তাই দরজার পাশে এক প্রহরী। একটা চেয়ার আর একটা টেবিল রাখা আছে। টেবিলের ওপর কিছু কাগজপত্র। চেক চেক লুঙ্গি পরে সাদা গেঞ্জি গায়ে মধ্যবয়সী জোয়ান লোকটি চেয়ারে বসে আছে, তার একটা হাত টেবিলের ওপর রাখা, আরেকটা হাত পায়ের ওপর, দৃষ্টি আমাদের দিকে স্থির। নিশ্চয়ই দুর্মূল্য কিছু আছে ও ঘরে, আমার ব্যাগটা লোকটির কাছে জমা রেখে ও ঘরে ঢুকতে পারব, এই ভেবে কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল। সঙ্গিনী বলল, 'ও মানুষ নয়, মোমের পুতুল।'

এই লোকটিই এ ঘরের দর্শনীয় বস্তু, মোমের তৈরি, মায় তার লুঙ্গিটা, গেঞ্জিটা পর্যন্ত মোমের। পাশের ঘরে ঢুকে বুঝলাম এই দুটো ঘর মোমের পুতুলের জন্য। নানান রঙের সাজপোশাকে, বিভিন্ন অভিব্যক্তিকে নকল করে পুতুল বানিয়ে রাখা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় সমাজের বিয়ের অনুষ্ঠানকেও ধরে রাখা হয়েছে মোমের পুতুল বানিয়ে। লন্ডনের মাদাম তুসোর মোমের সংগ্রহশালার মতো।

ফিরে এলাম কে এল সি সি। দোতলায় গিয়ে দুটো টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে

ম্যাপ খুলে বসলাম, কোথায় যাওয়া যায়। পাশে বসেছিলেন সম্ভবত এক দক্ষিণ ভারতীয়। কোনও ভূমিকা না করেই বললেন, 'পরের স্টেশনে নেমে পড়ুন, দেখতে পাবেন কুয়ালা লামপুরের প্রতীক।' কী জিনিস সেটা জিজ্ঞেস করবার সুযোগ নেই, ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়েছে স্টেশনে। হুড়মুড় করে নেমে পড়লাম। প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে নীচে নেমে আসতেই নজরে পড়ছে, লম্বা সরু একটা চূড়া নীল আকাশ ফুটো করে উঠে গেছে। নিশ্চয়ই এই হবে কুয়ালা লামপুরের প্রতীক। আরে এমন জিনিসটা এ কদিনে দেখা হয়নি। প্রায় ছুটলাম নিশানার দিকে লক্ষ্য রেখে।

মিনারা কুয়ালা লামপুর, পৃথিবীর চতুর্থ উচ্চতম ইট সিমেন্টে গাঁথা ইমারত। ৪২১ মিটার উঁচু। এর থেকে সেরা তিনটি যথাক্রমে কানাডা, রাশিয়া এবং চিনে দেখার সুযোগ হয়েছে। ইসলামিক স্থাপত্যধারায় এটি নির্মাণের সময় পরিবেশ ভারসাম্যের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে একশো বছরের বৃদ্ধ জেলুটং গাছটাকেও সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। এর ২৭৬ মিটার উঁচু ধাপে দূরবীন বসানো আছে শহরটাকে পুরো দেখার জন্য। পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য এর ভেতরে আছে ঘূর্ণায়মান রেস্তোরাঁ, সাঁতারের জন্য জলাধার, কারুশিল্প দ্রব্যের দোকান।

মিনারা থেকে বাসে লেক গার্ডেন, কুয়ালা লামপুরের সব থেকে জনপ্রিয় উদ্যান। অসম বন্ধুর সবুজ প্রান্তর। মাঝে মাঝে ফুলে ফুলে রঙিন ছোট ছোট ঝোপ, অনেকটা তফাতে তফাতে নিরক্ষীয় গাছে ছায়াবৃতা।

প্রায় গায়ে লাগানো পাখির উদ্যান। সরু আঁকাবাঁকা জলাধার উদ্যানকে ঘিরে রেখেছে। রাজহাঁস ক্রৌঞ্চের দল ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকেই, কলকাকলিতে যেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

আরও কিছুটা পথ হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যেতে পাওয়া গেল তুজু নেগারা, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের স্মারক উদ্যান, পাম গাছে সাজানো বাগান, যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত। উদ্যানের কেন্দ্রে কোনও শিল্পী রচনা করেছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিসমূহের ঐকতানের প্রতীক।

বিকেল বিকেল ফিরে এলাম বুকিট বিতাং। এ এক অন্য জগৎ, আগের সঙ্গে কোনও মিল নেই। নিসর্গের শান্তির নীড় থেকে একেবারে আধুনিকতার উচ্চনাদে কল্লোলিত কুয়ালা লামপুর। সব আকাশ ছোঁয়া বাড়ি। নগর পত্তনে পুরনো আর আধুনিক কালের নকশার অপূর্ব মেলবন্ধন হয়েছে।

সন্ধে হতে না হতেই রাতের কুয়ালা লামপুর সজাগ হল। দোকানে দোকানে আলোর রোশনাই, রেস্তোরাঁয় রেস্তোরাঁয় স্যাকসোফোনে ডিং ডিং, ট্যাক ট্যাক, ট্যাং ট্যাং ট্যাং সুরে সুরে তালে তালে টেবিলে টেবিলে টুং টাং শব্দে ব্যস্ত চামচের ওঠানামা, শ্বেতবস্ত্রে আবৃতা রমণীর একমাত্র অনাবৃত লাবণ্যময়ী মুখমণ্ডলে মিষ্টি হাসির সঙ্গে 'সেলামাত দাতাং', এই হল আধুনিকা কুয়ালা লামপুর।

রেস্তোরাঁর সামনের রাস্তার পুরোটাই বাজার। বড় বড় দোকানগুলির সামনে ফুটপাথ জুড়ে, পথের মাঝখান বরাবর সারি সারি অগুনতি দোকান। দর কষাকষি,

কেনাকাটা চলছে। কিছু কেনাকাটা করে ফিরে এলাম কে এল সি সি। ক্যামেরার দোকান থেকে ছবিগুলো নিয়ে কাল সকালে বিমানবন্দরে যাওয়ার ট্রেনের সন্ধানে গেলাম দোতলায়। সকাল ৮টায় ব্যাংককের প্লেন উড়বে। অতএব ৬টার মধ্যে বিমানবন্দরে পৌঁছতে হবে। ৫টায় প্রথম ট্রেন ছাড়বে। সময় যথেষ্ট; কিন্তু মনে একটু ধন্দ, প্রত্যুষের নির্জন অন্ধকার পথ দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে হোটেল থেকে স্টেশনে আসা নিরাপদ কিনা। অজানা শহর। ঝুঁকি না নিয়ে নীচে নেমে এলাম। একদিন আগে ট্যাক্সি বুক করবার ব্যবস্থা এখানে আছে। এর নাম কমফোর্ট ট্যাক্সি। এ শহরে সকাল ৬টার আগে ট্যাক্সিতে উঠলে শতকরা ৫০ ভাগ ভাড়া বেশি দিতে হয়। যে ট্যাক্সি যাবে তার ড্রাইভারের নাম, টেলিফোন নম্বর লেখা কার্ড নিয়ে হোটেলে ফিরলাম।

পরদিন সকাল ৫টার মধ্যে নীচে নেমে এলাম। তখনও অনেকটা রাত, পথে লোকজন নেই। ট্রেনে যেতে হলে এই আঁধার রাতে একা একা যেতে হত স্টেশনে। দূরত্ব এত কম যে এইটুকু পথ যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করা অর্থহীন। মত পরিবর্তন করে ভালো করেছি।

কিন্তু ট্যাক্সি আসতে দেরি হচ্ছে, দুশ্চিন্তা বাড়ছে। ড্রাইভারের মোবাইল ফোন নম্বর শানকে দিয়ে বললাম ফোন করতে।

শান ফোন করে জানাল, একই নামে আরেকটা হোটেল আছে, এটা ছোট সেটা বড়। ড্রাইভার ভুল করে বড়টার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এক্ষুণি চলে আসছে।

বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। ভোরের আলো সবে ফুটেছে, ঘড়িতে সাড়ে ছটা। ব্যাংককের প্লেন উড়বে আটটায়।

এই লেখা শেষ করে আজকের খবরের কাগজ নিয়ে বসেছি। পাতা উল্টোতে উল্টোতে এক অত্যাশ্চর্য খবরে দৃষ্টি পড়ল।

"Lost city found in Malaysia". কোনও এক গবেষক মেলাকার জোহর অঞ্চলে গভীর জঙ্গলের ওপরে দীর্ঘ ১২ বছর গবেষণা চালিয়ে ১০০০ বছরের পুরনো এক শহর আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করছেন। জায়গাটির নাম তিনি বলছেন, Kota Gelanggi বা Perbendaharaan Permata যার মানে Treasury of Jewels. গবেষক আরও দাবি করেছেন যে এই শহরটি ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে শ্রী বিজয়া মালয়ের রাজধানী ছিল। গবেষকের দাবি অভ্রান্ত প্রমাণিত হলে মালয়শিয়ার ইতিহাসের সূচনাকারী হিসেবে মালাক্কার সুলতানদের নাম মুছে দেওয়া হবে। মালয়শিয়ার ইতিহাস নতুন করে রচিত হবে। পরমেশ্বর বা সুলতান ইসকান্দার শাহর গৌরবের দিন শেষ হয়ে এল বোধ হয়।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

বর্মামুলুক

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

ব্রহ্মদেশের, বিশেষ করে রেঙ্গুনের সঙ্গে বাঙালির কতকালের অন্তরের যোগ। প্লেনের জানালা দিয়ে আরাকান ইয়োমা পর্বতশৃঙ্গের নিসর্গ-শোভায় দৃষ্টি মেলে মনে মনে ইতিহাসের পাতা উল্টোতে উল্টোতে ইয়াংগন বিমানবন্দরে নামলাম বেলা বারোটায়। এই সেকালের রেঙ্গুন।

পরিকল্পনা ছিল ব্যাংককে পৌঁছে সেখান থেকে লাওস, মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুর, মায়ানমার ঘুরব ট্রেনে ট্রেনে। দমদম থেকে থাই বিমানে চড়ার মাত্র দুদিন আগে পাসপোর্টে মায়ানমারের ভিসার পাতায় প্রথম নজর পড়ল, ভিসার নীচে রাবার স্ট্যাম্প লাগানো আছে, সড়কপথে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যাবে না।

মাথায় হাত। এখন কী হবে! প্রায় এক মাস আগে ভিসা হয়ে গেছে। এর মধ্যে একবারও নজরে পড়ল না! ক্লাব সেভেন-এর জোসেফকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলাম পার্ক স্ট্রিটে মায়ানমার দূতাবাসে। সরাসরি রাষ্ট্রদূতের ঘরে ঢুকে দাবি জানালাম, এই লাইনটা কেটে দিতে হবে, তা না হলে নতুন করে ভিসা দিতে হবে।

তিনি জবাব দিলেন, কোনওটাই হবে না।

আমি তর্ক জুড়ে দিলাম, আমি যে ভিসার আবেদনপত্রে লিখে দিয়েছি, রেলপথে যাব। তাহলে এই ছাপ লাগানো হল কেন?

জবাব দিলেন, আমরা দরখাস্ত পড়ি না। ভিসা চাইলে ভিসা দিয়ে দিই ওই শর্তে, স্থলপথে বা জলপথে না, আকাশপথেই যেতে হবে আমাদের দেশে।

দমদমে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে। পিছন থেকে একজন কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'একটা কথা বলব। আমার সঙ্গে একটু বেশি মাল আছে। আপনারা তো দো আদমি যাচ্ছেন, লাগেজ দেখছি একটা সুটকেস। আমার পাসপোর্টটা যদি আপনাদের সঙ্গে দেন, আমার মালটাও চলে যাবে। নেহি তো আমার চার পানচ হাজার রুপিয়া লেগে যাবে।'

পিছন ফিরে দেখি ট্রলির ওপর এইয়া বড় দুটো বস্তা। তার মধ্যে দুজন মানুষকে বেঁধে নেওয়া যায়। লোকটি পশ্চিমের, অল্পদিন কলকাতায় এসেছে বোঝা যায়। ঠোঁটদুটো অত্যধিক লাল। নিশ্চয়ই পান খায়।

একা যাচ্ছেন যখন এত মাল নিয়েছেন কেন?

'একটু বেশি না নিলে খরচা পোষায় না।'

তা হলে তো প্রত্যেকবার আপনার সঙ্গে বেশি মাল থাকে, তখন কী করেন?

'আপনার মতো ভালো মানুষ পেয়ে গেলে খরচা বেঁচে যায়, না হলে দিতে হয়। এর মধ্যে শুধু লোহালক্কর মাল আছে।'

আমাকে শুধু তিনটে পাসপোর্ট একসঙ্গে দিয়ে বলতে হবে, আমরা তিনজন আছি। এর বেশি আর কিছু নয়। এইটুকু উপকার করলে আমার কোনও ক্ষতি নেই। আবার ভাবছি, পিস্তল বন্দুকও তো লোহালক্কর, কোনও ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে না পড়ি।

কাউন্টারের সামনে এসে পড়েছি। আমাদের সুটকেসটা ওজন যন্ত্রের ওপর চাপিয়ে দিলাম। লোকটি আমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই তার বস্তাদুটো আমাদের সুটকেসের পাশে যন্ত্রের ওপর চাপিয়ে দিয়ে পাসপোর্টটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি তিনটে পাসপোর্ট একসঙ্গে কাউন্টারে দিলাম।

আকাশযান আকাশে উড়ল দশটার জায়গায় দশটা চল্লিশ মিনিটে। কুয়াশার জন্য এই দেরি। ইয়াংগন বিমানবন্দরের ভূতল স্পর্শ করল বেলা বারোটায়। এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের পথ। এ যেন বাসে করে বেহালা থেকে শিয়ালদা যাওয়া। ইয়াংগনের স্থানীয় সময় ১২টা ৫৫ মিনিট।

কনভেয়র বেল্ট থেকে বস্তাদুটো তুলে নিয়ে লোকটি কৃতজ্ঞতায় ভরা লাল ঠোঁটদুটো ফাঁক করে হাতজোড় করে পাশে এসে এক টুকরো কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, আমার নাম বনওয়ারি জালান, সল্টলেকে থাকি। মোবাইল নম্বর লিখে দিয়েছি। আমার ভাই নরেশ রেঙ্গুনে থাকে, ওর ফোন নম্বর দিয়েছি। ওকে এখানে সবাই চেনে। জরুরত হলে ফোন করবেন।

ছিপছিপে চেহারার একটি মেয়ে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল বনওয়ারির দিকে। বনওয়ারি সেটির ওপর চোখ বুলিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, দেখুন তো বোধহয় আপনাদের নিতে এসেছে।

কাগজে আমার নাম লেখা। বললাম, হ্যাঁ, আমি। তোমার নাম?

সামিনা। আপনারা বাইরে অপেক্ষা করবেন, আমি গাড়ি নিয়ে আসছি।

সামিনা চলে গেল। আমরা জিনিসপত্র নিয়ে শুল্কদপ্তরের দিকে এগিয়ে চললাম।

শুল্কবিভাগের ঘোষণাপত্র পূরণ করতে করতে কলম থেমে গেল। কত সোনা সঙ্গে আছে লেখ। সোনাদানা নিয়ে এদেশে ঢোকা চলবে না। কী জ্বালা! এ কি পাশের বাড়ির প্রতিবেশীর মতো কথা হল! সঙ্গিনী বলল, আঁচল চাপা দিয়ে গেলে হয় না?

"খেপেছো! এ মিলিটারি শাসনের দেশ। আগেভাগে দিয়ে দিলে হয়তো ফেরত পাওয়া যাবে।"

ভিড় মোটেই নেই। যারা এদেশের লোক সবাই চলে গেছে। বনওয়ারিকে কেউ একজন নিতে এসেছে। ওরা দুজনে দুটো বস্তা মাথায় নিয়ে চলে গেল। ওদের বস্তা খুলতেও বলল না। মিলিটারি শাসন হলে কী হবে, শাসনের বাঁধন তেমন শক্ত বলে মনে হচ্ছে না। পুলিশ বা সৈনিক বা নিরাপত্তাকর্মী কোথাও দেখছি না। ছোট ঘর, শুল্কবিভাগের কর্মীরা বসে আছে চেয়ারে। তাদের সামনে আমরা সবাই। মাঝখানে শুধু ফুট চারেক উঁচু কাঠের বেড়। হলুদ লাইন, গ্রিন চ্যানেল, রেড চ্যানেলের কোনও ব্যাপার নেই। সঙ্গিনীর হাতটা এক মহিলা কর্মীর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললাম, এর হাতে এই আছে, আর গলায় আছে এই। ফর্মে কী লিখব?

মহিলা কী বলল বোঝা গেল না। আমার হাত থেকে ফর্ম আর পাসপোর্ট দুটো নিয়ে পাসপোর্টে ছাপ লাগিয়ে ফেরত দিয়ে হাতের ইশারায় চলে যেতে বলল।

বিমানবন্দরকে পিছনে রেখে ট্যাক্সি শহরের পথ ধরল।

একেবারে সাদামাঠা পথ, কোনও আহামরি ভাব নেই, চেয়ে চেয়ে দেখার মতো কিছু নেই। বেহালা, বেলেঘাটা, বউবাজার এবং বাগবাজা- রের মতোই, বিদেশ বলে মনে হচ্ছে না।

হবে নাই বা কেন! আজ বিদেশ হলেও এক সময় কিছুদিনের জন্য হলেও তো স্বদেশ ছিল। বহু বাঙালি বর্মা মুলুকে চাকরি করতে আসত। কলকাতা, কক্সবাজার, চিটাগাঙের মতো বাঙালির আরও একটা পরিচিত জাহাজঘাটা ছিল রেঙ্গুন। শুধু মাঝে মাঝে নজরে পড়ছিল লাইটপোস্টের গায়ে গোলাকৃতি টিনের বোর্ডের ওপর রঙিন টুনি লাইটে লেখা কখনও ২০, কখনও ৩০। কলকাতার নো এন্ট্রি বোর্ডগুলো রং দিয়ে না লিখে টুনি বালব দিয়ে লিখলে যেমন হত ঠিক তেমনই। অনেক ভেবেও রহস্য ভেদ করতে না পেরে সামিনার কাছে ব্যাখ্যা চাইলাম। এ শহরের মেয়ে হলেও এত সব খুঁটিনাটি ব্যাপার ওর জানা নেই। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, দিনের কোন সময় কোন পথ দিয়ে গাড়ি ঘণ্টায় কত কিলোমিটার বেগে যেতে পারবে তার নির্দেশক ওই সংখ্যা। এখন এই পথ দিয়ে গাড়ি ঘণ্টায় ২০ কিলোমিটার বেগে যেতে পারবে। রাত নটার পর সংখ্যাটা হয়ে যাবে ৩০।

দুসিত ইনিয়া লেক হোটেল। রিসেপশন কাউন্টারে লেখালেখির কাজ চুকিয়ে সামিনা চলে গেল, বলে গেল সাড়ে তিনটেয় আসবে, তার আগেই যেন আমরা নীচে নেমে আসি।

তিনতলায় ঘরটি বেশ বড়সড়। কাঠের মেঝে, দুটো খাট, চেয়ার-টেবিলের ছড়াছড়ি, টেলিফোন, টিভি, ওয়ারড্রব, মিনি বার কী নেই! একটি অতিরিক্ত জিনিস রাখা আছে স্নানঘরে, পরিপাটি করে সাজানো দু-বোতল জল। বোতল দুটি রাখা আছে বেতের তৈরি দুটো বোতলদানের মধ্যে। ভারি সুন্দর দেখতে বোতলদান দুটো। ঘরের দক্ষিণ দিকে একটা বড় কাচ লাগানো দরজা। বন্ধ দরজার ওপাশে ব্যালকনি। দরজা আড়াল করা পর্দাদুটো সরিয়ে দুটো শালিক তারস্বরে

আপত্তি জানাতে শুরু করল, বুঝিয়ে দিল ব্যালকনিটা ওদের দখলে আছে, দরজা খোলা চলবে না।

এ ঘরে যারা আসে কেউই দরজা খোলে না বোঝা যাচ্ছে। অনেক কালের ধুলো জমে আছে ব্যালকনিতে, কেউ কখনও ঝাঁট দেয় না। ডিসেম্বর মাস। বাইরের হাওয়ার দরকার হবে না। দরকার হলেও অসুবিধা নেই, দরজার পাশে ছোট জানালা আছে, সেটা খুলে দিলেই হবে।

কাচ ভেদ করে বাইরের আলো এসে ঘরটা পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। এই দিকটা একেবারেই ফাঁকা। অনেকটা দূরে বড় বড় গাছের গায়ে গায়ে জড়াজড়ি দেখে মনে হচ্ছে ও জায়গাটা জঙ্গল হবে।

ঘরে শুধু একটা জিনিসের অভাব, মেঝেতে কার্পেট পাতা নেই। সকালে আমার যোগব্যায়াম করায় সমস্যা হবে।

বাড়ি থেকে তৈরি করে আনা খাবারে মধ্যাহ্নভোজ সেরে তিনটেয় নীচে নেমে এলাম। সামিনার আসতে আরও অনেকটা সময় বাকি। চারপাশটা ঘুরে ঘুরে একটু সময় কাটানো যেতে পারে।

শহরের হইচই থেকে দূরে, নিরালা, শান্ত ইনিয়া লেক হোটেল। বাঁয়ে একটা বড় পরিসরের লেক, গভীর নীল জলে গাঢ় হলুদ রঙের গোটা কয়েক কায়াক ভাসছে। হোটেলের সামনে, ডাইনে, খোলা চত্বর, প্রাণভরে নিশ্বাস নেওয়ার জায়গা। পিছনে ঘন সবুজ আস্তরণে ঢাকা মাঠ, তার এক পাশে রঙ্গমঞ্চ, আরেক পাশে টেনিস খেলার ব্যবস্থা, অন্য পাশে সাঁতার কাটার জলাধার। হোটেলের সীমানার বাইরের রাস্তাটা জনবিরল, বসতি শূন্য, বাঁদিকে একটু দূরে বড় রাস্তায় মিশেছে। ডানদিকে অলস গতিতে চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালাম। এতক্ষণ নজরেই আসেনি পথটা এখানেই শেষ। একটা বড় সাইনবোর্ড লেখা— সৈন্যনিবাস, সংরক্ষিত এলাকা। রাইফেলধারী দুই সান্ত্রী কটমট করে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। আরেব্বাস! একেই তো মিলিটারি দেশ। তার ওপর একেবারে মিলিটারির খপ্পরে এসে পড়েছি। গুটিগুটি সরে পড়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

সাড়ে চারটেয় সামিনা এল। শহরটা ঘুরিয়ে দেখাবে।

শহরের ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে। রাস্তাগুলো বেশ চওড়া। পথচারীদের ভিড়। ফুটপাত জুড়ে দোকান। বাসের মধ্যে মানুষের গাদাগাদি। সবই কলকাতার মতো, কোনও তফাত নেই। তফাত আছে এক জায়গায়, সব বাসের দরজা বন্ধ, ফুটবোর্ডে কোনও যাত্রী দাঁড়িয়ে নেই। জিপগাড়ি বোঝাই মানুষ যাচ্ছে ছাগল ভেড়ার মতো।

আং সান সু কি এই শহরেই থাকেন তো? জিজ্ঞেস করলাম সামিনাকে।

হ্যাঁ, জবাব দিল সামিনা।

তাঁকে দেখার খুব ইচ্ছে।

ইরাবতী নদী পার হয়ে গাড়ি যাচ্ছে নির্জন পথ দিয়ে। গাছের ফাঁক দিয়ে

অনেকটা দূরে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। সামিনা ওই দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই যে দেখা যাচ্ছে আং সাঙের বাড়ি, ওখানেই সু কি থাকেন।

ওখান থেকে গেলে হয় না?

না, ওখানে মিলিটারি পাহারা দিচ্ছে, গাড়ি যেতে দেবে না।

এই হল মিলিটারি জুন্টার শাসন। বর্মার অবিসংবাদিত নেতা আং সান-এর কন্যা আং সান সু কি, ন্যাশনাল লিগ অব ডেমোক্র্যাসি দলের নেত্রী। ১৯৯১ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী। জুন্টা শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের জন্য আপসহীন লড়াই করে যাচ্ছেন। জনতার দাবিতে নির্বাচন করতে বাধ্য হল মিলিটারি সরকার। নির্বাচনে অনেক কারচুপি করেও ন্যাশনাল লিগ অব ডেমোক্র্যাসিকে হারানো গেল না। কিন্তু জুন্টা সরকার শাসনক্ষমতা ছাড়ল না। দলের নেত্রীকে গৃহবন্দী করে রাখল। সৈন্য পরিবেষ্টিত বাড়িতে নিঃসঙ্গ জীবন। দলের কর্মীদের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। তবু এই নারী আত্মসমর্পণ করেননি। ফ্রান্সের জোয়ান অব আর্ক-এর ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের গল্প শুনেছি, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইয়ের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাহিনী ছোটবেলায় ইতিহাসের পাতায় পড়েছি। আজ আরেক বীর নারীর বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তাঁকে দেখার সুযোগ নেই, দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করাও দণ্ডনীয়। দূর থেকে তাঁকে মনে মনে শ্রদ্ধা জানালাম।

গাড়ি থামল বান্দুলা ট্যুর ও ট্র্যাভেলস-এর অফিসের সামনে। আগামীকাল ভ্রমণের কর্মসূচি ঠিক করে তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এলাম।

কিছু একটা উৎসবের প্রস্তুতির আভাস পাওয়া যাচ্ছিল অনেকটা দূর থেকে। হোটেলের ভেতরে এসে দেখি লবিতে এক বাজিয়ে একটি বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন। আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা। ছয় তারের যন্ত্র, ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের মতো দেখতে। মিষ্টি সুর। নাম তার হার্প। দক্ষ বাজিয়ে, সুরের লহরি তুলে নিবিষ্ট মনে বাজিয়ে চলেছেন। আর এক পাশে ক্রিসমাস ট্রি আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে।

হোটেলের পিছনে অডিটোরিয়ামে কিছু একটা অনুষ্ঠান চলছে, সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে, আসনে কিছু দর্শকও আছে। কাছে গিয়ে জানা গেল, অনুষ্ঠান নয় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে। বড়দিনের উৎসবে বড় আকারের অনুষ্ঠান হবে, নাচ, গান আরও কিছু। তারই চূড়ান্ত মহড়া চলছে। মঞ্চের পর্দা উঠল, ঘোষক ঘোষণা করল। পর্দার আড়ালে গান হচ্ছে, মেয়েরা নাচতে নাচতে মঞ্চে আসছে, শিক্ষক-শিক্ষিকারা মঞ্চে ওঠানামা দেখিয়ে দিচ্ছেন, নাচের ভুল সংশোধন করে দিচ্ছেন, যাকে বলে মঞ্চ মহড়া চলছে। আজ সবে ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখ। বড়দিনের অনেক দেরি।

পরদিন সারাদিন ভ্রমণ। সকাল ৮টার মধ্যে নীচে নেমে এলাম। এখানেই রেস্টুরেন্ট। বুফে পদ্ধতিতে প্রাতরাশ। আমি কিন্তু প্রাতরাশের নামে সারাদিনের খোরাক সংগ্রহ করে নিই জঠরে। আকণ্ঠ খেয়েছি। তার পরেও হাতে একটা কলা

নিয়ে বেরিয়ে এলাম রেস্টুরেন্ট থেকে।

গাড়ি এল ৯টায়। গাড়ি মানে ট্যাক্সি। দল বেঁধে বেড়ানো নয়, আমাদের দুজনের জন্যই ব্যবস্থা। সঙ্গে একজন গাইড, নাম মৌ।

শোয়েডাগন প্যাগোডা। আসলে এটা একটা স্তূপ। বর্মার সব থেকে উল্লেখযোগ্য বুদ্ধস্তূপ। লিফটে চড়ে উঠতে হল। দেশি আর বিদেশিদের জন্য আলাদা আলাদা লিফট। এ আবার কেমন ব্যবস্থা। দেশি আর বিদেশিদের চিহ্নিত করে দেওয়া, অথবা বিদেশিদের বেশি সম্মান দেওয়া, কোনটা প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝা গেল না।

১০০ মিটার উঁচু চূড়ার ওপর শোয়েডাগন প্যাগোডা, যেন পাহাড়ের চূড়ায় বসে বুদ্ধ রেঙ্গুন শহরের ওপর নজর রাখছেন। প্লেন থেকেও দেখা যায় একটা সোনালি বিন্দুর মতো। ৮০০০ সোনার প্লেট দিয়ে মোড়া মূলস্তূপটির মোচকানো চূড়া। তার ওপর বসানো আছে ৫০০০ হিরে আর ২০০০ রত্ন। স্তূপকে ঘিরে আছে ৮২টি ছোট-বড় মন্দির। আড়াই হাজার বছর আগে প্রতিষ্ঠিত মন্দির, যদিও মূলস্তূপটি তৈরি হয়েছে অষ্টাদশ শতকে।স্তূপের উত্তর-পূর্ব কোণে এক বিশালকায় ঘণ্টা আছে। ইংরেজরা সেটা চুরি করে নিয়ে যেতে চাইছিল ইংল্যান্ডে। বজ্র আঁটুনির ফসকা গেরোয় ঘণ্টা পড়ে যায় ইরাবতীর জলে। ইংরেজদের বুদ্ধি আর গায়ের জোর খাটিয়ে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি সে ঘণ্টা। শেষে ব্রহ্মদেশীয়রাই দেশি কায়দায় বড় বড় বাঁশ বেঁধে তুলে এনেছে ঘণ্টা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতিফলকও আছে মন্দিরগুলোর পাশে।

এত সব তথ্য মৌ-এর জানা নেই, জানতে হল শ্রমণদের কাছ থেকে। মৌ পেশাদার গাইড নয়। সবে কলেজের পড়া শেষ করেছে। এখন বেকার। কিছু পয়সা উপার্জনের জন্য এই কাজ করছে।

শেয়োডাগন প্যাগোডা থেকে সুলে প্যাগোডা। ২০০০ বছরের পুরনো বুদ্ধমন্দির, শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে। মন্দিরের সামনে রাস্তার অন্য পারে একটা ছোট পার্ক। ওই দিকে চলতে চলতে দুটি বালক পয়সার জন্য হাত বাড়িয়ে আমাদের পিছু নিল।

সুলে প্যাগোডার কাছেই চক হটাট ঘাই প্যাগোডা। বিশাল আকারের শায়িত বুদ্ধ আছেন এখানে। ডান হাতের তালুর ওপর মাথা রেখে ডানপাশ ফিরে শুয়ে আছেন বুদ্ধ। লম্বা পদযুগলের তলদেশে মণিমুক্তাখচিত অনেক মঙ্গলচিহ্ন আঁকা। এইরকম বুদ্ধমূর্তি দেখেছি ব্যাংককে ওয়াট ফো মন্দিরে। লাওসের বুদ্ধপার্কেও আছে শায়িত বুদ্ধ। তবে সেটা পাথরের তৈরি এবং রাখা আছে পার্কের উন্মুক্ত জায়গায়, কোনও মন্দিরে বা কোনও আচ্ছাদনের নীচে নয়। সেই বুদ্ধমূর্তিতে আছে ভাস্কর্যের নিপুণতা, আর ব্যাংকক বর্মার শায়িত বুদ্ধে আছে অলঙ্কার মণিমুক্তার সজ্জা।

এখান থেকে কাবা আয়ে। ১৯৫০ সালে বৌদ্ধধর্মের ২৫০০ বৎসর পূর্তি

স্মরণে এই মন্দির তৈরি হয়েছিল। কাবা আয়ে কথার অর্থ বিশ্ব শান্তি।

আরও কিছু বুদ্ধমন্দির, প্যাগোডা দেখা হল।

বো-তা-তউঙ মন্দির, মাহাসি মেডিটেশন সেন্টার, মহাপাষাণ গুহা দেখে এলাম বোঘিয়োক বাজারে। রেঙ্গুনের জনপ্রিয় বাজার। মৌ বলল, এই বাজারে সব কিছু পাবেন। খাওয়াদাওয়া সেরে কেনাকাটা করুন। আমরা এক ঘণ্টা পরে আসছি।

পথের ধারে ধারে অনেক খাবারের দোকান। আমাদের তো খাবার দরকার নেই। সকালে জঠরে সঞ্চয় করে এনেছি সারাদিনের খাবার। সঙ্গে আছে দু-বোতল জল। ঢুকলাম উপহারসামগ্রীর বাজারে। বহু দোকান, বহু বিচিত্র জিনিসের দোকান। সবই বর্মার নিজস্ব কারুশিল্পদ্রব্য। দেখে দেখে ঢুকলাম এক কাঠের শিল্পদ্রব্যের দোকানে। কয়েকটা জিনিস পছন্দ করে দর জিজ্ঞেস করলাম। বিক্রেতা দুই চারুশীলা তন্বী। কিন্তু জবাব দিলেন দরজার পাশে টুলের ওপর উপবিষ্ট এক বৃদ্ধ। শ্রবণমধুর বাংলায় বললেন, "পছন্দ হলে নিন না, দামে অসুবিধা হবে না।"

তাজ্জব ব্যাপার! চেহারায় তো বাঙালি বলে মনে হচ্ছে না, বিশেষ করে মেয়েদুটিকে একেবারেই না।

"আপনি বাঙালি?"

"না। তবে কলকাতায় আমাদের লোক আছে, সেখানে আমাদের যাওয়া-আসা আছে।"

"এই মেয়েদুটি আপনার কে?"

"নাতনি।"

"ওরাও বাংলা বলতে পারে?"

"দেখুন না বলে।"

"তোমরা কেন আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বললে না?" আমি ওদের অভিযোগ করলাম।

এদেশের একেবারে নিজস্ব তিনটি কারুশিল্পদ্রব্য বেছে নিলাম, যা অন্য কোনও দেশে পাওয়া যাবে না— পুতুল নাচের পুতুল, যাকে নাচানো যায়, এদেশের বাদ্যযন্ত্র হার্প, আর একটা এনামেলের গোল লম্বা চার কৌটোর টিফিন নেওয়ার পাত্র যেমন হয় সেইরকম ছোট্ট কাঠের তৈরি খেলনা টিফিন পাত্র। কিনে মৌয়ের নির্দেশিত জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। ওরাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে এসে গেল।

এখন চলেছি বর্মার জাতীয় মিউজিয়াম। আমাদের সামনে একদল স্কুলের মেয়ে চলেছে লাইন দিয়ে। ফুটফুটে গায়ের রং, নিটোল মুখের গড়ন, বড় বড় টানাটানা চোখ, যেন চলমান একদল মোমের পুতুল। বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে সবাই দেখছে আমাদের। ওরা ঢুকল মিউজিয়ামের ভেতর, আমরা ওদের পিছু নিলাম।

একতলায় শিলালিপি ও সুন্দর হস্তলিপি সংরক্ষিত কক্ষের পাশের ঘরে আছে একটি কাষ্ঠনির্মিত সিংহাসন। ১৫০ বছরের পুরনো কাঠের ওপর খোদাই করে বসানো কনকপর্ণ। বর্মার রাজা বিচারে বসতেন এই সিংহাসনে। ১৯০২ সালে

ইংরেজ সরকার সিংহাসনটি ম্যান্ডালয় থেকে কলকাতার যাদুঘরে নিয়ে এসেছিল। ১৯৪৮ সালে বর্মা স্বাধীন হলে সিংহাসনটি ভারত সরকার ফেরত পাঠিয়ে দেয়। সিংহাসনের সামনে রাখা আছে খাঁটি সোনায় তৈরি মণিমুক্তাখচিত রাজমুকুট। দেখলাম প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের মৃন্ময় পাত্র, প্রস্তর মূর্তি, চিত্রকলা, কারুশিল্প, বুদ্ধমূর্তি, বাদ্যযন্ত্র আরও কত কী!

ফেরার পথে ভারতের শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধিক্ষেত্র থেকে বান্দুলা ট্র্যাভেল কোম্পানির অফিসঘর।

হোটেলে ফেরার পথে মৌকে বললাম, আগামীকাল কোনও অর্থনীতির অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

"আচ্ছা, দেখছি।" মৌ আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

পরদিন কথামতো মৌ এক অধ্যাপকের বাড়িতে নিয়ে গেল। অধ্যাপকের নাম উ টিন থাউং, ইয়াংগন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে একটা আবাসনের তিনতলায় থাকেন। একটা ঘরে চার-পাঁচটা বেঞ্চ পাতা, দেওয়ালে ব্ল্যাকবোর্ড ঝুলছে। জানতে চাইলাম এদেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি সম্পর্কে। খুব হিসেব করে শব্দ ব্যয় করছিলেন অধ্যাপক আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে। শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ সাক্ষর। বেকার সমস্যা খুব বেশি। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর যা পেনশন পাওয়া যায়, তাতে একজনের তিন-চারদিনের বেশি চলে না। মৌ বলল, আজ যে ট্যাক্সিতে আমরা এসেছি তার ড্রাইভার ওর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর এই কাজ করছেন। আং সান সু কি সম্পর্কে জানতে চাইলে বললেন, খুব ভালো মানুষ। এর বেশি আর একটি বাক্যও ব্যয় করলেন না। তিনি স্বভাবে মিতভাষী, অথবা রাষ্ট্রীয় দমন নীতির দাপটে বাকসংযমী হয়েছেন, বোঝা গেল না। ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

রেঙ্গুন শহরের বাইরে বেশ কিছুটা দূরে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের সমাধিক্ষেত্র, সমাধিক্ষেত্রের প্রবেশপথে আছে একটা স্মৃতিস্তম্ভ। স্মৃতিস্তম্ভের পিছনে পাথর বাঁধানো আয়তাকার চত্বর। সেখানে স্মৃতিফলক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কিছু দেওয়াল তৈরি হয়েছে।বহু সৈনিকের নাম খোদাই করা আছে ফলকে। ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর মৃত সৈনিকদের এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছে। খোদিত নামের তালিকায় সবই ভারতীয়, তার মধ্যে বহু বাঙালির নাম আছে। এর উত্তরে সমাধিক্ষেত্র। আয়তাকার সিমেন্টে বাঁধানো সমাধিস্থানগুলিকে ঘিরে আছে ছোট ছোট ফুলগাছ। সব মিলিয়ে সুদর্শন পুষ্পোদ্যান। শহরের বাইরে অনেক দূরে হওয়ায় নিঃশব্দ প্রশান্তি বিরাজ করছে।

চিনা বাজারে পৌঁছলাম বেলা দুটোয়। রেঙ্গুনের বড় পোস্ট অফিস এখানে। পোস্ট অফিসের সামনে বসেছেন মানি অর্ডার ফর্ম লেখা, পার্সেল প্যাকেট সেলাই আর সিল করবার লোকেরা, ঠিক যেমন দেখা যায় কলকাতার জি পি ওর সামনে।

৩৫ ক্যাং দিয়ে একটা চিঠি পোস্ট করে হোটেলে ফিরলাম।

পরদিন সকালে জিনিসপত্র নিয়ে নীচে নেমে এলাম। সামিনা বলছে, বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়ার পথে সাদা হাতি দেখাবে। রেস্টুরেন্টে শেষবারের মতো খেয়ে এসে সামিনার অপেক্ষায় বসলাম। সে এল বেলা এগারোটায়। সাদা হাতি দেখিয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিল সাড়ে বারোটায়।

'ভ্রমণ' ডিসেম্বর, ২০০৫

পাথরের দ্বীপ

জয়া মিত্র

ঈশ্বর প্রজাপতি তৈরি করছিলেন। সন্তর্পণে তাদের ডানার নীচের পিঠে হালকা হলুদ রং লাগিয়ে সেগুলিকে শুকোতে দিচ্ছিলেন তাঁর নীলগম্বুজ প্রাসাদের বাতাসের সেলফে। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল নীচের ছোট্ট নদীটির ওপর। এত সুন্দর একটি জলধারা আর তাকে ঘিরে এমন পাথরের উপবন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তিনি! ঈশ্বর মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে গেলেন। সত্যি! কত সুন্দর ছিল সেই ঊষাকাল, যখন প্রথম তারুণ্যের স্বপ্ন চোখে নিয়ে তিনি বিশ্ব গড়তে শুরু করেছিলেন। তারপর কত কাল যে গেল! আবর্জনা জমে, ক্লান্তি জমে, কত মলিন হয়ে উঠেছে সে সৃষ্টি। কেবল এই এক-দুটি স্বচ্ছতোয়া কলনির্ঝরিণী তাঁর সেই স্বপ্নস্মৃতি হয়ে রয়ে গেছে কোথাও কোথাও। একটি গভীর শ্বাস পড়ল ঈশ্বরের। সেই শ্বাসবায়ুতে প্রাণ পেয়ে ঈশ্বরের অন্যমনস্কতার অবসরে সেই আধ-রং করা প্রজাপতিগুলি নেমে এল ছোট নদীটির কূলে। পাথরকিনারা ভেজা বালিতে। যেন ওরা সৃষ্টিকর্তার শৈশবস্মৃতির বেদনা। মূর্তিনদীর পাশে পাথরস্তূপের ছায়ায় সামসিং রকি আইল্যান্ডে ওরা এখনও বসে থাকে। ডানার নীচের পিঠে হালকা হলুদ, ওপর পিঠ সাদা।

একটু কাব্যিক হয়ে গেল? কিছু করার নেই। উতল কাব্যই জাগিয়ে তোলে। এত নিরালা এমন সুন্দর মনে হয় যেন স্বপ্ন। হয়তো স্বপ্ন দেখতে বা দেখাতে না পারলে রকি আইল্যান্ড হয় না। ডুয়ার্সের ভয়াল সৌন্দর্যময় জায়গাগুলির মধ্যে থেকে একটি ছোট খাঁজকে বেছে নিয়ে তাকে রকি আইল্যান্ড করে তুলছেন মধ্য ত্রিশের যে বাঙালি তরুণটি, তিনি ঠিক আরেকটা সুন্দর হিল-রিসর্ট গড়ে তুলতে চাননি। যে জন্য তিনি কোনও বিপুল প্রচারও চান না ওই ছোট জায়গাটির। অন্যরকম ভাবে বাঁচা, প্রকৃতিরই এক ঘনিষ্ঠ অংশ হিসাবে মনুষ্য জীবনকে সচেতনভাবে বোধ করবার ইচ্ছাই তাঁর সমস্ত কাজটির মধ্যে বিন্যস্ত রয়েছে।

জলপাইগুড়ির ছোট্ট নদী মূর্তি বহু আগে কখনও হয়তো বয়ে যেত পাহাড়ের এক খাঁজ দিয়ে। সেই বহমানতার সমস্ত চিহ্ন ফেলে রেখে আজ সে বয়ে যায় পাশের অনেকখানি গভীর এক খাত ধরে। এই অতীত ও বর্তমান ধারাপথে নদী নরম মাটি ধুয়ে ফেলে তৈরি করেছে কখনও বিশাল, কখনও ভেঙে কুচি পাথরের

এক বিশাল উপবন। পুরনো সেই খাতে পাথরের আশপাশে আবার জমেছে মাটি। জন্মেছে দীর্ঘ বৃক্ষগুলি।

সমুদ্রতল থেকে মাত্র দুহাজার ফুট উঁচু জায়গাটিকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে আট-দশ-বারো হাজার ফুটের পাহাড়ের জঙ্গল। মাঝখানে, নদীর অবিরাম শব্দের পাশ ঘেঁসে এই ছায়াভরা পাথুরে দ্বীপটি গড়ে উঠেছে এক ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড হিসাবে। নাগরিক আরামবিলাসের বন্ধনবন্দী যে জীবন, খোলা আকাশ খোলা বাতাস মুখোমুখি বহুবর্ণ সবুজের বিশাল উত্থান যে জীবনের অভিজ্ঞতার সর্বতো বাইরে, এখানে সরাসরি তারই মধ্যে অনাড়ম্বর বাস। বর্ষা ছাড়া অন্যকালে পাথরের আশপাশে খোলা জমিতে টেন্ট ফেলে রাতে শোয়া। বিকল্পে ছয় বেডের এক লগ কেবিনও আছে অবশ্য। তার আগে পর্যন্ত নদীর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গানের ঝরনা। মাথার ওপরে শূন্য জুড়ে বিশাল সব গাছের সুদূর শিলুয়েট। তারও পিছনে কালোনদীতে ভাসে টলটলে তারার প্রদীপ। সকাল আসে ঠিক সকালেরই মতো ধৌত শান্ত অমলতায়। ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড় শুরু করবার প্রস্তুতি হিসাবে নয়, একটি দিনের টপ করে গিলে ফেলা আরম্ভবটিকা হিসাবে নয়, শৈশবের আকাঙ্ক্ষিত একটি দীর্ঘ বিলম্বিত দিন-ভূমিকা হয়ে গাছের আলোছায়া, পাখির নানারকম ডাক, দূরের পাহাড় নীল, কাছের পাহাড় সবুজ রংবাহারি আর মূর্তির অবিরাম মর্মর শব্দের খেলুড়েপনায় মাখামাখি ভরাট সকাল। চা-পিয়াসীদের জন্য দুয়েকবার চায়ের পর একটু বেলা হলে 'কাকা'র তৈরি লুচি আলুর পরোটা কিংবা ডিম পাউরুটির প্লেট হাতে নিয়ে যার যেমন ইচ্ছে জায়গায়, ঘাসের ওপর চেয়ার নিয়ে কিংবা পাথরে চড়ে খানিক দূর পর্যন্ত দেখতে দেখতে খাওয়া।

তবে হ্যাঁ, ছুটি জোড়া বিলাস প্রয়াসীদের জন্য ঠিক সুবিধাজনক নয় অবশ্য পাথরের এই আকৃতি উদ্যান। ইলেক্ট্রিসিটি নেই। ডাইনিং হল তো দূরস্থান প্রথামত খাবার টেবিলও নেই কোনও। জঙ্গলের চোরাই কাঠে তৈরি আসবাব কিংবা ঘরবাড়িতে পাহাড় পাগল শ্রীবিশ্বাসের আগ্রহ নেই বলে বাগানের মাঝখানে কাঠ ও পলিথিন শীটের ছোট ছাউনির নীচে যেমন-তেমন বেঞ্চি টেবিলে বসে কিংবা আশপাশে ফোল্ডিং টেবিল পেতে গরম গরম ভাত-রুটি, সাদামাটা ডাল-তরকারি, চিকেন কিংবা আন্ডাকারি। ছোট্ট গাছের ডালে ঝোলে মোমবাতি-লণ্ঠন। আর দিনে আছে পূর্বকথিত সেই যেখানে খুশি বসে খাওয়ার স্বাধীনতা। তার আগে স্নান সেরে আসা খঞ্জন পাখির মতো ছটফটে মূর্তির গা-জুড়নো, গা-ভাসানো জলে। ঈষৎ নীলচে তরল কাচের ধারা যেন সেই জল। ত্রিশ ফুট ওপর থেকেও তার নীচের প্রতিটি পাথর স্পষ্ট দেখা যায়। অবিশ্বাস্য। কাছাকাছি কোনও দোকান-বাজার নেই, বিছানা নেই ফোম কি ডানলোপিলো। হ্যাঁ, রানিং ওয়াটার আছে। নদীস্নানে অনিচ্ছুকদের জন্য আছে সাদামাটা স্নানঘরও। ফিল্টার আছে বটে কিন্তু ঠান্ডা জল একেবারে অমিল। নেপালি প্রতিবেশিনী অবিশ্বাসনীয় কঠিন পরিশ্রমে পাহাড়ের

গায়ে কেটেছেন কুণ্ড। ঝরনা থেকে এসে জমা-হওয়া জলে সেখানে খেলা করে নদীর মাছ। কপালে থাকলে অতিথিদের রসনা পরিতৃপ্তও করে তারা। স্যালাডের ডিশে দেখা দেয় পাথুরে বাগানের একপাশে আজ্ঞানো ধনেপাতা গাজর কাঁচালঙ্কার টাটকা সুবাস।

তবু যদি জীবনকে দেখতে চায় কেউ কৃত্রিম উপচারের খোলা সরিয়ে একেবারে সরলভাবে, সে হয়তো আশ্চর্য শান্তি ও প্রাচুর্যের বোধ পাবে এই নীল-কালো-সবুজ ভূখণ্ডে এসে। স্কুল-কলেজের তরুণ-তরুণীরা, যাদের কাছে জীবন এখনও টাটকা দাগ-না-পড়া আশায় সমুজ্জ্বল, যারা এখনও কৌতূহল নামে সেই ম্যাজিক পাথরের মালিক— তাদের জন্য এখানে আছে পৃথিবীর খোলামুখ, আলো ঝলমল চোখ। এখানে এলে তারা চিনবে পাথরের চেহারা, শিখতে পারবে রক ক্লাইম্বিংয়ের মজা, গাছের ডাল-লতা বেয়ে আসা-যাওয়া, বনের পথে নিশানা রাখবার যে সব নিয়ম সারা পৃথিবীতে চলিত আছে সে সবও। শিখবে গভীর জঙ্গলে, মরুতে কি পাহাড়ে পথ হারালে রাতের আশ্রয় খুঁজে বার করা, খাদ্য ও পানীয় তৈরির কৌশল, বাঁধা জীবনের স্বপ্নে হঠাৎ দেখা দিয়ে যাওয়া অ্যাডভেঞ্চারের ঝলক। ব্যবস্থা আছে প্রকৃতির কোলের কাছে বসে পরিবেশের পাঠ নেওয়ার— ভূগোল, জীবনবিজ্ঞান কি পরিবেশ বিজ্ঞানের। এমনকী এসবের শিক্ষার্থী নয়, কখনও অভিযাত্রী হবে না এমন যে মানুষ, তাকে তো জেনে নিতে হবে কোন বিশ্বপ্রকৃতি, কী পরমাশ্চর্য সৌন্দর্যসম্ভার সে পেয়েছে উত্তরাধিকারে যা সে রেখে যেতে চায় নিজের সন্তানদের জন্য। তাকে শিখতে হবে জলমাটি ও প্রাণের রহস্য, রূপ আকৃতি ও বর্ণের উৎসব।

তাই, বছরে তিনশো পঞ্চাশ দিন স্বকৃত দাস থাকার পর দশ-বারো-পনেরো দিনের জন্য সুখপ্রয়াসী, সাফল্যপ্রয়াসী কাঙাল অকিঞ্চন যাক প্রাকৃতিক মুক্তিতে। নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে ধুয়ে নিক নতুন বোধের স্নানে।

শিলিগুড়ি থেকে সেবক হয়ে জলপাইগুড়ির পথে ঘণ্টা দুই, মালবাজারের পর সামসিং চা-বাগান। সেখান থেকে গাড়ি পাওয়া যায় কিন্তু যে কোনও পিপাসু ব্যাগ কি রুকস্যাক কাঁধে পিঠে ফেলে ট্রেক করবে সেই তিন কিলোমিটার পাহাড়ি পথ যার দুপাশ সাজানো কমলালেবু বাগান, অর্কিডের অলৌকিক গয়না পরা লম্বা লম্বা ছায়াঘন গাছের সারি আর বারবার খরগোশ বাচ্চার মতো একপাশের পাহাড় থেকে পথের ওপর লাফিয়ে পড়েই বনের তলায় পালিয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট ঝরনা।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৩

সবান্ধবে বান্ধবগড়ে

সব্যসাচী চক্রবর্তী

প্রতিবছরই দু-তিনবার করে জঙ্গলে বেড়াতে যাই। জঙ্গলই আমি ভালোবাসি, জঙ্গলই আমাকে বেশি টানে, তা সে জঙ্গল সমতলে হোক, পাহাড়ে হোক, সমুদ্রতীরে হোক বা মরুভূমির মাঝেই হোক। জঙ্গল মানে গাছপালা-ঝোপঝাড়ই শুধু নয়। জঙ্গল বলতে আমি সেইসব জায়গাকে দেখি ও ভালোবাসি, যেখানে মানুষের ঘনবসতি নেই। যেখানে কারখানার রাসায়নিক জল নদীতে পড়ে না, চিমনির বিষাক্ত ধোঁয়া বাতাসে ভাসে না। অজস্র গাড়ির ধোঁয়া ও আওয়াজ নেই। সিমেন্ট, লোহা, কাচ ও প্লাস্টিকের ছড়াছড়ি নেই। জঙ্গল মানে প্রকৃতির আধিপত্য! যেখানে সূর্যের তাপ, নদীর জল, মেঘের আনাগোনা, বায়ুর ঝাপটা, এইসবই রাজত্ব করে, আর করে গাছপালা-বালি-পাথর ও লক্ষ লক্ষ কীট-পতঙ্গ, হাজার-হাজার পাখি, শয়ে-শয়ে জীবজন্তু, সেটাই জঙ্গল, সেটাই স্বর্গ, সেটাই প্রাণ, সেটাই আমার ভালোবাসা। এমন এক জায়গা হল 'বান্ধবগড়'। মধ্যপ্রদেশের উত্তরদিকে।

আমার ছ বন্ধু, শ্বশুর-শাশুড়ি, মা, স্ত্রী ও দুই পুত্র সহ ১৩ জন যাত্রা করলাম 'বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান'-এর উদ্দেশে। আমি আমার স্ত্রী মিঠু, ছেলেরা গৌরব ও অর্জুন, মা মণিকা। বন্ধুরা চিত্রভানু, প্রশান্ত, দেবাংশু, বিশ্বজিৎ, শিবু ও প্রণবদা। শ্বশুর অমরনাথ সান্যাল, শাশুড়ি অর্চনা সান্যাল। মে মাসের শেষ, জুন মাসের শুরু। মধ্যপ্রদেশে সবচেয়ে বেশি গরম। এইরকম সময়েই জীব-জন্তুরা বেরিয়ে পড়ে জলের খোঁজে। তাই এটাই তাদের চাক্ষুষ করার সবচেয়ে ভালো সময়। (যদি গরমটা সহ্য করার ক্ষমতা থাকে!) আমরা এগারোজন রওনা হলাম হাওড়া থেকে বম্বে মেলে। আমার দিল্লিনিবাসী শ্বশুর-শাশুড়ি প্রায় একই সময় রওনা হলেন দিল্লি থেকে। তাঁদের উৎসাহ ও আমার মার উৎসাহের কাছে আমাদের উৎসাহটা অনেক মলিন বোধ হল। এলাহাবাদ পৌঁছনোর আগেই টের পেলাম বান্ধবগড় কীরকম গরম হবে। কারণ এলাহাবাদ পৌঁছনোর আগের থেকেই 'লু' বইতে আরম্ভ করল। তাপমাত্রাও তখন আন্দাজ ৪৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উঠে গেছে! সকলকে বলা ছিল গরম 'লু' থেকে বাঁচতে হলে সারা শরীর ঢেকে রাখতে হবে যাতে ঘাম উবে না যায়। ঘামটাকে জামার নীচে আটকে রাখতে হয়, না হলেই ডি-হাইড্রেশন এবং সান স্ট্রোক। প্রচুর পরিমাণে নুন-জল খেতে হয় এবং পেট খালি রাখতে নেই।

সকলেই সেটা মেনে চলল এবং যদিও সবাই মুখে বলছিল— 'উরেব্বাস!' —'বাপরে!' —'মরে গেলাম!' —'উফ!' —ইত্যাদি, কিন্তু কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েনি।

সাতনা স্টেশন পৌঁছনোর ঘণ্টাতিনেক আগেই খাবার জল শেষ! এলাহাবাদের পরের স্টেশনেই বড় জলের পাত্র নিয়ে নেমে পড়লাম আমি ও দেবাংশু। সে হ্যান্ড পাম্প দেখে, খুব জোরে জোরে পাম্প করতে থাকল, কিন্তু আমি পাত্র নিয়ে পৌঁছনোর আগেই গোটা তিনেক লোক বিভিন্ন মাপের পাত্র নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেল। দেবাংশু পাম্প করে চলল, এদিকে অনেকেই পাত্র নিয়ে আসছে, আমি দেখলাম উপায় নেই, অভদ্র হতেই হচ্ছে; অতএব ধাক্কা দিয়ে তৃতীয় পাত্রটি সরিয়ে আমি আমাদের পাত্রটা বসিয়ে দিলাম। জল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আমি ও দেবাংশু ট্রেনের কামরার দিকে হাঁটা দিলাম। ততক্ষণে জল ভরা নিয়ে একটা বচসা শুরু হয়ে গেছে! আমরা কামরায় ফিরে দেখলাম, সবাই পাম্প থেকে চলে গেল। কারণ একজন ষণ্ডা-মার্কা লোক দেবাংশুর দায়িত্বটা পালন করতে গিয়ে হ্যান্ডেলটা ভেঙে ফেলেছে! ট্রেন হুইসল দিয়ে আবার চলতে শুরু করল। খানিক এগনোর পর বাইরে তাকিয়ে দেখলাম ধু-ধু প্রান্তর! কিছু ক্যাকটাস গাছ আর বালি! দেবাংশু গোল-গোল চোখে আমায় জিজ্ঞেস করল— 'আমরা জঙ্গলেই যাচ্ছি তো?' আমি বললাম— 'অবশ্যই।' দেবাংশু আশ্বস্ত হল কিনা বোঝা গেল না। কারণ সে চুপ করে বাইরেই তাকিয়ে রইল। তখন রেল কামরার কাঠ ও রেক্সিন ছুঁলেই ছ্যাঁকা লাগছে!

কটায় সাতনা পৌঁছলাম মনে নেই। তখন প্রায় বিকেল হওয়ার যোগাড়। প্ল্যাটফর্মে নেমে যে হাওয়াটা পেলাম সেটা কোনও মতেই ৪৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নয়, বেশিই হবে। রিটায়ারিং রুম থেকে বেরিয়ে এলেন আমার শ্বশুর ও শাশুড়ি, তাদের দেখে বোঝার উপায় নেই যে 'লু' বইছে। তার দুটো কারণ, এক নম্বর— তাঁরা দিল্লির গরমে অভ্যস্ত আর দু নম্বর— তাঁরা আমাদের অনেক আগে সাতনা পৌঁছে গরমটা সইয়ে নিয়েছেন। দুখানা সুমো গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম বান্ধবগড়ের উদ্দেশে। সাতনায় সবাই নুন-চিনি দিয়ে লস্যি খেল, আইস বক্সে বরফ কিনে ভরা হল এবং ২৪ বোতল বিয়ার কেনা হল। বিয়ার খাওয়ার লোক আটজন, তবুও বান্ধবগড় পৌঁছতে পৌঁছতে ২৪টা বোতল খালি হয়ে গেল! আমাদের এম পি ট্যুরিজমের হোটেল বুকিং করাই ছিল, চারটে ডাবল বেডেড রুমে ১১ জন অ্যাডাল্ট এবং দুজন বাচ্চা ঢুকে পড়লাম। প্রত্যেকটি ঘরে এয়ারকুলার থাকার দরুন রাতটা আরামে ঘুমনো গেল।

আগে থেকে বলা ছিল, সকাল ৬টার মধ্যে দুখানা হুডলেস মারুতি জিপসি এসে হাজির হল। একটায় ছ জন অন্যটায় সাতজন চড়ে বান্ধবগড় টাইগার রিজার্ভের গেটে উপস্থিত হলাম। সেখানে আরও অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সবকটিতে ট্যুরিস্ট ভর্তি। সবাই এন্ট্রি পারমিট করিয়ে, টাকাপয়সা জমা দিয়ে প্রবেশ করলাম ভেতরে। প্রত্যেকটি গাড়ির চালক ছাড়া একজন করে গাইড নেওয়া বাধ্যতামূলক। এই গাইডরা জাতীয় উদ্যানের কর্মী নয়, তারা ফ্রি-ল্যান্সার এবং

প্রত্যেককেই পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হয়, তারপর তারা রেজিস্টার্ড গাইড হয়। আমাদের দুটি গাড়িতে দুজন উঠে পড়ল।

জাতীয় উদ্যানে ঢুকে দেখা গেল অনেক জায়গায় গাছ ভেঙে পড়ে আছে রাস্তার ধারে, বা জঙ্গলের ভেতর দিকটায়। এই গাছগুলো হয় পোকায় খেয়ে ফেলেছে বা বয়সের ভারে মরে গেছে। কিন্তু এগুলোকে সরানো হয় না বা কাটা হয় না, এগুলো ওইখানেই পচে এবং পরবর্তীকালে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। তবেই না জঙ্গল আরও বাঁচার রসদ পাবে। এটাই তো ইকো-সিস্টেম। জাতীয় উদ্যানের ভেতর গরু-ছাগল নিয়ে প্রবেশ করা নিষেধ, এখানে ধূমপান করা নিষেধ, জোরে কথা বলা বা কোনও রেডিও অথবা টেপ চালানো নিষেধ, গাড়ির হর্ন বাজানো নিষেধ, গাড়ি থেকে নামা নিষেধ, জঙ্গল থেকে কিছু তোলা নিষেধ। শুধু ছবি তোলা যায় আর দেখা যায়, প্রাণভরে নিশ্বাস নেওয়া যায়, গাছপালা ও জন্তু-জানোয়ারদের দূর থেকে ভালোবাসা যায়। মনে রাখতে হয় এটা জীব-জন্তুদের বাড়ি, আমরা সেখানে অনধিকার প্রবেশ করেছি। জন্তুরা আমাদের ডেকে আনেনি, আমরা তাদের বাড়িতে জোর করে ঢুকে পড়ে, তাদের দেখছি। আমরা সেখানে অপ্রয়োজনীয়। তবুও ওরা আমাদের মারে না, তাড়িয়ে দেয় না, গালিগালাজ করে না, পুলিশ ডাকে না, কিছুই করে না, শুধু ভয়ে লুকিয়ে পড়ে। ওরা নিজেদের মতো বেঁচে থাকতে চায়।

বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যানে প্রায় সবকিছুই দেখা যায়। হরেকরকম পোকা-মাকড়, নানা প্রজাতির পাখি, সাপ-ব্যাঙ-গিরগিটি, চিতল হরিণ, সম্বর, হগ ডিয়ার, নীল গাই, শুয়োর, বাঁদর, বাইসন, শেয়াল, লেপার্ড, প্যান্থার, বাঘ। তবে হাতি নেই, গণ্ডার নেই। হাতি আছে গোটাকয়েক শুধু পর্যটকদের নিয়ে ঘোরাবার জন্য, সবই পোষা। একরকম টাইগার-শো হয়, যেটায় আমার বেজায় আপত্তি। বাঘ পাওয়া গেলে তাকে দু-চারটে হাতি দিয়ে ঘিরে, অন্য কয়েকটা হাতিতে লোকজন তুলে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকা লাগে। ওভাবে বাঘ দেখার কোনও মানেই হয় না। হয় বাঘটা একটা জন্তু মেরে খাচ্ছিল বা আরাম করে ঘুমোচ্ছিল, তখন তাকে ঘেরা হয়েছে, বা সে অসুস্থ বা ক্লান্ত তাই তাকে এক জায়গায় বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। জঙ্গলের সম্রাট যদি হেঁটে বা দৌড়ে না বেড়ায়, তবে আর মজা কী? এ তো চিড়িয়াখানা নয়। বলুন?

ঘুরতে ঘুরতে সবচেয়ে বেশি যা নজরে পড়ে তা হচ্ছে চিতল হরিণ। মাঝে মাঝে বিরাট একটা দল; আবার মাঝে মাঝে পাঁচ-ছটা, হয় ঘাস-পাতা খাচ্ছে বা দৌড়ে রাস্তা পার হচ্ছে অথবা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছে। এরাই বাঘ, চিতাবাঘ, শেয়াল এবং বুনো কুকুরের প্রধান খাদ্য। তাছাড়া শুয়োর, বাঁদর, সম্বর ইত্যাদি তো আছেই। জঙ্গল ঘুরে প্রচুর ময়ূর, নীলকণ্ঠ পাখি, সারপেন্ট ঈগল, ফিশিং আউল এবং দুটি জ্যাকল পেলাম। দু-চারটে শুয়োরও দেখলাম, তবে বাঘ জাতীয় কোনও জন্তুর দেখা পেলাম না। ছবি প্রচুর তুললাম, প্রণবদাও তুলল। সাড়ে নটায় গেট দিয়ে বেরিয়ে

এসে একটি জল-খাবারের দোকানে ঢুকে পুরি-সবজি এবং গোলাপজাম খেলাম।

তারপর আবার ট্যুরিস্ট হাটে ফিরে বিশ্রাম। সামনে দাঁড়িয়ে একটা ছবিও তোলা হল। মারুতি জিপসি দুটোকে বলা হল আবার বিকেল সাড়ে চারটেয় আসতে। ইতিমধ্যে সকলে স্নান সেরে ফেলল। ট্যাঙ্কের জলে চান করা অসম্ভব, তাই বালতিতে ভরে অল্প ঠান্ডা করে নিয়ে তারপর গায়ে ঢালতে হত। দুপুর দুটোয় রেস্টুরেন্টে যাবার সময় একটা ছায়ায় থার্মোমিটার টাঙানো দেখলাম, ভানু সেটা একবার দেখে আমার দিকে চোখ গোল-গোল করে তাকিয়ে ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে রেস্টুরেন্টের দিকে হাঁটা দিল। পরে খেতে বসে আমায় বলল— 'থার্মোমিটারের দাগটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে লেখা ৪৮!' আমি খানিক ভেবে ওকে বললাম— 'বাকিদের বলিস না। বুঝলি তো, সাইকোলজিক্যালি অনেকে অসুস্থ বোধ করতে পারে।' ও-ও মাথা নেড়ে সায় দিল।

দুপুরের খাবারে প্রচুর মশলা ও নুন ছিল। সেটাই আবশ্যক। ওখানকার লোক তাই খায়। বডি সল্ট রিপ্লেনিশমেন্ট। দুপুরে ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রাম নিয়েই আবার বেরিয়ে পড়লাম। এবারে দুজন অন্য গাইড, তবে এন্ট্রি ফি আর নতুন করে দিতে হয় না। সকালের পারমিটটাই ভ্যালিড। গাইড আমাদের সোজা নিয়ে গেল একটি পুকুরের ধারে। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে সবাইকে বলা হল চুপ করে বসে থাকতে। গ্রীষ্মের বিকেলে কিছু পাখির ডাক আর বাঁদরদলের কিচিরমিচির ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। মাঝে মধ্যে একটা ঝিঁঝি পোকা। বসে আছি তো বসেই আছি। গাইডরা একদৃষ্টে পুকুরের অন্যপ্রান্তে তাকিয়ে বসে রইল, প্রায় মিনিট দশ-বারো একভাবে বসে আছি আর ফিসফিস করে কথা বলছি। হঠাৎ গায়ে পড়ল কয়েকটা জলের ফোঁটা, তারপর আরও অনেকটা। ভাবলাম মেঘহীন আকাশ থেকে বৃষ্টি কীভাবে? তারপরেই ওপরে তাকিয়ে দেখি, একটি হনুমান তার জলীয় ত্যাগটি আমার মাথা লক্ষ্য করেই করেছেন। অগত্যা আমি সকলের হাসির পাত্র হলাম। হঠাৎ গাইডরা একসঙ্গে বলে উঠল— 'চুপ রহিয়ে, ওয়ো আ রহী হ্যায়!' আমরা ভাবলাম 'কোন নারীর কথা বলছে ওরা'? হঠাৎ পুকুরের ওধার থেকে উঠে এলেন রাজরানি স্বয়ং! 'সীতা'— যাকে সবাই বলে 'বান্ধবগড় কি রানি'। বান্ধবগড়ের সবচেয়ে বিখ্যাত বাঘিনী, যে তার জীবদ্দশায় ২১টি বাঘ ও বাঘিনীর জন্ম দিয়েছে! তার স্বামীর নাম— 'চার্জার'! যার অভ্যেস ছিল ট্যুরিস্টদের চার্জ করে ভয় দেখানো। এখন চোখের সামনে আমাদের সেই 'সীতা'। খানিক পরেই এসে উপস্থিত হল তার ২২ মাসের ছেলে, আয়তনে মা-র থেকে সামান্য ছোট। মা ও ছেলের জল-খাওয়া, জলে খেলা ও শেষমেশ চলে যাওয়া আমরা উপভোগ করলাম ২০-২৫ মিনিট ধরে। আমার ও প্রণবদার ক্যামেরার শাটারের আওয়াজে মা ও ছেলে বিন্দুমাত্র আপত্তি করেনি। আমাদের সৌভাগ্য।

পরদিন ভোরে আবার সেই জঙ্গল ভ্রমণ। সেই দিন গরম যেন আরও বেড়ে গেল পরে থার্মোমিটারে ৪৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দেখেছিলাম। সেদিন আমাদের গাইড গাড়ি

থামিয়ে একটা ঝরনা থেকে খাওয়ার জল ভরতে নেমেছিল। দুর্ভাগ্যবশত তখনই ফিল্ড ডিরেক্টর গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই গাইডকে সাসপেন্ড করলেন এক সপ্তাহের জন্য! আমার খুব খারাপ লাগল। সেদিন সন্ধেবেলা ফিল্ড ডিরেক্টর বান্ধবগড়েই ছিলেন। আমি আর ভানু তার সঙ্গে দেখা করে গাইডকে ডিউটিতে ফেরানোর জন্য অনুরোধ করলাম। বললাম যে তাকে তো আমাদের বোতল থেকে জল দিতে পারতাম, দিইনি কারণ সঙ্গে মহিলা ও বাচ্চারা ছিল, তাদের জলের অভাব হতে পারত, তাই। যদি দোষ কারও হয়ে থাকে, তবে সে আমার। আমাকে শাস্তি দিন, ওকে মাফ করে দিন। ফিল্ড ডিরেক্টর বললেন, তিনি ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন। পরদিন সকালে জঙ্গলে ঢোকার সময় দেখলাম সেই গাইড ডিউটিতে দাঁড়িয়ে আছে। আমায় নমস্কার জানাল, আমিও প্রতি নমস্কার জানিয়ে একটা স্যালুটও ঠুকে দিলাম। সে মুচকি হাসল। জঙ্গলের এবার একটু পাহাড়ি অঞ্চলে নিয়ে গেল আমাদের গাইডরা। সেখানে বাঁশ-বন আছে এবং গাছপালা বেশ ঘন। গাইড বলল, এদিকটায় বাঘরা বেশি থাকে। অনুভব করলাম এইখানটায় গরমও কম। ভেতরদিকটায় যতদূর দেখা যাচ্ছিল দেখলাম রোদ বেশ কম পৌঁছয়। হঠাৎ গাইড আমাদের গাড়ির চালককে বলল, 'রোক লে!' গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। অন্যটাও আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। দুই গাইড কী কথা বলল, তারপর গাড়ি দুটো আস্তে আস্তে এগোতে থাকল। হঠাৎ আমাদের চালক গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়ে বাঁদিকের ঝোপঝাড়ের দিকে আঙুল তুলে বলল— 'ওয়ো দেখিয়ে বৈঠি হ্যায় ওঁয়াহা পেড় কে পিছে।' আমি কেন, গাড়িতে অন্যরা সবাই তাকিয়েও কিছুই দেখতে পেল না। গাইড আবার আঙুল দেখিয়ে বলল, 'সীধা দেখিয়ে। ওয়ো বৈঠি হ্যায়।' আমি ৪০০ মিমি টেলিলেন্স লাগিয়ে ক্যামেরা চোখে লাগিয়ে ফোকাস করার সঙ্গেই দেখলাম একটি বাঘিনীর মাথার পিছনদিকটা। সে আস্তে করে ঘুরে আমাদের দিকে দেখল, তারপর আবার মাথা ঘুরিয়ে নিল। আমি ভাবলাম— যাঃ, ছবি আর পাওয়া গেল না। হঠাৎ সে উঠে হাঁটা দিল, আমরাও রাস্তা বরাবর চলতে থাকলাম। গাছের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ল আরও দুটো বাঘ! আমি আনন্দে বলে উঠলাম, 'দো আউর হ্যাঁয়!' গাইড বলল, 'তিন আউর হ্যাঁয়। মোহিনী আউর উসকে তিন বচ্চে। বি-১, বি-২, বি-৩।' হঠাৎ আমাদের পিছন থেকে আরেকটা জিপসি এগিয়ে এল এবং ওভারটেক করল। আমরা তাদের হাত দেখাতেই তারা আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তাতে প্রচুর লোক কথা বলতে আরম্ভ করল, বাচ্চারা চেঁচাতে শুরু করল, আমি দেখলাম সেরেছে, আর মোহিনী বেরোবে না। ইতিমধ্যে উল্টোদিক থেকে আরও দুটো জিপসি তাদেরও আমাদের গাইড হাত দেখিয়ে থামতে বলল। তারাও ভাগ্যক্রমে থামল। আমি দেখলাম সামনের গাড়ির লোকজন উঠে দাঁড়িয়েছে, অতএব আমার ক্যামেরার সামনে শুধু লোক। আমি সময় নষ্ট না করে তড়াক করে জিপসির মাঝখানের রোলকেজের বারটার উপর উঠে গেলাম, ভানু আমাকে পিছন থেকে সাপোর্ট দিল। আমি ক্যামেরা তাক করলাম।

এইবার মোহিনী বাঁদিকের জঙ্গল থেকে মুখ বার করে একবার আমাদের দেখল, অন্যদিকের গাড়িগুলোও দেখল তারপর ধীর পায়ে রাস্তা পেরিয়ে ডানদিকে চলে গেল। তারপর ধীরগতিতে বেরোল একটি বাচ্চা, সেও প্রায় আয়তনে মোহিনীর সমান, রাস্তা পার হয়ে চলে গেল। তারপর দ্রুতগতিতে রাস্তা পেরিয়ে ডানদিকে চলে গেল দ্বিতীয় বাচ্চাটা। ছবি পেলাম না। তৃতীয় বাচ্চাটা মুখ বার করে দুদিক দেখল, আবার বাঁদিকেই ঢুকে গেল। রাস্তা পেরোল না। গাইড বলল— 'ইয়ে বি-২ হ্যায়, ডরপোক হ্যায়।' খানিক অপেক্ষার পর দেখলাম মোহিনী ফিরে এল, আবার বি-২-কে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল। আমি এতই মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম যে ছবিই তোলা ভুলে গেলাম মা ও ছেলের।

এই বাচ্চাগুলোর বাবাও চার্জার। সেই 'চার্জার', যার দাপটে বান্ধবগড়ে আর কোনও বাঘ তার সামনে আসতে সাহস পায় না! এইরকম পুরুষ বাঘ যদি কোনও পুরুষ বাচ্চাকে পায় তার রাজত্বের ভেতর, তাহলে সেই বাচ্চাকে সে মেরে ফেলবেই, যাতে সেই পুরুষ বড় হয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে ওঠে। তাই মা-রা পুরুষ বাচ্চাগুলোকে বেশি আগলে রাখে। কিন্তু সেই চার্জার নাকি সীতার একটি পুরুষ বাচ্চাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিল। তাকে নাকি কিছুই বলত না। সে বাচ্চাটি চার্জারকে হাজার বিরক্ত করলেও না। সেদিন 'চার্জার', 'মোহিনী' আর 'সীতা', ও তাদের পরিবারের বাঘ-বাঘিনীদের গল্প শুনতে-শুনতেই জঙ্গল ঘোরা হল। আমি মুগ্ধ হয়ে শুধু শুনলাম আর তাদের আরও ভালোবেসে ফেললাম।

সেই বিকেলের ঘোরায় আলাপ হল অ্যালফোন্স রয়-এর সঙ্গে। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ওয়াইল্ড সিনেমাটোগ্রাফার। সে তখন প্যারট্রিজ ফিল্মস, ইউ কে-র হয়ে একটা সিরিজ বানাচ্ছিল— 'সীতা, মাদার অব অল টাইগারস'। অ্যালফোন্স তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে নিয়ে ছবি তুলছিল একটি বিশাল ময়াল সাপের, যে একটা বাঁদরকে ধরে আস্তে আস্তে খাওয়ার চেষ্টা করছিল। সেই বিকেলে আরও কত কী দেখলাম আমরা— একটা গাছ বেয়ে উঠছে একটা চার ফুট লম্বা মনিটর লিজার্ড— একদল সম্বর হরিণ ঘাস খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে মাথা তুলে দেখছে যে কেউ তাদের শিকার করতে আসছে কিনা— দুটো ব্ল্যাক-হেডেড ওরিওল গান গাইছে— একটা লেসার অ্যাডজুটেন্ট স্টর্ক খাবার খুঁজছে— একদল ব্ল্যাক নেকড্ স্টর্ক দাঁড়িয়ে আছে— একটা নীলকণ্ঠ পাখি জল খাচ্ছে— প্রচুর ময়ূর— ইত্যাদি। দূরে বান্ধবগড়ের কেল্লা (পাহাড়ের ওপর)— এইসব দেখে সেদিনের মতো ঘোরা শেষ হল। সেদিনও তাপমাত্রা উঠেছিল আটচল্লিশের সামান্য বেশি! সন্ধেবেলা ফিরে নুনজল, মশলাযুক্ত খাবার আর চান। চান করে গা মুছতে হত না, এমনিই শুকিয়ে যেত। তোয়ালে কেচে মেলে দিলে দশ মিনিটে শুকিয়ে যেত। তবুও কেউ অসুস্থ হইনি। সেই রাতে সবাই আমাকে হতবাক করে দিয়ে বলেছিল— '৪৮/৪৯ তো কী হয়েছে? আমরা যথেষ্ট সাবধানতা অর্জন করেছি। তুমি নিজেকে সামলাও।' পরদিন গাইডের সঙ্গে আমরা গেলাম পাহাড়ের ওপর, বান্ধবগড় কেল্লার

পাদদেশে। সেখানে গিয়ে দেখি ভগবান বিষ্ণুর একটা বিশাল মূর্তি, শোয়া অবস্থায়। নাম 'শেষ শয্যা'। সেই মূর্তির পায়ের দিক থেকে উৎপন্ন হচ্ছে একটি জলের স্রোত। চারপাশে একটি পাঁচিল ঘেরা জলের আধার, সেখান থেকে সেই জলের স্রোত পাহাড় বেয়ে নীচে নেমে যায়, নাম 'চরণ গঙ্গা'। এই চরণ-গঙ্গাই হচ্ছে বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যানের মূল জলের উৎস। পাহাড়ে ওঠার পথে পড়ে কয়েকটি গুহা। দেখে মনে হয় বহু হাজার বছর আগে মানুষের বসবাস ছিল। গুহার মধ্যে খোদাই করা অনেক লেখা। বিশ্বজিৎ দেখে বলল, 'ব্রাহ্মলিপি!' গাইড বলল, এই কেল্লার একটা কথিত ইতিহাস আছে। লঙ্কা জয় করে সীতাকে নিয়ে অযোধ্যা ফেরার পথে লক্ষ্মণকে এই কেল্লাটি উপহার দেন রাম। সেই থেকেই এই কেল্লার নাম 'বান্ধবগড়'। কেল্লা দেখে ফেরার পথে, কেল্লার পিছনদিকের জঙ্গলটাও ঘুরে আসা হল। সেখানে পেলাম কিছু নীলগাই।

বিকেলে পেলাম কুট্টাপ্পান সাহেবের হাতিতে চড়ার সুযোগ। ওই একটি মানুষ, যিনি বহু বছর ধরে এই বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যানের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। বহু নামী-দামি ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফারকে নিয়ে জঙ্গল ঘুরেছেন। বহু উপহারও পেয়েছেন, বাহবা পেয়েছেন এবং ভালোবাসা পেয়েছেন। তাঁর নিজের তোলা বহু ছবি পৃথিবীর বড় বড় পত্র-পত্রিকায় ছেপেও বেরিয়েছে। আজ তাঁর ছেলেরা গাড়ি চালিয়ে ট্যুরিস্টদের নিয়ে বেড়াতে যায়। কুট্টাপ্পন সাহেব এখন মাঝে মাঝে অসুস্থতার কারণে বিশ্রামে থাকেন। এই কুট্টাপ্পানবাবু, তাঁর হাতিতে আমাকে ঘুরিয়ে আমায় বহু ছবি তুলিয়ে দিলেন। ক্রেস্টেড সারপেন্ট ঈগল, প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার, সম্বর ফ্যামিলি, ওয়াইল্ড বোর, ব্ল্যাক-আইবিস, ব্রাউন ফিশিং আউল, হক ঈগল ইত্যাদির। পরবর্তীকালে আমাকে 'বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি' বিষয়ক ছবির প্রদর্শনীতে তিনি তাঁর তোলা চারটে ছবিও দিয়েছিলেন।

আজ 'চার্জার' নেই। বি-২-র আক্রমণে আহত হয়ে, কিছুদিন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সেবা-শুশ্রূষায় বেঁচে ছিল, তারপর সে মারা যায়। তার নামে একটা জায়গা তৈরি করে রাখা আছে, নাম 'চার্জার পয়েন্ট'। এখন বান্ধবগড়ে চার্জারের স্থান অধিকার করে বসে আছে, রাজা বি-২! বি-১ আর বি-৩ও বি-২-কে এড়িয়ে চলে। মনে পড়ে গাইডের কথা? 'ইয়ে বি-২ হ্যায়। সবসে ডরপোক!' হাঃ ডরপোক রাজা?!

আজ সীতাও নেই। চোরাশিকারিদের হাতে প্রাণ দিয়েছে না বয়সের ভারে গত হয়েছে, জানা নেই। তবে নিকটবর্তী একটি গ্রামে তার হাড়গোড় পাওয়া যায়। তবু বান্ধবগড় বেঁচে আছে। থাকবেও, যদি আমরা সচেতন হই। যদি আমরা স্বার্থপর না হই। আমরা যারা জানি-বুঝি, যদি অন্যদের বোঝাই, সে দায়িত্ব যারা জানে না, তাহলে আগামী পৃথিবী আরও সুন্দর হতে বাধ্য!

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৩

লাসা

সমীর রায়

নদী যে ঠান্ডায় জমে গিয়ে ফুটবলের মাঠ হয়ে যেতে পারে, লাসা শহরে না এলে এ অভিজ্ঞতা হয়তো কোনদিনই হত না। শহরের নামে নদী, নাকি নদীর নামেই শহর, এ তথ্য তিব্বতের রাজধানীতে আমাকে কেউ দিতে পারেননি। তবে নদীর সঙ্গে শহরের একাত্মীকরণ দেখলে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

লাসা নদী বয়ে গেছে লাসা শহরের প্রায় শরীর বিদীর্ণ করে। তখন জানুয়ারির শীত। নদীর ধার বরাবর সারি সারি পাতাহীন গাছ। পাতা না থাকলেও কয়েকটিতে আবার নানা রঙের মরসুমি ফুল ফুটেছে। তাদের ওপর চড়া রোদের ছটা। ওই একই রোদ নদীর জমে থাকা বরফের ওপরেও। সেই রোদ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে বরফ থেকে। ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ। কোথাও আবার বরফের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে রামধনুর রঙের বাহার। সেই রঙের ওপর দিয়ে পাখি উড়ে গেলে মাঝপথেই শিলুয়েট হয়ে যাচ্ছে তারা।

পাতাহীন গাছের ডালে সারি দিয়ে বসে আছে এক দঙ্গল চড়াইপাখি। দেখতে অবিকল কলকাতার চড়াইপাখির মতো। বারো হাজার ফুট উঁচু তিব্বতের এই শহরেও একইরকম ছটফটানি ওদের। অত ঠান্ডাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই কোনও। ডাল থেকে ডানা মেলে নদীর মধ্যে চলে যাচ্ছে অনেক দূর পর্যন্ত। তারপর ঘুড়ির মতো গোত্তা খেয়ে আবার ফিরে আসছে ডালে।

নদীর ঠিক মধ্যিখানে ঝকঝকে বরফের ওপর দু'ধারে দুটি গোলপোস্ট পুঁতে একদল শিশু ফুটবল খেলায় মত্ত। স্কেটিং শু নয়, সাধারণ বুট জুতো পরেই খেলছে। দূর থেকে রেফারির বাঁশির শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল, অনেক-অনেক বছর আগে রাশিয়া থেকে কলকাতার গড়ের মাঠে খেলা দেখাতে এসেছিল 'হলিডে অন্ আইস'। সেখানে কৃত্রিম উপায়ে জমানো হয়েছিল বরফ। অথচ লাসা নদীর এমন বরফ হয়ে যাওয়া কিন্তু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। এই সময়ে লাসার মানুষ নদী পারাপার করেন সাইকেলে চেপে। এখন লাসা নদীর ওপর মোটর সাইকেলের রেস হয়। নদীর ধারে, যেখানে বরফের আস্তরণ একটু পাতলা, মাইগ্রেটরি হাঁসেরা সেখানে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে-ঠুকরে বরফ ভাঙছে। সম্ভবত জ্যান্ত মাছ খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে। তিব্বতী মেয়েরা বরফের ওপর ঘুরে

ঘুরে রোদে চুল শুকোচ্ছে। রক্তিম পোশাকে এক বৃদ্ধ লামা নদীর ওপাড় থেকে এপারে আসছেন ধর্মচক্র ঘোরাতে ঘোরাতে। গায়ে এক ফোঁটাও গরমজামা নেই। অনেক দূরে লাসা ব্রিজের তলা দিয়ে এক ঘোড়সওয়ারকে দুলকি চালে এগিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। এখানকার ঘোড়ারাও বরফের ওপর দিয়ে চলতে অভ্যস্ত। শীতে যেন এখানে বসন্তের চাঞ্চল্য।

এত শীতেও ইওরোপ থেকে লাসা শহরে বেড়াতে এসেছে বেলগ্রেডের মেয়ে রাইসা। আলাপ সেই চেংডু শহরে। জিন জিয়াং হোটেলের ফুটপাতে আর্ট স্কুলের ছেলেমেয়েদের আঁকা পেইন্টিং কিনছিল। ওইসব শিল্পী ছেলেমেয়েদের কিন্তু একটাই বৈশিষ্ট্য। আর্ট স্কুলে পড়েও কিন্তু বিমূর্ত ছবি আঁকতে শেখেনি ওরা। ওই ফুটপাতে বসেও ছবি আঁকছে অবিরাম। এবং যা আঁকছে তার সবকটিই বিশুদ্ধ চাইনিজ পেইন্টিং। বাড়ির ঠাকুরঘরে চন্দন ঘষার পিঁড়ির সঙ্গে যে মোটা চন্দন কাঠটি থাকে, সেইরকম একটি বস্তুকে জলে ভিজিয়ে কাগজের ওপর পাকা হাতে রেখা টানছে তারা। কোনওটি হয়ে যাচ্ছে ইয়াক, কোনওটি গোম্ফা, কিংবা দাড়িওয়ালা কোনও বৃদ্ধ, ছেলেবেলায় ইতিহাসের পাতায় তৈমুরলঙের যেমন ছবি দেখেছি।

মেনল্যান্ড চায়নার চেংডু শহর থেকে আমি আর রাইসা একই বিমানে লাসা এসেছি। রাইসা খেতে ভালোবাসে খুব। শুধু খাওয়াই নয়, মদ্যপানেও ওর যথেষ্ট আসক্তি। তবে আসক্তি না বলে আগ্রহ বলাই ভালো। কারণ কোথাকার খাবার কেমন খেতে, কোন মদে নেশা বেশি হয়, এসব নিয়েই ওর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। লাসায় এসে পর্যন্ত ও খুঁজে বেড়াচ্ছে মাওতাই। এটা নাকি এক ধরনের ঘাস থেকে তৈরি মদ। চেংডুর জিন জিয়াং হোটেলে আমাকে একদিন লাল রঙের একটা মদ খাইয়েছিল। ওটা নাকি ওয়াইন, অথচ ভাত থেকে তৈরি। আমার ধারণা ছিল আঙুর ছাড়া ওয়াইন হয় না। রাইসাও সেটাই জানত। কিন্তু ভাত থেকে তৈরি লাল মদ আমরা ওই দেখলাম। মদের নাম শাওসিং।

খাবার নিয়েও রাইসার উৎপাত অনেক। লাসায় আমরা যে হোটেলে ছিলাম সেটি হলিডে ইন্ গোষ্ঠীর। এই হোটেলে খাবার নিয়ে আমার সমস্যা হত খুব। বছর দুয়েক আগেও লাসায় এসে এই একই হোটেলে ছিলাম আমি। তখন আমার খাওয়ার মতো একটি জিনিসই পেতাম মেনুকার্ডে। চিকেন স্যান্ডউইচ। সঙ্গে প্রায় কিলোখানেক কাঁচা গাজরের কুচি। ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে ডিনার পর্যন্ত ওই একটি পদ দিয়েই খাওয়া শেষ করতে হত আমাকে। পেট ভরানোর জন্য কাঁচা গাজরগুলোও চেটেপুটে খেয়ে নিতাম। আর গরুর মতো ওই কাঁচা গাজর খেয়ে খেয়ে মাঝে মাঝে নিজেকে আর মানুষ বলে মনে হত না।

এবছর এসে দেখছি আমার খাওয়ার উপযোগী আরও একটি পদ রয়েছে এখানে। ইয়াকের মাংসের টিকিয়া দিয়ে মিট বার্গার। কিন্তু সেখানেও রসিকতা অনেক। অর্ডার দেওয়ার সময়ে বলে দিতে হবে আমি গ্রিলড মিট চাই, না সান-

ড্রায়েড। তিব্বতীরা রোদ্দুরে শুকিয়ে নেওয়া কাঁচা ইয়াকের মাংস খেতে খুব ভালোবাসে। সেই মাংস দিয়ে তৈরি বার্গারও পরিবেশন করা হয় এখানে। আমি অবশ্য অর্ডার দিতাম গ্রিলড মিটের। কারণ গরম থাকার ফলে চোখ-কান বুজে গিলে ফেলতাম তাড়াতাড়ি। গাজরের বদলে এই পদের সঙ্গে একগাদা কাঁচা বাঁধাকপির কুচো। নাকে গন্ধ লাগলে মুখের মধ্যে ঠুসে দিতাম এক গোছা ওই কাঁচা বাঁধাকপি।

রাইসা কিন্তু খেত রোদ্দুরে শুকিয়ে নেওয়া কাঁচা ইয়াকের মাংস। নতুন জায়গায় এসে নতুন খাবার খেতেই নাকি ওর মজা। মেনু থেকে উদ্ভট সব খাবার বেছে নিয়ে অর্ডার দিত ও। মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হত যে আমার খাবারটা হাতে নিয়ে আমি অন্য টেবিলে গিয়ে বসতাম। ওর পছন্দ করা খাবারের বিটকেল গন্ধ আমি সহ্য করতে পারতাম না। ব্রেকফাস্টে ও প্রায়ই খেত হাঁসের পা-ভাজা। আঙুলসুদ্ধ হাঁসের পাগুলো পাম তেলে ভাজা। আমার সামনে বসে কচকচিয়ে খেত ও। আমি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিতাম।

একদিন ডিনারে বসে রাইসা আমাকে বলল, 'আজ যে খাবারটার অর্ডার দিয়েছি সেটা মিং সম্রাটেরা খেতেন। এমন চমৎকার ইনগ্রেডিয়েন্ট বিশ্বের খুব কম খাবারেই পেয়েছি আমি। তুমিও আমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারো। অবশ্য তুমি তো আবার ইন্ডিয়ান পন্ডিত।'

আমার খাওয়াদাওয়ার ন্যাটা দেখে রাইসা আমার নাম দিয়েছিল ইন্ডিয়ান পণ্ডিত।

ভারতীয় এই পণ্ডিতদের সঙ্গে কিন্তু হিমালয়ের একেবারে রক্তের সম্পর্ক। আসলে এই পণ্ডিতেরা হলেন কাশ্মীরি হিন্দু। কিংবা এককালে রাজপুতানা থেকে আগত কুমায়ুনের ভোটিয়ারা। তিব্বতীদের সঙ্গে এঁদের ছিল চমৎকার সম্পর্ক। কয়েকশো বছর আগে থেকেই অন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে তিব্বতীদের সঙ্গে যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত, তার মূল অংশীদার ছিলেন এঁরাই। তিব্বত যখন সকলের জন্য নিষিদ্ধ, তখন ভারতবর্ষ থেকে একমাত্র এই ভোটিয়া তথা পণ্ডিতদেরই ছিল সেখানে অবাধ গতিবিধি। এমনই একজন পণ্ডিত হলেন নয়ন সিং রাওয়াত। ব্রিটিশ আমলে এঁদের কাজ ছিল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার পক্ষে হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় গোপন জরিপের কাজ চালানো। এক অর্থে গুপ্তচরের কাজ করতেন তাঁরা। তিব্বত তখন নিষিদ্ধ দেশ। বিভিন্ন ছদ্মবেশে তিব্বতে ঢুকে এঁরা ওইসব এলাকার মানচিত্র তৈরি করতেন।

তিব্বতের এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে নয়ন সিংকে পাঠানো হয়নি। নয়ন সিংয়ের জন্ম ১৮২১ সালে। মানস সরোবর থেকে শুরু করে লাসা পর্যন্ত, এমনকী ব্রহ্মপুত্রের উৎসস্থলেও অভিযান চালিয়ে ছিলেন নয়ন সিং। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর উপাধি দেন। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'কৈলাস ও মানস সরোবর' গ্রন্থে এব্যাপারে কিছু বিভ্রান্তিকর

তথ্য দেওয়া আছে। উমাপ্রসাদ লিখেছেন, রায় বাহাদুর উপাধি দেওয়া হয়েছিল কিষেণ সিং রাওয়াতকে। আসলে কিন্তু রায় বাহাদুর পেয়েছিলেন নয়ন সিং। শুধু রায় বাহাদুরই নয়, ১৮৭৭ সালে অর্থাৎ যে বছর রানি ভিক্টোরিয়া 'এম্প্রেস অফ ইন্ডিয়া' হলেন, সেই বছরেই নয়ন সিংকে দেওয়া হয়েছিল 'কম্প্যানিয়ন অফ দি নিউ অর্ডার অব দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার' নামক তকমা। এছাড়াও তিনি পেয়েছিলেন রয়্যাল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটির সর্বোচ্চ সম্মান 'পেট্রন্স গোল্ড মেডাল'। তাঁর জন্মস্থান মিলাম গ্রামে তাঁকে জায়গীর দেওয়া হয়। নয়ন সিংয়ের মৃত্যু হয় ১৮৯৫ সালে।

উমাপ্রসাদের গ্রন্থে এমন তথ্যের অসম্পূর্ণতা আরও অনেক। মানস সরোবরের প্রথম ব্রিটিশ আবিষ্কারক হিসেবে তিনি মুরক্রফ্টের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ওই অভিযানে তাঁর সহযাত্রীটিকে তিনি শুধু 'সঙ্গী' বলেই ছেড়ে দিয়েছেন। সম্ভবত ওই সঙ্গীটির নাম তিনি সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি। তিনি বোধহয় জানতেন না যে ওই সঙ্গীটিও ছিলেন বিখ্যাত এক সৈনিক এবং অভিযাত্রী। ১৮০৮ সালে উইলিয়াম ওয়েবের সঙ্গে একটি অভিযানে গিয়ে তিনি নদীর উৎস খুঁজে বার করেছিলেন। এই 'সঙ্গী'-র নাম ছিল হায়দার জং হিয়ারসে।

হায়দার জং-এর পরিচিতি ছিল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হিসেবে। তাঁর পিতা ছিলেন খাঁটি সাহেব। কিন্তু তিনি দুটি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর খাঁটি মেমসাহেব স্ত্রী থাকতেন ইংলন্ডে। কিন্তু ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি করতে এসে তিনি ভারতীয় এক জাঠ রমণীকে বিবাহ করেন। হায়দার জংয়ের জন্ম ওই জাঠ রমণীর গর্ভে। সেকালে ভারতবর্ষের সামন্ত রাজারা ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে চাকরি দিতেন গোরা সাহেবদের। হায়দার জং-এর প্রথম চাকরি ওই ভাড়াটে সৈন্য হিসেবেই, এক মারাঠা রাজার কাছে, জেনারেল পেরনের অধীনে। কিছুকাল মধ্যপ্রদেশের সিন্ধিয়া পরিবারেও কাজ করেছিলেন তিনি। বিয়ে করেছিলেন ক্যাম্বের রাজকুমারী জুহুর-উল-মিসাকে। তাঁর জায়গীর ছিল বেরিলিতে।

১৮১২ সালের মে মাসে মুরক্রফ্ট এবং হায়দার জং ভোটিয়া বণিকের ছদ্মবেশে তিব্বতের পথে রওয়ানা হন। তাঁরা তিব্বতে ঢোকেন নিতি গিরিপথ পার হয়ে। তারপর গার্টোক হয়ে দারচেনের মধ্য দিয়ে ঘুরপথে মানস সরোবরে পৌঁছন আগস্ট মাসে। হায়দার জং এবং মুরক্রফ্টই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন, মানস সরোবর কোনও নদীর উৎস নয়। মানুষের এতদিনের ধারণা ভুল।

উমাপ্রসাদ জাপানি পরিব্রাজক একাই কাওয়াগুচির মানস সরোবর অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, কলকাতা থেকে দার্জিলিং হয়ে কাওয়াগুচি মানস সরোবর রওয়ানা হন। কিন্তু একাই কাওয়াগুচি কলকাতা থেকে কেন দার্জিলিং গিয়েছিলেন, সে তথ্য সম্ভবত উমাপ্রসাদ জানতেন না। কাওয়াগুচি আসলে ছিলেন পরিব্রাজক, অভিযাত্রী নয়। তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন বৌদ্ধগয়া দর্শন করতে। সেখান থেকেই খবর পেয়ে তিনি দার্জিলিং গিয়েছিলেন

গুরুর সন্ধানে। দার্জিলিং শহরে তখন থাকতেন বিখ্যাত বাঙালি টিবেটোলজিস্ট শরৎচন্দ্র দাশ। দীর্ঘ ১৩ মাস দার্জিলিং শহরে বসে শরৎচন্দ্রের অধীনে তিব্বতী ভাষা ও সংস্কৃতির তালিম নিয়েছিলেন তিনি। তারপর মূলত শরৎচন্দ্রের অনুপ্রেরণাতেই তিনি মানস সরোবরের পথে রওনা হন। এটা ১৮৯৯ সালের কথা। মানস সরোবর থেকে কাওয়াগুচি পৌঁছে যান লাসা শহরে। তিব্বতে দীর্ঘ ২ বছর কাটিয়েছিলেন তিনি। ১৯০১ সালে তিব্বত থেকে ফেরার সময়ে কাওয়াগুচি আবার আসেন দার্জিলিং শহরে, শরৎচন্দ্রের অধীনে তাঁর তিব্বতী ভাষা ও সংস্কৃতির তালিম শেষ করতে। সেবারেও দীর্ঘকাল দার্জিলিং শহরে কাটান তিনি। কারণ যতদূর জানা যায়, ১৯০৩ সালের আগে কাওয়াগুচি জাপানে ফিরে যাননি। কাওয়াগুচির প্রসঙ্গ এনেও উমাপ্রসাদ এতবড় একটা বাঙালি মহিমার কথা এড়িয়ে গেলেন কীকরে জানি না! আসলে উমাপ্রসাদ এসব খবর জানতেন না। এশিয়াটিক সোসাইটির পুথির ভাণ্ডারে তিনি এসব তথ্য খুঁজে পাননি।

শরৎচন্দ্র দাশ যে তখন কত বিখ্যাত তার একটা চমৎকার উদাহরণ দিই। রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের 'কিম' গ্রন্থে একটি বাঙালি চরিত্র হল বাবু-গুপ্তচর হরিচন্দর মুখার্জি। হরিচন্দর ছিলেন কিম্বাল ও'হারার গুরু। গুরুর কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কিম্বালও ভেবেছিলেন তিব্বতে গিয়ে তিনি ব্রিটিশ রাজকে কিছুটা সাহায্য করবেন। প্রায় কাওয়াগুচির ঘটনার মতো। রুডইয়ার্ড কিপলিং বহু জায়গায় স্বীকারও করে গেছেন যে তিনি হরিচন্দরের চরিত্রটি এঁকেছিলেন বাবু শরৎচন্দ্র দাশের কথা ভেবেই। সেটা ১৯০০ সাল।

যাকগে, ইতিহাস আওড়াতে গিয়ে রাইসা প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। রাইসার সঙ্গে সেদিনের ডিনার খাওয়ার কথা বলি। কিছুক্ষণ পরে একটি বিশাল চিনেমাটির বাটিতে খাবারটি পরিবেশন করা হল। বাটি থেকে ধোঁয়া উঠছে। সামনে ঝুঁকে পড়ে বাটির মধ্যে কী আছে দেখতে গেলাম। রাইসা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, চায়ের লিকারের মধ্যে পনেরোটি কচি হাঁসের মুণ্ডু সিদ্ধ করা। আমি হতবাক। হাঁসের শুধু মুণ্ডুই নয়, ঠোঁটগুলিও যেমন থাকে ঠিক তেমনই। আর ওপরে কর্পূরের গুঁড়ো ছড়ানো। এমন বিদ্‌ঘুটে খাবার আমি জীবনে কখনও দেখিনি। চায়ের লিকারের সঙ্গে হাঁসের মুণ্ডুর কী সম্পর্ক সেটাও বুঝলাম না। রাইসা আমাকে ভাগ দিতে যাচ্ছিল। আমি হাতজোড় করে প্রাণ ভিক্ষা চাইলাম। আমার তখন প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। খাবারের নাম নাকি জাংচা ইয়াসি। মনে মনে ভাবলাম, মিং সম্রাটেরা সম্ভবত বনমানুষের স্পিসিস ছিলেন। রাইসাও তাই।

রাইসা যে প্রকৃত অর্থে মনুষ্য নয় সেটা আরও বেশি করে বুঝেছিলাম ওর সঙ্গে পোতালা প্রাসাদ দেখতে গিয়ে। পোতালা প্রাসাদে পৌঁছতে হয় প্রায় হাজারখানেক সিঁড়ি ভেঙে। ছোটবেলা থেকেই বড় বড় অভিযাত্রীদের কাছ থেকে শিখেছি, উঁচুতে উঠতে হয় ধীরে ধীরে, স্বাভাবিক নিশ্বাস নিতে নিতে। আমিও তাই করছিলাম।

রাইসা কিন্তু সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল প্রায় একশো মিটার দৌড়ের স্পিডে। বেশ খানিকটা উঠে গিয়ে পিছন ফিরে আমাকে একবার ঠাট্টা করে আবার দৌড়। কয়েক মিনিটের মধ্যে শূন্যে মিলিয়ে গেল রাইসা। আমার সঙ্গে ওর আবার দেখা হল প্রায় দেড় ঘন্টা পরে, দলাই লামার ঘরের নীচের উঠোনে। ও তখন ছবি তুলতে ব্যস্ত। এমন প্রাণশক্তি বোধহয় বনমানুষেরও হয় না। উঠোনে প্রায় অর্ধশায়িত অবস্থায় রাইসা তখন ওপরে দলাই লামার ঘরের বারান্দার ছবি তুলছে, যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দলাই লামা সকলকে হাত তুলে আশীর্বাদ করতেন।

আমি আর রাইসা লাসার বারখোর বাজারে গিয়েছিলাম, এখনও সেখানে টাটকা শিকার করা বাঘের ছাল বিক্রি হয় কিনা দেখতে। সেই বাজারে একগাদা বড় বড় পুঁতির মালা কিনে গলায় পরে ফেলল রাইসা। মাথায় টিকলির মতো ঝুলিয়ে নিল প্রায় পিংপং বলের আকারের একটা সবুজ পুঁতি। তারপর হঠাৎ সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল মাটিতে। বলল, বারখোর বাজার থেকে জোখং মন্দির পর্যন্ত দণ্ডি কেটে যেতে চায় ও। তিব্বতীরা যদি কয়েকশো কিলোমিটার ধরে এইভাবে জোখং মন্দিরে আসতে পারে তাহলে ওই বা পারবে না কেন। বোঝ ঠ্যালা! ওর যাবতীয় ব্যাগ এবং রুকস্যাক তখন আমার ঘাড়ে। রাইসা দণ্ডি কাটছে। আমি প্রভুভক্ত ভৃত্যের মতো গুটিগুটি পিছনে হাঁটছি। কাণ্ড দেখে স্থানীয় তিব্বতীরা জড়ো হয়ে গেল সেখানে। তাদের মুখে খিলখিল হাসি। সেই জনতাও পিছু নিল আমাদের। একজন বয়স্ক তিব্বতী কী এক মন্ত্রপাঠ শুরু করে দিল। সেও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে।

শেষবারের মতো দণ্ডি কেটে রাইসা যখন জোখং মন্দিরের চৌকাঠ পার হল, সমবেত জনতা তখন সজোরে হাততালি দিতে শুরু করেছে। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে শুরু করল রাইসাও। ও প্রচণ্ড উত্তেজিত। আমি শুধু ওর মুখের দিকে তাকালাম। সারা মুখে ধুলোর আস্তরণ। চুলের সামনের দিকটায় কে যেন ছাই মাখিয়ে দিয়েছে খানিকটা। ভুরু দুটো মনে হচ্ছে যেন ধুলো দিয়েই তৈরি। আর সবচেয়ে করুণ অবস্থা হয়েছে ওর নাকের। যেন জোকারের মতো নাকের ওপর একটা ধুলোবালির বল বসিলে দিয়েছে কেউ। জনতার দিকে তাকিয়ে রাইসা বলল, ওঁ মণিপদ্মে হুঁ। জনতার আবার হাততালি। এটা ও লাসায় এসে শিখেছে। কিন্তু ওর সাহেবি উচ্চারণে কথাটা শোনাল অনেকটা এইরকম: অং মানিপাড্‌মে ঢুন।

জোখং মন্দিরের ভেতরে ঢুকলে গা শিউরে ওঠে। সর্বত্র ঘুটঘুটে অন্ধকার। যেন বিশালকায় এক গুহা। আলো বলতে শুধু শত শত চর্বির প্রদীপ। চতুর্দিকে চাপা স্বরের মন্ত্রপাঠ। কেউ প্রদক্ষিণ করছেন। কেউ চর্বির বাতি জ্বালছেন। কেউ কেউ সাষ্টাঙ্গে মাটিতে শুয়ে। পুরো মধ্যযুগীয় পরিবেশ। বৌদ্ধভিক্ষু হতে গেলে এই মন্দিরে এসেই সর্বস্ব দান করে দিতে হয়। এই মন্দির থেকেই দেওয়া হয় ভিক্ষাপাত্র। সেই ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ভিক্ষুকের জীবন শুরু করতে হয় সর্বপ্রথম

এই মন্দিরের সামনে বসে ভিক্ষা করে। সম্যক কৃচ্ছসাধন।

পুরনো লাসা শহরে এখনও খচ্চরে টানা কাঠের চাকা লাগানো মালগাড়ি চলে। সহিসের পোশাক এবং চেহারা দেখলে মনে হবে এইমাত্র কাওয়াগুচির সঙ্গে দর কষাকষি করে এল। সেই দুশো বছরের ট্র্যাডিশন এখনও অটুট। মালবোঝাই ইয়াককে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তিব্বতী শিশু। তিব্বতী রমণীর সারা গায়ে লর্ড ক্লাইভের আমলের অলঙ্কার। এসব দৃশ্য এখনও কিছু কিছু চোখে পড়ে লাসা শহরে।

১৯৫২ সাল তিব্বতের ইতিহাসে অভিশাপের বছর। ওই বছরেই তিব্বত চলে গেল চিনের অধীনে। ওই বছরেই মারা গেলেন আরেক বিখ্যাত তিব্বত-অভিযাত্রী সোয়েন হেডিন। ওই বছরেই ভারতীয়দের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেল তিব্বতের দরজা। লাসা, কৈলাস কিংবা মানস সরোবর বাঙালির কাছে হয়ে গেল অতীতের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন পুনরায় বাস্তব হতে সময় লেগে গেল প্রায় তিরিশ বছর। ১৯৮০ সালে চিন সরকার ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের জন্য আবার খুলে দিলেন দরজা। ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত সরকারের বিদেশ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ২০ জনের একটি তীর্থযাত্রীর দল লিপুলেখ দিয়ে মানস সরোবরে পৌঁছলেন। ওই দলের নেতৃত্বে ছিলেন আরেক পণ্ডিত, কিষেণ সিংয়ের নাতি এস সি রাওয়াত। কালক্রমে বাঙালিদেরও উৎসাহ বেড়ে গেল। নেপাল-চিন সীমান্ত দিয়ে না হেঁটে জাপানি জিপে চড়ে কৈলাস ও মানস পৌঁছে গেলেন কয়েকশো বাঙালি। সেই ট্র্যাডিশন এখনও চলছে। এই বছরেও ওই পথে তীর্থ করে এসেছেন প্রায় চল্লিশজন বাঙালি। লাসাতেও পৌঁছেছেন কয়েকজন। শিগার, শিগাৎসে এবং গিয়ান্তসে হয়ে।

আমি আর রাইসা লাসা থেকে ঝাংমু এসেছিলাম ওই একই পথে, জাপানি জিপে চড়ে। রাইসাকে নিয়ে পথে আরও কত কাণ্ড ঘটেছিল সে আরেক ইতিহাস। রাইসার হয়তো বিয়ে হয়ে গেছে এতদিনে। কিন্তু একটা জিনিস আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকতে চায় না, রাইসার মতো এমন বিচিত্র মেমসাহেব বউদের সাহেবরা সামলায় কী করে? যাদু জানে বোধহয়। কী জানি!

'ভ্রমণ' অক্টোবর, ২০০১

বাংলাদেশের সুন্দরবনে

সমীর রায়

বড় জাহাজটির সঙ্গে আমাদের দেখা হল ঠিক সন্ধের মুখে, জামদানি গ্রামের নদীর ঘাটে। আমরা দলবেঁধে জামদানি গ্রামে গিয়েছিলাম সরাসরি তাঁতিদের কাছ থেকে শাড়ি কিনতে। আর দেখা হওয়ামাত্র আসান মনসুর ঘোষণা করলেন, আজ আপনাদের জন্য বার-বি-কিউ ডিনার এই জাহাজেই।

ওঁরা সেইদিনই সুন্দরবন থেকে ফিরলেন। ওঁরা গিয়েছিলেন মাওয়ালিদের মধু সংগ্রহ অভিযান দেখতে। চাঁদের আলোয় জাহাজের ছাদে বসে সেইসব গল্পই শুনছিলাম আমরা। প্রত্যেকের হাতে কাঠকয়লার আগুনে পোড়ানো মুরগির মাংসের তাল। সবচেয়ে সাংঘাতিক গল্পটি শোনালেন সমীর সেনগুপ্ত। এবারেও মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে একজন মাওয়ালির মৃত্যু ঘটেছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের হাতে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড বাঘের খপ্পরে থেকেই সাড়ে পাঁচ ফুটের নধরকান্তি মানুষটি পরিণত হয়েছে আড়াই ফুটের একটি মাংসপিণ্ডের দলায়। সহযাত্রীরা চেঁচামেচি করেও বাঁচাতে পারেনি তাকে। বীভৎস ওই মৃতদেহ নৌকো করে বয়ে আনা হয়েছে তার গ্রাম পর্যন্ত, তার পরিবারবর্গের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বুদ্ধি সর্বজনবিদিত। গভীর অরণ্যে মধু সংগ্রহের সময় হলেই বাঘেরা ঘাপটি মেরে বসে থাকে মৌমাছির চাকের আশপাশে। জানে, ওই সময়ে মাওয়ালিরা আসবে মধু সংগ্রহ করতে। আর তখনই ঘাড় মটকে দেওয়া যাবে সবচেয়ে সহজ শিকার, মানুষের। অবশ্য সুন্দরবনের বাঘেরা মধুরও পরম ভক্ত। মৌমাছির চাক থেকে যখন মধু উপচে পড়ে, তখন তার প্রথম খাদক হল ওই বাঘেরাই। পরম সুখে চেটে চেটে মধু খায় ওই রয়্যাল বেঙ্গল।

অবশ্য সুন্দরবনের বাঘেরা কী না খায়! বাঙালির মতো মাছেরও পরম ভক্ত তারা। বড় মাছকে জলে ঝাঁপিয়ে শিকার করে। আর ছোট মাছ খাওয়ার পদ্ধতিটি ভারি সুন্দর। ছোট মাছ যেখানে সবচেয়ে বেশি সেইসব জায়গায় জলের মধ্যে অর্ধেক শরীর ডুবিয়ে শিকারি সারসের মতো নিঃশব্দে বসে থাকেন তিনি। মাছ খেলতে খেলতে জলের ওপরে শূন্যে লাফালেই ছোঁ মেরে টপ করে তাকে মুখের মধ্যে পুরে ফেলেন এবং এই খেলা চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। রয়্যাল বেঙ্গলের আরেকটি প্রিয় খাদ্য হল গোসাপ। গোসাপকে শিকার করার সময় জলে এবং

ডাঙায় চলে সমান তাণ্ডব। সুন্দরবনের বাঘ চমৎকার সাঁতারু। খাঁড়ির পর খাঁড়ি পার হয়ে যায় অক্লেশে সাঁতার কেটে।

আমাদের সুন্দরবন যাত্রা এই বড় জাহাজে নয়। আমাদের জন্য মোংলা বন্দরে অপেক্ষা করছে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি জাহাজ। মোট বারোটি দুই শয্যার কেবিন সেই জাহাজে। বাথরুমে ২৪ ঘণ্টা জল। আর চমৎকার একটি ডাইনিং রুম। চারদিক কাচ দিয়ে ঘেরা। খেতে খেতেই সেখান থেকে দেখা যাবে অরণ্যের রূপ। শোনা যাবে মানিকজোড়, মদনটেক, শ্যামখোল কিংবা ভীমরাজের ডাক। অরণ্যের খুব কাছ দিয়ে গেলে নাকে আসবে এক ধরনের বুনো গাছের গন্ধ। সুন্দরী, কেওড়া, গরান, গর্জন কিংবা বাইন। হাওয়ায় দুলবে গোলপাতা। উলুখড়ে ঢেউ খেলবে। আকাশ থেকে তীরবেগে জলের দিকে নেমে আসবে শঙ্খচিল। দুই পায়ে একটি জ্যান্ত মাছকে ধরে আবার উড়োজাহাজের মতো উঠে যাবে আকাশে। ডাঙার মুখে সর্বত্র ভিজে এঁটেল মাটির পাহাড়। চোখে দূরবীন লাগালে এক অভিনব দৃশ্য। ওই এঁটেল মাটির সর্বত্র অসংখ্য গর্ত। আর সেই গর্তে ঢুকছে-বেরুচ্ছে লক্ষ লক্ষ রক্ত-লাল এক দাঁড়ার খুদে কাঁকড়ারা। সারা গায়ে কাদা মেখে কিলবিল করছে চ্যাং মাছের দল।

মোংলা বন্দর থেকে ছেড়ে গভীর রাতে আমাদের জাহাজ প্রথম যেখানে এসে দাঁড়াল, সেই জায়গাটির নাম ঢাংমারি। জাহাজ নোঙর করা হল মাঝনদীতে। সেখান থেকে ছোট্ট স্পিডবোটে চেপে আমাদের বাংলাদেশের দলনেতা মনিরুল ইসলাম ডাঙার দিকে চলে গেলেন বনদপ্তরের অনুমতি আনতে। চারদিকে ঘন জঙ্গল। দূরে একটি আলো জ্বলছে মিটিমিটি। সম্ভবত ওটিই হল অরণ্যের মধ্যে বনদপ্তরের অফিস। মনিরুল যখন ফিরলেন তখন আরও রাত বেড়েছে। কিন্তু তিনি একা ফিরলেন না। সঙ্গে নিয়ে এলেন দুই বন্দুকধারী নিরাপত্তা রক্ষীকে। এমনই ব্যবস্থা ছিল। আগামী তিন রাত আমাদের জাহাজেই কাটাতে হবে। আর জাহাজের মধ্যে আমাদের পাহারা দেবেন ওই বন্দুকধারীরা। এরপর থেকে আমাদের শুধু এগিয়ে যাবার পালা। খাঁড়ির পর খাঁড়ি পার হয়ে আমাদের গন্তব্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত।

জাহাজের মধ্যে আমাদের অফুরন্ত অবসর। চারপাশের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকা, খাওয়া আর মাঝে মাঝে কেবিনে শুতে যাওয়া। খাওয়ার বহরও পেল্লায়। বার-বি-কিউ ডিনার দিয়ে যে খাওয়া শুরু হয়েছিল, পরবর্তী তিনদিনে তা প্রায় হাঁপিয়ে ওঠার মতো। এক ফুট লম্বা আস্ত মাগুর মাছ, সদ্য নদী থেকে তোলা ইলিশ মাছ ভাজা, প্রায় রেকাবির সাইজের আস্ত রূপচাঁদা। এছাড়াও মুরগি এবং পাঁঠা। প্রতিবার দু-তিন রকমের সব্জি। চমৎকার ডাল এবং স্যালাড। ম্যাকডোনাল্ডের কায়দায় ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। ব্রেকফাস্টে পাউরুটিতে পুরু করে মাখন, মারম্যালেড কিংবা মাওয়ালিদের সংগ্রহ করা টাটকা মধু। সঙ্গে ফ্রায়েড এগ। যখন তখন তরমুজের সরবত, কফি এবং চা। সহযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা খাদ্যরসিক তাঁদের খুব ফুর্তি।

তরুণ সেন, অনিল দত্ত কিংবা প্রবীর মল্লিকের খাওয়া শেষ করতে সময় লেগে যাচ্ছে এক ঘণ্টারও বেশি। যে মন্দিরা পাল এবং সোনা পাল কলকাতার বাইরে গিয়ে আমিষ স্পর্শ করেন না, তাঁরাও মাঝে মধ্যেই পাতের দিকে টেনে নিচ্ছেন আড়াইশো গ্রামের টাটকা রুইমাছের পেটি। প্রণব নন্দীর স্টিল ক্যামেরার দাম দেড় লক্ষ টাকা। বাইরে বেড়াতে এসে যে প্রণবের ছবি তোলাই একমাত্র প্যাশন, তারও খাওয়ার প্রতি মনোযোগ দেখে মনে হচ্ছে, জাহাজের ডেকে রয়্যাল বেঙ্গল উঠে এলেও এখন খাওয়া বন্ধ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মিনতি সেন তো আস্ত রূপচাঁদা খেয়ে বসলেন। আমাদের পমফ্রেটই বাংলাদেশে রূপচাঁদা। তবে প্রজাতি আলাদা। গায়ে বেশ রঙের বাহার। যে নূপুর এবং সৌরভকে বাড়িতে খোসামোদ করে খেতে বসাতে হয়, তারাও খাবার টেবিলে চলে আসছে সময়ের আগেই। ডিনারে ভাত দেখলে যে কৃপাঞ্জলি প্রায় আঁতকে ওঠে, সে পর্যন্ত সোনামুগের ডাল আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দিয়ে ভাত মেরে দিচ্ছে দু আউন্স। সুন্দরবনের জলযানে খাবারদাবারের মহিমা এমনই। তবে সব ব্যবস্থাই মনিরুলের। নেপথ্যের অবদানটুকু হাসান মনসুরের। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের এই দুটি মানুষের জন্যই আমাদের সুন্দরবন যাত্রা এত সুখের হয়েছিল।

বাংলাদেশের সুন্দরবন চারটি রেঞ্জে বিভক্ত। খুলনা, সাতক্ষীরা, চাঁদপাই এবং শরণখোলা। গোটা সুন্দরবন দুটি দেশের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছে। একটা অংশ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে। বাকিটা বাংলাদেশে। তবে বাংলাদেশের অংশই আয়তনে বড়। প্রায় ৬০ ভাগ। আয়তন কমবেশি ২৪০০ বর্গ মাইল। দুই দেশের মধ্যে সুন্দরবনের সীমানা হল দুটি নদী। রাইমঙ্গল এবং হরিণভাঙা। সীমান্ত অঞ্চলে যে রেঞ্জ তার নাম সাতক্ষীরা। আর পুবদিকে অরণ্যের যে সীমানা সেটাই হল শরণখোলা। বাঘ এবং কুমিরের সংখ্যা এই রেঞ্জেই বেশি। ফলে আমাদেরও গন্তব্য ছিল সেটাই। শরণখোলা রেঞ্জে একেবারে বঙ্গোপসাগরের মোহানায় দুটি উল্লেখযোগ্য পয়েন্টের নাম কটকা এবং কচিখালি। কচিখালিই হল টাইগার পয়েন্ট। কটকায় ফরেস্ট লজ রয়েছে। রয়েছে ভিউ টাওয়ার। লজের বিপরীতে যে অরণ্যদ্বীপ তা বঙ্গোপসাগরে মিশে শেষ হয়েছে সমুদ্রসৈকতে। অরণ্য বিলীন হয়ে গেছে ঝাউবনে মিশে। আর সেই ঝাউবনে সর্বদাই টাটকা বাঘের পায়ের ছাপ। জনমানবহীন প্রান্তর। আশপাশের খাঁড়িতেও সমুদ্রের ঢেউ। আকাশে মাছরাঙা আর চিল। সামনে সীমাহীন জলরাশি।

কটকার ঘাটে কাঠের সাঁকো। যাতে এঁটেল মাটিতে পা না পড়ে। সেই সাঁকোর ওপর কাঠের বেঞ্চি। সেই বেঞ্চিতে বসে অরণ্য এবং সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। জায়গাটি এত নির্জন যে দেখলে মনে হবে এখানে মানুষের বোধহয় কোনওদিন পা পড়েনি। এখানে বসেই দেখলাম সেই দৃশ্য। একটি বিচিত্র পাখির খেটে খাওয়া দিনযাপন। পাখিটি দেখতে অনেকটা টিয়াপাখির মতো। গায়ের রং দুধসাদা। বসে আছে জলের ধারে একটি শুকনো গাছের ডালের ওপর। তাকিয়ে

আছে জলের দিকে। মাঝে মাঝেই সে উড়ে যাচ্ছে আকাশের দিকে। তারপর তীরবেগে নেমে আসছে জলে। জল থেকে যখন উঠছে তখন তার ঠোঁটে ছোট্ট একটি জ্যান্ত মাছ। ঠোঁট কিন্তু তার মাছরাঙার মতো লম্বা নয়। অথচ শিকারে পটু। অত উঁচু থেকে ওইটুকু চোখ দিয়ে কী করে জলের মধ্যের মাছ দেখছে কে জানে! আমি বসেছিলাম প্রায় এক ঘণ্টা। ওই এক ঘণ্টায় তারও পরিশ্রমের বিরাম নেই। ধরে ফেলল অন্তত গোটা ছয়েক মাছ। একেকবারে মাছ মুখে নিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে ওপারের ঘন জঙ্গলের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরে আবার এসে বসছে ওই শুকনো ডালে। শুনেছি সুন্দরবনের এই অঞ্চলে মাছরাঙার প্রায় আটটি প্রজাতিকে দেখা যায়। এ পাখি হয়তো তাদেরই একজন।

আমরা যে নদী দিয়ে মোহানা পর্যন্ত এসেছি সে নদীর নাম পশুর। পিছনদিকে মোংলা বন্দর পর্যন্ত নদীর ওই একই নাম। মোংলার পর থেকে কিন্তু ওই একই নদীর নাম চালনা। পুরনো ও পরিত্যক্ত চালনা বন্দর পর্যন্ত চলেছে এই নাম। চালনার পর থেকে আবার ওই নদীর নতুন নাম রূপসা। এই রূপসা নদী বয়ে গেছে খুলনা শহরের ওপর দিয়ে। খুলনা শহর থেকে স্থলপথে মোংলা বন্দর যাওয়ার পথে পার হতে হয় এই রূপসা নদীর ফেরি। মোহানা থেকে চালনা পর্যন্ত এই নদীর বিস্তৃতি ব্যাপক। প্রায় এপার ওপার দেখা যায় না। তবে খুলনা শহরে ঢুকে এই নদী একেবারে শীর্ণকায়। রূপসা নদীর মাছ মানেই খুলনার মানুষের জিভে জল।

গভীর আরণ্যক পরিবেশে পশুর নদী দিয়ে মোহানার দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে রোমাঞ্চকর। সুন্দরবন মানেই ছোট বড় দ্বীপের সমষ্টি। আর দুই দ্বীপের মধ্যবর্তী জলপথই হল খাঁড়ি। সে খাঁড়ি কখনও নালার মতো। কখনও আবার তার সমুদ্রের ব্যাপকতা। এই পথে সামনের দিকে সর্বদাই চোখে পড়ে কোনও-না-কোনও খাঁড়ির মুখ। যেন কেউ মাটি কেটে খালের জল ছেড়ে দিয়েছে। অনেক দূরে দুটি দ্বীপ যেন হাত বাড়িয়ে মিলতে চাইছে। কিন্তু যত এগোচ্ছি, দুই দ্বীপের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। যখন কাছাকাছি চলে আসছি তখন সামনে আবার এক নতুন খাঁড়ি। দুটি নতুন দ্বীপ যেন পরস্পর মিলিত হতে উদ্যত। এ তো গেল সামনের দিকের কথা। আমার দুই পাশেও ওই একই অবস্থা। ছোট বড় খাঁড়ির পর খাঁড়ি। লম্ব আকারে ঢুকে গেছে অরণ্যের গভীরে. যেদিকে তাকাই, শুধু জল আর অরণ্য। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। সর্বত্রই জঙ্গল শেষ হয়েছে জলে এসে। আর যেখানে শেষ হয়েছে সেই অংশটুকু এঁটেল মাটির পাহাড়। পা ফেললেই ঢুকে যাবে হাঁটু পর্যন্ত। জলের কাছাকাছি অধিকাংশ গাছই কেওড়া কিংবা সুন্দরী, অথবা গোলপাতা। মাটির সর্বত্র বেরিয়ে রয়েছে বড় গাছের শিকড়। ঠিক ছুরির ফলার মতো। মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা এই শিকড়কে বলে শ্বাসমূল। সুন্দরবনের প্রায় সর্বত্রই এই শ্বাসমূল, যা লোহার মতো শক্ত। দু-তিন ইঞ্চি দূরত্বে খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে মাটি থেকে। মাইলের পর মাইল। শুধুমাত্র এই শ্বাসমূলের দাপটেই

সুন্দরবনের জঙ্গলে পায়ে হেঁটে চলাফেরা করা মানুষের পক্ষে প্রায় অসাধ্য। জমিতে পা ফেলার জায়গাই নেই যেন। অথচ অত বড় থাবা নিয়ে বাঘেরা অক্লেশে ঘুরে বেড়ায় এগুলোকে সামলে। বিস্ময়ের কথা সেটাই। এই শ্বাসমূলের উচ্চতা দুই ইঞ্চি থেকে কয়েক ফুট পর্যন্ত। শেষ মাথাটি বর্শার ফলার মতো সরু এবং ধারালো।

জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। সুন্দরবনের এটাই প্রচলিত প্রবাদবাক্য। শরণখোলাও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে কটকার ভিউ টাওয়ার থেকে পালে পালে হরিণ দেখে মুগ্ধ হয়েছি আমরা। সুন্দরবনের বাঘকে সাঁতার কেটে খাঁড়ি পার হতে দেখা রীতিমতো ভাগ্যের কথা। সে সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। তবে এঁটেল মাটিতে টাটকা বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছি। থাবার গর্তে তখনও জল জমে আছে। সামনে হেঁতেলের ঝোপ দেখে আর বেশি ভেতরে ঢুকতে সাহস হয়নি। কারণ সুন্দরবনের বাঘ গা ঢাকা দেয় ওই হেঁতেলের ঝোপেই। আর দেখেছি বিচিত্র কিছু পাখি এবং তাদের জীবনযাত্রা। জনমানবহীন ঘন অরণ্য বলেই হয়তো এটা সম্ভব হয়েছে। মুগ্ধ হয়েছি বাংলাদেশের সুন্দরবনের নিষ্কলুষ পরিবেশ দেখে।

'ভ্রমণ' জুন, ২০০০

হিউয়েন সাঙের নিজের গড়া মঠে

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী

দুহাজার দুই-তিন সালে চিনের চার শহরে প্রাচীনভাস্কর্যের একটা প্রদর্শনী করার ভার পেলাম কেন্দ্রের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সূত্রে। শহরগুলির নাম বেজিং, তিয়ানজিন, সাংহাই ও সিয়ান। বেজিং ও সাংহাইয়ের পরিচয় বিশেষ করে দেওয়ার নয়। তিয়ানজিন পুরনো মিউনিসিপ্যাল শহর। প্রথম খবরেই হাতছানি দিয়ে ডাক দিয়ে গেল সিয়ান!

সেই ইতিহাস-ভূগোলের সিয়ান (Xi'an)। ঐতিহাসিক 'সিল্ক রোড' বা রেশম পথে চিন দেশের প্রান্তিক জনপদ সিয়ান। উত্তর-পশ্চিম চিনের সাঙ্কসি প্রদেশের সেই ইতিহাসনগরী। প্রথম সহস্রাব্দের রাজকীয় উত্থান-পতনের সাক্ষী। সর্বোপরি সোয়াং ডজাং (Xuang Zang) বা হিউয়েন সাঙের পবিত্র কর্মভূমি। তাঁর ভারতযাত্রার প্রথম ও শেষ চারণবিন্দু। এখান থেকেই তিনি পা ফেলেছিলেন তথাগতের দেশে। সে যাত্রায় সতেরো বছর কাটিয়ে ফিরে এলেন সিয়ানেই। জীবনদীপ নিভে যাবার আগে আরও সতেরো বছর এখানেই বুদ্ধের শরণ নিলেন শাস্ত্র ও ধর্মের চর্চায়।

সিয়ানের হাতছানি আরও এক কারণে আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল। দুহাজার খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে টোকিও শহরে বিশ্বের চার প্রাচীন সভ্যতার প্রদর্শনীতে আমরা যোগ দিই হরপ্পা সংস্কৃতির কিছু শিল্পদ্রব্য নিয়ে। ভারত, চিন, মিশর ও মেসোপটেমিয়ার প্রত্ননিদর্শন ছিল সেই প্রদর্শনীতে। ওখানকার চারটি মিউজিয়ামে সাজানো হয়েছিল প্রাচীন কীর্তিগুলো। চিনের দর্শনীয়গুলির মধ্যে হঠাৎই আবিষ্কার করলাম সম্রাট অশোকের এক বেলেপাথরের মূর্তি। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে এই সিয়ানের প্রত্নস্থলী থেকে উঠে এসেছিল ৫১১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এই মূর্তিটি। সেবার জাপান থেকে ফিরে এসেই লিখেছিলাম ভারত থেকে দূরে চিনের মাটিতে অশোকমূর্তির পুনরুদ্ধার কাহিনী। তাই ভারত এবং চিন দুই সরকারের সিদ্ধান্তে প্রদর্শনক্ষেত্র হিসাবে সিয়ানের গুরুত্ব মেলায় খুশি হলাম। কৌতূহল বেড়ে গেল হিউয়েন সাঙের নগর দর্শনের।

বলে রাখি এখানে, দেশ-বিদেশে প্রদর্শনী করতে হলে বছর দুয়েক ধরে চলে সলতে পাকানোর পর্ব। চিন সরকারের ইন্টারন্যাশনাল এক্সিজিবিশন এজেন্সির

সঙ্গে দীর্ঘদিন কেজো কথাবার্তা আদানপ্রদানের পর ওদের এবং চিনের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সঙ্গে চুক্তিপত্র সই করতে দুহাজার দুয়ের নভেম্বরের শেষে পৌঁছলাম বেজিং। শুধু স্বাক্ষর সম্পাদন নয় ওই চার শহরের প্রদর্শন ব্যবস্থার টুকিটাকি, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের খুঁটিনাটি সরেজমিনে পরীক্ষা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের একজন ডিরেক্টরও সফরসঙ্গী হলেন। গাড়োয়ালের মানুষ, নাম সঞ্জীব মিত্তল।

বেজিংয়ে চায়না ইন্টারন্যাশনাল এক্সিজিবিশন এজেন্সির ভাইস ডিরেক্টর ওয়ান জিয়ুআন চিন সরকারের তরফে প্রাথমিক আলোচনাপর্বে নেতৃত্ব দিলেন। সুপুরুষ এই সংস্কৃতিকর্মী দুবছর বাদে যে পঞ্চাশে পড়বেন চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। চিনের এক নামজাদা চিত্রশিল্পী। মূলত তেলরঙে কাজ করেন। বছরখানেক আগে তাঁর গোটা সত্তর তৈলচিত্র নিয়ে গ্লোবাল ট্যুর নামে এক প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছে চায়না ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস মিউজিয়ামে। ইতালি, আমেরিকা, হল্যান্ড, আফ্রিকা, গ্রিস, স্পেন, ফ্রান্স— যেখানেই গিয়েছেন নানান দৃশ্যকে সাজিয়ে নিয়ে বাহির বিশ্বকে ক্যানভাসে তুলে নিয়ে এসেছেন। বাদ যায়নি ভারতবর্ষ। এগিয়ে দিলেন তাঁর প্রদর্শনীর ক্যাটালগটি। জুন ২০০১-এর। দেখলাম এঁকেছেন 'নতুন দিল্লির এক রাত'। অপর এক নগ্নিকার ছবির পাতায় হাত রাখতেই বললেন, তিন দেশকে মিলিয়ে এ ছবি এঁকেছিলাম বছর দুই আগে। দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর পেন্টিংকে পশ্চাতের পটে রেখে তুরস্কের গালিচায় চিনা মেয়ে ইয়েলিনা ভাবে বিভোর।

বত্রিশ দফা বিধিনিয়মের খসড়া নিয়ে আলোচনা করতে দুপুর গড়িয়ে সন্ধে হত। তারপর আবার হোটেলে ফিরে গভীর রাত পর্যন্ত চলত যুক্তি-তক্কো-গপ্পো। মিত্তল রোজ সকালে আলোচনার টেবিলে যাবার আগে বলতেন, মনে আছে স্যার, সেই আর্যবচন— চিনেরা নিজের স্বার্থে বজ্রকঠোর। এ ব্যাপারে কুসুমকোমলতার স্থান নেই আমাদেরও!

চুক্তি-যুক্তির বয়ানগুলো আপাতত শিকেয় তুলে ঠিক হল তিয়ানজিন সিয়ান ঘুরে আসতে হবে অন্তর্বর্তী সময়ে। ইতিমধ্যে স্থির হয়ে গেছে ছয় মাসব্যাপী এই এক্সিবিশন শুরু হবে হিউয়েন সাঙের শহর সিয়ানে। বড়দিনের দুদিন পরে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমরা তখনও কলহ করছি ধারা-উপধারা নিয়ে। সবই কিন্তু যে যার দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য।

বেজিং থেকে তিয়ানজিন এলাম গাড়িতে। যেন নতুন দিল্লি থেকে পুরনো কলকাতায়। হেপিং জেলার চেংদে রোডে তিয়ানজিন মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়ামের বাড়ি যেন এক পুরনো প্রাসাদপুরী। ঘরগুলো বিশাল। হাজারদুয়ারির মতো। একটা মলিন ধূসরতা বাড়িটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রদর্শনীর জন্য আরও সাজগোজ আরও সুরক্ষিত হতে হবে। তিয়ানজিন আসলে পূর্ব উপকূলে এক সমুদ্র-বন্দর। এই নগর-জাদুঘরে পৌঁছনোর আগে এক রেস্তোরাঁয় মধ্যাহ্নভোজ

সেরে নিলাম। এরই পাশে অতি বিশাল এক সূর্যঘড়ি। ডায়াসের চারপাশে দ্বাদশরাশি। কলকব্জাগুলো দেখা যায়। বাঁকানো এক ক্রেনের মাথায় সূর্যের মুখ। মিউজিয়ামের দ্রষ্টব্য চারু ও কারুদ্রব্য এবং চাইনিজ স্ক্রোল। মহিলা কিউরেটরের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে সেই রাতেই ফিরে এলাম বেজিংয়ে।

পরদিন গেলাম নতুন গড়ে ওঠা ঝাঁ-চকচকে বেজিংয়ের আর্ট মিউজিয়াম অব চায়না মিলেনিয়াম মনুমেন্টে। এখানেও প্রদর্শনী শুরু হবে মধ্য পর্বে। একেবারে আধুনিক প্রযুক্তিতে গড়ে তোলা এর প্রদর্শনী কক্ষ সম্পর্কে কোনও দ্বিধা থাকতে পারে না। মিউজিয়াম-ডিরেক্টরের সহকর্মীরা ঘুরিয়ে দেখালেন এক বৃত্তাকার হলে দেওয়ালের প্যানেলে চিনের ইতিহাস। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সাংস্কৃতিক বিপ্লব-উত্তর চিন। সেই প্যানেলে খুঁজে নিলাম হিউয়েন সাং ও তাঁর সময়ের ত্যাং সম্রাট লি শিমিনকে। ভারত অভিযান শেষে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন মহাশ্রমণকে। গ্যালারি থেকে ফিরে এলাম আবার বিরাট রিসেপশন রুমে। চিন-জাপান-কোরিয়া-তাইওয়ানে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা জানেন 'উরুশি' বা গালা-পালিশ করা হাল্কা-পল্কা পেয়ালা পিরিচ হাতে তিরতির করে এগিয়ে এসে অতিথিকে সবুজ চায়ের আপ্যায়ন করেন পীত তরুণীরা। চা খেতে খেতেই মিলেনিয়াম মিউজিয়ামের ডিরেক্টর ওয়াং জিয়াঞ্চি চিনা ইতিহাসের খাজাঞ্চির খাতা খুলে বসলেন। দেখো ভারতকে আমরা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই 'সেন্তু' আর 'তিয়ানজু' নামেই জানি। তোমাদের রামাপিথিকাস আর আমাদের য়ুয়ানমৌ মানুষ প্রমাণ করেছে প্রিমিটিভ ম্যান এই দুদেশেই বিচরণ করত। গ্যালারিতে অনেকক্ষণ হেঁটেছি। তারপর আবার এই প্রাগৈতিহাসিক পরিক্রমা। মনে হল, 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।' মিঃ জিয়াঞ্চি দমবার পাত্র নন। বললেন, সোয়াং ডজাংয়ের মঠ দেখেছো? কবে যাচ্ছে সিয়ান? 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই' মন্ত্রে তিনিই তো সব।

সেদিন হোটেলে ফিরে আরেক প্রস্থ আলোচনা হল। প্রদর্শনীর নাম ঠিক হল— 'সোল অব ইন্ডিয়া— ব্রোঞ্জ স্কাল্পচারস' 'ভারতের আত্মা— ধাতুমূর্তির মাধ্যমে'। আশিটি মূর্তির তালিকা নিয়ে গিয়েছিলাম— হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈনধর্মের দেবদেবীর। এছাড়া জোর দিয়েছিলাম মণিপুর, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবাংলার লৌকিক দেবতা ও জীবনচর্যার উপকরণের দিকে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ষড়ভুজ জারের দেবতা, মণিপুরের শস্য ঝাড়তে বসা তিলক কাটা মহিলা, দক্ষিণ ভারতের ওলাউঠা ও জলবসন্তের দেবী মারিয়াম্মা। এককথায়, ভারতের গ্রামীণ জীবনের লোক-আত্মার প্রতিভূ পরিচয়। ওয়ান জিয়ুআন উসখুস করছিলেন। বলেই ফেললেন, সোয়াং ডজাংয়ের নালন্দার কোনও বৌদ্ধমূর্তি আনবে না? সঞ্জীব মিত্তল শব্দহীন ইঙ্গিতে বোঝালেন— ধীরে, বৎস ধীরে!

পরদিন ড্রাগন এয়ারলাইন্সের ছোট বিমানে সন্ধেবেলায় পৌঁছনো হল না সাঙ্কসি। পৌঁছলাম যখন তখন প্রায় মধ্যরাত। সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে

বলি, বনহংস প্যাগোডায় পৌঁছব কখন? হোটেলের কাউন্টার থেকেই একটা ব্রোশিওর তুলে নিয়েছিলাম। তাতে লেখা, হিউয়েন সাঙের সেই মঠকে সবাই জানে 'ওয়াইল্ড গুজ প্যাগোডা' বলে। ঘুরে দেখলাম সাঙ্কসি হিস্ট্রি মিউজিয়াম, যেখানে আমাদের প্রদর্শনীর প্রথম আসর বসবে বলে ঠিক হয়েছে। মিউজিয়ামের প্রধান হাসিখুশি মানুষ। নাম জৌ তিয়ানইউ! ইতিহাসপণ্ডিত। অল্প আলাপেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সিয়ানকে প্রদর্শনীর প্রথম দ্রষ্টব্যস্থল বলে বেছে নেওয়ায় খুবই খুশি। দেখাশোনা শেষ করে এবার বেরলাম আরও কয়েকটি মিউজিয়াম দর্শনে। তারপর দুপুর দুপুর পৌঁছে গেলাম সিয়ান। আমাদের তারাপীঠ, দক্ষিণেশ্বরের মতো তীর্থক্ষেত্রের মন্দিরে পৌঁছনোর আগে যেমন দোকান-পসরা বসে এখানেও তেমনই। ধাপে ধাপে পাহাড়-কাটা চত্বরগুলো পেরিয়ে এগিয়ে এলাম মঠের প্রধান ফটকের সামনে। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব দেশেই যেমন বিশাল ঘণ্টা থাকে মঠ মন্দিরের সামনে তেমন ঘণ্টার জন্য এক ঘণ্টাঘর বা বেলটাওযার আরেক প্রান্তে ড্যামটাওয়ার। স্মৃতিমন্দিরে ঢোকার আগে প্রশস্ত এক হল, সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে হয় সেখানে। নীচের চত্বরে ধূপ-দীপ প্রজ্জ্বলনের সুদৃশ্য আধারগৃহ। লালরঙের মোমবাতি জ্বলছে গোলাকার দীপস্তম্ভে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে এক থোকা রঙ্গন। হলের সামনের বারান্দায় কালো রং করা কাঠের থাম। দুটি থামে ওপর থেকে নীচে চিনা অক্ষরে কিছু লেখা দেখে কৌতূহল হল— এ-ই কি তবে হিউয়েন সাঙের লেখা! আমাদের যাত্রাসঙ্গী সাঙ্কিস হিস্ট্রি মিউজিয়ামের ডেপুটি ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসা করলাম। উনি বললেন, ঠিক চিনেছো! এ তো সোয়াং ডজাংয়ের নিজের লেখা। আমি উৎসুক হয়ে বললাম, প্লিজ ইংরিজি করে বলো কথাগুলো। যা বললেন শুনে আমি স্তম্ভিত, আনন্দে উদ্বেল। হিউয়েন সাং লিখছেন— এই মঠে বৌদ্ধধর্মের চর্চা ঠিক নালন্দা মহাবিহারের মতোই সফল (the study of Buddhism in this monastary is as good as that in Nalanda)। এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে ভ্রমণসঙ্গীকে বললাম, মিঃ ওয়ানজি! চিনা ভাষায় লিখে দিন শব্দগুলো। হিউয়েন সাং তাঁর হাত দিয়ে এ যুগের কলমে লেখালেন— 'ডজোঙ সুয়ে হোঙ ওয়েই শি চি দি কান বি না লান তুয়ো'। এবার অন্য স্তম্ভলিপিটিতে কী লেখা জানতে চাইলে বললেন, লেখা আছে— ভিক্ষু-পণ্ডিত সোয়াং ডজাং গোটা দুনিয়ায় বৌদ্ধধর্মের এক আচার্য হিসাবে বিখ্যাত। এমনকী ভারতবর্ষেও তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে মানুষের অগাধ শ্রদ্ধা। নিজের সম্বন্ধে একথা নিশ্চয় উনি লেখেননি। একথা হয়তো তাঁর সমকালের কোনও সম্রাটের।

'হল অব দি গ্রেট হিরো' বা স্মৃতিমন্দিরের প্রশস্ত হল পেরিয়ে এবার প্যাগোডার দিকে এগোলাম। এই সেই সাততলা বৌদ্ধমঠ একদিন যার মূল পাঁচটি তলার নির্মাণকাজ তত্ত্বাবধান করেছিলেন হিউয়েন সাং নিজের ডিজাইন অনুসারে। ইতিহাস বলে এই মহাশ্রমণ নিজেই সেদিন বয়ে আনতেন ইট আর পাথরখণ্ড তাঁর সাধের মন্দিরের সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য। ৬৫২ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চাশ ফুট উঁচু

পাঁচতলা মন্দিরটি শেষ হয়। মূল প্যাগোডাটি বিধ্বস্ত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর অসহিষ্ণু শাসকের দৌরাত্ম্যে। আরও দুটি তলা যুক্ত হয়েছে ৭০১ থেকে ৭০৪ সালের মধ্যে। ৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিন বছর ধরে সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে। যুগে যুগে ধ্বংসলীলার অগণিত দাপটেও অক্ষতঅবিচল থেকেছে হিউয়েন সাঙের সেই বুনো হাঁস— 'দি ওয়াইল্ড গুজ প্যাগোডা'।

কেমন করে এমন নাম হল তার কয়েকটি গল্প এখন বলি। তার আগে বলতে হয় ত্যাং রাজবংশের যুবরাজ লি জি-র মাতৃভক্তির কাহিনী। মার জন্য সতত মন কেমন-করা এই ক্রাউন প্রিন্স ৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'মহৎ করুণার মন্দির' তৈরি করিয়েছিলেন। এদিকে বছর তিন হল দুশো পঁচাত্তরটি বৌদ্ধশাস্ত্রের পালি ও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি নিয়ে ভারত থেকে সিয়ানে ফিরেছেন হিউয়েন সাং। সে দেশের সম্রাট লি শিমিনের অনুরোধমতো লি জি তাঁকে দায়িত্ব নিতে বললেন এই 'মহৎ করুণা এবং মাতৃস্নেহ মন্দির'-এর। রাজি হলেন বৌদ্ধ আচার্য। তবে নিবেদন করলেন, এই বিপুল গ্রন্থসম্ভারের অনুবাদ করার ও চর্চা-গবেষণার জন্য একটি মঠ তৈরি করতে হবে কাছাকাছি। সম্রাট রাজি হলেন এই শর্তে যে হিউয়েন সাংকে দায়িত্ব নিতে হবে মঠের অধ্যক্ষ পদে। ভারত-পরিব্রাজক বললেন, তথাস্তু।

'বনহংস' মঠের গল্প শুনছিলাম এক তরুণ শ্রমণের কাছে। আমাদের অনুবাদক ইংরিজিতে তর্জমা করে দিচ্ছিলেন সেই কাহিনীগুলো। প্রাচীন ভারতে এক যক্ষের ওপর ভার পড়ল একটি মন্দির তৈরি করার। যক্ষরা বেশ রম্য ঘরবাড়ি বানাতে ওস্তাদ। পাঁচটি তলাযুক্ত একটা মন্দির তৈরি করল সে রাজার জন্য। তার প্রথম তলাটির রূপ দিল একটা হাঁসের আদলে। আচার্য সোয়াং ডজাংয়ের মনে ধরেছিল এই গল্পটা। তাই তিনিও বুনো হাঁসের গলার মতো পাঁচতলা এই প্যাগোডার ডিজাইন করলেন। আরেকটি গল্প এরকম: সেদিন বোধিসত্ত্বের (বুদ্ধের পূর্বজীবনের অবস্থা) ভিক্ষাদিবস। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সঙ্ঘারামের জন্য ভিক্ষা করার দিন। মহাবিহারের এক ভিক্ষু হা-হুতাশ করে নিজের মনেই বিড়বিড় করছিলেন, আজ আমার খাবার জন্য একটু মাংসও অবশিষ্ট নেই। বোধিসত্ত্ব হয়তো ভুলে গিয়েছেন সে কথা। ভাবতে না ভাবতেই হঠাৎ কোথা থেকে যেন ঝপ করে এক বড়সড় হাঁস এসে পড়ল তাঁর সামনে। শ্রমণ দেখলেন এত উঁচু থেকে পড়াতে হাঁসটির মৃত্যু হয়েছে তক্ষুণি। মনের দুঃখে আর প্রাণীটির প্রতি করুণায় সেই মরণভূমিতেই শ্রমণ একটি মঠ তৈরি করে দিলেন। সেই থেকে এর নাম হল 'বড় হাঁসের মঠ'। আরও একটি গল্প শুনলাম। প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্র ও সূত্রের সন্ধানে বেরিয়ে ক্লান্ত হিউয়েন সাং একবার অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছেন। এক ফোঁটা জলের খোঁজ পাচ্ছেন না ধারে কাছে। সহসা সামনে দেখেন এক রাজহাঁস। সে তাঁকে পথ দেখিয়ে এক জলাশয়ের কাছে নিয়ে এল। মহাস্থবিরের মনে হল— ইনি আর কেউ নন, বোধিসত্ত্ব। বুনো হাঁসের রূপ ধরে তাঁকে দেখা দিয়ে গেলেন করুণাময়। তাই সিয়ানের নতুন প্যাগোডার নাম রাখলেন 'বনহংস মঠ'।

গল্পে গল্পে বেলা শেষ হয়ে এল। এমনিতেই সেদিন সকাল থেকে ছিল ঘন কুয়াশা। দূরে পাহাড়ের গায়ে কালো করে মেঘ জমছে। একতলা-দোতলা করে সাততলায় মন্দিরের অভ্যন্তরে পুরনো খাড়াই সিঁড়ি ধরে উঠে গবাক্ষপথে বাইরে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, 'আহা কী দেখিলাম, জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না।'

সতেরো বছর কাটিয়েছেন হিউয়েন সাং এই মঠে। লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন কত গ্রন্থ। ৬৪৮ খ্রিস্টাব্দের এক ডিসেম্বরে তিনি কার্যভার নিয়েছিলেন এই মঠের।

হেনান প্রদেশে ইয়াসি গ্রামে তাঁর জন্ম ৬০২ খ্রিস্টাব্দে। আর এই সিয়ানেই মহাস্থবিরের বুদ্ধলোকে মহাপ্রস্থান ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে। তাঁকে সমাধি দেওয়া হয় পূর্ব সিয়ানে শ্বেতমৃগ মালভূমিতে। পরে তাঁর শরীরাবশেষ নিয়ে যাওয়া হয় ত্রিপিটক মন্দিরে।

সাত-মহলা মঠ থেকে নেমে এলাম ষাট একর জুড়ে বিস্তৃত আনুষঙ্গিক স্থাপত্যের ঘরে ঘরে। এখানেই আছে তিনটি উপাসনাগৃহ, অনুবাদ কক্ষ, পূর্ব ও পশ্চিমের সবুজ উঠোন। সেকালের অজস্র স্মৃতি-চিহ্ন।

সঙ্গীরা তাগাদা দিচ্ছেন— যাবেন না 'টেরাকোটা সোলজার মিউজিয়াম'? যেখানে বিস্তীর্ণ প্রত্নক্ষেত্রে এখনও খুঁড়ে তোলা হচ্ছে পোড়ামাটির অসংখ্য সেনানীর মূর্তি। হাজার আটেক সশস্ত্র সৈন্য, অসংখ্য ঘোড়া ও রথ নিয়ে বাইশ হাজার বর্গমিটার জুড়ে মাটির নীচে সঞ্চিত ছিল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে, তাদের রাজা চিনের প্রথম সম্রাট চিনসিহুয়াং (২৫৯-২১০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ)-এর জয়গাথা শোনাতে। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য, ইউনেস্কোর 'বিশ্ব ঐতিহ্য' এই অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিকরা আমার মনের অনেক পিছনে পড়ে রইল। ওদের কথা বলা যাবে অন্য সময়।

আপাতত হিউয়েন সাং এলেন মনের দরজায়। তাঁর কার্যভার গ্রহণের ১৪৫৪ বছর পর সেই ডিসেম্বরেই এসে তাঁর মঠের কোলে শান্তির কয়েকটি মুহূর্ত ফিরে পেলাম।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

জলপথে অরুণাচল

রবীন চক্রবর্তী

ব্রহ্মপুত্রের উজান বেয়ে অরুণাচল প্রদেশে যাব বলে ডিব্রুগড় শহরে এসে উপস্থিত হলাম এক শীতের দুপুরে। আসামের চায়ের খ্যাতি ভুবনজোড়া আর এই চা ব্যবসার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ডিব্রুগড়। শহরের উত্তরে ব্রহ্মপুত্র আর দক্ষিণে শুধু একের পর এক চা-বাগান। একটা রাত কাটিয়ে কাল ভোরে নৌকোয় উঠতে হবে, তাই আশ্রয় নিলাম প্রায় শতাব্দী-প্রাচীন কুসুম হোটেলে। হোটেলের সামনের অংশটি তার পুরনো চেহারা বজায় রেখেছে। পিছনের অংশটি নবনির্মিত এবং আধুনিক। হোটেলের যে ঘরটি আমার জন্য খুলে দেওয়া হল, শুধু এই ঘরটিতে থাকার জন্যই কলকাতা থেকে কষ্ট করে এতদূরে আসা চলে। দোতলার ওপর পুরো কাঠের তৈরি ছোট্ট কিন্তু পরিচ্ছন্ন ঘরটিতে সিঙ্গল খাট পাতা যা বহু বছর আগে সম্ভবত কোনও চা-বাগানের বাংলোর শোভাবর্ধন করত। ঘরের অন্য আসবাবপত্রও মিউজিয়ামে রাখার যোগ্য। কুসুম হোটেলের অবস্থান মারোয়াড়ি পট্টি এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রায় সবার আদি নিবাস ছিল বিহার, উত্তরপ্রদেশ বা রাজস্থান। ডিব্রুগড়ে বাঙালির সংখ্যাও কম নয়।

বেলা তিনটে নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম শহর দেখতে। বেশ বড় শহর এই ডিব্রুগড়। মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হবার পর শহরের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। বড় বড় কোম্পানির সুসজ্জিত শো-রুম দেখে মনে হয় কলকাতায় আছি। রাস্তাঘাটে প্রচুর লোকজন। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানেই নিরাপত্তা বাহিনীর সতর্ক পাহারা। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম ব্রহ্মপুত্রের কাছে। উদ্দেশ্য, খোঁজ-খবর করা, কাল ভোরে নৌকো কোথা থেকে, কখন ছাড়বে, কত ভাড়া ইত্যাদি। ব্রহ্মপুত্র দর্শন করে হতাশ হলাম। ভেবেছিলাম বিশাল এক জলপ্রবাহ দেখতে পাব, কিন্তু কোথায় কী! বিস্তৃত এক বালুকাময় প্রান্তর চোখের সামনে ভেসে উঠল। সরু সরু কয়েকটা জলের ধারা বয়ে চলেছে। এর মধ্যেই দেখি যাত্রীবোঝাই এক জিপগাড়ি নদীর বুকে নেমে সোজা এগিয়ে চলেছে। জানা গেল, এই জিপ চলেছে ফেরিঘাট। যাত্রীরা সেখানে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান জলস্রোত অতিক্রম করে সোনেরিঘাটে পৌঁছবেন। খোঁজ নিয়ে জানলাম ডিব্রুগড় থেকে জলপথে অরুণাচল প্রদেশ যেতে গেলে এখান থেকে আরও দশ কিলোমিটার উজানে গিয়ে যন্ত্রচালিত বড় নৌকোয়

উঠতে হবে। তার জন্য জিপের ব্যবস্থা আছে, ভাড়া মাথাপিছু ৩০ টাকা। নৌকোর ভাড়া জনপ্রতি ৮৫ টাকা। সকাল আটটায় ছেড়ে আট ঘণ্টা চলার পর নৌকো পৌঁছবে অরুণাচলের ওরিয়াম ঘাট। সেখানে পাশিঘাট যাবার বাস দাঁড়িয়ে থাকবে, দূরত্ব ৩৭ কিলোমিটার।

হোটেলে ফিরে দেখি রিসেপশন কাউন্টারে একজন সৌম্যদর্শন, প্রবীণ লোক হাসিমুখে এবং অনায়াস দক্ষতায় সবদিক সামাল দিচ্ছেন। পরিচয়ের পর মুহূর্তে আপন করে নিলেন। ইনি হলেন অমল কর। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে অনেকটা শখের বশে হোটেলের কাজে সময় দিচ্ছেন। আমার ভ্রমণসূচি জানতে পেরে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'কোনও চিন্তা নেই, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

আমার সামনেই পাশিঘাটে হোটেল সিয়াং-কে ফোন করে ঘর বুক করে দিলেন। তারপর ফোন করলেন এক জিপগাড়ির মালিককে। ঠিক হল কাল ভোর সাড়ে ছটায় গাড়ি হোটেল থেকে আমাকে তুলে নেবে।

জলপথে প্রয়োজন হবে ভেবে শুকনো খাবার কিনতে চলে গেলাম 'ওসমান বেকারি'। দোকান তখন বন্ধ হবার মুখে। এক কর্মচারী সবিনয়ে জানাল, আজ আর নয়। আমি ততোধিক মিষ্টি করে বললাম, 'আপনাদের সুনাম শুনে এতদূর থেকে এসেছি।' আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দোকানের শাটার বন্ধ করে দেওয়া হল। তিন মিনিটেই কেনাকাটা শেষ, তারপর শুধু গল্প আর আড্ডা। মালিক এবং কর্মীদের যেন বিশ্বাস হতে চায় না চাকরি বা ব্যবসার প্রয়োজন ছাড়া কেউ এভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। বড় এক প্যাকেট বিস্কুট দোকানের তরফ থেকে আমাকে উপহার দেওয়া হল।

৩ ডিসেম্বর ২০০১, সোমবার সকাল সাড়ে ছটায় জিপে চড়ে রওনা দিলাম ফেরিঘাটের উদ্দেশে। গাড়িতে বারো-তেরোজন যাত্রী। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি জিপ চলেছে ব্রহ্মপুত্রের উঁচু পাড়ের ওপর দিয়ে। আধঘণ্টার মধ্যেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম। নদীর ঘাটে গিয়ে আরেকবার হতাশ হতে হল। অপ্রশস্ত জলরাশির ওপর এক শ্রীহীন জলযান নোঙর করা আছে। চেহারা দেখে বিশ্বাস হচ্ছিল না এই বুড়ো নৌকোই আমাকে নিয়ে যাবে স্বপ্নের দেশ অরুণাচলে। দেখতে দেখতে যাত্রী এবং মালপত্রে নৌকো ভরে উঠল। প্রচুর কেরোসিনের ড্রাম, চাল, ডাল, চিনি, পেঁয়াজের বস্তা আর বনস্পতির টিন তোলা হল। নৌকোর একদিকে কাঠের আচ্ছাদন দেওয়া যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা আর টয়লেট। অন্যদিকে ইঞ্জিন ঘর। ইঞ্জিন ঘরের প্রশস্ত ছাদে অনেক খালি বস্তা রাখা ছিল। বেশ কিছু বুদ্ধিমান যাত্রী দেখি বস্তাকে গদি বানিয়ে বসে আছেন। আমিও একজনের পাশে বসে পড়লাম। আলাপ হতে দেরি হল না। আমার নতুন বন্ধুর নাম রহিমুদ্দিন শেখ। বাড়ি ধেমাজি জেলার জোনাই বাজারে।

সকাল আটটায় নৌকোয় প্রাণসঞ্চার হল। ইঞ্জিনের গর্জন শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। কী দাপট! 'বুড়ো' বলার জন্য নৌকোর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম।

অভিজ্ঞ লোকের কাছে শুনেছি উত্তর-পূর্ব ভারত বেড়াবার পক্ষে সেরা সময় নাকি ডিসেম্বর মাস। কথাটা বোধহয় সত্যি। কী চমৎকার আবহাওয়া। আকাশ একদম পরিষ্কার, বাতাসে হিমের পরশ। নৌকো চলতেই ঠান্ডা হাওয়া সামলাতে উইন্ডচিটার গায়ে দিতে হল। একটু পরেই নৌকো পরস্পর যুক্ত বিভিন্ন জলধারাকে অতিক্রম করে ব্রহ্মপুত্রের প্রায় মাঝখানে চলে এল। আমাদের বাঁদিকে অনেক দূরে, অরুণাচলের নীলাভ শৈলমালা দেখা যাচ্ছে, আর ডানদিকে শুধু চা-বাগান। নদীর জলের রং ঘোলাটে। নদীর বিশালতা এবার অনেকটাই বোধগম্য হচ্ছে। এখন শীতের সময় জল কম বলে অসংখ্য চর জেগে উঠেছে। কয়েকটি চরের আয়তন এতই বিশাল যে তাদের দ্বীপ বলাই ভালো। এখানে উদ্যোগী কৃষিজীবী চাষের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। উর্বর মাটিতে অল্প পরিশ্রমেই সোনার ফসল ফলছে, বর্ষাকালে এইসব ছোট-বড় চর জলের তলায় চলে যায়। ব্রহ্মপুত্র তখন আর নদী থাকে না, সাগর হয়ে যায়। তার সেই ভয়াল রূপ দেখলে বুক কেঁপে উঠবে।

নদী চর নিয়ে ভাবনার জাল ছিন্ন হল ঢং-ঢং করে ঘণ্টার আওয়াজ কানে যেতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নৌকোর ইঞ্জিনও বন্ধ হয়ে গেল। রহিমুদ্দিন জানালেন, এ হল বিপদ সঙ্কেত, অর্থাৎ জলের গভীরতা বিপজ্জনক ভাবে কমে গেছে। একবার নৌকো যদি জলের তলার মাটিতে আটকে যায় তাহলেই সর্বনাশ, এ সুন্দরবনের নদী নয় যে জোয়ারের জল এসে উদ্ধার করবে। ব্যাপারটা ভালো করে বোঝার জন্য নৌকোর সামনের দিকে চলে গেলাম। একজন লোক লম্বা বাঁশের লগি নিয়ে জলের গভীরতা মেপে সারেংকে নৌকোর গতিপথ নির্ণয় করতে সাহায্য করছে। বিপদ কেটে গিয়ে অবস্থা স্বাভাবিক হতেই সারেংয়ের সঙ্গে আলাপ করলাম। পরদেশী এবং উৎসাহী লোক দেখে কেবিনের দরজা খুলে পাশে বসতে বললেন। সারেংকে এখানকার লোকেরা মাঝি বলে। আমাদের এই মাঝির দেশ ভাগলপুর। ওর মামা ছিলেন এই নদীপথের এক ওস্তাদ কাণ্ডারি। আকাশ দেখে আর বাতাস অনুভব করে উনি নির্ভুল আবহবার্তা ঘোষণা করতেন। ইতিমধ্যে একটি ছেলে এসে চা দিয়ে গেল। যাত্রীরা দাম দিয়ে চায়ের শখ মেটাতে পারেন। যাঁরা দুপুরের খাবার খেতে ইচ্ছুক তাঁদের আগেই অর্ডার দিয়ে দিতে হবে। গরম ভাত, ডাল, তরকারি আর মুরগির ঝোল পাওয়া যাবে, দাম ৪৫ টাকা।

মাঝির সঙ্গে আড্ডায় মেতে ছিলাম তাই খেয়াল করিনি, নদীপথের দৃশ্য কখন যেন বদলে গেছে, এখন আমার সামনে শুধু জল আর জল। মাঝি জানাল, জলের গভীরতা কিন্তু বেশি নয়। মাঝি হঠাৎ আঙুল তুলে বলে উঠল 'ওই দেখুন পাখি'। দূরে, বাঁদিকের জলের ওপর অসংখ্য পাখির মেলা। তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে বাইনোকুলার বার করে চোখে দিলাম। পাখি চিনতে অসুবিধে হল না। এদের বলা হয় ডোরাশির রাজহাঁস (BAR HEADED GOOSE)। এই পরিযায়ী পাখিটি শীতকালে এই অঞ্চলে উড়ে আসে। গায়ের রং হালকা বাদামি আর মাথার পিছনে

দুটো কালো দাগ আছে। আমাদের নৌকো আরও একটু কাছে যেতেই রাজহাঁসের দল একসঙ্গে, বিরাট শব্দ করে, আকাশে উঠে পড়ল কিন্তু উধাও হয়ে গেল না। আকাশে কয়েক চক্কর মেরে দূরে গিয়ে আবার জলে বসে পড়ল। এত সুন্দর পরিবেশে পাখি দেখার আনন্দই আলাদা। এই নদীপথে আর যেসব পাখি আমার চোখে পড়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মেটে হাঁস (GREY DUCK), বালিহাঁস, খুন্তে বক, কোঁচ বক, সাদা কাঁক (GREY HERON), পানকৌড়ি আর মাছরাঙা। এছাড়া আরও কয়েকটি পাখি দেখেছি যাদের চিনতে পারিনি। শীতকালে ব্রহ্মপুত্র পাখিদের কাছে স্বর্গ বিশেষ।

রাজহাঁস দেখে নৌকোর খোলে ঢুকলাম অন্য যাত্রীরা কী অবস্থায় আছেন দেখতে। জায়গাটিকে এককথায় বলা যায় এ যেন নৌকোর অন্দরমহল। মহিলারা বাচ্চা-কাচ্চা সামলাতেই জেরবার। বেশিরভাগ পুরুষ যাত্রী নৌকোর ছাদে বসে তাস খেলায় মশগুল। যাঁরা সে স্বাধীনতাটুকু অর্জন করে উঠতে পারেননি তাঁরা বিরস বদনে পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর দিচ্ছেন। এখানেই আলাপ হল এক মারোয়াড়ি যুবকের সঙ্গে, নাম রাজেশ আগরবাল। পাশিঘাটের সম্পন্ন ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে, ডিব্রুগড়ে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এখন সপরিবারে ঘরে ফিরছেন। উনি কথায় কথায় জানালেন যে এই জলপথটি বেশ পুরনো। অরুণাচলে রাস্তাঘাটের অবস্থা যখন খুব খারাপ ছিল তখন এই নৌকোই ছিল পাশিঘাট অঞ্চলের লোকদের একমাত্র ভরসা। ইদানীং সাধারণ যাত্রীরা জলপথে পাশিঘাটে না এসে ডিব্রুগড়ে নদী পেরিয়ে শিলাপাথার দিয়ে সড়কপথেই যাওয়া-আসা করেন। কথাবার্তার মধ্যেই রাজেশবাবু বলে উঠলেন, 'ব্রহ্মপুত্রের ভাঙন দেখুন' মুখ বাড়িয়ে দেখি আমাদের নৌকো চলেছে নদীর ডানতীর ঘেঁসে। আমাদের একেবারে কাছেই দেখা যাচ্ছে এক চা-বাগানের অনেকখানি অংশ নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে। বাগানের লোকজন অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখছে। কয়েকটি চা-গাছ ডুবন্ত মানুষের মতো মাটি কামড়ে ঝুলে আছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তির ক্ষমতা নেই এই ভাঙনকে ঠেকাবে। ভারতবর্ষে ব্রহ্মপুত্রই বৃহত্তম নদ যার ওপর কোনও বাঁধ নির্মিত হয়নি। ব্রহ্মপুত্র তাই স্বাধীন। সে চলে তার নিজের খেয়ালে।

বেলা একটায় মধ্যাহ্নভোজন পরিবেশিত হল। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে এক চলমান জলযানের ছাদে বসে খাবার অভিজ্ঞতা চিরদিন মনে থাকবে। পেটে ভাত পড়লে বোধহয় অনুভূতি দুর্বল আর সুপ্তি প্রবল হয়ে ওঠে। ভাতঘুমের প্রভাব কাটার পর চোখ মেলে দেখি একটা দ্বীপে সারি সারি সবুজ রঙের তাঁবু খাটানো আছে। বেশ কিছু বিদেশি পুরুষ এবং মহিলাকে দেখলাম শিশুসুলভ আনন্দে মেতে আছেন। কয়েকজন মিলে ভলিবল খেলছেন। কেউ কেউ নদীর ধার ধরে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন। আমাদের দেখে হাত নাড়লেন। এঁরা বিত্তবান বিদেশি পর্যটকের দল। এঁদের ভারত ভ্রমণের পদ্ধতি একটু অন্যরকম।

এঁরা জানে প্রকৃতিকে কী করে উপলব্ধি করতে হয়। এখন দেখতে পাচ্ছি নদীর জল অনেক পরিষ্কার আর জলে স্রোতও অনেক বেশি। বোঝা গেল নৌকো আস্তে আস্তে জলপথ বেয়ে ওপরে উঠছে। যাত্রীদের মধ্যে হঠাৎ একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠল। জোনাই ঘাট এসে গেছে। ওরিয়াম ঘাট যাবার পথে শুধু এখানেই নৌকো থামে। নৌকোর বেশিরভাগ যাত্রী নেমে গেলেন। নতুন যাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মঙ্গোলীয় চেহারার উপজাতীয় মানুষকে দেখে মনে হল, অরুণাচলের দিকেই যাচ্ছি বটে। জোনাই থেকে ওরিয়াম ঘাট এক ঘণ্টার পথ। এই এক ঘণ্টার মধ্যেই দৃশ্যপট দ্রুত পাল্টাতে লাগল। নদী এখনও বেশ প্রশস্ত বটে কিন্তু প্রকৃতির কী খেয়ালে নদী যেন ডানদিকে হেলে পড়েছে। ফলে জলস্রোতের সবটাই নদীর ডানদিক ঘেঁসে তীব্র বেগে প্রবাহিত হচ্ছে আর নদীর বাঁদিক সোনালি বালিতে পূর্ণ। বড় বড় বনস্পতির কঙ্কাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। এগুলি হল গত বর্ষার স্মৃতিচিহ্ন। আমাদের জলযান যতই এগিয়ে চলেছে জলের স্বচ্ছতাও যেন বেড়ে চলেছে। মনে বাসনা ছিল ব্রহ্মপুত্রের ওপর দারুণ একটা সূর্যাস্ত দেখব কিন্তু শীতের আদিত্য নেমে গেল বন-পাহাড়ের আড়ালে তাই মনের ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে গেল।

দিনের আলো কমে আসছে। নদী সংলগ্ন জঙ্গল বেশ ঘন বলেই মনে হল। আন্দাজ করলাম ধারেকাছেই রয়েছে ডি এরিং অভয়ারণ্য, যার খ্যাতি বিভিন্ন প্রজাতির পাখির জন্য। হঠাৎ দেখি ঝোপঝাড় ঠেলে নদীর পাড়ের দিকে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসছে বড়সড় এক প্রাণী, গায়ের রং বাদামি, মাথায় শিং রয়েছে। কী ওটা? সম্বর হরিণ? শিং এত ছোট কেন? হায় কপাল, এ যে দেখছি গৃহপালিত গাভী। তার মানে ধারে কাছে নিশ্চয়ই গ্রাম আছে। যাত্রীরা আরেকবার চঞ্চল হয়ে উঠল। আমাদের নৌকো গিয়ে ভিড়ল অরুণাচলের ওরিয়াম ঘাটে।

পাশিঘাটের ছোট বাস যেন আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। যাত্রীরা ওঠা মাত্র ছেড়ে দিল। পাশিঘাটের ভাড়া নিল কুড়ি টাকা। অরুণাচলে প্রবেশ করেছি কিন্তু আমার ইনারলাইন পারমিট ব্যাগ থেকে বার করার প্রয়োজন হল না। পারমিট দেখার লোক কোথায়? আসলে এই পথে স্থানীয় লোকেরাই যাতায়াত করেন, বাইরের লোক কালে-ভদ্রে। ঘড়িতে দেখি চারটে বেজে গেছে, আলো বেশ কমে এসেছে। ওই আলোতেই দেখলাম ছোট্ট উপজাতীয় গ্রাম। কয়েকঘর দোকান-পাট, স্থানীয় মানুষের জটলা, বাচ্চাদের খেলাধুলা। ছোট্ট বাগান শীতের শাক-সবজিতে সবুজ হয়ে আছে, তারপর ঘন জঙ্গল।

পূর্ব সিয়াং জেলার সদর পাশিঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম সন্ধে ছটা নাগাদ। প্রায় সমতল শহরটি আলোয় ঝলমল করছে, রাস্তায় লোক চলাচল ভালোই। প্রচুর দোকান, কিন্তু ক্রেতার ভিড় চোখে পড়ল না। হোটেল সিয়াংয়ে আমার জন্য একটি দ্বিশয্যার ঘর খুলে দেওয়া হল। ভাড়া ২০০ টাকা, আমি একা বলে একটু ছাড় পাওয়া যাবে। থাকা-খাওয়ার জন্য হোটেলটিকে মধ্যবিত্ত পর্যটকদের পছন্দ হবে।

একটু বিশ্রাম নিয়ে, চা খেয়ে বাইরে বেরিয়ে চমকে উঠলাম। ঘড়িতে মাত্র সাতটা বাজে, এর মধ্যেই রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য, বেশিরভাগ দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে একটা শহরের চেহারা এমন আমূল পাল্টে যেতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। পরবর্তীকালে এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশিরভাগ শহরে। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম শুধু গুয়াহাটি আর আগরতলা।

বাধ্য হয়ে হোটেলে ফিরে গিয়ে রিসেপশন কাউন্টারে বসা ছেলেটির সঙ্গে আলাপ জমালাম। একা বেড়াবার সমস্যা আছে বটে কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হল মানুষের সাহচর্য এবং বন্ধুত্ব। কাউন্টারে ডিউটিতে রয়েছে রূপেশ ছেত্রী। নেপালি পরিবারের ছেলে হলেও ভালো বাংলা বলে। কথায় কথায় রূপেশকে অনুরোধ করলাম পাশিঘাট ঘুরে দেখার জন্য আগামীকাল একটা সাইকেল যোগাড় করে দিতে। সাইকেল ভাড়া যা লাগবে দেব। চৌকশ ছেলে রূপেশ সাইকেলের বদলে গোটা একটা অটোরিকশার ব্যবস্থাই করে দিল। সিয়াং হোটেলেই আরেক ভদ্রলোক পাশিঘাট ঘুরে দেখতে ইচ্ছুক ছিলেন। রূপেশ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। একটি চমৎকার যৌথ-উদ্যোগের সূচনা হল।

ভোরবেলায় লোকজনের হাঁকডাকে ঘুম ভেঙে গেল। বেড টি দিতে আসা ছেলেটি জানাল আমার ঘরের পাশেই বাজার বসেছে। চললাম বাজার দেখতে। রাস্তার ধারে হরেকরকম তরি-তরকারি আর শীতের শাক-সবজি বিক্রি করছে উপজাতীয় স্ত্রী-পুরুষ। নানা ধরনের কন্দ এবং ওল চোখে পড়ল। স্তূপীকৃত আলু, পেঁয়াজ, আদা, রসুন বিক্রি করছে বিহারি দোকানদার। মাছের বাজারে বাঙালি ব্যবসায়ীদের আধিপত্য। বিরাট আকারের মাগুর, বোয়াল এবং আড় মাছ বিক্রি হচ্ছে। মাছের বাজারে বেশ কয়েকজন প্রবাসী বাঙালিকে দেখলাম যাঁদের নজর ট্যাংরা, পারসে, পুঁটি, মৌরলার মতো ছোট মাছের দিকে। বাজারের একপ্রান্তে দেখি বেশ ভিড়। কাছে গিয়ে দেখি মিথুনের মাংস বিক্রি হচ্ছে। অরুণাচলের বেশ কিছু উপজাতীয় মানুষের কাছে মিথুনের গুরুত্ব অসীম। আদি, আপাতানি, নিশি, মিশমি, আকা, মিজি এবং বাংনি উপজাতির মানুষ যে-কোনও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মিথুন বলি দিয়ে তার মাংস আত্মীয় এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করেন। এই প্রাণীটিকে অর্ধ-গৃহপালিত জীব বলা যেতে পারে। গ্রামের নিকটবর্তী জঙ্গলে এরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করে এবং মানুষের সান্নিধ্যে এরা অভ্যস্ত। পাশিঘাটের বাজারে মিথুনের মাংস যারা কিনছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ খদ্দের উপজাতীয় আর বাকিরা নিম্নবিত্ত সমতলের মানুষ। বাজারে আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতা ইঁদুরের দোকানে। বড় আকারের মেঠো ইঁদুর বিক্রি হচ্ছে ডজন দরে। ইঁদুরগুলিকে মেরে, পাতলা দড়ি মুখে ঢুকিয়ে মালার মতো তৈরি করা হয়েছে। খদ্দের এসে ইঁদুরের শরীর স্বাস্থ্য দেখে দরদাম করছে। শিক কাবাবের মতো কায়দায় তৈরি করা মূষিকের মাংস নাকি অতি উপাদেয়।

বাজার দেখে, চায়ের সন্ধানে এক দোকানে ঢুকলাম। দোকানি উত্তরপ্রদেশের লোক। খদ্দের কম তাই কথা বলার অসুবিধে নেই। তিনি জানালেন, পাশিঘাট থেকে লক্ষ্মী সেদিনই বিদায় নিয়েছেন যেদিন থেকে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে কুণ্ডার ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। গাছের গুঁড়িকে এখানে কুণ্ডা বলা হয়। সিয়াং নদীর উজানে, গভীর জঙ্গলে, বড় বড় গাছ কেটে গুঁড়িগুলি নদীর জলে ফেলে দেওয়া হত। তীব্র স্রোতে ভেসে সেই গুঁড়ি চলে আসত পাশিঘাটে। পাশিঘাট হয়ে উঠেছিল কাঠ ব্যবসার এক বিরাট কেন্দ্র। স্থানীয় লোকেদের হাতে তখন অঢেল পয়সা। তবে এই লাভদায়ক ব্যবসার পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করত সমতলের মানুষ।

সকাল নটা নাগাদ আমি এবং গণপত জৈন অটোরিকশায় উঠে বসলাম। চালক পাশিঘাট এবং কাছেপিঠের দ্রষ্টব্যস্থল দেখিয়ে নিয়ে আসবে, ভাড়া ১৭০ টাকা। প্রথমেই রওনা দিলাম সবচেয়ে সুন্দর স্পট সিয়াং নদীর দিকে। যাবার পথে পাশিঘাটের বিমানক্ষেত্রটি চোখে পড়ল। আমাদের সামনেই একটা হেলিকপ্টার এসে নামল। কয়েক দশক আগে, যখন অরুণাচলের রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়নি, প্রত্যন্ত স্থানে কর্মরত সরকারি কর্মীদের যাওয়া-আসা এবং খাবার-দাবার পাঠানোর একমাত্র বাহন ছিল হেলিকপ্টার।

নদীর তীরে গিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। সিয়াং এত সুন্দরী! আকাশের নীলিমা নদীর স্বচ্ছ জলে প্রতিফলিত হয়ে জলধারাকে নীল রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। নদীর ওপারে হাল্কা নীল পাহাড়ের গায়ে খণ্ড-খণ্ড সাদা মেঘ হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওই পাহাড়ের পিছনেই লুকিয়ে আছে আদি-পাশিদের গ্রাম। সিয়াং নদীর উৎপত্তি মানস সরোবরের দক্ষিণ-পূর্বের এক হিমবাহ থেকে। তিব্বতে এর পরিচিতি সাংপো নামে। সাংপো নদী অরুণাচলে প্রবেশ করে নতুন নাম পেল সিয়াং। সিয়াং দিবাং এবং লোহিত নদীর মিলিত জলধারা আসামের সমতলে নেমে নাম পেল ব্রহ্মপুত্র। পাশিঘাটের খেয়াঘাটে নদী পারাপারের জন্য বড় নৌকোর ব্যবস্থা রয়েছে। ঘাটের কাছে কমলালেবু বিক্রি করছে দুটি মেয়ে। তাদের কাছেই জানলাম এ লেবু খুব মিষ্টি আর এসেছে আলং থেকে। লেবুর দোকানেই আলাপ এক আদি উপজাতীয় দম্পতির সঙ্গে। সোতাইলাম বোনাং ও তার স্ত্রী। দুজনেই রাজ্য সরকারের কর্মী। ভদ্রমহিলার হাতে একটা বেতের চুপড়িতে রাখা ছোট আরশোলার মতো পোকার প্রতি আমার কৌতূহল দেখে উনি জানালেন, এ হল এক ধরনের বিটল। নদীর ধারে পাথরের নীচে পাওয়া যায়। আদি সমাজে খুব সমাদৃত এই পোকা। বিশেষ পদ্ধতিতে রান্না করলে নাকি বেশ মুখরোচক।

পূর্ব ও পশ্চিম সিয়াং জেলার প্রধান উপজাতীয় জনগোষ্ঠী হল আদি। শিক্ষা, সম্পদ এবং জীবনযাত্রার মানে আদিরা অন্যদের থেকে এগিয়ে। প্রকৃতি উপাসক আদিদের প্রধান উৎসব হল সোলুং আর মোপিন। প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় সেপ্টেম্বরের প্রথমে আর দ্বিতীয়টি এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে। উৎসবের দিনে ঘরে তৈরি রাইসবিয়ার আপং ঢালাওভাবে পরিবেশিত হয়।

সিয়াংকে ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না, কিন্তু উপায় নেই, অটোচালক তাড়া দিচ্ছে। আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল সিয়াং নদীর ওপর নির্মীয়মাণ ব্রিজ। এই বিশাল কংক্রিটের সেতুটি তৈরি হয়ে গেলে এই অঞ্চলের মানুষ, বিশেষ করে দিবাং উপত্যকার অধিবাসীরা দারুণ উপকৃত হবেন। এতদিনে হয়তো ব্রিজ তৈরি হয়ে যেত, কিন্তু অর্ধ-সমাপ্ত ব্রিজ গত ১১ জুন, ২০০০-এ এক আকস্মিক জল-প্লাবনে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এবার আমরা চলেছি ডাঙ্গারিবাবার শিবমন্দির। আমার সফরসঙ্গী গণপত জৈন এতক্ষণ একটু চুপচাপ ছিলেন এবার ঠাকুর-দেবতার নাম শুনে নড়েচড়ে বসলেন। এই শিবমন্দিরটির অবস্থান আলং যাবার পথে। শিবভক্ত সাধু ডাঙ্গারিবাবার নামেই এটি বেশি পরিচিত। গিয়ে দেখলাম মন্দিরটি সম্প্রতি নতুন করে তৈরি হয়েছে। আর পাঁচটা শিবমন্দিরের সঙ্গে এর তেমন কোনও তফাত নেই শুধু একটা ব্যাপারে এই দেবালয়টি একটু আলাদা। মন্দিরের সংলগ্ন বিশাল এবং অদ্ভুত দর্শন এক বটগাছ। গাছের গোড়ায় অসংখ্য বটের ঝুরি প্রকৃতির খেয়ালে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। দেখলে মনে হয় যেন এক জটাধারী, ধ্যান-নিমগ্ন নাগা সন্ন্যাসী বসে আছেন।

দেবদর্শন শেষে অটো মুখ ঘোরাল পাশিঘাটের দিকে। গণপতবাবুর ইটানগরে ওষুধের ব্যবসা। ওঁর কিছু কাজ ছিল জেলা হাসপাতালে তাই আমারও সুযোগ হয়ে গেল অরুণাচলের একটা বড় স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেখার। বেশ বড় হাসপাতাল এবং যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। হাসপাতালের শীর্ষপদে একজন বাঙালি ডাক্তার আছেন দেখে গর্ব অনুভব করলাম। এরপর আর অটো থেকে নামা নয়। চালক দূর থেকেই দেখিয়ে দিল জওহরলাল নেহরু কলেজ, সার্কিট হাউস, ডেপুটি কমিশনারের অফিস আর বনদপ্তর। সবশেষে অটো এসে থামল হোটেল সিয়াংয়ে।

দুপুরের খাওয়া সেরেই ছুটলাম সিয়াং নদীর ধারে। সবুজ ঘাসে ঢাকা এক নিরালা জায়গায় বসে পড়লাম।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কলকাতা বা গুয়াহাটি থেকে বিমান এবং ট্রেনপথে ডিব্রুগড় যাওয়া যাবে। গুয়াহাটি থেকে ডিব্রুগড় আরামপ্রদ বাসেও যাওয়া যায়, দূরত্ব ৪৪০ কিলোমিটার। পাশিঘাট হল অরুণাচলপ্রদেশের অন্যতম প্রবেশদ্বার। এখান থেকে আলং, দাপোরিজো, জিরো হয়ে ইটানগর চলে যাওয়া যাবে। প্রতিটি শহরেই পর্যটকদের থাকার সুব্যবস্থা আছে। যাতায়াতের জন্য রয়েছে বাস এবং চমৎকার টাটা সুমো সার্ভিস।

ইটানগর থেকে বমডিলা এবং তাওয়াং বেড়িয়ে গুয়াহাটি ফিরে গেলে অরুণাচলের অনেকটাই দেখা হয়ে যাবে।

ইনারলাইন পারমিট: পারমিটের জন্য ভোটার পরিচয়পত্র সহ যোগাযোগ করতে হবে নীচের ঠিকানায়:

Arunachal Bhawan

Block CE-109/110, Setor-I, Salt Lake City, Kolkata-700 064

☎2334-1243, 2358-4107

পারমিট ফি: ১৫ টাকা

কোথায় থাকবেন

ডিব্রুগড়ে প্রচুর হোটেল। কুসুম হোটেলে থাকার সুবিধে হল এরাই পাশিঘাটে 'হোটেল সিয়াং'-এ থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। এদের কাছেই ওরিয়াম ঘাটগামী নৌকোর সর্বশেষ তথ্য পাওয়া যাবে।

কুসুম হোটেল, ঝালুকপাড়া, ডিব্রুগড়, পিন-৭৮৬ ০০১

☎(০৩৭৩) ২৩২০১৪৩, ২৩২৩৯৭৮

পাশিঘাটে সার্কিট হাউস এবং জেলা পরিষদ বাংলোয় থাকার অনুমতি দেবেন:

ডেপুটি কমিশনার, পাশিঘাট ☎(০৩৬৮) ২২২৩৪০

পাশিঘাটে মাঝারি মানের হোটেলের মধ্যে কয়েকটি হল:

হোটেল সিয়াং ☎(০৩৬৮) ২২২২০৯, **হোটেল অরুণ, হোটেল সাংগো।**

কখন যাবেন

অরুণাচলপ্রদেশ বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাস। সেরা সময় নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাস।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৩

তিনসুকিয়া প্যাসেঞ্জার যেন চলমান ভারতবর্ষ

রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত বেড়াতে গিয়ে নির্দিষ্ট ভ্রমণসূচি অনুসরণ করা বেশ কঠিন পরিস্থিতির অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে নিজেদের চলার পথও ঘন ঘন পালটাতে হয়। এর ফলে অনেক সময় নতুন পথে, নতুন জায়গায় পৌঁছে যেতে হয়। ঠিক এমনটিই ঘটল মিজোরামের রাজধানী আইজল থেকে শিলচর শহরে এসে। ভ্রমণসূচি অনুযায়ী আমাদের শিলচর থেকে বাসপথে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে যাবার কথা। দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার। বাসের টিকিট কাটতে গিয়ে শুনি আগামীকাল ভোর থেকে ৪৮ ঘণ্টার মণিপুর বন্ধের ডাক দিয়েছে কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র সংগঠন। সর্বনাশ, তা হলে উপায়! একবার মনে হল শিলচর থেকে বিমানপথে ইম্ফল চলে যাওয়া যাক। কিন্তু বন্ধের মধ্যে মণিপুরে গিয়ে হাজির হওয়াটা ঠিক হবে না ভেবে সে চিন্তা ত্যাগ করতে হল। এবার কী করা যায় এই নিয়ে ভ্রমণসঙ্গী কল্যাণ চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক হল পরদিন শিলচর থেকে সন্ধের ট্রেনে আমরা জোরহাটের উদ্দেশে রওনা দেব। জোরহাট থেকে কাজিরাঙা বেড়িয়ে তারপর যাব নাগাল্যান্ড আর মণিপুর।

শিলচর থেকে জোরহাট যেতে গেলে প্রথমে মিটারগেজ ট্রেনে লামডিং যেতে হবে। লামডিং জংশন থেকে ব্রডগেজ লাইনের তিনসুকিয়া প্যাসেঞ্জার আমাদের নিয়ে যাবে মারিয়ানি স্টেশন। সেখান থেকে বাসে জোরহাট শহর মাত্র এক ঘণ্টার পথ।

পরদিন প্রাতরাশের পর বেরিয়ে পড়লাম শিলচর শহর দেখতে। অপার সৌন্দর্যের আকর বরাক উপত্যকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনপদ শিলচর বাঙালি-প্রধান শহর। বাংলা ভাষা এবং বঙ্গ-সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলনের মাঝে ১৯ মে, ১৯৬১ সালে পুলিশের গুলিতে এগারোজন প্রাণ হারিয়েছিলেন। প্রতিবছর নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের স্মরণ করে শিলচরের মানুষ। গান্ধিবাগে ভাষা শহিদদের স্মৃতিস্তম্ভটি শিলচরের একটি অবশ্যদর্শনীয় স্থান।

শিলচর শহরে সবচেয়ে আনন্দ পেলাম কাছাড় ক্লাব দেখে। ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটি তৈরি হয়েছিল প্রধানত ইংরেজ রাজপুরুষ এবং

চা-বাগানের কর্তাদের জন্য। এখানেই মেজর জেনারেল জে ই শেয়ারারের উদ্যোগে গড়ে ওঠে শিলচর পোলো ক্লাব যাকে বিশ্বের প্রথম পোলো ক্লাব বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে শতাব্দী প্রাচীন এই ক্লাবটি ঘুরে দেখার সময় পুরনো ইতিহাস চোখের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে উঠছিল। বিলিয়ার্ড রুমটি দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। মহার্ঘ বিলিয়ার্ড টেবিলের ওপর এক মলিন আচ্ছাদন, ঘরের আনাচকানাচে ধুলো-বালি আর মাকড়সার জাল।

২৯ নভেম্বর ২০০২, শুক্রবার বিকেল ঠিক সাড়ে পাঁচটায় শিলচর স্টেশন থেকে ৫৮০২ ডাউন কাছাড় এক্সপ্রেস ছাড়ল। যাত্রীর ভিড় নেই, তাই অতি সহজেই স্লিপার কোচে দুটি বার্থ পাওয়া গেল। আলাপ হল অন্যতম সহযাত্রী বিজয় পালের সঙ্গে। শিলচরের মানুষ বিজয়বাবু ব্যবসাসূত্রে জোরহাটে রয়েছেন অনেক বছর ধরে। আমরা বেড়াতে এসেছি শুনে জানালেন আমাদের উচিত ছিল সকাল সওয়া সাতটার ট্রেনে ওঠা, তাহলে বরাক উপত্যকা আর হাফলং পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখার সুযোগ পেতাম। কথাটা শোনামাত্র চমকে উঠলাম। তাই তো! বিরাট ভুল হয়ে গেছে। শিলচর-হাফলং-লামডিং ট্রেনযাত্রার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নিতে এক সময়ে ভ্রমণরসিকরা দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসতেন। ১৯০৩ সালে যখন এই রেলপথটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় তখন এই বিশাল কর্মকাণ্ডকে ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতার এক চূড়ান্ত প্রকাশ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন পূর্তবিদ্যার পণ্ডিতরা। গভীর অরণ্যে ঢাকা দুর্গম পাহাড়ের ভেতর দিয়ে রেললাইন পাতার সময় তৈরি করতে হয়েছিল ৭৩টি বড় সেতু, ৫১৩টি ছোট ব্রিজ আর ৩৭টি টানেল। এদের মধ্যে আবার দয়াং নদীর ওপর নির্মিত ব্রিজটি নাকি অসাধারণ। কতবার বুনো হাতির হামলায় নির্মাণকর্মীদের তাঁবু তছনছ হয়ে গেছে। বিষাক্ত পোকামাকড় আর বিষধর ভুজঙ্গের দংশনে প্রাণ-সংশয় হয়েছে শ্রমিকদের, তবু কাজ বন্ধ হয়নি। এই অতীব দুরূহ কাজটি শেষ করতে সময় লেগেছিল মাত্র চার বছর। এমন একটি ঐতিহাসিক যাত্রাপথ আমরা রাতের অন্ধকারে অতিক্রম করব, একথা ভাবতেই নিজেদের ধিক্কার দিলাম।

শিলচর ছাড়ার পর এক ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেন পৌঁছে গেল বদরপুর জংশন। দূরত্ব ২৯ কিলোমিটার। বদরপুর থেকে একটি লাইন চলে গেছে ত্রিপুরার মনু পর্যন্ত। দূরত্ব ১৪১ কিলোমিটার। আর অন্যপথটি সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে হাফলং হয়ে লামডিং, দূরত্ব ১৮৫ কিলোমিটার। আমাদের এই কাছাড় এক্সপ্রেস নামেই এক্সপ্রেস, তার গদাই লস্করি চাল দেখলে প্যাসেঞ্জার ট্রেনও লজ্জা পাবে, কোথায় দাঁড়াচ্ছে, কেন দাঁড়াচ্ছে ড্রাইভার-গার্ড ছাড়া কেউ জানে না। এই নিয়ে অবশ্য আমাদের কোনও চিন্তা নেই। বিজয় পাল এই পথে বছরে তিন-চার বার যাতায়াত করেন। উনি জানালেন পরদিন সকাল সাতটায় তিনসুকিয়া প্যাসেঞ্জার লামডিং থেকে ছাড়বে, তার দেড় ঘণ্টা আগেই আমরা লামডিং পৌঁছে যাব।

পৌঁছে অবশ্যই যেতাম যদি না লামডিংয়ের ঠিক আগে মন্দারদিসা স্টেশনে

আমাদের দীর্ঘ সময় দাঁড়াতে হত। খোঁজখবর করেও আসল কারণটা জানা গেল না। কেউ বলল, মোষ কাটা পড়েছে, কেউ চাপা গলায় জানাল, রেললাইনে বোমা পাওয়া গেছে। আবার কে যেন বলে উঠল, ড্রাইভারকে পাওয়া যাচ্ছে না। অবশেষে আমাদের ট্রেন যখন লামডিং গিয়ে হাজির হল ততক্ষণে তিনসুকিয়া প্যাসেঞ্জার ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। বিজয় পাল এখন আমাদের দলপতি। বললেন, 'তাড়াতাড়ি আমার পিছন পিছন আসুন।' আমি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠলাম, 'টিকিট কাটতে হবে তো'। বিজয়বাবু ইঙ্গিতে জানালেন, এই নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে না।

একাধিক রেললাইন পেরিয়ে, হাঁপাতে-হাঁপাতে, নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দেখি গাড়িতে বেশ ভিড়। বসার জায়গা পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। এদিকে বিজয়বাবু দেখছি হেঁটেই চলেছেন। ট্রেনের একেবারে ল্যাজের দিকে গিয়ে উনি দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'উঠে পড়ুন,' উঠে পড়ব কি, এ যে আর এম এস (Railway Mail Service) কামরা। দ্বিধা করে লাভ নেই, ওদিকে গাড়ি ছাড়ার বাঁশি বেজে উঠেছে। উঠে পড়লাম। বেশ বড় কামরা। প্রথমদিকে কয়েকজন ডাক-কর্মী বেশ কিছু ক্যানভাসের বস্তা পরিবৃত হয়ে ভারি আনন্দে আছেন। আনন্দের কারণটা বোঝা গেল কামরার আরও ভেতরে ঢুকে। টিমটিমে আলোয় চোখে পড়ল বেশ কিছু যাত্রী মালপত্র নিয়ে বসে আছেন। জায়গার অভাব নেই তবু যাত্রীরা যেন স্বস্তিতে নেই। স্বস্তি আসবে কোথা থেকে, কারও কাছে যে টিকিট নেই। আর এম এস কর্মীদের 'সহযোগিতায়' তাদের স্থান হয়েছে এই বগিতে। আমরা গুছিয়ে বসার পর বিজয়বাবু আমাদের কাছ থেকে চল্লিশ টাকা নিয়ে কিছু সময়ের জন্য উধাও হলেন।

প্রথমে খেয়াল করিনি, পরে দেখলাম কামরার এদিকটার সবকটি লোহার শাটার নামানো রয়েছে। উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার। অন্দরমহলের অবস্থা যাতে বাইরের লোক, বিশেষ করে টিকিট চেকার, দেখতে না পারেন তাই এই ব্যবস্থা। ট্রেন ছাড়ার পর শাটারগুলো তুলে দেওয়া হল। আলোয় ভরে উঠল পুরো কামরা। পর্যাপ্ত আলোয় এবার আমাদের সহযাত্রীরা দৃশ্যমান হলেন। দেখার মতো দৃশ্য। কত রকমের লোক আর কতরকমের তাদের মালপত্র। বাক্স-প্যাঁটরা তো আছেই তাছাড়া রয়েছে হাঁস-মুরগি, শুয়োর, চালের বস্তা, বনস্পতির টিন আর ঝুড়ি ঝুড়ি তরিতরকারি। লোকজনের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় এরা সব খেটে খাওয়া মানুষ। শুধু তাই নয় এদের মধ্যে অনেকের পূর্বপুরুষই রুটি-রুজির সন্ধানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই অঞ্চলে এসেছিলেন। কারণটা হল অসংখ্য চা-বাগান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এই রেলপথের দুইধারে। চা-বাগানের শ্রমিকের কাজ করতে এখানে মানুষ এসেছে উত্তরবঙ্গ, বিহার মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ আর নেপাল থেকে। বাগানের যন্ত্রপাতির দেখভাল করতে মিস্ত্রির কাজ নিয়ে লোক এসেছে ওড়িশা থেকে। বাগানের হিসেবপত্র ঠিক রাখতে বাঙালি এসেছে। এছাড়া

চা-বাগানের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে লোক এসেছে দক্ষিণ-ভারত, পাঞ্জাব এমনকী পশ্চিম ভারত থেকে। আর এত লোকের অন্ন-বস্ত্র আর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান দিতে ব্যবসা খুলে বসেছেন রাজস্থান থেকে আসা ব্যবসায়ীর দল। বছরের পর বছর এই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এক‌েকটি চা-বাগানকে কেন্দ্র করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে এসেছেন। এক সম্প্রদায়ের উৎসবে অন্যরা অংশগ্রহণ করেছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এমন অনন্য নজির খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ট্রেনের গতি কমে আসতেই আন্দাজ করলাম স্টেশন আসছে। বিজয়বাবু জানালেন, আমরা এখন লামডিংয়ের পরের স্টেশন বারলাংফায় ঢুকছি। গাড়ি স্টেশনে ঢোকার আগেই অভিজ্ঞ যাত্রীরা পটাপট জানালার শাটার ফেলে দিলেন। আমাদের কামরায় দুজন নতুন যাত্রী উঠলেন। দুজনেই মহিলা। দেখে নেপালি বলেই মনে হল। এঁদের মধ্যে একজনের মাথায় বিরাট লাই শাকের বোঝা, কোলে দুষ্টু-মিষ্টি ছানা। মানুষের নয়, ছাগলের। গাঢ় বাদামি রঙের প্রাণীটির কপালের ঠিক মাঝের অংশ ধবধবে সাদা। মহিলাটি আমার কাছেই গাড়ির মেঝের ওপর বসলেন। আমি চাইতেই ছাগল ছানাটিকে আমার কাছে দিয়ে দিলেন। কোলে নিয়ে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। মনের এই আনন্দ কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। মনটা খুঁত-খুঁত করছে। প্রতিটি স্টেশনেই যদি জানালা বন্ধ থাকে তবে এ পথের রেলস্টেশনগুলির চেহারা, স্বভাব-চরিত্র কিছুই তো জানা যাবে না। বিজয়বাবু এই পথের বিশেষজ্ঞ, তিনিই সমস্যার সমাধান করলেন। ডাক-কর্মীদের কাছে গিয়ে কী কথা বললেন জানি না, পরের স্টেশন আসতেই আমাদের দুজনকে নিয়ে গিয়ে ওদের মাঝে বসিয়ে দিলেন। তাঁরা যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গেই আমাদের গ্রহণ করলেন। একটু পরেই তাদের মধ্যে একজন আগ্রহ নিয়ে আমায় প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কোন কাগজে লেখেন?' বুঝলাম বিজয়বাবু আমাদের পরিচয় দিয়েছেন সাংবাদিক বলে। মনে মনেই তাঁর বুদ্ধির তারিফ করলাম।

লামডিং থেকে ৩২ কিলোমিটার এসে গাড়ি দাঁড়াল দিফু স্টেশনে। এখানে কয়েকজন লোক উঠল আমাদের কামরায়। চেহারায় মঙ্গোলীয় ছাপ। ডাক কর্মীদের মধ্যে একজন জানালেন, এরা নাগা। শুনে আমি অবাক। এরা যদি নাগা হন তাহলে ওরা কারা। 'ওরা' অর্থে নাগাল্যান্ডের সব ছবিতেই যাদের দেখা যায়। মাথায় পাখির পালক গোঁজা জবরজং টুপি, গলায় পাথরের মালা, হাতে বর্শা, পরনে কৌপিন সদৃশ বস্ত্রখণ্ড। আমাদের সহযাত্রী নাগাদের পরনে জামা প্যান্ট, মাথায় টেরি কাটা, হাতে গাঁইতি-বেলচা। অচিরেই আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। এই নাগারা রেলের চাকরি সূত্রে এই অঞ্চলে বাস করছেন কয়েক পুরুষ ধরে। এখন প্রায় সমতলের অধিবাসী হয়ে পড়েছেন। এই 'নাগাত্ব' হারানো নাগাদের আরও কাছ থেকে দেখার লোভে তাদের কাছাকাছি গিয়ে বসলাম। ইতিমধ্যে কামরার যাত্রীরা মোটামুটি জেনে গেছেন যে আমরা দুই বন্ধু দেশ দেখতে

বেরিয়েছি। তাদের কাছে ব্যাপারটি বেশ নতুন। আমাদের ট্রেনযাত্রা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত হয় তা দেখার জন্য সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা।

দিফুর পরের স্টেশন ধানসিঁড়ি। নদীর নামে স্টেশন। নামটা শোনামাত্র কবি জীবনানন্দ দাশের কথা মনে পড়ে গেল। ওঁর কবিতায় বিখ্যাত হয়েছে ধানসিঁড়ি নদী। একটু আগে যে ধানসিঁড়ি নদীটি আমরা পেরিয়ে এলাম তা নাগা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ৩৫২ কিলোমিটার পথ চলার পর ঝাঁপ দিয়েছে ব্রহ্মপুত্রের বুকে। এতই আঁকাবাঁকা পথে বয়ে গেছে এই ধানসিঁড়ি নদী যে ভৌগোলিকরা এর উল্লেখ করেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে সর্পিল নদীগুলির একটি বলে।

ধানসিঁড়ির পরের স্টেশন রাঙা পাহাড়, তারপর এল ডিমাপুর। এখানে অনেকক্ষণ গাড়ি দাঁড়াল। আমাদের নাগা সহযাত্রীরা নেমে গেল, তার বদলে উঠল বেশ কয়েকজন বাঙালি। আলাপ হতে দেরি হল না । এরা ডিমাপুরে আছেন অনেক বছর। শুনলাম তাদের কথা। সুখের কথা কম, দুঃখের কথাই বেশি। ইদানীং স্থানীয় ভূমিপুত্রদের সঙ্গে যথেষ্ট মানিয়ে গুছিয়ে চলতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই তুচ্ছ ঘটনাকেও ইচ্ছাকৃত ভাবে বড় অশান্তির আছিলা হিসেবে কাজে লাগাচ্ছেন সুযোগ সন্ধানীরা।

ডিমাপুরের পর বোকাযান ছাড়িয়ে চোঙাযান স্টেশনে এসে গাড়ি সেই যে দাঁড়াল দাঁড়িয়েই রইল। প্ল্যাটফর্মে ডাঁই করে রাখা পর্বতপ্রমাণ তরিতরকারি গাড়িতে তোলার কাজ চলতেই থাকল। শীতকালের কোনও সবজি বোধ হয় বাদ যায়না। পুরো স্টেশন চত্বরে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। এর মধ্যেই স্টেশন সংলগ্ন মাঠের সাপ্তাহিক হাটের কিছুটা অংশ প্ল্যাটফর্মের ওপর চলে আসাতে ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। সে এক প্রচণ্ড গোলমেলে পরিস্থিতি। কারা বাজার করতে এসেছে আর কারা ট্রেনের যাত্রী বোঝে কার সাধ্যি। আমি দেখলাম এই ভালো সুযোগ প্ল্যাটফর্মে নেমে জনতার ভিড়ে মিশে যাবার। চোঙাযান স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল পাক্কা এক ঘণ্টা তিরিশ মিনিট। এই সময়টুকু মুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু দেখেই গেছি। প্ল্যাটফর্মের ওপরেই কতরকম পণ্য বিক্রি চলছে। ভুটানি মহিলা সোয়েটার গছাচ্ছে চা-বাগানের দারোয়ানকে। দারোয়ানজির না কিনে উপায় নেই। সোয়েটার তো পছন্দ হয়েছেই তার চেয়েও বেশি মনে ধরেছে পসারিণীর মোহিনী হাসি। প্ল্যাটফর্মের একধারে বিক্রি হচ্ছে শুয়োরের মাংস। পঞ্চাশ টাকা কিলো। তার পাশেই বিক্রি হচ্ছে হাঁস, মুরগি আর মাছ। নরসুন্দর একমনে তার খদ্দেরকে সুন্দর করার কাজে মগ্ন। সেই দৃশ্য মুগ্ধ চোখে দেখছে বেশ কয়েকজন লোক। এর মধ্যেই কে একজন কলার খোসায় পা দিয়ে আছাড় খেল। যারা ধরাধরি করে তুলল তারা তাকেই না দেখে শুনে পথ চলার জন্য বকাবকি করল। ট্রেনের যে যাত্রী জানালা দিয়ে খোসা ফেলেছিল তাকে কেউ কিচ্ছু বলল না।

তিনসুকিয়া প্যাসেঞ্জারের অন্যান্য কামরার চেহারা দেখে আঁতকে উঠলাম।

মানুষ, মালপত্র আর তরকারির ঝুড়ি মিলেমিশে একাকার হয়ে দরজার মুখ পর্যন্ত উপচে পড়ছে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড এই অবস্থাতেও যাত্রীদের মুখে হাসি লেগে আছে। কার ঝুড়ি কার পায়ে পড়ল, কার ছাতার খোঁচায় কার জামা ছিঁড়ল এই নিয়ে কোনও অশান্তি নেই। দেখে মনে হল গন্তব্যস্থলে হেঁটে যেতে হচ্ছে না এই আনন্দেই সবাই মশগুল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল এই তরিতরকারির বেশিরভাগটাই নেমে যাবে ফুরকাটিং জংশনে, চোঙাযান থেকে যার দূরত্ব ৫১ কিলোমিটার।

চোঙাযানের পরের দুটি স্টেশন সরুপাথার আর বড়পাথার বাঙালিপ্রধান এলাকা। এই বাঙালিদের বেশিরভাগের আদি নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা, সিলেট, ময়মনসিংহ আর রংপুর জেলায়। এতই অতিথিবৎসল এই ছিন্নমূল মানবগোষ্ঠী যে বারে বারে আমাদের অনুরোধ করছিলেন তাঁদের সঙ্গে একটা দিন কাটিয়ে যেতে। বড়পাথারের পরের স্টেশন জামগুড়ি। এখানে বেশ কয়েকটি পাকাকলার কাঁদি নিয়ে উঠল দুজন মহিলা। চেহারা দেখে মনে হল কোনও এক সময়ে এদের দেশ ছিল সাঁওতাল পরগনা। কাঁঠালি কলার চেয়ে আকারে বড় এই কলা কেনা হল বিজয়বাবুর উদ্যোগে। দাম পড়ল পাঁচ টাকা ডজন। খেতে ভালোই তবে ভেতরে বিচি থাকায় কলা খেয়ে তৃপ্তি হল না। জানালা দিয়ে দেখি নীলাভ পাহাড়ের শ্রেণী ট্রেনপথের অনেক কাছে চলে এসেছে। ভাবনা চিন্তা করে মনে হল এ নিশ্চয়ই মিকির পাহাড়। গত বছর এই পাহাড় চোখে পড়েছে তেজপুর থেকে কাজিরাঙা যাবার সময়, পথের ডানদিকে। এখন এই মিকির পাহাড় আমাদের বাঁদিকে বিরাজমান। এই অঞ্চলটি এখন কার্বিআংলং জেলার অন্তর্গত। মিকির পাহাড় দেখেই আমার মনে পড়ল হিসেব মতো আমার ডানদিকে নাগা পাহাড় চোখে পড়ার কথা। একরাশ কৌতূহল নিয়ে চোখ রাখলাম উল্টোদিকের জানালায়। ওই তো দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট শৈলমালা, যা নাগা হিলস নামেই পরিচিত।

লামডিং থেকে রওনা হবার পর ট্রেনপথের ধারেই কৃষিক্ষেত্র আর চা-বাগান চোখে পড়ছিল। এবার দেখলাম বড় বড় আখের খেত। এই আখ চাষিদের আদি নিবাস ছিল বিহার এবং উত্তর প্রদেশ। আখচাষ করে এরা এখন বেশ সম্পন্ন কৃষক। জামগুড়ির পরের স্টেশন ফুরকাটিং এই পথের গুরুত্বপূর্ণ জংশন। এখানেই ঘটল অঘটন। রেল দুর্ঘটনা নয়, তারচেয়েও খারাপ। টিকিট চেকারের নজরে পড়ে গেলাম। এর জন্য দায়ী আমাদের চায়ের নেশা। অনেকক্ষণ ধরেই চায়ের জন্য প্রাণ আনচান করছিল। বন্ধ জানালার ওপারে চা-বিক্রেতার হাঁক-ডাক শুনে জ্ঞানহারা হয়ে জানালার শাটার তুলতেই আবিষ্কার করলাম দু-হাত দূরেই টিটি সাহেব চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছেন। আমি ওঁকে দেখলাম, উনি আমাকে দেখলেন। টিটি প্রশ্ন করলেন 'কোথায় নামবেন?' আমি উত্তর দিলাম মারিয়ানি। টিটি মৃদু হেসে প্রস্থান করলেন। আমার আর টিকিট চেকারের চার চোখের

শুভদৃষ্টি বিজয়বাবুর নজর এড়াল না। উনি প্রমাদ গুনলেন। মারিয়ানি স্টেশনে নামামাত্র আমরা যে এই টিটির হাতে পড়ব তাতে কোনওই সন্দেহ নেই। সে এক বিশ্রী ব্যাপার হবে। তা হলে উপায়? উপায় ঠিক করতে তিন মাথা এক করলাম। ঠিক যেন যুদ্ধক্ষেত্রে তিন সেনাপতি। অনেক ভেবেচিন্তে রণকৌশল স্থির হল।

বিজয়বাবু জানালেন মারিয়ানির আগেই আমরা তিতাবর স্টেশনে নেমে পড়ব। তিতাবর থেকে জোরহাট যাবার বাস আছে। সমস্যার চমৎকার সমাধান। খটকা শুধু এক জায়গায়। তিতাবর স্টেশনে নামার পর যদি টিটি ধরে? আবার আরেকপ্রস্থ আলোচনা। এবার আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন একাধিক সহযাত্রী। সে কী উৎসাহ তাদের! এদের মধ্যে শেষ কে কবে রেলের টিকিট কেটে এই পথ পাড়ি দিয়েছেন জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারবেন না। আমাদের সহযাত্রীদের কাছে আমরা মাননীয় অতিথি। সেই অতিথিরা বিপদে পড়েছেন, এই অবস্থায় তাঁরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন?

সহযাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে পোড় খাওয়া মানুষটির কথাই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হল। ঠিক হল তিতাবর স্টেশনে গাড়ি থামার পর সহযাত্রীদের মধ্যে দুজন 'স্বেচ্ছাসেবক' আমাদের মালপত্র নিয়ে ভাঙা রেলিংয়ের চোরা পথ দিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে। আমরা তিনজন গাড়ি ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে চট করে ট্রেন থেকে নেমে সেই চোরা পথ দিয়েই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাব।

ফুরকাটিং জংশনের পর দেখতে দেখতে পরের দুটি স্টেশন কামারবান্ধা আর চাকিটিং পেরিয়ে গেলাম। বাইরের শোভা দেখা মাথায় উঠল, মনে শুধু একটাই চিন্তা, তিতাবরে কী ঘটবে। বিজয় পালের কাছে জানতে চাইলাম এত যাত্রীদের মধ্যে কজন টিকিট কেটেছে? আমরাই বা এত দুশ্চিন্তা করছি কেন? পালবাবু অতি প্রাঞ্জল ভাবে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিলেন। আর এম এস কামরায় আমাকে আবিষ্কার করা মাত্র অভিজ্ঞ টিকিট চেকার যা বোঝার বুঝে নিয়েছেন। দশ-বিশটা চুনোপুঁটি ধরার চেয়ে দু-তিনটে রুই-কাতলা ধরা অনেক কাজের। যতক্ষণ আমরা এই কামরায় আছি, কোনও চিন্তা নেই। অলিখিত নিয়ম মেনে কোনও চেকার এই বগিতে উঠবে না। কিন্তু মারিয়ানি স্টেশনে নামামাত্র আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য টিটি সাহেব যে উপস্থিত থাকবেন তাতে কোনওই সন্দেহ নেই। পরবর্তী হেনস্থার ছবি মনে মনে কল্পনা করে ঘেমে উঠলাম।

তিতাবর স্টেশনে গাড়ি ঢুকছে। মনে প্রচণ্ড উত্তেজনা। সেই ছোটবেলায় লুকোচুরি খেলেছি, আজ এত বছর পর ঠিকমতো খেলতে পারব তো?

অবাক কাণ্ড! তিতাবর স্টেশনে পৌঁছবার পর থেকে আমাদের পরিকল্পনা এত নিখুঁত ভাবে বাস্তবায়িত হল যে প্ল্যাটফর্মের বাইরে গিয়েও বিশ্বাস হচ্ছিল না যে বিপদ কেটে গেছে। সম্বিত ফিরল ট্রেনের তীব্র হুইসলে। তিনসুকিয়া প্যাসেঞ্জার নড়ে উঠেছে। এবার সে চলেছে ১৩ কিলোমিটার দূরের মারিয়ানির দিকে। আর

এস এস কামরার প্রতিটি জানালায় শুধু মানুষের মুখ। আমাদের ছেড়ে আসা সহযাত্রীরা হাত নাড়ছেন, মনটা ভার হয়ে গেল।

বিশ্ববিখ্যাত ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস বা ট্রান্স-সাইবেরিয়ান এক্সপ্রেসে চড়ার সৌভাগ্য এই জীবনে আর হল না। তবে আজ যা পেলাম তাই বা কম কী! তিনসুকিয়া প্যাসেঞ্জার আজ আমাদের অনস্বাদিতপূর্ব মধুর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছে। প্রাণ ভরে শুধু মানুষ দেখেছি। এমন মানুষ যারা দিন আনে দিন খায়। কিন্তু অপরিচিতকে আপন করে নেওয়ার কঠিন কলা যাদের করায়ত্ত।

'ভ্রমণ' অক্টোবর, ২০০৪

নারিকেল জিঞ্জিরা দ্বীপে

রবীন চক্রবর্তী

বাংলাদেশ ভ্রমণের প্রস্তুতি পর্বে বিভিন্ন তথ্যপুস্তিকা এবং মানচিত্রে চোখ বোলাতে গিয়ে বাংলাদেশের শেষ ভূখণ্ড সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বেড়িয়ে আসার প্রবল তাগিদ অনুভব করলাম। সেন্ট মার্টিন নিয়ে বিস্তারিত তথ্য অবশ্য পাওয়া গেল না। শুধু জানা গেল এটি একটি প্রবাল দ্বীপ এবং সেখানে যেতে গেলে টেকনাফ থেকে মাছধরা ট্রলারে চেপে আড়াইঘণ্টার জলপথ অতিক্রম করতে হয়।

বাংলাদেশের নানা জায়গায় বেড়িয়ে একদিন গিয়ে হাজির হলাম কক্সবাজার শহরে। প্রচুর বড় বড় হোটেল আর রিসর্ট দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে বাংলাদেশের পর্যটন মানচিত্রে কক্সবাজারের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। শীতের মরসুমে ছুটির দিনগুলোতে পর্যটকদের ভিড় এখানে উপচে পড়ে। ভোরের দিকে কক্সবাজারের সাগরসৈকত ধরে হিমছড়ির দিকে পথ চলার অভিজ্ঞতা সত্যি অনুপম। বিকেলে সূর্যাস্তের দৃশ্যও কম আকর্ষণীয় নয়। কক্সবাজারে থাকার সময় সেন্ট মার্টিন দ্বীপ সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল এখানকার একাধিক পর্যটন সংস্থা ভ্রমণরসিকদের এই প্রবাল দ্বীপ ঘুরিয়ে নিয়ে আসেন। ভোরে বেরিয়ে রাতে ফেরা। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনেক কম খরচে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বেড়িয়ে আসা যায়, এই কথা জেনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

১৫ ডিসেম্বর, ২০০৪, সকাল সাতটা নাগাদ কক্সবাজার থেকে বাস ছাড়ল ৮৫ কিলোমিটার দূরের টেকনাফের উদ্দেশে। রাস্তা বেশ ভালো, তাই মসৃণগতিতে এগিয়ে চললাম বাংলাদেশের দক্ষিণতম প্রান্তের দিকে। পনেরো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বাস দাঁড়াল উখিয়া। পথের দুধারেই হাট বসেছে। শীতের শিশিরে ভেজা তাজা তরি-তরকারি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। আমরা যে সড়কপথ ধরে চলেছি তার ডানদিকে ছয়-সাত কিলোমিটার গেলেই বঙ্গোপসাগর। কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সৈকত বিশ্বের দীর্ঘতম। সড়কপথ এবং সাগরসৈকত প্রায় সমান্তরালভাবে অবস্থান করছে। উখিয়া ছেড়ে আসার কিছুক্ষণ পরে আমার সহযাত্রী বাঁদিকের নীলাভ শৈলমালার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানালেন, ওই অঞ্চলটি মায়ানমারের এলাকা। উখিয়া ছাড়া এই পথের অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য জনপদ হল পালংখালি আর হোয়াইকং। আমার

পাশের সিটের যাত্রী জনাব আবুল হোসেন পেশায় স্কুলশিক্ষক এবং তাঁর নেশা দেশভ্রমণ। উনি একাধিকবার ভারতের বিভিন্ন জায়গা বেড়িয়ে এসেছেন। ওঁর কাছে বাংলাদেশের এই অঞ্চল সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য সংগ্রহ করলাম। ওঁর কাছেই জানা গেল এই এলাকায় প্রচুর বার্মিজ উদ্বাস্তুর বাস। হোসেন সাহেবের কাছেই প্রথম শুনলাম ছেড়া দ্বীপের কথা। সেন্ট মার্টিন দ্বীপের অদূরেই বেশ কিছু প্রবাল দ্বীপ জড়াজড়ি করে সাগরে ভেসে আছে। দেখে মনে হয় সৃষ্টিকর্তা এক ভূখণ্ডকে বেশ কয়েক টুকরোয় ছিঁড়ে ফেলে সাগরে নিক্ষেপ করেছেন। তাই স্থানীয় মানুষ এই দ্বীপসমষ্টির নামকরণ করেছেন 'ছেড়া দ্বীপ'।

টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যাবার জন্য তিনরকম জলযানের ব্যবস্থা আছে। সবচেয়ে কমখরচে যাওয়া যাবে সাধারণ ট্রলারে, ভাড়া ৫০ টাকা। এর ওপরেই রয়েছে ছোট জাহাজ যা সি-ট্রাক নামে পরিচিত। এতে যাতায়াতের ভাড়া ২৫০ টাকা। এছাড়া রয়েছে অপেক্ষাকৃত বড় এবং আরামপ্রদ জাহাজ কেয়ারি সিন্দবাদ, যার যাতায়াতের ভাড়া ৩৫০ টাকা। হোসেন সাহেবের পরামর্শ মতো ঠিক করলাম টেকনাফ থেকে সি-ট্রাকে চেপেই সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পৌঁছে যাব।

টেকনাফ নদীবন্দরটিকে নতুনভাবে নির্মাণ করার কাজ শেষ হয়েছে ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে। সি-ট্রাকের কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে জাহাজঘাটায় প্রবেশাধিকার পেলাম। প্রচুর পর্যটক এসেছেন ঢাকা এবং চট্টগ্রাম থেকে। এদের প্রাণোচ্ছল কলরবে বন্দর এলাকা মুখরিত হয়ে রয়েছে। ভাসমান জেটি থেকে প্রথমে ছাড়ল কেয়ারি সিন্দবাদ। বেলা দশটায় ছাড়ল আমাদের সি-ট্রাক। ছোটখাটো, গাট্টা-গোট্টা দেখতে এই জলযানের নামটিও বেশ পুরুষালি, এস টি খিজির। পরে রওনা দিয়েও কেয়ারি সিন্দবাদের আগে সেন্ট মার্টিন পৌঁছে যাবে এই খিজির। আমার সহযাত্রীদের সংখ্যা প্রায় দুশো। এদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ সেন্ট মার্টিন দ্বীপ দেখে আজ বিকেলেই ফিরে আসবেন। টেকনাফ থেকে রওনা দিয়ে আমরা নাফ নদীর ওপর দিয়ে সোজা দক্ষিণদিকে ভেসে চললাম। প্রথমেই চোখে পড়ল বিশাল চওড়া নদীর ওপর অবস্থিত ছোট একটা দ্বীপ। দ্বীপের ওপর বাদাবন দেখে আমার সুন্দরবনের কথা মনে পড়ে গেল। নাফ নদীর মাঝখান দিয়ে বাংলাদেশ এবং মায়ানমার রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সীমারেখা টানা আছে। বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের একাধিক দ্রুতগামী জলযান চোখে পড়ল। চারদিকের দৃশ্য ভালোভাবে দেখার জন্য জাহাজের ছাদে উঠে দেখি ইতিমধ্যেই সেখানে বেশ কিছু যাত্রী উপস্থিত রয়েছেন। সকলেই যে শোভা দেখছেন তা নয়, অনেকেই তাস নিয়ে মেতেছেন, আবার কয়েকটি পরিবার সঙ্গে আনা খাদ্যসম্ভার নিয়ে মহাব্যস্ত। জাহাজের প্রায় মাথার ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকের শোভা সত্যি মনোমুগ্ধকর। আমাদের পিছনে ফেলে এসেছি টেকনাফ বন্দর এবং জনপদ, সামনে নাফ নদীর প্রশস্ত মোহনা সাগরের রূপ ধরেছে, ডানদিকে বাংলাদেশের জনবিরল জলাভূমি আর বাঁদিকে, অনেকটা দূরে, মায়ানমারের এলাকায়, আরাকান পাহাড়ের

পাদদেশে এবং নদীর ধারে ছোট-বড় জনবসতি চোখে পড়ছে। বিশেষ করে চোখে পড়ছে বিশাল এক বৌদ্ধ মন্দির বা প্যাগোডা। প্যাগোডার সোনালি শীর্ষদেশ সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। আমাদের জাহাজের গতিপথের দুধারেই প্রচুর জেলেনৌকা মাছধরা জালের পাশে স্থির হয়ে আছে। এতক্ষণ সামনের আর দুদিকের জগৎ নিয়েই মগ্ন ছিলাম হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমার পিছনেই ঘটে চলেছে এক দারুণ আকর্ষণীয় কর্মকাণ্ড। আমাদের চলন্ত জাহাজের পিছন পিছন উড়ে চলেছে বেশ কিছু ছোট প্রজাতির গাংচিল। জাহাজের প্রপেলারের অভিঘাতে আন্দোলিত জলে ছোট ছোট মাছ বেসামাল হয়ে পড়লেই আকাশ থেকে এই সুযোগসন্ধানী বিহঙ্গের দল ডানা গুটিয়ে তীরের মতো নেমে আসছে জলে আর অব্যর্থ লক্ষ্যে শিকার ধরে আবার নীল আকাশে ডানা মেলে দিচ্ছে।

একঘণ্টা জলবিহার শেষে নাফ নদীর মোহনা অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে পড়লাম। ডানদিকে শাহপরী দ্বীপকে ফেলে রেখে আরও এগিয়ে যেতেই শুধু জল আর জল, শীতের শান্ত সমুদ্র দেখে কল্পনাও করা যায় না বর্ষাকালের ঝড় জলে কী ভয়ঙ্কর রূপ ধরে এই দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি। চলার পথে ইতিমধ্যেই কেয়ারি সিন্দবাদ-কে পিছনে ফেলে দিয়েছে আমাদের খিজির। সিন্দবাদকে অতিক্রম করার সেই মুহূর্তে আমার সহযাত্রীদের প্রবল উল্লাসধ্বনি বোধহয় সেন্ট মার্টিন দ্বীপেও পৌঁছে গিয়েছিল।

প্রখর রোদের তাপ সহ্য করতে না পেরে ছাদে বসে থাকা অনেক যাত্রী লোয়ার ডেকে ফিরে গেছে। যারা আছে তারাও অবনত মস্তকে ঝিমুচ্ছে। এই অবস্থায় এক চা-বিক্রেতার সরব ঘোষণা— ওই সেন্ট মার্টিন দেখা যায়— যাত্রীদলে আবার প্রাণ সঞ্চার করল। দক্ষিণ দিগন্তে এক দ্বীপভূমির অবস্থান ক্রমশ স্পষ্ট হতে আরম্ভ করল। আরও কিছুটা যাবার পর চোখে পড়ল দ্বীপের হলুদ সৈকত আর অজস্র নারকেল গাছ। টেকনাফ থেকে রওনা দিয়ে দু ঘণ্টার পর সি-ট্রাক এস টি খিজির গিয়ে ভিড়ল দ্বীপের জেটিতে। অন্যান্য পর্যটকদের সঙ্গে, গুটি গুটি পায়ে, বাঁশ আর কাঠ দিয়ে তৈরি দীর্ঘ এক গ্যাংওয়ে অতিক্রম করে পা রাখলাম সেন্ট মার্টিন দ্বীপের বালুকাময় সৈকতে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঠিকমতো বুঝে ওঠার আগেই আমি সুলেমানের নজরে পড়ে গেলাম। পর্যটকদের সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ঘুরিয়ে দেখাবার কাজ করছে প্রচুর কচি-কাচার দল, এদেরই একজন হল সুলেমান। ওর বয়স খুব বেশি হলে বারো কিংবা তেরো কিন্তু ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে একজন ভালো গাইডের যাবতীয় গুণাবলী। আমার পিঠের রুকস্যাক দেখেই সুলেমান বুঝে নিল যে এই ট্যুরিস্ট এখানে থাকতে এসেছে। প্রায় জোর করেই আমার কাছ থেকে রুকস্যাকটা নিয়ে সে হন হন করে হাঁটা দিল। কোথায় চলেছে জানতে চাইলে এক গাল হেসে উত্তর দিল 'হাজি সাহেবের কাছে'।

শুকনো ঝুরঝুরে বালির ওপর দিয়ে কষ্ট করে হেঁটে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম এক নবনির্মিত, সাধারণ-দর্শন পর্যটক নিবাসের দোরগোড়ায়।

সাইনবোর্ডে বড় বড় করে লেখা আইল্যান্ড রিসর্ট, পরিচালক: হাজি মহম্মদ সালে। হাজি সাহেবকে দেখামাত্র কেন জানি না মনে হল এই সৌম্যদর্শন প্রবীণ মানুষটিকে দিয়ে আর যাইহোক হোটেল ব্যবসা চলার নয়। আলাপ হবার পর তাঁর সম্পর্কে আমার প্রাথমিক ধারণা আরও বদ্ধমূল হল। আপাদমস্তক ভদ্রলোক, সহজ, সরল হাজি সাহেবকে দ্বীপবাসীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। আট-নয় বছর আগে এই দ্বীপে যখন কোনও হোটেলের অস্তিত্ব ছিল না তখন রাত্রিবাস করতে আগ্রহী পর্যটকদের সাহায্য করতে এগিয়ে যেতেন এই হাজি সাহেব। সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ক্রমে ক্রমে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হয়ে ওঠার পর অবশেষে উনি এই পর্যটক নিবাসটি তৈরি করিয়েছেন। মাত্র চারদিন আগে চালু হওয়া আইল্যান্ড রিসর্টে আজকের মতো আমিই একমাত্র অতিথি। ছয়জন থাকতে পারে এমন একটি বড় ঘরে থাকার জন্য আমাকে দিতে হবে দুশো বাংলাদেশি টাকা।

মধ্যাহ্নভোজন সারতে অদূরবর্তী বাজারে গিয়ে দেখি হোটেলের অভাব নেই এবং সব জায়গাতেই খদ্দের উপচে পড়ছে। সুলেমানের সঙ্গে কথা বলে যা বুঝলাম তা হল প্রতিদিন বেলা বারোটা থেকে বিকেল সাড়ে তিনটে পর্যন্ত অসংখ্য পর্যটকের উপস্থিতিতে ছোট্ট এই দ্বীপ প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। পর্যটকদের নিয়ে দুই জাহাজ টেকনাফের দিকে রওনা দিলেই সেন্ট মার্টিন দ্বীপের জীবনযাত্রা তার নিজস্ব ছন্দ ফিরে পায়। খাবারের সন্ধানে আমি যে হোটেলটিতে ঢুকলাম তার নামটি বেশ বড়। সেন্ট মার্টিন ট্যুরিস্ট পার্ক অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। সেই তুলনায় দোকানের মেনুটি বরং বেশ ছোট। ভাত, ডাল এবং ইলিশ সহ সামুদ্রিক মাছের বিভিন্ন পদ। বুঝতে কষ্ট হল না যে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ মৎস্যপ্রেমিকদের পক্ষে আদর্শ হলেও নিরামিষভোজীদের পক্ষে সুবিধের নয়। হোটেলের রান্নার স্বাদ তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে লেখা একটি আপ্তবাক্য এককথায় অসাধারণ। বাক্যটি হল 'নগদ বিক্রি পেটে ভাত, বাকি বিক্রি মাথায় হাত'।

হোটেল থেকে বেরিয়ে আমার ছোট্ট গাইড সুলেমানের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম দ্বীপ দেখতে। দ্বীপের একমাত্র পাকা রাস্তাটি চলে গেছে পুব থেকে পশ্চিমে। সাইকেল রিকশা চেপে প্রায় দু কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার সময় অবাক চোখে দেখছিলাম বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এক ছোট্ট দ্বীপের অধিবাসীদের ঘর-বাড়ি, খেত-খামার, নারকেল বাগান আর তাদের জীবনযাত্রার টুকরো টুকরো ছবি। দ্বীপটি সত্যিই ছোট। দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিন কিলোমিটার আর প্রস্থে মাত্র দেড় কিলোমিটার। বেশ কয়েক জায়গায় দেখলাম বাঁশের মাচায় সামুদ্রিক মাছ শুকোচ্ছে। আমাদের রিকশা গিয়ে থামল পাকা রাস্তার শেষপ্রান্তে। এই জায়গাটির নাম পশ্চিমপাড়া। আমার প্রাণচঞ্চল ক্ষুদে পথপ্রদর্শককে অনুসরণ করে পৌঁছে গেলাম এক অনিন্দ্যসুন্দর, জনবিরল সাগরসৈকতে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই সেন্ট মার্টিন দ্বীপে এসে অবধি এই জায়গাটিকে আর পাঁচটা সি-রিসর্টের

চেয়ে তেমন কিছু আলাদা বলে মনে হয়নি। কিন্তু এখন, শীতের এই স্বর্ণাভ অপরাহ্নে নীল সমুদ্র, সুনীল আকাশ, হলুদ বেলাভূমি আর ঘন সবুজ নারকেল কুঞ্জ মিলে যে অনুপম দৃশ্যপট রচনা করেছে তা দেখে স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

আমার বালক গাইড সুলেমান উৎসাহের প্রাবল্যে প্রায় উড়ে চলেছে আর তার গতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে আমি হিমসিম খাচ্ছি। চলার পথে পরিচিত কাউকে দেখলেই সুলেমান সগর্বে জানাচ্ছে, 'আঙ্কেল ইন্ডিয়া থিকা আইছে'। তার গর্বের কারণ আছে বইকি, সুদূর ভারত থেকে আসা এই পর্যটককে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ঘুরিয়ে দেখাবার গুরুদায়িত্ব এখন তার ছোট্ট কাঁধে। সুলেমান প্রথমেই আমাকে নিয়ে গেল সৈকত সংলগ্ন এক কটেজে। বাড়ির নাম সমুদ্রবিলাস। গৃহকর্তার নাম হুমায়ুন আহমেদ, বাংলাদেশের জনপ্রিয়তম সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন। সেন্ট মার্টিন দ্বীপের ছবি আহমেদ সাহেব তাঁর বিভিন্ন লেখায় এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে তার মাধ্যমেই বাংলাদেশের পর্যটকমহলে প্রত্যন্ত এই প্রবালদ্বীপ নিয়ে প্রবল কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। ভ্রমণরসিকদের আসা-যাওয়া বাড়তে থাকে এবং সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে হোটেল আর গেস্টহাউসের সংখ্যা। 'সমুদ্রবিলাস' দেখে আবার ফিরে গেলাম সাগরতীরে। এখন শীতকাল, সমুদ্র তাই শান্ত। নিরীহ ঢেউ অতি বিনীত ভঙ্গিমায় তটভূমিকে স্পর্শ করে অদৃশ্য হচ্ছে। সমুদ্রের শান্তশ্রী দেখে বেশ কিছু পর্যটক হাঁটুজলে নেমে আনন্দে মেতেছেন, কয়েক জায়গায় জল থেকে মাথা বার করে রয়েছে প্রস্তর সদৃশ প্রবালখণ্ড। দূর থেকে দেখে কালোপাথর বলে ভ্রম হয় কিন্তু কাছে গেলেই বোঝা যায় অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট এই বস্তুটি প্রস্তর নয়, প্রবাল।

স্থানীয় কিছু ছেলেমেয়ে রকমারি ঝিনুক, শঙ্খ আর বিচিত্র দর্শন প্রবাল-তরু বিক্রি করার জন্য ট্যুরিস্টদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেছে। সুলেমানের দাপটে তারা কেউ অবশ্য আমার কাছে ঘেঁসতে পারল না। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় পৌঁছে গেলাম জেটির কাছে। এখানে এখন দারুণ ব্যস্ততা কারণ একটু পরেই পর্যটকদের নিয়ে দুটি জাহাজ আবার টেকনাফে ফিরে যাবে। ঘরে ফেরার আগে বেশ কিছু ট্যুরিস্ট ব্যস্ত রয়েছেন সেন্ট মার্টিন দ্বীপের সবচেয়ে বিখ্যাত জিনিসটি কিনতে। জিনিসটি হল শুটকি মাছ। 'শুটকি' শব্দটি শোনামাত্র যাঁরা অস্বস্তি বোধ করেন সেই সব 'গন্ধ কাতর' মানুষদের একবার অন্তত এখানে আসা উচিত। এলে দেখতে পেতেন শুটকি মাছ এখানে কী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। আমার কৌতূহল দেখে সুলেমান আমাকে নিয়ে গেল এখানকার সবচেয়ে বড় দোকানটিতে। বাঁশের তৈরি বেঞ্চিতে বসে বড় বড় চোখ করে প্রত্যক্ষ করে গেলাম শুকনো মাছের জগৎ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ বুঝতে পারলাম ঠিকমতো মাছ চিনে, দরদাম করে, শুটকি মাছ কেনা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। পোড় খাওয়া খদ্দেরের সঙ্গে ঘোড়েল দোকানির কথোপকথন শোনাও এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা বিশেষ। শুকনো মাছের দোকানে রাজার আসনটি দখল করে আছে কালো চাঁদা মাছ, দাম ১৮০ টাকা প্রতি

কিলোগ্রাম। এরপর রয়েছে সুরমা বা ম্যাকরোল (১৩৫ টাকা), টেক চাঁদা (১২০ টাকা) আর কুরাল (১২০ টাকা)। এছাড়া হরেকরকম কম দামের মাছও রয়েছে।

বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ যাত্রীদের নিয়ে সিন্দবাদ এবং খিজির প্রায় হাত ধরাধরি করে টেকনাফের দিকে রওনা দিতেই সেন্ট মার্টিন দ্বীপের গা থেকে নাগরিক সভ্যতার মোড়কটি যেন খসে পড়ল। মুষ্টিমেয় যে কজন পর্যটক স্বেচ্ছায় দ্বীপে রয়ে গেলেন তাঁরা দ্বীপের এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়লেন আবিষ্কারের আনন্দ পেতে। সুলেমান আমাকে দ্বীপের এক জনবিরল সৈকতে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। স্থানীয় মৎস্যজীবীরা তখন জাল টানতে ব্যস্ত। অস্তগামী সূর্যকে সাক্ষী রেখে জেলেদের কাজকর্ম দেখতে বেশ লাগছিল। জাল টানা শেষ হতে সবার মন খারাপ। দামী মাছ একটাও ওঠেনি।

অন্ধকার নেমে এলে চায়ের সন্ধানে ফিরে গেলাম সেই রেস্তোরাঁতে যেখানে মধ্যাহ্নভোজন সম্পন্ন করেছিলাম। গিয়ে দেখি ম্যানেজার মহিউল্লাহ নিরানন্দ মুখে কাউন্টারে বসে আছেন। খদ্দের নেই, আনন্দ হবে কী করে! আমাকে দেখে নড়েচড়ে বসলেন। দুপুরে কথা বলার সুযোগ ছিল না, এখন হাতে অঢেল সময়। আড্ডা জমে উঠল। স্থানীয় কয়েকজন মানুষ এবং আশপাশের দোকানিরাও এসে হাজির। ইন্ডিয়া থেকে আসা একজন বাঙালি পর্যটক সেন্ট মার্টিন দ্বীপে এসে রয়েছেন এই ব্যাপারটিই মহিউল্লাহ এবং অন্যদের বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। ভারতবর্ষ, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে তাদের অসীম কৌতূহল। একদিন ভারতীয় পর্যটকরাও এসে উপস্থিত হবেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এই প্রবাল দ্বীপে এমন একটি সুখস্বপ্ন দেখতে সবাই বেশ আগ্রহী বলেই মনে হল।

রাতের আহার সেরে ফিরে গেলাম হাজি সাহেবের অতিথিনিবাসে। উনি বোধহয় আমার প্রতীক্ষাতেই ছিলেন। হাজি মহম্মদ সালের সঙ্গে আলাপ না হলে আমার সেন্ট মার্টিন ভ্রমণ অসম্পূর্ণ রয়ে যেত। মৃদুভাষী এবং ধর্মভীরু এই মানুষটির কাছে দ্বীপের পুরনো দিনের কথা শুনছিলাম মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। ওঁর কাছেই জানলাম যে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের স্থানীয় নাম নারিকেল জিঞ্জিরা। কয়েক দশক আগেও বর্ষাকালে তিনমাস সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকত এই দ্বীপ। বেঁচে থাকার জন্য কী কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে স্থানীয় অধিবাসীদের তা এখন কল্পনাও করা যাবে না। দাঁড়টানা নৌকোয় টানা এগারো-বারো ঘণ্টা নৌকো চালিয়ে যেতে হত টেকনাফ। সামুদ্রিক ঝড়ে কতবার নৌকো ডুবে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও নারিকেল জিঞ্জিরার মানুষ গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে করুণাময় আল্লার অপার মেহেরবানি সর্বদা বর্ষিত হচ্ছে এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের ওপর। তাদের এই অটল বিশ্বাসের সমর্থনে একাধিক উদাহরণ হাতের কাছেই রয়েছে। যেমন পানীয় জল নিয়ে কোনও সমস্যা নেই, মাটি খুঁড়লেই মিষ্টি জলের ভাণ্ডার। এছাড়া নারকেল বাগানের দৌলতে দ্বীপবাসীরা মোটামুটি স্বচ্ছল। এখানকার নারকেল, পেঁয়াজ আর শুকনো মাছ টেকনাফ হয়ে দূর-দূরান্তের বাজারে পৌঁছে

যায়। সেন্ট মার্টিন দ্বীপ যে ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য তার সবচেয়ে জোরালো প্রমাণটি হল কয়েক বছর পরে পরেই সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চল, বিশেষ করে ছোট-বড় দ্বীপগুলি যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তখনও সেন্ট মার্টিন দ্বীপ কীভাবে যেন প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পেয়ে যায়।

হাজি সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যেই আরও একজন বয়স্ক মানুষ এসে উপস্থিত হলেন। ইনি হাজি সাহেবের বন্ধু সেখ নাসিরুদ্দিন, স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে যিনি পীরসাহেব নামেই বেশি পরিচিত। আলাপ হবার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ বোঝা গেল যে সেখ নাসিরুদ্দিন হলেন সেন্ট মার্টিন দ্বীপের এক বর্ণময় চরিত্র। জীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলিটি যেমন সমৃদ্ধ তেমনই তাঁর কথা বলার ভঙ্গিমাটিও ভারি আকর্ষণীয়। ওঁর জীবনের অন্যতম রোমাঞ্চকর ঘটনা হল পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াই ভারত দর্শনে বেরিয়ে পড়া। এরজন্য অবশ্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলে মাসতিনেক কাটাতে হয়েছিল, বিদায় নেওয়ার আগে পীরসাহেব শোনালেন সেই অত্যাশ্চর্য কাহিনী। আজ থেকে অনেক বছর আগে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের অদূরে একটি বিমান ভেঙে পড়ে। বিমানের যাত্রী এবং চালকদল সবাই মারা যান। একটি বাদে সবকটি মৃতদেহই উদ্ধার করা হয়। যার মৃতদেহের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি সেটি ছিল কুমিল্লা জেলার এক হিন্দু জমিদারের সুন্দরী কন্যার। পারিবারিক সূত্রে জানা যায় বিমানে ওঠার সময় মেয়েটির গায়ে ছিল বেশ কিছু সোনার অলঙ্কার। পরবর্তী সময়ে এক রহস্যময়ী সালঙ্কারা সুন্দরী মহিলার দর্শন পেয়েছেন বেশ কয়েকজন দ্বীপবাসী এবং এদের প্রত্যেকের মধ্যেই মানসিক রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। এখনও নিশুতি রাতে নির্জন স্থান থেকে চুড়ির শব্দ অনেকের কানে আসে।

হাজি সাহেব এবং সেখ নাসিরুদ্দিনকে বিদায় দিতে মন চাইছিল না। এর আসল কারণটি হল এই গেস্টহাউসে আজ আমিই একমাত্র অতিথি। পীরসাহেবের সর্বশেষ কাহিনী শোনার পর নিজেকে বড্ড বেশি একা বলে মনে হচ্ছিল। রাত সাড়ে দশটায় জেনারেটার বন্ধ হল। অন্ধকারে শুয়ে পীরসাহেবের মুণ্ডপাত করতে লাগলাম। তাঁর কী দরকার ছিল 'ক্ষুধিত পাষাণ' টাইপের এমন একটি কাহিনী শোনাবার। সারাদিন দৌড়-ঝাঁপ কম হয়নি তাই চোখের পাতা একসময় ভারি হয়ে এল।

ঘুম ভেঙে গেল চুড়ির শব্দে। প্রথমে ভাবলাম কল্পনা, তারপরে বুঝতে পারলাম কল্পনা নয়, সত্যি চুড়ির রিনিঝিনি শুনতে পাচ্ছি। শুধু চুড়ির শব্দ নয় তার সঙ্গে সঙ্গে একটি ধাতব শব্দও শ্রুতিগোচর হচ্ছে। মানসিক উদ্বেগে বুক ধড়ফড় করতে লাগল। হা ঈশ্বর, শেষ পর্যন্ত কিনা এই প্রত্যন্ত দ্বীপে এসে প্রেতাত্মার খপ্পরে পড়তে হল। আমি যখন ভেবে উঠতে পারছি না এবার আমার কী করা উচিত ঠিক সেই সময় স্পষ্ট কানে এল এক নারীকণ্ঠ। সূচিভেদ্য অন্ধকারের বুকচিরে একটু দূর থেকে ভেসে এল একটি বাক্য, 'অ আমিনা, তোর ছাওয়াল যে কান্দে'।

এই একটিমাত্র সংলাপ সব রহস্যের জট খুলে দিল। আমার ঘরের পাশেই রয়েছে একটি টিউবওয়েল। সেখানে জল নিতে এসেছে স্থানীয় গৃহবধূ 'আমিনা'। টিউবওয়েলের হাতল টেপার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতভর্তি কাচের চুড়ি ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠছে। সেই ঝংকার যে আমার বুকে কাঁপন ধরাচ্ছে বেচারি তা জানবে কী করে। ভাগ্যিস আমিনার ছাওয়াল অর্থাৎ ছোট ছেলেটি চিৎকার জুড়েছিল তাই না ঘরে তার ডাক পড়েছে। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। টর্চ জ্বালিয়ে দেখি ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজে।

তৈরি হয়ে নিয়ে সূর্যোদয়ের আগেই পৌঁছে গেলাম জেটির কাছে। উদ্দেশ্য, ট্রলারে চেপে ছেড়া দ্বীপ যাওয়ার চেষ্টা করা। সেন্ট মার্টিন দ্বীপের জেটি থেকে স্পিডবোট বা ট্রলারে চেপে অতি সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় ছেড়া দ্বীপের জনহীন ভূখণ্ডে। গোটা ট্রলার ভাড়া করা একার পক্ষে খরচসাপেক্ষ তাই সহযাত্রীর খোঁজ করতে উদ্যোগী হলাম। একই উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে ঘোরাঘুরি করছিলেন জোবায়ের আহমেদ। পরিচয় হতেই মুহূর্তে সখ্য গড়ে উঠল। তরুণ জোবায়ের আহমেদ বাংলাদেশ ইসলামি ব্যাঙ্কের ঢাকা অফিসের একজন পদস্থ আধিকারিক। দেখতে দেখতে আরও আটজন যাত্রী যোগাড় হয়ে গেল। সবাই মিলে প্রবল উৎসাহ নিয়ে ট্রলারে উঠে বসলাম। ভাড়া পড়ল মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকা।

ট্রলারও ছাড়ল আর ওদিকে পুবের আকাশ রাঙিয়ে দিয়ে প্রভাকরও আত্মপ্রকাশ করলেন। চলন্ত জলযান থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের অনেকটা এলাকা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একে একে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল ব্লু মেরিন রিসর্ট, বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের দপ্তর, জেলেদের গ্রাম আর নারকেল বাগান। সাগরের জল ক্রমশ স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর হচ্ছে। ট্রলারে বসার ব্যবস্থা মোটেই স্বস্তিদায়ক নয় কিন্তু এই নিয়ে কারও কোনও অভিযোগ নেই। সবাই আজকের এই ব্যতিক্রমী জলযাত্রার রূপ, রস, গন্ধ আত্মস্থ করতে মগ্ন। কাকচক্ষু জলের ভেতর এবার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বিচিত্র প্রবাল জগৎ।

ছেড়া দ্বীপের চারপাশেই ছোট-বড় প্রবালখণ্ড এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে ট্রলারের পক্ষে সম্ভব হয় না দ্বীপভূমিকে স্পর্শ করার। সমস্যার সমাধানে ছোট ডিঙি নৌকোর ব্যবস্থা রয়েছে। ট্রলার থেকে দোদুল্যমান ছোট নৌকোয় উঠতে গিয়ে সবাইকেই খানিক নাজেহাল হতে হল। ছেড়া দ্বীপের যে অংশটিতে গিয়ে ডিঙি নৌকো ভিড়ল সেখানে রয়েছে কয়েকটি দোকান। বিক্রি হচ্ছে বিশালাকার ডাব, নানারকম ঝিনুক, শঙ্খ আর বিচিত্র দর্শন প্রবাল। চা-বিস্কুটের ব্যবস্থাও আছে। একটা ডাব পুরো শেষ করা গেল না। দোকানির সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল শীতের সময় এরা এখানেই অস্থায়ী ডেরা বাঁধে। এই জনহীন দ্বীপে এদের সঙ্গে দুয়েকটা দিন কাটাতে পারলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে, একথা ভেবে রোমাঞ্চিত বোধ করলাম।

বেশ কিছুক্ষণ আগেই ভাটা আরম্ভ হয়েছিল। ভাটার টানে জলস্তর অনেকটা

নেমে গেছে তাই হাঁটুজল ভেঙে এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে পৌঁছে যেতে কোনও সমস্যা হল না। উৎসাহের আতিশয্যে আমি আর জোবায়ের একছুটে গিয়ে হাজির হলাম এক গোলাকার হলুদ বালুকাময় ভূখণ্ডে। এই মিনি দ্বীপের মাঝে রয়েছে কেয়াগাছের বন। বেশ কিছু গাছে ছোট-বড় ফল ঝুলছে। ফলের চেহারা একেবারে ছোট আকারের কাঁঠালের মতো। মন দিয়ে কেয়া ফল দেখছি এমন সময় কানে এল জোবায়ের আমাকে উত্তেজিত স্বরে ডাকছে, তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে হাজির হতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। সাগরতট জুড়ে শুধু শঙ্খ আর ঝিনুকের ছড়াছড়ি। যেমন বিচিত্র তাদের রং তেমনই বিচিত্র তাদের আকার। প্রকৃতির সবকটি রং এখানে উপস্থিত। নির্জন দ্বীপে এমন এক অপার্থিব দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে নিজের শৈশবে ফিরে গেলাম। প্রবল উৎসাহে আমি আর জোবায়ের মেতে উঠলাম ঝিনুক সংগ্রহে। নতুন নতুন ঝিনুক এবং শঙ্খের সন্ধানে জলের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পুরো দ্বীপটাই প্রায় প্রদক্ষিণ করা হয়ে গেল, এতই ছোট্ট এই দ্বীপ। আর এই দ্বীপ পরিক্রমার সময় একাধিকবার থমকে দাঁড়াতে হয়েছে নতুন নতুন দৃশ্যপটের মুখোমুখি হয়ে। এক জায়গায় দেখলাম বেলাভূমির অনেকটা জায়গা জুড়ে লাল কাঁকড়াদের বিশাল সমাবেশ। কাছে যাবার চেষ্টা করতেই মুহূর্তে উধাও। আরেক জায়গায় আরও বিচিত্র এক দৃশ্য। দ্বীপের অনেকটা ভেতরে অনুচ্চ প্রবাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা জায়গায় জল জমে আছে। কাচের মতো স্বচ্ছ জলে ছোটাছুটি করছে ছোট ছোট সামুদ্রিক মাছ। এরা জোয়ারের সময় এখানে ঢুকেছিল সম্ভবত খাদ্যের সন্ধানে, পরে ভাটার সময় জল নেমে গেলেও এই মাছের দলটি আর বেরোতে পারেনি। পরবর্তী জোয়ারের সময় পর্যন্ত এদের এখানেই বন্দী থাকতে হবে।

আপাতত আমি আর জোবায়ের আহমেদ হলাম ছোট্ট এই দ্বীপের অধীশ্বর। তবে খুব বেশিক্ষণ যে আমাদের মৌরসিপাট্টা স্থায়ী হবে না তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি বেশ কয়েকটি স্পিডবোট আর ট্রলার সেন্ট মার্টিন দ্বীপ থেকে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। স্বর্গ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় মনটা ভার হয়ে গেল।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কলকাতা-ঢাকা বাস সার্ভিসের দৌলতে বাংলাদেশ ভ্রমণ এখন অনেক সহজসাধ্য। যাতায়াতের বাসভাড়া এক হাজার টাকা। এর সঙ্গে যোগ হবে ট্র্যাভেল ট্যাক্স বাবদ আরও ৩০০ টাকা। দীর্ঘ বাসযাত্রার ধকল নিতে অনিচ্ছুক পর্যটকদের জন্য রয়েছে আকাশপথ। মাত্র ৪০-৪৫ মিনিটেই ঢাকা। পাসপোর্ট থাকলে দু-তিন দিনের সব ব্যবস্থা করে দেবে যে-কোনও প্রতিষ্ঠিত পর্যটন সংস্থা। বাংলাদেশ বেড়াতে গেলে অবশ্যই সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বেড়িয়ে আসা উচিত। ঢাকা থেকে কক্সবাজার (দূরত্ব ৪০২ কিলোমিটার) যাবার আরামপ্রদ সুপারফাস্ট বাস রয়েছে একাধিক বেসরকারি

পরিবহণ সংস্থার। যেমন, গ্রিনলাইন, সাউদিয়া বা এস আলম। লাক্সারি কোচের ভাড়া ৩০০ টাকা আর বাতানুকূল অতি আরামপ্রদ বাসের ভাড়া ৫৫০ টাকা। কক্সবাজার থেকে ৮৫ কিলোমিটার দূরবর্তী টেকনাফ যেতে সময় লাগে দু ঘণ্টা। টেকনাফ থেকে জাহাজ বা ট্রলারে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যেতে সময় লাগবে দু ঘণ্টার একটু বেশি। কক্সবাজার থেকেই জাহাজের টিকিট অগ্রিম সংগ্রহ করতে হলে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

PRASAD-PARADISE
Plot-12, Block-B, Kalatoli Road, Cox Bazar ☎ 0341-62638
জলপথে টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দূরত্ব ৪৮ কিলোমিটার।

কখন যাবেন

সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বেড়াবার মরসুম হল শীতকাল। সেরা সময় ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাস। মধ্য ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ কক্সবাজারে পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ে। থাকার জায়গা যোগাড় করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাই ভ্রমণসূচি তৈরি করার সময় বিষয়টি মাথায় রাখলে ভালো হয়।

কোথায় থাকবেন

সেন্ট মার্টিন যাতায়াতের পথে কক্সবাজারে রাত্রিবাস করার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া কক্সবাজার নিজেই বাংলাদেশের বিখ্যাত এক পর্যটনকেন্দ্র। কক্সবাজারে থাকার ব্যবস্থা করতে হলে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করাই ভালো।

Bangladesh Parjatan Corporation
Commercial Division, 233, Air Port Road
Tejgaon, Dhaka ☎ (008802) 8119192, 8117855

সেন্ট মার্টিন দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঠিকমতো উপভোগ করার জন্য, বিশেষ করে ভোরবেলায় ট্রলার বা স্পিডবোটে ছেড়া দ্বীপ বেড়িয়ে আসতে চাইলে এখানে একটা রাত কাটাতেই হবে। মাঝারি মানের হোটেলে থাকার জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে নীচে উল্লিখিত ব্যক্তিদের সঙ্গে।

হাজি মহম্মদ সালে (আই ল্যান্ড রিসর্ট), মহাবুবুল হক ভুঁইঞা (সি সেন্ট কুমিল্লা হোটেল), মৌঃ আব্দুর রহমান (সেন্ট মার্টিন ট্যুরিস্ট পার্ক অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট)।

এছাড়া রয়েছে নবনির্মিত ব্লু মেরিন রিসর্ট যেখানে দ্বিশয্যার ঘরভাড়া ১,০০০ বাংলাদেশি টাকা, তিন শয্যার ঘর ১,২০০ টাকা এবং ছয় শয্যার ঘর ১,৫০০ টাকা। অগ্রিম ঘর সংরক্ষণ করতে হলে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

Blue Marine Resorts
Lal Bhaban, 18, Rajuk Avenue, Dhaka ☎ (008802) 9556251

সম্প্রতি আরও একটি বিশাল অতিথি নিবাস এখানে নির্মিত হয়েছে, নাম সেন্ট মার্টিনস রিসর্ট। ছুটির দিন বাদ দিয়ে সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে এখানে ঘর পেতে খুব একটা সমস্যা হবে না।

'ভ্রমণ' মার্চ, ২০০৫

সুন্দরবনের গ্রামে জঙ্গলে

রবীন চক্রবর্তী

সুন্দরবন বেড়াবার সেরা সময় ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাস, তাই ২০০৩ সালের মধ্য জানুয়ারিতে দুই সঙ্গীকে নিয়ে হাজির হলাম শিয়ালদা স্টেশন। লোকাল ট্রেনের যাত্রী হয়ে ক্যানিং পৌঁছতে সময় লাগল দেড় ঘণ্টার কম। রেলস্টেশনের অদূরে মাতলা নদীর দিকে যাবার পথে মাথায় শুধু একটাই চিন্তা, নদীতে এখন জোয়ার না ভাটা? যদি জোয়ার থাকে তবে সুন্দরবন ভ্রমণের সূচনাটি হবে ভদ্রস্থ আর ভাটা থাকলে এক হাঁটু কাদা ভেঙে নৌকোয় উঠতে বিস্তর নাকানি-চোবানি খেতে হবে। সৌভাগ্যবশত জোয়ার থাকায় খুব সহজেই নদী পেরিয়ে ডকঘাটে পৌঁছে গেলাম। ডকঘাট থেকে অটোরিকশায় সোনাখালি গিয়ে ছোট লঞ্চে চেপে পৌঁছে গেলাম গোসাবা। অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত সুন্দরবন অঞ্চলের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ এই গোসাবা।

গোসাবা ফেরিঘাট থেকে ভ্যানরিকশায় চেপে আমরা চলেছি তিন কিলোমিটার দূরবর্তী রাঙাবেলিয়া টেগোর সোসাইটি ফর রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্টের অতিথি নিবাসে। চলার পথে চোখে পড়ছে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রার টুকরো টুকরো ছবি। একাধিক প্রাচীন গির্জার অবস্থিতি এই অঞ্চলের বর্ণময় অতীতকে মনে পড়িয়ে দেয়। অতিথিনিবাসে জায়গা পেতে সমস্যা হল না। কেয়ারটেকার রামপদ পাত্র জানালেন, আমরা খুব ভালো সময়ে সুন্দরবন বেড়াতে এসেছি। পরদিন বনবিবির পুজো উপলক্ষে সবাই উৎসবে মেতে উঠবে।

রামবাবুর উদ্যোগে রাতে গেলাম জটিরামপুর, টুসু গান শুনতে। গৃহকর্তা গোপাল সর্দারের পূর্বপুরুষরা পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে এখানে এসেছিলেন জঙ্গল পরিষ্কার করে জনবসতি এবং কৃষিজমি তৈরির কাজে। গোপালবাবুর মতো অসংখ্য আদিবাসী পরিবার সুন্দরবনের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়েছেন। আদিবাসী সমাজের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালনে এরা নিষ্ঠাবান। গোপাল সর্দারের বাড়ির টুসু প্রতিমা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ঠিক যেন আমাদের লক্ষ্মী ঠাকুরের রূপ। অনেক রাত পর্যন্ত টুসু গান শোনার সৌভাগ্য হল। টুসু গানের সহজ-সরল বক্তব্যের মধ্যেই ধরা পড়ে আদিবাসী সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুখ-দুঃখের কথা।

আমরা ঠিক করেছি এ যাত্রায় শুধু জলপথে জঙ্গল না দেখে সুন্দরবনের অধিবাসীদেরও কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করব। পরদিন সকালে তাই রওনা দিলাম সাতজেলিয়া দ্বীপের জেমসপুর গ্রামের দিকে। এই গ্রামেই বাস করে আমার পরিচিত নিরঞ্জন মণ্ডল আর অজয় তরফদার। প্রথমজনের প্রধান পেশা নিজস্ব বোটে পর্যটকদের সুন্দরবন ঘোরানো আর দ্বিতীয়জন হলেন সুন্দরবনের একজন অভিজ্ঞ গাইড। ইতিপূর্বে নদীপথেই একাধিকবার জেমসপুর গ্রামে গেছি, এবার যাব স্থলপথে। জেমসপুর আর লাহিড়ীপুর গ্রামের নাম একসময় প্রায়শই খবরের কাগজে স্থান পেত কারণ সজনেখালির জঙ্গল থেকে নদী পেরিয়ে বাঘ মাঝে মধ্যেই গ্রামে ঢুকে পড়ত গরু-ছাগলের সন্ধানে।

রাঙাবেলিয়া থেকে জেমসপুর যাবার পথে প্রথমে যেতে হবে দয়াপুর ফেরিঘাটে। বেশ খানিকটা পথ ভ্যানরিকশায় যাবার পর হাঁটা পথ ধরলাম। আমাদের চলার পথে ডানদিকে বয়ে চলেছে গোমর নদী। নদীর ওপারেই রয়েছে সজনেখালি ট্যুরিস্ট লজ এবং বনদপ্তর। পথের বাঁদিকে চোখে পড়ছে চাষের জমি আর মাটির ঘরবাড়ি। মানুষের বাসস্থান, তাকে ঘিরে থাকা ছোট্ট পুকুর, নারকেল, সুপুরি, আম, কাঁঠালের জটলা আর ফুল বাগান মিলে সৃষ্ট হয়েছে এক স্নিগ্ধ সৌন্দর্য। দয়াপুর ফেরিঘাটে গোমর নদী পেরিয়ে পা রাখলাম সাতজেলিয়া দ্বীপে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল জেমসপুর যেতে গেলে প্রায় চার কিলোমিটার পথ হাঁটতে হবে। মেঠো পথ ধরে আরম্ভ হল আমাদের পদযাত্রা। কিছুদূর গিয়ে পৌঁছে গেলাম পিচখালি নদীর ধারে। এখান থেকে বাকি পথটা নদীবাঁধ ধরেই যেতে হবে। নদীবাঁধ বলতেই মাইথন, পাঞ্চেতের মতো বড় বড় বাঁধের যে ছবিটি আমাদের মনে ভেসে ওঠে তার সঙ্গে সুন্দরবনের নদীবাঁধের কোনওই মিল নেই। পূর্ণ জোয়ারের সময় নদীর নোনা জল ঢুকে পড়ে যাতে জনবসতি এবং চাষের জমির ক্ষতি করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে মাটি ফেলে ফেলে নদীর পাড়কে অনেকটা উঁচু করা হয়। এইভাবেই গড়ে ওঠে সুন্দরবনের নদীবাঁধ। ভাবলে অবাক লাগে যে সুন্দরবনে এই রকম নদীবাঁধের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৬০০ কিলোমিটার। নদীবাঁধ শুধু নদীর নোনা জলই আটকায় না, স্থানীয় অধিবাসীরা এর ওপর দিয়েই দ্বীপের এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যাতায়াত করেন।

শীতের মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে নদীবাঁধের ওপর দিয়ে এ এক অন্য স্বাদের পথ চলা। আমাদের ডানদিকে পিচখালি নদী আর বাঁদিকে দিগন্তবিস্তৃত কৃষিজমি। জমি এখন ফাঁকা কারণ বেশ কিছুদিন আগেই আমন ধান কাটা হয়ে গেছে। একটু পরেই চোখে পড়ল সুন্দরবনের এক অতিপরিচিত ছবি। বাগদা চিংড়ির বাচ্চা— [illegible] 'বাগদা মীন' বা 'বাগদা পোনা' নামেও পরিচিত— সংগ্রহ করছে বেশ ক[illegible] কমবয়সী ছেলেমেয়ে। নদীর কোমর জলে নেমে, লাঠিতে বাঁধা [illegible] জাল টেনে চলেছে কচি-কাঁচার দল। অতিক্ষুদ্র যে ক[illegible] উঠছে নদীর পাড়ে রাখা অ্যালুমিনি[illegible]

বিক্রি হবে চিংড়ি ভেড়ির প্রতিনিধিদের কাছে। কাছে গিয়ে হাঁড়িতে উঁকি মারলাম। জলের মধ্যে স্বচ্ছ কাঠির মতো ক্ষুদ্রাকৃতি বাগদা শিশুরা নড়াচড়া করছে। খুব মনোযোগ সহকারে দেখলে তবেই এদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায়। প্রশ্ন করে জানা গেল এখন দর যাচ্ছে ২৯০ টাকা হাজার। শীতের সময়টাতেই সবচেয়ে ভালো দাম পাওয়া যায়। বাগদা চিংড়ি গভীর সমুদ্রের লবণাক্ত জলে ডিম ছাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই তারা নদীর মোহনায় চলে আসে বাদাবনের প্রাকৃতিক খাদ্যভাণ্ডার থেকে আহার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এই বাগদা মীন সংগ্রহের কাজটিকেই সুন্দরবনের অত্যন্ত গরিব পরিবারগুলি বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন রূপে বেছে নিয়েছে। অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং বিপদসঙ্কুল এই কাজ। প্রতিবছর কুমির এবং কামটের আক্রমণে হতাহতের সংখ্যা কিছু কম নয়।

নদীবাঁধের ওপর দিয়ে আমাদের চলার পথটি কিছু কিছু জায়গায় এতই সংকীর্ণ যে বিপরীত দিক দিয়ে যাঁরা আসছেন তাঁদের জায়গা দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। তিনজন আপাদমস্তক শহুরে মানুষকে সাতজেলিয়ার দ্বীপভূমিতে আবিষ্কার করে স্থানীয় পথিকদের চোখে একরাশ কৌতূহল। দুয়েকজন দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জানতে চায় আমাদের গন্তব্য। নিরঞ্জন মণ্ডলের বাড়ি যাব জেনে আবার প্রশ্ন করে কোন নিরঞ্জন মণ্ডল? বোটম্যান নিরঞ্জন? আমরা মাথা নাড়তে যত্ন করে পথের হদিশ বাতলে দেয়। মাঝে মধ্যে পথচলা থামিয়ে নদীর ওপারে সজনেখালি দ্বীপের জঙ্গলের দিকে চেয়ে থাকি। এখান থেকে বোঝে কার সাধ্য যে ওই নিরীহ দর্শন অরণ্যেই বাস করে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী, সুন্দরবনের বাঘ।

জেমসপুর গ্রামে প্রবেশ করে নিরঞ্জন মণ্ডলের বাড়ি খুঁজে বার করতে কোনও সমস্যা হল না। আমাদের দেখে তার সে কী আনন্দ। নিরঞ্জনের এত উচ্ছ্বাসের আরেকটি কারণ হল তার বাড়িতে আজ বনবিবির পুজোর অনুষ্ঠান। পুজোর দিনে আমাদের এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবকে নিরঞ্জন এক শুভ ঘটনা বলে চিহ্নিত করেছে। মাটির বাড়ির বারান্দায় চাটাই পেতে আমাদের বসার ব্যবস্থা হল। ডাবের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমাদের আগমন বার্তা পেয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকেই এসে হাজির হয়েছেন আগন্তুকদের দর্শন করতে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট মানুষটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল নিরঞ্জন মণ্ডল। ইতি হলেন বিপিন বরকন্দাজ। মাঝবয়সী বিপিনের জীবিকা নদীতে মাছ ধরা। মাছ ধরেই কোনওক্রমে সংসার চালাচ্ছিলেন রোগা চেহারার নিরীহ মানুষ বিপিন। এই অতি সাধারণ মানুষটিই কী করে যেন করে ফেললেন এক অসমসাহসিক কাজ। কাজটি ছিল বাঘের মুখ থেকে এক সঙ্গীকে উদ্ধার করা। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে। এই [illegible] বিপিনকে প্রশ্ন করলে ভারি লজ্জিত বোধ করেন। আমাদের বারংবার [illegible] সেদিনের ঘটনাটি তাঁর মুখেই শোনার বিরল সৌভাগ্য হল।

[illegible] একটি দল মাছ ধরতে গিয়েছিল কালীরচর এলাকায়।

কয়েক দফা মাছ ধরার পর দুপুর তিনটে নাগাদ নতুন করে জালপাতার সময় পাশের জঙ্গল থেকে একটি বাঘ দলের অন্যতম সদস্য রবীন্দ্রনাথ মাঝির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লাফটি ঠিকমতো না হওয়ায় বাঘ এবং তার শিকার দুজনেই জলে পড়ে যায়। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় বাঘ রবীন্দ্রনাথ মাঝির কাঁধে কামড় বসিয়ে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হয়। এমন পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গীরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই সচেষ্ট হয় কিন্তু সেদিন বিপিনের ওপর কী যেন এক শক্তি ভর করেছিল। নৌকো থেকে বড় একটা কুডুল নিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করতে করতে বিপিন তেড়ে গেল রুদ্রমূর্তি বাঘের দিকে। এমনতর ঘটনার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। বাঘও সম্ভবত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। দলের অন্য সদস্যরা সম্বিত ফিরে পেতেই লাঠি, কুডুল নিয়ে এগিঁয়ে গেল বিপিনকে সাহায্য করতে। সমবেত প্রতিরোধের সামনে পড়ে সুন্দরবনের নরখাদক বাঘকেও রণে ভঙ্গ দিতে হল। রবীন্দ্রনাথ মাঝি গুরুতর আহত হলেও শেষপর্যন্ত প্রাণে বেঁচে গেলেন। তাঁর অসমসাহসিকতার জন্য বিপিন বরকন্দাজ মৎস্যজীবী মহলে নায়কের আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। সেদিনের নায়ক আজ আমাদের সামনে। পুরনো কথা বলে গেলেন নিস্পৃহভাবে। নিজে কৃতিত্ব না নিয়ে তারিফ করলেন আক্রান্ত সঙ্গীর সৌভাগ্যকে, শুনে তো আমরা অবাক। বাঘের মুখে পড়া সৌভাগ্যের ব্যাপার কী করে হয়? বিপিন প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিলেন। আসলে বাঘটা ছিল সদ্য যৌবনে পা রাখা এক আনাড়ি বাঘ। সম্ভবত, এটাই ছিল তার মানুষ মারার প্রথম প্রচেষ্টা। অনভিজ্ঞ বাঘ বলেই বিপিনরা রুখে দাঁড়ানোয় শিকার ফেলে পালিয়েছিল। পাকা মানুষখেকোর আক্রমণ শুধু অব্যর্থই নয় তার মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া অসম্ভব বললেই চলে।

বাড়িতে বনবিবির পুজো নিয়ে ব্যস্ততার মধ্যেই নিরঞ্জন মণ্ডল আমাদের তার নতুন কেনা বড় নৌকোটি দেখাতে নিয়ে গেল। নদীর ধারে নোঙর করা বড়সড় যন্ত্রচালিত নৌকোটির গায়ে বড় বড় করে লেখা 'এম ভি বাবাসাধন'। এ নৌকো করেই আগামীকাল আমাদের জলপথে সুন্দরবন ভ্রমণের সূচনা হবে। নৌকোর মধ্যে স্বচ্ছন্দে সাত-আটজন পর্যটক রাত কাটাতে পারে। আমাদের মুখে তার নৌকোর প্রশংসা শুনে নিরঞ্জন ভারি খুশি। হবে নাই বা কেন। এ নৌকো যে তার সন্তানবৎ। নিরঞ্জনের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক হল এখন আমরা যাব সজনেখালির বনদপ্তরে। সেখানে বিরাটভাবে বনবিবির পুজো হচ্ছে। এই পুজোর অন্যতম কর্মকর্তার ভূমিকা পালন করছে অজয় তরফদার। অজয়ের সঙ্গে কথা বলে আমাদের ভ্রমণ-পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে।

দাঁড় টানা ডিঙি নৌকোয় চেপে সজনেখালির দিকে রওনা দিলাম। পিচখালি নদীতে এখন ভাটার টান। জোয়ারের সময় বাদাবনের অনেক ভেতর পর্যন্ত জল চলে যায়। নদী সংলগ্ন গাছপালার মাথাগুলো শুধু জেগে থাকে। জোয়ারের সময় বন্যপ্রাণী চোখে পড়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। ভাটার সময় নদীর সম্পূর্ণ অন্য

চেহারা। জল নেমে গিয়ে নদী-তীরবর্তী কর্দমাক্ত তটভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। এই সময়টাতেই বনের পশুপাখিরা খাবারের সন্ধানে নদীতীরে চলে আসে। এই কথা ভেবেই আমাদের ছোট্ট নৌকো নদীর একেবারে ধার ঘেঁসে চলল। মাছধরা ছোট ডিঙির পক্ষেই এত ধার দিয়ে যাওয়া সম্ভব। কাদার মধ্যে চোখে পড়ছে প্রচুর লাল কাঁকড়া আর বিচিত্রদর্শন মাড-স্কিপার। আশপাশের গাছে মাছরাঙাদের জটলা। ভাটার সময় নদীর ধারে হরিণ এবং বুনো শুয়োর চোখে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এযাত্রায় অবশ্য তাদের দর্শন পাওয়া গেল না।

সজনেখালি গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। দূরদূরান্ত থেকে সুন্দরবনবাসীরা এসেছেন বনবিবির পুজোয় অংশ নিতে। বনদপ্তরের চৌহদ্দির মধ্যেই রয়েছে বনবিবির স্থায়ী মন্দির। পুজো উপলক্ষে আজ বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে পুরো মন্দিরচত্বরটি। সজনেখালির বনদপ্তরের পাশেই রাজ্য পর্যটন বিভাগের ষাটশয্যার বড় ট্যুরিস্ট লজ। 'সুন্দর-চিতল' নামের এই পর্যটক আবাসটি ২৮-৯-১৯৮৪ তারিখে উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন পর্যটনমন্ত্রী পরিমল মিত্র। শীতের মরসুম ছাড়া অন্য সময়ে প্রায় খালিই পড়ে থাকে। বেশিরভাগ ভ্রমণার্থী দলবেঁধে লঞ্চ ভাড়া করে সুন্দরবন বেড়াতে আসেন। থাকে খাওয়া এবং রাতে শোবার ব্যবস্থা।

বেশ কষ্ট করেই অজয় তরফদারের সন্ধান পাওয়া গেল। সঙ্গীদের নিয়ে দর্শনার্থীদের স্রোত সামাল দিতে গিয়ে তার তখন নাজেহাল অবস্থা। অজয় দ্রুত আমাদের ইতিকর্তব্য স্থির করে দিল। এখন থেকে ওর কথাকেই আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। অজয়ের পরামর্শমতো ফিরে চললাম আমাদের রাঙাবেলিয়ার আস্তানায়। সজনেখালির ঘাট থেকে নৌকোয় চেপে গোমর নদী পেরিয়ে গোসাবা দ্বীপের পাখিরালা এলাকায় পৌঁছে গেলাম। এক সময় এই পাখিরালাতেই ছিল পরিযায়ী পাখিদের বিশাল আস্তানা। পরবর্তী সময় কোনও কারণে পাখিরা এই স্থান ত্যাগ করে মরিচঝাঁপির দিকে চলে যায়। এই পাখিরালাতেই রয়েছে জেলা পরিষদের সুদৃশ্য বাংলো 'আলয়'। টাইগার মোড় থেকে ভ্যানরিকশা চেপে তিন কিলোমিটার দূরের টেগোর সোসাইটির অতিথি নিবাসে যাবার পথে আলাপ হল সহযাত্রী ঝড়খালির স্বপন মৃধার সঙ্গে। স্বপন আজ বেজায় খুশি, কারণ সে তার নববধূকে সজনেখালির পুজো দেখাতে নিয়ে এসেছিল। তার উচ্ছ্বাস দেখে মনে হল ট্যুরিস্ট লজের ডাইনিং হলে সস্ত্রীক মধ্যাহ্নভোজনের অভিজ্ঞতা তার দাম্পত্যজীবনের এক সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে। অতিথি নিবাসে স্নানাহারের পর মালপত্র নিয়ে আবার ফিরে গেলাম সজনেখালি। শীতের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়তেই দর্শনার্থীদের ভিড় হালকা হতে আরম্ভ করল। সন্ধে নামার আগেই দর্শনার্থীদের শেষ নৌকোটি চলে গেল, তখন বনবিবির মন্দিরচত্বরে যারা রয়ে গেল তাদের মধ্যে বনকর্মীদের সংখ্যাই বেশি। এছাড়া রয়েছেন অজয় তরফদারের মতো বেশ কয়েকজন যুবক যাঁরা পেশায় সুন্দরবনের গাইড। এতক্ষণে অজয় ফুরসত পেল আমাদের দিকে নজর দেওয়ার। তার সঙ্গে প্রথমেই গেলাম

বনবিবির মন্দিরে। ব্যাঘ্রাসীনা বনবিবির মূর্তির কাছাকাছি রয়েছে বনবিবির ভাই শাহজঙ্গুলি আর বাঘেদের রাজা দক্ষিণরায়ের মূর্তি। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সুন্দরবনবাসীদের কাছে বনবিবি পূজিতা হন। বিশেষ করে মউলে (মধু সংগ্রহকারী), বাউলি (কাঠ সংগ্রহকারী) এবং জেলেদের কাছে বনবিবি হলেন মূর্তিমতী বিপত্তারিণী। বনবিবি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে অজয় মুচকি হেসে জানাল, আজ রাতেই জেমসপুরে বনবিবির উপাখ্যান নিয়ে যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হবে। আমরাও সেখানে দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকব।

সজনেখালি থেকে ভুটভুটি চেপে জেমসপুরে অজয়ের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ। একটু পরেই সেখানে নিরঞ্জন মণ্ডল এসে হাজির। সঙ্গে তার বাড়ির পুজোর প্রসাদ। নিরঞ্জনের নৌকোয় দুদিনের সুন্দরবন ভ্রমণের চমৎকার পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেল। নিরঞ্জন হল এই অঞ্চলের পোড়খাওয়া নৌচালকদের অন্যতম আর অজয় হল সুন্দরবনের একজন অভিজ্ঞ গাইড। রাত দশটা নাগাদ যাত্রানুষ্ঠান আরম্ভ হবে, হাতে অনেক সময়, তাই আরম্ভ হল আড্ডা। বলাবাহুল্য আড্ডার বিষয়বস্তু ছিল সুন্দরবনকেন্দ্রিক। বাঘ-বাঘিনীর প্রেমপর্ব, মানুষখেকো বাঘের চালাকি, মধু সংগ্রহের কায়দাকানুন, ছোট্ট কালাচ সাপের মরণকামড়, বাঁদর-হরিণের সখ্য, কুমিরের সংসার, নদীপথে জলদস্যুর উৎপাত, কোনও কিছুই বাদ গেল না। আমার দুই সঙ্গীর এই প্রথম সুন্দরবন ভ্রমণ তাই তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে অজয়কেও বেগ পেতে হচ্ছিল। বাইরে কনকনে ঠান্ডা আর আমরা লেপ-কম্বল আর আড্ডায় ডুবে রইলাম। রাত দশটা নাগাদ যাত্রার আসরে পৌঁছে দেখি ইতিমধ্যেই সেখানে হাজির গোটা জেমসপুর গ্রাম। অনেকে দেখলাম বসার স্থান সুনিশ্চিত করতে বাড়ি থেকে মাদুর-শতরঞ্চি নিয়ে এসেছেন। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের অধিবাসীরা যাত্রার আসরে অনুপস্থিত থাকার কথা ভাবতেও পারেন না। হ্যাজাকের আলোয় আরম্ভ হল বনবিবির উপাখ্যানের ওপর আধারিত যাত্রা 'বনবিবির পালা'। মঞ্চের ওপর কলাকুশলীদের আবির্ভাব মুহূর্তে স্তব্ধ করে দিল দর্শকদের গুঞ্জন। আমরাও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পরিচিত হয়ে থাকি দুখে নামে এক গ্রাম্য কিশোরের চমকপ্রদ জীবনকাহিনীর সঙ্গে।

দুখে গরিব বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। ধনাই নামে এক সম্পন্ন মউলে মধু সংগ্রহের কাজে দুখেকে নিজের দলে সামিল করে। ধনাই কিন্তু জঙ্গলে ঢুকে এক ফোঁটাও মধু পায় না। দক্ষিণরায় হলেন বাদাবনের মধু-মোমের সৃষ্টিকর্তা এবং রক্ষক। ধনাই স্বপ্ন দেখলেন দক্ষিণরায় তাকে বলছেন 'আমি তোমার সাতটি নৌকো মোম-মধুতে ভরে দেব, কিন্তু আমি নরবলি চাই। দুখেকে আমার খুব পছন্দ। তুমি তাকে কেঁদোখালি রেখে যাবে। আমি বাঘ হয়ে দুখেকে খাব'। ধনাই প্রথমে রাজি না হলেও দক্ষিণরায় যখন নানাভাবে ভয় দেখাতে আরম্ভ করলেন সে রাজি হয়ে গেল। ধনাইয়ের সাতটি ডিঙি মোম-মধুতে ভরে যায়। ধনাই ঘরে ফেরার পথে কেঁদোখালিতে পৌঁছে দুখেকে রান্নার কাঠ সংগ্রহ করতে গভীর

জঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়। দুখে কাঠ নিয়ে ফিরে এসে দেখে ধনাই আর তার সপ্তডিঙির কোনও চিহ্নই নেই। দক্ষিণরায় তখন ভয়ঙ্কর বাঘের রূপ ধরে দুখের সামনে এসে হাজির হন। বাঘ দেখে কিশোর দুখে ভয়ে কাঁদতে থাকে। তার মনে পড়ে যায় জঙ্গলে আসার সময় দুখিনী মা বলেছিল কোনও বিপদ হলে বনবিবির নাম স্মরণ করতে। দুখে এক মনে বনবিবির নাম স্মরণ করতে করতে মাটিতে পড়ে যায় এবং জ্ঞান হারায়। বনবিবি দুখের কান্না শুনতে পেয়ে ভাই শাহজঙ্গুলিকে সঙ্গে নিয়ে ঝড়ের বেগে কেঁদোখালিতে এসে বাঘের মুখ থেকে দুখেকে উদ্ধার করে কোলে তুলে নেন। বনবিবির যমজ ভাই শাহজঙ্গুলির প্রবল প্রতিরোধের সামনে পড়ে দক্ষিণরায়কে হার মানতে হয়। বনবিবির কাছ থেকে প্রচুর ধনরত্ন পেয়ে দুখে দেশে ফিরে যায় এবং বনবিবির মহিমা প্রচারে উদ্যোগী হয়। যাত্রা শেষ হবার পরেও অনেকক্ষণ মনের ভেতর তার রেশ থেকে গিয়েছিল।

পরদিন সকালে আরম্ভ হল আমাদের জলপথে সুন্দরবন দর্শনের প্রস্তুতি। নিরঞ্জন মণ্ডলের নৌকোয় সজনেখালি বনদপ্তর গিয়ে প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করার পর নদী পেরিয়ে পাখিরালা টাইগার মোড় যেতে হল দুদিনের রসদ যোগাড় করতে। মুদিখানায় ফর্দ জমা দিয়ে অজয়ের সঙ্গীরা গেল কাঁচাবাজার সেরে নিতে। আর আমি গেলাম বন্ধুবর খগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করতে। আলাপচারিতার মধ্যেই খগেনবাবু বলে উঠলেন, 'চলুন আপনাকে একটা ভালো জিনিস দেখাই'। ইট বাঁধানো এক সরু পথ ধরে পাখিরালা বনদপ্তরের কাছাকাছি যেতেই কানে এল লক্ষ পতঙ্গের গুঞ্জন। শব্দের উৎস চোখে পড়ল আরও একটু এগিয়ে যেতে। পথ সংলগ্ন বাইন গাছের ডাল থেকে ঝুলছে প্রকাণ্ড এক মৌচাক। মৌমাছিদের বড়সড় চেহারা দেখেই বোঝা যায় এরা হল পাহাড়ি মৌমাছি। সুন্দরবনের ফুল থেকে মধু আহরণ করতে এই মৌমাছিরা সুদূর হিমালয় থেকে প্রতি বছর গ্রীষ্মের শুরুতে এই অঞ্চলে এসে হাজির হয়। বর্ষার আগেই এরা পাহাড়ি এলাকায় ফিরে যায়। এই মধ্য জানুয়ারিতে এদের দর্শন পাব এমনটা মোটেই আশা করিনি। খগেনবাবু জানালেন, মৌমাছিদের এই বিশাল ঝাঁকটি আর কয়েকদিন পরেই দূরে পাড়ি দেবে। তাদের এই হঠাৎ আসা-যাওয়ার গ্রহণযোগ্য কারণ বিশেষজ্ঞরাই দিতে পারবেন। ফেরার পথে খগেনবাবু সুন্দরবনের মধু নিয়ে আরও কিছু আকর্ষণীয় তথ্য দিলেন। বাদাবনের সেরা মধু হল খলসি ফুলের মধু। মৌচাক তৈরি করার জন্য মৌমাছিরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গেঁওয়া গাছকেই বেছে নেয়। এরপর তাদের পছন্দ বাইন, গর্জন, গরান আর সুন্দরী গাছ। দুই ঘনফুট আয়তনের মৌচাক থেকে প্রায় ১৪ কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়। আর মৌচাকে এক কিলোগ্রাম মধু জমাতে মৌমাছিদের প্রায় কুড়ি লক্ষ ফুলে যেতে হয়।

পাখিরালা থেকে খরিদ করা যাবতীয় সামগ্রী নৌকোয় তোলা হয়। পানীয় জলের প্রয়োজন মেটাতে আমাদের সঙ্গে চলেছে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাব। বেলা দশটা নাগাদ আমাদের নৌকো গোমর নদীর ওপর দিয়ে গোসাবা দ্বীপকে বাঁদিকে রেখে

এগিয়ে চলল। আজ আমাদের গন্তব্য হেমনগর হয়ে ঝিঙেখালি। যার অবস্থান বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে। পাখিরালাকে পিছনে ফেলে রেখে একে একে পেরিয়ে গেলাম জটিরামপুর, এমলিবাড়ি, উত্তরডাঙা, মোল্লাখালি আর হেতালবাড়ি। চলার পথে জঙ্গল তেমন চোখে পড়ছে না। হেতালবাড়ি পেরিয়ে কিছুদূর যাবার পর অজয় দূরবর্তী এক জঙ্গলে ঢাকা স্থলভাগকে দেখিয়ে বলে উঠল 'ওই হল মরিচঝাঁপি'। ১৯৭৯ সালে দণ্ডকারণ্য ছেড়ে বেশ কিছু বাঙালি এই স্থানটিতে বসতি গড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। মরিচঝাঁপিকে ডানদিকে রেখে আমাদের জলযান কুমিরমারি, বাগনা আর হেমনগর ছাড়িয়ে পৌঁছে গেল ঝিঙেখালি। তার আগেই অবশ্য চলমান নৌকোর ছাদে বসে আমাদের মধ্যাহ্নভোজন সম্পন্ন হয়েছে। ভোজনপর্বের প্রধান আকর্ষণ ছিল চলার পথে জেলেদের কাছ থেকে কেনা প্রমাণ সাইজের কানমাগুর মাছের ঝাল আর পারশে মাছভাজা।

ঝিঙেখালিতে রয়েছে বনবিভাগের রেঞ্জ অফিস এবং একটি ওয়াচটাওয়ার। কাঠের জেটিতে নৌকো লাগার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে এসে হাজির হল এক পাল বাঁদর। তাদের উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার। পর্যটকদের কাছ থেকে খাবারদাবার যদি কিছু পাওয়া যায়। ঝিঙেখালির ওয়াচটাওয়ারে বেশ কিছুটা সময় কাটালাম। কয়েকটা চিতল হরিণ চোখে পড়তেই আমাদের সে কী উত্তেজনা! ঝিঙেখালি দেখে আমাদের নৌকো ভিড়ল হেমনগরের নবনির্মিত পাকা জেটিতে। রায়মঙ্গল নদীর ধারে অবস্থিত হেমনগরের পরিচিতি সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশপথ রূপে।

১৯৯৬ সালের শেষদিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের উদ্যোগে হেমনগরে পর্যটক নিবাস তৈরি হয়েছে। ব্যবস্থা মোটামুটি ভালোই। মোট আটটি দ্বিশয্যাঘর ছাড়াও রয়েছে বড় বড় দুটি হল ঘর। ঘর সংলগ্ন বারান্দা থেকেই রায়মঙ্গল নদীর ওপরে বাগনা ফরেস্ট রেঞ্জের শোভা চোখে পড়ে। ঘর খালি থাকলেও এখানে রাত্রিবাস করতে আমরা আগ্রহী নই কারণ, হেমনগর ঘাটে লাগানো নৌকোতে রাত কাটাব বলে আগে থেকেই ঠিক করা আছে।

হেমনগর থেকে ভ্যানরিকশা চেপে রওনা দিলাম চার কিলোমিটার দূরে যোগেশগঞ্জে। আজ শনিবার তাই বাংলাদেশ লাগোয়া যোগেশগঞ্জে হাট বসেছে। এই অঞ্চলে যোগেশগঞ্জের হাটের বেশ নামডাক। শীতের নরম রোদ গায়ে মেখে সরু পিচরাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সুন্দরবনের এক প্রত্যন্ত জগৎ প্রত্যক্ষ করছিলাম। মাটির বাড়ি, চাষের জমি আর অজস্র পুকুর ডোবা নিয়ে এই পৃথিবী। যোগেশগঞ্জ পৌঁছে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। একটা গ্রামীণ হাট আকারে এবং বৈচিত্রে এত বিশিষ্ট হতে পারে কল্পনাও করিনি। কী নেই এখানে। হাট দেখে আমার শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার কথা মনে পড়ে গেল। চায়ের দোকানে বসে স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে জানা গেল বাংলাদেশ থেকে প্রচুর মানুষ এখানে কেনাকাটা করতে আসেন। সূর্যাস্তের আগেই অবশ্য তাদের ফিরে যেতে হয়। হাটের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটি হল মাছের বাজার। চোখের সামনে ঝুড়ি

ঝুড়ি বাগদা চিংড়ি, ভেটকি, পারশে, গুরজালি নিলামে বিক্রি হয়ে রওনা দিল কলকাতার দিকে।

যোগেশগঞ্জ থেকে হেমনগর ফেরার পথে ভ্যানরিকশার এক তরুণ সহযাত্রী দেবব্রত মিস্ত্রির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। হেমনগর পৌঁছে সে মহা উৎসাহ নিয়ে আমাদের নিয়ে গেল পরিমল মিস্ত্রির বাড়ি। অতি সাধারণ দর্শন এই বাসস্থান একদিনের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল কারণ, রাতের অন্ধকারে বাগনার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে রায়মঙ্গল নদী পেরিয়ে এক বাঘিনী এই বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। দিনটি ছিল ২৭ জুলাই, ১৯৯৫। পরিমলবাবুর কাছে সেই রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণ শোনার অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। এই বাঘিনীটি প্রথমে বাড়ির গোয়ালঘরে ঢুকে দুটি গরুকে মারে তারপর লোকজনের হৈচৈ শুনে ঘাবড়ে গিয়ে ঢুকে পড়ে বাড়ির অন্য একটি ঘরে। পরে বনকর্মীরা এসে ঘুমপাড়ানি গুলির সাহায্যে বাঘিনীকে অজ্ঞান করে খাঁচায় বন্দী করতে সমর্থ হন। পুরো ঘটনাবলির সবচেয়ে রোমহর্ষক অংশটি হল উদ্‌ভ্রান্ত বাঘিনীর গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির অন্দরমহলে গমন। আংশিক ভেজানো দরজা ঠেলে বাঘিনী যে ঘরটিতে ঢুকেছিল সেখানে তখন পরিবারের এক বয়স্কা সদস্য তাঁর তিনবছর বয়সী নাতিকে নিয়ে শোবার তোড়জোড় করছেন। বাঘিনী ঘরে ঢুকেই এক কোণে আশ্রয় নিল। ভাবলেও বুক কেঁপে ওঠে, ঘরের ভেতর বিরাজমান ভয়ঙ্কর সুন্দরবনের বাঘ। অসমসাহসের পরিচয় দিয়ে এবং মাথা ঠান্ডা রেখে নাতিকে কোলে নিয়ে ঠাকুমা ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতেই অন্যরা দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে খিল তুলে দিলেন।

যোগেশগঞ্জের হাট থেকে মুরগি কেনা হয়েছিল। আমাদের সঙ্গে আসা ছোকরা রাঁধুনি তার সমস্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এমন একটি পদ বানিয়েছিল যার স্বাদ হয়েছিল অনির্বচনীয়। নৌকোয় রাত কাটাবার অভিজ্ঞতা সবসময় রোমাঞ্চকর। রায়মঙ্গল নদীর জলকল্লোলের মধুর সঙ্গীত শুনতে শুনতে এক সময় চেতনা লোপ পেল।

সূর্যোদয়ের পরে পরেই দেবব্রত মিস্ত্রি এসে হাজির। হেমনগরবাসী আমাদের এই নতুন বন্ধুটি সঙ্গে নিয়ে এসেছে বাড়িতে ভাজা মুড়ি আর ঘরে তৈরি নলেনগুড়। এ পর্যন্ত কত জায়গায় কত রকম প্রাতরাশ করার সৌভাগ্য হয়েছে কিন্তু মুড়ি-নলেনগুড়ের যুগলবন্দি যে এমন তৃপ্তিকর হতে পারে কোনও ধারণাই ছিল না। পরে জেনেছিলাম উত্তর ২৪ পরগনার এই অঞ্চলেই নলেনগুড়ের খ্যাতি সুদূরবিস্তৃত।

হেমনগর থেকে বিদায় নিয়ে গতকালের পথ ধরেই ফিরে চললাম সজনেখালির দিকে। আজ আমরা দেখব সুধন্যখালি, দোবাঁকি আর নেতিধোপানি। সজনেখালিতে না থেমে আমাদের নৌকো এগিয়ে চলল সুধন্যখালির দিকে। আমাদের বাঁদিকেই গভীর বাদাবন। নদীর জলে এখন ভাটার টান তাই জঙ্গলের

অনেকটা অংশই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ঠেসমূলের অভিনব বৈশিষ্ট্যের জন্য গর্জন গাছের সারি সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে। আবার শালের মতো ছুঁচলো শ্বাসমূল গরান গাছের বৈশিষ্ট্য। এছাড়া রয়েছে হেঁতাল, বাইন, গেঁওয়া, গোলপাতা, ধুন্দুল, কাঁকড়া, খলসি, পশুর আর বকুল গাছ। প্রতিটি ঝোপেই মনে হয় বাঘ লুকিয়ে আছে। ধুন্দুল গাছের বৈশিষ্ট্য তার ছোট ফুটবল সদৃশ ফলের জন্য। এই গাছের কাঠ দিয়েই স্থানীয় মানুষ আসবাবপত্র তৈরি করেন। যে গাছের নামে সুন্দরবনের নামকরণ হয়েছে সেই সুন্দরী গাছের সংখ্যাই বেশ কম। সুন্দরবনের পাখিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাচ্ছে অজয় তরফদার। কতদিন পর এত কাছ থেকে শঙ্খচিলকে গাছের ডালে বসে থাকতে দেখলাম। কর্দমাক্ত নদীতটে বক, কোঁচবক, কাদাখোঁচা, কাস্তেচরা, শামুকখোল পাখিরা এক মনে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ল রঙিন মাছরাঙাদের ব্যস্ততা। ছয়-সাত রকম মাছরাঙা দেখতে হলে সুন্দরবনে আসতেই হবে।

নৌকোর ইঞ্জিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে অবাক হয়েছিলাম। অজয় জানাল, অদূরবর্তী নদী চরটি হল এক বড় কুমিরের রোদ পোহাবার প্রিয় জায়গা। কপালে না থাকলে বন্যপ্রাণীর দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তাই ঘটল। কুমিরের বদলে তার বিশ্রামের জায়গা দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। সুন্দরবনের মতো বড় মাপের মোহনার কুমির বিশ্বে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। সরকারিভাবে নথিভুক্ত সবচেয়ে বড় কুমিরটির দৈর্ঘ্য ছিল ১০.০৫ মিটার। এই কুমিরটির কঙ্কাল রাখা আছে কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে। সুধন্যখালির কংক্রিটের জেটি থেকেই লোহার জালে ঘেরা ইট বাঁধানো পথ চলে গেছে ওয়াচটাওয়ারের দোরগোড়ায়। পাহারাদার বনকর্মীরা এখানে নৌকোর ওপরেই রাত্রিবাস করেন। ওয়াচটাওয়ারে উঠলাম খুব উৎসাহ নিয়ে, কারণ অন্যতম বনকর্মী আশুতোষ মিস্ত্রি জানিয়েছেন, গতকাল বিকেলেই এক বাঘকে এ তল্লাটে দেখা গেছে। ওয়াচটাওয়ার থেকে চোখে পড়ছে মিষ্টিজলের পুকুর, জঙ্গল কেটে তৈরি করা লম্বা করিডোর। প্রায় একঘণ্টা সময় কাটল নজরমিনারে। চোখে পড়ল শুধু এক বড় গোসাপ। এই গোসাপ হল সুন্দরবনের বাঘের অন্যতম খাদ্য। আবার এই গোসাপরাই কুমিরের ডিম খুঁজে বার করে পরম তৃপ্তিতে ভক্ষণ করে।

সুধন্যখালি দেখে পৌঁছে গেলাম দোবাঁকি। দোবাঁকিতে বনদপ্তর পর্যটকদের জন্য নতুন ওয়াচটাওয়ার তৈরি করেছেন। দীর্ঘ এক মাচাপথের ওপর দিয়ে এই নজরমিনারে যেতে হয়। ঝুলন্ত ব্রিজের ওপর থেকে বাদাবনকে এত কাছ থেকে দেখা যাবে ভাবতেই পারিনি। নবনির্মিত বড় ওয়াচটাওয়ারটি একদিকে কিছুটা হেলে পড়েছে। এর ওপর থেকে অবশ্য বেশ কয়েকটি চিতল হরিণের দর্শন পাওয়া গেল।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য নেতিধোপানি ওয়াচটাওয়ার। চলেছি তো চলেছিই। জলপথ যেন আর শেষ হয় না। মাকড়সার জালের মতো ছড়ানো নদী আর খালের

গোলকধাঁধা দেখে মনে প্রশ্ন জাগে মাঝিরা পথ চেনে কী করে? এই নিয়ে নিরঞ্জন মণ্ডলকে প্রশ্ন করার আগেই ঘটল এক অপ্রত্যাশিত রোমাঞ্চকর ঘটনা। নেতিধোপানির কাছাকাছি পৌঁছে আমাদের নৌকো বাঁদিক ঘুরে সবে নতুন এক জলপথ ধরেছে, চালকের কেবিন থেকে কানে এল নিরঞ্জনের উত্তেজিত কণ্ঠ। তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে যা শুনলাম তাতে সমস্ত শরীর শিহরিত হল। এই মাত্র একটা বাঘ নদী পারাপার করল। ঠিকমতো বুঝে ওঠার আগেই দক্ষিণরায় নদী সংলগ্ন জঙ্গলে ঢুকে পড়ায় তার দেখা আমরা পেলাম না বটে তবে কাছ থেকে তার টাটকা চরণরেখা দর্শন করে আর ছবি তুলেই নিজেদের কৃতার্থ বোধ করলাম।

অবশেষে পৌঁছে গেলাম নেতিধোপানির ঘাট। মনসামঙ্গল কাব্যে এই ঘাটের উল্লেখ রয়েছে। ভেলায় করে বেহুলা স্বামী লক্ষ্মীন্দরের মৃতদেহ নিয়ে ভেসে চলার সময় এই জায়গায় এক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। বেহুলা দেখলেন কাপড় কাচার সময় বারংবার বিরক্ত করার জন্য এক রজকিনী তার ছেলেকে আছাড় মেরে মেরে ফেলার পর কাজ শেষে পুনরায় তাকে বাঁচিয়ে তুললেন। বেহুলা বুঝলেন এই ধোপানি সাধারণ নারী নয় তাই ভেলা নিয়ে ঘাটে এসে তার পা জড়িয়ে ধরে কৃপা প্রার্থনা করেন। এই রজকিনীই নেতিধোপনি এবং এর সাহায্যেই বেহুলা স্বর্গের দেবসভায় যেতে সমর্থ হন।

সুধন্যখালির মতো নেতিধোপানি ওয়াচটাওয়ারে যাবার পথটিও লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। এখানেও রয়েছে বনবিভাগের তৈরি করা মিষ্টিজলের পুকুর। পুকুরের অদূরেই রয়েছে প্রাচীন এক শিবমন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। নজরমিনারের ওপর দাঁড়িয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না এমন একটি জায়গায় বাঘের দর্শন পাবার সমূহ সম্ভাবনা। নেতিধোপানি ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা বনকর্মী তায়েব আলি মণ্ডল বাঘ নিয়ে যখন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছিলেন আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। নেতিধোপানিতে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে আমরা দেখলাম শুধু কয়েকটি বুনো শুয়োর, জংলী শুয়োর। জংলী শুয়োর প্রসঙ্গে তায়েব আলি জানালেন, এরা সুন্দরবনের বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য হলেও পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল বরাহকে বাঘও ঘাঁটাতে চায় না। আক্রান্ত হলে এদের মুখের দুপাশে বেরিয়ে থাকা ধারালো দাঁতের বিদ্যুৎগতি-সঞ্চালন বাঘের মতো ভয়ঙ্কর প্রাণীকেও গুরুতর আহত করতে পারে।

নেতিধোপানি থেকে বিদায় নিয়ে চললাম পাখিরালার দিকে। আজকের রাতটা কাটাব খগেনবাবুর হোটেলে, এমনটিই ভেবে রেখেছি। সবদিক দিয়ে বিচার করলে সার্থক আমাদের এই সুন্দরবন ভ্রমণ। শুধু একটাই আক্ষেপ, বাঘের দেখা পেলাম না। সত্যি সত্যি দক্ষিণরায়ের দর্শন পেলে ব্যাপারটা কী দারুণ রোমাঞ্চকর হত এই ভেবে আমরা যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছিলাম তা বোধহয় ওপরওয়ালার নজরে এসেছিল তা নাহলে একটু পরেই আমাদের এক চরম রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে কেন?

নেতিধোপানি থেকে রওনা দিয়ে আমাদের যন্ত্রচালিত বোট তখন পঞ্চমুখানিতে

প্রবেশ করেছে। প্রশস্ত বিদ্যা নদীর সঙ্গে আরও চারটি নদী মিলিত হয়ে পঞ্চমুখানির দিগন্তবিস্তারী জলরাশির সৃষ্টি করেছে। চোরাস্রোতের জন্য এই স্থানটি এতই কুখ্যাত যে পাকা মাঝিরাও পঞ্চমুখানির দরিয়া পেরোবার সময় বদরপীরের নাম জপ করেন। পঞ্চমুখানির প্রায় মাঝামাঝি এসে মনে হল আমরা ভুল করে বোধহয় সাগরে চলে এসেছি। চারদিকে শুধু জল আর জল। এই অবস্থায় মনের কোণে অবধারিতভাবে যে ভাবনাটি জায়গা করে নেয় তা হল এই জায়গায় যদি নৌকোর ইঞ্জিন বিগড়ে যায়? সমবেত প্রার্থনায় যদি ঐশী শক্তি জেগে ওঠে, তবে সমবেত উদ্বেগ বোধহয় অঘটনকে ত্বরান্বিত করে। তা নাহলে সত্যি সত্যি কেনই বা আমাদের চলমান জলযান হঠাৎ গোটা কয়েক হেঁচকি তুলে মাঝদরিয়ায় দাঁড়িয়ে পড়বে! নিরঞ্জন হাসিমুখে নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে ইঞ্জিনের মানভঞ্জন করার কাজে লেগে গেল। নিরঞ্জনের হাসিমুখে ভ্রূকুটি দেখা দিল অজয়ের প্রাথমিক বিপদবার্তা শুনে। অজয় জানাল, এখানে জল এত গভীর, নোঙর ফেলেও মাটি পাওয়া যাচ্ছে না। অজয়ের কাছেই জানা গেল, জলে ভাটার টান তীব্র হলেই নোঙরহীন নৌকো ভেসে চলবে বঙ্গোপসাগরের দিকে। আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম ভাসতে ভাসতে যে কোনও একটা দ্বীপে নৌকো লাগালেই তো হয়। আমাদের সমাধান সূত্র শুনে কাণ্ডারী নিরঞ্জনের মুখে মলিন হাসি ফুটল। উত্তর দিল অজয়, দ্বীপে নৌকো লাগানোটা সমস্যা নয়, সমস্যা দেখা দেবে পরে। ভাটা শেষ হলেই কাদায় নৌকো একেবারে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসবে। নৌকো ভেসে উঠবে আবার জোয়ার এলে। অনেক চেষ্টা করেও বিকল ইঞ্জিন সারানো গেল না, এদিকে হালকা ভাটার টানে আমাদের নৌকো আস্তে আস্তে দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। ঘড়িতে দেখি তিনটে বেজে গেছে। শীতের বেলা দ্রুত পড়ে আসে। পুরো পরিস্থিতি উপলব্ধি করে উৎকণ্ঠায় গলা শুকিয়ে এল। অজয় ভরসা দিল ভয়ের কিছু নেই, অন্য নৌকোর সাহায্যে আমরা উদ্ধার পাব। কোথায় অন্য নৌকো! অনেক দূর দিয়ে দুয়েকটা নৌকো দিনান্তে ঘরে ফিরছে বটে কিন্তু এত দূর থেকে আমাদের প্রাণপণ চিৎকার তাদের কানে কোনওমতেই পৌঁছবে না। সুন্দরবনের এই অঞ্চলে যে ডাকাতের উৎপাত আছে এ তথ্য আমার জানা ছিল। কথাটা নিরঞ্জনকে বলতেই সে একবাক্যে তা স্বীকার করে নিল। নিরঞ্জন অচল ইঞ্জিনকে সচল করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে, আর আমরা চোখ রাখছি অন্য নৌকোর গতিবিধির ওপর। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্ত যাবে আর তারপর কী হবে ভাবতেই শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল।

ওই তো! একটা ভুটভুটি আমাদের বিপরীত দিকে ধেয়ে চলেছে। আমাদের থেকে এমন কিছু বেশি দূরেও নয়, আমরা সবাই মিলে তারস্বরে চিৎকার করে সেই নৌকোর আরোহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলাম। আমাদের সমবেত কণ্ঠের আওয়াজ শুনে সেই নৌকোর গতি কমতেই আমরা স্বস্তির নিশ্বাস

ফেললাম। যাক বিপদ কেটে গেছে। হায়, তখনও যদি জানতাম দুর্ভোগের অনেক বাকি আছে।

আমাদের ত্রাতা বলে যে নৌকোটিকে ভেবেছিলাম, কী এক অজ্ঞাতকারণে সে আমাদের কাছে না ঘেঁসে দ্বিগুণ উদ্যমে উধাও হয়ে গেল। নিরঞ্জন হতাশ হয়ে বলে উঠল, 'এই ভয়টাই করছিলাম। ওই নৌকোর লোকজন যদি আমাদের ডাকাত বলে সন্দেহ করে থাকে তাদের দোষ নেই।' নিরঞ্জনের কথা শুনে আরেকবার ভয়ে হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। আমাদের ডাকাত ভেবে অন্য নৌকো উদ্ধার করতে আসবে না এমন জটিল পরিস্থিতি কল্পনাতেও আসেনি। অজয় সুন্দরবনের একজন অভিজ্ঞ গাইড হিসাবে নানা সমস্যার মোকাবিলা করেছে। তাই তার মাথা থেকেই বুদ্ধিটা বেরিয়ে এল। তার পরামর্শে আমরা আমাদের সঙ্গে আনা উজ্জ্বল রঙের উইন্ডচিটারগুলো গায়ে চাপিয়ে নিলাম। মাথায় টুপি দেওয়ার পর আমাদের চেহারা দাঁড়াল আদি-অকৃত্রিম পর্যটকের। এবার শুধু প্রতীক্ষা কখন আরেকটি নৌকো আমাদের কাছ দিয়ে যাবে। রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা এক সময় শেষ হল। ভাটার টানে ভাসতে ভাসতেই চোখে পড়ল ডানদিকে একটা বড় নৌকো দ্রুত বেগে আমাদের বিপরীত দিকে চলেছে। সবাই বুঝতে পারছি এটাই শেষ সুযোগ। কারণ সূর্য হেলে গেছে। ইতিমধ্যে অজয় একটা বাঁশের লগির মাথায় তার মেরুন রঙের চাদরটি পতাকার মতো বেঁধে ফেলেছে। নৌকোর সামনের দিকে এগিয়ে সবাই মিলে হাত নেড়ে তারস্বরে চিৎকার শুরু করলাম, অজয় চাদর বাঁধা লগিকে সশব্দে, সজোরে নাড়তে লাগল, সব মিলিয়ে সে এক অবর্ণনীয় শব্দবিস্ফোরণ। আমাদের এই মরণপণ উদ্যম ব্যর্থ হল না। আমাদের প্রবল চিৎকার শুনে আর ইশারা-ইঙ্গিত অনুধাবন করে অপর নৌকোটি তার গতি কমিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে দূর থেকেই খোঁজখবর করতে লাগল। পর্যটকদের নৌকো বিকল হয়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হবার পরেই সেই নৌকো এসে আমাদের গা ঘেঁসে দাঁড়াল। নিরঞ্জন গিয়ে অপর নৌকোর সারেংয়ের সঙ্গে টাকা-পয়সার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতেই উদ্ধারকারী নৌকোর সঙ্গে রজ্জু বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমাদের নৌকো রওনা দিল বালি দ্বীপের উদ্দেশে। ঘণ্টা দুয়েক পরেই পৌঁছে গেলাম বালি দ্বীপ। দ্বীপের বেশিরভাগ অধিবাসী পেশায় মৎস্যজীবী। স্থানীয় মিস্ত্রির সাহায্যে নিরঞ্জনের বিকল ইঞ্জিন সচল হতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগল। এবার আমাদের গন্তব্য সেই পাখিরালা।

প্রয়োজনীয় তথ্য

সুন্দরবন ভ্রমণের সবচেয়ে সহজসাধ্য এবং আরামপ্রদ উপায় হল রাজ্য পর্যটন নিগম বা সুন্দরবন টাইগার ক্যাম্পের প্যাকেজ ট্যুরে অংশ নেওয়া। কলস দ্বীপেও থাকতে পারেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জিলা পরিষদের উদ্যোগে। যাঁরা একটু অন্যভাবে সুন্দরবন বেড়াতে আগ্রহী তাঁরা ৭-৮ জনের দল গড়ে নিজেদের উদ্যোগেই বেরিয়ে পড়তে

পারেন। কলকাতা থেকে সুন্দরবনের বাদাবনের প্রধান প্রবেশপথ গোসাবা দ্বীপের পাখিরালা যাবার পথনির্দেশ নীচে দেওয়া হল।

কলকাতার বাবুঘাট থেকে বাসন্তীগামী স্টেট বাস চেপে সোজা সোনাখালি। দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার। সময় লাগবে তিন ঘণ্টা। সোনাখালিতে হোগল নদী পেরোলেই অপরদিকে বাসন্তী। এখানে অটোরিকশা চেপে গদখালি যেতে সময় লাগবে চল্লিশ মিনিট। গদখালিতে ফেরি নৌকোয় নদী পেরোলেই গোসাবা জনপদ। গোসাবা বাজার থেকেই পাখিরালা যাবার ভ্যানরিকশা পাওয়া যাবে। পাখিরালাতে রাত্রিবাসের জন্য একাধিক মাঝারি মানের হোটেল রয়েছে। পাখিরালা থেকে নৌকোয় সুন্দরবন বেড়ানো যেতে পারে।

কয়েকটি জরুরি ঠিকানা

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম

ট্যুরিজম সেন্টার, ৩/২, বি বা দী বাগ (পূর্ব), কলকাতা-৭০০ ০০১

☎২২১০-৩১৯৯, ২২৪৮-৫৯১৭

বিভাগীয় বনাধিকারিক (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

১২, বিপ্লবী কানাই ভট্টাচার্য সরণি, প্রশাসনিক ভবন, ফোর্থ ফ্লোর

কলকাতা-৭০০ ০২৭ ☎২৪৭৯ ৯০৩২

সুন্দরবন টাইগার ক্যাম্প

জৈনকো বিজনেস সেন্টার, ১, কিড স্ট্রিট, ৪৩, প্লাজা কোর্ট

কলকাতা-৭০০ ০১৬ ☎৩০৯৩-৫৭৪৯

অজয় তরফদার

গ্রাম ও পোঃ-জেমসপুর, থানা-গোসাবা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মধুবন হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট

গ্রাম ও পোঃ পাখিরালা টাইগার মোড়, থানা-গোসাবা

জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা ☎(৯১১৮) ২৩৬৫৫৬, ২৩৬০৫২

সঙ্গে কী নেবেন

রোদটুপি, জিওলিন, মশা তাড়ানো ধূপ বা ক্রিম, টর্চ লাইট এবং ব্যক্তিগত ওষুধপত্র। সুন্দরবন ভ্রমণে চামড়ার বুট জুতো অচল। এখানে কাজে দেবে রবারের স্যান্ডাক জাতীয় পাদুকা। সম্ভব হলে সঙ্গে বাইনোকুলার নেবেন।

'ভ্রমণ' ডিসেম্বর, ২০০৪

আগুন ও বরফের দেশ আইসল্যান্ড

প্রীতি সান্যাল

আইসল্যান্ড চলেছি। দুহাজার চার সালের বিজয়া দশমীর পরদিন ভোরে প্যারিস থেকে রওনা দিলাম রেইকাভিক, আইসল্যান্ডের রাজধানীর পথে। আগুন আর বরফের দেশ আইসল্যান্ড।

উড়োজাহাজ নামবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। আকাশ পরিষ্কার। সূর্য ঝলমল করছে। তবু নীচে নামলেই শূন্য তাপমাত্রার কথা ভেবে শিউরে উঠছি। প্লেন নামছে। সূর্য মেঘে ঢাকা। চারদিক আঁধার করে আছে। আধঘণ্টা এখনও নামতে। দূরে একটু নীল আর সবখানে ধূসর। বরফ ছড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে তুষার অবতরণের প্রস্তুতি।

আইসল্যান্ড কথাটাতেই তো রহস্য। আটলান্টিকের মধ্যেখানে আমাদের চোখের আড়ালে এক দ্বীপ। চারদিক ঘেরা এক অপার নৈঃশব্দ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে বা কোনও শীর্ষ সম্মেলন হলে সে বিষয়ে কখনও-সখনও কাগজে তার খবর পাওয়া যায়। মনে হয় দ্বীপটি না থাকলেও জগতের কিছু এসে যেত না। তবু এই দ্বীপ যেন অনেক দিক দিয়েই স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটু পরেই তার সঙ্গে পরিচয় হবে, উৎসুক অপেক্ষায় আছি।

এয়ারপোর্টে নামলাম। বেশ দশাসই চেহারার গাড়ি চালক আমাদের নাম লেখা ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়ে। প্যারিসের ভ্রমণ বিপণি থেকে বেছে নেওয়া আইসল্যান্ডে আমাদের মতো অনেকেই এসেছে। ফরাসি দলটির মধ্যে আমরাই একমাত্র অন্য দেশের। ফরাসি ভাষার কলকাকলিতে বরফ জমা আইসল্যান্ডের ঠান্ডা যেন কম লাগছে। নানা বয়সের মানুষজন। দুয়েকটি কথাবার্তা। বাস চালক গুডমুনডার শেখাল ভাইকিং সম্ভাষণ— গোয়ান ডাগ— হ্যালো, সুপ্রভাত; তাক ফিরির— অশেষ ধন্যবাদ।

চলেছি পরিচ্ছন্ন রাজপথ ধরে। দুধারে একটিও গাছ নেই। একটা নির্জন রুক্ষতা। এত জমি শূন্য পড়ে আছে দেখলে অবাক লাগে। রাজধানী রেইকাভিকের দিকে চলেছি। রাস্তা কালো পিচের। দূরের সাদা বাড়িগুলির ছাদ লাল টালির। একটু পরে সব মিলিয়ে এক অচিন দেশ। এখনও পঞ্চাশ কিলোমিটার দূর। পথে ব্লু লেগুন হ্রদে গাড়ি থামবে। উষ্ণ জলের নীল হ্রদ। এয়ারপোর্টের বাইরে শূন্য

ডিগ্রি ঠান্ডা অপেক্ষা করছিল। বেশ জোর একটা হাওয়া উঠে তুষার ঠান্ডা চারদিকে ছড়িয়ে আমাদের মুখে আছড়ে পড়ল। শীতকাপড়ের ব্যূহ ভেদ করে আর ঢুকতে পারে নি। মাথা ঢাকা গরম উলের বনেট, হাত মোজা পা মোজা এবং গরম বরফ রক্ষাকবচ স্কাই জ্যাকেট, তার থেকে মজার ব্যাপার হল সবাই পরে নিয়েছে সাঁতারের পোশাকের ওপর এসব পশম পোশাক। উষ্ণ জলের আহ্বান হাতছানি দিচ্ছে।

এ কোথায় এলাম! অন্য কোনও গ্রহে! দু ধারে আগ্নেয় লাভা জমে আছে নানা রকমের আকারে। কখনও গাছ, মানুষের মুখ, পশু পাখি, ফুল লতাপাতা লাভায় জমে আছে যেন। তার ওপর দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা কোনও আলোড়ন তুলে মাড়িয়ে গেছে এরকম মনে হচ্ছিল। সবুজের চিহ্ন নেই কোথাও। লাল কালো লাভা পাথরের জমির ওপর একটা পাতলা শ্যাওলা রঙের আস্তরণ। আকাশের রং ধূসর রক্তিম। দু পাশে কালো পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের মাথা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মনে হচ্ছে অন্য এক উপগ্রহে এসেছি, গাছ পাতা ঘাস শূন্য এক রুক্ষতা। মাঝে মাঝে ব্লু লেগুনের জল চমকে দেখা দিয়ে যাচ্ছে। তার আগে চোখে পড়ল জিওথার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট, পাইপে ঘেরা বিশাল সাদা কারখানা। এখানে আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনটরা চাঁদে নামার অভ্যেস করতেন। Tomb Raider, জেমস বন্ডের Die Another Day থেকে কয়েকটি দৃশ্য এখানেই শ্যুটিং হয়।

ধোঁয়া, আগ্নেয় পলি আর জল— এই সব নিয়ে নীল জলের হ্রদ বাষ্পে দুধ সাদা দেখাচ্ছে। কখনও নীল সবুজ, জলের নীচে ওই রঙের শ্যাওলা, জলের তলায় থকথকে সিলিকা কাদার পলেস্তারা। নির্জন লাভা ভূমিতে গড়ে উঠেছে প্রকৃতির খেলায় ব্লু লেগুন। বাস থামল। এরকম চার-পাঁচটি বাস দাঁড়িয়ে আছে পার্কিংয়ের খোলা মাঠে। অনেকটা এগিয়ে চোখে পড়ল সাদা তোরণের মতো প্রবেশপথ, তার গায়ে লেখা Blaa lonio- ব্লু লেগুন। ভেতরে রাস্তার দুধারে জমাট বাঁধা লাভা পাথরের সারি। ভেতরে বিরাট কর্মকাণ্ড চলছে। এই থার্মাল স্টেশনের দেওয়ালগুলি তৈরি ষাট-সত্তর হাজার লাভার টুকরো দিয়ে। বড় কাচের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে হ্রদ। বাষ্প, বরফ, কাঠিন্য ও একই সঙ্গে সুখের ছবি দেখিয়ে রুক্ষ লাভা ঘেরা এই হ্রদ উষ্ণ জলের আহ্বান জানাল আমাদের।

আমরা অভ্যর্থনা কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম। একটা গন্ধক মেশানো জলজ গন্ধ চারদিকে। টিকিট কাটলাম। সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে জামাকাপড় পাল্টানোর জন্য। ভাড়া পাওয়া যায় সাঁতারের পোশাক, তোয়ালে, ড্রেসিং গাউন। মেয়েদের লকার রুম আলাদা। লাল রিবনে চাবি ঝুলছে। জামাকাপড় রেখে সাঁতারের পোশাকে চল চানের জায়গায়। হাতে বাঁধা লাল রিবনের চাবি। গরম জলে সকলের স্নান সারা হলে তবেই ছাড়পত্র মিলবে উষ্ণ জলে অবগাহনের। প্রায় কুড়ি জন মেয়ে শাওয়ারের নীচে। তারপর ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামা। চোখের সামনে পাঁচ হাজার স্কোয়্যার মিটার হ্রদ, ধূসর আকাশের গায়ে এলিয়ে

পড়ে আছে। ধোঁয়া উঠছে। তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি। দরজা খুলে বাইরে বেরোতেই মুহূর্তের মধ্যে শীত ঝাঁপাল আক্রোশে, ততক্ষণে দৌড়ে সকলে ঝাঁপ দিয়েছে গরম জলের আরামে। চিবুক ডুবিয়ে বসে সেই উষ্ণতা শরীরে মাখা মনে থাকবে। মাথার ওপর খোলা আকাশ। অল্প বৃষ্টির ছাঁট। লাভার কটাহে জল কোথাও টগবগ করে ফুটে আবর্ত তৈরি করছে। গন্ধক-মেশা গরম জল। দূরে লাভার দেওয়ালে মৌচাকের মতো গর্তে গনগন জ্বলছে আগুনের ফুলকি, ধোঁয়া ঢেকে দিচ্ছে একে অন্যকে। আমরা দুধরঙা জলে ডুবে ভাবছি বৃষ্টি আর শূন্য তাপমাত্রা সত্ত্বেও এই আরামের আবেশ ভাবাই যায় না। জল কোথাও কোথাও এত গরম যে পুড়ে যাচ্ছে চামড়া, আমরা নতজানুপ্রায় হয়ে এগিয়ে চলেছি জল কেটে নিজেদের তাপ সহার ক্ষমতা মেপে। সাদা ধোঁয়া ঢেকে দিচ্ছে একে অন্যকে। জল গভীর নয়। তাই সাঁতারের প্রশ্নই ওঠে না। তবু জাপানি কয়েকজন তরুণী চেষ্টা করে যাচ্ছে আর ঝপঝপ এ ওর ছবি তুলছে। লেগুনের মাঝেমাঝেই লাভার দেওয়ালের ওপর রাখা গরম সিলিকা কাদার বালতি। অনেকে তুলে গায়ে মুখে মেখে নিচ্ছে দামি ক্রিমের মতো। আমিও সাদা লাভা পমেটম মাখলাম বেশ করে ওদের মতোই আগ্রহে ও খুশিতে। এখানে স্নান করলে নানা চর্মরোগের উপশম হয়। তাই বিক্রি হয় এখানকার লাভা কর্দম, শ্যাওলা থেকে তৈরি কত রকমের ক্রিম, সিলিকা, লবণ, খনিজ জল থেকে তৈরি স্পা চিকিৎসার বিভিন্ন ওষধি, রূপচর্চার উপচার। এখানে এদেশের ও ডেনমার্ক থেকে চর্মরোগীরা চিকিৎসার জন্য আসে। ক্লিনিক এর ভেতরেই। চিকিৎসার খরচ বহন করে এসব দেশের সরকার।

জল একটু ঠান্ডা বোধ হলেই এগিয়ে চলেছি আরও গরমের দিকে। সাঁকোর ভেতর দিয়ে ঢুকলাম এক জলের গুহায়। প্রাকৃতিক বাষ্পস্নান, ভেতরে অনেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসা। অন্ধকার, গরম আর ঝাঁঝালো গন্ধকের গন্ধ। বেরিয়ে একটা জলধারার নীচে দাঁড়াতেই রুকস্যাক বয়ে কাঁধের ব্যথার জায়গায় গরম আরামস্রোত। ধুয়ে নিলাম ততক্ষণে চটচটে হয়ে ওঠা মুখের লাভা ক্রিম। বৃষ্টি বরফের কুচি হয়ে ঝরছে। সাদা কুর্চি ফুলের ঝরনা এড়াতে এ জলগুহা ও গুহায় মাথা বাঁচাচ্ছি কিন্তু এই উষ্ণ জলের আবেশ ছেড়ে উঠতে মন চাইছে না একেবারে। চারদিকে একটা গুমগুম আওয়াজ, আগুনের হলকা, লাল কালো আগ্নেয় পাথরে আছড়ে পড়ছে, হ্রদ, আগুন, বৃষ্টি বরফ একসঙ্গে। অন্ধকার হয়ে আসছে। এবার উঠতে হবে। যদিও উঠবার এতটুকু ইচ্ছে নেই কারোরই। সেই দুমিনিটের শীত কাটানো দৌড়, ওপরে গিয়ে শাওয়ার, বস্ত্রবদল। নীচে লবিতে এসে ওখানেই রেস্তোরাঁতে স্যামন স্যান্ডউইচ আর কফি খেলাম। বাইরে ব্লু লেগুনের জলে তখনও বসে আছে অনেকে। ধূসর লাল আকাশ ওখানেই কখন রং পাল্টাল! ঝকঝকে নীল আকাশ, দুয়েকটি তারার উঁকিঝুঁকি।

বাইরে বেরিয়ে এসেছে আমাদের ফরাসি দলটি। পার্কিংয়ের জায়গায় হেঁটে চলেছি। আগুনের গুমগুম আওয়াজ কানে বেজে চলেছে। নীল হ্রদের পাশ দিয়ে

অনেকটা এগিয়ে দেখি আমাদের বাসচালক দাঁড়িয়ে। সবাই ক্লান্ত কিন্তু তৃপ্ত। বাসে একটিও কথা বলছে না কেউ। অন্ধকার পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বাস চলেছে। রেইকাভিক পঞ্চাশ কিলোমিটার হবে। হঠাৎ পথের ধারে বাস থামল। গুডমুনডার আমাদের নামতে বললেন। ঘন অন্ধকার। একটা তারাও নেই। আকাশ পরিষ্কার। তার ওপর সবুজের ঝিলিক। গভীর নীল আকাশে সবুজের খেলা। এক সেকেন্ডে একটা সবুজ তীর আকাশের একটা পাশ বিঁধিয়ে আলো করে দিল। ফিসফিস করে কেউ বলে উঠল— অরোরা বোরিয়ালিস— ফিতের মতো ঘুরছে ফিরছে এই আলো, যেন এক অচেনা নাচের ছন্দ। আইসল্যান্ডে পা দিতে না দিতেই এই উত্তরের আলোর দেখা পাব ভাবতেই পারিনি। শৈশব থেকে শুনে এসেছি যার কথা, যা দেখবার কথা ভেবেছি এখানে আসার আগে, এত সহজে দেখা পাওয়া সৌভাগ্য ছাড়া কী বলব! আকাশের ওই দিকটি তারপর খণ্ড খণ্ড সবুজে ছড়িয়ে গিয়ে মিলিয়ে চলে গেল কোনখানে কে জানে! কেউ একটা কথা বলছে না। অপ্রত্যাশিত দর্শন আপ্লুত করে তুলেছে আমাদের। বাসচালক উঠে ইঞ্জিন চালু করতে আমরা ধীরে বাসে উঠলাম। গল্পের মতো শোনাচ্ছে, তবু সব ব্যাপারটা এরকমই ঘটেছিল।

রাতে ঘোরের মতো এসে হোটেলে যখন ঢুকছি, মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। জানলার পর্দা সরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি দুয়েকটি তারা। দূরে টিলার মাথায় সাদা একটা বাড়ি পদ্মফুলের মতো ফুটে আছে। হোটেল নেসজাকোলিতে প্রথম রাত কাটল।

ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ এই আইসল্যান্ড। তাপমাত্রা গড়ে ৩১ ডিগ্রি ফারেনহাইট জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে, ৫৮ জুলাই মাসে। আমরা তো ঠান্ডার সময় এসেছি। কাজেই শীতের ভয় করলে চলবে কেন! অরোরা বোরিয়ালিসের দেখা দুয়েকটিবার যদি পেয়ে যাই তা হলেই তো মনে মনে উষ্ণতা।

সকালে হোটেলেই জলখাবার। মাছের বিবিধ পদ সাজানো আরও অন্যান্য উষ্ণ প্রাতরাশের সঙ্গে। কফির স্বাদ চমৎকার। দুয়ারে প্রস্তুত ততক্ষণে আমাদের শহর ঘুরে দেখানোর মিনিবাস। দাইটল— সুপ্রভাত, হোল ফ্রিডাল— ঝকঝকে সকাল। তরুণী আলমা আমাদের গাইড অভ্যর্থনা জানাল। সত্যিই কী সুন্দর রোদের আভামাখা এই সকাল। ঠান্ডা খুব। দৌড়ে বাসে উঠে জানলার ধারে আসন নিলাম। শহর কেটে চলেছি।

গাড়ির ইঞ্জিনের মৃদু আওয়াজের সঙ্গে মিশে আলমার মিষ্টি গলায় দেশের ইতিহাস বলে চলা ভালো লাগছিল আমাদের। 'মেরু বৃত্তের প্রত্যন্তে কুড়ি মিলিয়ন বছর আগে উত্তর আটলান্টিক গড়ে দেয় এই আইসল্যান্ড। ক্যাটাক্লিজম গলিত আগুন, সাগরের নীচে আগ্নেয়গিরি থেকে উৎসারিত গরম লাভা দিয়ে তৈরি এই দ্বীপ সাগরের জলে ঘেরা। আর এই জলময় আলিঙ্গন দ্বীপটিকে অনেক বছর ধরে মানুষের চোখের আড়ালে রেখেছিল। তুষার যুগ এল, গেল, পুরু আস্তরণের বরফ

গ্লেসিয়ার আমার দেশের মুখচিত্র খোদাই করে দিল, ধারালো চূড়ার পাহাড় ছুরির প্রহরায় ঘিরে রাখল দ্বীপ, আগ্নেয়গিরির সারি উগরে দিচ্ছিল মাইল উঁচু ধোঁয়া, আগুন, গ্যাস ছাই। অন্য অনেক দেশে যখন সভ্যতার ঝকমকে মুখ আইসল্যান্ড আড়াল করে রাখল নিজেকে অনন্ত জলরাশি আর বরফহিম তুষার ধোঁয়ায়। পুবে আমেরিকা আর পশ্চিমে ইউরোপ এই দু-ভূমির দুদিকে পা রেখে দ্বীপটি দাঁড়িয়ে ভূতাত্ত্বিক আলোড়নে। দুটি ভাগ প্রতি বছর দু সেন্টিমিটার করে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে। আইসল্যান্ডের উত্তরে গ্রিনল্যান্ড আর দক্ষিণে অতলান্তিক মহাসাগর'।

তিনশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রথম তার কথা জানা গেল গ্রিক অভিযাত্রী নাবিক পিথিয়াস অব মাসালিয়ার বিবরণ থেকে। তিনি জলযাত্রায় এই দ্বীপটির দেখা পান আর নাম দেন উলতিমা থুলে— অর্থাৎ চেনা জগতের প্রত্যন্ত সীমানার দ্বীপ, যাকে ঘিরে আছে তুষারসমুদ্র। মধ্যযুগীয় কোনও প্রাচীন পুঁথিতে তা পড়ে অষ্টাদশ শতকে আইরিশ সন্তেরা এই নির্বাসিত দ্বীপে পশুর চামড়ায় তৈরি নৌকো ভাসিয়ে আসেন। কী কঠিন সেই যাত্রা। আমাদের সাগায় তার বর্ণনা আছে। এই অজানার দিকে এমন যাত্রা কোন বিশ্বাসের পথে! তারাই আইসল্যান্ডের প্রথম বাসিন্দা।

এরপর এল নরওয়ে থেকে ভাইকিংয়ের দল যারা সাধুদের হটিয়ে বসতি স্থাপন করল। কাহিনী আছে— এদের দলপতি ইঙ্গলফার আরনারসন দূর থেকে যখন দ্বীপটির দেখা পেলেন, দখল নেওয়ার জন্য পুরনো রীতিতে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেললেন তার মসনদের কয়েকটি পায়া। লক্ষ রাখলেন কোন পাড়ে দেবকুল তাদের ভাসিয়ে এনে ফেলবেন। সেখানেই তৈরি হবে তাঁর নতুন রাজ্য। চার বছর চলে গেল দেবতাদের বিধানের অপেক্ষায়। একদিন দেখেন আইসল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম তটে পড়ে আছে পায়াগুলো। কালো মেঘেরা ঘিরে আছে ধোঁয়ার মতো। নাম দিলেন এই নতুন জায়গার রেইকাভিক অর্থাৎ ধোঁয়াটে খাঁড়ি।'

আমরা যখন ক্রিশুভিকে এসেছিলাম, পরদিন দেখেছিলাম রাজধানীর কাছেই ইঙ্গলফারের ধোঁয়া— মাটির নিচ থেকে যেন কোনও দৈত্যের নাকের পাটা ফুলে উঠছে রাগে আর আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে ভূগর্ভ থেকে উৎসারিত উষ্ণ প্রস্রবণের গরম বাষ্প। নরওয়ে, ডেনমার্ক, ওলন্দাজদের প্রভুত্ব অনেক দিন ধরে আইসল্যান্ডে। স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৯১৮ সাল থেকে। ১৯৪৪ সাল থেকে দ্বীপটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করে স্বাধীন।

ততক্ষণে আমরা বন্দরে পৌঁছে গেছি। সেখানে নোঙর করা জেলেনৌকা আর মাছ ধরার বড় বড় জাহাজ দেখিয়ে আলমা বলল, 'আমরা সাগর থেকে কুড়িয়ে আনি সম্পদ; মৎস্যব্যবসা আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক রোজগারের তিন-চতুর্থাংশ। আমাদের নোবেল পুরস্কারে পুরস্কৃত কবি হালাডর লাক্সনেস লিখেছিলেন 'জীবনটা নোনা মাছ।' ১৯৩০ সালের সেই উক্তি এই শতকেও সত্যি। জীবন এখনও নোনা মাছ, তাছাড়া টিনের মাছ, ধোঁয়া স্যামন, বরফ জমা চিংড়ি এমনকী ক্যাভিয়ার সবই দেশের আর্থিক অবস্থাকে ঠিকঠাক রেখেছে।'

কাছেই অনেক ছোট ছোট রেস্তোরাঁ। একটি সাইনবোর্ডে দেখি বিশাল তিমি মাছ শিল্পীর তুলির টানে গা এলিয়ে আছে— নীচে লেখা 'আমি সুস্বাদু চেখে দেখ'। তা খাওয়া হয়নি। তিমি জাহাজ চড়ে গভীর সমুদ্রে তিমি মাছের জলক্রীড়া দেখতে যাওয়া— সময়াভাবে তাও হয়নি। ফিরবার পথে শহর দেখাবে। তাই আবার মিনিবাস। থামল আলথিং, জাতীয় পার্লামেন্টের কাছে। দেশে যখন প্রথম বসতি গড়ে উঠছে সেই হাজার বছর আগে তৈরি। পাশেই লুথেরান ক্যাথিড্রাল। তার পেছনে টাউন হল। ভেতরে মেঝেতে খোদাই করা আছে আইসল্যান্ডের বিশাল ম্যাপ। কী দুর্গম সব জায়গা, খাঁড়ি, উথাল সমুদ্র, গ্লেসিয়ার, লাভার পাহাড়, আগ্নেয়গিরি, বরফমাখা পাহাড়ের সারি চোখের সামনে মানচিত্রে। এরপর গেলাম হালগ্রিম চার্চ দেখতে। রেইকাভিকের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাথায় তৈরি। লিফট নিয়ে একেবারে উঁচুতে চলে যাওয়া যায়। দেখতে পাওয়া যায় আদিগন্ত বিছানো শহরের ছবি। তাছাড়া আছে নানা মিউজিয়াম। সময় হাতে থাকলে তবেই সম্ভব। কেনাকাটির প্রশ্নই ওঠে না, এত দাম। তবু দুয়েকটি দোকানপাড়া ঘুরেছি। পশমে বোনা সোয়েটার চোখে পড়ার মতো।

হোটেলের অভ্যর্থনাকারিণী ওলগা মেয়েটি হাসিখুশি। আমি অরোরা বোরিয়ালিস দেখার গল্প করেছিলাম। বলেছিল এই হোটেলের সামনে যে টিলা তার মাথায় উঠলেই ঝকঝকে আকাশ থাকলে আবার দেখতে পাব। রাত এগারোটায় হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে হোটেলের সামনে আগ্নেয় নুড়ি বিছানো গ্রামীণপথ ধরে টিলার মাথায় অনেকটা উঁচুতে উঠলাম সেই বিখ্যাত নর্দান লাইট দেখতে। ত্রয়োদশীর চাঁদ ঝলমল করছে। তারই আভা পড়েছে চারদিকে। একটা কুয়াশার মতো সাদা আবরণ। এখনই দেখা দিতে পারে সেই সবুজ গোলাপি তারার নাচ এই আশায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ফিরে এলাম। আকাশে চাঁদ থাকলে অরোরা বোরিয়ালিসের দেখা পাওয়া যাবে না— এ কথাটা ওলগা বলতে ভুলেছিল।

আজ সকালে শূন্য ডিগ্রির নীচে তাপমাত্রা। আমি শীত এড়ানোর ধড়াচূড়া পরে চললাম ওই হোটেলের সামনের রাস্তা পেরিয়ে টিলাপথ ধরে পদ্মের আকারে গড়া বাড়িটির দিকে। পেরলিন। গরম জলের ট্যাঙ্ক। এখান থেকেই সারা শহরের উষ্ণ জল সরবরাহ করা হয়। নীচে পাইপ চলে গেছে অলংকৃত পাথরের আবরণে ঢাকা। মাঠ কেটে উঠে গেছে সরু পিচের রাস্তা পথচারীদের জন্য। দূর থেকে একটা সুন্দর গ্রাফিক ডিজাইনের পদ্ম মনে হচ্ছে। স্থাপত্যশিল্পের সুষমা আর ইঞ্জিনিয়ারিং কলাকুশলতা একসঙ্গে মিলেছে এই দশতলা বাড়িতে। এখানে ছটি আধারে জল জমা থাকে ৮,৭৯,৮৭৫ গ্যালন। তাপমাত্রা ৮৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। চারতলা থেকে রেইকাভিকের পুরো চেহারা দেখা যায়। এখানেই নীচের তলায় এদের পুরনো ভাষার পুঁথিপত্র সাগার একটি অংশ রাখা আছে। ওপরে ঘুরে ঘুরে যায় চমৎকার রেস্তোরাঁ। ওখানেই আজ দুপুরের খাওয়াদাওয়া।

আজ আবার হু হু হাওয়া দিচ্ছে। উঠছি উঁচুতে। দুধারে ঝাউয়ের বন আর লাল লাভার পাথরের চাঁই। গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে চলেছি। ছোট ছোট পরিচ্ছন্ন কুটির। একটি মোটাসোটা সাদায় কালোয় খরগোশ এ বন থেকে ও বনে সতর্ক লাফ দিয়ে চলে গেল। প্রথম বরফ পড়েছে। স্কুলে শিক্ষক ধর্মঘট। ছেলেমেয়েরা বরফের ওপর দিয়ে স্কেটবোর্ডে দৌড় লাগিয়েছে। আর কলকোলাহল। সমুদ্রের নীল চোখে পড়ছে। তা পেরিয়ে খাঁড়ি আবার সাগরের নীল— একটা চিল এই ঠান্ডাতেও আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। জেলেনৌকারা স্থির দাঁড়িয়ে। মাছের পণ্যসম্ভার অনেক ভোরে এসে বিক্রিবাটা হয়ে গেছে। দুয়েকটি কাফেবারে ক্লান্ত ধীবররা দীর্ঘ গেলাসে টইটুম্বুর বিয়ার পান করছে। এক কাপ কফি পানের বাসনা ছিল। প্রমীলা একজনও নেই। তাই ফিরে চললাম পেরলিনের দিকে।

ওপরে কফিশপে ছোট ছোট স্যান্ডউইচ আর কফি কিনে যে টেবিলে বসলাম তার পাশেই নীল সাগরে ঢেউ লাফ দিয়ে আকাশ ছুঁয়ে দিতে চাইছে যেন। বেশ তারিয়ে তারিয়ে ভোজনপর্ব উপভোগ করলাম। এখানে জিনিসপত্রের দাম চড়া। তাই রেস্তোরাঁর দিকে এগোইনি। আস্তে আস্তে ঘুরে চলেছে পেরলিন বাইরের সমগ্র সৌন্দর্য যাতে উপভোগ করা যায়।

ওখান থেকে ফিরে হোটেলে আসতে দেখি বাস ছাড়ছে ব্লু লেগুনের দিকে। সাঁতারের পোশাক এক দৌড়ে হোটেল থেকে নিয়ে বাসে চেপে আবার সেই উষ্ণজলে অবগাহনের যাত্রা। নেশা ধরিয়ে দিয়েছে এই লাভা হ্রদ। সন্ধে অব্দি জলে কাটিয়ে ফিরলাম যখন তখন আকাশ তারায় ভরে গেছে।

পরদিন সফরসূচিতে ছিল গোল্ডেন সার্কেল ট্যুর। সোনার বেড় ঘুরে দেখা। আমাদের মিনিবাসে দশজন বিভিন্ন দেশের মানুষ। গাইড বয়স্ক, নাম এডভার্ড। আমরা রেইকাভিক ছেড়ে পূব দিকে চলেছি। পনেরো মিনিটের মধ্যে শহর উধাও। মিনিবাস উঠছে নামছে আগ্নেয় পাহাড়ি রাস্তা ধরে, চারদিকে ধু-ধু শূন্যতা। শুধু লাভা পাথর আর দূরের পাহাড়ের মাথায় বরফ এই দৃশ্য দেখতে দেখতে গড়িয়ে নামলাম ভেরাগারথি উপত্যকায়, একটা প্রাকৃতিক উষ্ণজল দিয়ে গ্রীষ্মদেশের গাছপালা সাজানো খামার বাড়িটির নাম এডেন। আসলে ট্যুরিস্টদের জন্যেই তৈরি। সামনে দোকানে কী না বিক্রি হচ্ছে! ভাইকিং হেলমেট, চড়া দামের সোয়েটার, জলপ্রপাত আঁকা চাবির রিং, ধীবরদের হাতের ক্রিম। ভাগ্যিস মাত্র কুড়ি মিনিট। বাস ছুটল কেরিথের দিকে।

কেরিথে একটা বিশাল আগ্নেয় খাত পঞ্চান্ন মিটার গভীর আর দুশো মিটার চওড়া। অনেক নীচে শ্যাওলা সবুজ হ্রদের জল দেখতে পাচ্ছি। দূর থেকে দাঁড়কাক ডেকে উঠল কয়েকবার। পুরো ক্রেটার চক্কর দিলাম। দেখা যাচ্ছে দূরে সাদা মেঘে ঢাকা বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি হেকলা। দ্বীপের সবথেকে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি, গত হাজার বছরে অনেকবার আগুন উগরে ধ্বংস করেছে মানুষ, বসতি। আমরা চলেছি বিখ্যাত গালফস জলপ্রপাতের দিকে। গাড়ির জানলা থেকে অনেক দূরে

দেখতে পাচ্ছি লাংজোকুল হিমবাহের গম্বুজের মতো সাদা মাথা, আইসল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্লেসিয়ার। প্রথমে বুঝতেই পারিনি কোথায় মেঘের শুরু আর কোথায় বা হিমবাহের শেষপ্রান্ত। মেঘ সরে যেতেই দেখি বরফের চাঁই কতটা পর্যন্ত ছড়িয়ে!

এডভার্ড শোনাল খুদে মানুষদের গল্প। এ দেশের মানুষের বিশ্বাসের কাহিনী। দুধারে পাহাড়ে মৌচাকের মতো খোপ। সবুজ শ্যাওলা ঢাকা পাথরের বিচিত্র আকার দেখিয়ে বলে উঠল— ওইখানে একটা ট্রল! বেঁটে ভূত! অশুভ আত্মার ডেরা নিশ্চয়। দেখ ওটাকে দানো মনে হচ্ছে না! প্রতিটা পাথরে সে দেখতে পায় অসুখী অতৃপ্ত মৃতদের মুখ। তার দৃঢ় বিশ্বাস এলফ— লুকানো মানুষেরা সবখানে। গল্প শোনাল কেন আইসল্যান্ডের অনেকে সেই পথগুলি এড়িয়ে যায় যেখানে আছে এলফদের ঢিবি অথবা বেঁটে পাথর। 'ভগবান তৈরি করেছিলেন শিশুদের আদম ইভের জন্য। এক শনিবার না বলেকয়ে চলে এলেন আদম ইভের ডেরায়। শনিবার আইসল্যান্ডে চান করার রাত। ইভ বেচারি কোনওরকমে বাচ্চাদের আধচানে ভেজালেন অতিথি আসার আগে। প্রায় নোংরা বাচ্চাদের তাঁর সামনে বার করার ভয়ে লুকিয়ে রাখলেন। যখন ঈশ্বর অন্য শিশুদের দেখে প্রশ্ন করলেন, সারিবাঁধা পরিচ্ছন্ন বাচ্চারা কি তোমার? ইভ বললেন, হ্যাঁ। মিথ্যে ধরা পড়ল তক্ষুনি। যেহেতু ইভ তাঁর শিশুদের লুকিয়ে রেখেছিলেন ভয়ে, তাই তারা সারা জীবন লুকিয়ে থাকবে মানুষের চোখের আড়ালে—অভিশাপ বর্ষাল। এই লুকানো মানুষেরা হল এলফ— আমাদের মতোই তারা, কিন্তু দেখা যায় না। ঈশ্বর তাদের গুহাবন্দী করে দিলেন। তার থেকেই জন্ম পাতালের জীবেরা— ম্যাগনাসুসেন, এড্ডালারে— মানুষ তাদের ভয় পায়'।

এখানকার গাইডরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের লেখা সাগা থেকে প্রায়ই গল্প বলে। আমার তো ভালোই লাগছিল।

বাস থামল রাস্তার পাশে। একটি জলপ্রপাত। দ্য লাকসি। আমরা পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নামলাম। বিশাল এক জলপ্রপাত আমাদের সামনে। বাতাসে গুঁড়ো জলের ভাপে চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। 'গালফসের মতো অতটা বিরাট কিছু নয়, সে জন্য ক্ষমা চাইছি।' আমাদের চমৎকৃত উৎসাহে জল ঢেলে দিল এডভার্ড। ভাবলাম না জানি গালফস কী অপার সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় আছে। বাসে আরও কুড়ি মিনিট চলার পর আমরা গালফস পার্কের প্রবেশমুখে এসে দাঁড়ালাম। তখনও চোখে দেখিনি। শুনতে পাচ্ছি বাজের গর্জনে গর্জিত এক প্রবল জলধারার আওয়াজ।

নীচে নামছি আর আকাশ ফাটা গর্জন কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। বাতাসে জলকণা ছিটকে চারদিক কুয়াশা মাখিয়ে দিচ্ছে। চূর্ণ জলকণা মনে হচ্ছে হীরের টুকরো বাতাসে ছড়াল। একেবারে খাতের কিনারে দাঁড়িয়েছি। চোখের সামনে গালফস স্বর্ণপ্রপাত। কী তার ভয়ংকর সৌন্দর্য! অনেক নীচে জল প্রবল ঘূর্ণিতে

ঘুরে চলেছে। প্রপাতের আরেকটু ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছি জলপ্রপাতের নীচের আধা রূপ। পঁচাত্তর মিটার ঝাঁপ দিয়েছে, যেখানে গিরিখাত বেঁকে গেছে ডানদিকে নব্বুই ডিগ্রি কোনায়। সে জায়গাটা পেরিয়ে জলধারা গর্জন করে লাফিয়ে পড়ছে আরও পঁচাত্তর মিটার নীচে। জল ছিটকে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাদের। কেউ এক পাও নড়ছি না। মুগ্ধ দাঁড়িয়ে থাকা। কেউ কারও কথা শুনতে পারছি না প্রপাতের গর্জনে।

পরে গাইড বলল, 'জেনে রেখ, এই ঘূর্ণিত উথল দামাল আমার দেশের জন্য প্রত্যেকের মনে আছে অফুরন্ত ভালোবাসা। এ দেশের কবি জোনাস হ্যালগ্রিমসন একশো ষাট বছর আগে লিখেছিলেন প্রপাত নয় আইসল্যান্ডের পবিত্র বেদী এই গালফস।' ১৯০৭ সালে এক ইংরেজ কিনতে চায় গালফস হাইড্রোইলেক্ট্রিক বাঁধ তৈরির জন্য। অনেক মালিকের মধ্যে একজনের গ্রামীণ কন্যা পঞ্চাশ বছর ধরে লড়েন এই প্রস্তাবের বিপক্ষে। জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জনের জন্য অব্দি প্রস্তুত ছিলেন। আইনের বিচারে হেরে যান। জিতে নেন দেশের মানুষের হৃদয়-মন। ১৯৭৯ সালে সরকার এই প্রপাতকে দেশের উত্তরাধিকার সম্পদ বলে ঘোষণা করে।

এবার দুপুরের খাওয়া প্রপাতের কাছে উঁচু টিলার মাথায় রেস্তোরাঁয়। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। জলপ্রপাত দেখতে দেখতে খেলাম সুস্বাদু রোস্ট করা ভেড়ার মাংস আর ছোট ছোট কাঠে পোড়ানো আলু, ঘরে বানানো রুটি। কফির স্বাদ চমৎকার। বাসে উঠে ঘুম পেতে লাগল। চলেছি উষ্ণ জলের স্ফূর্ত ছড়িয়ে যাওয়া দেখতে। গিজার। স্ট্রকুর গিজার উঁচুতে ফুৎকারে জল ছুঁড়ে দিচ্ছে দেখতে পেলাম বেশ দূর থেকে। মনে হল বজ্রদেবতা খুলে দিল বাষ্প চুল্লি, যার থেকে উৎসারিত জলধারা লাফিয়ে উঠে মিশে গেল কোথায় কে জানে। বাস থেকে নেমে লাভা জমি দিয়ে এগিয়ে চলেছি, গিজার আমাদের অপেক্ষা না করেই গরম জলে বুড়বুড়ি তুলে থামের মতো জলধারায় কুড়ি মিটার উঁচুতে উঠে ছড়িয়ে গেল। ক্যামেরায় কখনও তাদের ধরা যায়, কখনও পলক ফেলতে না ফেলতে মাটির নীচের গরম জল হঠাৎ জেগে উঠে বিস্মিত করে দেয়। এরকম এক ডজন গিজারের খেলা দেখেছি গরম লাভাপাথরের কিনারায় দাঁড়িয়ে। আগুন আর বরফ একই সঙ্গে পাশাপাশি বাস করছে— আইসল্যান্ডের এটাই বৈশিষ্ট্য। অনতিদূরে বাড়িঘর তৈরি করে বাস করছে মানুষ। যে কোনও মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাতে ভেঙে যেতে পারে বাড়িঘর গ্রাম। প্যারিসে ফিরে আসার পর খবরে জানি ঠিক ওইখানেই ভূমিকম্পে জায়গাটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

থিংভেলির চলেছি। অনেকটা রাস্তা। এডভার্ড বলে চলেছে— আমরা একটা ঐতিহাসিক স্থান দেখতে চলেছি। সে কথায় পরে আসব। প্রথমেই বলব আটলান্টিক রিজের কথা। এখন তোমাদের বলব প্লেট টেকটনিকের ব্যাখ্যা। আটলান্টিক সাগর এরকম দুটি বিশাল টেকটনিক প্লেট দিয়ে বিভক্ত। ইউরেশিয়ান

প্লেট আর উত্তর আমেরিকান প্লেট। দুটি একত্র হয় আটলান্টিক রিজের কাছে, জলের নিচ দিয়ে হাজার মাইল অব্দি বয়ে যায়, একমাত্র আইসল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মাটির ওপরে উঠে আসে। একটা দিকে শ্যামল শস্যভূমি, নিস্তরঙ্গ হ্রদ, অন্য দিকে রুক্ষ লাভা জমি আইসল্যান্ডের মানুষদের হাতে। ভূতাত্ত্বিক গুরুত্ব ছাড়া থিংভেলিরের একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এখানেই ভাইকিংরা গড়ে নেয় পৃথিবীর প্রথম পার্লামেন্ট। বছরে আটচল্লিশ জন দলনেতা আসতেন এখানে। প্রত্যেকের দুটি করে উপদেষ্টা থাকত। প্রতি জুনে তারা আসত আইনকানুন নিয়ে আলোচনা করতে। একজন আইনবিদ মুখস্থ বলে যেতেন তৈরি হওয়া যত আইনকানুন। ৯৩০ শতক থেকে ১২৭১ সাল পর্যন্ত এই সভা বসত। প্রথমে নরওয়ে পরে ডেনমার্কের কাছে পরাজিত হওয়ার পর তার গুরুত্ব কমে আসে।

আমরা দুধারে লাভা দেওয়ালের মাঝখানে উপত্যকায় এসে দাঁড়ালাম। এই সেই আইন পাথর যার ওপর দাঁড়িয়ে আইনবিদ ধারা মুখস্থ বলতেন। এখানে শব্দ উচ্চারণ উচ্চকিত হয়ে সকলের শ্রবণ সম্ভব হত। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি নীচে উপত্যকার ছবি। লাভার দেওয়াল, পাথর সব মিলিয়ে জর্ডনের পেট্রার প্রবেশ দ্বারের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

ফিরে চলেছি রাজধানীর দিকে। বাস থেকে নেমে রেইকাভিকের Tjorn হ্রদের ধারে এলাম। এর নিচ দিয়ে উষ্ণস্রোত বয়ে যায়, তাই পাখিদের ভিড়। আলস্যে জলে বসে ভাসা ওদের। কখনও চকিতে উড়ে যাওয়া জল ছুঁয়ে। এখন রাত নটা। সূর্য ঝলমল করছে। কয়েকটি রাজহাঁস পাড়ের দিকে এগিয়ে এল হেলতে দুলতে। শংখচিলেরা জলের ওপর উড়ে নানা কসরত দেখাচ্ছে। কখনও ব্যালেরিনার ছন্দে নেচে চলা। অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশ জোড়া রামধনু জল ছুঁয়ে আলো করে দিল রঙেরঙে চারদিক। জলে বরফের সাদা খণ্ড ভাসছে, পাখিদের আনন্দ খেলা, আকাশের নীলে রঙের আতসবাজি আইসল্যান্ড ভালো লাগার ছবিটা সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

ভিতরকণিকার ভিতরমহলে

সূর্য ঘোষ

ধৌলি এক্সপ্রেস ছাড়ে ভোরবেলা, ৬টা ১৫ মিনিটে, হাওড়া স্টেশন থেকে। ৭টা ৫০ মিনিটে ছাড়ছে ফলকনামা এক্সপ্রেস। কমবেশি চারঘণ্টায় বালেশ্বর ছাড়িয়ে ভদ্রক। ভদ্রকে নেমে ধরতে হবে চাঁদবালি যাওয়ার বাস বা ট্রেকার। অহরহ ট্রেকার যাচ্ছে। ট্রেকার সম্পর্কে একটাই কথা বলার, ফ্রন্টসিট যার সৌভাগ্য তার। দুই ঘণ্টার যাত্রা। ট্রেকার ছুটবে যে রাস্তা চিরে, তার দুপাশে ওড়িশার রুখা-সুখা খেত। কখনও বা দুপাশেই কেয়াঝোপ, পানের বরজ। সাপের আখড়া এইসব পানের বরজ, কেয়াঝোপ।

চাঁদবালি এক সুপ্রাচীন বন্দরনগরী। ভিতরকণিকা ছিল এক স্বাধীন রাজ্য। দূরদেশ থেকে জলপথে বাণিজ্যসংযোগ রক্ষা করত চাঁদবালি। ভিতরকণিকার প্রবেশতোরণ এই চাঁদবালি। এখান থেকেই সংগ্রহ করতে হয় পাওয়ার বোট। তারপর শুরু হবে দীর্ঘ জলযাত্রা। তার আগে চাঁদবালি ফরেস্ট অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে এন্ট্রি পারমিট। ড্যাংমল, একাকুলা বা হাবালিখাটির বনবাংলোয় থাকার জন্য অগ্রিম বুকিং নিতে হবে এই ঠিকানা থেকে: ডি এফ ও, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ডিভিশন, রাজনগর, পিন-৭৫৪ ২২৫।

চাঁদবালি পৌঁছেই মন ভালো হয়ে যাবে। সামনেই নদী, যে-সে নদী নয়, বৈতরণী নদী। এই নদীপথেই সুন্দরবনের মতো গভীর ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, ভিতরকণিকার ভিতরমহলে যাত্রা শুরু। চরিত্রে-চেহারায়, পাখিতে-কুমিরে, গোসাপে-হরিণে একদম সুন্দরবন। শুধু নেই বনরাজ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। পাওয়ার বোট ভাড়া নিতে হবে চাঁদবালি থেকে। দেখে নেবেন, যন্ত্রচালিত বোটে যেন অবশ্যই সাইলেন্সার লাগানো থাকে। এমনিতেই পাওয়ার বোটে একটা ভুটভুট আওয়াজ হবেই। কিন্তু সাইলেন্সার লাগানো না থাকলে সে আওয়াজ হবে এত বেশি যে, আপনার কানের এবং পাখি সহ যাবতীয় বন্যপ্রাণ-দর্শনের দফারফা। বোটভাড়া দিনপ্রতি ৭০০-৮০০ টাকা। দল বড় হলে এই চার্জটাই হয়ে যাবে ১,০০০-১,২০০ টাকা। ড্যাংমলে যদি বা কিছু খাবার মেলে, হাবালিখাটিতে একদম নয়। ফলে কলকাতা থেকে নিয়ে যেতে হবে, বিস্কুট- কাজু- চকোলেট- চানাচুর- চা- কফি- মিল্কমেড। আর ভদ্রক বা চাঁদবালি থেকে কিনবেন মিনারেল

ওয়াটার-চাল-ডাল-তেল-ডিম-মশলা-মুরগি। বনে যাচ্ছেন, সিট্রনেলা অয়েল বা ওডোমস জাতীয় মশা-নিরোধকও প্রয়োজন।

চাঁদের আলোয় কুহক-নদী

ডিসেম্বরের এক শীতার্ত বিকেলে, খাদ্যে-পানীয়ে সশস্ত্র হয়ে, আমরা উঠলাম পাওয়ার বোটে। বৈতরণীর জল কেটে চলেছি, সূর্যের রং হয়ে এসেছে হাঁসের ডিমের কুসুমের মতো লাল। দিকচক্রবালের সেই লাল আগুনের প্রতিফলন নদীজলে। প্রদোষকাল প্রায় উপস্থিত, আমরাও পৌঁছে গেছি ফরেস্ট চেকপোস্টে। সেখানে এন্ট্রি পারমিট দেখালাম, তবুও চৌকিদার ঢুকতে দেবে না। 'সন্ধে হয়ে গেছে, অন্ধকারের মধ্যে নৌকো যাবে কী করে, ওসব হবে না। চাঁদবালি ফিরে যান, কাল আসবেন।' এই বনে বাঘ নেই, কুমির অন্ধকারে নৌকোয় উঠে টেনে নিয়ে যায় বলে জানা নেই, মাঝিমাল্লা যেতে প্রস্তুত, তবু যেতে দেবে না কেন? 'না না, ও হবে না। 'খোলা' পড়বে সামনে। সেখানে বোট ফেঁসে যাবে। আর বোট ফেঁসে গেলেই কুমিরের পেটে। হবে না।' আমরা তখনও জানি না বিপদটা কী, কীভাবে তা ঘটতে পারে। বললাম, 'আমরা লিখে দিচ্ছি, তুমি বারণ করেছ, আমরাই জোর করে ঢুকছি। দায়িত্ব আমাদের।' ভাঙা ওড়িয়ায় চৌকিদার যা বলল তার মানে এই: 'সুইসাইড নোট লিখতে চাইছেন। লিখে দিন।' সেসব লিখে-টিখে আবার যখন জল কাটা শুরু, তখন চাঁদ উঠেছে। কিছুক্ষণ পরে এল সেই অদ্ভুত জলাঞ্চল, খোলা। এখানে জলের মধ্যে বিপজ্জনকভাবে মাথা তুলে আছে অসংখ্য মরা গাছের গুঁড়ি। কোনওটা এক-মানুষ, কোনওটা দু-মানুষ সমান উঁচু। সেইসব মরা গাছেদের ফাঁক দিয়ে সন্ধের অন্ধকারে নৌকো চালানো খুবই দুঃসাধ্য। সেই কাজটাই করে চলেছে দুই মাঝি, ব্রজ ও বাগাল। ঘাম ছুটে যাচ্ছে ওদের, নৌকো ঘোরাতে হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। একবার একটা গাছের কানায় ঠকাস করে লেগেই গেল নৌকোর পিছন। চাঁদনি আলোয়, দুপাশে ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়ে ছুটে চলা কুমিরসঙ্কুল এক অপ্রশস্ত খাঁড়ির মধ্যে, পত্রহীন একগুচ্ছ মরা গাছের মধ্য দিয়ে জলচলা, যেখানে যখন-তখন বোট ফাঁসতে পারে, শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথের সেই দুঃসাহসিক মাছ-চুরি অভিযানের চেয়ে কম কীসে? বিপজ্জনক 'খোলা' শেষ হল। নিরাপদ জল থেকে চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাওয়া চরাচর, নদী আর পিছনের 'খোলা'-র মরা গাছের কলোনি দেখতে দেখতে কেমন যেন মনে হচ্ছিল এসব সত্যি না কি মায়া?

এতক্ষণে আলো দেখা গেল। নিয়নশোভিত ড্যাংমল। জেটিতে নেমেই দেখি বনদপ্তরের সবুজ বোর্ডে সাবধানবাণী— 'খবরদার জলে হাত দেবেন না। চান করার প্রশ্নই ওঠে না। মাছ ধরাও নিষিদ্ধ। এসচুয়ারাইন ক্রোকোডাইল কিলবিল করছে নদীর জলে।' নীল নিয়নে আলোকিত জেটি থেকে নেমে এক নারকেলবীথি পেরিয়ে ড্যাংমল ফরেস্ট বাংলো। পিছনে আরেকটা দীর্ঘ নারকেলবীথি পেরিয়ে

ফরেস্ট রেস্টহাউসের অ্যানেক্স বিল্ডিং।

দীর্ঘযাত্রার ক্লান্তি ঝেড়ে একটু ফ্রেশ হয়ে সবে কফির কাপ নিয়ে বসেছি বারান্দায়, ইশারায় ডাকলেন এক ফরেস্ট অফিসার। তার হাতে একটা জোরালো স্পটলাইট। বাংলোর চৌহদ্দির ডানদিকের পাঁচিলের ওপারে ফেললেন সেই শক্তিশালী আলো, দৃশ্য দেখে অবাক! দু-দশটা নয়, চল্লিশ-পঞ্চাশটা নয়, শয়ে শয়ে হরিণ! যেন চিতল হরিণদের পিকনিক! 'এইখানেই আছে সল্ট লিক। হরিণের দল নুন চাটতে এসেছে।' ফিসফিসিয়ে বললেন অফিসার। স্তব্ধ হয়ে দেখছি সেই দৃশ্য। বেশিরভাগই নির্লিপ্ত, নুন চাটতে ব্যস্ত। দুয়েকটা কচিকাঁচার চোখে লেগেছে আলোর ধাঁধা। তারা আলোর পানে তাকিয়ে। আসলে ভিতরকণিকার হরিণ প্রায় তপোবনের মতোই নির্ভয়। বাঘ নেই, চিতা নেই, পোচার নেই। খাতক বলতে কুমির, সে তো নদীর নোনা জলে। সেখানে জল খেতেও যায় না এরা। তাহলে আর ভয়টা কাকে! আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকি হরিণ, হরিণ— হরিণঅরণ্য!

জলপাই কচ্ছপের দেশে

পরদিন সকালে উঠে প্রাতরাশ সেরে অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ের কাছে দেখে এলাম এনক্লেভ। সেখানে আছে দুষ্প্রাপ্য এক জীব, সাদা কুমির। আসলে ওটা অ্যালবিনো। মনিটর লিজার্ড আছে, বড়সড় গোসাপ। অন্যান্য এসচুয়ারাইন ক্রোকোডাইল তো আছেই। এনক্লেভ দেখে জেটি থেকে ফের পাওয়ার-বোটে। ড্যাংমলে এক রাত্রিবাস যথেষ্ট নয়, কিন্তু কী বা করার! এবার শুরু হল ব্রাহ্মণী নদী ধরে যাত্রা। শীতের মিঠেকড়া রোদ্দুরে গা ডুবিয়ে এই জলযাত্রা আমি সারাজীবনে ভুলব না। দুপাশে ঘন সবুজ ম্যানগ্রোভ অরণ্য, দুপাশে ঠিক সুন্দরবনের মতোই থকথকে কাদা। হঠাৎ দেখি কুমির! শুয়ে আছে রোদ মেখে, কাদা মেখে। বোটের আওয়াজের তরঙ্গ অনুভব করতেই সড়াৎ করে জলে। দু-দাঁড় এগিয়েছি, আবার কুমির! সে বাবাজিও জলে ঝাঁপ। এরপর দেখলাম এক অতিকায় কুমির। মেঘের মতো তার গায়ের রং। মাঝিমাল্লা জানাল, নাম তার কালিয়া। শহর, শহরের মানুষ আর আওয়াজের উৎস পাওয়ার বোটের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে সেই কালাপাহাড় লাফিয়ে পড়ল জলে। কালিয়াকে জ্যান্ত মুরগি দেন ট্যুরিস্টরা, ব্রজরা জানাল। সেসময় বেশ টেনশন, ওইটুকু তো এক নৌকো! কালিয়ার এক ল্যাজের ঝাপটেই উল্টে যেতে পারে। একযাত্রায় এত কুমির আমি জীবনে দেখিনি। পঁচিশ-ত্রিশ পর্যন্ত গুনেছিলাম। তারপর আর গুনিনি। পরে জেনেছি, এই অভয়ারণ্যে আছে ৩০০-র বেশি কুমির!

পাখি দেখেছি বটে এই যাত্রায়। শামুকখোল অর্থাৎ ওপেন-বিলড স্টর্ক প্রথমে একটা, তারপর একজোড়া, তারপর শয়ে শয়ে! একটা জায়গায় তো আকাশ কালো করে ফেলল শামুকখোল পাখির দল। ওদের কলোনি এটা, জেনেছি পরে। জায়গাটার নাম বার্ড আইল্যান্ড। বার্ড-ওয়াচার বা ওরনিথোলজিস্টরা তো বটেই,

ট্যুরিস্টরাও নামে এখানে, পাখি দেখতে! আমাদের সময় ছিল না। জোয়ার-ভাটার সময় মেপে আমরা চলেছি। যাব একাকুলা। সেখানে নদী সাগরে মিশেছে। ফলে জল অগভীর। জোয়ারের সময় না হলে একাকুলায় পৌঁছতেই পারব না। কাজেই সময় নেই। ভাটা পড়ে গেলে সব মাটি। রহস্যময়, প্রত্যন্ত এক ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে নদীপথে এগিয়ে চলেছি। শব্দ নেই, কোলাহল নেই, দূষণ নেই! অপার শান্তি বিরাজ করছে। শুধু কুমির আর পাখি, পাখি আর কুমির! ক্যাটল ইগ্রেট (গাইবকলা) ছেড়েই দিলাম, মিডিয়াম ইগ্রেট, লার্জ ইগ্রেটও দেখছি বেশ কিছু। দুয়েকটা গ্রে হেরন চোখে পড়ছে কখনও সখনও। একটা জায়গায় দেখি তিনটে পেন্টেড স্টর্ক। গোলাপি রং বাহারে পাখি, খুবই দুষ্প্রাপ্য। চিত্রবিচিত্র পাখি! হাড়গিলেও (অ্যাডজুটাস্ট স্টর্ক) চোখে পড়েছে কিছু। এইসব দেখতে দেখতে মোহনা! ওঃ, সে কী দৃশ্য। বিশাল নীল ক্যানভাসে বঙ্গোপসাগর, ব্রাহ্মণী মিশছে তাতে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ব্ল্যাক হেডেড সী-গাল। একটা, দুটো, তিনটে...। দূরে দেখা যাচ্ছে গহিরমাতা বিচের রক্তাভ রেখা। আরেক প্রান্তে ঝাউবনে ঘেরা একাকুলা বিচ। এ দৃশ্য কাগজে-কলমে আসে না। গহিরমাতা বিচের আন্তর্জাতিক খ্যাতি। কারণ এখানেই হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে ‘নেস্টিং’ করতে আসে অলিভ রিডলে টার্টলের দল। হাজার হাজার সমুদ্রকচ্ছপের সেই আসা-যাওয়ার দৃশ্য নাকি অনন্য! সমগ্র সমুদ্রে তখন শুধু জলপাই রঙের ঢেউ! ওরা আসে, সংসার পাতে, ডিম পাড়ে, ডিমে তা দেয়, ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বড় করে ফের চলে যায় নিজের দেশে, সাগরে জলপাই রঙের ঢেউ তুলে! এই বিরল প্রজাতির সমুদ্রকচ্ছপ চোরাশিকারিদের ফাঁদেও পড়ে প্রায়শই। এখন অবশ্য ফরেস্ট ব্যাটেলিয়ন গড়ে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে।

জোয়ারের জল ঠেলে একাকুলায় ভিড়ল তরী। কূলে একা, তাই নাম একাকুলা। বিশাল এক ঝাউবন পরম অপত্য স্নেহে ঘিরে রেখেছে সমুদ্রসৈকত। এখানে রোদ্দুরের রং প্রকৃত হলুদ, বঙ্গোপসাগরের জল স্ফটিক নীল। এত চমৎকার প্রশস্ত বিচ খুব বেশি দেখিনি! প্রকৃত অর্থে এক নির্জন সৈকত। উপকূল ধরে ধরে হাবালিখাটি। সেখানে সমুদ্রতীরে বনবাংলো। রাতে শনশন হাওয়া। অরণ্য-নদী, সব সাগরে এসে শেষ। টিমটিমে লণ্ঠনের আলোয় অমৃতের মতো লাগল চৌকিদারের রান্না গরমাগরম খিচুড়ি আর ডিমভাজা।

সাগর থেকে ফেরা

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়েছি একাকুলা থেকে বোট নিয়ে। যে পথে এসেছি, সে পথে নয়। চলেছি অন্য পথে। কালিভঞ্জন অভয়ারণ্য দুপাশে, চলেছি ধামরা নদী চিরে। সোজা গিয়ে পড়ব চাঁদবালি। দেখছি জোয়ারের জল তীর ভাসিয়েছে, জেগে রয়েছে নক্রের নাক! দেখছি সি-গাল। নানারকম পাখি। দেখছি পার্সে মাছ উড়ছে চলে। উড়ছে মানে পার্সের ঝাঁক সাঁতরে, উড়ে জল ধরে চলেছে। খুবই সামান্য

উড়ান, বলা যায় লাফ। কী উজ্জ্বল, চকচকে মোহরের মতো তাদের রুপোলি আঁশ।

দুপাশে সবুজ ঘন জঙ্গল। এ ভিতরকণিকা নয়, কালিভঞ্জন ফরেস্ট। সুন্দরী-গরান-হেঁতাল-হোগলার ঘন সন্নিবেশ। খোলা-নদী-বন-কুমির-পাখি-সাগর দেখে মন ভরিয়ে ফিরে চলেছি চাঁদবালি। মাঝে একটা ছোট্ট গ্রাম। নাম তার তালচুয়া। সেখানে নেমে উদ্বৃত্ত চাল-ডাল-ডিম রান্না করল ব্রজরা। সার সার নৌকো বাঁধা এখানে। ভুটভুটি লঞ্চ যাচ্ছে পারাদ্বীপ। অসম্ভব নীল জল, প্রশস্ত ধামরা নদী। কাদায় ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করছে কয়েকটা স্নাইপ, স্যান্ডপাইপার। পৃথিবী যেন এক নিঝুমগড়ে থমকে থেমে আছে।

খেয়েদেয়ে ফের যাত্রা শুরু। ভিতরকণিকার ভিতরমহল প্রায় শেষ। অপূর্ব এক উপহার এই শেষবেলায়। একটি রংচঙে পাখি, বৃক্ষশীর্ষে। বোট থামিয়ে তাকে দেখি, ওই একবারই দেখেছি ওই পাখি। মাথা কালো, গা-টা লাল! ব্ল্যাকক্যাপড কিংফিশার। কালো টুপি নয়, আমি ওর নাম দিয়েছি কালোমুকুট মাছরাঙা!

'ভ্রমণ' জানুয়ারি, ২০০৩

আমাজনের গাছবাড়ি

রতনলাল ব্রহ্মচারী

২০০০ সালের শারদীয় ভ্রমণ থেকে জানতে পারলাম একদা প্রায় অগম্য আমাজন অরণ্যে বিরাট কাঠের সেতু আর টাওয়ার তৈরি করে পর্যটক আনছেন আরিয়াউ আমাজন টাওয়ার্স। এর স্রষ্টা ডঃ রিত্তা বার্নার্দিনো। তিনি ছিলেন ব্রাজিল সেনাবাহিনীতে। ব্রাজিলের প্রকৃতি তাঁকে মুগ্ধ করে। এই অপার প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরাই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। ব্যবসাও বটে।

যথাসময়ে সাও পাওলো-তে নামলাম। কিন্তু ভাষা সমস্যা। ব্রাজিলের ভাষা পর্তুগিজ, অনেকে স্প্যানিস জানেন, শুধুমাত্র বড় বড় জায়গায় ইংরিজি চলে। ব্যাগেজ অর্থাৎ একটি রুকস্যাক সংগ্রহ করে দুজন কর্মচারীকে পর্তুগিজ ভাষায় বললাম, 'পর্তুগিজ বলতে পারি না, কেউ ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান বা ইটালিয়ান জানেন?' একজন উত্তর দিলেন, স্প্যানিস জানি। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে কয়েকটি স্প্যানিস গল্প-কবিতা পড়েছি, তবে কোনওদিন কথা বলিনি। আসার কয়েকদিন আগে স্প্যানিস আর পর্তুগিজের প্রাইমারদুটি নতুন করে পড়েছি, সঙ্গে এনেওছি। তখন স্প্যানিসে দু-চার কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, মানাউস যাব, কোথায় যেতে হবে এখন? অতি ভদ্র যুবকটি আমার সঙ্গে অনেকদূর এসে কাউন্টার দেখিয়ে দিল, এমনকী আমার রুকস্যাকটি বয়ে দিতে চেয়েছিল। বন্ধুভরা বসুন্ধরার আরেকটি রূপ দেখলাম। দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের পর ডারউইন লিখেছিলেন, পর্যটকের পরিচয় ঘটে অনেকের সঙ্গে, যাঁদের আগে কখনও দেখেননি তিনি, পরেও আর দেখবেন না, কিন্তু এই সব পথের বন্ধু নিঃস্বার্থভাবে অনেক কিছু করেন তাঁর জন্য। কাউন্টারের কর্মচারিণী ভালোই ইংরিজি বলেন।

মানাউসের ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করছি নির্দিষ্ট স্থানে, হঠাৎ শুনি পর্তুগিজ ভাষায় ঘোষণা, মানাউস ফ্লাইটের গেট নম্বর বদলে গেছে। কোথায় এই নম্বরের গেট! কাছাকাছি একটি অফিসে গিয়ে প্রশ্ন করলাম। এক মহিলা কর্মচারী পালিশ করা কাঠের ওপর যেন স্কেট করে, অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে একটি টেলিফোনের কাছে চলে গেলেন। হ্যাঁ, নম্বর বদলেছে, এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে যেতে হবে। অনেক পরে ইংরিজিতেও ঘোষণা হয়েছিল।

মানাউসের ছোট্ট সুন্দর এয়ারপোর্টে নামলাম যথাসময়ে। প্লেনে বেশ কিছুক্ষণ ব্রাজিলের প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী নিয়ে ফিল্ম দেখানো হয়েছিল। আরিয়াউ টাওয়ার হোটেলের প্রতিনিধিকে খুঁজে বের করলাম, কিন্তু একটু বেগ পেতে হয়েছিল। এই বিমানবন্দরে কোনও ট্যাক্সি নেই বা আমার চোখে পড়েনি। ফেরার সময়ও নয়। স্থানীয় যাঁরা আসেন, তাঁদের নিজের গাড়ি আছে। অধিকাংশই ট্যুরিস্ট। তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে নানা ট্যুর অপারেটারের গাড়ি। আরিয়াউ টাওয়ার্সের গাড়ি আমাকে নিয়ে গেল বোটঘাটে। আরিয়াউ টাওয়ার্সের নিজস্ব লঞ্চে উঠলাম। একটা বড় জাপানি দল ও আরও কেউ কেউ আসবেন, তাঁদের জন্য ওই ভদ্রলোক আবার চলে গেলেন। দুয়েকজন মাঝি-মাল্লা আর আমি রইলাম লঞ্চে।

নিরক্ষীয় অঞ্চল। উজ্জ্বল সূর্য দিগন্তের দিকে একটু হেলেছে, গরম একটু কম। সুন্দর বাতাস বইছে। লঞ্চের আপার ডেকে আমি একা। রিও-নিগ্রো বা কালো নদীর জলে ভাসছি। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। আমাজনের ১,১০০ শাখা নদী আছে, তার মধ্যে একটি হল এই রিও নিগ্রো বা কৃষ্ণা। এর দৈর্ঘ্য বোধহয় গঙ্গার চেয়েও বেশি। আর চওড়া দেখছি, মানাউস শহরের সামনেই চার-পাঁচ মাইল হবে হয়তো। আমাজন পৃথিবীর প্রশস্ততম নদী, সাগর মোহনায় এর ব্যাপ্তি দুশো মাইল। কয়েকদিন পরে, আমাজন, কৃষ্ণা আর রিও সোলিমোয়েসের (অর্থাৎ সলোমন রিভার) সঙ্গমস্থল দেখতে গিয়েছিলাম। তখন ওটি ছিল ১৮ কিলোমিটার চওড়া। কৃষ্ণা আর সোলিমোয়েসের জলের রঙে পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যায়।

কৃষ্ণার রং কেন কালচে? ঘাটের কাছে অগভীর জল বেশ কালো, লক্ষ করে দেখলাম। অনেক বিজ্ঞানীরা বলেন, কোটি কোটি গাছের পাতা পচে, তার থেকে ট্যানিন ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ মিশে এরকম রং হয়েছে। সন্ধ্যার আগে নামলাম আরিয়াউ জেটিতে। বিরাট এই লজ ও সেতুর সর্বত্রই পায়ের তলায় শুধু কাঠ। নেই মাটি, নেই ইট-পাথর বা সিমেন্ট।

ব্রাজিলের ভূ-প্রকৃতি প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। প্যান্টানাল আর ইগাপো। প্যান্টানাল জলাভূমি, তার মধ্যেই আছে ডাঙা। আর ইগাপো হল বনাঞ্চল, যা প্রতি বছর কয়েক মাস জলমগ্ন থাকে। আমি এসেছি ইগাপোতে। অফিস, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি টাওয়ারগুলি থেকে সেতু দিয়ে নানা দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। সেতুর দৈর্ঘ্য মাইল পাঁচেক। সেতুর ওপরেই একাধিক স্থানে রয়েছে টয়লেট, বসার জায়গা, চেয়ার টেবিল, এমনকী স্নানের টাব। কোনও কোনও স্থানে রয়েছে দোতলা, তেতলা সেতু। আধ মাইল, এক মাইলের মধ্যে হয়তো আর কোনও লোকই নেই। মনে হয় আমি যেন রেন ফরেস্টে এক নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী। স্বর্গের রং মাখানো বড় বড় ম্যাকাও পাখি নারকীয় চিৎকার করে উড়ে যাচ্ছে। দেখলাম টারজান হাউস— সত্যিকারের গাছবাড়ি বা গাছপ্রাসাদ। সেতুর মাঝখান দিয়েই উঠে গেছে বিরাট এক স্ট্র্যাংগলার ফিগ। এই মহামহীরুহ বট বা অশ্বত্থের মতোই আশ্রয়দাতা বিশাল তরুটিকে লৌহমুষ্টিতে যেন পেষণ করে। টারজান হাউস যখন

ঝাঁট দেওয়া হয় শুধু তখনই আমরা ব্যালকনিতে বসে দেখতে পারি। ঘর-বারান্দার মধ্য দিয়েই প্রকাণ্ড সব ডাল চলে গেছে। তার তলাতে চেয়ার-টেবিলে বসে চা খেতে পারেন শুধু সেই ট্যুরিস্ট যিনি ঘরভাড়া নিয়েছেন। বিলাসবহুল ঘরের ভেতরে গিয়ে দেখতে পারিনি। সেতুর প্রায় সর্বত্রই আলোর ব্যবস্থা, তাই রাতের অরণ্যের রূপ পর্যবেক্ষণ করা যায় না।

আমাজনের উদ্ভিদ-বৈচিত্র সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। স্মিথসনিয়ান ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা আমাজনের জঙ্গলে একর প্রতি ২৮০ প্রজাতির বৃক্ষ— বিরুৎ, লতা ছোট গাছ বাদ দিয়ে— গণনা করেছেন। আমাদের বক্সা অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করে দেখি আমাজনের বৃক্ষ-বৈচিত্র বক্সার চেয়ে অন্তত ৫৬৮ গুণ বেশি। আমাজনের পরেই বোর্নিও— একর প্রতি ২৪০ প্রজাতির বৃক্ষ।

ডঃ বার্নার্দিনো ও আলোকচিত্রশিল্পী প্রিনসিপের লেখা 'আমাজন ইমোশনস' বইটির ইংরিজি সংস্করণ গাছবাড়ির অফিস থেকে কিনে নিয়েছি। অসাধারণ রঙিন চিত্রের ছড়াছড়ি, অনেক খবরও আছে।

২ আগস্ট। ইউরোপীয় আর ব্রাজিলীয় ঘরানার মিশ্র ব্রেকফাস্ট খেলাম পেট ভরে। পাকা কলা ভাজা প্রতিদিনই থাকে মেনুতে। অনেকটা খেয়ে দেখেছি, পেটের গোলমাল হয় না। লাঞ্চ-ডিনারও দুই ঘরানার মিশেল। স্যুপ, রুটি, ভাত, আলু, দুরকমের মিষ্টি আলুসিদ্ধ, মাছ, মাংস, কলা, পেঁপে, আভোকোডো ইত্যাদি খাদ্য বিপুল পরিমাণে সাজানো।

আজ সকালে গাছবাড়ি অর্থাৎ আরিয়াউ টাওয়ার্স ঘুরে দেখলাম। দুপুরের পর গাইড ম্যাক্সের সঙ্গে আউটবোর্ড মোটরযুক্ত নৌকোয় বিহার। আমাদের দলে আমেরিকান, ব্রাজিলীয় শ্বেতাঙ্গ, জার্মান ও জাপানি পর্যটকরা থাকতেন— একেক দিন একেক দলের সঙ্গে পরিচয়। নৌকোগুলি লম্বা ক্যানোর মতো। মোটর বন্ধ করে দিয়ে দাঁড় টানা যায়। খোলা নৌকোয় রোদ যেন ঝলসে দিচ্ছে। যাত্রা শুরু হতেই সুন্দর, ঠান্ডা বাতাস শরীর জুড়িয়ে দিল। দেখলাম একটি অপরূপ দৃশ্য— কৃষ্ণার বুকে ছোট ছোট ঢেউগুলি সূর্যকিরণে ঝকঝক করছে। যেন হিরের কুচি থেকে জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে।

যাইহোক, জলমগ্ন ইগাপো অরণ্যে পৌঁছে ইঞ্জিন বন্ধ করে দাঁড় টেনে চলল মাঝিরা। ছায়াঘেরা বনপথ অর্থাৎ সরু গলির মতো জলপথ। আমরা অনেকে ছোট ছোট মাংসের টুকরো বড়শিতে গেঁথে ছিপ ধরে বসে রইলাম। যদি ধরা যায় পিরানিয়া মাছ। এ মাছ কুখ্যাত। গল্পে, হলিউড ফিল্মে, অনেকে পড়েছেন বা দেখেছেন, ঝাঁকে ঝাঁকে এই রাক্ষুসে মাছ কোনও প্রাণী বা মানুষকে আক্রমণ করে। দু-চার মিনিটে শুধু কঙ্কাল পড়ে থাকে। এসব অতিরঞ্জিত কাহিনী। তবে এ মাছ ধরতে গিয়ে অনেকে হাতের বা পায়ের আঙুল খুইয়েছেন। সাঁতার কাটার সময় কেউ কেউ হারিয়েছেন দেহের দু-চার টুকরো মাংস। ২৪ প্রজাতির পিরানিয়া আছে, আমি চারটি মাছ দেখেছি (তিন প্রজাতির)। সবই ক্ষুদ্রকার, কিন্তু আছে

ছোট, ধারালো দাঁত। যেন মিনি হাঙর বা বারাকুদা। আমাদের কেউই পিরানিয়া ধরতে পারলেন না। তখন আবার বড় নদীতে ফিরে গিয়ে, কিছুদূরে আরেকটি ইগাপোতে চলে এলাম। বেলা পড়ে এসেছে। হঠাৎ শুনি দূরাগত গর্জন, বাড়ছে, কমছে আবার যেন দিগন্ত মথিত করে আকাশ ভরিয়ে দিচ্ছে। হাউলার মাঙ্কি। বিড়ালের আকারবিশিষ্ট এই বাঁদরের গর্জন প্রায় সিংহের মতো। রোজ সকালে, বিকেলে গর্জন করে এরা জানান দেয় তাদের উপস্থিতি— জানালেন গাইড। শেষে একজনের বড়শিতে উঠল অতি ছোট এক পিরানিয়া। গাইড ম্যাক্স সন্তর্পণে মাছের দাঁত দেখিয়ে ওকে জলে ছেড়ে দিলেন। তারপর আবার বড় নদী দিয়ে ফেরা। নদী নয়, যেন কৃষ্ণসাগর। আকাশে একটি মেঘের কিনারে আশ্চর্য সুন্দর সাদা-সোনালি দীপ্তি। দুটি রিভার ডলফিন বা শুশুক দেখলাম। ম্যাকাও, প্যারট, বক ও পানকৌড়ি পাখিরা উড়ে গেল। নিগোবা বা মাগুবা গাছ থেকে শিমুল তুলোর মতো 'প্যারাসুট বীজ' বাতাসে ভেসে আসছে, তারপর লক্ষ লক্ষ ছোট সাদা পালতোলা নৌকোর মতো জলস্রোতে এগিয়ে যাচ্ছে।

৩ আগস্ট। ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া ছিল। রাত থাকতেই উঠে পড়লাম। ভোরের আলো ফোটার আগেই রওনা হতে হবে। সকাল ৫টা ৩০ মিনিটে ঘুটঘুটে অন্ধকার। পূর্ব বা মধ্য আফ্রিকার মতোই এটাও নিরক্ষীয় অঞ্চল, দিন রাত প্রায় সমান, গোধূলি ও প্রত্যূষের স্থায়িত্ব বড়ই কম। জুরিখের একটি দলের সঙ্গে নৌকোযাত্রা। ধীরে ধীরে কালো আকাশ ধূসর হয়ে এল, তারপর আলোর ঝরনাধারায় উদয়সূর্যের অপরূপ রূপ। মিনিটে মিনিটে আকাশ আর মেঘের রং বদলাচ্ছে। প্রায় নিস্তরঙ্গ কৃষ্ণসাগরের বুকে গলিত সোনা আর রক্তরাগের আভা। পুপ-পুপ-কুক-কুক— কোন বিহঙ্গের সুরেলা কণ্ঠ আকাশ ভরিয়ে দিল। এ হল টুকান, ব্রাজিলের জাতীয় পাখি। অনেকটা ভারত বা আফ্রিকার হর্নবিল বা ধনেশের মতো, তবে আরও বর্ণময়। ধনেশের ডাক কর্কশ, কিন্তু টুকানের স্বর মিষ্টি।

তারপরই হাউলারের সিংহ-গর্জন। তারপর আবার এক ঝাঁক ছোট হাঁসের শিস। এর নাম লেক ডাক। এইসব ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের সঙ্গে উপভোগ করা গেল উদয়ভানুর রূপ।

আবার ইগাপোর জল-বনপথে। ছায়া ঘেরা নিস্তব্ধ পরিবেশে দীর্ঘ বনস্পতিগুলি যেন ক্যাথিড্রালের মতো।

আজ ব্রেকফাস্টে কতকটা পেঁপের মতো একরকম ফল দেখলাম। এর নাম মোমো।

দুপুরে, বিকেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাঠের সেতুতে ঘোরাফেরা করলাম। দুদিকে যেন এক প্রাকৃতিক বটানিক্যাল গার্ডেন। টারজান হাউসের কাছে অনেক সময় কাটালাম।

চিৎকার করতে করতে একজোড়া ম্যাকাও এসে বসল খুব কাছেই একটি গাছের ডালে। একটির লেজ অপরিণত। এরা নীল-হলদে ম্যাকাও (Ara azule e

amarela)। অন্য প্রজাতিটি হল লাল আরা (Ara vermelho)। আসলে এরা লাল-নীল-কমলা। আমাদের থাকার ব্লকটির নামও আরা। নামটি সার্থক, আশপাশে আরা উড়ে যায় প্রায়ই। স্থানীয় গল্প আছে, একজোড়া আরার একটি মারা গেলে অন্যটি মনের দুঃখে অনেক উঁচুতে উড়ে গিয়ে পাখা বন্ধ করে মাটিতে আছড়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

নীল-হলদে আরার ছবি তুলছি, তখন একটি স্পাইডার মাঙ্কি দু-তিন ফুট দূর থেকে আমাকে সঙ্গ দিল। এখানে বেশ কয়েকটি বাঁদর আছে যারা ট্যুরিস্ট ও কর্মচারীদের কাছ থেকে খাদ্য পায়, মানুষের সাহচর্য পছন্দ করে। এরপর তিন চারটি লাল আরা কান ফাটানো চিৎকার করে আরও দূরে একটি গাছে এসে বসল।

৪ আগস্ট। আজ দুটি বড় সবুজ প্যারট দেখলাম। ডানা মেললে দেখা যায় পিঠের দিক উজ্জ্বল লাল। একটি স্কুইরেল মাঙ্কি আমার ক্যামেরা, বাইনোকুলার দেখে আকৃষ্ট হল, বাইনোকুলারের লেন্সের উল্টোদিকে চোখ লাগাল। বিড়ালছানার আকারের এই কাঠবিড়ালি বাঁদর বেশ কয়েকটি আছে এখানে। এই বাঁদরটি তার একটি হাত দিয়ে আমার একটি আঙুল যেন জড়িয়ে ধরল, কামড়াবার চেষ্টাও যেন করল।

আজ দেখলাম একটি সরু গাছের ডাল সেতুর ওপর এসে পড়েছে আর তাতে কিছু অ্যাফিড; এই পতঙ্গ 'পিঁপড়ের গরু' নামেও পরিচিত। কোনও কোনও পিঁপড়ে কোনও কোনও অ্যাফিডের দেওয়া মিষ্টি রস পান করে, এদের রক্ষাও করে। অ্যাফিড গাছ থেকে জলীয় রস সংগ্রহ করে। এখানে পিঁপড়ে নেই কিন্তু এক ধরনের অতি ছোট মৌমাছি উড়ে এসে অ্যাফিডের গায়ে বসে বেশ কিছুক্ষণ ধরে যেন রস সংগ্রহ করছে। ঘটনাটি আমার কাছে নতুন। দুদিন পর অ্যাফিড ও মৌমাছি অদৃশ্য হয়ে গেল।

এখানে ব্রিজ না বলে ক্যাটওয়াক বলা হয় সেতুকে। ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটি সবুজ প্যারট দেখলাম সেতুর পাশেই, শুধু ঠোঁটটি দেখা যাচ্ছিল, দেহটি গাছের পাতায় একেবারেই মিলে গেছে। এরপর পাখিটি নামল সেতু বা ক্যাটওয়াকের ওপর। তারপর আরেকটি। মাত্র দু-এক ফুট দূরত্ব থেকে দেখলাম এদের চোখ জুড়ানো রূপ। আমার পায়ের ৬ ইঞ্চি মতো দূরে চলে এল একবার। কাঠের ওপর পড়েছিল একটি মাগুবা ফলের খোসার দুটি খণ্ড। ওপরটা কাঠের মতোই শক্ত, ভেতরের দিক থেকে খুঁটে খুঁটে খেতে লাগল এই প্যারট দুটি। অনেকে এদের আমাজন প্যারট বলেন, আমার গাইডের মতে এরা মিলি প্যারট। আমাজন প্যারট আরও ছোট আকারের, বড় বড় দলে ঘোরাফেরা করে আরও উঁচুতে। টারজান হাউসের কাছাকাছি সেতুর দোতলা বা তেতলা থেকে তাদের অনেক দেখেছি।

বিকেলে একটি ক্যাটওয়াকের অপেক্ষাকৃত চওড়া অংশে অনেকক্ষণ কাটালাম।

এখানে আছে একটি টেবিল, দুটি আর্মচেয়ার, একটি বেঞ্চ, আর স্নানের জন্য বড় বাথটাব। সকালের স্পাইডার মাঙ্কিটি এসে বসল আমার পাশের আর্মচেয়ারে। বাথটাব থেকে জল খেয়ে বাঁদরটি উঠল টেবিলে। সেখানে বসে তার একটি হাত রাখল আমার হাতের ওপর। তারপর টেবিলের ওপর একটু ঘুমিয়ে নিল। একটি মিলি প্যারট নেমে এসে জল খেল ওই টাব থেকে। তারপর আরও দুটি। কাছেই ছিল লিটার বিন, ঢাকনা ছাড়া। এই বিনে ফেলে দেওয়া ধাতব ক্যানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনটি মিলি প্যারট। একটি পাখি তার ভীষণ শক্ত ঠোঁট দিয়ে একটা লোহার আংটা ক্যান থেকে ভেঙে নিল। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যানটি নীচে পড়ে গেল, জলে, ঠোঁট থেকে আংটাটিও। পরে গাইডকে বলেছিলাম অফিসে জানিয়ে বিনে ঢাকনা লাগিয়ে দিতে। ওই আংটা খেয়ে ফেললে পাখিটির মৃত্যুও হতে পারে।

রাত আটটার পরে আবার নৌকোভ্রমণ। কুমির দেখার জন্য। আফ্রিকা আর ভারতের কুমিরের থেকে আমেরিকার অ্যালিগেটর, কাইমান ইত্যাদি আলাদা। প্যান্টানালে শত শত কুমির আছে, কিন্তু এখানে খুবই কম। নৌকো থেকে স্পটলাইট ফেলে কুমিরের লালচে চোখ দেখা যায়। ছোট আকারের কাইমান অল্প জলে থাকলে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক হাঁটুজলে লাফিয়ে পড়ে কায়দা করে প্রাণীটিকে ধরে ফেলে। ঠিক মতো ধরতে পারলে কাইমান স্থির হয়ে থাকে। আফ্রিকা বা ভারতের কুমিরের বেলায় এধরনের চেষ্টা অসম্ভব।

আজ কোনও কুমির দেখলাম না, কিন্তু অন্ধকারে রেন ফরেস্টে সেই নৌকোভ্রমণ একটি দারুণ অভিজ্ঞতা।

৫ আগস্ট। আজ বড় নদী ও তার শাখা দিয়ে অনেক দূর গিয়ে নামলাম এক জঙ্গলে। এটা ইগাপো নয়, কখনওই জলমগ্ন হয় না। এখানে দুয়েকটি জাগুয়ার বা তাপির হয়তো আছে, দেখা দুঃসাধ্য। এরকম দুটি জঙ্গলে অনেক ট্রিপ নিয়েছি, বিচিত্র উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য। গাইড ম্যাক্স দেখালেন আকারিকুয়ারা কাঠ। আমাদের গাছবাড়ির খুঁটিগুলি এই কাঠ দিয়ে তৈরি। আমাজনের চারশো প্রজাতির উইপোকা এ কাঠ আক্রমণ করে না। দেখলাম বালাটা গাছ। চুইং গাম তৈরি হত বালাটার আঠা থেকে, পরে অবশ্য অন্য উপায় বের হয়েছে। আঠা প্রায় তরল, একটু মিষ্টি। খেয়ে দেখলাম।

ব্রো গাছটির বাকল হাত দিয়ে ঘষলাম। হাতে সুন্দর একটা ধূপের গন্ধ লেগে থাকল। এছাড়া তাতে একটা হলুদের গন্ধও ছিল। এই গন্ধ আমাদের কাছে খুব পরিচিত কিন্তু গাইড ম্যাক্স বা স্থানীয় লোকেরা স্বাভাবিক ভাবেই এর বর্ণনা করতে পারেন না। পরে আরেকদিন ম্যাক্স ব্রোর আঠা একটি কাঠির ডগায় লাগিয়ে মাটিতে পুঁতে দিলেন, সিগারেট লাইটারের সাহায্যে আঠায় আগুন ধরালেন। এই কাঠি তখন মোমবাতির কাজ করল। সুগন্ধী মোমবাতি।

এই অরণ্যে ১০ শতাংশ গাছ তাল বা পাম জাতীয়, ৬ থেকে ৭ শতাংশ সায়না

লতা। গল্পে টারজান লায়না বেয়ে ওঠানামা করতেন। ম্যাক্স একটি পাম দেখালেন, পাতা অনেকটা নারকোলের মতো। ছুরি দিয়ে ছোট ডাল কেটে একটি হাতপাখা তৈরি করলেন চটপট। এ গাছের ডাল দিয়ে একটি ছোট আচ্ছাদন সৃষ্টি করা যায় মাথার ওপর। পাতার ঠাসবুনোনি শিশির বা অল্প বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

আজ একটি ট্যারান্টুলা মাকড়সা দেখেছি, ডিমের থলি পাহারা দিচ্ছে একটি গর্তে। আর একটি অদ্ভুত দর্শন মাকড়সা হল এক্রোমিটাগ। আজ তাও দেখলাম। দেড়-দুশো বছর আগে বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ বেটস্ এর ছবি এঁকেছেন। ১৯৭৩ সাল নাগাদ ছাপা লাইফ সিরিজের 'আমাজন' বইটিতে এই ছবি আছে। বার্নার্দিনোর বইতে রয়েছে রঙিন ফটোগ্রাফ।

৬ আগস্ট। আজ আবার কৃষ্ণার বুকে সূর্যোদয়। এদিন হাউলার মাঙ্কি বা টুকান পাখি ছিল না, ছিল এক ধরনের নাইটজার। এ পাখির কণ্ঠস্বর আমাদের নাইটজারের ঠুক ঠুক শব্দের চেয়ে অনেক মিষ্টি। ভারতে নাইটজারের হিন্দি নাম ঠুকঠুকিয়া, দুটি পাথরে ঠোকাঠুকির মতো শব্দ অনেকটা।

৭ আগস্ট। আজ আবার জাঙ্গল ট্রেক। যে পাম গাছটি দেখেছিলাম দুদিন আগে, যার থেকে হাতপাখা আর আচ্ছাদন তৈরি করেছিলেন ম্যাক্স, তার ফল আজকে কুড়িয়ে পাওয়া গেল। এই বাবামু ফল আর ইনাজে ফল মানুষের খাদ্য হতে পারে। ভাগ্যক্রমে এদের বড় বড় গুচ্ছ মাটিতে পড়ে থাকে। ছুরি বা ম্যাচেট দিয়ে কেটে গাইড দেখালেন বাবামু ফলের শক্ত কাঠের মতো খোলাতে রয়েছে অল্প পরিমাণ শাঁস। খেয়ে দেখলাম স্বাদ নারকোলের মতো। আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল ফায়ার ভাইন বা ওয়াটার ভাইন। এর থেকে সুপেয় জল পাওয়া যায়। এ ধরনের লতার কথা শুনেছি ভারতেও। গির অরণ্যে প্রচুর চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি।

৮ আগস্ট। আজ সানরাইজ ক্রুজের সময় তিনবার দেখলাম লাল রিভার ডলফিন (boto vermelho)। শুধু এখানেই আছে এই প্রজাতি। অনাদিকাল থেকেই এদেশে প্রচলিত গল্প, রাতের বেলা নদীর ধারে নাচগানের জলসা বসালে মানুষের রূপ ধরে বোতো অংশগ্রহণ করে। সুন্দর চেহারার কোনও অচেনা যুবক যদি খুব ভালো নাচে, তবে বুঝতে হবে এ আসলে বোতো। অনেক সময় যুবতীরা ছদ্মবেশী ডলফিন দেখে মুগ্ধ হয়, প্রেমে পড়ে। মাত্র কয়েক বছর আগেও জঙ্গলের ধারে বার্থ রেজিস্ট্রেশন অফিসে কোনও কোনও যুবতী মা সন্তানের জন্ম নথিভুক্ত করার সময় বলেছেন, 'সন্তানের পিতা বোতো।'

৯ আগস্ট। আজ আরেকটি জঙ্গলে গেলাম। যাওয়ার পথে বিরাট নদীর বুকে দেখলাম অনেক সি-গাল। এই সামুদ্রিক পাখি বড় নদী বা লেকেও দেখা যায় অনেক সময়। একাধিক প্রজাতির মাছরাঙাও ছিল।

এই জঙ্গলে বোটঘাটের কাছেই দুয়েক ঘর জনবসতি আছে। তাদের চেহারা অনেকটা ভারতীয় বা এশীয়দের মতো।

আজ ম্যাক্স দেখালেন চিম্বো গাছ। এর তীব্রগন্ধী ডাল থেকে পোকামাকড় তাড়িয়ে দেওয়ার বা মেরে ফেলার ওষুধ হয়। চিংগু আদিবাসীরা মাছ মারার জন্যও এ গাছ ব্যবহার করতেন। ওইসব মাছের রক্ত তাঁরা বের করে দিতেন, খাওয়ার আগে। তারপর ঘন জঙ্গলে অতি সরু পায়ে চলা পথ ধরে এগিয়ে যেতে ম্যাক্সের চোখে পড়ল বিঙ্গে গাছ। এর থেকেও ইনসেক্টিসাইড তৈরি হয়। আবার পেলাম ব্রো। সিট্রোনেলা তেলের মতো গন্ধ, সেটা মিলিয়ে যাওয়ার পর পরিষ্কার হলুদের গন্ধ।

ম্লান আলোতে দেখলাম নানা লতানে উদ্ভিদ বনস্পতির কাণ্ড বেয়ে বেয়ে উঠে গেছে, অতি সুন্দর নকশা যেন এঁকে দিয়েছে কেউ।

আজ দেখলাম বিরাট পিঁপড়ে টুকাণ্ডেরা। এর চেয়ে লম্বা পিঁপড়ে দেখেছি জাইরে-তে, কিন্তু টুকাণ্ডেরার পায়ের বিস্তার অনেকটা বেশি। লম্বায় এটি ইঞ্চিখানেক। এছাড়া এখানে রয়েছে বিখ্যাত প্যারাসোল অ্যান্ট বা ছাতা-পিঁপড়ে। এরা পাতার অংশ কেটে উঁচু করে ধরে নিয়ে যায়, যেন ছত্রধারী পিঁপড়ে। তাই ওই নাম। প্যারাসোল মানে রোদ আটকানোর ছাতা। এই পিঁপড়েরা ছত্রাক-চাষী। ওই পাতার টুকরোগুলি বিশেষ ধরনের ছত্রাক চাষের জন্য ব্যবহার করে পিঁপড়েরা। প্রকৃতিতে এই পিঁপড়ে আগে দেখিনি। এখানে ওরা পাতার টুকরো ছাড়াও নিয়ে যাচ্ছে এক ধরনের লম্বাটে ফুলের কুঁড়ি। এগুলিই বেশি।

জঙ্গলে ফুল ফুটে থাকা তরুপ্রজাতি খুব কমই দেখেছি। এই দেশীয় কলমীলতার ফুল আছে, আর ইপে নামের বড় গাছে হলদে ফুলের স্তবক চোখে পড়ার মতো। ইপে ফলের তেল ব্যবহার করা হয় কর্ণপ্রদাহে। 'এই হল কোপাইবা। ক্ষত নিরাময়ের জন্য এ গাছের কদর। লন্ডনের বিখ্যাত বডি শপ কোম্পানি তাঁদের ওষুধে এই কোপাইবা ব্যবহার করেন', বললেন ম্যাক্স।

১১ আগস্ট। গতকাল আমাজন, সোলিমোয়েস আর নিগ্রোর ত্রিবেণী সঙ্গম দেখে এসেছি। আজ একটি জলার ধারে কুইনিনের আদি উৎস, সিংকোনা গাছ দেখালেন ম্যাক্স। বাকলের টুকরো চিবিয়ে খেলাম, বেশ তেতো স্বাদ, অবশ্য কুইনিনের ধারে কাছে নয়।

এখানে জলার ধারে, নদীর ধারে বা ইগাপোতে কোনও জোঁক নেই। অথচ আমাদের কাছাকাছি উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে জোঁকের কী তীব্র উৎপাত। তবে এখানে বাচ্চা কুমিরের গায়ে জোঁক লেগে থাকে।

আরিয়াউ গাছবাড়ির কাছে ইগাপোতে মশা নেই বললেই চলে। এখানকার জল মশার লার্ভার পক্ষে ক্ষতিকর, আর নানা মাছও রয়েছে মশক শিশুর বংশ ধ্বংস করতে। ইগাপোর বাইরে ২ নম্বর জঙ্গলে (যেখানে ছত্রধারী পিঁপড়ের বাস) মশা আছে।

আজ একটি তাল জাতীয় গাছের কাণ্ডে শত শত ৬ ইঞ্চি লম্বা কাঁটা লক্ষ করলাম। আমাদের দেশে পাম জাতীয় কাঁটাগাছ শুধু খেজুর, শুষ্ক অঞ্চলে

সাধারণত কাঁটা গাছের প্রাচুর্য কিন্তু জলের রাজ্য ইগাপো বা কাছাকাছি অরণ্যে বেশ কিছু বড় বড় কাঁটাযুক্ত পাম প্রজাতি রয়েছে।

জঙ্গলে এই ক'দিন বেশ কয়েক প্রজাতির সাপুপাইমা বৃক্ষ দেখেছি। যেসব বৃক্ষে কাণ্ডের তলার দিকে, মূলের ওপরের অংশ অনেকটা প্রাচীরের মতো, এদেশে তাদের সাধারণ নাম হল সাপুপাইমা। স্থানীয় লোকেরা এই বৃক্ষ-প্রাচীরে আঘাত করে ঢাকের মতো শব্দ করে। এটা একটা সংকেত, টেলিগ্রাফিক ভাষায় লোকেরা সংবাদ আদানপ্রদান করে। বহুদূর থেকে শোনা যায় সাপুপাইমা ঢাকের বাজনা।

আজ ম্যাক্স বললেন, এই হল হেলিকনিয়া। এই উদ্ভিদের পাতার আকার ছোট কলাপাতার মতো। আজ একটা হেলিকনিয়া প্রজাতি দেখলাম, এর পাতা আমাদের দেশের কলাপাতার মতো, অতটাই বিরাট আকৃতি। 'আমরা হেলিকনিয়া পাতা দিয়ে মাছ বা মাংস জড়িয়ে আগুনের তলায়, অর্থাৎ মাটির অল্প তলায় রাখি। এভাবে রান্না করা মাছের স্বাদ অপূর্ব, আমি খেয়ে দেখেছি'— ম্যাক্স জানালেন।

এই দেখুন পুডাক্কো। পু মানের বৃক্ষ, আক্কো মানে ধনু। স্থানীয় ভাষায়। এই গাছ থেকে তীরধনুক তৈরি হত আগেকার দিনে। সম্প্রতি মানাউসে INPA ল্যাবরেটরিতে এর থেকে ক্যান্সারের ওষুধ পাওয়া গেছে, অবশ্যই গবেষণা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে।

আজ রাত আটটায় কাইমান (কুমির) দেখতে চলেছি। নৌকোয় ওঠার আগে দেখি, ঘাটের ওপর আলোর চারদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে বিরাট সব চামচিকে। আমাদের দেশের কলা-বাদুড়ের মতো বড়। ব্রাজিলে কিন্তু কোনও বাদুড় নেই।

আজ কুমির ধরা মানুষটি একটি খুব ছোট আকারের কাইমান ধরতে পারলেন। টর্চ ও স্পটলাইটের আলোয় হাতে ধরা অবস্থায় দেখলাম প্রাণীটিকে। 'এখানে তিন প্রজাতির কাইমান আছে। একটা ১৫ ফুট লম্বা হতে পারে, আরেকটি ৯ ফুট, আর তৃতীয়টি ৫ থেকে ৬ ফুট। এই কাইমানটি দ্বিতীয় প্রজাতির'— ম্যাক্সের ধারাভাষ্য। এই কাইমানের জিভ নেই। ভারতীয় কুমিরের জিভ আছে কিন্তু তলাটা আটকানো, সাপ বা গোসাপের মতো জিভ বাইরে বের করতে পারে না।

এরপর এই প্রজাতির আরেকটি কাইমান ধরা হল। এর গায়ে জোঁক সেঁটে আছে। দুটি কাইমানকেই জলে ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলাম আমরা।

১৩ আগস্ট। আজ মেঘলা আকাশের তলায়, ইগাপোর বন-জলপথগুলির আরেক রূপ। দ্বিতীয় জঙ্গলে আজকের ট্রেক। বেশি সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলাম ছত্রধারী পিঁপড়েদের। টুকাণ্ডেরার দেখা পাওয়া গেল।

স্থানীয় লোকেরা ছোট ছেলেমেয়েদের গায়ে টুকাণ্ডেরা ছেড়ে দেয়। পিঁপড়ের কামড়ে খুবই যন্ত্রণা হয় বাচ্চাদের। তারপর একরকম পাতা ঘষে দেয় গায়ে। জ্বালা কমে যায়। এরপর ছেলেমেয়েরা নানা পোকামাকড়ের কামড়ে আর কাবু হয় না। ম্যাক্সের কাছে শুনলাম এভাবে একজন ইটালিয়ান নিজেকে 'ইমিউনাইজড' করেছিলেন।

এরই মধ্যে গাছবাড়ির এক কর্মচারিণী দেখালেন তাঁর পোষা ট্যারান্টুলা। একটিকে তিনি আস্তে করে তুলে নিলেন, তারপর বাহুতে ছেড়ে দিলেন। তখন আমিও তাই করলাম। সে সময় মানাউস থেকে এক ট্যুরিস্ট এসেছিলেন। এসব দেখে তিনি স্তম্ভিত!

আজ বিকেলে ক্যাটওয়াক থেকে অনেক ম্যাকাও দেখলাম। একবার নটি স্কুইরেল মাঙ্কি লাইন করে চলে গেল।

১৪ আগস্ট। আজ মেঘলা আকাশে কৃষ্ণার বুকে সূর্যোদয়। আরেকরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আজ টিনামু পাখির ডাক শুনলাম। কতকটা টুকানের মতো। জলপিপির মতো জ্যাকানা বা জাসানা পাখি, অদ্ভুত ধরনের মাছরাঙা ইত্যাদি চোখে পড়ল।

পরে সেতু থেকে নানা উদ্ভিদ প্রজাতি পর্যবেক্ষণ করলাম। বুনো আনারস জাতীয় ৯০০ প্রজাতির ব্রোমেলিয়াড উদ্ভিদ আছে, অনেকগুলিই ব্রাজিলের রেন ফরেস্টে পাওয়া যায়। কতগুলি অসাধারণ নমুনা দেখেছি লন্ডনের কিউ গার্ডেনে। এখানে ক্যাটওয়াক থেকে দেখলাম আরেকটি অদ্ভুত ধরনের বুনো আনারস।

বিকেলে আবার পিরানিয়া ধরার জন্য যাত্রা। আজ নানা লোকের বঁড়শিতে উঠল তিনটি পিরানিয়া, আর অন্য একটি মাংসাশী মাছ। এখানে ৮০ শতাংশ মাছ মাংসাশী, ২০ শতাংশ ফলাশী। জলময় ইগাপোতে অনেক গাছের বীজ বিস্তার করে মাছেরা। সুন্দরবনে পাঙ্গাস মাছ বাইন ও কেওড়া ফল খুব খায়।

১৫ আগস্ট। আজ ব্রেকফাস্টের পরে দীর্ঘ লঞ্চযাত্রা। মানাউস ফিরে যাচ্ছি। কৃষ্ণার বুকে শেষ সফর।

জোয়ার-ভাটার অবস্থা বুঝে আজ আর মানাউস বোটঘাটে লঞ্চ লাগানো গেল না। লঞ্চ থেকে একটা ছোট সাঁকোর মতো লাগিয়ে দেওয়া হল। ডাঙায় পৌঁছনোর জন্য রুকস্যাক নিয়ে একটি ছোট লাফ দিতে হল। বাঁধানো রাস্তায় এসে পেলাম আরিয়াউ টাওয়ার্সের গাড়ি। আমাকে নামিয়ে দিল মানাউস বিমানবন্দরে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

একটি সম্ভাব্য যাত্রাপথ: কলকাতা-লন্ডন-সাও পাওলো-মানাউস-আরিয়াউ। মানাউস-আরিয়াউ জলপথে যাত্রার জন্য আলাদা ভাড়া গুনতে হবে না। যোগাযোগ ব্যবস্থা সরাসরি করতে চাইলে ই-মেল: treetop@ariautowers.com.br
বর্তমান ভাড়া ইত্যাদি এখান থেকে জানা যাবে। ভালো কোনও ট্যুর গাইড এজেন্সির সাহায্য নেওয়া যায় ভারত বা ইংল্যান্ড থেকে। ইউরোপ থেকে যাত্রা করলে প্লেন ফেয়ার কম পড়বে।
আরিয়াউ বিষুবরেখার খুব কাছেই, সব সময়ই গরম, কখনও খুব বৃষ্টি। মিষ্টি আলু, কলা, পেঁপে ইত্যাদি পরিচিত খাদ্য পাওয়া যাবে। গাইডরা ইংরিজি বলতে পারেন। কর্মচারীরা বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেন। সাপের হাড় ও বীজের নেকলেস ইত্যাদি ওখানেই কিনতে পাওয়া যায়।

সারভাইভ্যাল ট্রেনিং

আগেকার দিনে অনেক অভিযাত্রী আমাজনের অরণ্যে পথ হারিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। পানের অযোগ্য জল, খাদ্য দুর্লভ। ফরাসি বিজ্ঞানী মোফ্রেস-র ডায়েরিটি পাওয়া গিয়েছিল। প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহের জন্য তাঁর দৈনন্দিন সংগ্রাম লিপিবদ্ধ আছে ডায়েরির পাতায়। ২০০০ সালে দুই ফরাসি ট্যুরিস্ট ও তাঁদের গাইড হারিয়ে যান। চারদিন পর ব্রাজিলের সৈন্যদল তাঁদের উদ্ধার করে। হারিয়ে গেলে কী করণীয় সে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সারভাইভ্যাল ট্রেনিং দেওয়া হয়। আরও কম বয়স হলে সে ট্রেনিং নিতাম। তবে জাঙ্গল ট্রেকিংয়ের সময় সে শিক্ষা কিছুটা পেয়েছি।

গাইড ম্যাক্স বলেন, 'একটি ম্যাচেট ও একটি সিগারেট লাইটার থাকলে আমি একা জঙ্গলে বেঁচে থাকতে পারি, খাদ্য সংগ্রহ করতে পারি, তবে বেশি নয়।' একটি ছোট মজে যাওয়া ডোবা দেখিয়ে ম্যাক্স প্রশ্ন করলেন, 'এখান থেকে কীভাবে পানীয় জল সংগ্রহ করবে?' আমি দেখলাম, ডোবার পাড়ে, জলের ধারে বালি রয়েছে। আমার উত্তর, 'বালিতে গর্ত করব, ধীরে ধীরে বালিতে ফিল্টার্ড হয়ে জল এসে ভরে দেবে গর্ত। আফ্রিকায় হাতিদের দেখে শুষ্ক নদীগর্ভে বালি খুঁড়ে জল সংগ্রহ করেছি, ভারতেও। 'হ্যাঁ, এটা একটা উপায়, কিছুটা পানযোগ্য জল পাওয়া যাবে। আরও পরিষ্কার জল ডোবা, জলা থেকে অনেক দূরেও পাওয়া যাবে ওই ওয়াটার ভাইন বা ফায়ার ভাইন লতা থেকে'— জানালেন ম্যাক্স। ডেমনস্ট্রেশন ক্লাসে বড়, পরিণত লতা নষ্ট করলাম না। চতুর্থ ট্রেকিংয়ের দিন পেলাম একটি মাঝারি লতা। একটি লম্বা অংশ কেটে নিয়ে তার মাঝখানে আবার কাটলেন ম্যাক্স। এই দ্বিতীয় ছেদন তল থেকে নীচের দিকে প্রায় কলের জলের মতো ধারাপাত! জল খেয়ে দেখলাম সুপেয় তবে সামান্য কেরোসিনের গন্ধ পেলাম।

খাদ্য? আমাদের পক্ষে শুধুমাত্র বাবাসু আর ইনাজের পড়ে থাকা ফলের শাঁস সংগ্রহ করাই সম্ভব। ম্যাচেট থাকলে, তবেই। অনেক সময় প্রজাপতি, মথ এমনকী জোনাকি পোকার লার্ভাও ফলের কঠিন খোলায় গর্ত করে। শাঁস খেয়ে ফেলে। যদি লার্ভা বা পিউপা বেরিয়ে না গিয়ে থাকে, তবে সেগুলিকেই ধরে চিবিয়ে খেতে হবে। সুখাদ্য, বিষাক্ত নয়।

দুরকমের লতা দিয়ে দড়ির কাজ করা যায়, ম্যাক্স দেখালেন। এই দড়ি আর কাঠি দিয়ে ফাঁদ তৈরি করলেন তিনি। সন্ধ্যার দিকে ইঁদুর জাতীয় প্রাণী ধরা পড়বে ফাঁদে। তারপর সিগারেট লাইটার দিয়ে শুকনো কাঠি, কাঠ-কুটোতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে খাওয়া যেতে পারে। তারপর ব্রো বা অন্য গাছের আঠা কাঠিতে লাগিয়ে মোমবাতির কাজ করা।

আমাজনের বাঁদরকুল

এদেশের সবচেয়ে ছোট বাঁদর মার-মো-সেট। সবচেয়ে ছোট প্রজাতির বাঁদরটিকে (পিগমি মারমোসেট) একটু বড় আকারের চায়ের পেয়ালায় বসিয়ে রাখা যায়। আমি একটিমাত্র মারমোসেট দেখেছি, সেটির আকার খরগোশের মতো। এই আহত বা কুড়িয়ে পাওয়া প্রাণীটিকে রেখেছিলেন একজন কর্মচারী।

এরপর বলতে হয় স্কুইরেল মাঙ্কির নাম। এই ছোট ছোট বাঁদর আর উলি মাঙ্কি মসৃণ

কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে স্লাইড করে যাওয়ার খেলা দেখাত প্রায়ই। উলি মাঙ্কির লোম মোটেই লম্বা নয়। অনেকটা পশমের মতো। একটা উলি মাঙ্কি আমার আঙুল কামড়ে দিয়েছিল। কাঠের ওপর পড়ে যাওয়া রক্ত সে চেটে খেল। বাঁদরের কামড় থেকে র‍্যাবিস বা জলাতঙ্ক হয় না, যদি তাকে কোনও র‍্যাবিসবাহী শেয়াল কুকুর না কামড়ে থাকে। এখানে কোনও শেয়াল কুকুর নেই। গাছবাড়ির দুজন ডাক্তার ফার্স্ট এড করে দিলেন।
স্পাইডার মাঙ্কি শুধু লেজ দিয়ে গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে ঝুলতে পারে। এর গায়ে লম্বা লম্বা কালো লোম। এ বাঁদরের হাতে চারটি আঙুল— পাঁচটি নয়।

ওষধি ভাণ্ডার

পৃথিবীর সব দেশেই জনজাতি নানা উদ্ভিদের সাহায্যে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করেছেন হাজার হাজার বছর ধরে। সাম্প্রতিক কালে ৩৫,০০০ ওষধি উদ্ভিদ নথিভুক্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা। আরও হাজার হাজার রয়েছে তাঁদের অগোচরে, আদিবাসীদের জ্ঞানভাণ্ডারে। আমাজন থেকে কুইনিন ও কুরারে-র খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীতে। এখন জানলাম আরও কত বৃক্ষ-লতার কত গুণ। আমাজন অরণ্য ধ্বংস হয়ে গেলে শত শত মূল্যবান ওষুধ অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে।

'ভ্রমণ' মার্চ ২০০৫

জিরাফের দেশে

রতনলাল ব্রহ্মচারী

উগান্ডার মবালে শহর থেকে ল্যান্ডরোভারে রওনা দিলাম আরও উত্তরে শুষ্ক আরণ্যক কারামোজা অঞ্চলের দিকে। সঙ্গে চলেছে জুলফিকার। অন্য একটি সাধারণ গাড়িতে আসছেন মবালে স্কুলের আর্ট টিচার কমল চৌধুরী আর তাঁর ছাত্র পাটিয়ার। এরা ফিরে যাবেন সন্ধের আগে। তারিখটা ছিল ১৭-০৮-১৯৬৮।

ঘণ্টাতিনেক বাদেই পৌঁছে গেলাম জনহীন বিশাল প্রান্তরে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অসংখ্য বাবলা গাছ— প্রধানত একাসিয়া ড্রেপানোলোবিয়াম বা হুইস্লিং থর্ন। এ গাছের বিরাট লম্বা কাঁটার গোড়ার দিক খুবই স্ফীত, কালচে-বেগুনি রঙের। আর কাঁটাগুলি সাদা। এক প্রজাতির পিঁপড়ে ওই স্ফীত গোলকে গর্ত করে বাস করে। এই গর্ত কতকটা বাঁশির ছিদ্রের মতো কাজ করে। বাতাস বয়ে গেলে হাজার হাজার কাঁটার ছিদ্র যেন হুইসল দেয়। এই গাছকে আমরা বাঁশি-বাবলা বলতে পারি, যদিও বাঁশের বাঁশির মতো কোনও মিষ্টি সুর বের হয় না।

চৌধুরীদের গাড়িটি রেখে এবার সবাই মিলে ল্যান্ডরোভারে। কিছুদূর গিয়ে ছোট টিলার মতো একটি রক পেলাম। এর ওপর উঠে চারদিক পর্যবেক্ষণ করলাম। ওই তো দূরে অনেক জিরাফ, বাঁশি-বাবলার পাতা খাচ্ছে। সেদিকে অল্পদূর যেতেই এক বিপত্তি, একটি পাথর ল্যান্ডরোভারের তলায় আটকে গেছে, এত নিখুঁতভাবে, যে মনে হয় ওটার আকার-আয়তন যেন এর জন্যই ফরমায়েশ করে তৈরি হয়েছিল। এসব ব্যাপারে জুলফ— এখন থেকে জুলফিকার মহাশয়কে জুলফ বলব, ও অঞ্চলে তাঁকে এই সংক্ষিপ্ত নামেই চেনেন অনেকে— খুবই ওস্তাদ। একখানা শাবল ছিল গাড়িতে। খানিকটা মাটি কেটে তারপর গাড়িকে জ্যাক-আপ করে সমস্যা মিটিয়ে ফেললেন জুলফ।

এবার এগিয়ে যাওয়া। খানিক বাদেই দেখি অনেক জিরাফ, অনেক বাঁশি-বাবলা। এখানে কোনও ট্যুরিস্ট নেই, নেই কোনও গেম ডিপার্টমেন্টের লোক, আদিম আফ্রিকান সাভানায় আমরা ক'জন। জুলফের অভিজ্ঞ হাতে স্টিয়ারিং, শক্তপোক্ত যদিও পুরনো গাড়ি, আর কিসের পরোয়া? ছুটল ল্যান্ডরোভার, সরু কাণ্ডের ছোট বাঁশি-বাবলা গাছগুলি প্রায় পাটকাঠির মতো ভেঙে ফেলে জিরাফের পশ্চাদ্ধাবন, সে কী উন্মাদনা! চৌধুরী কতগুলি স্টিল শট নিলেন। বেলা হয়েছে

অনেক। এবার একটু বিশ্রাম আর প্যাকড লাঞ্চ খাওয়া। এরজন্য একটি রোমান্টিক স্থান নির্বাচন করা গেল। পাঁচ বছর আগে জঙ্গি কারামোজং (কারামোজার উপজাতি) এসে এখানকার একটি গ্রাম আক্রমণ করে, অনেক স্থানীয় অধিবাসীদের মেরে ফেলে। গ্রামটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, যাঁরা বেঁচেছেন তাঁদের কেউই এখানে ফিরে আসেননি। শুধু ভগ্নদশায় টিকে আছে একটি স্কুলবাড়ির ছাদ, কয়েকটি পিলারের ওপর। চারদিকে লম্বা জংলী ঘাস। এখন মাঝে মধ্যে কোনও শিকারির ক্যাম্প পড়ে এখানে।

বিকেলের দিকে আবার জিরাফের পিছনে ছোটা। আরও জোরে ছুটছে ল্যান্ডরোভার, পট পট ভেঙে পড়ছে সরু বাঁশি-বাবলা, ভাঙা কাঁটাগুলি বৃষ্টির ছাঁটের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। গাড়ির বনেটে শেষবেলায় দেখলাম অসংখ্য বাবলার ছোট ডাল, কাঁটা আটকে আছে।

বিশাল উন্মুক্ত সাভানায় জিরাফদের সাবলীল গতিভঙ্গি। একটি খোঁড়া জিরাফ অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়ল। আমরা প্রায় ধরে ফেললাম, তখনই সে আবার কোথা থেকে নতুন শক্তির উৎস খুঁজে পেয়ে যেন ভেলকি দেখিয়ে দিল, ভেসে গেল যেন বাতাসেই। অনেক দূরে দেখি টোপির একটা লাইন। এগুলো হার্টবিস্টের মতো অ্যান্টিলোপ, মুখ লম্বা। শেষবেলায় দেখলাম অসাধারণ এক দৃশ্য। শ'খানেক জিরাফ আর শ'খানেক জেব্রা। জেব্রার দল থেকে খক খক শব্দের একটা ঢেউ এসে গেল। ওদের অ্যালার্ম কল বা ভয়ের ডাক। কতকটা কুকুরের ডাকের মতো, কতকটা আমাদের দেশের বাঁদরের ডাকের মতো এই শব্দ। এবার ফিরে এলাম। চৌধুরী আর পাটিয়ার তাঁদের গাড়িতে উঠে মবালের দিকে চলে গেলেন, আমরা যাব নাবিসাওয়া গেম ডিপার্টমেন্টের ক্যাম্পে।

১৯৬৫ থেকে উগান্ডায় জিরাফ পর্যবেক্ষণ করছি, প্রধানত নীলনদের ধারে মার্চিসন ফলস অভয়ারণ্যের নামসিকা অঞ্চলে। এখানে ছিল মাত্র ডজন খানেকের একটি দল, চোবে অঞ্চলে আরও বেশি সংখ্যক জিরাফ দেখেছি, কিন্তু শুনেছি ও পড়েছি আফ্রিকার সর্বত্র জিরাফরা থাকে ছোট ছোট দলে। তাই উত্তর উগান্ডায় একশো জিরাফ একই সঙ্গে দেখা, বেশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'জিরাফের দেশে' এসেছি বলে মনে হল।

আমরা নাবিসাওয়া ক্যাম্পে একটি ঘর নিয়েছি, সামান্য ভাড়ার বিনিময়ে। দু'জন আফ্রিকি কর্মচারীও আছেন। তাঁদের নিযুক্ত করেছেন জুলফ আমাদের কিছু কাজ করে দেওয়ার জন্য। ঠিক সময়ে আমরা আশ্রয় পেয়েছিলাম। এবার বৃষ্টি আরম্ভ হল। জুলফ তাঁর আরেক পরিচয় দিলেন এখন। তিনি কুশলী পাচকও বটে। এরমধ্যে আমরা বড় বড় মাশরুম পেয়েছি জঙ্গলে। জুলফ দেখেই চিনতে পারলেন, —এগুলি নির্বিষ, সুখাদ্য। আমরা চারটি মাশরুম পেয়েছি, বড় দুটির ব্যাস ১০ ইঞ্চি করে। আফ্রিকিরা এরই মধ্যে একটি মুরগিও কিনে নিয়েছে। জুলফ এবার মুরগির ঝোল ও মাশরুম রান্নায় লেগে পড়লেন। আমি একটি তক্তার ওপর

চাদর পেতে শুয়ে শুয়ে উপভোগ করলাম অবস্থাটি। বাইরে আদিম আফ্রিকার আঁধার রাত, টুপ টুপ বৃষ্টির শব্দ, যেন বনলক্ষ্মীর নূপুর-শিঞ্জন।

এরপর এল প্রবল বৃষ্টি। রাতের খাওয়া জমল ভালোই। গভীর রাতে বৃষ্টি থেমে গেল, জলপ্লাবিত প্রান্তরে জুলফ আমাকে ল্যান্ডরোভারে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। দু-চারটি মাত্র প্রাণী দেখলাম। ঊষার আলো ফোটবার ঠিক আগে ফিরে এলাম ক্যাম্পে।

পরদিন সকালে নাবিসাওয়া ক্যাম্পের লোকজন, তাদের আত্মীয়-পরিজন, বাচ্চা-কাচ্চাদের ভিড়ে বেশ অস্বস্তি বোধ করলাম। কিছুক্ষণ বাদে জুলফ আবার আমাকে নিয়ে যাত্রা করলেন। অতি দ্রুত পৌঁছে গেলাম জনমানবহীন, ধু-ধু সাভানায়। একটি বিরাট রক প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে, ওপরের দিকে বড় বড় মৌচাক। এর থেকে ছোট আরেকটি রকের ওপর উঠলাম। চারদিকে বিশাল প্রান্তর, সেই বিরাটত্ব ও 'গম্ভীর সৌন্দর্য' ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, উপযুক্ত মানসিকতা যাঁর আছে, তিনি ঠিকই বুঝে নেবেন।

গত রাতের অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি সত্ত্বেও উপভোগ করলাম আজকের দিনটি। সকালে-বিকালে বাবলাবনে বিচরণশীল জিরাফ ও জেব্রা দেখলাম, দুপুরে নির্জন আরণ্যক পটভূমিতে মাটিতে বসে লাঞ্চ, পাশেই প্রবহমান ছোট নদী। সাধারণত এসব লাগা য়া নালা প্রায় শুষ্ক থাকে, এক পশলা জোর বৃষ্টির পর প্রায় দুকূল ছাপিয়ে, ভাসিয়ে বয়ে যায় তার জলধারা। চারদিকে অসংখ্য বনফুল ফুটে জায়গাটাকে আলো করে রেখেছে। দু-চারদিন বৃষ্টির পরই এসব ঊষর প্রান্তরে বনফুলের সম্ভার দেখা যায়।

সন্ধ্যায় ফিরে এলাম ক্যাম্পে। আজ রাতেও প্রবল বৃষ্টি।

কাল রাতে ঘুম হয়েছিল অনেকটা, যদিও বৃষ্টি কমার পর একবার বাইরে ঘুরে এসেছি নিশুতি রাতে। আজ বৃষ্টি-ধোয়া আকাশে উজ্জ্বল সূর্য। জুলফ নিয়ে গেলেন একটি ট্র্যাপার্স ক্যাম্পে, অর্থাৎ বন্যপশু ধরার কেন্দ্রে। তখনও চিড়িয়াখানা বা ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য বন্যপশু ধরা আইনসিদ্ধ ছিল। জিরাফ, জেব্রা ইত্যাদি প্রাণীগুলি এখানে এত বেশি সংখ্যায় ছিল যে প্রতি বছর কয়েকটি ধরে নিয়ে গেলেও সামগ্রিকভাবে তার কোনও প্রভাবই পড়ত না। অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল ইদি আমিনের সময় থেকে, যদিও ১৯৭৬-এ শেষবারের মতো উগান্ডা গিয়ে তখনও দেখি ওই অঞ্চলে প্রচুর জেব্রা, জিরাফ, উটপাখি রয়েছে।

ক্যাম্পের আশপাশে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বন্য সৌন্দর্য একেই বলে। একটা উঁচু অধিত্যকার ওপর ক্যাম্প। থাকার জন্য ছাউনি দেওয়া, ঘাস ও নলখাগড়ার তৈরি বড় ঘর, কিছুদূরে শক্ত কাঠের বেড়া দেওয়া 'কোরাল', সেখানে বেশ কয়েকটি ধরা-পড়া জিরাফ, আরেকটি কোরালে একটি কুডু (অ্যান্টিলোপ), আর একটু দূরে একটি চিতা। চারদিকে ছায়া মেলে ধরা বড় বড় বাবলা গাছ। প্রধানত বাঁশি-বাবলা। অসংখ্য বাবুই পাখি বাসা তৈরির কাজে ব্যস্ত। নীচে বিস্তীর্ণ

উপত্যকা, অনেক দূরে সারি দিয়ে যাচ্ছে একদল উটপাখি।

এখানে মাসের পর মাস পরম আনন্দে থাকা যায়, বন্যপ্রাণীগুলি ধরার পর তাদের কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে, আদিম আফ্রিকার স্বাদ অনুভব করে।

পরে জেনেছি এই ক্যাম্পটি ছিল হেরম্যান বা মিঃ ম্যান নামে এক জার্মান ভদ্রলোকের। সেদিন সেখানে ছিলেন এক ইংরেজ যুবক। চিতার কথা তুলতেই বললেন, না, এখানে কোনও চিতা নেই, চলুন ওদিকে যাই। বুঝলাম চিতাটি বিনা লাইসেন্সে ধরা হয়েছে, অথবা আইনি কোনও গণ্ডগোল আছে। মনটা দমে গেল, ইচ্ছা ছিল এর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে পরে এখানে এসে থাকার কোনও বন্দোবস্ত যদি করা যায়।

প্রায় দু বছর পরে কিন্তু সে সুযোগ পেলাম। ১৯৬৯-এর নভেম্বরে আবার উগান্ডা। মার্চিসন ফলস অভয়ারণ্যে গবেষণামূলক পর্যবেক্ষণ করে ডিসেম্বরের শেষে কমল চৌধুরী আর দিপালী চৌধুরীর বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। তখন উগান্ডাতে এঁরাই ছিলেন একমাত্র ভারতীয় যাঁদের গভীর আগ্রহ ছিল আফ্রিকার মানুষ, তাঁদের কৃষ্টি, আর আফ্রিকার প্রকৃতি বিষয়ে। কমলবাবু শিল্পী আর দিপালী দেবী স্বশিক্ষিতা বিজ্ঞানী।

১৯৬৯-এর ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর আবার সেই নাবিসাওয়া, কদম পাহাড়, দেবাসিন অঞ্চলে। এবার নগ্ন কিন্তু আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন, আমার মতে সভ্য, কারামোজংদের দেখলাম। প্রচুর জিরাফ দেখলাম, প্রধানত বাঁশি-বাবলার পাতা খেয়ে চলেছে। কমলবাবু আট মিলিমিটার মুভি ফিল্ম তুললেন। প্রায় ১৮ ফুট লম্বা একটি পুরুষ জিরাফের খুব কাছে পায়ে হেঁটে যেতে পারলাম।

এ অঞ্চলে পাওয়া যায় জিরাফের যে উপজাতি, তার নাম রথচাইল্ডস জিরাফ, এরাই সবচেয়ে বড় আকারের জিরাফ। রেকর্ড সাইজ ১৮ ফুট উচ্চতা।

এবার একটি সাদা জিরাফও দেখলাম। এটির বয়স বেশি নয়। জিরাফের গায়ের উজ্জ্বল ছোপগুলি এর নেই, খুবই নিষ্প্রভ সে সব দাগ, শরীরটি বেশ সাদা। পরে দেখা হল প্রাণিতত্ত্ববিদ ভাগনারের সঙ্গে। তিনি বললেন, জিরাফটি এলবিনো নয়, চোখের রং স্বাভাবিক, পায়ের তলার দিকে কালো রং রয়েছে।

অনেক জেব্রাও দেখলাম। জেব্রা মায়ের সঙ্গে বাচ্চা বেশ কয়েকটি ছিল। ল্যান্ডরোভার এগিয়ে আসতেই জেব্রা মা ও শিশুরা ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে, কিন্তু সুনির্দিষ্ট লাইন বেঁধে, একের পিছনে আর এক। নাবিসাওয়া কি দেবাসিনের বনকর্মীদের কয়েকজন থাকছেন একটি ক্যাম্পে। এটিও ট্র্যাপার্স ক্যাম্পের মতোই অতিসুন্দর জায়গায় তৈরি করা হয়েছে। নীচের উপত্যকা বহুদূর বিস্তৃত, কারামোজার পাহাড়শ্রেণী পর্যন্ত। বায়নোকুলারের সাহায্যে দেখা গেল বহুদূরে একটি পুরুষ উটপাখি। আমাদের ল্যান্ডরোভারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রেসের ঘোড়ার মতো ছুটল সে, কিছুতেই ফিল্ম করার মতো কাছাকাছি দূরত্বে পৌঁছনো গেল না।

এরপর ট্র্যাপার্স ক্যাম্পে ম্যানের সঙ্গে দেখা হল, তিনি ক্যাম্প ইজারা দিয়েছেন

প্রাগ জুয়ের ডাইরেক্টর অধ্যাপক ভাগনারকে। ভাগনার খুব সহজেই রাজি হয়ে গেলেন আমাকে দু-চার দিন সেখানে থাকতে দিতে। ভাগনারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেখি ট্র্যাপার্সদের দল একটি জিরাফ ধরে নিয়ে এল। এর তদারকি করলেন ম্যান। বোধহয় এই জিরাফটা ভাগনার কিনে নেবেন ১০-১২,০০০ শিলিং দাম দিয়ে। প্রাগের চিড়িয়াখানার জন্য তিনি বেশ কয়েকটি জিরাফ ও অন্য প্রাণী সংগ্রহ করবেন, কয়েকটি কিনবেন, কয়েকটি নিজে ধরবেন।

১৯৭০-এর ৬ জানুয়ারি একটি ব্যাগ নিয়ে চলে এসেছি ট্র্যাপার্স ক্যাম্পে। তখন দুপুর শেষ হয়ে বিকেলের দিকে গড়াচ্ছে। বিশ্রামরত ভাগনার উঠে এসে দেখিয়ে দিলেন আমার থাকার জায়গা। সেই উঁচু ছাউনি দেওয়া হলঘরের মধ্যেই ঘাস আর নলখাগড়ার সুদৃশ্য পার্টিশান দিয়ে আরেকটি ঘর তৈরি হয়েছে। এখানেই থাকতেন ম্যান। মেঝেতে ওখানকার প্রাকৃতিক লাল মাটি, দুয়েকটি ঘাস ও আগাছা আছে। জুতো খুলে ক্যাম্পখাটে ওঠার জন্য রয়েছে একটি পাপোশ আরেকটি কাঠের তক্তা। একটা বেসিন লাগানো আছে, তার পাশে রাখা আছে একটি জলভরা বড় পাত্র। একটি আয়না। এই বেসিনে টুথ ব্রাশ করা, মুখ ধোয়া আর, অন্তত আমার ক্ষেত্রে, মাথায় এক মগ জল ঢালা। স্নান করার প্রশ্নই নেই, কারণ জল রেশন করা। অনেকটা দূর থেকে জল আনতে হয়। খাবার জন্য সেই জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করে বোতলে ভরে রাখা হয়।

বিকেলে তিনটি জিপভর্তি গাছের ডালপালা নিয়ে এলেন কয়েকজন কর্মী। এগুলি কোনওটাই বাঁশি-বাবলা নয়। এগুলি ঝুলিয়ে দেওয়া হল বন্দী জিরাফদের কোরালে। জিরাফ শান্ত প্রাণী, সহজেই পোষ মানে। একদিন পরেই মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে পাতা খায়। কিন্তু রোন অ্যান্টিলোপ দু'চার দিন বাদেও তেড়ে আসে।

একটু পরেই ভাগনারের সঙ্গে বেরলাম। জিরাফ বা রোন ধরা হবে ল্যাসো দিয়ে। ষাটের দশকে পূর্ব ও পশ্চিম দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রধানত বিজ্ঞানী টনি হার্টহুর্ন ঘুমপাড়ানি বন্দুক বা তীর-ধনুকের ব্যবহার চালু করেন। গুলি ও তীরের বদলে একটি সিরিঞ্জ এসে বিঁধে যায় প্রাণীটির শরীরে। হার্টহুর্ন ঘুমপাড়ানি ওষুধ M 99 নিয়ে অনেক গবেষণা করেন। কিন্তু উত্তর উগান্ডায় তখনও ল্যাসোর ফাঁসে আটকে প্রাণীগুলি ধরা হত। তারপর প্রয়োজন হলে, ঘুমপাড়ানি বা ট্রানকুইলাইজার ওষুধ।

কোনও কোনও প্রাণীবিজ্ঞানী মনে করেন জিরাফের ১২টি উপজাতি আছে বা ছিল। এদের নাম, রথচাইল্ড (বা বারিংগো), টিপেলসকির্চি (বা মাসাই), রেটিকিউলেটেড, কেপ, নুবিয়ান, কর্ডোফান, নাইজেরিয়ান, সাউথ লাডো, কংগো, রোডেশিয়ান, আংগোলা, ট্রান্সভাল। এদের মধ্যে প্রথম চারটি সবচেয়ে পরিচিত। রথচাইল্ডের গায়ের দাগগুলি চৌকো, মাসাই জিরাফের বেলায় সেগুলি কতকটা ফুলের পাপড়ির মতো; আর সবচেয়ে সুন্দর হল রেটিকিউলেটেড বা জালি

জিরাফ, গায়ে যেন সাদা জাল আঁকা। দক্ষিণে আছে কেপ জিরাফ আর ট্রান্সভাল জিরাফ, এ দুটির পার্থক্য এখন কতটা স্বীকৃত জানি না।

পঞ্চাশের দশকে, আর ষাটের দশকের প্রথম দিকেও অনেক প্রামাণ্য পুঁথিপত্রে দেখা যেত, জিরাফ প্রধানত গাছের পাতা খায়, কিন্তু কিছু ঘাসও খায় কখনও। পরে জানা গেছে, জিরাফ ১০০% পত্রভোজী। আমি দেখেছি উগান্ডার মার্চিসনে, নাবিসাওয়া-কদম-দেবাসিনে, দূর থেকে যদিও মনে হয় মাটিতে মুখ নামিয়ে ঘাস খাচ্ছে, কাছে গিয়ে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় আসলে তার খাদ্য ঘাসের মধ্যে জন্মানো অতি ছোট দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতা। প্রোটিন-সমৃদ্ধ নানা ধরনের বাবলাপাতা জিরাফের উৎকৃষ্ট খাদ্য। মার্চিসনে নীলনদের ধারে নামসিকা অঞ্চলে দেখেছি বাবলা নেই, এখানে এরা প্রচুর পরিমাণে ছোট গাছ হ্যারিসনিয়া আবিসিনিকা খাচ্ছে। এটাও প্রোটিন-সমৃদ্ধ, কিন্তু একইরকম প্রোটিনযুক্ত আরেক প্রজাতির গাছ কমিফোরা স্পর্শ করছে না। হয়তো এই দ্বিতীয়টির মধ্যে রয়েছে বেশি পরিমাণে ট্যানিন ইত্যাদি যা সুস্বাদু নয়, এমনকী বিষাক্তও হতে পারে। তৃণভোজী প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেক গাছ বিষাক্ত দ্রব্য তৈরি করে।

আজ থেকে চারদিন কাটল দারুণ উত্তেজনার মধ্যে। পথহীন সাভানায় উল্কাবেগে ছুটছে দুটি জিপ, তাতে রয়েছেন দুজন ল্যাসোধারী আর ভাগনার। গাড়িও জীবনবিমা করে রেখেছেন। অনেকটা পিছনে খাঁচাসুদ্ধ একটি ট্রাক আর তাতেই জনা দশেক লোকের সঙ্গে আমি। একটা ট্রাকের পক্ষে এর গতি অতি দুর্বার, খাঁচা আর ট্রাকের উঁচু কাঠের দেওয়ালের মাঝে সরু প্যাসেজে দাঁড়িয়ে দুহাতে আঁকড়ে ধরে উপভোগ করছি বন্য সাভানার বুকে সেই বিচরণ। ছুটছে জিরাফ, ছুটছে অ্যান্টিলোপ, উড়ছে ধূলি, চরণতলে বিশাল সাভানা দিগন্তে বিলীন। একটি রোন অ্যান্টিলোপ ধরা পড়ল ল্যাসোর ফাঁসে। দড়িদড়া ছুড়ে অনেক লোক মিলে তাকে কাবু করল। খাঁচা থেকে কোরালে ঢোকানোর আগে প্রাণীটিকে অবশ করতে ওষুধ দিতে হল।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বৃষ্টি হচ্ছে। অধ্যাপক ভাগনার তাঁর সঙ্গে ডিনার খেতে ডাকলেন, বাহুল্যবর্জিত ইউরোপীয় খানা। সারা দিনের উত্তেজনার পর রাতের খাওয়া খুবই তৃপ্তিকর। বাইরে আফ্রিকার আরণ্যক পরিবেশ, অন্ধকার, বৃষ্টি মৃদুস্বরে আমরা দুজন কথাবার্তা বলছি। মিসেস ভাগনার আরও আগেই শুতে যেতেন।

পরদিন সকালে আবার যাত্রা, অনেক জিরাফ, কয়েকটি রোন, চারটি উটপাখি দেখলাম। ভাগনার তাঁর জিপ থেকে তিনটি চিতাও দেখলেন। শেষ পর্যন্ত আরেকটি রোন ধরা গেল।

বনে আগুন লাগার ফলে বাঁশি-বাবলার ক্ষতি হচ্ছে, লক্ষ করলাম। এই অঞ্চলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তরুপ্রজাতি হল বাঁশি-বাবলা আর তাই জিরাফের প্রধান খাদ্যও বটে। আগুনের প্রভাব ঠিক কতটা? তিনদিনের পর্যবেক্ষণে আমার সমীক্ষার ফল হল— আগুনের কবলে পড়া ৮৫টি বাঁশি-

বাবলার ৩৭টি মরে গেছে, ৪০টির ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু তারা বেঁচে আছে, সামলে উঠছে, আর ৮টির কোনও ক্ষতিই হয়নি।

যাহোক, রোন নিয়ে ফিরে এলাম। তারপর ভাগনার শুয়ে পড়লেন। বুঝলাম উনি দিনেরবেলা আর খান না। বেলা ১টা বেজে গেছে, আমার পেটে আগুন জ্বলছে, সকালবেলা সঙ্গে আনা টিনড্ ফুড থেকে কয়েক টুকরো সিদ্ধ গাজর খেয়েছি মাত্র। আগে ভাসা ভাসাভাবে বলে দিয়েছিলাম একজন আফ্রিকি পরিচারককে, যে আমার খাওয়ার জন্য শুধু মাটকে (কাঁচকলা) সিদ্ধ হলেই চলবে। মাটকে উগান্ডায় সহজলভ্য, কিন্তু খেয়াল করিনি যে লোকালয় থেকে এতদূরে এই ঊষর বনভূমিতে তা নাও পাওয়া যেতে পারে। আর সেই আফ্রিকি লোকটিকেই বা এখন পাই কোথায়? কাউকেই দেখা যাচ্ছে না, কাঠফাটা রোদে সবাই নিজের নিজের জায়গায় নিদ্রারত।

দেবদূতের মতো এলেন দুজন আফ্রিকি। ইংরিজি, স্বোয়াহিলি কয়েকটি কথায় ও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, আফ্রিকায় না খেয়ে থাকলে খুব ক্ষতি হয় শরীরের; "আসুন আমাদের ঘরে, কিছু খান। তবে কাউকে বলবেন না, মেম সাহেবকে (মানে মিসেস ভাগনার) জানাবেন না।" দেবভোগ্য চালের ভাত বড় এক প্লেট তারা সাজিয়ে দিলেন। উগাণ্ডায় তখন ভালো পেশওয়ারি বাসমতি চাল ও অন্যান্য চাল পাওয়া যেত, তার প্রধান কারণ ওদেশে ৭০ হাজার ভারতীয় থাকতেন। ভাতের সঙ্গে পেলাম কাঁচকলা নয়, সুস্বাদু মুরগির মাংস ও ঝোল। এরপর থেকে প্রতিদিন এরকম, ব্রেকফাস্টে আমার টিনের গাজর সিদ্ধ, দুপুরে ভাত আর মুরগি, রাতে ভাগনারের সঙ্গে সাদামাটা ইউরোপীয় খানা। আশ্চর্য ব্যাপার, আফ্রিকি এই দুই 'অতি ভদ্রলোক' শেষ পর্যন্ত একটি পয়সাও চাননি। চাইলে অসুবিধা হত, টাকা পয়সা খুবই কম ছিল।

বিকেলে আবার জিরাফের সন্ধানে ছুটলাম— কারামোজায় প্রবেশ করে মোরোটোর পথে অনেক দূর গেলাম। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক জিরাফ, সবাই খাচ্ছে বাঁশি-বাবলা, মাত্র একটি দেখলাম অন্য প্রজাতির গাছ খাচ্ছে। সূর্য নামল পাটে, অস্ত-আকাশে অতি সুন্দর রক্তিম আভা। এই পটভূমিকায় ১৫টি জিরাফের একটি দল তাড়িয়ে গেল জিপদুটি। পথে পড়ল দাঁতাল বরা ওয়ার্ট-হগ, ছোট অ্যান্টিলোপ ওরিবি, সবাই ছুটে পালাচ্ছে। জিরাফগুলি ধরা পড়েও পড়ছে না, দু-এক ফুট এদিক-ওদিক হয়ে যাচ্ছে ল্যাসো বিশারদদের হিসাবে।

প্রতিদিন রাতে বৃষ্টি। অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ও পরিশ্রান্ত হয়ে রাতের খাবার খাই ভাগনারের সঙ্গে, একটা সার্থকতার আনন্দ নিয়ে। টিপ টিপ বৃষ্টি, অন্ধকার রাত্রি, বাইরে আছে লেপার্ড, হায়েনা।

এমনি করে চারদিন কেটে গেল, আমরা ধরেছি তিনটি রোন আর তিনটি জিরাফ, মোট ছটি প্রাণী। একটি জিরাফকে কমজোরি বা অসুস্থ মনে করে ছেড়ে দেওয়া হল।

১০ জানুয়ারি সকালবেলা এক আফ্রিকি ড্রাইভার আমাকে পৌঁছে দিলেন বাসরাস্তায়। মবালেগামী বাসের জন্য অপেক্ষা করছি, হঠাৎ দেখি দুশো গজ দূরে একটি কুটির থেকে বেরিয়ে এলেন এক আফ্রিকি, মলিন বেশভূষা, হাতে একটি ছোট অতি সাদামাটা কাঠের চেয়ার। সেটি আমার সামনে পেতে দিয়ে বললেন, "বসুন বানা"। বানা বা বোয়ানা মানে কর্তামশাই,— একটি শ্রদ্ধাসূচক সম্ভাষণ। তাঁকে কোনওদিন দেখিনি কিন্তু রাস্তার ধারে দাঁড়ানো বিদেশি 'মাগিনি'র (অতিথি) জন্য তাঁর সৌজন্যে কোনও কমতি নেই। বুঝলাম, বিদায় নিচ্ছি শুধু জিরাফের দেশ থেকে নয়, বড় মাপের মানুষের দেশ থেকেও।

১৯৭৬-এ এসে দেখি উগান্ডার অনেক অবনতি হয়েছে। ট্র্যাপার্স ক্যাম্পে তখন আছেন বিলেতের বিখ্যাত চিপারফিল্ডদের লোকজন। অনেক জিরাফ ও উটপাখি ধরেছেন তাঁরা। সে বছর ইউরোপের নানা চিড়িয়াখানায় নাকি উটপাখির খুব চাহিদা। ওই সময় চিপারফিল্ডদের একটি গাড়িতে বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটে। তাই ওঁদের সঙ্গে জিরাফ-ধরা দলে থাকার অনুমোদন পাইনি।

এরপর সুযোগ এল ২০০৫-এ। দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল (এখন নাম হয়েছে নর্দার্ন প্রভিন্স) অঞ্চলে একটি প্রাইভেট গেম রিজার্ভ থেকে আরেকটি প্রাইভেট রিজার্ভে নিয়ে আসা হল একটি জিরাফ। এ জিরাফ ধরা পার্টিতে থাকার সুযোগ পেয়েছি আমি আর কলকাতার এক অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মহিলা—অর্পিতা। উত্তর উগান্ডার সেই বিশাল সাভানার তুলনায় এসব দু-চার-পাঁচ হাজার হেক্টরব্যাপী রিজার্ভ অতি নগণ্য। সেই প্রচণ্ড উন্মাদনা এখানে নেই, তবে সেই ধকল হয়তো এখন সহ্য হত না। মানুষ দেখতে অভ্যস্ত জিরাফের কাছাকাছি আসা গেল সহজেই। M99 ওষুধ ভরা সিরিঞ্জ রাইফেলে ঢুকিয়ে শুট করলেন মিঃ মাইবুর্গ। প্রথমবার ব্যর্থ হলেন। দ্বিতীয় চেষ্টায় বিঁধে গেল সুচটি। ভয় পেয়ে ছুটল জিরাফ, গাছ বাঁচিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটল ট্রাক। ওষুধের ক্রিয়া আরম্ভ হল, জিরাফটি পিছিয়ে পড়ল অন্যদের থেকে, গতি হল আরও শ্লথ। অমনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন দড়ির ফাঁস নিয়ে কয়েকজন লোক। আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ল প্রাণীটি। গলা ও মাথা তুলে রাখলেন লোকেরা, চোখ মুখ বেঁধে দিয়ে জল ঢেলে ঠান্ডা করা হল জিরাফের শরীর। একটু জ্ঞান ফিরতে দড়ি-বাঁধা প্রাণীটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হল খাঁচায়, এসব খাঁচার ওপর দিক খোলা।

'ভ্রমণ' নভেম্বর, ২০০৫

ড্রাগন পাহাড়ের ধারে

রতনলাল ব্রহ্মচারী

জোহানেসবার্গ বিমানবন্দর থেকে লেড ট্যুর অপারেটরের গাড়ি আমাকে নিয়ে যাচ্ছে উত্তর-পুবে, ট্রানসভাল অঞ্চলে। এখন এ অঞ্চলকে বলা হয় নর্দার্ন প্রভিন্স। পথেই পড়বে জক অব বুশভেল্ডের দেশ, দেখতে পাব ড্রাকেন্সবার্গ বা ড্রাগন পাহাড়ের শাখা-প্রশাখা। ২০০২-এর অক্টোবরের কথা বলছি।

প্রশস্ত হাইওয়ে, মাইলের পর মাইল সোজা চলে গেছে, মসৃণ, পরিচ্ছন্ন। গাইড কাম ড্রাইভার দক্ষিণ আফ্রিকার নানা খবর দিলেন। 'জক অব বুশভেল্ডের দেশ'— নোটিস বোর্ডটি দেখালেন। আর এক জায়গায় কোনও খেয়ালী বড়লোক প্রমাণ সাইজের হাতি, গণ্ডার, জেব্রা ইত্যাদির মূর্তি তৈরি করেছেন। পথের ধারে মাঠে অনেক ভেড়া চরছে। এক জায়গায় তাদের সঙ্গে অনেক ব্লেসবাক। এই অ্যান্টিলোপগুলি আধপোষা, মাংসের জন্য এদের বড় করা হচ্ছে। ব্লেসবাকের ওজন ৬০ থেকে ৮০ কেজি হতে পারে, ভালোই মাংস পাওয়া যাবে। এরপর বিহার বা ওড়িশার মতো ছোটছোট পাহাড়ের মেলা। একটির গঠনশৈলী অস্বাভাবিক, যেন মানুষ চেষ্টা করেছে, কোনও স্তূপ বা চৈত্য বা জিগারাট তৈরি করতে।

দুপুরবেলা একটি ছিমছাম কমপ্লেক্স দেখে গাড়ি থামালেন গাইড। এখানে আছে পেট্রোল পাম্প, সাময়িকী ও বইয়ের দোকান আর রেস্তোরাঁ। এখান থেকে কিনলাম এ মাসের গেটওয়ে ম্যাগাজিন, ওদেশের বিখ্যাত ভ্রমণ পত্রিকা। আকারে 'ভ্রমণ-'এর চেয়ে একটু বড়। আগেকার একটি গেটওয়ে থেকেই জানতে পেরেছি এবারকার গন্তব্য, সুখুদু-র কথা। রেস্তোরাঁতে খেয়ে নিলাম, তারপর আবার যাত্রা।

ড্রাগনশৈলের দুয়েকটি শাখা দেখে, বিকেলে পৌঁছলাম সুখুদু। এখান থেকেও দেখা যায় ড্রাকেন্সবার্গ শৈলমালার একটি নীলাভ শ্রেণী। আমার থাকার জায়গা ওয়াটার বাক কটেজ। পাথর আর সিমেন্টের তৈরি সুন্দর কটেজের ওপর ঘাস বা তালপাতার ছাউনি দেওয়া, তাতেই আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। আশপাশে কাঁটাঝোপ। কুটিরের ভেতরে আরামদায়ক, পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা, আছে এদেশের মতো সিলিং ফ্যান। নিচু টেবিলে এক ঝুরি ফল, কয়েকটি রঙিন ম্যাগাজিন, একটি বাইবেল,

এক পাতায় ইংরিজি অন্য পাতায় আফ্রিকানস ভাষায় লেখা। পাশেই বাথরুম, কমোডের কাঠের অংশটুকু অতি সুন্দর; রঙিন নকশা করা কাপড়ে মোড়া।

একটু পরে ডাইনিং হল কাম ড্রইং রুমে গেলাম। টি টাইম। চায়ের সঙ্গে টা-এর বিপুল আয়োজন। এই গরমে গরম চা বাদ দিয়ে শুধু টা-ই খেলাম। চা পানের পর ছোট ছোট দলে ট্যুরিস্টরা কয়েকটি খোলা, উঁচু, ল্যান্ডরোভারে এক-একজন গাইডের সঙ্গে বের হলেন বন্যপ্রাণী দেখতে ও ফটো তুলতে। এই গাড়িগুলো দক্ষিণ আফ্রিকার নিজস্ব স্টাইলে তৈরি। পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকায় এরকম দেখিনি।

আজ ১৩ অক্টোবর আমার ১৩নম্বর আফ্রিকা অভিযান আরম্ভ হল। একদিক দিয়ে দেখলে এটি একটি অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স, শত শত বা হাজার হাজার বর্গমাইল আরণ্যক আফ্রিকার পরিবর্তে পাঁচ হাজার হেক্টর বেড়া দেওয়া বুশভেল্ড— যেন খেলাঘরের জঙ্গল, আর সুখাদ্যের এই প্রাচুর্য যেন ধনীর পিকনিক। তবে এই খেলাঘর কলকাতার চিড়িয়াখানার চেয়ে তিনশো আট গুণ বড়। আর এখানে এসেছি সিংহের কেশর নিয়ে একটু গবেষণার জন্য, সে চেষ্টা সফল হয়েছিল।

আজ প্রথমেই দেখলাম মা ও শিশু হাতি। আট মাস বয়সী শিশু হাতি থেমে থাকা ল্যান্ডরোভারে ধাক্কা মারল। মা-হাতি শুঁড় দুলিয়ে দিল খোলা ল্যান্ডরোভারের ওপর, যেন একটি অতিকায় সাপ। দুবার শুঁড়ের ডগা ঢুকে গেল আমার কাঁধে ঝোলা খাকি ব্যাগের মধ্যে। এর আগে বাচ্চা হাতি আমার পকেটে শুঁড় ঢুকিয়ে খুঁজেছে সুখাদ্য জিম্বাবোয়েতে, জলদাপাড়ায়। কিন্তু এ অভিজ্ঞতা অসাধারণ, যেন একটি মহীরুহ সাপের আকার ধরে মুখের সামনে দুলছে। এর পরেই এলো মহাকায় পুরুষ হাতিটি, তার আবার মস্তিরস নিঃসরণ হচ্ছে। বিপজ্জনক। মদমত্ত হস্তী। গাইড ক্রিস গাড়ি চালিয়ে দিলেন। মা, বাবা আর শিশু হাতির পরিবার প্রকৃতিতে দেখা যায় না। সাধারণত হাতিদের পরিবার বা কেন্দ্রীয় দল হল একাকী স্ত্রী-হাতি আর শাবকদের একটি গোষ্ঠী। পুরুষ হাতিরা একাধিক অথবা ব্যাচেলর হার্ড করে থাকে, কখনও কখনও ওই পরিবারভিত্তিক কেন্দ্রীয় দলের সঙ্গে মেলামেশা করে, আসে যায়। কিন্তু যে দল ভাঙে না, দৃঢ় সমাজ বন্ধনে বাঁধা, তা হল ওই স্ত্রী হাতিদের সঙ্গ। এখানে কৃত্রিম পরিবেশে, মা, বাবা ও শিশুর একটি নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি তৈরি করা হয়েছে। আমি সবচেয়ে বড় হাতির দল দেখেছি জাইরে, শ দেড়েক হবে। কিন্তু তা কোনও দীর্ঘস্থায়ী পরিবার নয়।

এরপর দেখলাম কয়েকটি গণ্ডার, একটি বড় কুডু অ্যান্টিলোপ, আফ্রিকার বুনো মোষ কেপ বাফেলোর একটি বড় দল। লম্বা গলা (ভালচারাইন) গিনি ফাউল এক ঝাঁক। এগুলি বর্ন ফ্রি খ্যাত জর্জ অ্যাডামসনের লায়ন ক্যাম্পে দেখেছি, আমাদের কুটিরগুলির আশপাশেই ঘুরে বেড়াত, প্রায় পোষা মুরগির মতো। এখানে অত কাছে যাওয়া যায় না।

সন্ধ্যা হয়ে এল। গাড়ির আলোয় একটি শেয়ালের (ব্ল্যাক ব্যাকড় জ্যাকাল) চোখদুটি জ্বলে উঠল।

এরপর স্পটের আলোয় একটি বুশ বেবি। বানর-কল্প এই ক্ষুদ্র প্রাণী খুবই আকর্ষণীয়, হয়তো বা ভুতুড়ে চেহারার। আমাদের দেশে আছে লজ্জাবতী বানর— স্লো লোরিস, আর স্লেনডার লোরিস— আর বোর্নিও ইত্যাদি দেশে টারসিয়ার। এদের সকলেরই বিরাট, গোল চোখ, টারসিয়েরের বেলায় সবচেয়ে বড়। এ প্রাণীটিকে দেখা বেশ শক্ত। বোর্নিও-র টানজুং পুটিং-এ একটি ছিল, তার গায়ের মৃদু গন্ধ পেয়েছি কিন্তু দিনেরবেলা দেখা অসম্ভব, রাতেও খুবই কম দেখা যায়। ওখানে তখন একজন গবেষক টারসিয়ের নিয়ে থিসিস লিখছিলেন।

উগান্ডার বুডঙ্গো অঞ্চলে প্রচুর বুশবেবির ডাক শুনেছি অনেকদিন আগে, কিন্তু দেখতে পাইনি। এখানে বেশ কয়েকটি দেখলাম, অনেকেই চিক চিক করে কতকটা পাখি বা কাঠবেড়ালির মতো ডাকে। উগান্ডার ওগুলি কিন্তু অদ্ভুত খর্‌র আওয়াজ করত। প্রজাতি একই।

ক্রিস গাড়িটা একটি গাছের কাছে নিয়ে এলেন। বুশবেবির একটি চোখ স্পটের আলোয় জ্বলছে, যেন একটি লাল তারা। তারপর আরও কাছে এলাম, প্রাণীটিকে স্পষ্ট দেখা গেল। কী মজাদার দেখতে।

ডিনার সার্ভ করা হল বাইরে, একটু ঘেরা জায়গায় খোলা আকাশের নীচে। উঠানের মাঝখানে ক্যাম্প ফায়ারের মতো কাঠের আগুন জ্বলছে। বুফে সিস্টেমে প্রচুর খাবার সাজানো। ডিনারে একটি পদ হল গেম মিট অর্থাৎ বন্যপ্রাণীর মাংস। আজ আছে উটপাখির মাংস। গাজর ও পেঁয়াজ সিদ্ধ দিয়ে অস্ট্রিচ কাবাব জাতীয় একটা ডিশ। এই মাংসে কোলেস্টেরলের মান শূন্য। আফ্রিকায় নানা বন্যপ্রাণীর মাংস খেয়েছি, এখানে নতুন দুয়েকটি সংযোজন হল। মাংস যদি খেতে হয় তবে বন্য মাংস খাওয়াই শ্রেয়, কারণ ওই মাংসে ক্ষতিকর স্নেহপদার্থ কিছু কম থাকে প্রায় সবক্ষেত্রেই।

ডিনারের পর ট্যুরিস্টদের বলে দেওয়া হয় কেউ যেন একা একা নিজের কটেজে চলে না যায়, কারণ দুচারটি লেপার্ড আর দুটি সিংহী শিকারের সন্ধানে আশপাশে এসে থাকতে পারে। ক্রিস সতর্কতার সঙ্গে আমাকে ওয়াটার বাক কটেজে পৌঁছে দিলেন। সুখুদু-তে আমার প্রথম দিন শেষ হল।

স্থানীয় সোমো ভাষায় সুখুদু কথাটির অর্থ গণ্ডার। ২২ বছর আগে এই কৃষি খামারের অবস্থা হয়েছিল খুবই খারাপ, তখন মালিকের কাছ থেকে এটি কিনে নিলেন সামেন্স নামে এক ভদ্রলোক। তাঁর পরিবার বহু প্রজন্ম ধরেই রয়েছেন এদেশে, তাঁরা চিরকালই শিকারি, কৃষিকাজও করতেন। এখন কৃষিকাজের চেয়ে বেশি লাভজনক ইকো ট্যুরিজম। বন্যপ্রাণী, দেখতে, ফটো তুলতে আগ্রহী ট্যুরিস্টের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়ছে, কি ন্যাশনাল পার্কে, কি এ সব ছোট প্রাইভেট গেম রিজার্ভে। ব্যক্তিগত মালিকানার এই সব ছোট রিজার্ভগুলি, সম্মিলিতভাবে বিরাট শক্তিধর, বন ও বন্যপ্রাণী বাঁচিয়ে রাখতে এদের অবদান লক্ষণীয়। পাঁচ হাজার হেক্টর প্রাকৃতিক পরিবেশে এখানে আছে শতাধিক বুনো মোষ, ওইরকম

সংখ্যায় নু বা উইল্ডবিস্ট, হাজারখানেক ওয়ার্ট হগ (বুনো শুয়োর), ৪০-৫০টি জিরাফ, বেশ কয়েকশো ইম্পালা, আর অল্প সংখ্যায় কুডু, ইল্যান্ড, গেমস বক— এখানে অনেকে উচ্চারণ করেন হেমসবক, আর বিদেশিদের কেউ কেউ বলেন জেমস বক। দুটি সিংহী দু চারটে লেপার্ড, দু চারটে হায়নাও আছে। এছাড়া ছোট প্রাণী, বুশবেবি, বেজি, একটি শেয়াল পরিবার, জেনেট (খুব সুন্দর ফোঁটা কাটা ভাম জাতীয় প্রাণী), সজারু ইত্যাদি আর অসংখ্য পাখি রয়েছে।

সুখুদুর গণ্ডারগুলি হোয়াইট রাইনো, তার মানে চওড়া মুখ গণ্ডার, সাদা গণ্ডার নয়। হোয়াইট রাইনো নামটি এল কী করে সেটা একটি রহস্য। অনেকে বলেন, এটি এসেছে আফ্রিকানস ভাষার Weit (অর্থাৎ Wide) কথাটি থেকে কিন্তু কেউ কেউ বলেন, চওড়া বোঝাতে হলে Breit কথাটি ব্যবহার করা হত।

পরদিন সকালে সূর্যোদয়ের পরেই ডাইনিং-ড্রইং রুমে গেলাম। ধীরে জমায়েত হচ্ছেন ট্যুরিস্টরা। একটু চা খেয়ে, ব্রেকফাস্টের আগেই একটা গেম ড্রাইভ। এখন একটু ঠান্ডা ভাব আছে, এগিয়ে গেলাম চায়ের টেবিলে। ট্যুরিস্টরা নিচ্ছেন চা বা কফি, আমি চাইলাম রুইবস— রেডবুশ গাছের পাতার নির্যাস। এটি খুব উপকারী। চা বা রুইবসের সঙ্গে বড় এক টুকরো চকোলেট কেক। গেম ড্রাইভের পর ব্রেকফাস্ট, তা-ও এলাহি ব্যাপার, বিকেলে হাই টিও দারুণ, এছাড়া লাঞ্চ আর ডিনার তো আছেই। ট্যুরিস্টদের খাওয়াতে ওস্তাদ সুখুদুর কর্মচারীরা।

আলা এসে পাখিদের জন্য খাদ্য দিয়ে গেলেন। বিরাট এক ঝাঁক হলুদ ঠুঁটি ধনেশ, কিছু লাল ঠুঁটি ধনেশ, আরও কয়েক প্রজাতির পাখি উড়ে এল। বেশ কয়েকটি সচিত্র আফ্রিকার পাখি বিষয়ক বই রয়েছে। এগুলি থেকেই পাওয়া যায় অনেক পাখির পরিচয়। কিন্তু আলা-র পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এই মহিলা ছোটবেলায় সাইবেরিয়ায় বন্দী ছিলেন। পোল্যান্ডে তার পরিবার প্রথমে নাৎসিদের বিষনজরে পড়েন, তারপর রাশিয়ায় তাদের পাঠানো হয়। মহাযুদ্ধের শেষে তাঁদের কতজন বেঁচে ছিলেন, সে প্রশ্ন তুলিনি, সেই ভয়াবহ স্মৃতি উসকে দিতে চাইনি। শেষ পর্যন্ত আফ্রিকায় এসে সামেন্সের গৃহিণী হলেন তিনি। এখন তাঁর ছেলে সামেন্স সুখুদুর কর্ণধার। জীবনে অনেক উত্থান-পতনের সাক্ষী এই মহিলা বললেন, 'সাধারণ অতি দরিদ্র চোরাশিকারিদের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। তাদের ক্ষুধার্ত স্ত্রী-পুত্রদের খাওয়াবার জন্য তারা মরিয়া। সে অবস্থায় থাকলে আমিও তো তাই করতাম। প্রাণীহত্যার কথা যদি তোলো, উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, বাঁচতে হলে অন্যের প্রাণ হরণ করতে হয়। এটাই তো নিয়ম।'

আজ গাইডদের পরামর্শে প্রথম চলে গেলাম ব্লাইডে রিভার ক্যানিয়ন ও পটহোলস-এ। দুজন ব্রিটিশ ট্যুরিস্ট ওদিকে যাচ্ছেন, এ সুযোগ হয়তো আর পাওয়া যাবে না। ব্লাইডে নদী গিরিখাতে প্রবাহিত, এক জায়গায় ক্যানিয়নের মতো তৈরি হয়েছে। খুব নরম পাথরের ওপর দিয়ে প্রবাহের ফলে, পাথর ক্ষয়ে গিয়ে

আশ্চর্য রকমের সব গর্ত হয়েছে শিলা চত্বরে, এটাই পটহোলস। এই প্রাকৃতিক দৃশ্যটি দেখা আমার উপরিপাওনা। বিকেলের গেম ড্রাইভে সিংহ প্রজনন কেন্দ্র। এখন যাচ্ছি অন্য ট্যুরিস্টদের সঙ্গে কিন্তু পরে যখনই সম্ভব, ম্যানেজার রস বা আফ্রিকি কর্মচারী ল্যামসন আমাকে নিয়ে গেছেন এই কেন্দ্রে। প্রচুর পর্যবেক্ষণ করা গেছে, সাধারণ চিড়িয়াখানা থেকে অনেক বেশি প্রাকৃতিক পরিবেশে।

আজ ডিনারে ছিল নিয়াশা অ্যান্টিলোপের মাংস। এ-ও বেশ সুন্দর দেখতে ডোরাকাটা অ্যান্টিলোপ। ওজন ৫৫-১২৭ কেজি। স্ত্রী ও বাচ্চা নিয়াশা প্রায় লাল রঙের, আর তাতে উজ্জ্বল সাদা ডোরা। এরা পুরুষদের চেয়ে বেশি সুন্দর, অবশ্য শিংয়ের বাহার নেই। এগুলি দেখেছি এ বছর গামেলা রিজার্ভে।

আজ রাতে ডিনারের পর আর একটা গেম ড্রাইভ। একটা হর্নড আউল তার উজ্জ্বল ব্রাউন রঙের দুটি চোখ দিয়ে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। স্পটলাইটের আলোয় দেখলাম। এই পেঁচার কয়েকটি পালক শিং বা কানের মতো খাড়া হয়ে থাকে, তাই নাম হর্নড আউল। এদেশেও আছে। তারপর এক লহমার জন্য একটি লেপার্ড। দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। সে রাতে একটি আফ্রিকান বনবেড়ালও দেখেছি। এই প্রাণীটি আমাদের গৃহপালিত বেড়ালের পূর্বপুরুষ। এই জংলি বেড়াল বাচ্চাবেলায় ধরতে পারলে পোষ মানে। আফ্রিকায় এমন পোষা বেড়ালের সঙ্গে সঙ্গম করে জংলি বেড়াল তৈরি হয়। সংকর প্রাণী। নামিবিয়াতে দেখেছি। ফেরার আগে গাছের ওপর একটি জেনেট-কে লক্ষ করে আলো ফেললেন ক্রিস, চোখ ছাড়া আর কিছুই বোঝা গেল না।

১৫ অক্টোবর সকালবেলা ঘুম ভাঙল কাচের জানালায় টোকায়। বুঝলাম রস বা ক্রিস এসেছেন মর্নিং ড্রাইভের জন্য জাগাতে। আসছি, উঠছি বলে উঠে দেখি কেউ নেই। কোথায় রস বা ক্রিস? আবার টোকা। দেখ কাণ্ড, একটি লাল ঠুঁটি হর্নবিল (ধনেশ) পাখি কাচের ওপর নিজের প্রতিবিম্ব দেখে ঠোকর মারছে! এই মজার ব্যাপারটা পরেও ঘটেছে, কখনও মানুষের টোকা, কখনও হর্নবিলের।

আলা-র বার্ড টেবিলের কাছে ১০-১২টি লাল ঠুঁটি ধনেশ এসে বসে আছে। একটু পরে খাদ্য, প্রধানত নানারকম কাটা ফল দেওয়া হল। মস্ত এক ঝাঁক পাখি যেন হামলে পড়ল। বেশিরভাগ হলুদ ঠুঁটি হর্নবিল, আর গ্লসি স্টার্লিং। এছাড়া লম্বা লেজ সাদা-কালো শ্রাইক (পায়েড শ্রাইক), কমলা ঠোঁট উইডোফিঞ্চ। বসে বসেই বই দেখে অচেনা পাখিগুলিও চিনতে পারলাম। আর এক প্রজাতির পাখি টুরাকো— এদেশে বলে লুরি।

আজ গেম ড্রাইভে দেখলাম বুনো মোষ, একটি ছোট জলাতে দুটি জলহস্তী, একটি কুমির। ষাটের দশকে উগান্ডায় ভিক্টোরিয়া নাইলের ধারে পায়ে হেঁটে দেখেছি শত শত হিপো আর কুমির, তখন ওখানে মাইল প্রতি দেড়শো মতো কুমির আর ওই সংখ্যার হিপো ছিল। জাইরের রুইন্দি নদীতে হিপো ছিল আটাশ হাজারের মতো। মনে হয় হিপোর পিঠে পিঠে পা ফেলে ছোট নদীটি পার হওয়া

যাবে। কয়েকটি জিরাফও চোখে পড়ল। খরার সময় তৃণভোজী প্রাণীদের লুসার্ন ইত্যাদি ঘাস বা খড় খেতে দেওয়া হয়, কতকটা চিড়িয়াখানার মতো। আমার ওয়াটার বাক কটেজের সামনে, গেম ড্রাইভের সময় অনেক জায়গাতেই দেখি শুকনো গাছপালা। একাসিয়া বাবলা গাছগুলি নিস্পন্দ, সাদা কাঁটাগুলি কঙ্কালের হাড়ের মতো। বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন— ওদেশে রুদ্র বৈশাখ আসবে জানুয়ারিতে, কারণ অঞ্চলটা বিষুবরেখার অনেক দক্ষিণে বুশভেল্ডে গ্রীষ্ম বড়ই নিষ্ঠুর ঋতু। দু-এক দিন দু-এক পশলা বৃষ্টি হতেই ভোজবাজির মতো সবুজ পত্রকোড়কে ছেয়ে গেল একাসিয়া আর নবথর্ন গাছগুলি। নবথর্নে ফুলও ফুটল দু-চারদিনের মধ্যেই।

এখানে লায়ন ব্রিডিং সেন্টারে এ পর্যন্ত প্রায় তিনশোটি সিংহ-সিংহীর জন্ম হয়েছে। এদের নিয়ে কী করা হয়? সামেন্সের বক্তব্য, বর্তমানে আফ্রিকায় মাত্র ১৫-২০,০০০ সিংহ রয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় মাত্র ২,৫০০-এর মতো। বিখ্যাত ক্রুগার পার্কের অনেক সিংহ টিবি রোগের শিকার। তৃণভোজী প্রাণীদের থেকেই ছড়িয়ে পড়েছে এই রোগ। আমরা সুস্বাস্থ্যবান সিংহের স্টক রাখছি, এখান থেকে পার্কে বা রিজার্ভে আমরা সিংহ দিতে পারি। কোনও কোনও ব্যক্তিগত রিজার্ভে সুখুদু থেকে সিংহ-সিংহী বিক্রি হয়েছে। মাত্র একটি সিংহীকে শিশু অবস্থা থেকে বড় করে তুলে এখানেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, আরেকটি বন্যসিংহের সঙ্গে। তারা নিজেরা শিকার ধরে খেতে শিখেছিল। এরা আবার শাবকদের জন্ম দিয়েছিল। তাদের একটিকে মা-বাবার সঙ্গেই থাকতে দেওয়া হয়, অন্যগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায়, পরে সারা পৃথিবীতেই টি টি পড়ে গেল, ক্যানড লায়নের খবর পাওয়ার পর। বেশ কিছু খুব ধনী বিদেশি এসে এক ধরনের সিংহ শিকার করেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। এই সব বিকৃত-রুচির শিকারি ছোট এনক্লোজারে এমনকী খাঁচায় রাখা সিংহ গুলি করে মারে। পরে নিজেদের দেশের বাড়িতে সেই সিংহের চামড়া ট্যানড করে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে, হয়তোবা বন্ধু বান্ধবদের বলে বেড়ায়, সিংহ-শিকারে তারা কত বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। এই সব শিকারিদের জন্য অনেকে সিংহ প্রজনন করছে।

আজ সন্ধ্যার পর গেম ড্রাইভে দেখলাম বিখ্যাত বিষাক্ত গেছো সাপ— বুমস্লাং। একটা উঁচু ডালে সবজেটে একটা সাপ। সবুজ রঙ দেখে বোঝা যায় সাপটি পুরুষ, স্ত্রী বুমস্লাং ব্রাউন বা বাদামি।

আজ আবার ডিনারে উটপাখির মাংস, সঙ্গে গাজর ও পেঁয়াজ। একটা বাচ্চা শেয়াল (ব্ল্যাক ব্যাকড জ্যাক্যাল) আশপাশে ডাকছে। এটি প্রায়ই মানুষের খুব কাছে চলে আসে। বেশি রাতে কটেজ থেকে স্পটেড হাইনা বা হায়েনার ডাকও আজ শুনেছি।

১৬ অক্টোবর সিংহ প্রজনন কেন্দ্রে গিয়ে দেখি, এখানকার চার নম্বর হাতিটি সিংহদের এনক্লোজার এক জায়গায় ভেঙে ফেলেছে। একটি সিংহ বাইরে

পালিয়েছে। এই হাতিটি, নাম তার টেম্বা, দুষ্টুমির জন্য বিখ্যাত। ও আগে ছোট স্ত্রী হাতিটিকে ঠেলে দিত বিদ্যুৎ সংযুক্ত বেড়ার ওপর। হস্তীবালিকা শক খেয়ে চেঁচিয়ে উঠত। এতেই টেম্বার আনন্দ। এর থেকেই তার বুদ্ধি, কুবুদ্ধি এবং কৌতুকপ্রিয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সিংহদের খাবার দেওয়ার সময় দেখা গেল পালিয়ে যাওয়া সিংহটি ঠিক ফিরে এসেছে!

আজ জেব্রা, জিরাফ, ওয়ার্ট হগ আর ওয়াটার বাক দেখেছি, এছাড়া ছিল কুডু। প্যাঁচানো শিঙের জন্য এই অ্যান্টিলোপ অতি বিখ্যাত, গায়ে ডোরাও আছে। নামিবিয়া আর এখানে দেখেছি বড় জাতের গ্রেটার কুডু। ১৭০-২৬০ কেজি ওজন হতে পারে।

আজ দু জাতের একাসিয়া দেখলাম, এদের বড় মোটা কাঁটার মধ্যে বাসা বাঁধে কিছু পোকা। কেনিয়াতে অন্য প্রজাতির বাবলা কাঁটা ও পতঙ্গের সহাবস্থান নিয়ে গবেষণা করেছি।

আজ রাতে ডিনারে ছিল নু বা উইল্ডবিস্টের মাংস, ভালোই তার স্বাদ। দু জাতের নু আছে, ব্লু আর ব্ল্যাক।

প্রথমটাই বেশি দেখা যায়, এখানেও এই প্রজাতিটিই রয়েছে। এদের ওজন ১৮০-২৭০ কেজি।

নানা দেশ, প্রধানত ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে ট্যুরিস্টরা আসেন, আর কিছু দক্ষিণ আফ্রিকি শ্বেতাঙ্গ। একজন ব্রিটিশ মহিলাকে একটু গর্বের সুরেই বলেছিলাম, আমি ১৩ বার আফ্রিকায় এসেছি। উনি একটু মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'আমি এসেছি ৩১ বার।' প্রতি বছর অন্তত বার দুই আসেন।

একদিন এক ফরাসী ভদ্রমহিলা সবাইকে ডেকে জানিয়ে দিলেন— ওই দেখুন ওই টেবিলে বসে আছে টিপি! তার মানে? তখন জানলাম ইউরোপীয় টিভিতে খুবই পরিচিত এই টিপি— Tippy of Africa; খুবই অল্প বয়স থেকে টিপি আফ্রিকার দুর্গম বনে জঙ্গলে বন্যপ্রাণীর কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন স্কুল ছুটির সময় ফ্রান্স থেকে একটি দলের সঙ্গে এসেছে। দেখলাম একটু লম্বাটে একজন স্কুলের মেয়ে, মুখে নিষ্পাপ কিশোরীর অভিব্যক্তি। লম্বা সোনালি চুলের ঢল নেমেছে ঘাড়ে, পিঠে। এদের দলটি সামেন্সের ব্যক্তিগত অতিথিবর্গ। এদের দুজন, একটি পুরুষ ও একটি মহিলা ওয়াইল্ড লাইফ ফিল্মের প্রোডিউসার ও ডিরেক্টার। মহিলাটি ভারতে গির অভয়ারণ্যে এসেছিলেন, মাইক পাণ্ডের একটি ফিল্মের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। সিংহের কেশর নিয়ে কী করছি, ওরা জানতে চাইলেন।

বাঘ, সিংহ, বেড়াল এরা সবাই মূত্রনালী দিয়ে পিচকারির মতো একটি গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ ছিটিয়ে দেয়। এর সাহায্যে এরা নানা বার্তা আদান-প্রদান করে। বার্তাগুলি গন্ধযুক্ত অণু। সিংহ অনেক সময় পিচকারি মারার আগে মাথা ঘষে গাছের কাণ্ডে। বছর চল্লিশেক আগে এক বিজ্ঞানী এ বিষয়ে তথ্য দিয়ে বলেছিলেন

কেশর বা মাথার লোমও হয়তো এ ধরনের রাসায়নিক সঙ্কেত রেখে যায়। এ বিষয়ে কোনও গবেষণা হয়নি। ওই কালো কেশর আর এবছর (২০০৫) সংগ্রহ করা টিম্বাজাতি-র বিখ্যাত সাদা সিংহের কেশর বিশ্লেষণ করে আমি আর মৌসুমী পোদ্দার সরকার কিছু রাসায়নিক পেয়েছি, এগুলি ওই ধরনের বার্তা হওয়া সম্ভব।

২৫ অক্টোবর আমি সিংহের কেশর সংগ্রহ করতে গেলাম। সিংহেরা মাথা ঘষে বেড়ার গায়ে, আর অনেক সময় সেখানে একটু কেশর লেগে থাকে। ম্যানেজার রস বললেন, এভাবে কেশর সংগ্রহ করতে সময় লাগছে, কাঁচি দিয়ে একবারেই কেটে নেওয়া যাবে। আফ্রিকি কর্মচারী ল্যামসন কেটে নিতে পারবে। বড় কাঁচি কোথায়? এক কর্মচারিণী হিল্ডা (শ্বেতাঙ্গিনী) নিলেন কাঁচি যোগাড়ের ভার। এক গুচ্ছ আঙুর তুলে প্লেটে নিচ্ছি, হিল্ডা অনুযোগ করলেন, এত কম কেন? নিজেই একটা বড় গুচ্ছ তুলে দিলেন প্লেটে। ঠিক হল ল্যামসন হিল্ডার বাড়ি থেকে বড় কাঁচি নিয়ে বিকেল সাড়ে চারটেয় আমাকে নিয়ে যাবেন কৃষ্ণকেশরী সিংহ শুম্বার কাছে। সিংহীরা কালো, বড় কেশর খুব পছন্দ করে। শৌর্য-বীর্যে ভরা সিংহের বেশি কালো ও লম্বা কেশর থাকে।

আজ সকালের গেম ড্রাইভে শুনলাম চিন স্পট বাটি পাখির সুন্দর শিস। চিনিয়ে দিলেন গাইড গ্যারেথ। পর পর তিনটি শিস দেয় এ পাখি। জেব্রা, ওয়াটার বাক আর ওয়ার্ট হগ দেখলাম। আর ছিল এক দল মোষ, সঙ্গে কয়েকটি বাচ্চা বা বাছুর।

ঠিক সময়ে কাঁচি নিয়ে ল্যামসন হাজির। বেড়ার ধারে শুম্বা এলে ল্যামসন এগিয়ে দিলেন একটি জলের বোতল, উল্টো করে ধরে। শুম্বা জল খেতে শুরু করল, ল্যামসন এক গুচ্ছ কালো কেশর কেটে নিলেন অন্য হাতে। লোমগুলি সঙ্গে সঙ্গে এনভেলাপে ভরে সিল করে দিলাম। তারপর ৬টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলাম সিংহদের, মিনিট ধরে ধরে নোট করলাম তাদের আচার-আচরণ। দেখেছি সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের পর এরা বেশি অলস হয়ে পড়ে, ছায়াতে বিশ্রাম নেয়, আর বিকেল পাঁচটা নাগাদ আবার আলস্য ঝেড়ে ফেলে।

আজ রাতে আবার অস্ট্রিচের খানা। পৌনে নটা নাগাদ কটেজ থেকে শুনি দুটি সিংহীর গর্জন। মা ও মেয়ে মিলে যে যূথটি তৈরি করেছে সে যূথের গর্জন। এরা এই পাঁচ হাজার হেক্টর এলাকায় শিকার ধরে খায়। সিংহটি ইলেক্ট্রিক ফেন্স ভেঙে চলে যায় পাশের রিজার্ভে।

এর মধ্যে গ্যারেথের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে দিনের আলোতে দেখেছি এক মজার পেঁচা প্রজাতি। গ্যারেথ বললেন, পার্ল স্পটেড আউলেট। বিরাট প্রজাতির পেঁচা। পার্ল স্পটেড পেঁচার মাথার পিছন দিকে, পালকে, কতগুলি চিহ্ন আছে, সেগুলি একজোড়া চোখ বলে ভুল হয়। আর, এই পেঁচাটির ডাক বড় মিষ্টি, পেঁচার ডাক বলে মনেই হয় না।

সুখুদুতে একটি পোষা চিতা আছে, সে নিজেও শিকার ধরে খায়। একদিন সজারু দেখার জন্য রাত ৯টার সময় আমাদের দু-তিনজনকে নিয়ে গেলেন হিল্ডা।

রাতের পর রাত রান্নাঘরের উচ্ছিষ্ট খাদ্য বাইরে রেখে দিয়ে সজারুদের সহজেই আকৃষ্ট করা যায়। আমরা দরজার আলোতে ঘরে ঢুকে অন্ধকার ঘর পেরিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকলাম। সামনেই এক ফালি নিচু বারান্দা। একটু পরে হিল্ডা পর্দা সরিয়ে দিলেন, টর্চের আলোয় দেখি অপূর্ব দৃশ্য। চারটি মস্ত সাইজের সজারু, তাদের কাঁটাগুলি ময়ূরের পেখমের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ছোট আকারের দুটি ব্ল্যাক ব্যাকড শেয়াল আরও দূরে, মধ্যে মধ্যে তারা বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো বারান্দায় উঠে একটু খাদ্য নিয়েই ছুটে যাচ্ছে।

এখানে অনেক উইটিবি আছে, কিছু পরিত্যক্ত। আর্ডভার্ক (পিপীলিকাভুক) এই টিবিতে গর্ত করে থাকে, অনেক উই খেয়ে ফেলে। আর্ডভার্ক চলে গেলে পিঁপড়েরা এসে বাকি উইগুলিকে শেষ করে দেয়। পরিত্যক্ত, ভগ্ন, এই মাটির কেল্লায় আশ্রয় নেয় নানা প্রাণী। ডোয়ার্ফ মনগুজ অর্থাৎ বেঁটে বা ছোট আকারের এক প্রজাতির বেজি আছে এখানে। এরাও থাকে পরিত্যক্ত উই টিবিতে। জার্মানিতে বন্দিদশায় থেকে, আর কেনিয়াতে স্বাভাবিক পরিবেশে ১৫ বছর পর্যবেক্ষণ করে রাসা নামের এক বিজ্ঞানী এদের নিয়ে অসাধারণ একটি বই লিখেছেন। এই মহিলার গবেষণা থেকেই আমরা জানলাম এই বেজির পরিবারে স্নেহ মমতা, পারস্পরিক সাহায্যের মান মানুষেরই মতো, শিম্পাঞ্জি বা হাতির থেকেও বেশি। একমাত্র মানুষের সঙ্গেই এই বেজি পরিবারের তুলনা চলে।

২৯ অক্টোবর। অতি সামান্য বৃষ্টিতেই আমার ঘরের সামনে নবথর্ন কাঁটাগাছ ফুলে ভরে গেছে। আজ গেম ড্রাইভে দেখি সেই মা-মেয়ের সিংহীযূথ একটি ইল্যান্ড শিকার করেছে। ইল্যান্ড আফ্রিকার বৃহত্তম অ্যান্টিলোপ। হেমিংওয়ের লেখাতে ইল্যান্ডের উল্লেখ আছে এভাবে— গরুর আকারের প্রাণী যা খরগোশের মতো লাফায়। এই বিখ্যাত লেখক আফ্রিকায় শিকারি জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইল্যান্ডের ওজন ৯১০ কেজি পর্যন্ত দেখা গেছে।

দুপুরে, বিকেলে, অনেক প্রাণী দেখলাম। আজ রাতে দুর্যোগ আরম্ভ হল।

৩০ অক্টোবর। সোয়েটার, উইন্ডচিটার গায়ে দিয়েও ঠক ঠক করে কাঁপছি। দুদিন আগেও তাপমাত্রা দুপুরের দিকে ছিল ৪০-৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফরাসি ফিল্ম প্রোডিউসার আর ডিরেক্টর সামেন্সের ব্যক্তিগত বৈঠকখানায় আগুন জ্বালিয়ে বসে আছেন। আজ সিংহদের ওপর শেষ পর্যবেক্ষণ করলাম, আরেকটু বেলায়। বিকেলের দিকে আবার দারুণ ঠান্ডা। গেম ড্রাইভে বেরলাম না, রুকস্যাক ইত্যাদি প্যাক করে নিলাম। আজ রাতে লেড টুর্স-এর গাড়ি আসবে। কাল ভোরের আলো ফোটার আগেই যাত্রা, জোহানেসবার্গ-মুম্বাই ফ্লাইট ধরতে হবে।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

হাভানার মৃতের শহর

শোভন সোম

মেট্রোপলিস, অ্যাক্রোপলিস, নেক্রো-পলিস শব্দগুলির সঙ্গে আমরা মোটামুটি গ্রিক ইতিহাসের সূত্রে অল্পবিস্তর পরিচিত। গ্রিক মেতের বা সংস্কৃত মাতৃ এবং গ্রিক পলিস বা শহর, এই দুই শব্দ মিলিয়ে তৈরি জোড়কলম শব্দ মেট্রোপলিস শব্দের প্রকৃত অর্থ জননী নগরী বা রাষ্ট্রের রাজধানী বা প্রধান শহর। গ্রিক আক্রোস শব্দের অর্থ উঁচু, শীর্ষবিন্দু বা চুড়ো। বলা বাহুল্য, প্রাচীনকালে মন্দির হত শহরের সব চেয়ে উঁচু বাড়ি। দূর থেকে শহরের আর কিছু দেখা না গেলেও মন্দিরের চুড়ো দেখা যেত। এখনও ইউরোপ আমেরিকার পুরনো শহরে শহরের প্রধান গির্জের সামনে খোলা বড় প্রাঙ্গণ দেখা যায়, যাকে সিটি সেন্টার বা প্লাজা বলে। অ্যাক্রোপলিস মন্দিরকেন্দ্রিক শহরাঞ্চল বোঝায়। কিন্তু নেক্রোপালিস কী এবং তা আদৌ আছে কি না, এ বিষয়ে আমারও সংশয় ছিল। গ্রিক নেক্রোস শব্দের অর্থ মৃত। নেক্রোপলিস বলতে তাই মৃতের শহর বোঝায়।

আমরা যে দেশটাকে কিউবা বলি সে দেশকে স্থানীয় মানুষ বলেন কুবা। সমাজতন্ত্রী দেশ হবার আগে রাষ্ট্রধর্ম ছিল রোমান ক্যাথলিক। রোমানদের যেমন একেক শহরের একেকজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী থাকতেন তেমনই রোমান ক্যাথলিকরাও একেকটি শহরে একেকজন সন্তের নামে প্রধান গির্জে তৈরি করতেন। কুবার রাজধানীকে আমরা ইংরিজি উচ্চারণে হাভানা বলে থাকি। স্প্যানিশ উচ্চারণে সেটা লাবানা, বা লা আবানা অর্থাৎ মহিলা সন্ত আবানা এবং তাঁরই নামে রাজধানীর এই নামকরণ।

ভারত থেকে ভ্রমণকারী নানা দেশে যান, কিন্তু কুবায় যান না। ওখানকার চিকিৎসাব্যবস্থা নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে সর্বোত্তম, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও, এবং বলা বাহুল্য আমি যখন গিয়েছিলাম তখন চিকিৎসা হত নিখরচায়। আমি লাবানার হোসে মার্তি বিমানবন্দরে অভিবাসনের কাগজপত্র দাখিল করতেই আমার হাতে একটা কার্ড ধরিয়ে বলা হয়েছিল, আমি অসুস্থ হলেই যেন এটা দেখাই, তাহলে আমার নিখরচায় চিকিৎসা হবে। পৃথিবীর আর কোনও দেশে এ ব্যবস্থা আছে কিনা জানা নেই। ইতালির ভিসা পাবার শর্ত হিসেবে আমাকে স্বাস্থ্যবিমা করাতে হয়েছিল। কুবায় পৃথিবীর বহু দেশের মানুষ নানা দুরারোগ্য

অসুখের চিকিৎসা করাতে যান। ভারতীয়রা যাঁন না বললে চলে। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন। কুবায় পর্যটকেরা স্বাগত তবে তাঁদের সরকারি প্রতিনিধির মাধ্যমে সেখানে হোটেলে থাকার ও ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হয়। এছাড়া শীতের দিনে ঝাঁকে ঝাঁকে মার্কিন, ক্যানাডিয়ান ও স্বচ্ছল ইউরোপীয় দেশের ভ্রমণকারীরা সমুদ্রতটে রোদ পোহাতে আসেন। ওঁদের জন্য সংরক্ষিত হোটেল, সংরক্ষিত সমুদ্রতট ও ক্যাবারে সহ নানা বিনোদনের ব্যবস্থা আছে। ওঁরা সাধারণত ওইসব সংরক্ষিত স্থানে আতিথ্য গ্রহণের পর বিমান বোঝাই হয়ে ফের দেশে ফিরে যান।

লাবানা উঁচু নিচু শহর। অতি পরিচ্ছন্ন, অতি সুন্দর এবং শীতে গ্রীষ্মে তাপমাত্রার হেরফের প্রায় নেই। দেশটা গরমও নয়, ঠান্ডাও নয়, বলতে গেলে আরামপ্রদ। আমি গিয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অধ্যাপক-বিনিময় প্রকল্পে লাবানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি অব ফিলোজফির হিস্ট্রি অব আর্ট পড়াতে পাঁচ সপ্তাহের জন্য। সরকারি অতিথি হিসেবে যাবার দরুন আতিথ্যে যেমন খামতি ছিল না, দেশ ঘোরানোতেও সরকার কসুর করেননি। আমি কোথায় কী দেখব, তার একটা তালিকাও আমাকে দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ক্রিস্তোবাল কোলোন দেখতে যাবার কথাও লেখা ছিল। স্প্যানিশে ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে ক্রিস্তোবাল কোলোন বলে।

ক্রিস্তোবাল কোলোনে যাবার সময় বলা হয়েছিল যে জায়গাটা লাবানা শহরের প্রধান অঞ্চল ভেদাদো-র পশ্চিমে এবং শহরেরই মধ্যে। কিন্তু ক্রিস্তোবাল কোলোন যে কী সেটা জানলাম অধ্যাপিকা লুর্দেজ রডরিগেজ ও আমার দোভাষি মারিয়ার কাছ থেকে গুইয়া তুরিস্তিকা বা ট্যুরিস্ট গাইড পেয়ে। ক্রিস্তোবাল কোলোন একটি নেক্রোপলিস বা শহরপ্রতিম কবরখানা। প্রাচীন ইতালি গ্রিস পশ্চিম এশিয়ায় যেমন প্রাকারবেষ্টিত তোরণ সমন্বিত নগর হত, লাবানার ক্রিস্তোবাল কোলোনও তেমনই একটি প্রাকারবেষ্টিত, নগরদ্বার সহ বেশ বড়সড় শহর। এই শহরে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, রাস্তার আলো, রাস্তার নম্বর, বিশেষ বিশেষ নির্দেশ সবই রয়েছে। নেই কেবল জীবিত কোনও মানুষ। কারণ এই মৃতের শহরে সুন্দর সুন্দর যত ঘরবাড়ি সবই কোনও না কোনও পরিবারের কেনা সমাধি। এই সমাধিতে অনেক নিচু থেকে পরপর নীচে ওপরে কফিনে পরিবারের মৃতদের কবর দেওয়া হচ্ছে। ঘরবাড়ি ছাড়াও আছে সুদৃশ্য সব মূর্তি সহ সমাধি।

আমেরিকান মহাদেশের শহরগুলিতে মূলত রাস্তার নাম থাকে না, রাস্তাগুলো সংখ্যা দিয়ে পরিচিত। তেমনই লাবানা শহরের বারো ও তেইশ সংখ্যক রাস্তার কোনাকুনি এই ক্রিস্তোবাল কোলোন উনিশ শতকের মাঝামাঝি তাৎকালীন শাসকেরা তৈরি করেন। তখন কুবা ছিল স্পেনের উপনিবেশ। ঔপনিবেশিক শাসকেরা নিজেদের সমাধিকে মহিমান্বিত করার অভিপ্রায়ে এই নেক্রোপলিসের পরিকল্পনা করেছিলেন। ফলে উনিশ শতকীয় স্প্যানিশ শিল্পরীতির সমাধি থেকে বিপ্লবোত্তর শিল্পরীতির সমাধি এখানে রয়েছে। রয়েছে স্পেনের ভাস্করদের রচনা,

এমনকী কুবার আধুনিক ভাস্কর রীতা লোংগা-র ভাস্কর্য। এখানে শায়িত আছেন বহু বিখ্যাত ব্যক্তি। প্রাচীন যাবতীয় সমাধি, সমাধিগৃহ ইত্যাদি অধিকাংশই তৈরি হয়েছিল সাদা শ্বেতপাথরে। রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে কারুকার্যখচিত সমাধি তৈরির প্রবণতা রয়েছে। বিত্তবান ব্যক্তিরা মৃত্যুর আগেই নিজেদের সমাধিমন্দির তৈরির ব্যবস্থা করে যান। রেনেসাঁসের কালে পোপেরাও জীবিতাবস্থায় তাঁদের সমাধির জন্য বিখ্যাত ভাস্করদের দিয়ে নানা ভাস্কর্য তৈরি করিয়ে রাখতেন। কুবার ক্রিস্তোবাল কোলোনে ঔপনিবেশিক কাল থেকে বিপ্লবোত্তর কাল অবধি সমাধি শৈলির মধ্যেই সমাজ ও সময়ের ইতিহাস রয়েছে।

এর মধ্যে আমার উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে আঠারো শো একাত্তরে চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রদের বিদ্রোহে নিহতদের ভাস্কর্য সমন্বিত সমাধি, যেটি ঔপনিবেশিক সমাধির নিদর্শন। এটি সুউচ্চ ও শ্বেতপাথরে তৈরি। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সমাধিটি অভিনব। এটির ওপরে কেবল মাটির আচ্ছাদন রয়েছে। এখানে শায়িত উনিশ শো সাতান্নতে স্বৈরাচারী শাসক বাতিস্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নিহত ছাত্রেরা যাঁরা বাতিস্তার প্রাসাদে চড়াও হয়ে শহিদ হন। এই সমাধিতে শায়িত একুশজন শহিদের স্মৃতিতে একুশটি ধাতুদণ্ডে স্টেন্‌লেস স্টিলের পতাকা যেন বাতাসে উড্ডীন। এছাড়া ঔপনিবেশিক আমলে নৌবিদ্রোহের শহিদদের স্মৃতিতে নির্মিত সমাধি বস্তুত এক বৃহৎ প্রাসাদ।

ক্রিস্তোবাল কোলোনের শ্বেতপাথরের বিশাল বিশাল সব সমাধির মধ্যেই রয়েছে মৃত্যুর আবহ। যাঁরা নেই তাঁদের সমাধি অতি সযত্নে এখানে রক্ষিত এবং এই ক্রিস্তোবাল কোলোন কুবার অবশ্যদ্রষ্টব্য একটি স্থান।

কুবার সঙ্গে ভারতের সময়ের তফাত তেইশ ঘণ্টার। সব পকেটের উপযোগী হোটেল লাবানায় আছে। রয়েছে ভ্রমণকারীদের নিয়ে শহর ও দেশ দেখাবার ব্যবস্থা। লাবানায় বিচ নেই। এ শহরের সমুদ্রতট দেওয়াল দিয়ে বাঁধানো। লাবানায় যাবার বিমান পাওয়া যায় মাদ্রিদ, মস্কো, মেক্সিকো সিটি থেকে। লন্ডন থেকে মাদ্রিদ হয়ে মাদ্রিদ থেকে টানা দশ ঘণ্টার উড়ানে বারমুডা ট্রায়াঙ্গালের ওপর দিয়ে যাওয়া যায়। এ যাত্রায় বিমান থেকে বারমুডা ট্রায়াঙ্গাল দেখা এক অভিজ্ঞতা। মাদ্রিদ থেকে যায় ইবেরিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান। নিউইয়র্ক থেকে এয়ারো মেহিকো বা মেক্সিকান এয়ারলাইন্সে মেক্সিকো সিটিতে নেমে কুবানা বা কিউবান এয়ারলাইন্সে গেলে দুদিন মেক্সিকো সিটিতে স্টপওভার করা যায়। এই পথের বাড়তি লাভ মেক্সিকো দর্শন। কুবার আবহাওয়া এ দেশের মতো। তাই হালকা গরম কাপড়ই যথেষ্ট। ওদেশে আম, কৃষ্ণচূড়া সব গাছ যেমন আছে তেমনই আছে বিশালদেহী দীর্ঘজীবী বাওবাব গাছ। লাভানা দর্শনের আরও একটি লাভ এই যে, এই শহর যেমন মেট্রোপলিস, সেইসঙ্গে অ্যাক্রোপলিস এবং এখানে নেক্রোপলিসও আছে।

আর লাবানা দর্শনের উপরি লাভ বোদেইগিতা বারে যাওয়া। এখানে কিউবান

রাম দিয়ে তৈরি মোহিতো ও দাইকিরি উপভোগ করতে করতে স্প্যানিস সঙ্গীত শোনা যায়। গায়ক-বাদকেরা ওখানে সবসময় হাজির। বোদেইগিতার বিশেষত্ব এই যে, যে সব বিখ্যাত মানুষ এখানে এসেছেন তাঁরা সকলেই এর দেওয়ালে সই করে গেছেন। এঁদের মধ্যে চে গুয়েভারা আছেন, ফিদেল কাস্ত্রো আছেন, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে আছেন, আছেন হলিউডের বিখ্যাত তারকারা।

যাঁরা ঘরে বসে কিউবান মোহিতো উপভোগ করতে চান তাঁদের জন্য মোহিতো তৈরির প্রণালী জানাচ্ছি। আধগ্লাস সাদা কিউবান রামে সমপরিমাণ সোডা, দু-ফোঁটা বিটার বা পাতিলেবু রস, এক টুকরো লেবু আর সামান্য তাজা পুদিনা পাতা একটু কচলে, প্রয়োজনমতো দুকিউব বরফ সহ স্টারার দিয়ে নাড়িয়ে নাড়িয়ে খান। এই ককটেল লা-জবাব।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

সূর্যগ্রহণ এবং বেলুনে আফ্রিকা

অর্পিতা চক্রবর্তী

ছোটবেলায় 'চাঁদের পাহাড়' পড়বার পর থেকেই অনেকের মতো আমারও স্বপ্ন ছিল আফ্রিকায় যাবার। সেই স্বপ্ন সত্যি করার সুযোগ ২০০১ সালের জুন মাসে অপ্রত্যাশিতভাবেই আমার হাতে চলে এল।

একুশ শতকের প্রথম পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ পূর্ব আফ্রিকার দেশ জাম্বিয়া থেকে প্রত্যক্ষ করার জন্য কলকাতার আরও আটজন ব্যক্তির সঙ্গে রওনা হলাম। ১৫ জুন নাইরোবির সময় সকাল ৬টা ৩৮ মিনিটে বিমান নাইরোবির আন্তর্দেশীয় বিমানবন্দর স্পর্শ করল। সেখানে তখনও অন্ধকার।

পরদিন সকাল ৯টা নাগাদ জাম্বিয়ার একটি বিমানে লুসাকার উদ্দেশে যাত্রা করলাম। এক সময় বিমানের পাইলট ঘোষণা করলেন যে বিমান লেক ট্যাঙ্গানাইকার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। এর অন্তত ৪৫ মিনিট পরে বাঁদিক বরাবর একটি তুষারশুভ্র পর্বতশৃঙ্গ দেখলাম। বুঝলাম প্রত্যক্ষ করছি স্বপ্নের মাউন্ট কিলিমানজারোকে যা আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বত। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে জোহানেস রেবম্যান নামক এক জার্মান মিশনারি বিষুববৃত্তে এই তুষারশুভ্র পর্বতের কথা প্রথম ইউরোপবাসীকে জানান। দেখলাম ভোরের আলো তুষারাবৃত কিলিমানজারোর ওপর পড়ছে এবং পর্বতশৃঙ্গটি গলিত সোনার মতো চকচক করছে। এ এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য। মনে পড়ল কালজয়ী সাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের হৃদয়জয়ী উপন্যাস 'দ্য স্নোজ অব কিলিমানজারো'র কথা। বরফাবৃত কিলিমানজারোর অপার্থিব সৌন্দর্য ও ভুবনমোহিনী আবেদনের কথা ভাষায় প্রকাশ করা সত্যিই কঠিন।

লুসাকায় পৌঁছবার পরদিনই পৃথিবীর প্রশস্ততম ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত দেখবার জন্য লিভিংস্টোনের দিকে যাত্রা করলাম। বাস সময় নিল সাত ঘণ্টা। রাতে লিভিংস্টোনে থাকলাম। পরদিন সকালে একটি ওয়াটার প্রুফ অলওভার গায়ে চড়িয়ে পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক বিস্ময় ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত দর্শন করলাম। প্রায় এক মাইল চওড়া জাম্বেজি নদীর জল ওপর থেকে প্রায় ৩৫০ ফুট নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তার গগনভেদী গর্জনে দিগ্বিদিক দিশেহারা। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকের কথা কিছুই শোনা যায় না। প্রথমে নদীর একটি শাখা এক অপরিসর প্রপাত সৃষ্টি করেছে। এর নাম 'ডেভিলস ক্যাটারাক্ট'। একটু দূরে প্রধান জলপ্রপাত

বা মেইন ফলস। প্রবলবেগে জাম্বেজি নদীর জল নীচে পড়বার জন্য জলকণা ফোয়ারার মতো ওপরে উঠে আসছে এবং তা এক জলীয় ধোঁয়ার জাল বিস্তার করছে। এই জলীয় ধূম্রজাল বহুদূর থেকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই কারণে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের অপর নাম 'মোসি-ওয়া টুনিয়া' অর্থাৎ যে ধোঁয়া গর্জন করে। রামধনু দেখা যায় এই প্রপাতের জলে। যদিও আমরা তা দেখতে পাইনি। চারপাশের সমস্ত দর্শনার্থীর শরীর পিচকিরির মতো ভিজিয়ে দিচ্ছে এই জলপ্রপাতের জলকণা। আমিও তার অংশীদার হলাম। অনতিদূরে একটি বেলুনে চড়ে এই জলপ্রপাতের কালজয়ী সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করলাম। জলপ্রপাতের অপর পারে ঘন সবুজের সমাবেশ। তার মধ্য দিয়েও মাঝে মাঝে ছোট ছোট রামধনুর খেলা চলে। এক প্রান্তে স্যার ডেভিড লিভিংস্টোন মিউজিয়াম। তাতে তাঁর বিভিন্ন ব্যবহৃত জিনিসপত্র রাখা আছে। ১৮৫৫ সালে বিশ্বখ্যাত এই ব্রিটিশ অভিযাত্রী প্রথম আবিষ্কার করেন এই প্রপাতটিকে এবং পরে রানি ভিক্টোরিয়ার নামে এটি নামাঙ্কিত করা হয়। স্যার লিভিংস্টোন এর স্বর্গীয় সুষমার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "Scenes so beautiful that must be gaged on by Angles in their Flights"। কথাগুলির মাহাত্ম্য যেন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। এখানে ফলসের ওপর দিয়ে একটি হেলিকপ্টার রাইড দেওয়া হয়। এটির পোশাকি নাম Flight of Angles। আগে থেকে আসন সংরক্ষণ না করার জন্য এটির অনবদ্য অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হলাম।

সেইদিন বিকেলবেলা জাম্বেজি নদীতে লঞ্চে নৌকোবিহার করলাম। সেই প্রথম দেখলাম আফ্রিকার বিখ্যাত জলহস্তি। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় দেখলাম তাদের জলক্রীড়া। শুধু মাথা আর নাকের ওপরের অংশ দৃশ্যমান। মাঝে মাঝে তারা পিচকিরির মতো ওপরে জলের ফোয়ারা ছুড়ে দিচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে সর্বগ্রাসী হাঁ করছে। কিছুক্ষণ পরে নদীর পাশে শুকনো ডাঙায় উঠে আবার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা জলে নেমে পড়ছে। নজরও রাখছে লঞ্চগুলির দিকে। হিপো-অধ্যুষিত জাম্বেজি নদীর মধ্য দিয়ে আমরা লঞ্চবিহারে ব্যস্ত। একটু পরেই জাম্বেজি নদীতে সূর্যাস্ত। স্বর্গীয় সেই সৌন্দর্য। ফেরার পথে ওখানকার ন্যাশনাল পার্কের মধ্য দিয়ে গাড়িতে করে এলাম। সেখান দিয়ে আসবার সময়। এক জায়গায় একটা হাতির দেখা পাওয়া গেল। সে অবশ্য গাড়ির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্যুরিস্টদের অনুরোধে গাড়িকে হাতির কাছাকাছি দাঁড় করানো হল। তখন একদমই অন্ধকার নেমে এসেছে। গাড়ির হেডলাইটের আলোই সম্বল। সেই আলোয় ছবি তোলার মতো অবস্থা একদমই নেই। সেই অবস্থাতেই কিছু শ্বেতাঙ্গ পর্যটক হাতিটির ছবি ফ্ল্যাশ দিয়ে তুলতে আরম্ভ করল। বার বার ফ্ল্যাশের আলোয় হাতি গেল ক্ষেপে। সে সামনে ঘুরে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বৃংহণ তুলে গাড়ির দিকে তেড়ে আসে আর কি! গাড়ির চালক তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে সেখান থেকে আমাদের নিয়ে পালাল। তা না হলে আফ্রিকার উত্তেজিত বন্যহাতির তাড়া

সামলাতে আমাদের সবাইকে সেদিন খুবই বিপদে পড়তে হত।

আমরা লিভিংস্টোনে ছিলাম 'দ্য আলটিমেট' লজে। শহর থেকে বেশ দূরে। দক্ষিণ গোলার্ধের রাতের আকাশ আগে কখনও দেখিনি। তাই সেদিন রাত তিনটেয় উঠে কেয়ারটেকারকে অনুরোধ করলাম লজের বারান্দা ও গেটের আলোগুলি নিভিয়ে দিতে। আলো নেভাতেই বিষুবীয় রাতের আকাশের সৌন্দর্য যেন তার অনন্ত রহস্য নিয়ে আমাদের কাছে ধরা দিল। দেখলাম ছোট ম্যাজেলানিক ক্লাউড। ম্যাজেলানিক ক্লাউড হচ্ছে দুটি নীহারিকা বা নেবুলা যা খালি চোখে দেখা যায়। শুধু দক্ষিণ গোলার্ধ থেকেই এদের দেখা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে বড়টি আমরা দেখতে পাইনি। তবে ছোটটিও বড়ই সুন্দর। একটি সাদা মেঘের খণ্ডের মতো দেখতে। পুরো সাদাও নয়— নীলচে আভাযুক্ত এবং স্থির অর্থাৎ সাধারণ মেঘের মতো স্থান পরিবর্তন করে না। পৃথিবীর সবথেকে কাছের নীহারিকা অ্যান্ড্রোমিডা ও উজ্জ্বল লাল মঙ্গল গ্রহ এবং আলফা সেনটাউরির মতো নক্ষত্রও খালি চোখে অপূর্ব দৃশ্যমান হল। তারায় তারায় যেন আকাশ ভেঙে পড়বে মনে হচ্ছিল। আকাশে যেন তারার সমুদ্র। এরকম অসাধারণ নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশ আগে প্রায় দেখিইনি। লিভিংস্টোন থেকে ফিরে এলাম লুসাকায়। লুসাকা ঘুরে দেখলাম কিছুটা। দেখা হল লুসাকার সুপার মার্কেট মান্ডা হিল শপিং কমপ্লেক্স। দেখলাম কাবুওয়াটা কালচারাল সেন্টার। অনেকটা অবিন্যস্ত ও গ্রাম্য পরিবেশ বজায় রেখে এটি গড়ে তোলা হয়েছে। ওখানে স্থানীয় আদিবাসীদের হাতের কাজ, মুদ্রা, বিভিন্ন স্মারক বিক্রি হয়। একদিন এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটিতে জাম্বিয়ার বিভিন্ন লোকনৃত্য দেখানো হল। অসাধারণ সেই সব লোকনৃত্যের সম্ভার। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যুদ্ধ জয়ের গৌরবে 'এনগোমা' নৃত্য, উত্তর জাম্বিয়ার এমবেম্বা উপজাতিদের 'মুফুনকুটু' নৃত্য, বিবাহ উপলক্ষে মাচোঞ্চা নৃত্য, পূর্ব জাম্বিয়ার সৌহার্দ্য বিনিময়ের প্রতীক 'সাংগানি' নৃত্য ইত্যাদি। মন ভরে গেল এইসব নৃত্যসম্ভার দেখে। শেষে ছিল রণপা নৃত্য। রণপা নৃত্য পরিবেশন করার অর্থ হল লম্বা লম্বা শ্বেতাঙ্গ লোকেরা এসে তাদের দেশ দখল করে নিল। এটি একটি প্রতীকী নাচ। ওখানে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে শ্বেতাঙ্গরা 'মুজুংগু' (লাটসাহেব) এবং এশিয়রা 'মোইনা' (কিপটে) নামে পরিচিত। একটি বাড়িতে দেখেছিলাম অতিথিদের খাদ্য পরিবেশনের সময় একটি অল্পবয়সী জাম্বিয়ান পরিচারিকা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে খাবার পরিবেশন করছে। গৃহকর্তার বাড়িতে অতিথি এসেছে দেখে তাঁদেরও কর্তার সমান মর্যাদা দেওয়া কর্তব্য। তাঁদের সামনে পরিচারিকার উঠে না দাঁড়ানো তাঁদের প্রতি বিনয় দেখানোর প্রতীক। ঔপনিবেশিক প্রথার কিছু অবশিষ্ট আছে এখনও— এর থেকেই তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল। ওখানে চিকেনের একটি মেনু খুব প্রচলিত। সেটি হল চিকেন ব্রাই। অর্থাৎ চিকেনকে বড় বড় টুকরো করে সিদ্ধ করে নিয়ে পরে ভাজা হয়। আর খেয়েছি জাম্বেজি নদীর বড় বড় পাবদা ও ক্যাট ফিশ। বিশেষ করে পাবদা খুব সুস্বাদু।

এরপর চলে এল মহা প্রতীক্ষিত ২১ জুন, ২০০১। শতাব্দীর প্রথম পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের দিন। দুপুর ৩টে ১০ মিনিটে জাম্বিয়ার 'টেন মাইলস' নামক একটি জায়গা থেকে প্রকৃতির এক অনবদ্য ও অতুলনীয় সৌন্দর্যে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করলাম। করোনা, হীরের আংটি বা ডায়মন্ড রিং, শ্যাডো কলাম, শ্যাডো ব্যান্ড সবই প্রত্যক্ষ করলাম। পূর্ণগ্রাসের সময়সীমা ছিল ৩ মিনিট। সময়টুকু যে কোথা দিয়ে কেটে গেল তা বুঝতেও পারলাম না। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল যে জাম্বিয়া আসা সার্থক হয়েছে। অন্যান্য বহু বিদেশি পর্যটককেও দেখা গেল প্রকৃতির এই অনন্যসুন্দর রূপকে প্রত্যক্ষ করতে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল জাম্বিয়ার বড় বড় হোটেলগুলিতে এক বছর আগে থেকে নাসা, ইউরোস্পেস এজেন্সির বিভিন্ন কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীরা অগ্রিম বুকিং করিয়ে রেখেছেন। জাম্বিয়ার সরকারও সেই দেশের সাধারণ জনগণকে এই দুর্লভ ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য বহু আগে থেকেই জনসচেতনতা গড়ার কাজে উদ্যোগী হয়েছিল। সরকার থেকে ২১ জুন জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়েছিল।

২৪ জুন সকালবেলা আমাদের নাইরোবি থেকে সাফারি জিপ নিয়ে আম্বোসেলি ন্যাশনাল পার্কের উদ্দেশে যাত্রা করার কথা। ২৩ জুন তাই ফিরে এলাম নাইরোবি। ২৪ তারিখ সাফারিতে আমাদের সঙ্গী হল কনকর্ড সাফারির আফ্রিকান চালক জর্জ। এই সাফারি কোম্পানির কর্ণধার হলেন দিনা প্যাটেল নামে একজন গুজরাটি মহিলা। সাফারি জিপের ওপরের অংশ বা হুডটি দরকার মতো খোলা ও বন্ধ করা যায়। আম্বোসেলি ন্যাশনাল পার্ক বিখ্যাত তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য— যার সর্বক্ষণের সঙ্গী মাউন্ট কিলিমানজারো— এবং জগদ্বিখ্যাত আফ্রিকান হাতির জন্য। আফ্রিকান হাতি ভারতীয় হাতির তুলনায় আকারে বৃহত্তর, বিশাল কান এবং সর্বোপরি বৃহদাকারের গজদন্তের অধিকারী। স্ত্রী হাতিরও গজদন্ত থাকে। এই গজদন্ত হাতির পক্ষে অভিশাপও বটে। গজদন্ত আফ্রিকান হাতিকে দিয়েছে অনন্য সৌন্দর্য এবং এর জন্যই চোরাশিকারিদের হাতে কত যে হাতির প্রাণ গিয়েছে তা হিসাবের বাইরে। মনে হল যেন বিরাটকায় পর্বত চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। চালচলন একেবারে রাজার মতো। বিভিন্ন বয়সের হাতি জলায় শরীর ডুবিয়ে বিশ্রাম করছে, মাঝে মাঝে জলক্রীড়াও করছে। একদিকে দেখা যাচ্ছে তুষারাবৃত মাউন্ট কিলিমানজারো, অন্যদিকে তার পটভূমিকায় হাতিদের অবাধ বিচরণ। এরপর হঠাৎ ঝোপের মধ্যে দেখলাম স্পটেড হায়েনা। সতর্ক দৃষ্টিতে সে আমাদের ওপর নজর রাখছে। চলতে চলতে দেখলাম কিছু হস্তিযূথ। হঠাৎ পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল একটি গোল্ডেন ব্ল্যাক ব্যাক জ্যাকাল। সোনালি রঙের চামড়ার ঠিক পিঠের ওপরে কেউ যেন নীলচে-কালো গালিচার মতো চামড়া সেলাই করে বসিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ একটি গাছের ডালে দুটি টুর্যাকো পাখি বসে থাকতে দেখলাম। এই পাখিগুলিকে দেখতে খুবই সুন্দর। সূর্যাস্তের সময় পড়ন্ত সূর্যের গোলাপি আভা মাউন্ট

কিলিমানজারোর শিখরে এসে পড়ল। দেখে মনে হল বরফের আবরণে কেউ যেন সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে। মাউন্ট কিলিমানজারো যেন হোলি খেলায় মেতে উঠেছে।

সেই রাতে 'ওল টুকাই' লজে আফ্রিকার যোদ্ধা উপজাতি মাসাইদের একটি দল এসে তাদের নৃত্যগীত পরিবেশন করল। আলো-আঁধারি পরিবেশে তাদের এই নৃত্যগীত মনকে যেন এক রহস্যময় জগতে নিয়ে গেল। মাসাই উপজাতি এবং আফ্রিকান সিংহের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক একরকম কিংবদন্তি পর্যায়ের। তারা একে অপরের শক্তি সম্পর্কে অবগত। তাদের এই পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে মাসাইরা এক অপূর্ব নৃত্যকলা নিবেদন করল।

পরদিন আমরা লেক নকুরু চলে এলাম। পথে যেতে যেতে বহু জেব্রা, জিরাফ, ন্যু বা উইল্ডবিস্ট, কেপ বাফেলো দেখলাম। লেক নকুরু পৃথিবী বিখ্যাত তার অভিজাত দর্শন ফ্লেমিংগোর জন্য। একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলবেলা লেক নকুরু দর্শনে বেরিয়ে পড়লাম। লেক দূরের থেকে দৃশ্যমান হতেই দেখা গেল তার ওপরে এবং লেকের ধার ঘেঁসে অসংখ্য লাল এবং সাদা বিন্দু। সবই ফ্লেমিংগো। গাড়ি কাছে আসতেই ফ্লেমিংগোগুলি ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর হল। সাদা ও লাল রঙের এই পাখিগুলি যেন একপ্রকার নাচের ভঙ্গিমায় হেঁটে চলেছে। লম্বা গলা, লাল ঠোঁট, লাল বড় চোখ সব মিলিয়ে রাজকীয় সৌন্দর্যের অধিকারী এরা। এদের বিশাল বিশাল মিলিত দলকে দেখে মনে হচ্ছিল সমস্ত লেকে যেন আগুন জ্বলছে। 'ক্যারোটিন' পদার্থের জন্য ফ্লেমিংগোর ডানায় আছে আগুনে লাল রং। শুধু এদের দেখবার জন্যই এত দূরে এখানে আসা যায়। উড়ে যাওয়ার ভঙ্গিমাও রাজকীয়। লেকের ধারে প্রচুর গুয়ানো ডিপোসিট রয়েছে। ক্যালসিয়াম বা সমুদ্র লবণ এবং ফ্লেমিংগো ও অন্যান্য সামুদ্রিক পাখির মলের মিশ্রণে এই ডিপোসিট তৈরি হয়েছে যা দিয়ে উর্বর সারও তৈরি করা যায়। এছাড়া দেখলাম বিরাট বিরাট মারাবু স্টর্ক বা আফ্রিকান হাড়গিলা ও পেলিক্যান পাখির দল। কিছু মৃত ফ্লেমিংগোর দেহাবশেষ লেকের ধারে দেখা গেল। জর্জ বলল, শিকারি মারাবু স্টর্করা ফ্লেমিংগো মেরে খায়। এছাড়া লেকের তীরে প্রচুর ফ্লেমিংগোর লাল-সাদা রঙের পালক পড়ে থাকতে দেখলাম। বেশ কিছু স্মৃতি হিসাবে কুড়িয়ে নিলাম। ফ্লেমিংগো, পেলিক্যান এবং অন্যান্য সামুদ্রিক পাখির মিশ্রণ লেক নকুরুকে বর্ণময় করে যেন আমাদের সামনে হাজির করল।

২৬ জুন সকালবেলা আবার লেক নকুরু দেখে বিশ্ববিখ্যাত এবং বহু চর্চিত গেম পার্ক মাসাই মারার দিকে যাত্রা করলাম। সোয়াহিলি ভাষায় মারা শব্দের অর্থ স্থান আর মাসাইরা সেখানে বাস করে বলে অঞ্চলটির নাম 'মাসাই মারা'। পথে যেতে যেতে অসংখ্য আফ্রিকান বন্যপ্রাণী চোখে পড়ল। সাভানা তৃণভূমির বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রচুর জেব্রা, জিরাফ, উইল্ডবিস্ট, কেপ বাফেলো, উটপাখি ইত্যাদি। বুক সমান সাভানা তৃণভূমির প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে বিপদ। এই ঘাসের জঙ্গলেই দেহের রং মিলিয়ে কোথাও আত্মগোপন করে রয়েছে

আফ্রিকার মহারাজ সিংহ। ওত পেতে বসে রয়েছে শিকারের অপেক্ষায়। আমরা এগিয়ে যেতে থাকলাম সিংহ দেখার আশায়। কিন্তু দেখা মিলল না। জর্জের মুখেই শুনলাম এক ধরনের ভাইরাল অসুখের জন্য মাসাই মারার অনেক সিংহই মারা গেছে। শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এতদূর আফ্রিকায় এসেও সিংহ দেখতে পাব না। কী আর করা যাবে! বিভিন্ন রকম পাখি (হুপু, কারমিন বী-ইটার, বাবুই) দেখতে দেখতে এবং তাদের মধুর ধ্বনির মধ্য দিয়ে জঙ্গলের ভেতরে আরও অগ্রসর হলাম। হঠাৎ দেখলাম দূরে তিনটি হাতি এবং সঙ্গে একটি বাচ্চা। হস্তিশাবকটি সাভানার বিরাট ঘাসে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। একবার দেখলাম তিনটি জিরাফ এক ধরনের কাঁটাঝোপ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করছে। এক জায়গায় দেখলাম একটি জিরাফ বসে রয়েছে। দেখতে দেখতেই ঘণ্টাচারেকের মধ্যে পৌঁছলাম মাসাই মারায়। এসে উঠলাম 'মারা সিম্বা' (সিংহের অঞ্চল) লজে। খেয়ে উঠে একটু বিশ্রাম করে বিকেলে সাফারিতে বেরিয়ে আবার অনেক জানোয়ার দেখলাম। দূরে একটি আফ্রিকান গণ্ডার বা ব্ল্যাক রাইনো দেখা গেল ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছে। দূরে একটি পাহাড় নজরে পড়ল। পাহাড়টির আকৃতি দেখলে মনে হয় কোনও ব্যক্তি যেন চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। এই পাহাড়টির নাম 'ঘুমন্ত মাসাই' বা স্লিপিং মাসাই। সেদিনের মতো সাফারি শেষ করে পরের দিনের 'হট এয়ার বেলুন' যাত্রার খোঁজ নিলাম। ঠিক হল আমি এবং আমাদের দলের এক সহযাত্রী ও চিকিৎসক ডঃ শুভাশিস চন্দ পরদিন এই বিরল অভিজ্ঞতার সাক্ষী হব।

পরদিন অর্থাৎ ২৭ জুন তখনও অন্ধকার। সেই সময় বেলুন-সংস্থার গাড়ি এল আমাদের দুজনকে বেলুনযাত্রার নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য। আফ্রিকার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমরা গাড়ি করে এগিয়ে চললাম। একটু পরে গাড়ি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছল। এর পরে এল বেলুনের ক্যাপ্টেন কানাডার বিলওয়াড়ি এবং তাঁর স্টুয়ার্ড বা সাহায্যকারী হিসাবে আফ্রিকার ফিলিপ। তখন আমাদের মনে হচ্ছিল যে সত্যিই এক দুর্দান্ত ও বিরল অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে চলেছি। আমাদের সঙ্গে আরও দুজন জাপানি যাত্রী ছিলেন। একজন ভদ্রলোক এবং তার বাচ্চা মেয়ে। হঠাৎ দেখলাম একটি জিপগাড়ি এল। একটি বিশাল বেলুন তার দড়িদড়াসহ সেই খোলা জিপের পিছনের অংশের সঙ্গে আটকানো। বেলুনটিকে টানতে টানতে সেই জিপগাড়িটি এসে থামল। বেলুনটি মাটির ওপর শোওয়ানো অবস্থায় ছিল। বিরাট একটি পাখার সাহায্যে বেলুনটির মুখের মধ্যে হাওয়া ঢোকাতে আরম্ভ করল ফিলিপ। বেলুনটি আস্তে আস্তে ফুলতে আরম্ভ করল। বেলুনটি বেশ ভালো পরিমাণে স্ফীত হবার পর বেলুনটির মুখে বার্নার দিয়ে ভেতরকার হাওয়া গরম করতে আরম্ভ করা হল। বেলুনটির মুখ এবং বার্নারের অবস্থান সমান্তরালভাবে ছিল। কিছুক্ষণ ধরে ভেতরের হাওয়া গরম হবার পর আমরা বেলুনে চড়ে বসলাম। কারণ আরও বেশিক্ষণ হাওয়া গরম হলে বেলুন লঘুতর হয়ে আমরা চড়ে বসবার আগেই ওপরে উঠে যেত। বেলুনে

চড়বার ব্যাপারটিও অদ্ভুত। বেলুনের দুটি কক্ষ সামনে এবং দুটি পিছনে। আমাদের দুজনের জন্য নির্ধারিত হল পিছনের একটি কক্ষ। আরেকটিতে ছিল ফিলিপ। সামনের কক্ষ দুটির একটিতে ছিল পাইলটের কক্ষ এবং একটিতে বসবে জাপানি দুই যাত্রী। সামনের কক্ষ দুটি সোজা অবস্থাতেই ছিল, পিছনের দুটি মাটিতে আধশোয়া অবস্থায়। বেলুনে চড়বার আগে আমাদের এই মর্মে বন্ড সই করতে হল যে এই রাইডের সময় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে কোম্পানির কোনও দায়িত্ব থাকবে না। কারণ ৩,০০০ ফুট ওপরে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে প্যারাশ্যুটে করে লাফাতে হবে। তারপর ভাসতে ভাসতে জঙ্গলের কোন অংশে পড়ব তার কোনও হিসাব থাকবে না। আমরা পিছনের একটি কক্ষে উঠে আধশোয়া অবস্থায় কক্ষের সঙ্গে লাগানো একটি স্টিল রড দুহাত দিয়ে শক্ত করে ধরলাম। মনে হল আমরা যেন মহাকাশচারী। একটু পরেই মহাকাশে যাব। এবার আবার গরম হাওয়া বেলুনে পাম্প করা শুরু হল। বেলুনটি আরও হালকা হতে হতে এবার ওপরে উঠতে আরম্ভ করল। যার ফলে পিছনের কক্ষদুটি সোজা হয়ে গেল এবং আমরা তখন স্বাভাবিকভাবে বসতে পারলাম। তখন বেলুনের দড়িগুলি গাড়ির থেকে আলাদা করে কেটে দেওয়া হল। ফলে বেলুনটি এবার খুব দ্রুত ওপরে উঠতে লাগল। সামনের আরেকটি কক্ষে ছিল পাইলট বিলওয়াড়ি। বেলুনটি মাসাই মারার ওপরে উঠতে আরম্ভ করার সময় চারপাশের জেব্রা, জিরাফ, ন্যু বিস্মিত হয়ে এবং বার্নারের শব্দে পালাতে আরম্ভ করল। বাতাসের চাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফিলিপ বেলুনে গরম হাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করল। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি নীচে মাসাই মারার জমি ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র হতে আরম্ভ করেছে। সূর্য ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে মাসাই মারার জমি উদিত সূর্যের আলোয় লাল হয়ে উঠল। কী অপূর্ব সেই দৃশ্য। সূর্যোদয়ের সেই ছবি আমি সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা বন্দী করলাম। ক্রমাগত উঠতে উঠতে বেলুন ৩,০০০ ফুট ওপরে উঠে এল। আমরা উচ্চতাজনিত কারণে ঠান্ডা অনুভব করতে লাগলাম। বেলুন মাসাই মারার ওপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। মনে হল নীচে যেন বিরাট এক দাবার বোর্ড বসানো। প্রচুর জেব্রা, জিরাফ, ন্যু তাতে একদম ক্ষুদ্র আকারে চড়ে বেড়াচ্ছে। একদম ছবির মতো লাগছিল সব কিছু। আমাদের বেলুন এবার 'ঘুমন্ত মাসাই' পাহাড়ের ওপর দিয়ে যেতে লাগল। ওপর থেকে পাহাড়টাকে আরও সুন্দরভাবে বোঝা গেল, মনে হল সত্যিই যেন এক মাসাই ঘুমিয়ে রয়েছে। ওপর থেকে দেখলাম সর্পিলাকারে এঁকেবেঁকে চলেছে লেক ট্যাঙ্গানায়িকা থেকে বেরিয়ে আসা একটি প্রশাখা। সূক্ষ্ম নীল বর্ণ চুলের মতো লাগছিল সেটিকে। আস্তে আস্তে বেলুন আমাদের ট্যানজানিয়ার সীমানার কাছে নিয়ে এল। দেখলাম যে আফ্রিকার জন্তুদের বিখ্যাত মাইগ্রেশন শুরু হবার মুখে। বিশ্ববিখ্যাত সেরেঙ্গেটি থেকে ট্যানজানিয়ার সীমানা অতিক্রম করে অনেক কেপ বাফেলো, উইল্ডবিস্ট, জেব্রা, জিরাফ, কেনিয়ার মাসাই মারায় ঢুকছে। কী অসাধারণ অভিজ্ঞতা হল। এ বোধহয়

ভাষায় বর্ণনাতীত।

বেলুনে এক ঘণ্টা ভ্রমণের পর মাসাই মারার একটি স্থানে পাইলট বেলুনটি অবতরণ করালেন। মনে হল এক ঘণ্টা যেন নিমেষেই শেষ হয়ে গেল। এরপর পাইলট আমাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এরপর একটি ল্যান্ডরোভার জিপে ফিলিপ আমাদের এক ঘণ্টা মাসাই মারার অভয়ারণ্যে জিপ সাফারি করাল। দুপাশ খোলা এই জিপে বসে আফ্রিকার জঙ্গলে ভ্রমণ করার অভিজ্ঞতাই অন্যরকম। অনেক জন্তু-জানোয়ার বেশ কাছ থেকেই দেখা গেল। হঠাৎ দেখলাম জিপের সামনেই খোলা জায়গা থেকে দুটি আফ্রিকান দ্বিশৃঙ্গ গণ্ডার আমাদের লক্ষ করছে। ফিলিপের নির্দেশে একদম নিশ্চুপে তাদের লক্ষ করলাম। কারণ হঠাৎ বিরক্ত হলে তারা রেগে উঠতে পারে আর তখনই এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হবে। একটু পরে আবার দেখলাম দুটি ওয়ার্ট হগ বা বন্যশুয়োর, তার কিছুক্ষণ পরে আবার দুটি কেপ বাফেলো। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম একটি কেরানি পাখি বা সেক্রেটারি বার্ড মাটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই পাখি উড়তে পারে না। এর গায়ের রং সাদা, চোখের চারপাশটা লাল, মাথায় সামান্য ঝুঁটি ও পিছনে অল্প কিছুটা পুচ্ছ। এত সাজসজ্জার জন্য এর পোশাকি নাম সেক্রেটারি বার্ড। এছাড়া আরও নানারকম পাখি দেখলাম, কিন্তু সিংহ ও চিতা আবার হতাশ করল।

ফিরে এলাম লজে। বিকেলবেলা আবার সাফারি ভ্যানে বেরলাম মাসাই মারার জঙ্গলে। অন্যান্য বারের মতোই বিভিন্ন আফ্রিকান জীবজন্তু দেখলাম। হঠাৎ জর্জ আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অদূরে সাভানার জঙ্গলে রং মিলিয়ে বসে রয়েছে 'সিম্বা'। খুব ভালো করে তাকে দেখতে থাকলাম। সেই মুহূর্তে আমরা এবং আরও নানা দেশের পর্যটকরা পশুরাজের ছবি তোলা আরম্ভ করল। অন্তত ১৫০-১৬০টি ছবি উঠল সেই সিংহটির। লোকজন এবং এত ফটোগ্রাফির মধ্যেও কী নির্বিকার সে। বোঝা গেল এসবে সে পুরোপুরি অভ্যস্ত।

সেদিন বিকেলবেলা মারা সিম্বা লজে ফিরে আসবার পর টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হল। আমাদের ঘরের পিছনের দিকে নীচের মাটিতে একটি অগভীর খাড়ি ছিল। তার ওপরে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি একটি সেতু ছিল। আমি ব্যালকনিতে বসে আফ্রিকার বৃষ্টি উপভোগ করছিলাম। সেই খাঁড়ির তীরে একটি বিশাল কাঁচা মাংসখণ্ড (সম্ভবত গরু বা মোষের) রাখা ছিল। অনুমান করলাম লজের কোনও কর্মী ইচ্ছে করেই মাংসখণ্ডটা ওখানে রেখে গেছে। কী উদ্দেশ্য তা নিয়ে মনে মনে ভাবছি। হঠাৎ পাশের লাগোয়া ঝোপের মধ্যে থেকে একটি বেজি বেরিয়ে এসে ওই খণ্ডটির থেকে তার সাধ্যমতো বেশ কিছুটা খুবলে নিয়ে পালাল। হঠাৎ ওই অগভীর খাড়িটি থেকে একটি দৈত্যাকার কুমির ডাঙায় উঠে এল। ভারতীয় কুমিরের প্রায় দ্বিগুণ আয়তন তার। সেই মাংসখণ্ডটির প্রায় অর্ধেকটাই সে মুহূর্তে উদরস্থ করল। একটু পরেই কোথা থেকে আরেকটি কুমির চলে এল। গোধুলি

লগ্নে এবার শুরু হল সেই মাংসের অবশিষ্টাংশ সহকারে তাদের ভোজন। মনে হল সৃষ্টির আদিলগ্নে যেন তারা আমাকে পিছিয়ে নিয়ে গেছে। আমি যেন কোনও আদিম ও সর্বগ্রাসী সৃষ্টির আদিম মহাভোজ প্রত্যক্ষ করছি। এ এক ভয়ঙ্কর সুন্দর। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের মহাভোজ সম্পন্ন করে কুমিরদুটি ওই খাঁড়িপথেই আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। ধাতস্থ হতে আমার বেশ অনেকটা সময় লেগে গেল।

সেদিন রাতে খাবার পরে হোটেলের ব্যালকনিতে এসে বসলাম। পরদিনই আমরা রওনা হব নাইরোবির দিকে। ব্যালকনির আলোতে এক মায়াময় পরিবেশ তৈরি করেছে। বাতির চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে 'ডুডুস' (স্বোয়াহিলি ভাষায়) বা কীটপতঙ্গ।

পরদিন সকালবেলা প্রাতরাশ করে প্যাকড লাঞ্চ ও লটবহর নিয়ে নাইরোবির উদ্দেশে রওনা হলাম। যথারীতি বন্যজন্তু দেখতে দেখতে চলেছি। হঠাৎ দূরে দেখি এক অভিনব দৃশ্য। ২০টি জিরাফ সারিবদ্ধভাবে দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এরকম বিরল দৃশ্য দেখতে পেয়ে সত্যিই খুব পুলকিত হয়ে উঠলাম। আমাদের গাইড-কাম-চালক জর্জ বলল যে সে কুড়ি বছর আগে একসঙ্গে একরকম ৩৫টি জিরাফ দেখেছে। বিরল এবং একইসঙ্গে দারুণ মজার অভিজ্ঞতাও বটে। সন্ধ্যায় ফিরে এলাম নাইরোবি। নাইরোবি খুবই বিপজ্জনক জায়গা। সন্ধের পরে হোটেল থেকে একা বেরনো একেবারে অনুচিত। একা বেরোলেই সবকিছু ছিনতাই হয়ে যাবার প্রবল সম্ভাবনা। বেরলে দলবেঁধে বেরনো উচিত। নাইরোবির জাতীয় মিউজিয়ামটি দেখলাম। সেটিও দেখবার মতো।

শেষ হল আমার আফ্রিকা ভ্রমণ। বুক ভরে নিয়ে এলাম একরাশ অভিজ্ঞতা যার সুখস্মৃতি বহন করব সারাজীবন।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর, ২০০৪

বোর্নিওর আদিম জঙ্গলে

অর্পিতা চক্রবর্তী

২০০১ সালে পূর্ব আফ্রিকার জাম্বিয়ায় পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখতে যাই। এইজন্য আমায় যেতে হয়েছিল ইয়োলো ফিভার ইঞ্জেকশন নিতে। অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথে টিকা নিতে গিয়ে পরিচয় হয় অধ্যাপক রতনলাল ব্রহ্মচারীর সঙ্গে। উনি বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী। ১৫ বার আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়েছেন। ২০০১-এ যাচ্ছিলেন আমাজনে। প্রথম বাঙালি যিনি পার্বত্য গরিলা দেখেছেন। ডায়ান ফসির সঙ্গে পত্রমাধ্যমে তাঁর যোগাযোগ ছিল। প্রত্যক্ষ করেছেন কঙ্গোর বিখ্যাত নিবাগঙ্গো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। 'বর্নফ্রি'র লেখিকা বিশ্বখ্যাত জয় অ্যাডামসনের স্বামী জর্জ অ্যাডামসনের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন চারটি অমূল্য মাস। এছাড়াও আফ্রিকার জঙ্গলের আরও অসাধারণ সব অভিজ্ঞতা তাঁর ঝুলিতে। আমাজনের বিখ্যাত বৃক্ষ বাড়ি হোটেল অ্যারিআউ টাওয়ার্সে ছিলেন ১২ দিন।

যাই হোক ২০০১ সাল থেকে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সুফল মিলল ২০০৩ সালে। অ্যাডভেঞ্চার ইন্দোনেশিয়ার মাধ্যমে ঠিক হল যাওয়া হবে ২০০৩-এর মে মাসে। এই ট্যুরটির নাম ছিল ওরাংউটান অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর। কিন্তু বাদ সাধল মারণ রোগ সার্স। সার্সের প্রকোপ কমতেই ঠিক করলাম ২০০৩-এর জুলাই মাসে সেখানে যাব।

কলকাতা থেকে বোর্নিওর জঙ্গলে যেতে হয় বেশ ঘুরপথে। কলকাতা থেকে প্রথমে সিঙ্গাপুর, সেখান থেকে আবার বিমানে ঘণ্টা তিনেকের পথে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা। জাকার্তা থেকে আবার আকাশপথে ঘণ্টা আড়াইয়ের পথে সেমারাং। সেমারাং বিমানবন্দরে নেমে বাসে করে বিশ্বখ্যাত বৌদ্ধস্তূপ বোরোবুদুর যাওয়া যায়। ভাড়া মাত্র ২ মার্কিন ডলার। সময় লাগে ঘণ্টা দুয়েক। আগে জানা ছিল না, তাই যাওয়া হয়নি। এখনও সেই দুঃখ মন থেকে যায়নি। যতদিন না বোরোবুদুর দেখতে পাব, এই দুঃখ থাকবেই। সেমারাং থেকে আবার আকাশপথে পাংকালানবুন। পাংকালানবুন বিমানবন্দরে নেমে জিপে করে কিছুটা সড়ক পথে। তারপর জিপ থেকে নেমে সোজা ক্লটক বা রিভার বোটে ওঠা।

১৩ জুলাই ভোরবেলা রয়্যাল ব্রুনেইর বিমানে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। ঘণ্টা তিনেক পর পৌঁছলাম সিঙ্গাপুর। সেখান থেকে আমাদের জাকার্তা পৌঁছনোর কথা ছিল সেদিনই। কিন্তু সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে টিকিট কনফার্মড কিনা জানতে গিয়েই আমাদের মাথায় বজ্রপাত হল। জানা গেল, আমার টিকিট কনফার্মড নয় এবং ফেরার সময়কার মানে রিটার্ন টিকিট আমার ও প্রফেসরের কনফার্মড নয়। বিদেশে এইরকম বিপদজ্জনক পরিস্থিতি হলে যে কী অবস্থা হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। প্রফেসর আমাকে একা ফেলে যেতে পারলেন না। জাকার্তার বিমান তাঁকে ছাড়াই ছেড়ে গেল। সেদিনের ফ্লাইটে জাকার্তা যাবার সব আসনই ভর্তি। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে সিঙ্গাপুর থেকে জাকার্তা যাবার বিমানে সারা বছরই ভীষণ ভিড়। এটি আন্তর্জাতিক বিমানপথের অন্যতম ব্যস্ত রুট। সুতরাং এই পথ দিয়ে যাঁরা জাকার্তায় যাবেন তাঁরা বিমানের আসন অতি অবশ্যই অনেক আগে থেকে সংরক্ষিত করিয়ে যাবেন। এই বিমান ধরতে না পারার জন্য পরদিনও আমরা জাকার্তা থেকে সেমারাং এবং সেখান থেকে পাংকালানবুনের বিমান পেলাম না। সিঙ্গাপুর বিমান কর্তৃপক্ষ আমাদের এই চরম বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁরা ১৪ জুলাই খুব ভোরের একটি বিমানে আগের দিনের টিকিটে যাবার ব্যবস্থা করিয়ে দিলেন। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হল যে অধ্যাপক জাকার্তার বিমান নির্ধারিত দিনে না ধরার জন্য যে আসনটি খালি রইল তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ওরা তাঁকে ১০০ সিঙ্গাপুরিয়ান ডলার দিলেন। কেননা এত ভিড় যে যাত্রীসংখ্যার তুলনায় আসন কম। ওঁরা কারণ দেখালেন যে অধ্যাপক তাঁর নির্ধারিত আসন খালি করে দিয়ে ওঁদের উপকার করেছেন। ওই একটি বাড়তি আসনেরই অনুকূলে ওঁরা অপর কোনও একজন অপেক্ষমাণ যাত্রীর টিকিট কনফার্ম করাবেন। সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে বিনিদ্র রজনী কাটানোর পর পরদিন খুব ভোরের ফ্লাইটে আমরা জাকার্তার পথে রওনা দিলাম। তিন ঘণ্টা পরে জাকার্তা বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখি সেখানকার ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাডভেঞ্চার ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধি তরুণ যোগা আমাদের জন্য অপেক্ষারত, সঙ্গে একটি তরুণী, তার হাতে কোম্পানির ব্যানার। ওদের দেখে মনে হল হাতে স্বর্গ পেলাম। মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হতেই আমাকে মৃদু হেসে বলল যে ওর খুব নাচ শেখার শখ। আমি নাচ জানি কিনা আর জানলে ওকে শেখাব কিনা। যাই হোক, যোগা তখন আমাদের গাড়িতে তুলল। ওর নামটা হিন্দু নাম। ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে অনেকের নামের সঙ্গে ভারতীয় নামের মিল আছে। যাই হোক, গাড়ি সুহার্তো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছাড়িয়ে জাকার্তা শহরের দিকে এগোতে লাগল। বিশাল বিশাল বহুতল অট্টালিকা এবং বড় বড় রাজপথের শহর জাকার্তা। গাড়ি ছুটল হু হু করে। শহরটি সুন্দর এবং উন্নত। কিছুক্ষণ পরে জাকার্তার একটি আধুনিক হোটেলে এসে পৌঁছলাম। নাম হোটেল আইবিস ইন্টারন্যাশনাল। কিন্তু সেদিনের সেমারাং এবং পাংকালানবুন যাবার বিমান মিস করলাম। কারণ

সেমারাংয়ের বিমান সকালেই চলে গেছে। এই অবস্থায় আমাদের আবার প্রবল দুশ্চিন্তা হতে লাগল। ভাবলাম যোগা আমাদের জন্য সেই দুটি বিমানের আসন সংরক্ষণ করতে পারবে কি? আমাদের কলকাতার ট্র্যাভেল এজেন্ট ভয়েজার্স ক্লাব অ্যাডভেঞ্চার ইন্দোনেশিয়াকে এই মর্মে বার্তা পাঠাল যে যতদিন না আমরা পাংকালানবুন পৌঁছচ্ছি ততদিন আমরা জাকার্তায় থাকতে পারব। সেই কদিন থাকার ব্যয় বহন করবে ভয়েজার্স ক্লাব। এদিকে আমাদের এই হয়রানি ও চিন্তা থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি দেওয়ার জন্য অ্যাডভেঞ্চার ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকে ১৬ জুলাই বোগোর বটানিক্যাল গার্ডেন বা জাতীয় যাদুঘর দেখাবার প্রস্তাব দিল। এটি একটি সৌজন্যমূলক ভ্রমণ। এটি ইন্দোনেশিয়ার একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভ্রমণ সংস্থা। হলিউডের চিত্রাভিনেতা-নেত্রীদেরও এই রেনফরেস্ট ঘুরে দেখানোর ব্যবস্থা করে তারা। অধ্যাপক ঠিক করলেন বোগোর বটানিক্যাল গার্ডেন দেখতে যাবেন। আমিও রাজি হয়ে গেলাম।

১৬ জুলাই সকালে যোগা এল ওদের গাড়ি নিয়ে। শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে বোগোর বটানিক্যাল গার্ডেন। ডাচ আমলে বোগোরের নাম ছিল বুইতেনইয়োর্গ। দারুণ ছিমছাম রাজধানী শহর জাকার্তার বড় বড় রাজপথ ধরে গাড়ি চলতে লাগল। গোটা শহর জুড়ে অনেকগুলো ওভারব্রিজ। ফলে যানযটের সমস্যা অনেক কম। একসময় পৌঁছে গেলাম বোগোর জাতীয় উদ্যানে। ১৫,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ আছে এখানে। পৃথিবীর সব থেকে বড় ফুল অ্যামরফোফিলাস টিটেনাম-এর গাছ রয়েছে। তবে তখন ফুলটা ফোটেনি। দেখলাম লাল রঙের পাপড়ি বিন্যস্ত বড় র‍্যাকেট বল ফুল। দেখতে বড় বলের মতো। তাই এই নাম। ফুলটি দেখতে ভারি চিত্তাকর্ষক। এছাড়াও দেখা হল মারান্তি, রামবুটান (অতি সুস্বাদু ফলের গাছ) যার চারপাশে সবুজ পাতা এবং মাঝখানে কিছুটা লাল পাতার গুচ্ছ। এছাড়াও আছে কেয়াগাছ, বড় পাম বৃক্ষ এবং একটা ঘরে বেশ কিছু অর্কিডের একটি নয়নমনোহর সংগ্রহ। আর দেখলাম এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান বৃক্ষ ডুরিয়ান। তিন প্রজাতির ডুরিয়ান হয়। বোগোরে যেটি ছিল সেটির নাম ডুরিয়ান আকুটিফোলিয়া। ডুরিয়ানের ফল কাঁঠালের মতো। অপূর্ব তার স্বাদ। কিন্তু তীব্র দুর্গন্ধ। এই দুর্গন্ধের জন্য ইন্দোনেশিয়ার কিছু নামীদামি হোটেলে ডুরিয়ান ফল নিয়ে প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার জঙ্গলে ওরাংউটান, গিবন ও বিভিন্ন বাঁদর গোষ্ঠীর প্রিয় খাদ্য ডুরিয়ানের এই ফল। দূরে দেখলাম বোগোরের রাজপ্রাসাদ। বোগোরের পথে বড় রাস্তার ওপর এক জায়গায় দেখলাম প্রিন্স ডিপানেগোরোর মূর্তি। ইন্দোনেশিয়া যখন ডাচ অধিকৃত ছিল তখন এই প্রিন্সই ডাচদের উচ্ছেদ করতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সময়কাল ছিল ১৮২৫-১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ। যাই হোক, বোগোর দেখে ফিরলাম জাকার্তায়। এসে শুনলাম আমাদের বাকি দুটি বিমানের আসন সংরক্ষণ করা গেছে। অর্থাৎ আমরা আগামীকাল ১৭ জুলাই সেমারাং, পাংকালানবুন তথা

বোর্নিওর টানজুং পুটিং ন্যাশনাল পার্কের দিকে রওনা দিতে পারব। যোগা এই শুভ সংবাদ দিতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যোগাকে তখন দেখে দুনিয়ার সবচেয়ে উপকারী ব্যক্তি মনে হচ্ছিল।

বিপদ কাটায় এবার খাবারের কথায় আসি। জাকার্তায় থাকাকালীন খেলাম নাসি গোরেং, নাসি কুনিং ও নাসি উদুক। তিনটে তিন রকমের ডিশ। কিন্তু ভাত সবেতেই। ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় নাসি শব্দের অর্থ ভাত। নাসি গোরেং ডিশে থাকে অল্প লাল সস দেওয়া বেশ অনেকটা ভাত, একটা ডিমের পোচ, কিছুটা স্যালাড এবং উড়েন স্টিকে আটকানো দুই পিস ভাজা চিকেন। নাসি কুনিং হল হলুদ বর্ণের ভাত। অনেকটা দেখতে আমাদের পোলাওয়ের মতো। নাসি উদুক নারকেলের জলে সিদ্ধ ভাত।

১৭ জুলাই সকালে যোগা তার গাড়ি নিয়ে এল। বিমানবন্দরে এসে যোগাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে এবং তখনকার মতো বিদায় দিয়ে সেমারাংগামী বিমানে উঠলাম। বিমানটি গরুড় এয়ারলাইন্সের। ঘণ্টা আড়াইয়ের কাছাকাছি যাত্রা। ঘণ্টা আড়াই পরে সেমারাং বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। বিমানবন্দরটি খুব সুন্দর। পাঁচিলের বাইরে নারকেল গাছের সারি। দেখলে অনেকটা কেরালার মতো লাগে। যথাসময়ে পাংকালানবুনের বিমান ছাড়ল। বেশ নিচ দিয়েই উড়ছিল। জানলা দিয়ে দেখি নীচে সুনীল জাভা সমুদ্র। মনে হল, ছোটবেলার সেই ভূগোল বই থেকে যেন উঠে এসেছে এই সমুদ্র। বিমান পৌঁছল। সময় লাগল ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। একটু হেঁটে টারম্যাকের বাইরে বেরতেই দেখলাম দুটি অল্পবয়সী ইন্দোনেশিয়ান ছেলে আমাদের উদ্দেশে হাত নাড়ছে। এদের একটি ছেলে এগিয়ে এসে অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করল যে তিনি রতনলাল ব্রহ্মচারী কিনা। উনি পরিচয় দিতেই সে আমাদের বলল যে তাঁর নাম ফেরি চন্দ্র এবং সে বোর্নিওর জঙ্গলে আমাদের ট্যুর গাইড। উঠলাম একটি জিপে। সঙ্গে ড্রাইভার। তার নাম নানাং। জিপ আমাদের নিয়ে এখানকার শেষ সড়কপথের ওপর দিয়ে যাত্রা শুরু করল। বুঝতে পারলাম গভীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। মিনিট কুড়ি যাবার পর জিপ থামল একটা নদীর পাড়ে। বুঝলাম সড়কপথের এখানেই শেষ। এবার জলপথের শুরু। জিপ থেকে নেমে দেখলাম নদীর ধারে অপেক্ষারত একটি ক্লটক (Klotk)। জলের ওপর দিয়ে নৌকো যাওয়ার সময় ইঞ্জিনের ক্লটক-ক্লটক শব্দ হয়। তাই এই ধরনের নৌকোর পোশাকি নাম 'ক্লটক'। এটি মোটরচালিত কাঠের নৌকো। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৬ মিটার ছ ২ মিটার, ওপরের ছাদই আপার ডেক। লোয়ার ডেক বোটের ভেতর। নৌকোর কেবিন নেই। নীচের এবং ওপরের ডেক লম্বায় ৩ মিটার ও চওড়ায় ২ মিটার। নৌকোর ক্যাপ্টেন, তার একজন সহকারী, একজন রাঁধুনি এবং একজন গাইড— মোট এই চারজন ইঞ্জিন রুম কাম রান্নাঘরে রাতে ঘুমত যা পর্যটকের নীচের শয়নকক্ষের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একটা স্লাইডিং দরজা বন্ধ করে দিলেই আর কোনও সম্পর্ক নেই। পুরো নৌকোতে

ওপর-নিচ মিলিয়ে ৪-৬ জন থাকতে পারে। ওপরের ডেকে অর্থাৎ নৌকোর ছাদে কাঠের ফ্রেম বসিয়ে তার ওপর টারপুলিন টাঙিয়ে রৌদ্র এবং বর্ষার হাত থেকে বাঁচা এবং রাতের বেলায় মশারি টাঙিয়ে শোয়া যায়। বোর্নিওর জঙ্গলে অবস্থিত টানজুং পুটিং ন্যাশনাল পার্কস্থিত ক্যাম্প লিকি দেখতে যে সব পর্যটক আসেন তাঁদের অধিকাংশই টানজুং হরাপান এলাকাস্থিত রিম্বা লজ থেকে যাতায়াত করেন, কেউ কেউ তিন-চারদিন ক্লটকে থাকেন। কিন্তু আমরাই প্রথম এতদিন (১৩ দিন) ক্লটকে থাকছি। আধুনিক সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্লটকে থাকা এবং রাতে হ্যারিকেনের আলোয় বসে খাওয়া এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। সঙ্গে রইল আদিম নিরক্ষীয় জঙ্গল-প্রকৃতির দৃশ্য এবং ধ্বনি। আমার মনে হয়েছিল প্রকৃতি যেন তার সব রং, রূপ উজাড় করে দিয়েছে। মনে হয়েছে যে এই মানবজন্ম সার্থক। যেটুকু কষ্ট হবে তা পূরণ করে দেবে নৌকোর ইন্দোনেশিয়ান গাইড তথা বাকি ক্রু-র অসাধারণ বন্ধুত্বপূর্ণ মিষ্টি ব্যবহার। ওরা পর্যটককে খুশি রাখতে এবং অতিরিক্ত সাহায্য করতে সর্বদাই তৎপর। একটি কাঠের পাটাতন ব্যবহার করে ক্লটকে উঠলাম। আগামী ১৩ দিন এই ক্লটকই হবে আমাদের ঘর, বাড়ি এবং ক্যাম্প লিকি ও তার চারপাশ আমাদের ভ্রমণক্ষেত্র। আমাদের এই নৌকোটির নাম হরপা মিনা-২ এবং আয়তনে বেশ ছোট। ফেরি বলল, হরপা মিনা-১ মেরামতের জন্য গেছে। সেটি কয়েকদিন পরে আসবে এবং আয়তনেও বড়। ক্লটকে উঠে অন্যান্য ক্রুর সঙ্গে পরিচয় হল। কিন্তু গাইড ফেরি ছাড়া অন্য কেউই ইংরিজি জানে না। এরা প্রত্যেকেই মুসলিম। ক্লটক যাত্রা করল বোর্নিও রেনফরেস্টের উদ্দেশে। যেখানে যাব সেটি হল মধ্য কালিমান্তানের অন্তর্গত বোর্নিও জঙ্গল। এই রেনফরেস্টটি সম্ভবত আমাজনের রেনফরেস্টের থেকেও কম আবিষ্কৃত।

সেকোনিয়ার নদীর বুক চিরে আমাদের যাত্রা শুরু। সেকোনিয়ার নদীর জল বছর কয়েক আগে পারদ-দূষিত হওয়ায় এখন পানের ও স্নানের অযোগ্য। নদীর দুই পাশে নীপা (গোলপাতা) ও প্যান্ডেনাসের (কেয়াগাছ) ঘন জঙ্গল। আমরা এগোতে থাকি এবং দুপাশে জঙ্গলের ঘনত্ব বাড়তে থাকে। চলতে চলতে একসময় মনে হতে থাকে যে আমি যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তের দিকে যাত্রা করেছি। এরপরে আর বোধহয় কিছুই থাকতে পারে না, কিছু থাকতে নেই, শুধুই অসীম, অপার মহাশূন্য ছাড়া। এত ঘন জঙ্গল এর আগে কখনও দেখিনি। আর উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি সেকোনিয়ারের হৃদয়।

সেকোনিয়ার নদীর এক পাশের জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে নদীর ধার ঘেষে কিছু বাড়ি নজরে এল। বাড়িগুলি কাঠের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে মাটি থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে। লোকের পরিবহণের মাধ্যম জলপথ। সেজন্য তারা ইঞ্জিন চালিত নৌকো বা স্পিডবোটের মাধ্যমে যাতায়াত করছে। S চিহ্নটি ব্যবহার করা হচ্ছে নদীর প্রবাহ কোথা দিয়ে গেছে তা বোঝাতে। কারণ জঙ্গল এত ঘন যে চিহ্ন না দিলে

বোঝার উপায় নেই দুপাশের জঙ্গলের কোন পথ দিয়ে নদী প্রবাহিত হচ্ছে। বাড়িগুলো থেকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাচ্চারা আমাদের দিকে হাত নাড়ছিল। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আমাদের প্রথম দিন রিম্বা লজে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু গোলমালে তিন দিন নষ্ট হওয়ায় রিম্বা লজে আরেকটিও অমূল্য দিন নষ্ট করলাম না। ঠিক হল ফেরার পথে একরাত থাকব। জুল নামক একটি ইন্দোনেশিয়ান ছেলে আমাদের ক্লুটকে উঠেছিল। হাতে একটা গিটার। উঠেই মন উদাস করা সঙ্গীতের সুর বাজাচ্ছিল। রেনফরেস্টের অল্প ভিতরে রিম্বা লজ আসতেই ও সেখানে নেমে গেল। সম্ভবত বিদেশি পর্যটকদের জন্য ও লজে গান গায়। রিম্বা লজ ছাড়িয়ে ক্লুটক এগিয়ে চলল ঘন জঙ্গলের দিকে। দুপাশে বিস্তৃত অরণ্যর শোভা। বন আরও ঘন হচ্ছে। বেলা পড়ে এল। সূর্যাস্তের পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে কেয়া ঝোপের বুক চিরে ক্লুটককে নোঙর করা হল। মাথার ওপর দেখলাম সন্ধ্যার আকাশে বেশ বড় আকৃতির দুটি বাদুর উড়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার নিরক্ষীয় রাতের আকাশে প্রচুর তারা দেখা গেল। তারার সমুদ্র আকাশে। রাত আরেকটু বাড়লে চাঁদ উঠল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সঙ্গে সীমাহীন নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে শুধু রাতচরা পাখির ডাক আর ঝিঁঝির গুনগুন। সন্ধ্যা নেমেছিল ৭টায়। ৭টা ৩০ মিনিট নাগাদ রাতের খাবার খেলাম হ্যারিকেনের আলোয়। রাতের খাবারে ছিল ভাত, নুডলস, চিকেনের টুকরো, সব্জি। এর পর থেকে দিনে, রাতে দুবেলাই একই খাদ্য। আমাদের খাবার সঙ্গী গাইড ফেরি। শুরু হল আধুনিক নগরসভ্যতা থেকে বহু দূরে বোর্নিওর জঙ্গলে আমাদের আগামী কয়েকদিনের জীবন। খাওয়া শেষ হলে নীচের ডেকে আমি শুতে গেলাম। অধ্যাপক রইলেন ওপরে। নীচের কেবিনটি খুবই অসুবিধাজনক, দাঁড়ানো যায় না। গরমও খুব। শরীরে প্রচণ্ড ক্লান্তি থাকা সত্ত্বেও ঘুম আসছিল না। রেনফরেস্টকে এত কাছাকাছি পাবার একটা অসীম তৃপ্তি মনকে ভরিয়ে তুলছিল। রাত আড়াইটে নাগাদ বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি এক স্বর্গীয় দৃশ্য— বোর্নিওর আদিম রেনফরেস্টে চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে। যেন একেবারে মায়াময় পরীর দেশে চলে গেছি। রাত ৩টেয় শেষপর্যন্ত ঘুম এল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি সূর্য উঠেছে। নীচের দিকে ঘন কুয়াশা রয়েছে। কাটতে সময় লাগবে। আজ এখান থেকেই ক্যাম্প লিকির দিকে আমাদের যাত্রা করতে হবে। ক্যাম্প লিকির আশপাশেই আমরা আগামী দিনগুলিতে থাকব। দূরে একটি উঁচু গাছের ওপর দেখলাম একটি ওরাংউটানের বাসা। বুঝতে পারলাম ওদের সাম্রাজ্যে এসে পড়েছি। এদের ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের জন্যই আমাদের এত দূর আসা। মালয়ী বা মালয়ান ভাষায় 'ওরাং' শব্দের অর্থ মানুষ এবং 'উটান' অর্থ বন অর্থাৎ বনমানুষ। গাছের ওপর যে বাসাটা দেখলাম তা পুরনো এবং ডালপাতা দিয়ে তৈরি। বাসাটি কোনও বয়স্ক ওরাংউটানের নয়। কারণ বয়স্করা গাছের অত ওপরে উঠতে পারে না। সম্ভবত এটি কোনও বাচ্চা বা

অপেক্ষাকৃত কমবয়সী কিশোর বা কিশোরীর। বাসাটি সম্ভবত পরিত্যক্ত। আবার গাইড ফেরির কথায় সেটি বাসযোগ্য হতেও পারে। কারণ দেখতে আপাত-পরিত্যক্ত, এরকম বাসাও তাদের ঘরবাড়ি। একটু পরে অনেক দূর থেকে ভেসে এল বোর্নিওর বিখ্যাত গিবনের ডাক যার পোশাকি নাম গিবনের সঙ্গীত। ক্যাম্প লিকির পথে চলতে চলতে একটি ফলস ঘড়িয়াল। ফলস ঘাভিয়ালও বলা হয় এদের। এরাও মেছো কুমির, তবে ঘড়িয়াল থেকে আলাদা এক প্রজাতি৷ ছোট ছোট ঘটপত্র বা কলসি গাছ দেখলাম। রাসাউ নামক কাঁঠালের মতো দেখতে এক ধরনের ফল দেখলাম। বেলা ১টা ৪০ নাগাদ ক্লটক থামল ক্যাম্প লিকির জেটির ধারে। এখানকার জল পরিষ্কার। কিন্তু জলে নেমে স্নান— নৈব নৈব চঃ। নদীর জেটি থেকে অপর পারের জঙ্গলের অল্প দূরত্ব আগে অনায়াসে সাঁতার কেটে পার হওয়া যেত। কিন্তু তখন কে জানত এই নদীতে অপেক্ষা করে আছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে একটি অল্পবয়সী ব্রিটিশ ছেলে জেটি থেকে নদীতে নেমে সাঁতার দিয়ে বিপরীত তীরে যাচ্ছিল। অপর পারে সে প্রায় যখন পৌঁছে গেছে ঠিক তখনই বিশাল এক নোনাজলের কুমির টেনে জঙ্গলে নিয়ে যায় ছেলেটিকে। এই ঘটনার পর থেকে লিকি নদীতে নেমে স্নান করা এবং গাইড ছাড়া জঙ্গলে একা ভ্রমণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। নদীর মাঝামাঝি জায়গায় দড়ি দিয়ে বাঁধা এক কাঠের তৈরি ডাগ আউট ক্যানো। ভেতরের বসার জায়গাটা ফাঁপা। নদীর ধারে এগুলি না রাখার কারণ হল ওরাংউটানের থেকে রক্ষা করা। এত সাবধানতা সত্ত্বেও শান্তি নেই। একদিন জেটির বেশ কাছে একটা ক্যানো কেউ রেখে গিয়েছিল। একটা ওরাংউটান হঠাৎ এসে যে দড়ি দিয়ে সেটি বাঁধা ছিল সেটিকে খুলে ক্যানো নিয়ে নদীতে ভেসে পড়ে আর কি! কাছাকাছি থাকা কিছু বনকর্মীর চিৎকারে সে তখনকার মতো পিঠটান দিল। এরা ভীষণ বুদ্ধিমান ও অনুকরণপ্রিয়। ক্যাম্প লিকি নদীর জেটি থেকে উঠে একটা কাঠের সেতুর ওপর দিয়ে বেশ অনেকটা হেঁটে যেতে হয়। ওই সেতুটির ওপর মাঝে মাঝে নানা বয়সী ওরাংউটান বসে থাকত। কেউ বসত মানুষের চলাচলের রাস্তা আটকে। অনেক সময় তাড়া দিলেও ওখান থেকে সরতে চাইত না। সামনেই একটা নোটিস বোর্ড। তাতে লেখা টানজুং পুটিং ন্যাশনাল পার্ক। বিপরীতে আরেকটি সাইন বোর্ড। তাতে ওরাংউটান সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়মাবলি লেখা। যেমন কোনও পর্যটক তাদের যেন খাদ্য না দেয়, নিরাপদ দূরত্বে থাকে, তাদের স্পর্শ না করে প্রভৃতি।

ক্যাম্প লিকির ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বলি। ১৯৭১ সালে ডক্টর বিরুতে গ্যালডিকাস বৃন্তামোর ও তাঁর তৎকালীন স্বামী রড বৃন্তামোর ওরাংউটানদের এই পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ডক্টর লুইস লিকির নামানুসারে এর নাম দেওয়া হয় ক্যাম্প লিকি। বহুবিখ্যাত 'লিকির তিন কন্যা'র অন্যতম এই ডক্টর বিরুতে গ্যালডিকাস। অন্য দুজন হলেন প্রখ্যাত পার্বত্য গরিলা বিশারদ প্রয়াতা ডায়ান ফসি এবং শিম্পাঞ্জি বিশারদ বিশ্বখ্যাত জীববিজ্ঞানী ডক্টর

জেনগুভ্যাল। উপরোক্ত দুজনের তুলনায় ডক্টর গ্যালডিকাস প্রচারের আলো থেকে বেশ অনেকটাই দূরে। আজ পর্যন্ত বিরুতে ও তাঁর সহকারী পর্যবেক্ষকরা ১ লক্ষ ঘণ্টারও বেশি ওরাংউটানদের পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ এখনও চলছে। ওঁর এই ওরাংউটান-নিবেদিত-প্রাণ এবং ফলস্বরূপ দিনের পর দিন সভ্যতা থেকে বহু দূরে জীবনযাপন ডক্টর রড বৃন্তামোর আর সহ্য করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত এই কারণে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। পরে ডক্টর বিরুতে তার ডায়াক (ওখানকার আদিবাসী) গাইডকে বিবাহ করেন। বিভিন্ন মহলে তাঁকে এই সিদ্ধান্তের জন্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি বলেছেন যে তাঁর বর্তমান স্বামী এই ডায়াক ব্যক্তিটি হয়তো লেখাপড়া জানে না, কিন্তু তার মধ্যে যে এক গভীর অন্তর্নিহিত জীবনদর্শন রয়েছে তা আজকের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে ভীষণ ভাবে অনুপস্থিত। বিনতি নামক একটি পুত্রও আছে বিরুতের। তাঁর প্রথমপক্ষের সন্তান। সেও বিবাহ করেছে একটি ডায়াক মহিলাকে। ক্যাম্প লিকির সবার কাছে বিরুতে 'ইবু' বলে পরিচিত। বাহাসা ইন্দোনেশিয়ায় ইবু শব্দের অর্থ 'মা'। অধ্যাপক আমাকে বলতেন যে বিরুতে ওঁর দিদি আর আমার ইবু। আমার দুর্ভাগ্য যে তাকে সামনাসামনি দেখতে পাইনি। একদিন দূর থেকে দেখেছিলাম। পরিচয় হলে আমিও তাঁকে ইবু বলেই সম্বোধন করতাম। কারণ তিনিই তো এই ক্যাম্প লিকির ওরাংউটানদের জননী। ফেরির কাছে জানা গেল যে এখানকার অধিকাংশ ওরাংউটানই বাচ্চা বেলায় পুনর্বাসিত। এখান থেকে ২৫০টি মতো ওরাংউটানকে আবার স্বাভাবিক মুক্ত বন্য পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ৫০টির মতো মানুষের সংস্পর্শে আসে। বাকিরা আর আসে না।

ক্যাম্প লিকির ওরাংউটানদের জন্য একটি খাদ্যকেন্দ্র আছে। প্রতিদিন বেলা আড়াইটে নাগাদ সেখানে তাদের খেতে দেওয়া হয়। বনচারী ওরাং নিজের খাদ্য নিজে খুঁজে নেয়। যদিও উপযুক্ত খাদ্য অপ্রতুল এতগুলো ওরাংউটানের পক্ষে। এখানকার পার্ক রেঞ্জারের নাম নুরি। জঙ্গলে প্রবেশের ঠিক আগে একটি ওরাংউটান ইনফরমেশন সেন্টার আছে। বিরুতে কিছু স্থানীয় ইন্দোনেশিয়ান যুবককে রেখেছেন রোজ ওরাংউটানদের খাদ্য সরবরাহের জন্য। সেইসব ছেলেরা তাদের পরিবার নিয়ে ক্যাম্প লিকির অল্প কিছুটা ভেতরেই ঘরবাড়ি বানিয়ে থাকে। বাড়িগুলি কাঠের তৈরি এবং পাটাতনগুলি খুঁটির ওপর অনেকটা উঁচুতে অবস্থিত। চালার মাথায় দুদিক থেকে দুটি কাঠের খণ্ড হর্নবিলের ডানার আদলে বসানো। এই নকশা ডায়াক কায়দায় তৈরি। ডায়াকদের শুভ চিহ্ন ধনেশ বা হর্নবিল পাখি। এখানে দেখলাম বেশ কিছু অল্পবয়সী ইউরোপীয় পর্যটকের এক দল। এখানে এরা স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করতে এসেছে সামার কলেজ ছুটির অবকাশে। ফিডিং স্টেশনে ওরাংউটানদের কলা, গুঁড়ো দুধ, আনারস, মাঝে মধ্যে অন্যান্য ফল এবং জল দেওয়া হয়। রেঞ্জার নুরি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ডাকতে

কুটাই প্রদেশের অন্তর্গত জঙ্গলে নদীর তট ঘেষে 'প্রশস্তি' মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গেছে। দেখে মনে হয়, মন্দিরের গায়ে সংস্কৃত লিপি খোদাই করা আছে। হতেও পারে, কারণ পুরাকালে ভারতীয় দেশান্তরিতের অন্যতম রাস্তা ছিল কালিমান্তান।

সেদিন সকাল ৯টা নাগাদ আমাদের অন্যতম রুটিন জাঙ্গল ট্রেক শুরু হল। ফেরির সঙ্গে জঙ্গলে হেঁটে হেঁটে গাছপালা চেনা। কারণ এখানকার বেশির ভাগ উদ্ভিদই আমাদের অপরিচিত। সেগুলো আমাদের চিনতে হবেই। এখানে হেক্টর প্রতি ২৪০ প্রজাতির বড় গাছ আছে। পাসাক বুমি একটি ছোট্ট চারাগাছের মতো দেখতে। 'পাসাক' শব্দের অর্থ কাঠের পেরেক। 'বুমি' কথাটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'ভূমি' থেকে। এই গাছের শিকড় ম্যালেরিয়ার ঔষধ হিসেবে বাজারে বিক্রি হয়। এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া হলেই এই গাছের শিকড় সিদ্ধ করে তার নির্যাস দিনে দুবার পান করতে হয়। ফেরি নিজে এটি প্রয়োগ করে ম্যালেরিয়া সারিয়েছে। শিকড়টি কাঁচা অবস্থায় সামান্য তেতো। কিন্তু এর নির্যাস অসম্ভব তিক্ত। বিশাল উঁচু উঁচু বৃক্ষরাজিতে জঙ্গল পরিপূর্ণ। বিকেলে ফিডিং স্টেশনে যাওয়ার পথে হঠাৎ ফেরির ইশারায় মাঝপথেই থামতে হল। দেখি সামনেই পথ রুদ্ধ করে তিনটি ওরাংউটান খেলা করছে। বড় দুটি স্ত্রী ওরাংউটান। একটি প্রিন্সেস যে গতকাল আমাদের পিছু নিয়েছিল এবং অপরটি প্রায় ২৭ বছর বয়সী সেসুউই। বাচ্চাটির বয়স ২ বছরের মতো। আশ্চর্য ব্যাপার যে দুটি প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ওরাং একসঙ্গে এক জায়গায় খেলায় মেতেছে। তারা একে অপরকে আলিঙ্গন করছে, একজন অপরজনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। সঙ্গের বাচ্চাটিও একেবারে দুজনের ওপরে শুয়ে পড়ছে। মাঝেমধ্যে সে দুজনের মাঝখানে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। জীববিজ্ঞানী ম্যাককিনন বন্য অবস্থায় পূর্ণবয়স্ক ওরাংউটানদের কখনওই সোসালাইজ করতে দেখেননি। এখানে দেখলাম অবস্থা অন্যরকম। হঠাৎ বাচ্চাটা পাশের একটা গাছে উঠে ডাল ধরে ঝুলে পড়ে নীচের মজা দেখতে লাগল। ওরা আমাদের চলার পথ রুদ্ধ করে এইসব কাণ্ডকারখানায় মেতেছে ফলে সামনের দিকে আর এগোতে পারছি না। এইসব দৃশ্য আমি তখন ক্যামেরায় বন্দী করছি। ফ্ল্যাশও ব্যবহার করতে পারছি না। যদি রেগে গিয়ে হুলুস্থুলু বাধিয়ে বসে। উত্তেজনার মাথায় খেয়ালও করিনি যে কখন তাদের খুব কাছে চলে গেছি। এই অবস্থায়, বিশেষত বাচ্চা যখন সঙ্গে, কোনও মানুষের পক্ষে তাদের এত কাছে যাওয়া খুব বিপজ্জনক। আমি সমানে ক্লিক ক্লিক শব্দে শাটার টিপে ছবি তুলে চলেছি। এইসব কিছু তাদের শান্তি অবশ্যই বিঘ্নিত করেছিল। হঠাৎ প্রিন্সেস পিছনের দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড গতিতে আমায় তাড়া করল। ফেরি আমায় সতর্ক করে বলল, 'মুভ ব্যাক'। আমি ভুল বুঝলাম। ভাবলাম ও বোধহয় আমাকে দৌড়ে পালাতে বলছে। আমি পিছন ফিরে ছুটলাম। এবং ছুটতে গিয়ে শক্ত জমির ওপর আছাড় খেয়ে পড়লাম। ফেরি কিন্তু না ছুটে প্রিন্সেসের দিকে মুখ করে দাঁড়াল এবং ছুটন্ত প্রিন্সেসকে জোড়ে জোড়ে 'স্টপ' বলে থামতে বলল। এই

কথায় প্রিন্সেস ফেরির ১ মিটারের মধ্যে এসে থেমে দাঁড়িয়ে গেল এবং পরে ফিরে গেল। ভুলটা আমারই। প্রথমত এত সামনে গিয়ে ফটো তোলা। দ্বিতীয়ত ও তাড়া করার সময় পিছন ফিরে ছোটার ভুল। কখনও তা করতে নেই। সবসময় এদের মুখোমুখি হয়ে পিছু হাঁটতে হয়। তা না করলে এরা আরও আক্রমণ করতে পারে। সেদিন এই সমস্ত ঘটনার জেরে আমরা ফিডিং স্টেশনে পৌঁছতে পারলাম না। ফেরার পথে ব্রিজে উঠে দেখি ব্রিজের মাঝখানের এক জায়গায় আমাদের চলার পথের অন্তরায় হয়ে একটি ওরাংউটান দাঁড়িয়ে আছে। ফেরি তাড়া দিতেই সেটি সরে গেল। এরা নিজেদের মতো থাকতে ভালোবাসে। বন্যরা তো মানুষের কাছে আসেই না। ক্যাম্প লিকির গুলো তাও পর্যটক দেখে অভ্যস্ত। তাও তাদের রাজ্যে মানুষের বেশিক্ষণের উপস্থিতি বিলকুল না-পসন্দ। তার প্রমাণ আমার উপরোক্ত ঘটনা। ফেরির কাছে শুনলাম একবার ক্যাম্প লিকিতে কিছু স্পেনীয় পর্যটক এসেছিল। তাদের একজন পূর্বতন রাজা কোশাশির খুব কাছে চলে যায়। কোশাশি প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে লোকটির হাতে কামড়ে দেয়। সন্ধেবেলা ক্লটকে ফিরে দেখলাম হাঁটু বেশ ফুলেছে ও ব্যথা।

২০ তারিখ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ব্যথা কম, তবে ফোলা রয়েছে। ঠিক করলাম সকালে জাঙ্গল ট্রেক ও বিকেলে ফিডিং স্টেশনে যাব না। ক্লটকেই বিশ্রাম নেব। প্রাতরাশ সেরে প্রকৃতির শোভা দেখছি, হঠাৎ কাছাকাছি শোনা গেল একটি অদ্ভুত ডাক। অনেকটা চী-পাক, চী-পাক— এই ধরনের। মন দিয়ে শুনতে শুনতে ভাবছি, কিসের ডাক হতে পারে? হঠাৎ আমার সামনে দেখি সেই ডাকের উৎস। দেখলাম একটি স্ত্রী ওরাংউটান এই ডাক ডাকছে। কোলে একটি বাচ্চা। কেয়াপাতার ঘন জঙ্গলে তাদের শরীরের বেশিরভাগ অংশই ঢাকা। কেয়াপাতা ছিঁড়ছে এবং তার মাংসল সাদা সুস্বাদু অংশ চিবিয়ে খাচ্ছে। দেখে বুঝলাম যে কেয়াপাতার এই সাদা অংশ এদের প্রিয় খাদ্য। আস্তে আস্তে জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে এসে বাচ্চা সহ আমাদের সামনে সে আত্মপ্রকাশ করল। জঙ্গলের একদম ধারে সে চলে এল। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে তার একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের ক্লটকে ওঠা এবং তারপর সমস্ত জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করা। ক্লটক জঙ্গলের ধারে কেয়াপাতার ধার ঘেঁসে নোঙর করা। কিন্তু ক্লটক ও জঙ্গলের মাঝামাঝি নদীর জল রয়েছে। এই অল্প জলটুকু ডিঙিয়ে বা জল ভেঙে আসতে সে অপারগ। সেইজন্য সে প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে পাক পাক শব্দ করছে। ছবি তুললাম। ভাগ্যিস ওই জলটুকু অন্তরায় ছিল। তা না হলে বোটে উঠে সে কী দক্ষযজ্ঞ বাঁধাত কে জানে! সকাল প্রায় ৮টা ১৫ মিনিট থেকে ৮টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত তার এই দুর্দান্ত অ্যাকশন চলল। ফেরি বলল যে এটি ক্যাম্প লিকির পুরনো কোনও ওরাংউটান। মানুষের সংস্পর্শে অনেকদিন ছিল। তাই এখন বন্য হলেও আমাদের এত কাছে চলে এসেছে। ৮টা ৫০ মিনিট নাগাদ তিনি বাচ্চাসহ বিদায় নিলেন।

সেদিন ক্লটকে বসে বসে গাইড ফেরির মুখে ডায়াক সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতি

সম্বন্ধে জানতে পারলাম। ফেরির বাবা একজন ডায়াক। ডায়াকরা আগে হেড হান্টার বা নরমুণ্ড শিকারি ছিল। এদের মধ্যে ইবান গোষ্ঠী ছিল খুব হিংস্র। নরমুণ্ড শিকারের শেষে সেগুলি তারা তাদের বাড়ির সামনে প্রদর্শন করত। সেই মুণ্ডগুলির সামনে নানা খাদ্য, পানীয় রাখা হত। না হলে সেগুলি ডায়াকদের জীবনে নানারকম অঘটন ও অনিষ্ট ঘটাবে এই বিশ্বাস ছিল। প্রায় ১৫০ বছর আগে ডায়াকদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মোড়লরা মিলিত হয়ে একটি চুক্তি বা 'ইকরা'র মাধ্যমে এই প্রথার অবসান ঘটায়। যদিও আজও মাঝে মধ্যেই এই নৃশংস প্রথার ঘটনা কানে আসে। এরা 'টেওয়া' নামে একটি উৎসব পালন করে। এটি হল বিভিন্ন প্রজাতির ফুল জলে মিশিয়ে সেই জল দিয়ে পূর্বপুরুষের হাড় শোধন করার উৎসব। এরজন্য সুগন্ধী ফুল নির্বাচিত করা হয়। সাত রকমের রং হতে হবে। কিন্তু ফুলগুলির অন্তত প্রতিটি জোড়া হতে হবে একটি রঙের। 'টেওয়া' উদ্‌যাপন খুবই ব্যয়সাধ্য। সবার পক্ষে সবসময় করে ওঠা সম্ভব নয়। কারণ যে পরিবার এটি পালন করে সেই পরিবারের পক্ষ থেকে সমস্ত গ্রামবাসীকে নিমন্ত্রণ জানাতে হয়। এক সপ্তাহ ধরে তাদের প্রত্যেককে ভাত, শুয়োর, ভাতের থেকে তৈরি মদ ইত্যাদি খাওয়াতে হয়। কিন্তু সব থেকে ভালো লাগল ডায়াকদের একটি প্রথার কথা শুনে। এদের সমাজে কেউ জন্মগ্রহণ করলে নৃত্যগীতের মাধ্যমে তা যেমন আনন্দময় করে তোলা হয়, কারও মৃত্যু হলেও সমানভাবে নৃত্যগীতের মাধ্যমে আনন্দ সহকারে মৃত ব্যক্তিকে বিদায় জানানো হয়। মৃতের পরিবার সেই নৃত্যগীত করে। এরা মনে করে জন্ম ও মৃত্যু জীবনের অঙ্গ। সুতরাং জন্মতেও আনন্দ, মৃত্যুতেও আনন্দ। মৃত্যুতে দুঃখের কিছু নেই। সুখে, দুঃখে অবিচল থাকো। মৃত্যুকে শোকের মুহূর্ত না করে নৃত্যগীতের মাধ্যমে আনন্দের মুহূর্ত করে তোলে তারা। রাতে মাঝে মাঝে প্যাঁচা ডাকত। ডায়াকরা প্যাঁচাকে বলে বুডুং হান্তু। ওদের ভাষায় 'বুডুং' অর্থ পাখি এবং 'হান্তু' অর্থ ভূত। অর্থাৎ ভূতপাখি। বিকেলে ক্যাম্প লিকির প্রবেশপথ সংলগ্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করলাম। কাছেই স্টাফদের বাড়িঘর। একটা বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় লক্ষ করলাম বাড়িতে কেউ নেই, দরজায় তালা মারা ও জানলা বন্ধ। কী ব্যাপার? বাড়িতে কেউ না থাকা সত্ত্বেও ভেতর থেকে প্রচণ্ড জোরে রেডিওর আওয়াজ আসছে কেন? জানা গেল যে রেডিও চললে ওরাংউটান ভাববে বাড়িতে কেউ না কেউ আছে। আর তা না করলে বুঝতে পারবে যে ঘরে লোক নেই। তখন জানলা ভেঙে ঘরে ঢুকে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করবে এবং জিনিসপত্র নিয়েও যেতে পারে। দুপুর নাগাদ আমাদের পূর্বনির্ধারিত ক্লটক 'হরপা মিনা-১' এল। আমরা তাতে উঠে গেলাম। ক্লটক বিকেলে জলের ধারে অনেকটা উন্মুক্ত এক তৃণভূমির পাড়ে ভিড়ল। দেখে বোঝাই যায় যে এই জায়গাটিতে নির্বিচারে জঙ্গল কেটে চাষের জমি বানানো হয়েছিল। এখন তা পরিত্যক্ত। ফেরি বলল যে ১৯৭১ সালের আগে এখানে স্থানীয় লোকজন এসে চাষের জমি তৈরি করছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে ডক্টর গ্যালডিকাস

এখানে এলেন। তিনি চাইলেন যে এটি শুধু সংরক্ষিত অরণ্যই হবে। ওঁর কথায় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল সুহার্তোর সেনাবাহিনী এসে লোকজনকে বিতাড়িত করে। কিন্তু চোরাগোপ্তা প্রবেশ সমানেই চলছে। এখানে প্রায় প্রতিদিনই আমাদের ক্লটক নোঙর করত। সূর্যাস্তের দৃশ্য এখান থেকে অপরূপ সুন্দর। মাঝে মধ্যে নৌকো যখন কেয়ার জঙ্গলের বুক চিরে নোঙর করত তখন রাত্রিবেলা কেয়াবন থেকে সাপ বেরিয়ে আমাদের ক্লটকে ওঠার খুবই সম্ভাবনা থাকত।

পরদিন বিরুতে ইবুর সঙ্গে আমার দেখা হল না। উনি আমাদের ক্লটকের সামনে দিয়ে স্পিডবোটে বেরিয়ে গেলেন। দূর থেকে তাঁকে দেখলাম।

আমরা রোজ সকাল ৯টা নাগাদ জাঙ্গল ট্রেকে বেরতাম। ফেরিকে দেখেছি জাঙ্গল ট্রেকে বেরিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। কারণ জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল জঙ্গলে জোঁক রয়েছে। আমাদের জোঁকে ধরলে সিগারেটের জ্বলন্ত অংশ জোঁকের ওপর ও চেপে ধরবে। ফলে জোঁক ছেড়ে যাবে। এছাড়াও মশা তাড়াবার জন্য সিগারেটের ধোঁয়া কার্যকরী। জাঙ্গল ট্রেকে বিভিন্ন উদ্ভিদ দেখেছি। এর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল সিম্পুর গাছ। বড়, চওড়া পাতা। বৃষ্টির সময় ওরাংউটান সিম্পুর পাতা ছাতার মতো মাথায় দিয়ে বৃষ্টির জল থেকে মাথা বাঁচায়। ঊনবিংশ শতকে রাসেল ওয়াসেল বোর্নিওয় এসে স্থানীয় ডায়াকদের মুখ থেকে এই কথা প্রথম শোনেন। বছর দুই-তিনেক আগে আমাদের গাইড ফেরি দুজন আমেরিকান ট্যুরিস্ট নিয়ে জঙ্গলে ঘুরছিল সেই সময় প্রবল বৃষ্টি নামে। তখন তারা দেখতে পায় যে কয়েকটি অল্পবয়সী ওরাংউটান একেকটি বিরাট সিম্পুর পাতা তাদের মাথার ওপর ছাতার মতো ঢেকে বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাচ্ছে। তখন আমেরিকান পর্যটকরা তাদের যার যার নিজের ছাতা মাথায় দিয়ে সেই ঘটনা ভিডিও ফিল্মে তুলে রাখে। সিম্পুর গাছে খুব সুন্দর ছোট ছোট হলুদ ফুল হয়। এছাড়া হল কারামুনটিং কোডাক বৃক্ষ। এর কচিপাতা কোনও ক্ষতস্থানের ওপর প্রলেপ হিসেবে লাগানো হয়। বিশাল সিন্দুর বৃক্ষ রয়েছে। এর ভেতরের লাল লঙের আঠালো নির্যাস থেকে প্রদীপের আলো জ্বালাবার তেল তৈরি হয়। আছে শশাঙ্কো নামক চারাগাছ ধরনের চার-পাঁচ পাতাওয়ালা পাদপ। সন্তান প্রসবকালে মায়ের অতিরিক্ত রক্তপাত হলে এই পাতার নির্যাস রক্তপাত বন্ধ করে। পানাগা বৃক্ষ থেকে অতি শক্ত কাঠ তৈরি হয়। এর পাতা লাল। জামাই বৃক্ষের পত্র গিবনের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। আরেকটি অদ্ভুত নামের গাছ— ইদুর বৃক্ষ। দেখলাম পয়সন আইভ বৃক্ষ (লতা নয়) বা রেনগুস, বিষক্রিয়ার জন্য যার ছালেও হাত দেওয়া নিষিদ্ধ। ছুঁচল ফার্নের মতো দেখতে সেরি পুরেনটিং বা থাউজেন্ড ব্রাঞ্চেস। এটি পট প্ল্যান্ট হিসেবে বাড়িতে রাখা হয়। উদ্দেশ্য শয়তান আত্মাদের দূরে রাখা। ব্রুটার জঙ্গলে এক জায়গা ভর্তি। এটিও ফার্নের মতো দেখতে। এই পাতার ডাঁটি দিয়ে ডায়াকরা হাতের এক ধরনের বালা তৈরি করে। একেকটি বালা দরদাম করে ৭০-৭৫ টাকায় কেনা যায়। আমি নিজের এবং

বান্ধবীদের জন্য এইরকম ছয়-সাতটি বালা কিনেছিলাম। তৈরি করেছিল আমাদের ক্লটকের ক্যাপ্টেন আনাং। উবার গাছের পাতা এবং কারামুনটিং পাদাংয়ের ফল ওরাংউটানের অন্যতম খাদ্য। টোডাং নামক একটি বৃক্ষ সাপে কামড়ানোর ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নামটাই এসেছে টোডাং নামক একটি সাপ থেকে। সাপ কামড়ালে এই গাছের মূল সিদ্ধ করে তার নির্যাস পান করতে হয়। কখনও এই মূল আক্রান্ত স্থানে লাগানো হয়। শিকড়টি আক্রান্ত স্থান থেকে সমস্ত বিষ চুষে নিলে আপনা থেকেই সেখান থেকে পড়ে যায়। আর দেখলাম নেপেনথিস বা ঘটপত্র। ছোট আকারের। কয়েকটি ঘটপত্রকে উপুড় করলে তাদের ভেতর থেকে কিছু মরা কীটপতঙ্গ এবং অল্প পরিমাণে জলীয় পদার্থ দেখা যায়। জলীয় পদার্থ সকালের শিশিরবিন্দু এবং মরা কীটপতঙ্গের বডি ফ্লুইড হতে পারে। মাঝে মাঝে জঙ্গলের মধ্যে শোনা যায় কুকাল পাখির ভুট ভুট ডাক ও কাঠঠোকরার ক্রিক ক্রিক শব্দ। এছাড়াও শুনেছি টানজাউ ও মালকোহা পাখির ডাক। আর জঙ্গলের মধ্যে বা জলের ধারে মাঝে মধ্যে শোনা যেত ছড়া তারের শব্দের মতো এক ধরনের ঝিঁঝির অদ্ভুত কলতান। জঙ্গলে চলার পথ অত্যন্ত বন্ধুর। যুগ যুগ ধরে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন বৃক্ষরাজির মোটা মোটা শিকড় জড়াজড়ি করে মাটিতে প্রোথিত, মাটির ওপরেও বিস্তৃত। যে-কোনও সময়ে শিকড়ে পা জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। কতবার পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি, পড়েও গেছি কয়েকবার। এক জায়গায় দেখেছি দুটো গাছের বিশাল বিশাল দুটি কাণ্ড দুদিক থেকে এসে গিঁট পাকিয়ে গেছে। সেই বিশাল গিঁটের নিচ দিয়ে আরেকটি ছোট কাণ্ড লাঠির মতো নীচে ঝুলে রয়েছে। এই জায়গাটা দিয়ে খুব সাবধানে মাথা নিচু করে যেতে হত।

দু বছর আগে বি বি সি-র লোকেরা এখানে এসেছিল। তারা দেখেছিল ক্যাম্প লিকির জেটিতে মানুষের পাশাপাশি বসে ওরাংউটানও সাবান দিয়ে কাপড় কাচছে। শুধু তাই নয়, কাপড় কাচার পর মানুষের মতো হাত দিয়ে কাপড় চিপে জল বার করছে। আমাদের অতটা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই দেখেছি। ওরাংউটান জেটির ধারে সাবানের টুকরো পেলেই তা সমানে বাহুতে ঘষছে এবং ফলে পশমি বাহুতে যে ফেনা তৈরি হচ্ছে, সাবানের সেই ফেনা পরমানন্দে মুখে দিয়ে খেয়ে চলেছে। প্রায় প্রতিদিনই এরকম সাবান মাখার ও খাবার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি। কোনওদিন প্রিন্সেস, কোনওদিন, সেসুউই, এমনকী রাজা উইনকেও দেখেছি সাবানের ফেনা খেতে। কেন সাবানের প্রতি তাদের এই ভালোবাসা? ডক্টর গ্যালডিকাসের মতে, সাবান তৈরি হয় উদ্ভিজ্জ তেল থেকে। আর সেই উদ্ভিজ্জ তেলের প্রতি আকর্ষণই সাবানের ফেনাকে তাদের কাছে এত সুখাদ্য করে তুলেছে। অন্তত এইটুকু প্রমাণিত যে ক্যাম্প লিকির ওরাংউটানদের ক্ষেত্রে একথা সত্যি।

জল খেতেও দেখেছি এদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে। নদীতে মুখ ডুবিয়ে, মানুষের

মতো হাতে করে জল নিয়ে, কাঠি জলে ডুবিয়ে সেই কাঠি মুখে দিয়ে জল চুষে খেতে প্রভৃতি। কাছাকাছি এক জায়গায় একটা খালি টিনের পাত্র পড়েছিল। সেই ক্যান বা পাত্রটি নদীর জলে ডুবিয়ে জল ভরে নিল। তারপর ক্যানের জল দিয়ে একটা পুরনো কাপড় ভেজালো, কিন্তু সাবানের অভাবে কাচতে পারেনি। সেই ক্যান থেকে জলও খেয়েছে মানুষের মতো। এই একই কায়দায় ফিডিং স্টেশনে মাগ থেকে দুধও খেতে দেখেছি।

২২ জুলাই আমাদের কুমাই যেতে হয়েছিল। এটি একটি ছোট বন্দর শহর। উদ্দেশ্য ক্লুটকে বাকি দিনগুলোতে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ। আগের সবই প্রায় শেষ। কিন্তু আরও আট রাত জঙ্গলে থাকতে হবে। যাবার পথে দুটি সুন্দর ধনেশ পাখি, বেশ বড় হলুদ গাত্রবর্ণ ও লাল ঠোঁটের কয়েকটি মাছরাঙা, দুটি ফলস ঘাভিয়াল ও একটি বিষধর জলসর্প দেখলাম। এই প্রসঙ্গে বলি, রাত্রিবেলা ক্লুটকে শুয়ে শুয়ে নদীর জলে ছপাৎ ছপাৎ শব্দ শুনতাম। একদিন রাতে তো এত শব্দ হয়েছিল যে ভালো করে ঘুমোতে পারিনি। ফেরি বলল যে জলে মাছ রয়েছে, আর সেই মাছকে তাড়া করে জলের সাপ বা কুমির। সাধারণ ঘড়িয়ালের থেকে ফলস ঘাভিয়াল আকারে বেশ ছোট। যেতে যেতে হঠাৎ দুটি গাছের মাঝখানে চার হাত পা ছড়িয়ে মাকড়সার মতো অবস্থায় একটি বিশাল ওরাংউটান দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরার শাটার টিপলাম। ফ্ল্যাশও রেডি করতে পারলাম না। আমাদের মুখোমুখি তাকিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেটি ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফেরি বলল যে এটি বন্য ওরাংউটান। খুবই মুখচোরা। তাই মানুষ দেখেই অদৃশ্য হয়ে গেল। ১৪ দিন জঙ্গলে থেকে এই একটি মাত্রই প্রকৃত বন্য ওরাংউটানের ছবি তুলতে সমর্থ হয়েছিলাম। বন্য ওরাংয়ের ছবি তোলা খুব শক্ত ব্যাপার। মাসের পর মাস বসে থেকে তবে ছবি পাওয়া যায়।

বেশ কিছু প্রবোসিস বাঁদর দেখলাম। এদের নাক স্বাভাবিক বাঁদরের থেকে লম্বা। তাই এদের বিজ্ঞানসম্মত নাম নাসালিস লার্ভাটুস। পূর্বতন ইন্দোনেশিয়ার ঔপনিবেশিক ডাচরা আদিবাসী ডায়াকদের তুলনায় দীর্ঘনাসা ছিল। তাই তুলনা করে নাম দেওয়া হয়েছে মনিয়েট ব্রান্ডাস বা ডাচ মাংকি। এরা একেকটি দল নিয়ে সামনের পা দুটিকে হাতের মতো মাথার ওপরে তুলে নদী পার হয়ে যায়। এটি এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা এতদিন বোর্নিওর জঙ্গলে থেকেও এই দৃশ্য দেখতে পাইনি। জল পার হবার সময় কুমির দেখলে দলপতি ডাকাডাকি করে অন্যদের সাবধান করে দেয়। গাছের বিশাল উঁচু উঁচু ডাল থেকে পাক্কা অ্যাক্রোব্যাটদের মতো ধুপ ধুপ শব্দে নীচের ডালে এরা ঝাঁপ দেয়। এই ফ্রি-ফল একটি দেখবার মতো জিনিস। এত উঁচু ডালে থাকার কারণে চেষ্টা সত্ত্বেও এদের ছবি তুলতে পারিনি।

কুমাই যাবার পথে একটা ছোট খালের মতো জায়গা দিয়ে যেতে গিয়ে দেখি মহা বিপদ। একটা গাছ খালের ওপর এমনভাবে ঝুঁকে রয়েছে যে কোনও

জলযানের যাবার পথ বন্ধ। ফেরিরা সবাই মিলে সেই গাছটাকে কেটে আমাদের এগোনোর পথ প্রশস্ত করল। কুমাই পৌঁছে অঁরি বাজারে গেল। ফেরি আমায় নিয়ে গেল ওর বাড়ি। বাড়িতে ওর স্ত্রী, দু বছরের কন্যা, ওর বাবা-মা রয়েছে। বাচ্চাটি বাবাকে পেয়ে কী আনন্দ! কিছুতেই ছাড়ছে না। ফেরিরও মন খারাপ। অত ছোট কন্যাকে ছেড়ে কিছুদিন পর পরই দীর্ঘ সময়ের জন্য জঙ্গলে গাইডের কাজ করতে যেতে হয় তাকে। পরিবারের সঙ্গে আমায় আলাপ করাল। কিন্তু ওরা কেউই ইংরিজি না জানার জন্য আমার সঙ্গে কথা বলতে পারল না। ফেরি বলল যে ওর খুব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবার ইচ্ছা। কিন্তু অত টাকা নেই। আর ভীষণ ইচ্ছে যে হিমালয় পর্বত ও ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত রেড উড্ ট্রি দেখার। আর এক্কেবারে বলিউড পাগল। কাজল, শাহরুখ ও রানি মুখার্জির অন্ধ ভক্ত। বিশেষ করে কাজলের। মাঝে মধ্যেই কাজল-কাজল বলে উঠত। আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে যে দেশে ফিরে আমি ওকে কাজল, শাহরুখ ও রানি মুখার্জির ছবি পাঠাব। সঙ্গে হিমালয় পর্বতেরও ছবি। পরে দেখেছি ক্যাম্প লিকির অধিকাংশ ছেলেই বলিউডি সিনেমা পাগল। আমি ভারত থেকে গেছি শোনামাত্রই আমাকে দেখলে ওরা 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' গাইত। ফেরিকে বলেছি যে ও যদি ইন্ডিয়া আসার প্লেন ভাড়া দিতে পারে তবে আমি ওকে হিমালয় দর্শন করিয়ে দেব।

কুমাই থেকে ফেরার পথে আমাদের নির্ধারিত ক্লটক 'হরপা মিনা-১' এল। এখানকার ক্যাপ্টেন মালয়ী। রবার সংগ্রাহক ছিল। নাম আনাং। কুমাই থেকে গেলাম পণ্ডুক টাংগুই। এটি সরাসরি সরকারের অধীন। এখানে তিনটি নাবালক ওরাংউটান আছে। কিন্তু নাবালকেরই বাহুতে যে কী শক্তি সেটা এখানে এসে টের পেলাম। একটির এগারো বছর বয়স। আমরা তিন নাবালকের কাণ্ডকারখানা দেখছি। হঠাৎ একজন এসে দুপায়ে দাঁড়িয়ে খপ করে আমার বাম হাতের কব্জি ধরল। উদ্দেশ্য আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। অ্যাডভেঞ্চারের চরম সীমায় পৌঁছে দিল আমাকে। আমার তখন কিছু করার নেই। চেষ্টা করলেও ওর হাত ছাড়ানোর ক্ষমতা নেই। এত শক্ত সে বাহুর বন্ধন। মনে হল ইস্পাত-কঠোর বাহুর বন্ধনে আমার কব্জি আবদ্ধ। চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরে ওর কী মনে হল কে জানে, আপনিই আমার হাত ছেড়ে দিল। সেই বজ্রমুষ্ঠি আজও মাঝে মাঝে অনুভব করতে পারি। আরেকটি এসে অধ্যাপকের দুটি হাত ও হাঁটু ধরে ওঁর কোলে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। অন্য দুটি ওরাংউটান ওর মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল। কপাল ভাল অধ্যাপকের। তা না হলে ওঁর কী অবস্থা হত কে জানে! এই তিনটি নাবালককে ওখানকারই একটি মনুষ্য পরিবার দেখভাল করে। তাই তারা এত মানুষের সংস্পর্শে থাকতে চায়। ফেরির মুখে শোনা গেল পণ্ডুক টাংগুইতে রোজমেরির এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। রোজমেরি নামক একটি স্ত্রী ওরাংউটানের এক সন্তান মারা যায়। সে তার এই মৃত সন্তানকে নিজের কাছে প্রায় সপ্তাহ খানেক রেখে দেয়। মৃতটির শরীরে আস্তে আস্তে পচন ধরতে থাকে।

রোজমেরির এই দুঃখ সহ্য করতে না পেরে সেখানকার আরেকটি স্ত্রী ওরাংউটান তার নিজ সন্তানকে রোজমেরির কাছে দিয়ে দেয়। রোজমেরি সেই সন্তানটিকে দত্তক নিয়ে তার নিজ সন্তান হারানোর দুঃখ ভোলে। বোঝাই যায় মানবজগতের দুঃখ, যন্ত্রণা, আনন্দ এইসব অনুভূতি এদের মধ্যেও কতটা বর্তমান।

ওরাংউটান যে কতখানি অনুকরণপ্রিয় তার একটি উদাহরণ দেখা গেল ক্যাম্প লিকিতে। স্টাফদের একটি বাড়ির পাশে শক্ত জমির ওপর রয়েছে বহুদিনের শুকিয়ে যাওয়া গোলাপি রং। এই গোলাপি রঙের রহস্য ব্যাখ্যা করল ফেরি। একবার বাড়িটি রং করা হচ্ছিল। সেই সময় এক ওরাংউটান রং ভর্তি একটি ক্যান বাইরে নিয়ে আসে। মানুষের দেখাদেখি সেও সেই রং এবং রঙের মধ্যে রাখা পেন্ট ব্রাশ নিয়ে সেই জমির ওপর রং করতে শুরু করে। তারপর থেকে সেই নিদর্শনটি বিখ্যাত হয়ে আছে ওরাংউটানের পেন্টিং হিসেবে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপকের কাছে শুনলাম যে শিম্পাঞ্জি ও হাতির পেন্টিংয়ের প্রদর্শনী হয়ে গেছে।

কুমাই থেকে ফিরলাম ক্যাম্প লিকি। রোজই বিকেলে আমরা ফিডিং স্টেশনে গেছি। সেখানে যাবার পথে ও পৌঁছে ওরাংউটান সংক্রান্ত নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। একদিন যাবার পথে প্রিন্সেসের নাবালক ছেলে পেটা ফেরির এক হাত মানুষের মতো ধরে চলতে লাগল। মাঝে মাঝে চলায় তাল রাখতে না পেরে পেটা তার হাত অদল বদল করে ফেরির হাতে রেখে মাটির ওপর প্রায় ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে আমাদের সঙ্গে এগিয়ে চলল। একটু পরে কী খেয়াল হতেই ফেরির হাত ছেড়ে দিয়ে পেটা সামনের একটা গাছে উঠে পড়ল। আরেকদিন ফিডিং স্টেশনে এই পেটাই একটি স্ত্রী ওরাংউটানকে দেখে ভয় পেয়ে অধ্যাপকের হাত শক্ত করে ধরে রেখে তার কাছে নিরাপত্তা চাইছিল।

আরেকদিন বনপথ দিয়ে যাবার সময় পূর্বতন রাজা কোশাশি আমাদের পিছু নিল। আমরা স্বাভাবিক গতিতেই সামনে এগোতে থাকলাম। মাঝামাঝি রাস্তা অতিক্রম করে এসেছি। হঠাৎ দেখি আমাদের সামনে পথের ওপরেই বর্তমান রাজা উইন দাঁড়িয়ে আছে। আর দুই রাজার মাঝখানে আমরা। খুবই বিপজ্জনক অবস্থা তখন। কিছুটা শঙ্কিতও হলাম। আমার ভয়ের প্রধান কারণ ছিল যে দুই রাজার মধ্যে মারামারি না লাগে। তাহলে একেবারে দক্ষযজ্ঞ বেধে যাবে। ফেরিকে বললাম যে এখন কী উপায় হবে? ও বলল যে কিচ্ছু করার নেই। উইন সামনে থাকায় আমরা আর এগোতে পারব না। আমাদের পিছন ফিরে চলে যেতে হবে। বলল যে কিপ ইয়োর আইজ ডাউন। উইনের চোখে চোখ যেন না ফেলি। তাকালেই ভাববে আমরাও ওর প্রতিদ্বন্দ্বী। সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করবে। আমরা তখন মাথা নিচু করে অপেক্ষা করছি কী হয় কী হয়! হঠাৎ উইন গাছে উঠতে আরম্ভ করল। গাছের অনেকটা ওপরে থাকা একটি স্ত্রী ওরাংউটানের প্রতি সে তার আগ্রহ প্রকাশ করছিল। ফলে সামনের রাস্তা খালি হওয়ায় আবার এগোলাম। আরেকদিন একটি স্ত্রী ওরাংউটান খাবার জন্য অল্প কয়েকটি কলা নিয়ে বসেছিল।

হঠাৎ আরেকটি এসে তার কাছ থেকে কলাগুলি ছিনিয়ে নিয়ে গেল। যে স্ত্রী ওরাংউটানটি এই কাণ্ড ঘটাল তার নিজের কাছে কিন্তু অনেকগুলি কলা ছিল। সবথেকে বদমাইশ ছিল উইনুক নামক একটি ওরাংউটান। ওকে দেখলেই ফেরি বলত, 'উইনুক দ্য ন্যটি ওয়ান'। একবার উইনুক একটি অল্পবয়সী ব্রিটিশ মহিলা পর্যটকের ব্যাকপ্যাক ছিনিয়ে নিয়ে কাছের একটি গাছে উঠে পড়ে। ব্যাকপ্যাকে মহিলাটির ডলার, পাসপোর্ট সব রাখা ছিল। ফেরি ছিল তার গাইড। সেটি উদ্ধার করতে ফেরিও উইনুকের পিছন পিছন সেই গাছে ওঠে। ব্যাকপ্যাকটি উদ্ধার করতে সমর্থ হলেও উইনুকের এক থাপ্পড়ে ফেরি গাছ থেকে পড়ে যায়।

আমাদের অভিযানের দিনগুলি এইরকম সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই কেটে গেল। এতসব দারুণ ঘটনার মধ্যেও কিছু না পাওয়ার দুঃখ থেকে গেল। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও রেড লিফ বাঁদর, ড্রাকোভোলান্স নামক এক ধরনের উড়ন্ত লিজার্ড দেখতে পেলাম না। অবশ্য ভাগ্য আমার ভালো। একদিন জাঙ্গল ট্রেকে গিয়ে আমি ছোট আকারের একটি উড়ন্ত ব্যাঙ দেখেছিলাম। তার কাছে যেতেই সেটি গ্লাইড করে চলে গেল। ফেরি ও অধ্যাপক দেখতে পেলেন না। টারসিয়ার নামক এক ধরনের নিশাচর জীব (অনেকটা আফ্রিকার বুশবেবির মতো) এই রেনফরেস্টে আছে। কিন্তু তাকে দেখা আর ভগবানকে দেখা প্রায় একই ব্যাপার। তবে তার গায়ের গন্ধ পেয়েছি। দেখতে পেলে জঙ্গল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা একেবারে সুপারহিট হত।

৩০ জুলাই টানজুং হরাপান এলাকার রিম্বা লজে পৌঁছলাম। ক্লটক থেকে বিদায় নিয়ে আজ সেখানেই থাকব। বিকেলে লজে বসে টানজাউ পাখির ডাক ও সাইকাডার অবিরাম কলরোল শুনলাম। আগামীকাল এই আরণ্যক পরিবেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আরণ্যক কলতান, অসীম নিস্তব্ধতা আর উপভোগ করতে পারব না।

৩১ জুলাই জাকার্তায় ফেরার সময় বিপদের সম্মুখীন হলাম। পাংকালানবুন থেকে সেমারাংয়ের ফ্লাইট ছিল দুপুর ১টা ৪০ নাগাদ। সকালবেলা স্নান করতে যাব, হঠাৎ ফেরি ছুটে এসে খবর দিল যে 'মেরপটি এয়ারলাইন্স' নির্ধারিত ফ্লাইট কোনওরকম নোটিস ছাড়াই বাতিল করেছে। কোনওরকমে তৈরি হয়ে নিয়ে ক্লটকে উঠলাম। আমাদের মালয়ী ক্যাপ্টেন আনাং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ক্লটক চালিয়ে পাংকালানবুনের সকড়পথে পৌঁছে দিল। সেখান থেকে ওখানকার একজন এজেন্ট নানাং প্রচণ্ড গতিতে জিপ চালিয়ে আমাদের বিমানবন্দরে পৌঁছে দিল। ওর হাতে বাড়তি ১৪৪ ডলার দিয়ে নতুন ফ্লাইটের টিকিট কাটতে হল। যাই হোক সেমারং ও জাকার্তায় পৌঁছলাম। সেখান থেকে ১ আগস্ট সিঙ্গাপুর ও কলকাতা। কিন্তু মন জুড়ে এখনও রয়ে গেছে বোর্নিও।

'ভ্রমণ' অক্টোবর, ২০০৪

৩০ বছর আগের

লাহুল ভ্রমণ ও ত্রিলোকনাথ দর্শন

কমলা মুখোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ভূমিকা

লাহুল ও স্পিতি অঞ্চলটি একসময় মহাযানী-তিব্বতি রাজ্য লাদাখের অধীনে ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লাদাখ অঞ্চলটি কাশ্মীররাজ হরি সিংয়ের অধীনে আসে। তাদের দুর্ধর্ষ সেনাপতি জাড়োয়ার সিং-এর প্রচেষ্টায়। তখন কুলুই ছিল স্থলপথে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। তাই ইংরেজ শাসকরা তাদের মিত্র কাশ্মীররাজকে অনুরোধ করেন, মধ্য এশিয়ার সঙ্গে স্থলপথে বাণিজ্য করার জন্য। পরিবর্তে অন্য দুটি স্থান তাঁকে ছেড়ে দিয়ে একটি চুক্তি হয়। ফলে লাহুল ও স্পিতি তিব্বতি জেলা প্রথমে পাঞ্জাবের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর এটি নবগঠিত হিমাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু অবাধ যাতায়াতের খুব একটা সুবিধা ছিল না। নিকটস্থ গ্রামগুলির বাসিন্দারা গ্রীষ্মের সময় এখানে যাতায়াত করতেন। কিছু দুঃসাহসিক পর্যটক কয়েকদিন ধরে পদব্রজে ভ্রমণ করে এখানকার তদানীন্তন বিখ্যাত 'ত্রিলোকনাথ' গুম্ফা বা মন্দির দর্শন করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সঙ্গী মণি বিশ্বাস ও ভক্তি বিশ্বাস।

আমরা অবশ্য লাহুল থেকে রোটাং গিরিপথে বাসরাস্তা নির্মিত ও বাস চালু হলে, ১৯৭১ সালে এ অঞ্চলে গিয়ে পর পর ২-৩ বছর ধরে মানালি হয়ে লাহুল ভ্রমণ করেছি। এর মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য হল ত্রিলোকনাথ মন্দির বা গুম্ফাটি।

১৯৭১ সাল থেকেই মানালি একটি বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। মানালি পৌঁছে ভালো জায়গা পাওয়া গেল চন্দ্রভাগার ওপরে সেতুর কাছে ও বাসরাস্তারও কাছে ট্যুরিস্ট লজে। তখন বহু যাত্রী সমাগমে মানালি সরগরম। চন্দ্রভাগা নদীর অপরদিকে দর্শনীয় স্থান উষ্ণপ্রস্রবণ। সেখানে সর্বদাই ভিড় লেগে থাকত। ফলে স্থানীয় লোকেরা বেশ কয়েকটি অস্থায়ী দোকান খুলেছেন।

মানালি দর্শনকথা

ভিড়ের জন্য আমাদের বাসের টিকিট পেতে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হল। সেই কয়েকদিন আমরা স্থানটির বহু দ্রষ্টব্য দেখে নিলাম। প্রাচীন মন্দিরও বেশ কয়েকটি আছে। সেখানে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের কিছু কিছু চিহ্ন আছে। পরবর্তীকালের হিন্দু মন্দিরও কয়েকটি আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিড়িম্বাদেবীর মন্দিরটি। সেটি মানালির আগের গ্রাম কুলুর উত্তর-পশ্চিমে। হিড়িম্বাদেবীর মন্দিরটি খুব বিখ্যাত কারণ তাঁর অনুমতি না পেলে কুলুর দশেরা উৎসব শুরু হতে পারে না। এই উৎসবটির বেশ আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। বহু বিদেশি পর্যটক এই উৎসব দেখতে আসেন। এটি ৫ দিন ধরে চলে। নিকটস্থ মন্দিরগুলি থেকে সব দেবতাকে এখানে আনা হয় এবং উৎসবের কেন্দ্রস্থলে রাখা হয়। তাঁদের ঘিরে স্থানীয় কুলুবাসীরা উজ্জ্বল পোশাকে সজ্জিত হয়ে নৃত্যগীত করেন, কয়েক রাত ধরে মেলা চলে উজ্জ্বল আলোকিত মাঠে। কুলু অবশ্য প্রাচীনকাল থেকেই স্থলপথে বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে গণ্য হত। বাইরের থেকেও কিছু ব্যবসায়ী এখানকার আপেল বাগান কিনে ব্যবসা করতেন। মানালিতে আসার আগে আমরা এখানকার অন্যান্য স্থানের দর্শনীয় স্থানগুলির খোঁজখবর নিয়ে এসেছিলাম। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মানালির কিছু আগে রিওয়ালসর। হ্রদের ওপর মহাযানী বৌদ্ধদের পদ্মসম্ভবের মূর্তি। তিব্বতি বৌদ্ধদের কাছে এঁর স্থান খুব উঁচুতে। ইনি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মকে রক্ষা ও শক্তিশালী করার জন্য আকাশপথে তিব্বতে হিমালয়ের বিভিন্ন রাজ্যে এসে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এছাড়া পথে সর্বত্র গেস্টহাউস ছিল। মাণ্ডি ও অন্যান্য স্থানে প্রস্তর গুহার মধ্যে অনেক পাথরের ধ্যানী মূর্তিও দেখেছিলাম। যে কদিন ওখানে থাকতে হয়েছিল সেই সময় চারপাশ ঘুরে দেখেছি। ফাঁকা স্থানগুলিতে পাথরের গায়ে 'ওম মণিপদ্ম হুঁ' লেখা। ১৯৭১ সালে স্থানীয় লোকজন, সরকারি কর্মচারী ও অন্য প্রদেশ থেকে আসা আপেল ব্যবসায়ী ও পর্যটক ছাড়া খুব একটা ভিড় হত না। আপেলও খুব সস্তা— দুয়েক টাকায় ১ সের। অবশ্য পরবর্তীকালে ১৯৭২-৭৪-এ স্থানটি বেশ জনাকীর্ণ দেখলাম।

লাহুল যাত্রা

এরপরে বাসের টিকিট পেয়ে বেলা ১০টায় লাহুলের উদ্দেশে রওনা হওয়া গেল। পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ডাকবাংলোতে স্থান পেলাম। স্থানীয় এস ডি ও-র সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তাঁর কাছে এখানকার দ্রষ্টব্য স্থান, লোকজন ও অন্যান্য বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে জানলাম— এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের তপশিলী জাতির পর্যায়ে ফেলা হয়েছে, যাঁরা প্রধানত তিব্বতি বংশোদ্ভূত। এছাড়া এখানে সরকারি কর্মচারী, মানালির ব্যবসায়ীরাও আছেন।

পরদিন সকালে উঠে চন্দ্রভাগা নদীর ঘাটে নেমে একটি যন্ত্রচালিত নৌকায় উঠে ঝুলন্ত সেতুর সাহায্যে ওপারে উঠলাম। কিছুদূরেই বিখ্যাত ত্রিলোকনাথ

মন্দির, দূর থেকেই দেখা যায়। নিশান উড়ছে। তখন বেলা ৯টা হবে, পুণ্যকামীরা সবাই এসে গেছেন। এঁদের মধ্যে মহিলারাই সংখ্যায় বেশি। মন্দিরের প্রবেশপথের বাঁদিকে চৈত্য আকারের পাথরের বেদী থেকে একটি ১০-১২ ফুট লম্বা 'ওম মণিপদ্ম হুঁ' লেখা নিশান উড়ছে— চারদিকে মহিলারা সবাই তিব্বতি। কিছু পুরুষও আছেন। মন্দিরের প্রধান প্রশস্ত দ্বার দিয়ে ঢুকে দেখলাম দু ধরনের পূজার উপচার, একটি হিন্দু পূজারীদের, অন্যটি বৌদ্ধদের। হিন্দুদের পূজার থালায় ঘিয়ের প্রদীপ, ফুল, চাল ইত্যাদি বৌদ্ধদের পূজার থালায় প্রদীপ, জলের পাত্র এবং তিব্বতি পূজার উপচার বজ্র প্রভৃতি। ভেতরে তখন পূজা হচ্ছে তাই দরজা বন্ধ। বেশ খানিকটা অপেক্ষা করার পর মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত হলে আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম।

দেখলাম মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। নীচের পাঠান উপত্যকা থেকেও বেশ কিছু মহিলা পূজা দিতে এসেছেন। সবারই মাথায় কুলুর বিখ্যাত টুপি। পরিধেয় বস্ত্রটি ঘুরিয়ে পরা, বাঁ কাঁধের ওপর আটকানো, যাতে হাতদুটি কাজের জন্য খালি থাকে। তিব্বতি মেয়েদের মাথায় ওই ধরনের কুলু টুপি, পোশাক অবশ্য আলাদা। হিন্দু পূজারিণীদের জিজ্ঞেস করায় তাঁরা মৃদু হেসে বললেন, আমরা সব দেবতাকেই মানি। দুই ধর্মের এরকম সহাবস্থান দেখে বেশ ভালো লাগল। আগেই জেনে এসেছি যে ত্রিলেকনাথ দর্শন সমস্ত মহাযানী বৌদ্ধদের অবশ্য কর্তব্য। এখানে এসে দেখলাম ইনি সকলেরই পূজ্য।

এখানে একটা মজার ব্যাপার হল প্রবেশদ্বার। একটি দ্বার প্রশস্ত সাধারণ যাত্রীদের জন্য বাঁদিকের দরজাটির দুটি ভাগ ফলে দুটি অসমান প্রবেশপথ। কিংবদন্তী এই যে পাপীরা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। তবে আমরা সে পরীক্ষায় পাশ করে গেলাম। বেশ খানিকক্ষণ ছিলাম এখানে। স্থানীয় ও তিব্বতি লোকজনের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হল। কোনও বিরোধ নেই। দূর-দূরান্ত থেকে এমনকী ১৫,০০০ ফুট ছোবিয়া বা কুগতি পাশ হয়ে অনেক দুঃসাহসী বিদেশি এবং কিছু স্বদেশী পর্যটক এখানে এসেছেন বলে জানা গেছে। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা তাদের বেশি পছন্দ করে না বলে সেসব যাত্রা বন্ধ হয়ে গেছে। মন্দিরের বাঁদিকে বিস্তৃত স্থানে বেশ কিছু গ্রামবাসী থাকে। এখানে বৃষ্টি হয় না, বরফগলা জলেই যা কিছু ফসল বার্লি ইত্যাদি হয়। এখানে আলুই প্রধান ফসল। তবে আপেলও কিছুটা হয়।

এরপর ফিরে এসে মারকুলা (মহিষমর্দিনীর) মন্দির দেখতে পেলাম। সামনে কয়েকটি আলুখেত পার হতে হল। সেখানে মন্দির বেশ প্রশস্ত এবং অনেকখানি হেঁটে গিয়ে বেদীর ওপর প্রদীপ শিখায় দেবীমূর্তি দেখলাম। তবে মহাযানী বৌদ্ধধর্মে বহু হিন্দু দেবদেবীও স্থান পেয়েছেন। মন্দিরের প্রবেশপথে একটি পোড়া গেরুয়া লাল মাটির বা টেরাকোটার বুদ্ধ প্যানেল আছে তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সমস্ত ঘটনাবলী নিয়ে। বিকেলে চন্দ্রভাগা নদী ধরে আরও উত্তরে গ্রামগুলি

দেখতে গেলাম। মিয়ার নামে একটি নদী উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এসে চন্দ্রভাগাতে মিশেছে। স্থানীয় লোকরা জানালেন, এটি ৬ মাইল উত্তরে একটি পার্বত্য অঞ্চল থেকে এসেছে। সেখানকার অধিবাসীরা বহু শতাব্দী পূর্বে রাশিয়ার বৌদ্ধ অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা এখানে থাকেন। অতীতে খুব একটা মেলামেশা ছিল না কিন্তু সম্প্রতি সেনসাস রিপোর্টে তাঁদের তপশিলী জাতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং রেশন কার্ডও দেওয়া হয়েছে। ২-৩ মাইল নদী ধরে যেতে যেতে অন্ধকার হয়ে গেল। তবে একজন বিখ্যাত পর্বতারোহী প্রাণেশ চক্রবর্তীর 'হিমালয়ের গোপন পুরে' বইটিতে এবিষয়ে বিশদ বিবরণ আছে।

আরও লাহুল-কথা

লাহুলের উত্তরদিকটা অপেক্ষাকৃত উঁচু। এখান থেকে একটা পায়েহাঁটা রাস্তা গেছে লাদাখ অবধি। এখানকার বাসিন্দারা বেশিরভাগই তিব্বতি বৌদ্ধ। জনসংখ্যা অবশ্য খুব বেশি নয়। উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কারদুং মঠ, এখানকার প্রধান বৌদ্ধ গুম্ফা সর্পিল পাহাড়ি পথে উঠতে হয়। বেশ সময় লাগে। এটিই এককালে প্রধান দপ্তর ছিল। কিন্তু সবসময়ে যাওয়া কঠিন বলে প্রধান দপ্তরটি এখন কেলংয়ে। দুপাশে পাহাড়ের ওপর আরও কয়েকটি প্রাচীন গুম্ফা আছে। কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষুক সেখানে থাকেন। গুম্ফাগুলি হল— সা সুর, সেত্তাল, জেমু ও গুরু-ঘণ্টাল। শেষেরটি মানালি যাবার বাসরাস্তার পাশেই বলে এটির নীচের অংশটি এখন বাসের অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শীত এসে যাচ্ছে— পথের দুপাশে আলুর বস্তা ও উৎকণ্ঠিত গ্রামবাসী, বাসে এগুলি তাড়াতাড়ি পাঠাবার জন্য। ঘুরতে ঘুরতে একটা ভাত খাওয়ার দোকানও পেয়ে গেলাম। তার কাছেই একটি রেস্টহাউস। রাস্তার মুখেই একটি পাথরের Plaque-এ রাসবিহারী বসুর নাম খোদাই করা। অনুসন্ধান করে জানলাম এটি বানিয়েছেন এক বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার। চেষ্টা করেও তাঁর নাম জানতে পারলাম না। তবে খুব ভালো লাগল কারণ রাসবিহারী বসু ছিলেন সেকালের এক নামকরা বিপ্লবী।

রাসবিহারী বসু চন্দননগরের বাসিন্দা ও তখনকার বিপ্লবী দলের সদস্য। উত্তর ভারতে বিপ্লববাদ প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বনবিভাগের চাকরি নেন। পাঞ্জাব, দিল্লি, লাহোর, উত্তরপ্রদেশে বেশ কিছু যুবককে অনুপ্রাণিত করেন।

১৯১১ সালে বঙ্গ বিভাগ রদ হওয়ার পর রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। দরবার হলে অনুষ্ঠানে যাবার সময় হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ করেন। বড়লাট আহত হন। সরকারি অনুষ্ঠান হতে পারল না। তাঁর সঙ্গী ধরা পড়েন ও তাঁর ফাঁসি হয়। রাসবিহারী তখন এইসব দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ও পরে জাপানে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। সেখানকার এক বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। ১৯৪১-৪২ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে সাহায্য করেন ও সুভাষচন্দ্র এলে আই. এন. এ-র ভার

তাঁর হাতে তুলে দেন। তিনি ওখানেই মারা যান। তাঁর ভস্ম ওখানকার এক মন্দিরে রক্ষিত আছে। প্রস্তর ফলকটি দেখে খুব অনুপ্রাণিত হলাম।

এবার ফেরার পালা। মানালিতে ফিরে ট্যুরিস্ট বাসে উত্তর-পশ্চিমমুখী বাসে নাগ্গর গ্রামে বিখ্যাত চিত্রকর Nicholas Roerick-এর হিমালয়ের দৃশ্যাবলীর ওপর অপূর্ব চিত্রাবলী দেখলাম। একটি ট্রাস্ট-এর ওপর এর দেখাশোনা করবার ভার আছে।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৩

বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন ধরে

কমলা মুখোপাধ্যায়

গৌতম বুদ্ধ ২৫০০ বৎসর পূর্বে বর্ণাশ্রম প্রথার বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে সাম্যবাদ প্রচার করেছিলেন— জাতিধর্ম, ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানাধিকার প্রচার করে বহুজনকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, সচেতন হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন, তিনি আমাদের নমস্য। দুর্ভাগ্যক্রমে বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করেনি এই ভারতবর্ষ। এখান থেকে তাঁকে হটে যেতে হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। বুদ্ধগয়াতে বুদ্ধদেব 'বোধি' বা দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন— সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন, রাজগৃহতে বহুদিন ধরে বিম্বিসারের সময় ধর্ম প্রচার করেন ও কুশীনগরে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

১৯৬৯ সালে নেপাল ভ্রমণ কালে স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির দর্শনের সময় শুনেছি, বুদ্ধদেব স্বয়ং নাকি এখানে পদার্পণ করেছিলেন— সেখানে বিরাটাকার ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় আসীন বুদ্ধমূর্তি আছে— বুদ্ধের পদার্পণ ঘটেছিল শুনে খুবই রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। মুক্তিনাথ থেকে ফিরছি, নওতোনোয়া স্টেশনে এসে জানলাম বুদ্ধের লুম্বিনি ও বুদ্ধের পিতৃরাজ্য কপিলাবস্তু এখান থেকে খুবই নিকটে। বুদ্ধগয়া, বৈশালী আগেই দেখেছিলাম— এ যাত্রায় ভারত-নেপাল সীমান্তে বুদ্ধের কর্মক্ষেত্রকে, মৃত্যুস্থানকে দেখে বুদ্ধের বাণী আরও বেশি উপলব্ধি করলাম। বুদ্ধের জীবনী, বাণী, জাতকরূপে তাঁর শিষ্যবর্গের কর্ম ও সর্বোপরি অশোকের শিলালিপিগুলির মাধ্যমে বুদ্ধের জীবনকে জানবার ও বুঝবার বিশেষ সুযোগ ঘটেছে— সেইজন্যই এইসব ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখার এত আগ্রহ ছিল।

উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর শহরের কয়েক মাইলের মধ্যেই কুশীনগর— বর্তমান কাসিয়া থেকে দেড় মাইল। দেওরিয়া ও গোরখপুর উভয়দিক থেকেই বাসে যাওয়া চলে। কুশীনগরের নাম মথ কুনওয়ার বা মৃত রাজপুত্র। এর প্রাচীন নাম কুশাবতী। জঙ্গলের বন্য অধিবাসী কিন্তু গণতান্ত্রিক মল্লদের রাজধানী ছিল এখানে। বৈশালীতে আম্রপালীর প্রদত্ত শুষ্ক মাংস খেয়ে বুদ্ধ অসুস্থ হয়ে এখানে আসেন— বৈশালীতেই তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন তাঁর নির্বাণের দিন আগতপ্রায়। অনেকের মতে, বিষমিশ্রিত মাংস তাঁকে মারবার জন্য দেওয়া হয়েছিল, কারণ বুদ্ধদেব দাঁড়িয়েছিলেন সমাজের এক রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াশীল

শক্তিশালী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। কুশীনগরে মঠ, মন্দির, চৈত্য মিলিয়ে ১০টি দ্রষ্টব্য স্থান আছে। প্রধান স্তূপ ও নির্বাণ মন্দির বুদ্ধজয়ন্তী বৎসরে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। শিলালিপি যা পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় এখানে যে বুদ্ধের অসুস্থ অবস্থার শায়িত স্বল্প ভগ্নমূর্তিটি আছে তা পঞ্চম শতাব্দীতে হরিবল কর্তৃক নির্মিত হয়। ১৮৭৬ সালে খননের ফলে এটি পাওয়া যায়। বর্মাদেশের বৌদ্ধরা এটিকে নতুন মন্দির করে স্থাপনা করেছিলেন ১৯২৭ সালে— পরে আরও নতুন অংশ পুরনো স্তূপের নিকট নির্মিত হয়েছে। প্রায় ৭ ফুট লম্বা বুদ্ধের শায়িত হেলানো মূর্তিটি একটি বেদীর ওপর রক্ষিত— চারদিকের প্রকোষ্ঠে ও পায়ের তলায় মাথার কাছে ভক্তরা প্রদীপ ধূপধুনো জ্বেলে দিচ্ছেন, ওপরে চন্দ্রাতপ, খুবই সুন্দর করে সাজানো— মস্তক উত্তরদিকে। সমস্ত শরীরটি সূক্ষ্ম ধাতুর চাদর দিয়ে আবৃত! মুখাবয়ব ঈষৎক্লিষ্ট। গেটের সামনে ও চতুর্দিকে বিদেশি ভক্তরা নানা বিদেশি ফুল ও ফলের গাছ লাগিয়েছেন। এই স্থানটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও দর্শনীয়। আমরা যা কিছু জানতে পারলাম তা বর্মার বৌদ্ধভিক্ষুদের কাছ থেকে। তাঁদের কাছ থেকে কিছু ছবিও সংগ্রহ করলাম। এর কাছেই 'মথ কুনওয়ার'য়ের মন্দির ও তার পাশে রমাভার বা রম্যবন, যেখানে বুদ্ধদেবকে সমাহিত করা হয়। এর কাছেই মুকুটবন্ধন চৈত্য ৪০০-৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। রম্যবনের স্তূপটি খুবই সাদাসিদে, ওপরে ওঠা যায়, স্তূপটির পায়ে বুদ্ধমূর্তি খোদিত। শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশ, স্তূপটি ঘিরে সুন্দর বাগান। আমরা কিছু ধূপকাঠি জ্বেলে দিয়ে এলাম। এর কিছু দূরে নীল রঙের শিষ্ট পাথরের একটি বুদ্ধমূর্তি আছে ও আরও ভেতরে বর্মীয় ভিক্ষুদের দ্বারা সংরক্ষিত শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তি দেখলাম। এখানকার সব বুদ্ধমূর্তিগুলিই একটু ক্লিষ্ট ও কৃশাঙ্গ। ভেতরের দিকে যেতেই বেশ জঙ্গল শুরু হল। গ্রামের লোকেরা খুবই গরিব, রাখাল ছেলেরা গরু চরাচ্ছে, কিছু চাষবাসও আছে তবে খুব একটা বৃহৎ স্থান নয়। সেদিনের সেই শান্ত নির্জন প্রভাতকালটি সমাধি দর্শনের উপযুক্ত সময়ই ছিল। আমাদের সঙ্গে দক্ষিণ নেপালের কয়েকজন বৌদ্ধ কুশীনগর দেখতে এসেছিলেন— আমরা বৌদ্ধ নই অথচ কুশীনগর দেখতে এসেছি শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

কুশীনগর থেকে বাসে ফিরলাম গোরখপুরে। তখনই আনন্দনগর স্টেশনে বাস ছাড়ছে। আনন্দনগর হালের নাম, ফুরকে না ওই ধরনের একটা স্থানীয় নাম আছে কিন্তু বুদ্ধ জয়ন্তী বছর থেকে ভিক্ষু আনন্দের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য 'আনন্দনগর' নাম হয়েছে স্টেশনের। আনন্দর কপাল ভালো। বুদ্ধের নিত্য সহচর হওয়া সত্ত্বেও আনন্দের নামে কোনও স্তূপ বা স্মৃতিস্তম্ভ হয়েছে বলে দেখিনি। হালে শ্রাবস্তী বলরামপুর রাস্তার মাঝে 'আনন্দ উদ্যান' বা ওই ধরনের একটি নাম দেওয়া হয়েছে একটি প্রাচীন বিহার বা সংঘারামকে। গোরখপুর থেকে লখনউ অবধি যে ছোট লাইন (মিটার গেজের) চলে গেছে তার প্রতিটি স্টেশনে বুদ্ধের নানা বাণী সম্বলিত প্ল্যাকার্ড চতুর্দিকে টাঙানো আছে, বা দেওয়ালে দেওয়ালে

বুদ্ধের অমৃত বাণী উৎকীর্ণ করা আছে। জানি না স্থানীয় লোকেরা সে বিষয়ে কত অবহিত কারণ বেশিরভাগ ইংরিজিতে লেখা। বাস থেকে নেমে আনন্দনগর স্টেশনে এসে নওগড়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। বিকেলেই ট্রেনে করে নওগড় স্টেশনে পৌঁছলাম ও স্টেশন মাস্টারকে বলে বিশ্রামালয়ে আশ্রয় নিলাম। এখান থেকেই লুম্বিনি যেতে হয় বলে থাকবার ও খাবার বেশ ভালো বন্দোবস্ত আছে। একটি সিংহলী দম্পতি সেদিন লুম্বিনি থেকে ফিরেছেন ও রিটায়ারিং রুমে আশ্রয় নিলেন। এখান থেকে তাঁরা যাবেন কুশীনগরে। কপিলাবস্তু বা বৈশালী সম্পর্কে খুব বেশি ঔৎসুক্য দেখলাম না। তার কারণ বৌদ্ধ ভক্তদের পক্ষে লুম্বিনি, কুশীনগর, বুদ্ধগয়া ও সারনাথ অবশ্য দ্রষ্টব্য। অন্যান্য স্থানের অত মাহাত্ম্য নেই।

প্রায় একুশ মাইল দূরে লুম্বিনি— নিয়মিত বাস সার্ভিস আছে। সকালে রওনা হয়ে সাড়ে নটার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। লুম্বিনির অবস্থিতি নেপালের তরাই-এ, কিন্তু ভারতের মধ্য দিয়ে যাওয়াই সুবিধা। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত লুম্বিনি বা নেপালি রুমেন্দেই কপিলাবস্তু ও বুদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবীর পিতৃগৃহ দেবদহের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মায়াদেবীর পিতা ছিলেন অঞ্জন শাক্য। বুদ্ধজন্মের প্রাক্কালে মায়াদেবী সঙ্গিনী ও অনুচর-পরিবৃতা হয়ে পিতৃগৃহে ভ্রমণ করছিলেন। লুম্বিনি উদ্যানে যখন তিনি পৌঁছলেন— বসন্তের শেষে শাল, অশোক ও চম্পা বৃক্ষের পত্র ও পুষ্পের সমারোহ দর্শনে মুগ্ধ হয়ে মায়াদেবী দক্ষিণ বাহু তুলে অশোক বৃক্ষের একটা নিচু শাখায় হেলান দিয়ে ক্ষণিকের বিশ্রাম নিচ্ছিলেন— এই সময় বুদ্ধ ভূমিষ্ঠ হন। অনেকের মতে, বুদ্ধের জন্ম সন ৫৬৬ খ্রিস্টপূর্বে, অন্যান্যের মতে, ৬৪৪ খ্রিস্টপূর্বে। সিদ্ধার্থের ৭ দিন বয়সে তাঁর মাতার মৃত্যু হয়। তিনি মাতৃষ্বসা মহা প্রজাপতি গৌতমী কর্তৃক লালিত-পালিত হন।

অশোক সিংহাসনে অভিষিক্ত হবার পর ২৫৩ খ্রিস্টপূর্বে বুদ্ধতীর্থবিজড়িত স্থানগুলির উদ্দেশে 'ধর্মযাত্রা' করেন। মগধ থেকে আসার পথের দুপাশে বহু স্তম্ভ নির্মিত হয়। যে স্থলে বুদ্ধ ভূমিষ্ঠ হন সেইখানে একটি মন্দির নির্মিত হয় ও ভেতরে মায়াদেবীর বৃক্ষ শাখাতে দণ্ডায়মান ও বুদ্ধের জন্ম— এই দৃশ্যটি একটি প্রস্তরে উৎকীর্ণ হয়। সামনেই রেলিংয়ে ঘেরা অশোকস্তম্ভ ও শিলালিপিটি উৎকীর্ণ হয়। পাশেই একটি জলাশয় ছিল এবং এখনও আছে। অশোক লুম্বিনি গ্রামকে বুদ্ধের জন্মস্থান বলে করমুক্ত করেন— সেইমর্মে শিলালিপিও পাওয়া গেছে যার ফলে লুম্বিনি গ্রামের অবস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। বর্তমানে ওই স্থানেই নতুন মন্দির স্থাপিত হয়েছে, তার গর্ভগৃহে পুরনো, ধসে যাওয়া মায়াদেবী ও বুদ্ধের মূর্তির পাশে ওই একই বিষয়ে নতুন মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। এখানকার বহু পুরনো মূর্তি কাঠমান্ডু মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিগলিসাগর হ্রদ ও কনকমুনি বুদ্ধের মূর্তি উল্লেখনীয়।

লুম্বিনি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৮৯৫ সালে একজন জার্মান পর্যটক ডাঃ ফ্যুরার কর্তৃক। বনের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে তিনি এই স্তম্ভ দেখেন। এখানে একটি

অশ্বমূর্তি ছিল; আরও কটি স্তম্ভ ছিল— এগুলি এখন স্থানান্তরিত। ৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে হিউয়েন সাং এই স্থান পরিদর্শনে আসেন ও বজ্রাঘাতে খণ্ডিত অবস্থায় অশ্বমূর্তি দেখেন। তিব্বতি খাম্পা বৌদ্ধভিক্ষু ও বর্মা সিংহলের ভিক্ষুরা পাশেই বিরাট বুদ্ধমূর্তি সম্বলিত একটি মন্দির স্থাপন করেছেন। বর্তমানে লুম্বিনি বা নেপালি ভাষায় রুমেন্দেই একটি ছোট গণ্ডগ্রাম। তবে তীর্থযাত্রীরা আসেন বলে দোকান, বাজার, রাতে থাকবার ভালো হোটেল— সব কিছুরই বন্দোবস্ত আছে। দূরে ছোট ছোট গ্রামে কৃষকেরা চাষ করছে, তারা যে এই মহান ব্যক্তির উত্তরপুরুষ সে বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। সারাদিন লুম্বিনিতে কাটিয়ে রাতে স্টেশনে ফিরে এলাম। লুম্বিনি আসার সময় নেপালি ও ভারতীয় চেকপোস্ট পার হতে হয় তবে তেমন কড়াকড়ি কিছু নেই। গ্রামবাসীরা নিতান্তই গরিব। লুম্বিনির অবস্থিতি ছিল ৫ একর জমিতে এবং ভারত থেকে এখান অবধি যাতায়াতের চল ছিল, তাই এই স্থানগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত ও নিরাপদ ছিল। এই নদীর পাশেই তেলকোশী নদী। আধুনিককালে জার্মান পণ্ডিত ১৮৯৫ ওই শিলালিপি সর্বপ্রথম দেখেন।

পরদিন ভোরে কপিলাবস্তু যেতে হলে আগের দিনই শোহরৎগড়ে পৌঁছনো দরকার। অতএব লুম্বিনি থেকে ফিরেই চা ইত্যাদি খেয়েই ছোট লাইনের ট্রেনে চাপতে হল। ছোট লাইনের ট্রেন দিনে মাত্র দুটি তাই যখন তখন যাবার সুবিধা নেই। রাতে শোহরৎগড়ে পৌঁছে স্টেশনে থাকা ও পরদিন ভোরে কপিলাবস্তু রওনা দেওয়ার কার্যসূচি ঠিক করে রাতে শোয়া গেল। কিন্তু শোহরৎগড় অতি নগণ্য স্টেশন। একজন কি দুজন স্টেশন কর্মচারী তারাই টিকিট দেন, নিশান দেখান ও গাড়ি সিগনালের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে এগিয়ে গিয়ে ডেকে আনেন। যাইহোক যত ছোট জায়গাই হোক সাধারণ লোক ও স্টেশন কর্মচারীরা অতি সজ্জন লোক— যতদূর সাধ্য সাহায্য করেছেন। গ্রামবাসী যাঁরা দৈনিক যাতায়াত করে তাঁরা আমাদের আসার কারণ শুনে একটু হতচকিত হলেও ভদ্রতা ও সাহায্য কম করেননি। সাধারণ লোক আজও কত সৎ ও ভদ্র তাই বিদেশকে বিদেশ বলেই মনে হয়নি কখনও।

শোহরৎগড় থেকে কপিলাবস্তুর দূরত্ব ১২-১৩ মাইল। কপিলাবস্তুর অবস্থিতি সম্পর্কে তীব্র মতভেদ ছিল। প্রাচীনকালে হিউয়েন সাংকে তিলৌরাকট ও ফা-হিয়েনকে পিপড়াওয়া কপিলাবস্তু বলে দেখানো হয়। কাছাকাছি দুটি স্থানই খোঁড়া হয়— একটি ভারতের দেবলা মিত্রের পরিচালনায় হয়। অবশেষে শিলালিপি ও অন্যান্য প্রমাণ দেখে তিলৌরাকট গ্রামকেই কপিলাবস্তু বলেই সিদ্ধান্ত করা হয়। বর্তমানে মাত্র ২টি স্থান খোঁড়া হয়েছে ও বাড়ি, মন্দির শিবলিঙ্গ প্রভৃতি পাওয়া গেছে। আরও ৩৬টি স্থান খোঁড়া হবে বলে চিহ্নিত আছে। মাঝের উঁচু জায়গাটিতে উঠলাম। কণ্টকাকীর্ণ বন ও গাছপালার মধ্যে কারুকার্যখচিত ইট চারদিকে ছড়িয়ে আছে। বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে এই ধ্বংসাবশেষ।

স্টেশন থেকে রিকশা, সাইকেল বা এক্কা ছাড়া কোনও যানবাহন নেই।

কপিলাবস্তুর ঐতিহাসিক মূল্য এখনও হয়নি। এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে কথাটি জানা ছিল, এবং ছোট জায়গায় ৫-৭ জন দড়ি ধরে সবেগে যাব ভাবতেই ভয় করল। কারণ উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশি। অগত্যা সাইকেল রিকশা ভাড়া করতেই হল। কয়েক মাইল যাবার পর নেপালি চেকপোস্ট পার হয়ে কপিলাবস্তু গ্রামে প্রবেশ করলাম। এই গ্রামের অবস্থা লুম্বিনির চাইতেও খারাপ। কোথাও চেষ্টা করে একটা চায়ের দোকান অবধি পেলাম না। গ্রামের ঘরগুলি জীর্ণ ভগ্ন— লতাপাতায় আচ্ছন্ন। কিছুদূর যাবার পর রাস্তাও নেই— কারণ গ্রামের বাড়িগুলি ইতস্তত ভাবে খেতের পাশে ছড়ানো। তদুপরি হাঁটু সমান ধুলো— রিকশার পক্ষে এগিয়ে চলা মুশকিল। সুতরাং একটি বাগানে রিকশাকে রেখে প্রায় ২-৩ মাইল হেঁটে কপিলাবস্তুর ভিটেতে উপস্থিত হলাম এবং খননকার্য যখন শুরুই হয়নি তখন ২-১টি ইট নিলে অন্যায় হবে না ভেবে ২-১টি ইট ব্যাগে ভরলাম। ছোট ছোট নালা পার হয়ে উঁচু টিবি চিহ্নিত করা রয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে খননকার্যের জন্য। রিকশা ছেড়ে ২ মাইল হাঁটার পর খুনবা গ্রাম, তার ৬ মাইল পরে তিলৌরাকট (নেপালিতে বলা হয় তৌলিয়া) গ্রাম যেটি হল কপিলাবস্তুর প্রধান কেন্দ্র। তৌলিয়া থেকে গতিহাওয়া গ্রাম পর্যন্ত গেলাম। যে দুটি স্থান খনন করা হয়েছে তা জাপানি বৌদ্ধ সমিতি ও নেপাল সরকারের মিলিত প্রচেষ্টায়। এই দুটিতেই বেশ কারুকার্যময় ইট পাওয়া গেছে ও ঘরের মাঝখানে শিবলিঙ্গ বসানো আছে। ২-৩ জায়গায় স্তম্ভ আছে ও বেশ কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে। তাছাড়া খননের সময় অনেক প্রস্তরমূর্তি— তার মধ্যে শিবলিঙ্গ, গণেশ ও মকর মূর্তি। পদ্মের বেদী, মকর মূর্তি ও প্রাচীরের অংশ যা কিছু পাওয়া গেছে তা স্থানীয় একটি মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। ওই ৩৬টির মধ্যে জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য দেশের অর্থানুকূল্যে আরও কয়েকটি জায়গা এই বছরই খনন শুরু হবে। নেপাল ছোট দেশ, তার এত অর্থ কোথায়? এরপর আবার সেই হাঁটু ভাঙা ধুলোর স্তর পেরিয়ে ফিরলাম। হয়তো আমাদের জীবদ্দশায় কপিলাবস্তুর পুরো চেহারার কোনও নিদর্শন দেখে যেতে পারব না। বেলা ২টোর সময় ফিরলাম। এত গরিব গ্রাম যে চা কেন, কোনও খাদ্যদ্রব্যই মিলল না। কপিলাবস্তু থেকে লুম্বিনি সোজাসুজি গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়া চলে। দূরত্ব মাত্র ১৯ মাইল তবে কোনও রাস্তা নেই। একটি ছোট নদী আছে। এইসব জনপদ ও গ্রাম দেখলে বোঝাই যায় না অতীতকালে এসব স্থান ছিল এত গৌরবময় ও ঐতিহ্যপূর্ণ।

শোহরৎগড়ে ফিরে, সেদিন রাতেই গেলাম বলরামপুর। এই স্টেশনটি এই লাইনে বেশ বড় জংশন— এখান থেকে লখনউ বেশ কাছে। এখানে চিনির কল কয়েকটি আছে, তাছাড়া কোর্ট ও সরকারি দপ্তর এখানে বসে বলে ছোট লাইনের ট্রেনগুলিতে খুব ভিড় বেশি। সকালে উঠে ট্রেনে সব লোক এখানে আসে, সারাদিন কাজকর্ম সেরে রাতে ফিরে যায় যে যার নিজের গ্রামে। এইসব স্থানগুলি তরাই-এর অন্তর্ভুক্ত ও নেপাল সীমান্তের খুবই কাছে— এজন্য জিনিসপত্র যথেষ্ট চোরাপাচার হয়।

পরদিন ভোরে উঠে বাস ধরে শ্রাবস্তী দেখতে গেলাম। শ্রাবস্তীর নাম ছোটবেলা থেকেই মনে আছে 'দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে জাগিয়া উঠিল হাহা রবে'— রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাখানি থেকে। শ্রাবস্তীর আধুনিক নাম 'শাহেত-মাহেত'— যার অর্থ নাকি শ্রেষ্ঠ মঠ। এই জায়গাটি প্রায় ২-৩ মাইল মতো বিস্তৃত। শাহেত-এ অবস্থিত ছিল বিখ্যাত জেতবন বিহার বা জেতবনাশ্রম। আর মাহেত-এ ছিল প্রসেনজিৎ-এর রাজধানী— এটি প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। শাহেত-মাহেতেই ছিল প্রাচীন মহাজনপদ কোশলের রাজধানী। এটি অচিরাবতী বা রাপ্তী নদীতীরে অবস্থিত। এই অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যকালে বা তার কিছু পরেই জঙ্গলে আবৃত হয় ও সমস্ত বাড়িঘর জঙ্গলে ঢেকে যায়। ব্রিটিশ শাসনের সময় লর্ড কানিংহামের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এর প্রাচীন স্তূপ ও ভগ্নাবশেষের দিকে। ১৮৬৩ সালে তাঁরই পরিচালনায় ব্যাপকভাবে খননকার্য শুরু হয়। বলরামপুরের রাজারাও এতে অর্থ সাহায্য করেন এবং ১৮৬৪ সালে হোয়ে পরিচালনায় ও ১৯০৭-১৯১১ থেকে ভোগল মার্শালি ও দয়ারাম সাহনির পরিচালনায় পুরো স্থানটির খননকার্য সমাপ্ত হয়— বহু মূর্তি ও ভগ্নাবশেষ লখনউ মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত হয়। সিংহলের, চিনের, বর্মার ভিক্ষুরা মঠ স্থাপনা করে এখানে আছেন। এইরকম একজন সিংহলবাসী বৌদ্ধভিক্ষু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শাহেত বা জেতবনের সমস্ত জায়গাগুলি দেখালেন। পরে বনপথে মাহেত-এর বা প্রসেনজিৎ-এর রাজধানী প্রাচীন শ্রাবস্তীতে দেড় মাইল মতো হেঁটে যেতে হল। এখানে বেশ উঁচু কয়েকটি ঢিবি আছে, প্রসেনজিতের গড়, সুদত্তের স্তূপ ও অঙ্গুলিমালের স্তূপ দেখলাম— এটি একটু ডানদিকে ঘুরে গিয়েছে। বৌদ্ধধর্মের গৌরবের যুগ অস্তমিত হলেও জৈন ধর্মের প্রভাব ছিল বহুদিন ধরে। পরে ১২ শতাব্দীর মুসলমান বিজয়ের পর প্রসেনজিতের গড়ের মধ্যে মন্দিরের ওপর গম্বুজ নির্মাণের চেষ্টা হয়— তা দেখলেই বোঝা যায়। কয়েকটি তীর্থঙ্করের মূর্তিও আছে। ৫ম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন ও সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং এই স্থান পরিদর্শনে আসেন ও তখনই এখানকার অনেক কিছু ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। হিউয়েন সাঙের লিখিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে অশোক রাজত্বপ্রাপ্তির পর বুদ্ধস্মৃতিবিজড়িত স্থান সমূহতে ধর্মযাত্রা যখন করেন তখন স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ জেতবনের পূর্বদ্বারের দুদিকে ৭০ ফুট উঁচু দুটি স্তম্ভ তৈরি করান— একটির ওপর ছিল ধর্মচক্র, অন্যটির ওপর ছিল বলীবদ মূর্তি। স্তম্ভের নিকট অশোক এক সমাধি স্তূপ নির্মাণ করান যার ভেতরে বুদ্ধের অস্থি ছিল। এই স্তূপটি নির্মিত হয় এক কুয়োর পাশে— বুদ্ধদেব যার পাশে ভ্রমণ করতেন ও যার জল ব্যবহার করতেন। বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ আছে সম্রাট অশোক সারিপুত, মৌদগলায়ন, বহাকাশ্যপ তথা আনন্দের সমাধি স্তূপে পুজো দিয়েছেন। অশোকের সময় শ্রাবস্তী খুবই সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ সম্রাটদের বৌদ্ধধর্মে শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য শ্রাবস্তীর মঠ মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার হয়। কণিষ্ক ও হুবিষ্কের সময় বোধিসত্ত্বের দণ্ডায়মান মূর্তি ও

আসীন অভয়বরদ মুদ্রা সমেত মূর্তি স্থাপিত হয়। গুপ্ত সম্রাটরা বৌদ্ধ বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও শাহেত-মাহেতকে প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংস না করলেও পরোক্ষভাবে জীর্ণোদ্ধারের অভাবে এ স্থানের অসংখ্য স্তূপ, চৈত্য, বিহার ও সংঘারামগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় ও পরবর্তীকালে ঘন জঙ্গলে আবৃত হয়।

বুদ্ধের সময় জৈন মতাবলম্বী ও আজীবক (কুমারের কাজ যাঁদের পেশা) সম্প্রদায়ের অনেকেই এখানে বাস করতেন ও বুদ্ধের সঙ্গে তাঁদের ধর্ম বিষয়ে বহু তর্কবিতর্ক হয়েছে। রাজা প্রসেনজিৎ ও তাঁর পুত্র জেতকুমার ও অন্যান্য বণিকরা সকলেই ছিলেন জৈন ও মহাবীরের অনুরাগী। তাঁদের মধ্যে একজন ধনী ব্যবসায়ী সুদত্ত বারাণসীতে আত্মীয়গৃহে যাবার পথে বুদ্ধকে দর্শন করে খুবই শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন এবং তাঁকে শ্রাবস্তী আসার জন্য অনুরোধ করেন। সুদত্ত পরবর্তীকালে অনাথপিণ্ডদ বলে খ্যাত হন (বোধহয় গরিব দুঃখীদের মধ্যে তার সেবার কাজের জন্য)। বুদ্ধ সুদত্তর আমন্ত্রণ অস্বীকার করেন কারণ শ্রাবস্তীতে বৌদ্ধভিক্ষুদের থাকার জন্য ভালো বন্দোবস্ত ছিল না। সারিপুত এখানে এসে জেতবনটিকে পছন্দ করে যান। ওই স্থানটি ছিল প্রসেনজিতের পুত্র জেতকুমারের। তিনি খুব উচ্চমূল্য চান। বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুদত্ত সেই উচ্চমূল্য দিতেই স্বীকৃত হন। সুদত্তের গৃহ থেকে জেতবন পর্যন্ত সোনায় বিছিয়ে দিতে বলেন জেতকুমার। ১৮ কোটি স্বর্ণ কার্ষাপণ দিয়ে ওই স্থান আবৃত করেন সুদত্ত— কিন্তু জেতকুমারের গৃহের কিছু আগেই জেতকুমার তাঁকে নিরস্ত করেন। ওই সমুদয় স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে জেতকুমার বহু মঠ, মন্দির, স্তূপ, কোষাগার ও সংঘারাম নির্মাণ করান ও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। বুদ্ধ আদেশ করেন এই স্থানটিকে 'জেতবন বিহারের অনাথপিণ্ডদ আরাম' এই নামকরণ করতে। এই দান-কর্মটির একটি সুন্দর মূর্তিফলক দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারহুতে পাওয়া গেছে— অনাথপিণ্ডদ জলপূর্ণ কলস নিয়ে দাঁড়িয়ে। কয়েকজন স্বর্ণমুদ্রা বিছিয়ে দিচ্ছে, জেতকুমার হাত জোর করে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেক স্তূপ, মন্দির, মঠ ও বিভিন্ন অট্টালিকার বিশদ বিবরণ পাওয়া গেছে ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের লেখা থেকে, অশোকের শিলালিপি থেকে। এ স্থানটি বুদ্ধের এত পছন্দ হয়েছিল এবং এত শিষ্য তাঁর এখানে হয়েছিল যে ২৫ বছর ধরে প্রতি বর্ষাকালে চারমাস ধরে বুদ্ধ এখানে বাস করতেন ও ধর্মোপদেশ দিতেন। রাজা প্রসেনজিৎ প্রায়ই বুদ্ধের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতে আসতেন ও বুদ্ধের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন। সমস্ত বুদ্ধস্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলির মধ্যে বুদ্ধগয়ার পরই 'শ্রাবস্তীকে' সব চাইতে ভালো লেগেছে আমাদের। বিশাল বিস্তৃত স্থানে বিভিন্ন মঠ, সংঘারাম ও বাসস্থানগুলি কত শত সহস্র ভিক্ষু সমাগমে সরগরম ছিল। আজ আছে সে সবের ধ্বংসাবশেষ মাত্র— নীচের ভিত্তি গৃহগুলি মূলগন্ধকুটি বিহার ও কৌসম্ব কুটিরের সামনে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। কল্পনাচক্ষে দেখি সেই সুদূর অতীতকালকে যখন তথাগত তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন ত্যাগের, সাম্যের ও সেবার। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে জনসাধারণ শুনতে এসেছে তাঁর বাণী। দুঃখ দুর্দশা থেকে ত্রাণ

পাবার জন্য ছুটে এসেছে— জানি না সে মুক্তি আজও এসেছে কিনা। আবার হয়তো গোঁড়া রক্ষণশীলদের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে তর্ক করেছেন মোহমুক্ত মন দিয়ে, যুক্তিবাদ দিয়ে খণ্ডন করেছেন প্রতিপক্ষের যুক্তিগুলি।

কৌসম্ব কুটিরের ভিত্তিস্থলে সিংহলি ভিক্ষু আমাদের নিয়ে গেলেন— আমরা নতশিরে সেই মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা জানালাম তাঁর সঙ্গে। এর কিছু নীচে একটি জলাশয়— যেখানে বুদ্ধ স্নান করতেন; সেই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ যেখানে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তিনি পদচারণা করতেন। মূলগন্ধকুটি বিহারের দক্ষিণে ভিক্ষুণী বিশাখা 'পূর্বারাম' সংঘ স্থাপনা করেন— এটি অশোক ও হিউয়েন সাং দুজনেই দেখেছেন। এখানেই বুদ্ধ তাঁর ৯৬ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেন।

প্রসেনজিতের আন্তরিক ও সনির্বন্ধ অনুরোধে বুদ্ধের ৭০ ফুট চন্দন কাঠের মূর্তি মূলগন্ধকুটি বিহারের সামনে স্থাপিত হয়— বুদ্ধের জীবিতকালে এই মূর্তি নির্মিত হয় বলে বুদ্ধের মুখাকৃতির নিকটতম সাদৃশ্য এতে ছিল। পরবর্তীকালে বুদ্ধের যে সব মূর্তি উৎকীর্ণ বা নির্মিত হয় তা এই মূর্তির মুখাবয়ব অনুসারে। ফলে বুদ্ধমূর্তির বিকৃতি বেশি হয়নি। দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান বিজয়ের সময় বৌদ্ধরা অনেক পুঁথি সহ নেপালের কোনও মঠে স্তম্ভ স্থাপিত করেন— পরবর্তী সময়ে ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ওই স্তম্ভ ও মূর্তি বিনষ্ট হয়। খনন করার সময় বুদ্ধমন্ত্র খোদিত বহু মুদ্রা মাটিতে পাওয়া গেছে। সিংহলি ভিক্ষু অশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে সমস্ত কিছু দেখালেন। বুদ্ধগয়া থেকে আনীত বোধিদ্রুমের একটি চারা গাছ থেকে যে বিশাল বৃক্ষের উৎপত্তি তার বেদিটি বাঁধানো। বহু বৎসর ধরে বুদ্ধদেব যে এখানে ছিলেন তাতেই প্রমাণিত হয় তিনি এখানকার লোকদের আচার ব্যবহারে প্রীত ছিলেন ও প্রতি বৎসরই আসতেন। এখানকার ধ্বংসাবশেষ যা কিছু পাওয়া গেছে তা পাটনা মিউজিয়াম ও লখনউতে রক্ষিত আছে। ইচ্ছা আছে তা অদূর ভবিষ্যতে দেখে আসব। স্থানটি এত ভালো লেগেছিল যে দেড়-দু মাইল দূরে প্রসেনজিতের রাজধানী ও বিখ্যাত দস্যু অঙ্গুলিমালের (যে ১০০০ লোকের আঙুল কাটার অঙ্গীকার করে, পরে ভিক্ষু হয়ে যায়) স্তূপ, অনাথপিণ্ডদের স্তূপ প্রভৃতি আর দেখতে যেতে ইচ্ছা করছিল না। যাইহোক মাঝখানে একটা পুলের মতো আছে। একটু উঠে প্রসেনজিতের রাজধানীতে যেতে হয়— এই স্থানগুলি বুদ্ধের বাসস্থান কৌসম্বকুটি ও মূলগন্ধকুটি বিহার থেকে উচ্চে অবস্থিত। অনাথপিণ্ডদের স্তূপটি একটু ডানদিক ঘেঁসে। বনের মধ্য দিয়ে পথ— সিংহলি ভিক্ষুটি আর এলেন না। একজন রক্ষককে পাঠিয়ে দিলেন। সে মোটামুটি এখানকার ইতিহাস জানে। বিশ্রামাগার, ধর্মশালা প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও লোক সমাগম খুব কমই হয়— এই হল তার দুঃখ। সিংহলি ভিক্ষুরা একটা আশ্রম বানিয়ে এই স্থানে সাধনা করতে চান। সিংহল, বর্মা, জাপান প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বৌদ্ধরা প্রায়ই মূল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বা মহাযানী (তিব্বত ও নেপাল বাদে)। শ্রাবস্তী দেখতে বেশ সময় লাগে। ৭-৮ ঘণ্টা ধরে না দেখলে ভালো করে দেখাই হয় না। এই স্থান না দেখলে

বুদ্ধকে জানাই যেন অসম্পূর্ণ থেকে যেতে মনে হয়।

একটু অন্যপথে মজফফরপুর ও হাজিপুরের মধ্যস্থলে অবস্থিত বৈশালী বা বিশালগড়। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৃজি বা লিচ্ছবি গণতন্ত্রের রাজধানী ছিল ও খুব সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। ললিতবিস্তারেও এর উল্লেখ আছে। ইক্ষ্বাকুপুত্র বিশাল এর স্থাপনা করেন। এখানেই শেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর ৫৬১ খ্রিস্টপূর্বে জন্মগ্রহণ করেন ও জীবনের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর এখানেই অতিবাহিত করেন। ১৯৪৫ সালে বৈশালী সংঘ স্থাপিত হয় ও মহাবীরের জন্মোৎসব খুব জাঁকজমক করে প্রতিপালিত হয়। নর্তকী আম্রপালী বা আম্বাপালীর আমন্ত্রণে বুদ্ধ এখানে কয়েকবার এসেছেন ও অন্যান্যদের সঙ্গে বিচারে বসেছেন। এখানেই তিনি প্রথম অসুস্থ হয়ে পড়ে কুশীনগর চলে যান। তাঁর মৃত্যুর পর লিচ্ছবিরা বুদ্ধাস্থির ওপর স্তূপ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে অশোক একটি ১৫ ফুট উচু স্তম্ভ নির্মাণ করেন যার ওপরে পূর্ণাবয়ব সিংহ আসীন। একে ভীমসেনের লাঠিও বলা হয়। বিশালগড়ের ধ্বংসাবশেষ ছাড়াও, পদ্ম সরোবর, অভিষেক পুষ্করিণী ও জৈন মন্দিরগুলি দর্শনীয়। ৫ম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন ও ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং এই স্থান পরিদর্শন করেন। কানিংহাম ও স্মিথ 'বসাড়' গ্রামটি খনন করে বৈশালীর অস্তিত্বকে উদ্ধার করেন।

আমাদের বুদ্ধতীর্থবিজড়িত স্থানগুলির দর্শন এখানেই শেষ।

'ভ্রমণ' অক্টোবর, ২০০৪

ওরাংয়ের জঙ্গলে

বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরি

ঘুম ভেঙে গেল শেয়ালের ঐকতানে। চাদর জড়িয়ে এসে দাঁড়ালাম ওরাংয়ের সাতশিমুল বনবাংলোর সামনের উঠোনে। সূর্য তখনও কুয়াশার পর্দা সরিয়ে মুখ দেখায়নি। একটা রাতচরা নাইটজার পাখি একঘেয়ে ডেকে চলেছে, সামনের ঘাসের জঙ্গল থেকে। মিনিট দশেকের মধ্যেই অন্ধকারকে ফিকে করে লাল হয়ে উঠল পুবের আকাশ। রাত্তিরের গাছের আস্তানা ছেড়ে সামনের জলায় উড়ে এসে বসল দুটো কালাজাং বা ব্ল্যাক স্টর্ক। এরা বিদেশ থেকে পাড়ি জমায় আমাদের দেশে, বিশেষত উত্তর-পূর্ব ভারতে। আগের দিনে পৌঁছতে রাত হয়ে যাওয়ায় ভালো করে বুঝতে পারিনি এ বনভূমির রূপ। এতক্ষণে সমস্ত আকাশকে রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য উঠল। ওরাং-এর জঙ্গলে আমার প্রথম ভোর। সপ সপ ডানার শব্দ করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল পাঁচটা বড়কাও ধনেশ।

আগের রাতের কথামতো ঠিক সাড়ে ছ-টায় ফুলকলিকে নিয়ে মাহুত হাজির। বিশেষ অনুমতি ছাড়া এখানকার হাতি ট্যুরিস্ট নিয়ে জঙ্গলে যায় না। রেঞ্জার ডেকা সাহেবের কাছ থেকে আমার অনুমতি নেওয়াই ছিল। ফুলকলির না আছে হাওদা, না আছে গদি। তবে হাতিতে চড়বার মঞ্চ বানানো আছে বাংলোর কাছেই। দু-পাশে পা চওড়া করে ছড়িয়ে বসলাম হাতির পিঠে। মিনিটদশেক সুস্থভাবে যাবার পরেই হাতি নামল ডানদিকের ঘাসের জঙ্গলে— সেখানে কাদা একহাঁটু। হাতির পিঠে বসে আরম্ভ হল ব্যালান্সের খেলা। এক হাতে ক্যামেরা সামলে, অন্যহাতে দড়ি ধরে প্রায় ঝুলে থাকা। হাতি কখনও চড়ছে খাড়াই ঢালে, কখনও নামছে একহাঁটু কাদায়। ছবি তোলা মাথায়। পড়লেই হাতির পায়ের নীচে। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। হাতির পিঠে করে অনেকবার জঙ্গলে গেছি। কিন্তু এরকম করুণ অবস্থা এই প্রথম। যা হোক, প্রায় আধঘণ্টা চলার পর পৌঁছলাম একটা সমতলে। এতক্ষণে ক্যামেরায় হাত পড়ল। সামনেই একটা গাছে উড়ে এসে বসল একটা গ্রে হেডেড ফিশিং ঈগল। পায়ে ধরা একটা বড়সড় চিতল মাছ, তখনও বেঁচে। গাছের কাছাকাছি যেতেই মাছ নিয়ে ও উড়ে গিয়ে বসল, দূরের একটা গাছে, আর অদ্ভুতভাবে, একই ডালে উড়ে এসে বসল একটা পাল্লাস ফিশিং ঈগল। খুবই কাছ থেকে ছবি পেলাম। কিছুটা এগোতেই পৌঁছলাম একটা জলার

ধারে। সেখানে মহা সমাবেশ। এক সঙ্গে এত প্রজাতির স্টর্ক একই জায়গায় আগে কখনও দেখিনি। এক জোড়া কালাজাং, গোটা পাঁচেক লোহাজাং, কয়েকটা মানিকজোড় আর গুটি কয়েক কাস্তেচরা, হাতি কাছে এগোতেই একসঙ্গে সবাই উড়ল— সে এক সুন্দর দৃশ্য। হঠাৎই খুব কাছের এক সতর্ক বার্তায় কেঁপে উঠল সমস্ত বনভূমি— আর এগিয়ো না! পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে এক বিশাল দাঁতাল। মাহুত তড়িঘড়ি হাতি ঘোরালো উল্টোদিকে। যেতে যেতে জানাল ওই, দাঁতাল গুণ্ডা হাতি, ইতিমধ্যেই একজন শ্রমিককে পায়ে পিষেছে। বেশ কিছুটা যাবার পর আবার সেই জঙ্গল কাঁপানো বৃংহন। ফেরবার রাস্তাটা অনেক সমতল। দুটো কাকার হরিণ ঘাসের মধ্যে একটু থমকে দাঁড়িয়েই দৌড়ে মিলিয়ে গেল ঝোপের আড়ালে। প্রায় ঘণ্টা আড়াই হাতির পিঠে জঙ্গলে ঘোরবার পর ফিরে এলাম বাংলোতে। এখানে একটাই বাংলো। তৈরি করা হয়েছিল খুব চিন্তাভাবনা করে। দুদিকে দুটো শোবার ঘর, মাঝে বসবার ঘর। বসবার ঘরের জঙ্গলের দিককার জানলাগুলো কাচের। সেখানে দাঁড়ালে দেখা মেলে বিস্তীর্ণ উঁচু এলিফ্যান্ট গ্রাসের মধ্যে চরে বেড়ানো গণ্ডারের, বুনো শুয়োর আর সম্বরের। বাংলোর লাগোয়া রান্নাঘর। কাঁচাবাজার করে নিয়ে এলে এখানে রেঁধে দেওয়ার লোক আছে। আর সামনে শানবাঁধানো উঠোন। সেখান থেকেই ঢালু হয়ে নেমে গেছে ঘাসের জমি। উঠোন থেকে ওরাংয়ের বিস্তৃত দৃশ্য চোখে পড়ে। সারাদিন ধরে সেখানে বন্যপ্রাণীর আনাগোনা। বাংলোয় বসে বসে ভারতীয় একশৃঙ্গী গণ্ডারের ছবি তোলবার সহজ সুযোগ রয়েছে এখানে। রেঞ্জার সাহেব এলেন বেলা দশটা নাগাদ। নিজে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন পাঁচ কিলোমিটার দূরে হাতিশালে। সেখানে পাঁচটি বাচ্চার প্রশিক্ষণ চলছে। প্রশিক্ষকেরা তাঁবু খাঁটিয়ে হাতিশালেই রয়েছেন। মিঃ ডেকা জানালেন যে ওঁর জিপ, ড্রাইভার ও আর্মগার্ড রেখে উনি সেদিনই গুয়াহাটি যাবেন ব্যক্তিগত কাজে। তবে আমরা আমাদের সময়মতো রাতের ভ্রমণে বেরোতে পারব ওর গাড়ি নিয়ে।

বিকেলটা কাটল পাখির ছবি তুলে। নানা ধরনের শাখার পাখি, ঈগল আর ঘাসের পাখির আনাগোনা দিনভর। এদের মধ্যে ছিল বাবুনাই, রামগাংরা, নওরং, মোহনচূড়া, বেনেবৌ, ডোরাকাটা বসন্তবৌরী, সর্পভুক, ঈগল, কোড়াল, প্রিনিয়া আরও কত কী। আমার দু-রাতের সফরে দেখা পেয়েছি ১০৩ প্রজাতির পাখির।

রাত আটটায় ড্রাইভারকে আসতে বলে রেখেছিলাম। যথাসময় বন্দুকধারী গার্ড নিয়ে জিপ হাজির। ঠান্ডার মধ্যে টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। ড্রাইভারের কাছে খবর পেলাম দুদিন আগে একটা বুনো হাতি এসে একটা কুনকি হাতিকে মেরে ভালো রকম জখম করে দিয়েছে। তিন কিলোমিটার দূরের বিট অফিস থেকে এক কিলোমিটার দূরে তাকে রাখা হয়েছে— চিকিৎসা চলছে। যখন বিট অফিসে পৌঁছলাম, তখন পশুচিকিৎসক ইনজেকশন তৈরি করতে ব্যস্ত। একজন গার্ডকে সঙ্গে নিয়ে পশুচিকিৎসক আর আমি ওই টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যেই ঘন এলিফ্যান্ট

গ্রাসের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আহত হাতির উদ্দেশে রওনা হলাম। ঘাসের ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় খুব সতর্কভাবে পা ফেলতে হয়, না হলে পায়ে লতা জড়িয়ে হোঁচট খেতে হবে। যাই হোক একটু ভয় ভয় করছিল। কারণ যে কোনও সময় হাতি বা গণ্ডার বেরিয়ে আসতে পারত ঘাসের জঙ্গল ফুঁড়ে। এক কিলোমিটার পৌঁছতে প্রায় আধঘণ্টা সময় লেগে গেল। যা হোক আহত হাতির শুশ্রূষা করে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পৌঁছলাম জিপে। এবার জিপে করে জঙ্গলের রাস্তা ধরে এগোতে থাকলাম। জিপের আলোয় মাঝে মাঝে উড়ে যাচ্ছিল রাস্তার মাঝখানে বসে থাকা রাতচরা ইন্ডিয়ান নাইটজার পাখি। দুটো সজারু একটু ঘাবড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার মাঝখানে, গাড়ির সামনে। জিপ থেকে নিঃশব্দে নেমে ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ দিয়ে শাটার টেপার সঙ্গে সঙ্গেই নিমেষে উধাও হয়ে গেল পাশের ঝোপে। আরও প্রায় তিন কিলোমিটার এগিয়ে রাস্তার বাঁক নিতেই দেখা পেলাম এক বিশাল গণ্ডারের। সঙ্গে একটা বাচ্চা নিয়ে হেলেদুলে চলেছে। ইশারায় ড্রাইভারকে গাড়ি থামিয়ে দিতে বললাম। যদিও আপাত নিরীহভাবেই চলেছে, কিন্তু সঙ্গে ছোট বাচ্চা, বলাতো যায় না। মাঝে মাঝে আমাদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে আবার চলেছে নিশ্চিন্তে। প্রায় মিনিট পাঁচেক যাবার পর, বাঁদিকের জঙ্গলের দিকে মোড় নিয়ে মিলিয়ে গেল। আমাদের গাড়ি আবার এগোতে শুরু করল। প্রায় বারো কিলোমিটার রাস্তায় দেখা মিলল দুটো শেয়াল, বেজি, কাকার হরিণ আর সম্বরের। ফেরার পথে অন্য রাস্তা ধরা হল। এটা একটু ঘুরপথ। কিন্তু এখানেই হল আসল প্রাপ্তি। দেখলাম রাস্তার বাঁ পাশে বসে রয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল, মাপে বেশি বড় না, স্ত্রী বাঘ। বোধহয় গাড়ি বা মানুষ দেখার অভ্যাস একেবারেই নেই, তাই লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে দাঁত বের করে ভয় দেখাল, তারপর রাস্তা পার হয়ে ডানদিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল। ডানদিকে স্পট লাইট ফেলে দেখলাম— গজ তিনেক দূরে ঝোপের আড়ালে বসে একদৃষ্টে গাড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের ড্রাইভার আর গার্ড সাহেবের অবস্থা সঙ্গীন— তারা জীবনে কখনও বন্যবাঘ দেখেনি। গলায় আওয়াজ বের হচ্ছে না, ওদের ধারণা জঙ্গলে বাঘ দেখলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। বাধ্য হয়ে ড্রাইভারজিকে পিছনে পাঠিয়ে, আমি নিজে গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসলাম। ইতিমধ্যে ডানদিকের জঙ্গলে বাঘ গা ঢাকা দিয়েছে। জীবনে অনেকবার অনেকভাবে বাঘ দেখেছি। কিন্তু কোনও বনকর্মীর বাঘ দেখে এ হেন কাহিল অবস্থা দেখিনি। যাইহোক বাংলোয় ফিরলাম রাত প্রায় দুটোর সময়। ফিরেই সমস্ত সহকর্মীদের ডেকে তুলে ড্রাইভারজি বাঘ দেখার ভয়ংকর অভিজ্ঞতার বিশদ বিবরণ দিতে বসে গেলেন।

পরদিন বেলা সাড়ে সাতটায় ফেরার পালা। বাংলোর উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখলাম নিশ্চিন্তে চরে বেড়াচ্ছে একটা গণ্ডার। সম্বরের দল ঘাস খেতে ব্যস্ত। গাড়ি করে গুয়াহাটি ফেরবার পথে রাস্তায় পেয়ে গেলাম এক উপরিপাওনা। দু-পাশে গ্রামের বাড়ির চাতালেই গাছের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটা হাড়গিলে পাখি।

এরা এখন বিলুপ্তপ্রায়। সারা ভারতে গুয়াহাটির উপকণ্ঠেই এদের দেখা মেলে।

ওরাং অভয়ারণ্য যাবার সবচেয়ে সহজ রাস্তা তেজপুর থেকে গুয়াহাটি তেজপুর সড়কের ৪৫ কিলোমিটার পশ্চিমে চারিয়ালি পৌঁছে, চারিয়ালি থেকে ১৮ কিলোমিটার দক্ষিণে গেলেই ওরাংয়ের প্রবেশদ্বার। আর গুয়াহাটি থেকে চারিয়ালির দূরত্ব ১২৫ কিলোমিটার। বাস যাচ্ছে তেজপুর আর গুয়াহাটি থেকে চারিয়ালি আর চারিয়ালি থেকে সকালে একটা, দুপুরে একটা বাস যায় ওরাং। গুয়াহাটি থেকে বাইহাটার রাস্তা নিতে হবে। কাঁচাবাজার করে নেওয়া উচিত চারিয়ালি থেকেই। সব জায়গাতেই গাড়ি ভাড়া মেলে। শিলাবাড়ি ফরেস্ট লজটি গেটের কাছেই আর পাঁচ কিলোমিটার দূরে আছে সাতশিমুল বাংলো। বুকিংয়ের জন্য লিখতে হবে: ডি এফ ও, ওয়েস্টার্ন আসাম ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশন, তেজপুর।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

মেঘালয়ের তিন অরণ্য

সিজু নোকরেক বালফাক্রাম

বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরি

মেঘের রাজ্য মেঘালয়। একদিকে তার জয়ন্তীয়া পাহাড়, আরেকদিকে গারো পাহাড়। দুটো পাহাড়েই সবুজের সমারোহ। তবে গারো বোধহয় বেশি সবুজ।

হেমন্তের এক সকালে পৌঁছে গেলাম গুয়াহাটি। রওনা হলাম কৃষ্ণৈ-এর দিকে। ঘণ্টাদেড়েকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম কৃষ্ণৈ। এখান থেকে যেতে হবে 'তুরা'। নামটা ছোট্ট কিন্তু নামের মধ্যে দোলা আছে। গারো পাহাড়ের সদর শহর তুরা। গুয়াহাটি থেকে ১৯০ কিলোমিটার রাস্তা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ে চড়া শুরু হল। ভীষণ সুন্দর রাস্তা, দুদিকে সুপুরি গাছের বন। পাক খেতে খেতে পৌঁছে গেলাম তুরায়। বনদপ্তরের বাংলো আগে থেকেই সংরক্ষিত ছিল। আলাপ করতে এলেন বনপাল সাহেব। অমায়িক মানুষ, আতিথেয়তারও শেষ নেই। দুপুরের খাবার সেরে বের হলাম তুরা দর্শনে। সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর, পরিষ্কার রাস্তা, বনদপ্তরের অফিস, বাজার আর প্রাণবন্ত গারো ছেলেমেয়ে। বাজারের দিকটা অবশ্য অন্যান্য পাহাড়ি শহরের মতোই ঘিঞ্জি।

পরদিন ভোর না হতেই গাড়ি হাজির। আজকের গন্তব্য 'সিজু'। মুখ্য বনপাল, বন্যপ্রাণী শাখা, শিলং-এর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া ছিল আগেভাগেই। সুতরাং তুরা থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরের সিজু অভয়ারণ্যে পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। মাত্র পাঁচ বর্গকিলোমিটারের ছোট্ট বন। শুষ্ক আর আর্দ্র পর্ণমোচী গাছে মিশ্র জঙ্গল, তবে শাল গাছেরই প্রাচুর্য। ১৯৭৯ সালে 'সিজু' অভয়ারণ্যের শিরোপা পেয়েছে। অজস্র রংবেরঙের পাখির মেলা। তাদের মধ্যে দেখা পেলাম, সবুজ ম্যাগপাই, আলতাপরী বা হাজারিকা, চাকদোয়েল, বাবুনাই আর দামা পাখির। পুরো জঙ্গলটাই প্রায় হেঁটে ঘুরে ফেললাম। মাঝে মাঝে বন ভীষণ গভীর। দুটো কাকার হরিণ চকিতে পালিয়ে গেল। গাছে দেখা পেলাম অসমিয়া বাঁদরের। বেশ গম্ভীর মুখভঙ্গি, সাধারণ বাঁদরের মতো চপলমতি না। সিজু অভয়ারণ্যের আরেক আকর্ষণ ০.৩১ বর্গকিলোমিটার নিয়ে গড়ে ওঠা 'পতঙ্গভুক' গাছের (পিচার প্ল্যান্ট) অভয়ারণ্য। অসংখ্য ফুল ফুটে ছিল গাছে গাছে। ফুলের নীচের

দিকটা ফাঁপা আর ওপরের দিকে আছে ঢাকনা। ঢাকনাটা একটু ফাঁক করা থাকে, মধু খাবার লোভে পোকামাকড় ভেতরে ঢুকলে আর নিস্তার নেই, ঢাকনা বন্ধ হয়ে যাবে। আমাজনের জঙ্গলে শুনেছি আরও অনেক বড়সড় পিচার প্ল্যান্টের দেখা পাওয়া যায়। আসলে সিজু অভয়ারণ্যের গড়ে ওঠার কারণই হল এই পতঙ্গভুক গাছেদের রক্ষা করা। সিজুর আরেক আকর্ষণ 'সিজু গুহা'। পাহাড়ের নীচের দিকে গুহা আর গুহার প্রবেশ মুখে সারাদিন জল পড়ে চলেছে, যার ফলে গুহার মুখে প্রায় সারাদিন ধরে জেগে থাকে রামধনু। গুহার ভেতরে ঢুকলাম বেশ সন্তর্পণে। পায়ের তলায় সরু ধারায় যে নদীর শুরু, যত এগোতে লাগলাম ততই সে নদীর জল বাড়তে থাকল। ভেতরে অন্ধকার। মাথার ওপর দিয়ে এলোপাথাড়ি উড়ে যাচ্ছিল বাদুড়েরা। শুনেছি ওখানে ছয় প্রজাতির বাদুড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। বেশি দূর এগনো গেল না, জল বেড়ে যাওয়ায়। বনবিভাগের সুন্দর বিশ্রামগৃহে রাত কাটাবার ব্যবস্থা ছিল। আর তার সঙ্গে চৌকিদারের নিপুণ হাতের রান্না— সব মিলিয়ে দারুণ।

সিজুর পালা মিটিয়ে চললাম আরও পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরের আরেক জঙ্গল 'নোকরেক'-এর দিকে। তুরা থেকে নোকরেক আশি কিলোমিটার। মেঘালয়ের গারো পাহাড়ের ৪৭ বর্গকিলোমিটার জঙ্গল নিয়ে গড়ে উঠেছে নোকরেক জাতীয় উদ্যান। নোকরেককে অভয়ারণ্য ঘোষণা করবার প্রধান কারণ বিপন্ন বৃক্ষ প্রজাতি 'সাইট্রাম'-কে রক্ষা করা। মিশ্র পর্ণমোচী এই জঙ্গলে বাঘেরও সন্ধান মেলে। তবে গাছের ডালে, ঘন জঙ্গলের ফাঁকে চিতাবাঘের দেখা পাবার সম্ভাবনা বেশি। শুনেছি এখানে আমচিতাও (ক্লাউডেড লেপার্ড) আছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের দুই প্রজাতির বাঁদর— টুপি হনুমান (ক্যাপ্‌ড লাঙ্গুর) আর অসমীয়া বাঁদর রয়েছে এখানে। এছাড়া হাতি মাঝে মাঝেই এই বনের পথে যাতায়াত করে। আমার যাত্রাপথে অবশ্য হাতির পায়ের ছাপ আর বর্জ্য দেখেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হল। তবে টুপি হনুমান আর অসমীয়া বাঁদরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। চিতাবাঘের সদ্য চলা পায়ের ছাপ অনুসরণ করে প্রায় দেড় কিলোমিটার যাবার পর, ছাপগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল বনের ভেতরে। ফেরবার মুখে দেখা পেলাম হিমালয়ের ভামের (হিমালয়ান পালেন চিভেট)। একদিনের ভ্রমণে আর কিইবা আশা করা যায়! নোকরেকে কোনও থাকবার বন্দোবস্ত নেই, তাই রাত কাটাতে হল উইলিয়ামস নগরের বনবাংলোয়। ওখানে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। শুনলাম এখানকার জঙ্গলেও বাঘের আনাগোনার কথা।

পরদিন ভোর হতেই গাড়ি ছুটল। তুরা থেকে ১৬৭ কিলোমিটার দূরে বালফাক্রাম জাতীয় উদ্যান। উইলিয়ামস নগর থেকে বালফাক্রাম যেতে সময় লাগল ঘণ্টা তিনেক। ঝকঝকে সোনালি সকালে পৌঁছে গেলাম বালফাক্রাম। হাঁটাপথে বেরিয়ে পড়লাম বনের পথে। ১৯৮৮ সালে ২০০ বর্গকিলোমিটারের এই বনভূমি পেয়েছিল জাতীয় উদ্যানের শিরোপা। জীববিজ্ঞানীরা এখনও এই

জঙ্গলের পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করতে পারেননি। তাই জীববিজ্ঞানী আর উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর কাছে বালফাক্রাম এক বিশেষ আকর্ষণ।

বাঘ, চিতাবাঘের যথেষ্ট আনাগোনা এ জঙ্গলে— পায়ের ছাপ তাদের উপস্থিতি জানিয়ে দিল। জঙ্গলে হাঁটবার পথে মাথায় টুপি রাখা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ গাছের ডাল থেকে মাথায় জোঁক পড়ে। গাছের ডালে সবুজ ফুলের মতো ঝুলে ছিল লটকানের ঝাঁক (ইন্ডিয়ান লরিকীট)। টিয়া পাখিকে ছোট্ট করে দিলে লটকানের মতো দেখতে হয়ে যাবে। বড়কাও ধনেশ (গ্রেট হর্নবিল)-এর একটা বড় দল ডানায় শপ শপ শব্দ তুলে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। সম্বিত ফিরল ভারি ডাল ভাঙার শব্দে। যেখান দিয়ে আমি হাঁটছিলাম, সেই পাহাড়ের ঢাল ধরে, শ'দেড়েক ফুট নীচ দিয়ে ডাল ভাঙতে ভাঙতে এগোতে লাগল নটা হাতির একটা দল। আমার উপস্থিতি টের পেয়েও গ্রাহ্য না করে ওরা এগোতে লাগল সামনের দিকে। বুঝলাম আমাদের উত্তরবঙ্গের হাতির মতো ওরা লোক দেখলেই তাড়া করে না। দুটো টুপি হনুমান নিবিষ্ট মনে কুল খাচ্ছিল পা ঝুলিয়ে। আমায় দেখে বিরক্তি প্রকাশ করল দাঁত খিচিয়ে। বেশ কিছু জোঁকের শিকার হয়ে বাংলোয় পৌঁছতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল। পরদিন ঘুম ভাঙতেই চারদিকে উল্লুকের (হুলক গিবন) ডাক! তড়িঘড়ি বেরিয়ে ওদের খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু ওরা ছিল বেশ কিছুটা দূরের পাহাড়ে। অগত্যা পাখি দেখা। বাংলোর আশপাশেই অনেক পাখির মেলা। নানান জাতের ওয়ার্বলার আর ফ্লাইক্যাচারে ভরা এখানকার গাছপালা। একটা গাছের মগডালে ল্যাজ ঝুলিয়ে চালতা খেতে ব্যস্ত ছিল একটা মালাবার জায়েন্ট স্কুইরেল।

সকালেই গাড়ি করে বেরলাম বালফাক্রামের মালভূমির উদ্দেশে। মালভূমিতে রয়েছে একটা বড়সড় জলা। জলার জল কালো। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস, গারোরা মারা যাবার পর ওই জলায় তাদের আত্মা এসে স্নান করে। তাতে তাদের পাপ ধুয়ে যায়। তাই জল কালো। মালভূমির ওপর খোলা মাঠ ধরে চলতে শুরু করলাম পায়ে হেঁটে। পাশে জঙ্গলের শাল গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখলাম এগিয়ে চলেছে বেশ বড়সড় একটা গাউরের দল। কিছুটা চলার পর মালভূমির সামনে দেখা দিল বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমি।

এবারে ফেরার পালা। দুপুরের খাওয়া সাঙ্গ করে গাড়ি ঘোরালাম ১৬৭ কিলোমিটার দূরের তুরা শহরের দিকে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে সরাসরি রেলপথে গুয়াহাটি পৌঁছতে হলে সবচেয়ে সেরা ট্রেন ২৩৪৫ আপ সরাইঘাট এক্সপ্রেস। হাওড়া থেকে বুধ, বৃহস্পতি আর রবিবার বিকেল ৩টে ৪৫ মিনিটে ছেড়ে পরদিন সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে গুয়াহাটি পৌঁছে যায়। সরাইঘাট ছাড়াও

রয়েছে ৫৯৫৯ আপ কামরূপ এক্সপ্রেস। এই ট্রেনটি প্রতিদিন হাওড়া থেকে বিকেল ৫টা ৩৫ মিনিটে ছাড়ে।
কলকাতা থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স, জেট, সাহারা, এয়ারডেকানের বিমান প্রতিদিন গুয়াহাটি যাচ্ছে।

কোথায় থাকবেন

তুরা, উইলিয়মস নগর ও বালফাক্রামের বনবাংলোয় থাকবার জন্য অনুমতি নিতে হয় নীচের ঠিকানায়:
ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার
বন্যপ্রাণী শাখা, তুরা, পশ্চিম গারো হিলস, মেঘালয়
নকরেকে রাত্রিবাসের কোনও ব্যবস্থা নেই। সিজু ও নকরেক প্রবেশের জন্য অনুমতি নিতে হবে এই ঠিকানায়:
চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন, শিলং, মেঘালয়

'ভ্রমণ' জানুয়ারি, ২০০৬

লুমুট হয়ে প্যাংকর

উত্তরা গঙ্গোপাধ্যায়

স্পিডবোটে চেপে চলেছি মালয়শিয়ার একটি জনপ্রিয় দ্বীপ প্যাংকর দেখতে। ডিংডিং চ্যানেল বা ডিংডিং প্রণালীতে তখন প্রবল হাওয়া, উথালপাথাল ঢেউ। কিছুদূরেই ডিংডিং নদী এসে মিশেছে সমুদ্রে, যদিও আমাদের যাত্রাপথ থেকে সেদিকটা দেখা যায় না। দূরে ভাসমান প্যাংকর দ্বীপকে মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রের বুকে একটুকরো জঙ্গলের ঠাসবুনোট। আরেকটু কাছে যেতে নজরে এল সাদা বালির সৈকত ঘিরে রেখেছে দ্বীপের অনেকটাই।

মালয়শিয়ার রাজধানী কুয়ালা লামপুর থেকে কিছুটা উত্তরে সমুদ্র-পাড়ের শহর লুমুট। গাড়িতে সময় লাগে ঘণ্টা চারেক। লুমুট থেকে মিনিট চল্লিশেকের সমুদ্রযাত্রায় পৌঁছনো যায় প্যাংকর দ্বীপে। কুয়ালা লামপুর থেকে কাছে বলে লুমুট বা প্যাংকর যথেষ্ট পর্যটকপ্রিয় কিন্তু এখানে অন্যান্য উপকূল শহর যেমন পেনাং বা লাংকাউয়ির মতো ভিড় নেই। কারণ এখানে তাঁরাই আসেন যাঁরা নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশে দিনকয়েকের ছুটি কাটাতে চান কিংবা পরিবার সহ কিছুদিন নিজেদের মতো করে কাটাতে চান। ছবির মতো সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা আর নির্ভেজাল অবকাশ যাপনই হল লুমুট-প্যাংকরের প্রধান আকর্ষণ।

সাদা ফেনার রাশি পিছনে ঠেলে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে আমাদের স্পিডবোট। বড় বড় ঢেউয়ের মোকাবিলা করছে নাক উঁচিয়ে। মাঝে মধ্যেই ঢেউয়ের জল ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাদের। সবার গায়েই কমলা রঙের বাধ্যতামূলক লাইফ জ্যাকেট। যদি আমরা সাধারণ ফেরি করে লুমুট থেকে প্যাংকর পার হতাম তাহলে অবশ্য জ্যাকেট-ট্যাকেট কিছুই লাগত না। কিন্তু আমরা যে হোটেলে উঠেছি সেখান থেকে লুমুটের জেটি বেশ দূর। তাই আমরা হোটেলের নিজস্ব জেটি থেকে তাদেরই ছোট বোটে করে চলেছি। আর এই সব পর্যটক বোটে লাইফ জ্যাকেট বাধ্যতামূলক।

আমরা বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ রওনা দিয়েছি। খোলা সমুদ্রে তখন বেশ রোদ। তাই মাঝে মধ্যে জলের ঝাপটা মন্দ লাগছে না কিন্তু ক্যামেরা বার করার উপায় নেই। বেশ চলছিলাম কিন্তু হঠাৎ কী যে হল বোঝা গেল না, শুধু তীব্রগতিতে আসা বোটটা একবার টালমাটাল হয়ে ঘটাং করে থেমে গেল। পাইলট

আর সারেং মিলে যতই চেষ্টা করুক না কেন, ইঞ্জিন কিছুতেই সাড়া দেয় না। বেশ খানিক চেষ্টা করেও যখন কিছু হল না তখন খবর গেল হোটেলে, আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম দ্বিতীয় বোটের জন্য। এতক্ষণে জলের দিকে নজর দেওয়ার সুযোগ হল। জল গভীর কিন্তু পাড় বেশি দূরে নয় বলে বিশেষ কোনও জীবজন্তুর দেখা পাওয়া গেল না। শুধু দুয়েকটি অতিকায় জেলিফিশ চলেছে ভেসে ভেসে আর গোটা কয়েক মাছের মতো ছায়া একবার দেখা দিয়ে আবার হারিয়ে গেল কোথায়। দূর দিয়ে দুয়েকটি ফেরি বোট চলে গেল আমাদের হাত নেড়ে। আরও দূরে দাঁড়িয়ে আছে নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ। লুমুট মালয়শিয়ার নৌবাহিনীর প্রধান কার্যালয়। অবশেষে একটা মাছ ধরা বোটের সঙ্গে আমাদের বোটকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হল প্যাংকর জেটিতে।

জেটিটি খুবই সুন্দর। কিন্তু আমাদের বিচিত্র নৌবহরের জায়গা হল না সর্বসাধারণের নামার সিঁড়িতে। আমরা ভিড়লাম একপাশে। নামখানা-কাকদ্বীপের জেটির মতো এক ভাঙা পাটাতনে উঠে সেখান থেকে উঠলাম জেটিতে।

লম্বা জেটি এসে পড়েছে সুন্দর এক যাত্রী প্রতীক্ষালয় আর বাগানের প্রান্তে। অপেক্ষারত যাত্রীরা ইচ্ছে করলেই মেশিনে পয়সা ফেলে চা-কফি-কোক খেতে পারেন। রয়েছে টিকিটঘর আর শৌচালয়। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বেশি নজরে পড়ে তা হল পরিচ্ছন্নতা। জেটি থেকে একধাপ ওপরে শহর। ধাপ পার হলেই সিগারেট, চিপস, পপকর্ন ইত্যাদি খাবার-দাবারের দোকান। চারদিক বেশ ঝকঝকে, দেখলে মনে হয় যেন সদ্য রং করেছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম প্রতি বছর একবার রং করা হয় জেটি ও তার চারপাশ।

দূর থেকে বোঝা যায় না কিন্তু প্যাংকর দ্বীপ আসলে একটি উঁচু টিলা। বেশিরভাগটাই জঙ্গলে মোড়া। সমুদ্রের ধার ঘেঁসে আগে শুধু জেলে বস্তিই ছিল। এখন সেখানে শহর। মালয়েশীয়রা অবশ্য বলে 'কামপং' বা গ্রাম। ফেরিঘাটের ধারেই দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি টয়োটা ভ্যান। সরকার নির্ধারিত রেটে যাত্রী নিয়ে যাবে দ্বীপের নানা প্রান্তে। আমরাও চড়ে বসলাম একটা ভ্যানে।

জেটি থেকে মাত্র বিশ মিনিটের হাঁটাপথে চন্দ্রাকৃতি পাসির বোগাক সৈকত। এখানে পাহাড়ি পথ ও সৈকতের ধার ধরে ট্রেকিং করে পৌঁছনো যায় সুঙ্গেই পিনাং শহরে। প্যাংকরের তেলুক নিপা সৈকতটিও বেশ জনপ্রিয়। যাঁরা সামুদ্রিক মাছ ও প্রবাল দেখতে চান, তাঁদের জন্য আদর্শ জায়গা হল কোরাল বে।

সমুদ্রের ধার ধরে খানিকটা বেড়িয়ে আমাদের ভ্যান উঠতে লাগল পাহাড়ি পথ ধরে। সারা শহর জুড়ে এই একটাই প্রধান রাস্তা— ২৫ কিলোমিটার লম্বা রিং রোড— ঠিক সাপের মতো পেঁচিয়ে উঠেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। গাড়ি-ঘোড়া বিশেষ নেই। গাছের ছায়ায় ছায়ায় হেঁটেও যেতে মন্দ লাগবে না। রাস্তার একপাশে ঘন জঙ্গলে মোড়া পাহাড়ি ঢাল। অন্যদিকে কখনও কখনও দেখা যাচ্ছে সমুদ্র, সৈকত আর সৈকতের ওপর অবস্থিত রিসর্টগুলি। লুমুটের থেকে প্যাংকরের

রিসর্টগুলি বেশি দামি। ইওরোপ-আমেরিকার পর্যটকই বেশি। জার্মানরা নাকি খুব প্যাংকরের ভক্ত। দুয়েকজন সাহেবকে দেখলাম বিশেষ ধরনের সাইকেল চালিয়ে চলেছে পাহাড়ি পথে। এরা নাকি সব এখানে মাউন্টেন বাইকিং-এর আনন্দ নিতে আসেন। আর আসেন নাকে নল লাগিয়ে সমুদ্রের জলে 'স্নরকেলিং' করতে। গাড়িতে করেই পার হয়ে গেলাম দুটি 'কামপং'। চিনেদের বসতি। দেখা হল মাছ প্রসেসিং কারখানা বা 'সাতে ফিশ ফ্যাকট্রি'। অন্ধকার হয় হয় এমন সময় পৌঁছলাম ওলন্দাজ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে।

প্যাংকর দ্বীপের দক্ষিণদিকে ৩০০ বছরের ওলন্দাজ দুর্গ। মালাক্কা প্রণালীর পথে পেরাকের সমৃদ্ধ টিন ব্যবসাকে দখলে রাখার জন্য এই দুর্গ তৈরি করেছিল তারা। পরে অবশ্য ডাচদের থেকে ইংরেজদের হাতে যায় প্যাংকরের কর্তৃত্ব। ১৯৭৩ সালে মালয়শিয়ার জাতীয় মিউজিয়ামের উদ্যোগে জায়গাটিকে সুন্দর করে সাজানো হয়। থাকার মধ্যে রয়েছে খানিক দেওয়ালের অংশ আর একটি পাথরে খোদাই করা ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি-র 'কোট অব আর্মস'। সারা জায়গাটি ঘিরে তৈরি হয়েছে বাগান, যাত্রীদের জন্য বসার ব্যবস্থা, খাবারের দোকান, স্যুভেনির শপ।

সূর্যাস্ত দেখব বলে আবার নেমে এলাম দ্বীপের পশ্চিমে। সামনে দিগন্তবিস্তৃত নীল জল। চারদিক রাঙিয়ে ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত গেল। আমাদের পিছনে দোকানের সারি— বেশিরভাগই স্যুভেনির শপ আর চিনে খাবারের দোকান। কিছু কেনাকাটা সেরে আমরা আবার পাড়ি দিলাম লুমুটের উদ্দেশে।

কুয়ালা লামপুর থেকে আসা পথটি ডিংডিং নদী পেরিয়ে দুভাগ হয়েছে। বাঁদিকের পথটি গেছে লুমুট শহরের দিকে আর ডানদিকের পথটি গেছে দামাই লাউতের সুইস গার্ডেন রিসর্টের দিকে। আমরা ছিলাম সুইস গার্ডেন রিসর্টে। হোটেলের রিসেপশনটি হল তিনতলায়। সেখান থেকে ধাপে ধাপে নেমে গেছে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত। রিসর্টের সুদৃশ্য কফিশপ 'দি গার্ডেন টেরেসে' বসে দূরের প্যাংকর দ্বীপ ও মালাক্কা প্রণালীর একাংশ দেখা যায়।

পরদিন সকালে চললাম লুমুট শহর দেখতে। লুমুট শহরটিও বেশ সুন্দর। সমুদ্রের ধার ধরে লম্বালম্বি শহরের বিস্তৃতি তাছাড়া ইতস্তত ছড়ানো টিলার ওপর দুয়েকটি বাড়িঘর। পুরনো বাসিন্দাদের মতে, ক্রমশ বদলে যাচ্ছে লুমুট। 'লুমুট' শব্দের অর্থ 'শ্যাওলা'। আগে সমুদ্রসৈকত জুড়ে জলজ গাছপালা ও শ্যাওলা থাকত। আর ছিল জেলেদের বাস। কিন্তু এখানে মালয়শিয়ার নৌবাহিনীর সদর দপ্তর হওয়ার পর বদলাতে শুরু করে জীবনযাপনের ধারা। হালফিল ধরনের বাড়ি আর ব্যবসা লুমুটের সৌন্দর্যহানি করছে। কিন্তু সমুদ্রের ধারে স্ট্রান্ড অঞ্চলটি বেশ সাজানো। সমুদ্রের পাড় ঘেঁসে পাঁচিল, পাম গাছের সারি, সুদৃশ্য ল্যাম্পপোস্ট, বসার জন্য বেঞ্চ। শহরের দিকে সরে এলে দোকানের সারি। বিক্রি হচ্ছে ঝিনুক আর কাঠের তৈরি হস্তশিল্প, শুকনো মাছ ইত্যাদি। লুমুট থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে তেলুক বাটিকের সমুদ্রসৈকতটি সবার কাছেই প্রিয়। ছুটির দিনে

এখানেই বসে ক্যাম্পিং ও পিকনিকের আসর। স্থানীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আগস্ট থেকে নভেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় লুমুটের বাৎসরিক সমুদ্র উৎসব 'পেসতা লাউত'। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খাদ্যমেলা ছাড়াও থাকে নানাবিধ সমুদ্রক্রীড়ার আয়োজন। এই সময়ে লুমুট ও প্যাংকরের হোটেলগুলিতে খুব ভিড় হয়।

লুমুট দেখে আমরা আবার ফিরে গেলাম দামাই লাউত। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন আবার কুয়ালা লামপুর। পথে অবশ্য একবার থামা হয়েছিল ডিংডিং নদীর পাড়ে ম্যানগ্রোভ জঙ্গল দেখার জন্য।

'ভ্রমণ' এপ্রিল, ২০০৩

কলম্বাসের জাহাজে আর জলদস্যুদের নৌকোয় ভাস্কো-দা-গামার দেশে

ভূ-পর্যটক বিমল দে

১৯৯২ সালে, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পাঁচশো বছর পূর্তি উপলক্ষে আমেরিকা ও স্পেন সরকার একটা বিরাট উৎসব করল। শুধু রাজকীয় উৎসব বললে ভুল হবে, আরও ব্যাপক আরও বিপুল। দীর্ঘ একমাস ধরে চলা সেই উৎসব পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী, পরিব্রাজক, আবিষ্কারক, অভিযাত্রী, দেশনেতা আর শিক্ষাবিদদের এক মহামিলনক্ষেত্রের রূপ নিয়েছিল।

আজ ২০০৩ সাল। এগারো বছর পর কেন সেই পুরনো কথায় আসছি? ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পাঁচশো বছর উপলক্ষে সেই সময়কার আমেরিকা ও স্পেনের একটি হুবহু ছবি তুলে ধরা হয়েছিল। ছবি প্রদর্শনী থেকে শুরু করে পোশাক, খাওয়াদাওয়া, সামাজিক অনুষ্ঠান আর বিশেষত সে যুগের রেড ইন্ডিয়ানদের মনোভাব। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আর আকর্ষণীয় ছিল কলম্বাসের নৌবহর।

দক্ষিণ স্পেনের সেভিই নামক শহরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর সেভিই বন্দরে প্রদর্শিত হয়েছিল কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের তিনটি ক্যারাভেল। সেই রণতরী বা আবিষ্কার তরীতে পালতোলা পুরো কাঠের জাহাজটার থামে দড়িতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চলে গিয়েছিলাম সেই ১৪৯২ সালে। মনে মনে ভেবেছিলাম বন্দরে দাঁড় করানো জাহাজে সেই সময়কার একটা জাহাজি পরিবেশ পাওয়া গেল কিন্তু এই জাহাজে চড়ে যদি আবার পাল তোলা যেত তাহলে আরও ভালো হত। উপলব্ধি করতাম সেই দুঃসাহসী কলম্বাসের মনোভাব। বলাই বাহুল্য যে এই জাহাজগুলো হুবহু নকল মাত্র, ঠিক ছবিতে ও ইতিহাসের বইয়ে যে রকম আছে। প্রদর্শনীর সেই জাহাজগুলির মধ্যে যেটি প্রধান অর্থাৎ ক্রিস্টোফার কলম্বাস নিজে যে জাহাজে দুবার গিয়েছিলেন তার নাম ছিল সান্তা মারিয়া। তার ঠিক ঠিক অনুকরণে যেটা তৈরি হয়েছে তার নাম বোয়া এসপেরানসা ইংরিজিতে গুড হোপ। বন্দরে দাঁড় করানো সেই জাহাজে উঠে যখন সামান্য ঢেউয়ের দোলায় দর্শকরা দুলত, মনে হত ইতিহাসের দোলনায় দোলা

খাচ্ছি। একটা অদ্ভুত শিহরণ। আমি পথিক পর্যটক, আমাদের চিন্তা অধিকাংশ সময় মনেই থেকে যায়, বাস্তবে সব সময় পরিণত হয় না। বার বার ভেবেছিলাম এই জাহাজে চড়ে একবার যদি ঘোরা যেত! কলম্বাসের অন্য দুটো জাহাজের নাম ছিল লা নীনা ও লা পিন্তা।

প্রবাদে আছে 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়', আমি সেই প্রবাদে জুড়ে দিই— ইচ্ছাটা সাধ্যের মধ্যে হতে হবে তবেই তো!

দীর্ঘ এগারো বছর পর সুযোগ এল। ১৯৯২ সালের সেই ইচ্ছাটা ঘূর্ণির মতো মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে মনের গভীরে ঢুকে আটকে গিয়েছিল। সুযোগ এল ফারো যাবার। পর্তুগালের দক্ষিণ-পশ্চিমের আলগার্ভে (Phaeo Capital of Algarve) প্রদেশের রাজধানী ফারো। আলগার্ভে প্রদেশটি প্রাচীন যুগ থেকেই নাবিক আবিষ্কারক আর জলদস্যুদের আদিস্থান। কেন এই স্থানটি নাবিক আবিষ্কারক জল-অভিযাত্রী ও জলদস্যু বা পাইরেটদের পীঠস্থান ছিল? তার ইতিহাস কী? এর একমাত্র উত্তর, অশান্ত আটলান্টিকের কোণে এর ভৌগোলিক অবস্থান।

জাহাজ ও বাণিজ্যের জন্য পর্তুগালের এই অঞ্চলটির নাম নাবিকদের জানা। এটা সাধারণ ট্যুরিস্টদের যাতায়াতের পথে পড়ে না তাই আমাদের দেশ তো দূরের কথা ইউরোপের প্লেসেস অব ট্যুরিস্ট ইন্টারেস্টের তালিকায় এই অঞ্চলের নাম নেই। পোর্তো লিসবনের কথাই লোকে জানে। সবকিছু ইন্টারনেটে অবশ্য পাওয়া যাবে। জাহাজ ও বোট থেকেই এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাই প্রয়োজন একজন লোকাল গাইড। একটু দ্বিধা নিয়ে অনেকদিন আগের লেখা একটা নাম ও ঠিকানা ছিল সেটাই বার করলাম, তারপর হোটেল থেকেই টেলিফোন করলাম:

—হ্যালো মিস গাগো।

—হ্যাঁ, আমিই।

—আমার নাম বিমল দে, ভারতীয়, আপনার সঙ্গে জেনেভায় পরিচয় হয়েছিল। আপনি দি ব্লু ফ্ল্যাগ কনফারেন্সে পর্তুগালের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

ভদ্রমহিলা একটু থেমে ভেবে নিলেন তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন— ও হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মনে পড়েছে, আরে আপনার কথা মনে থাকবে না ...।

বাঁচা গেল, আমাদের কথাবার্তা শুরু হল। এরকমই হয়, চলার পথে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়, কেউ ভুলে যায়, কেউ সময়াভাবে বেশি কাছে আসতে চায় না, কেউ ইচ্ছা করে চেপে যায়, পাছে ঘাড়ে চেপে বসে, কাজেই পুরনো টেলিফোনে যোগাযোগ করার সময় সব সময়ই সতর্ক থাকি চিনবে কি চিনবে না, তারপর কণ্ঠস্বরেই বুঝি আমন্ত্রণ না বিসর্জন। মিস গাগোর কণ্ঠস্বরেই বুঝলাম যে তার আন্তরিকতা আছে।

কিছুক্ষণ পুরনো দিনের কথা বলে নিজেদের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তুললাম। তারপরই বললাম আমার অভিপ্রায়। ভদ্রমহিলা শুনেই লাফিয়ে উঠলেন।

—আরে! সত্যিই আপনি ভাগ্যবান, কালকে সকালেই চলে আসুন আমার

অফিসে, তারপর দেখবেন একটা সারপ্রাইজ।

বুঝলাম এতদিন ধরে তার টেলিফোন নম্বরটা রেখে ভুল করিনি। পরদিন সকাল নটায় তার নির্দেশানুযায়ী চলে এলাম ফারোর অফিসে। মিস গাগোর পুরো নাম ডঃ কনসেইচাও গাগো এখানকার এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর। আমাকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে আপ্যায়ন জানালেন।

মিস গাগো তাঁর সেক্রেটারির ওপর টেলিফোনের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমার মুখোমুখি পাশের সোফাতে এসে বসলেন। তারপর বার বার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি যে রকম ছিলেন তেমনই আছেন।

আমি ধন্যবাদ দিয়ে উত্তর দিলাম, আপনাকে আগের থেকেও সুন্দরী লাগছে। ভদ্রমহিলা তাঁর বাঁ হাত দিয়ে চুল গুছিয়ে বললেন, সত্যি!

এগুলো ভদ্রতামূলক মুখোশি কথাবার্তা, অনেকটা ফর্মুলার মতো। তারপর শুরু হল আমাদের আসল প্রসঙ্গ। আমি সরাসরি বললাম:

—আপনার এরিয়াতে বেড়াতে এলাম, আমাকে পরামর্শ ও উপদেশ দিন।

—আপনি খুব ভালো সময় এসেছেন। মনে হয়, সব খবর নিয়েই এসেছেন তাই না?

আমি জবাব না দিয়ে হাসিমুখে তার মুখের দিকে তাকালাম, ভাবটা বলে যান আমি শুনছি এরকম। মিস কনসেইচাও শুরু করলেন:

পর্তুগালের সর্ব দক্ষিণের এই প্রদেশটিকে বলে আলগার্ভে। এই অঞ্চলের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে সাগরের স্বচ্ছ পরিষ্কার জল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাগরসৈকত, সাগর ও সমুদ্রতীরবর্তী পাহাড়ের দেওয়ালে অসংখ্য সুন্দর প্রাকৃতিক গুহা, যেগুলো তৈরি হয়েছে ঢেউয়ের ধাক্কায় আর আছে ওয়াইল্ড লাইফ। স্থানীয় ঐতিহাসিক গুরুত্ব, সামাজিক জীবন কুলিনারি, নাচ, গান, গল্ফ, বোট রাইডিং, হর্স রাইডিং, ওয়াটার স্পোর্টস— এ সব তো আছেই। হ্যাঁ আর একটা কথা এই অঞ্চলে নাইট ক্লাব কাবারে রেস্টুরেন্টের অভাব নেই।

—আমার আগ্রহ হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ আর সাগর ঘেঁসা অসংখ্য গুহার দিকে। আপনি যে বললেন, আমি খুব ভালো সময় এসেছি, তার মানে?

আমার কথা শুনে ভদ্রমহিলা 'এক মিনিট' বলে উঠে গেলেন। তারপর একটা ফাইল নিয়ে এসে খুব উৎসাহিত হয়ে বললেন, এই দেখুন আমাদের ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের নতুন এডুকেটিভ অ্যাওয়্যারনেস প্রোগ্রাম। জনসাধারণ ও ট্যুরিস্টদের জন্যই এই ব্যবস্থা। পর্তুগিজ ভাষায় লেখা, আমি অনুবাদ করে দিচ্ছি। আমাদের এই অঞ্চলটা ইউরোপের অন্যতম দূষণহীন অঞ্চল। এখানকার বিচগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে সূর্যের তাপে ও শুদ্ধ হাওয়ায় শরীর ও মনের জীবনীশক্তি বেড়ে যায়। নদীর জলে, সাগরে আর সমুদ্রে পালতোলা নৌকোয় বেড়ানো একটা জীবনের নতুন দিক। জনসাধারণের মধ্যে এই কথাগুলোর প্রচার ও প্রসারের জন্য পর্তুগিজ সরকার দীর্ঘস্থায়ী অথচ সস্তায় নৌ-ভ্রমণের ব্যবস্থা

করেছে। আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক পৃথিবীবিখ্যাত আবিষ্কারকদের কথা জানাবার জন্য, তাদের পথে চলবার জন্য, তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য আলগার্ভে সরকার নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে।

এই পর্যন্ত পড়ে ভদ্রমহিলা একটু থামলেন, তারপর মনে মনে নিচু স্বরে বাকি লাইনগুলো পড়ে দুপাতা উল্টে তারপর আবার শুরু করলেন অনুবাদ: হ্যাঁ, এই দেখুন আমাদের পাশের ছোট্ট গ্রামীণ বন্দরে বর্তমানে দুটো পৃথিবীবিখ্যাত পালতোলা জাহাজ— অবিকল পুরনো মডেলে তৈরি— পর্যটকদের জন্য রাখা হয়েছে। পর্তুগিজ সরকার একেক বছর একেক বন্দরে এই জাহাজগুলো রাখে। সামান্য খরচে ইচ্ছানুযায়ী দুঘণ্টা, চারঘণ্টা, ছঘণ্টা, একদিন, দুদিন, এক সপ্তাহ ধরে সামর্থানুযায়ী ভাড়া করা যায়। পুরনো দিনের সম্পূর্ণ ছবি আর পরিবেশ পাবার এক মহাসুযোগ।

এ পর্যন্ত পড়েই এবার মিস গাগো আমার দিকে তাকালেন, তারপর আমাকে প্রশ্ন করলেন, জাহাজ দুটোর নাম বলুন তো?

—আমি সত্যি ধাঁধায় পড়লাম, তবে বেশিক্ষণ আমাকে অন্ধকারে থাকতে হল না। তিনি হাসিমুখে ও সগর্বে বললেন, একটার নাম সান্তা বের্নার্দা— পাইরেট বোট, দ্বিতীয়টির নাম সান্তা মারিয়া— ক্রিস্টোফার কলম্বাসের ঐতিহাসিক আমেরিকা আবিষ্কারের জাহাজ।

কথাটা শুনেই আনন্দে আমার বুকের ভেতরটা ধপ করে উঠল। শুধু আনন্দ নয় তার সঙ্গে উত্তেজনাও বটে।

আমি আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠে তার কথার প্রতিধ্বনি করলাম— সান্তা মারিয়া! কলম্বাসের সান্তা মারিয়া। অদ্ভুত যোগাযোগ!

এবার উত্তেজনাকে আরও জোর দেওয়ার জন্য মিস গাগোকে বললাম, ইংরিজি ছেড়ে ফরাসি ভাষায়ই কথা বলা যাক, তুমি তো ফরাসি ভাষা ভালোই জানো, তাই না?

—নিশ্চয়ই।

তার আশ্বাস পেয়েই সরাসরি আপনি ছেড়ে তুই-এ এসে পৌঁছলাম। ইংরিজিতে 'ইউ' সর্বঘটে কাঁঠালি কলা। ফরাসিতে আপনি আর তুই। ফরাসি ভাষায় আন্তরিকতা আছে, সহজেই অপরকে কাছে টানা যায়।

আমি উত্তেজিত হয়েই বললাম, জানো সেভিইতে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের বিশ্ব প্রদর্শনী আর উৎসবের সময় সান্তা মারিয়া জাহাজ দেখেছি, ভেতরে চড়েছি। মনে মনে ভেবেছিলাম এই জাহাজে চড়ে যদি ঘণ্টাখানেক ঘোরা যেত, সেই স্বপ্ন যে বাস্তবে পরিণত করা যাবে তা ভাবতেও পারিনি। তাই বার বার বলছি অদ্ভুত যোগাযোগ। আমার উৎসাহ দেখে মিস গাগো এবার সিরিয়াস হয়ে বসল তারপর সরাসরি টেলিফোন করল।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ফোন রেখে আমাকে জানাল, আমি হারবার

ইনস্টিটিউটে কথা বললাম, তারা খুবই উৎসাহী, তোমার মতো ট্যুরিস্ট পাওয়া ভাগ্যের কথা। পরশু দিন আমাদের একটা নাইট প্রোগ্রাম আছে সন্ধ্যা ছটা থেকে পরদিন সন্ধে ছটা পর্যন্ত, চব্বিশ ঘণ্টা, সমুদ্রে। জাহাজ ছাড়বে লাগোস বন্দর থেকে, সাড়ে পাঁচটায় জমায়েত। যাত্রীরা অধিকাংশই ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী, আর কয়েকজন মেরিন ইনস্টিটিউটের লোক থাকবে। মিটিং পয়েন্ট পোন্টাদা পিয়েদাদে। খরচ একশো ইউরো, মাথাপিছু। এই খরচের মধ্যে আছে ডিনার, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, কফি। জাহাজে ছোট বার আছে যাবতীয় গরম ও ঠান্ডা পানীয় আলাদা খরচ। তুমি আমাদের অতিথি। কনসেইচাও বড় নাম। সবাই আমাকে কনসিতা বলে, তুমিও কনসিতা বলতে পারো। ওর কথা শুনে আরও সহজ হয়ে গেলাম।

এত বড় একটা প্রোগ্রাম হয়ে যাবে আশা করতে পারিনি। আমি গেস্ট হিসাবে যেতে চাই না। আমি সাধারণ পর্যটক হয়েই যাব। আমার থেকেও একশো ইউরো নিতে হবে। আমি জোর করতেই কনচিতা রাজি হয়ে গেল। ওকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য বাইরে ড্রিঙ্কের জন্য অনুরোধ করলাম। 'আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করছি' বলে রাজি হয়ে গেল।

ওর অফিসের অনতিদূরেই বুলেভার্দের ওপরেই বার ফর্টি টু-এ এলাম। খুব চমৎকার জানলা ও টেরাস থেকে সামনের সুন্দর সৈকত দৃশ্য। বারে চা কফি থেকে আরম্ভ করে স্পেশ্যালিটি হোম মেড সাংগ্রিয়া, বিদেশি বিয়ার, রকমারি হুইস্কি তো আছেই আর স্ন্যাকস ও স্যান্ডউইচ। আমরা অর্ডার দিলাম দুটো হোম মেড সাংগ্রিয়া।

ড্রিঙ্ক করতে করতেই কনচিতা অন্যান্য তথ্য জানাতে লাগল, ফারো কনচিতার হোম টাউন, এক বছর হল লিসবন থেকে এখানে ট্রান্সফার নিয়ে এসেছে রাজধানীর থেকে অনেক দূরে, কাজেই প্রোমোশনের আশা নেই তবে জন্মস্থানে আছে সেটাই সবচেয়ে বড় কথা।

এবার ফারো সম্পর্কে দুয়েক কথা বলে নিই। ফারোর অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে হলে এখানকার সাফারি বোট নেওয়াই ভালো। রিয়া ফরমোসা ইউরোপের অন্যতম সুন্দর প্রোটেক্টেড এরিয়া। জেলেদের ছোট ছোট গ্রাম, নানা ধরনের পাখি আর বনফুলে ভরা পথ, আঁকাবাঁকা ছবির মতো ছোট ছোট নদীতে যাবার সময় চোখে পড়বে মাছের ঝাঁক। আলগার্ভের অন্যতম আধুনিক আকর্ষণ হচ্ছে এখানকার অতি সুন্দরভাবে সাজানো রাজকীয় গলফিং। আন্তর্জাতিক গল্ফ গাইড ক্যাটালগে আলগার্ভে কোর্সের কথায় লিখেছে ইউরোপের অন্যতম সুন্দর। এই ফারোর চারদিকেই চোখে পড়বে একুশটা গল্ফ কমপ্লেক্স। আঠাশটা আলাদা আর চারশো পঞ্চাশ রকমের বিভিন্ন গর্ত বিশিষ্ট। একই জায়গায় এতগুলো গল্ফ কোর্স সাধারণত চোখে পড়ে না। বলতে গেলে গল্ফিংয়ের স্বর্গরাজ্য।

প্রায় এক ঘণ্টা গল্প করে ও বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে তখনকার মতো

কনচিতাকে বিদায় জানালাম। সেদিন রাতে স্থানীয় রেস্টুরেন্টে সাগরের টাটকা মাছ আর প্রচুর সি ফুড ঝিনুক শামুক আর পঞ্চাশ রকমের ডিশ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, দেখেই পেট ভরে যায়। খাবারের ব্যাপারে আমি পরে আসছি, আপাতত আরম্ভ করা যাক আমার আসল সমুদ্র-ভ্রমণে।

কলম্বাসের জাহাজ

কথামতো আমি লাগোস বন্দরের পোনতাদা পিয়েদাদে দুঘণ্টা আগেই এসে পৌঁছলাম। লাগোস পুরনো শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি সুন্দর শহর, মাঝখানে সুন্দর সোনালি রঙের বারোকের খোদাই কাজ করা একটি গির্জা। নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক শহর, আমি সব কিছু উপেক্ষা করে ম্যাপ ফলো করে সরাসরি এসে পৌঁছলাম মিটিং পয়েন্টে। সাগরের শুদ্ধ শীতল বাতাস আমাকে স্বাগত জানাল। একটু এদিক ওদিক তাকাতেই ধরা পড়ল দূরের একটি কাঠের কালো বিরাট নৌকো। তিনটে বিরাট উঁচু থামের ওপর আটকে আছে তিনটে সাদা পাল, দেখেই চিনতে পারলাম।

আমি আগেই বলেছি কলম্বাসের যে তিনটে জাহাজ ছিল তারই হুবহু অনুকরণ, মডেল মাত্র। আমার কাছে, একটা ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় প্রতীক। বারসিলনে কলম্বাসের জাহাজের অবিকল প্রতিকৃতি আছে। সেটা অবশ্য বন্দরেই আবদ্ধ।

পয়েন্টে আস্তে আস্তে যাত্রীরা আসতে শুরু করল। তাদের মধ্যে কয়েকজন ইংরিজি জানে বটে, কিন্তু সবাই পর্তুগিজ। পর্তুগালের বিভিন্ন কলেজ ও ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণে এসেছে। আমিই একমাত্র বাইরের লোক কাজেই চিনতে অসুবিধা নেই। গাইড ও দলনেতা রোনাল্ডো সহজেই আমাকে দেখতে পেল। কাছে এসে হ্যান্ড শেক করে বলল, ওয়েলকাম মিঃ দে। ডঃ গাগো আপনার কথা বলেছে। সুন্দর হাসিখুশি উৎসাহী যুবক। উত্তরে বললাম, আমাকে দলে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

রোনাল্ডো প্রথমেই আমাকে হুঁশিয়ার করে দিল, এটা পর্তুগিজ দল, কাজেই সব সময় এই ভাষাতেই সব কিছু চলবে, তবে আপনি আমার কাছাকাছি থাকবেন আমি ইংরিজিতে আপনাকে বুঝিয়ে দেব।

আমি রোনাল্ডোকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। আমার সি-সিকনেস হয় না, আমি জলপথে কয়েকবার যাতায়াত করেছি।

রোনাল্ডো আশ্বাস দিয়ে বলল, হ্যাঁ আমি জানি, ডঃ গাগো আমাকে সব বলেছেন। আমাদের পুরো দল এখনও আসেনি। কাজেই ব্রিফিং পরে হবে, হাতে সময় আছে, আসুন এই জাহাজ সম্পর্কে কিছু বলি। এই বলে সে জাহাজের বিবরণ দিতে লাগল।

এই ধরনের বিরাট পুরনো আমলের পালতোলা জাহাজকে বলে কারাভেল।

এটার নাম বোয়া এসপেরান্সা। পর্তুগিজ শব্দ, ইংরিজিতে গুড হোপ। হুবহু কলম্বাসের সান্তা মারিয়ার নকল, তবে তফাৎ হচ্ছে সেই জাহাজে অনেক বৈঠা ছিল এটাতে তা নেই। আকার, রং, ভেতরকার গঠন সব অবিকল যেমন ছিল। এই মডেলগুলোর পর্তুগিজ নাম ইনফান্তে। এই ধরনের ক্যারাভেলের জন্মস্থান এই আলগার্ভে সাগর বন্দর। সেই সময়কার অন্যান্য জাহাজের সঙ্গে এর তফাৎ হচ্ছে এটা হাল্কা আর দ্রুত।

তেরোশো শতাব্দীতে উত্তর ইউরোপ থেকে যেসব জাহাজ আসত সেগুলো ছিল খুব ভারি আর ঘোরাফেরায় খুব ধীর। নতুন জগৎ আবিষ্কারের জন্য অনুপযুক্ত। আর আগের মতো শক্তিবান কঠোর পরিশ্রমী বৈঠাধরও নেই। বর্তমান যুগের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য এবং নিরাপত্তার জন্য আধুনিক যন্ত্র বসানো হয়েছে। একনজরে তার একটা লিস্ট আপনাকে বলছি।

অকসিলিয়ারি ইঞ্জিন পেন্টা ভলভো ১৯০ হর্স পাওয়ারের তিনটে মেইন থাম পালের জন্য। মোট বাইশ জন যাত্রী ও নাবিক সমেত। মূল কাঠ— পাইন, ওক ও ইউক্যালিপ্টাস। জাহাজ লম্বায় ২৩ মিটার, বড় থামের উচ্চতা ১৮ মিটার, চওড়ায় ৬ মিটার। রেডিও ও মডার্ন কমিউনিকেশনের ফুল সেট আপ।

যাত্রা শুরু

ঠিক ছটায় নৌকোয় পাল তোলা হল। প্রথমেই আমার মনে হল কলকাতা থেকে গঙ্গাসাগরের মেলায় সাগরযাত্রীর সঙ্গে স্নানে চলেছি। নৌকোর ধরনও অনেকটা সেরকম, তবে স্থান কাল পাত্র সবই আলাদা। নাবিক সমেত আমরা সবসুদ্ধ ১৯ জন, আরও তিনজন নেওয়া যেত। আজকে আকাশটা সকালের দিকে পরিষ্কার ছিল, বিকেলের দিকে মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে। কানে বেজে উঠল গাইডের স্বর। সকলকে স্বাগত জানিয়ে রোনাল্ডো সিকিউরিটি এবং সেফটি লাইফ জ্যাকেটের ব্যবহার ও নিয়মাবলি বোঝাতে লাগল, ঠিক যেমন প্লেনে, আন্তর্জাতিক নিয়ম মানতেই হবে। পোন্তাদা পিয়েদাদের বিরাট বিরাট পাথরের দ্বীপ থেকে শুরু হল আমাদের যাত্রা। স্থলভূমি থেকে যেগুলো ছোট দেখাচ্ছিল কাছাকাছি যেতেই সেগুলো আস্তে আস্তে বেখাপ্পা কিম্ভূতকিমাকার দৈত্যের মতো বিরাট রূপ ধারণ করতে লাগল। যাত্রার প্রথমেই শিহরণ। জলের ওপর এই বিরাট বিরাট দৈত্যাকৃতির পাথরগুলো দিনের পর দিন ঢেউয়ের আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে। অনতিদূরেই দেখা দিল স্থলভূমির বিরাট উঁচু পাঁচিল সেখানেও ঢেউয়ের ধাক্কায় ধাক্কায় সৃষ্টি হয়েছে দেওয়ালের গায়ে খোদাই করা বিভিন্ন আকারের ভাস্কর্য। সাদা ঝামাপাথর আর গেরুয়া রঙের স্থলভাগের পাঁচিল, ওপরে মেঘলা আকাশ আর নীচে সবুজ ও নীল রঙের অদ্ভুত খেলা।

একের পর এক দৈত্যাকৃতি খোদাই গুহা বাড়ি, প্রাসাদ আর অজস্র পাথরের খুদে দ্বীপ পেরিয়ে আমরা এসে পড়লাম একটা সুন্দর সাগরসৈকতে। রোনাল্ডো

বলল, এই নিখুঁত সুন্দর বালির চড়ার নাম প্রায়া দা লুজ আর তার পরেরটা বুর্গ। শুধু বালি, মাটির চিহ্নমাত্র নেই। আর বালির চড়ায় কোনওরকম নোংরা নেই। এখানে যারা আসে তারা সবাই প্রকৃতিকে ভালোবাসে আর পরিবেশ সচেতন। তারা এই বালির সৈকতকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। তাদের মধ্যে যারা ধূমপান করে তারাও এই শুদ্ধ বালির চড়ায় ধূমপান করে না। লাগোসের আকর্ষণীয় খোদাই পাথর, তারপর পাঁচিলের মতো ক্লিফ, তারপর সুন্দর বালির চড়া দেখার পর রোনাল্ডো ঘোষণা করল যে আকাশের অবস্থা মেঘাচ্ছন্ন। দিনের আলো থাকতে থাকতেই সাইগ্রেসে যাওয়া ভালো। কারণ ওখানকার খাদগুলো সূর্যাস্তে খুব সুন্দর দেখায়। কাজেই জাহাজের মোটর ব্যবহার করে তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো। অবশ্য যাত্রীরা যদি রাজি থাকে। গররাজির কোনও প্রশ্নই ওঠে না, কারণ এটা একটা সাধু প্রস্তাব আর আসল কথা হচ্ছে আমরা সবাই এই অঞ্চলে প্রথম। কথানুযায়ী কাজ। কারাভেলের মেশিন গর্জে উঠল। এই সুন্দর শান্ত পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ যেন বেসুরো আওয়াজে কে চেঁচিয়ে উঠল। রোনাল্ডোকে প্রশ্ন করলাম, এত সুন্দর শান্তিপূর্ণ সাগরসৈকত এখানকার লোকেরাও নিশ্চয়ই খুব শান্ত, তাই না?

রোনাল্ডো একটু হেসে জবাব দিল, আমারও তাই মনে হয়। সাগরসৈকতে যারা রৌদ্র সেবনে আসে তারা কিন্তু গ্রামের লোক নয়, সবাই ট্যুরিস্ট, অধিকাংশই জার্মানি অথবা ইংল্যান্ডের। গ্রামের লোকেরা তাদের জন্য কাজ করে। ট্যুরিস্টদের সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখার জন্য প্রচুর বার, কিয়স্ক, স্যুভেনির স্টল খোলা হয়েছে। আর প্রচুর রেস্টুরেন্ট, আজকাল প্রায়া দা লুজ ও বুর্গতে অনেক নাইট ক্লাবও খুলেছে।

রোনাল্ডোর কথায় ধাক্কা খেলাম। মনে মনে ভাবলাম শত হলেও একবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ অতি আধুনিক সমাজ। পলিউশন এদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্মস্থল থেকে বহু বহু দূরে ছুটে এসেছে প্রকৃতির ছন্দে কয়েকদিন শান্তির সন্ধানে, সারাদিন বালির চড়ে শুয়ে বসে নিস্তব্ধ শুদ্ধ বাতাস-রৌদ্রালোক আর আনন্দময় পরিবেশে নিজেকে চিন্তামুক্ত করছে আর রাতে ঘরে ফিরেই সঙ্গে সঙ্গে শব্দস্রোতে সারাদিনের সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করছে। ঘরে যদি টিভি না থাকে তাহলে ছুটে যাচ্ছে ডিস্কোথেক ও বারে। যেখানে ধূমপানে সৃষ্টি হয়েছে অপরিচ্ছন্ন কুয়াশা। আর নাইট ক্লাবে রয়েছে মনোচঞ্চলের বিবিধ ব্যবস্থা। মন শান্তি চাইলেও স্বভাব তাকে ছাড়বে কেন?

জাহাজ এবার স্থলভাগের আরও কাছে এল। হঠাৎ আমাদের সামনে একটা বিরাট পাহাড়। আকাশ দেখতে হলে মাথাটাকে প্রায় শরীরের সঙ্গে নব্বুই ডিগ্রি কোণে রাখতে হবে। জাহাজের ইঞ্জিন থামল। গাইডের বক্তৃতা শুরু হল। আমি যতটা সম্ভব নোট করে নিলাম। আমরা এখন সাইগ্রেস পয়েন্টে এসে পৌঁছেছি। বন্দরের নাম সাইগ্রেস পয়েন্ট আর শহরের নাম সাইগ্রেস। আজ ঢেউ নেই তাই

রক্ষে, নয়তো এত কাছে আসা যেত না। জাহাজকে দেওয়ালের গায়ে আছড়ে মারত। সামনে পাঁচিল কিন্তু পাহাড় নয়, তার ওপরে সমতলভূমিতে বর্ধিষ্ণু শহর সাইগ্রেস। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এতক্ষণ সাগর ধরে এসেছি। ইউরোপের স্থলভাগ এখানেই শেষ হয়েছে। সামনের উচ্চভূমিতে যে লাইটহাউসটা দেখতে পাচ্ছো ওটা জিব্রাল্টার হয়ে ভূমধ্যসাগরে যাওয়ার পথে। এখান থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে আরেকটা পয়েন্টে আরেকটা লাইটহাউস, ওই পয়েন্টের নাম কাবো ডে সাওভিসেন্তে। কাবো ডে সাওভিসেন্তের লাইটহাউসটা পড়েছে আটলান্টিক মহাসাগরে। ওটা ইউরোপ ও আফ্রিকার সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত জলপথ। অসংখ্য পাথর খাড়ি আর ঢেউয়ের জন্য জাহাজ কাছাকাছি আসতে পারে না।

সাইগ্রেস ও কাবো ডে সাওভিসেন্তেকে আগে বলা হত পৃথিবীর শেষ অংশ। এখান থেকে যে আফ্রিকায় যাওয়া যায় সে কথা আগে নাবিকেরা জানত না। এখানকার ঝড়, ডুবন্ত পাথর আর ভয়াবহ পাহাড়ি পাঁচিলে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ মানে বিরাট বিরাট পালতোলা নৌকো চুরমার হয়ে ভেঙে পড়েছে। আর সে কারণে এখানকার সমুদ্র সম্বন্ধে নানা দৈত্য ও অভিশপ্ত আত্মার গল্পও চালু ছিল। মাত্র পনেরো শতাব্দীতে সেই ভয় ও অভিশপ্ত কাহিনী উপেক্ষা করে এগিয়ে গেলেন এই সাইগ্রেসের রাজকুমার। আবিষ্কার ও অভিযানের ইতিহাসে আজ তার নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হয়ে আছে।

এই দুঃসাহসিক রাজকুমারের নাম হেনরি দি নেভিগেটর। জন্ম ১৩৯৪ সালে। কিং জোআও প্রথম এবং রানি ফিলিপার পঞ্চম পুত্র। ১৪১৫ সালে তিনি সেওটার যুদ্ধে জয়ী হয়ে নিজেকেই বীর সেনা, আবিষ্কারক দুঃসাহসিক নাবিক আখ্যা দিলেন। রাজা খুশি হয়ে ধর্মীয় ধনভাণ্ডার তাঁর হাতে তুলে দিলেন। এই অর্থসাহায্যেই তিনি শুরু করলেন নতুন পৃথিবীর পথ। তিনিই মহাসাগরের কিংবদন্তী দৈত্য দানবের ভয় ভাঙালেন।

১৪২০ সালে তিনি কারাভেল নিয়ে পৌঁছলেন মাদেইরা। ১৪৩৪ সালে তিনিই প্রথম ইউরোপিয়ান নাবিক যিনি পশ্চিম আফ্রিকার কোস্টে পৌঁছলেন। শুরু হল আবিষ্কারের নতুন যুগ। তিনিই প্রথম আবিষ্কারের জন্য নাবিকদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করলেন। নাম দিলেন ভিলা দো ইনফান্তে। তিনি দেহত্যাগ করেন ১৪৬০ সালে। জলপথে ভারতের পথপ্রদর্শক ভাস্কো-দা-গামার জন্ম ১৪৬৮ সালে সিনেস নামক স্থানে। এখান থেকে অনেক উত্তরে। কিন্তু নৌবিদ্যা শিখেছিলেন হেনরি দি নেভিগেটরের ভিলা দো ইনফান্তায়। ভাস্কো-দা-গামা ভারতের কোচিনে অবতরণ করেছিলেন ১৫২৪ সালে। কলম্বাস অবশ্য পর্তুগালের লোক নন, তিনি ছিলেন ইতালির জেনোয়া শহরের। তিনি আমেরিকা আবিষ্কারের জন্য প্রথমে পাড়ি দিয়েছিলেন এখান থেকে, বেশিদূর এগোতে পারেননি। একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে তার জাহাজ চুরমার হয়ে যায়। ভাগ্যক্রমে তিনি সাঁতার কেটে কোনওরকমে এখানে এসে পৌঁছেছিলেন। এই দুরবস্থার পর তিনি হেনরি দি ডিসকভারারের

কারাভেলের মতো নতুন জাহাজ তৈরি করলেন। সেই জাহাজেই তিনি আমেরিকা আবিষ্কার করলেন। জাহাজটি ছিল মজবুত, হালকা আর দ্রুতগামী, ঠিক এটার মতোই।

গাইড থামল। আমি মনে মনে ভাবলাম একটা নতুন কথা জানতে পারলাম। হেনরি দি ডিসকভারারের কাহিনী আমার জানা ছিল না।

এবার রোনাল্ডো জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। ক্যাপ্টেন আমাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আপনাদের মধ্যে যদি কেউ সাঁতার নাও জানেন ক্ষতি নেই। লাইফ ভেস্টটা সব সময়ই পরে থাকবেন। আমরা কোস্টগার্ডের সঙ্গে সব সময়ই যোগাযোগ রাখছি। ভয় নেই। আমার নাম আলবের্তো। এই কারাভেলের নাম 'বোয়া এসপেরান্সা'। গুড হোপ নামটা দেখেই বুঝতে পারছেন যে আমরা ভালো গাড়িতেই উঠেছি। এই বোটের মডেল অমর আবিষ্কারক হেনরি দি ডিসকভারারের নিজের সৃষ্টি। মজবুত, হালকা আর দ্রুত। বোটের পালে আছে ক্রুশ চিহ্ন। এই বোটটা ১৯৯০ সালে Portuguese Sailing Training Association-এর জন্য তৈরি হয়েছিল। জলে ভাসানো হয়েছিল ২৮ এপ্রিল ১৯৯০। তারপর আজ পর্যন্ত ৭৫,০০০ মাইল ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরে ঘুরেছে। ১৯৯২ সালে নর্থ আমেরিকার শ্রেষ্ঠ পুরনো বোট আখ্যা পায়। পঞ্চম শতাব্দী উৎসবে ক্রিস্টফার কলম্বাসের জাহাজ হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করে। ১৯৯৪ সালে রাজকুমার হেনরি পুরস্কারপ্রাপ্ত, ১৯৯৮ সালে ভাস্কো-দা-গামা পুরস্কারপ্রাপ্ত, ২০০০ সালে মিলেনিয়াম ওয়ার্ল্ড ট্যুর করল। প্রতি বছর হাজার হাজার লোক আসে একে দেখতে, স্পর্শ করতে। বর্তমানে ইউনেস্কোর Heritage of Humanity-র সম্মানের অপেক্ষায় আছে। বর্তমান হাই টেকনোলজির যুগে ইতিহাসের সাক্ষীস্বরূপ পুরনো মডেলের এই সম্মানীয় Boa Esperansa (Good hope)-য় আপনাদের স্বাগত জানাই।'

দেখতে দেখতে সন্ধে ঘনিয়ে এল। এবার সকলকে টুনা মাছের স্যান্ডউইচ বিতরণ করা হল। বারে জল, কোকাকোলা, কফি, বিয়ার সেলফ সার্ভিস। আবার শুরু হল ইঞ্জিনের শব্দ। জাহাজ ঘুরল, গন্তব্য কাবো ডে সাওভিসেন্তে। কিছুক্ষণের মধ্যে সাওভিসেন্তের লাইটহাউস চোখে পড়ল। তার সামনে জলের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অজস্র ঝামাপাথরের বিপজ্জনক খুদে দ্বীপ। মাথার ওপর মেঘের খেলা, সূর্যাস্ত দেখা গেল না। দূরে জ্বলে উঠল শক্তিশালী আলো, ওটাই এখানকার দ্বিতীয় বিশাল আলোকস্তম্ভ, জ্বলছে আর নিভছে। এখানকার জল থেকে পাহাড়ের উচ্চতা আরও বেশি। জাহাজ আরও একটু এগোতেই প্রথম একটা বড় ঢেউয়ের সম্মুখীন হলাম। জাহাজ আস্তে আস্তে ঢেউয়ের দোলায় আরও দুলতে লাগল, মোটর থামানো হল। আমাদের সামনেই কাবো ডে সাওভিসেন্তে বা কেপ অফ সেন্ট ভিনসেন্ট লাইটহাউস। লাইটহাউসের ওপর থেকে নীচের ভয়াবহ খাদ আর আমরা নীচের থেকে দেখছি পাহাড়ের দৈত্যাকৃতি পাঁচিল, স্থলভাগে

যাতে দুরন্ত আটলান্টিকের জল প্রবেশ করতে না পারে তারই জন্য প্রাকৃতিক বাঁধ। ভেতরে প্রবেশ করতে না পেরে আক্রোশে আটলান্টিকের জল আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের দেওয়ালে। আস্তে আস্তে ভাঙছে দেওয়াল, সাধারণ পাথর স্তরের পর স্তর ভেঙে পড়ছে, শক্ত পাথরগুলো দাঁড়িয়ে থাকছে। কালের এই ধ্বংসযজ্ঞে সৃষ্টি হচ্ছে বেখাপ্পা ধরনের অসংখ্য দ্বীপ। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে পাথরগুলো জলের ওপর ভাসছে। একটা দ্বীপ আরেকটা দ্বীপের কাছাকাছি, আসছে আবার সরে যাচ্ছে। প্রায় আধঘণ্টা থেমে জাহাজ প্রস্তুত হতে লাগল সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। জাহাজের ছজন নাবিক, রোনাল্ডো সবাইকে পাল খাটাবার কৌশল ও নিয়ম বুঝিয়ে দিতে লাগল। জাহাজের ওপর শুরু হল উত্তেজনা। তিনটে থামকে কেন্দ্র করে সবসুদ্ধ ছটা পাল, বাতাসকে কীভাবে ধরতে হবে, বাতাসকে কীভাবে পালে ধরলে জাহাজ কোনদিকে মোড় ফিরবে নাবিকেরা বোঝাতে লাগল। আমরা তেরোজন অভিযাত্রী, ছজন নাবিক। অভিযাত্রীদের তিনভাগে ভাগ করা হল— দুঘণ্টা দুঘণ্টা করে পর পর দায়িত্ব দেওয়া হল। আমি রইলাম আলাদা। রোনাল্ডোকে আগেই বলেছিলাম আমি জাহাজের চলার কৌশলে আগ্রহী নই। আমার আগ্রহ চলায়, আমি দোলনায় চড়ে ঘুরব আর তোমরা খাটো। মানে আমি একা যাত্রী, তোমরা সবাই নাবিক। ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্য এসেছে একদিনের সামুদ্রিক নাবিক হবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। কলেজ ও ইউনিভার্সিটি সিলেকশন করে পাঠিয়েছে, সরকারি খরচে এটা শিক্ষাসূচির মধ্যে পড়ে।

সব পালগুলো খাটানোর সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজটা দুলে উঠল একটু কাৎ হয়ে এগিয়ে চলল। একটা অদ্ভুত শিহরণ। দূরে আস্তে আস্তে লাইটহাউসটা জলে ডুবতে লাগল, প্রায় একঘণ্টা পর অদৃশ্য হল। শুধু পালে বাতাস লাগিয়ে এগিয়ে চলা। জলের ঢেউ মাঝে মাঝে জাহাজে ধাক্কা লাগিয়ে শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করছে। ইঞ্জিন সম্পূর্ণ বন্ধ। একটু সুযোগ পেয়ে রোনাল্ডোকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত সুন্দর প্রোগ্রাম রাতে করলে কেন?' উত্তরে বলল, 'দিনেরবেলাও একদিনের প্রোগ্রাম করি, আমরা প্রপোজ করি, যাত্রীরা পছন্দানুযায়ী বাছাই করে দিনের বেলা সাধারণ ট্যুর আর রাতে স্পেশ্যাল ট্যুর। আমরা পূর্ণিমার কাছাকাছি চাঁদের আলোতে ট্যুর প্রোগ্রাম করেছিলাম কিন্তু হঠাৎ মেঘ এসে চাঁদের আলোয় পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। ভাগ্য ভালো বৃষ্টি হচ্ছে না, বৃষ্টি হলে আমরা সেইলিং বন্ধ করে দিই, ভীষণ রিস্কি।'

আরও প্রায় একঘণ্টা চলার পর রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এল। গাইড রোনাল্ডো, জাহাজের হালের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম লণ্ঠন হাতে তিনজন নাবিক দাঁড়িয়ে, মাঝখানে ক্যাপ্টেন, ক্রিস্টফার কলম্বাসের পোশাকে। স্বপ্নের মতো অতীত ভেসে উঠল সামনে। জাহাজে আলো ও ইঞ্জিনের জন্য এমার্জেন্সি ব্যাটারি রয়েছে কিন্তু উপযুক্ত আবহাওয়া ও পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়েছে। জাহাজের প্রধান

থামের ওপর একটা বড় হ্যারিকেন, লাল চিমনি, সামনে একটা, পিছনে একটা, নীচে নামবার মইয়ের কাছে একটা। টয়লেটের বাইরে একটা আর মাঝখানে দুটো ঝোলানো যার যখন খুশি ব্যবহার করতে পারো।

প্রায় দুঘণ্টা লাগল আমাদের মনের সঙ্গে পরিবেশটাকে খাপ খাওয়াতে। তারপর একসময় সত্যি আমরা ফিরে পেলাম সেই পুরনোকে। পুনর্জন্মে মানুষ সামনের দিকে এগোয়। আমরা গেলাম পিছিয়ে। আমার চারদিকে পর্তুগিজ ভাষায় সবাই কথা বলছে, চারদিকে সমুদ্র, জাহাজ মাঝে মাঝে বড় বড় ঢেউয়ের ওপর উঠে নাগরদোলার মতো নীচে নামছে। মনটাকে সব সময় সচেতন করে রাখছে, এ কি স্বপ্ন? কী করে কলকাতার একটা লোক চলে এসেছে সুদূর পর্তুগালের কাছে আটলান্টিক মহাসাগরে আর তাও এক পাঁচশো বছর আগেকার এক ভুতুড়ে নৌকোয়। জাহাজের ওপর বসে বসে ভাবছি আর বার বার চলে যাচ্ছি সেই আবিষ্কারের প্রথম যুগে।

হ্যারিকেনের আলোয় দূরের থেকে কাউকে চেনা যায় না, সকলের লাইফ জ্যাকেট পরা, ফসফরাস আলোয় দেখা যাচ্ছে তাদের চলাচল। আমি উঁচু মাস্তুলের বাঁদিকে জাহাজের রেলিং ঘেঁসে বসে আছি, দুটো কাঠের বিমের মাঝখানে নিজেকে আটকে রেখেছি, পড়ার ভয় নেই। গাইডের কাছে আমাদের নাম আছে, আর নামের পাশে লাইফ ভেস্টের নম্বর লেখা ওই নম্বরই আমাদের আইডেন্টিটি কার্ড। আমার একটু সুবিধা আছে। আমি এ দলের সবচেয়ে হালকা মানুষ মানে ওজন কম। সবচেয়ে ছোট মানে বেঁটে আর সবচেয়ে বয়স বেশি। একমাত্র বিদেশি। ভাষার অভাবে সকলের সঙ্গে কথা বলা যাচ্ছে না কিন্তু সেটাই হয়েছে আশীর্বাদ, আমার স্বপ্নরাজ্যে কেউ আমাকে বিরক্ত করতে আসছে না।

হঠাৎ যেন আশীর্বাদ! আকাশের পর্দা সরিয়ে চাঁদমামা আমাদের দিকে উঁকি মারলেন, সমুদ্রের রং আর পরিবেশ সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেল। মনে মনে ভাবলাম দূরের থেকে যদি আমাদের এই জাহাজটাকে দেখতে পেতাম। যাই হোক চিন্তার স্রোত, সমুদ্রের স্রোত আর জাহাজের পালে আটকানো বাতাসের স্রোত— এই তিন স্রোতের সঙ্গমে আমি বার বার পুণ্যস্নান করতে লাগলাম।

যত ভালোই লাগুক না কেন, উত্তেজনা ক্লান্তি আর রাতের প্রভাব সকলকে ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন করল। যারা খাটছে তারা জাহাজের গতি ও দিক পরিবর্তনের জন্য পালের দড়িতে টান দিচ্ছে আলগা করছে, কোনও কোনওটাকে ধরে রাখছে কোনওটাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিচ্ছে দেখলে মনে হয় খুব সহজেই কাজ হচ্ছে কিন্তু দড়িতে হাত দিলেই বোঝা যায় অত সহজ নয় পালের দড়ির মধ্যেই লুকিয়ে আছে পালতোলা জাহাজের অগ্রগতির কৌশল, এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর অধ্যবসায়, পরিশ্রম আর অভিজ্ঞতা। একটা জাহাজকে এগিয়ে নিতে হলে চাই মনের জোর, ধৈর্য, একতা, একাগ্রতা আর অটুট স্বাস্থ্য।

বড় থামের উঁচুতে ছোট ঝোলানো পিঁড়িতে একজন দূরবীন হাতে নিয়ে সজাগ

হয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে দূরবীন দিয়ে দেখছে আর চিৎকার করে বলছে 'নাও নাও' কিছু না কিছু না, এই চিৎকারও পুরনো প্রথা। অন্য জাহাজ, দ্বীপ বা পাথর থেকে সাবধান হবার জন্যই এই ব্যবস্থা। সে প্রায় আঠেরো মিটার উঁচুতে, যাতে পড়ে না যায় তার জন্য কোমরে-থামে দড়ি বাঁধা।

বেশ চলছিলাম। হঠাৎ আমাদের শান্তিপর্বে বাঁধা পড়ল, গাইড হঠাৎ লাউড স্পিকার ব্যবহার করল, সাবধান! সাবধান! জেগে থাকো! জেগে থাকো! কোস্টগার্ড জানাচ্ছে, ঝড় আসছে, যাঁরা ওপরে আছেন তাঁরা যে কোনও রেলিংয়ের বেল্টের সঙ্গে নিজেকে আটকে নিন। যাঁদের সি-সিকনেসের ভয় আছে তাঁদের অনুরোধ করছি নীচের কেবিনে নেমে যান, জাহাজটা খুব নড়তে পারে তবে বিপদের ভয় নেই। কোনওরকম অসুবিধা হলে যে কোনও ক্রুর সঙ্গে কথা বলুন। নীচে ক্রু কেবিনে ইলেক্ট্রিকের বাল্ব জ্বলে উঠল, সবাই সতর্ক হয়ে উঠল। বুঝলাম ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কোস্টগার্ডের সর্বদা যোগাযোগ রয়েছে। পুরনো মডেল বটে কিন্তু আধুনিক যন্ত্রে সজ্জিত। বুঝলাম, এখন আমাদের নাটক থামিয়ে বর্তমানের সম্মুখীন হতে হবে।

ইতিমধ্যে অনেকেরই সি-সিকনেস আরম্ভ হয়েছে। হঠাৎ জাহাজটা একেবারে কাৎ হয়ে উঠল। নাবিকেরা দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করল। পালের দড়িতে কেরামতি শুরু হল। প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে জাহাজের পালগুলো নীচে নেমে এল অনেকটা সার্কাস পার্টির তাঁবুর মতো, বোঝাই যাচ্ছে এরা দক্ষ নাবিক। পাল ছাড়া জাহাজটা ন্যাড়া হয়ে গেল, ইঞ্জিন চালু হল। এবার শুরু হল ঢেউয়ের সঙ্গে নৌকোর তাণ্ডব নৃত্য। ঢেউগুলো জাহাজটাকে নিয়ে ধাক্কাধাক্কি শুরু করল। জাহাজটা কোনও সময় বাঁদিকে কাৎ হচ্ছে, কোনও সময় ডানদিকে কাৎ হচ্ছে। ক্যাপ্টেন চেষ্টা করছে ঢেউয়ের মুখোমুখি রাখতে। কোনও সময় সামনের দিক উঠছে, কোনও সময় পিছনে উঠছে, উঠেই আবার লাফিয়ে নীচে পড়ছে। প্রস্তুত ছিলাম না। এই ধরনের অভিজ্ঞতার জন্য হঠাৎ একটা মেয়ে চিৎকার করে উঠল। চেঁচিয়ে বলল, 'ফিরে চলুন ফিরে চলুন, আর এগোবেন না'। সদাজাগ্রত গাইড তার ছাড়া মাউথ স্পিকারে জবাব দিল, 'ভয় নেই, জাহাজ আমাদের আয়ত্তে, এই ধরনের সামুদ্রিক ঝড়ে আমরা অভ্যস্ত। আপনাদের অনুরোধ করছি, হ্যান্ড ফোন ব্যবহার করবেন না, জাহাজের রেডিও কমিউনিকেশনে অসুবিধা হবে।' হঠাৎ একটা বিরাট ঢেউ জাহাজের ওপর উঠে আমাদের ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেল। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ক্যাপ্টেন যাই বলুক না কেন আসলে আমাদের প্যানিক এসে গেছে। মনে হচ্ছে যে কোনও মুহূর্তে জাহাজটা উল্টে আমাদের ডুবিয়ে দেবে। আমি এই ধরনের বিপদে অনেকবারই পড়েছি। একবার পানামা থেকে ইয়টে তাহিতি গিয়েছিলাম ছোট্ট নৌকোয় ঝাঁকানির ধকল দিনের পর দিন সহ্য করতে হয়েছে, তবে সেটা এরকম হঠাৎ ঝড়ে পড়ার মতো নয়। বম্বে থেকে বসরা পাড়ি দিয়েছিলাম সিন্ধিয়া কোম্পানির বড় জাহাজে, ভারত মহাসাগরের বড় ঢেউ আমাদের স্পর্শ করতে

পারেনি। কেপ হর্ন পার হয়েছিলাম সেমি আইস ব্রেকারে, আন্টার্কটিকা যাবার পথে। বরফ ঝড় জল ভয় বিপদ সব কিছুরই অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু আজকের এই ধরনের ঝাঁকানি আগে পাইনি। জাহাজ কথায় মাত্র, আসলে কারাভেল বাণিজ্য তরণী মাত্র। বিরাট নৌকো ছাড়া আর কিছু নয়। স্বীকার করতেই হবে কলম্বাসের কারাভেলের অভিজ্ঞতা, সে যুগের একটা নাবিকের অভিজ্ঞতা। প্রায় দুঘণ্টা ধরে ঢেউয়ের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে জাহাজের বীরত্বে সমুদ্রদেব সন্তুষ্ট হলেন, শান্ত হলেন, বললেন, 'তথাস্তু তোমরা পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছ।'

সমুদ্রের উপরিভাগ আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে এল, ঢেউ ভাঙা বন্ধ হল। শুধু বড় বড় ঢেউ নিজের ছন্দে উঠছে আর নামছে। আকাশে পরিষ্কার পূর্ণচন্দ্র। এতক্ষণ ঢেউয়ের জন্য যাত্রীরা জীবন নিয়ে ব্যস্ত ছিল তাই ভ্রূক্ষেপ করেনি, আবার ধীরে ধীরে যাত্রীরা শান্ত হয়ে উঠল।

ক্যাপ্টেনের গলা ভেসে উঠল, আপনাদের সাহস আর সহযোগিতার প্রশংসা করি, ধন্যবাদ। যাদের শরীর ক্লান্ত তাদের এক নম্বর ডেকে আসতে অনুরোধ করছি। প্রায় সকলেই দেখলাম আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। আমার কৌতূহল হল কোন ধরনের ট্রিটমেন্ট করে দেখার জন্য। ওপর থেকে ডেকে আসার জন্য দুদিকে দড়ি দিয়ে পথ তৈরি করেছে যাতে দুহাতে ধরে যাওয়া যায়। চলতে গিয়ে দেখি মাথা ঘুরছে, অনভ্যস্ত লোকের অনেকক্ষণ হাতি চাপার মতো। রোনাল্ডোকে সামনে পেয়ে বললাম, আমি ক্লান্ত নই শুধু দেখার জন্য এলাম।

—আমিও তোমার মতোই, হেসে জবাব দিল।

ডেকে সবাই তক্তার ওপর পা ছড়িয়ে বসে, শুয়ে, অর্ধেক শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর একজন নাবিক সামনের বারে ঢুকে বিরাট ফ্লাস্ক থেকে ছোট ছোট গ্লাসে করে গরম পর্তুগিজ মদ সবাইকে দিল আর দুটো ডালিতে শুকনো ডুমুর আর পিস্তাস সকলের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। গরম মদে চুমুক লাগাতেই যেন আমাদের শক্তি ফিরে এল। আস্তে আস্তে শুরু হল কথাবার্তা। সবাই উফ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশের সহযাত্রীকে বলতে লাগল তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা। গরম মদ দ্বিতীয়বার দেওয়া হল, সবাই যেন তারই অপেক্ষায় ছিল। ক্লান্তি, মদ আর বিপদ থেকে মুক্তি হওয়ার আনন্দে মন ও দেহ সম্পূর্ণ লুটিয়ে পড়ল কাঠের পাটাতনে, অনেকে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। এখন যে গ্রুপের পাল তোলার ডিউটি ছিল তাদের সবাই অর্ধমৃতের মতো পড়ে আছে। জাহাজের ইঞ্জিন বন্ধ হলে নাবিকেরা আস্তে আস্তে আবার পাল তুলে দিল। আমি উঠে এসে এবার হালের প্ল্যাটফর্মে বসলাম। সুন্দর দৃশ্য, সামুদ্রিক ঝড়ের পর গরম লাল মদ, আর চাঁদের আলোয় কলম্বাসের জাহাজ পালে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে দূরে অনেক দূরে, আরেক নতুন রাস্তায় ইন্ডিয়ার পথে...।

আস্তে আস্তে পূর্বদিক উজ্জ্বল হতে শুরু করেছে, পূর্ণিমার চাঁদ আস্তে আস্তে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। জাহাজে বসে আছি বটে কিন্তু মনে হচ্ছে দূর থেকে যদি এই

জাহাজটাকে দেখতে পারতাম তাহলে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর দেখাত।

বেশ কিছুক্ষণ পর রোনাল্ডো এসে আমার পাশে বসল, কীরকম লাগছে?

—আমি সম্পূর্ণ অন্য জগতে বিচরণ করছি।

—আমি তাই দেখছি আপনি সত্যিকারের টাফ ট্র্যাভেলার, শুনুন, আমাদের হাইয়েস্ট প্ল্যাটফর্মে কেউ নেই সবাই কাহিল, আমাদের ভাগ করা দলে ভাঙন ধরেছে— আপনি উঠবেন নাকি ওপরে?

আমি রোনাল্ডোর কথায় সবচেয়ে বড় থামের উঁচুতে তাকালাম, তারপর বিনা দ্বিধায় বললাম, ঠিক আছে, বলেই সঙ্গে সঙ্গে উঠে দড়ির মইয়ে পা দিলাম। রোনাল্ডো আমাকে টেনে ধরল, দাঁড়ান একটা দূরবীন নিয়ে উঠুন, চারদিকে তাকাবেন, বেশ ভালো লাগবে আর কোমরে সেফটি বেল্ট লাগাবেন, সাবধানের মার নেই। দুমিনিটেই আমি ওপরে উঠে এলাম। ছোট্ট প্ল্যাটফর্ম। ভালো পা ঝুলিয়ে বসা যায়। দূরবীন রাখার জন্য সামনে একটা থলি আছে। নিজেকে গুছিয়ে দাঁড়াতেই হঠাৎ মনে হল মাথা ঘুরছে, আশ্চর্য হলাম। এ ব্যারাম তো আমার নেই। ভালো করে মাথাটা ঝাঁকিয়ে কোমরের সিকিউরিটি বেল্টটা দেখে নিলাম, ঠিক আছে। তিন-চার মিনিট লাগল নিজেকে সামলে নিতে, তারপরই ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। আসলে মাথা ঘুরছে না জাহাজের সর্বোচ্চ অংশে থামের ওপর আছি বলে ঢেউয়ের দোলায় মনে হচ্ছে মাথা ঘুরছে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি। দোলনা বা নাগর দোলায় চাপলেও এরকম অনুভূতি হয়নি। দশতলা উঁচু ওয়ান্ডার হুইলে চড়েছি, সেটাও আলাদা। পায়ের নীচে নৌকো, আমি অনেক উঁচুতে একা থামের ওপর পাখির মতো দাঁড়িয়ে আছি, আমার চারদিকে জল জল আর জল, নীচের জাহাজটাকে দেখতে হলে মাথা নিচু করতে হবে। ঝড়ে বাঁশগাছের মতো এই থামটা ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। একবার নীচে জলের কাছাকাছি নেমে আসছে, আবার ওপরে উঠে আসছে। ভারি মজার খেলা। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আকাশ থেকে আমাকে কোমরে দড়ি বেঁধে কে যেন ছেলেখেলা করছে। বেশ মজা লাগছে কিন্তু ঢেউয়ের দোলায় এই উঁচুতে ঝাঁকুনিটা আরও বেশি, যে এই অবস্থায় পড়েনি তাকে বোঝানো যাবে না। হঠাৎ পায়ের কাছ থেকে একটা শব্দ ভেসে উঠল— ঠিক আছো? গলার স্বরেই বুঝলাম রোনাল্ডো। আগে লক্ষ করিনি, এখন দেখছি ছোট্ট একটা লাউডস স্পিকার, শব্দটা আবার ভেসে উঠল, হ্যালো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

—মোটেই না, তবে মনে হয় না আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব।

—আপনি সামনের দিকে দূরবীন দিয়ে দেখুন দূরে অনেক দূরে, যেখানে আকাশ সমুদ্রে পড়েছে।

কথামতো আমি দূরবীন নিয়ে সামনের দিকে তাকালাম একটু এদিক ওদিক করে দূরবীনের ফোকাস বাড়িয়ে কমিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলাম অনতিদূরেই একটা কালোপাহাড় জলের ওপর ভাসছে। চেঁচিয়ে উঠলাম, হ্যাঁ পেয়েছি, পেয়েছি দেখতে

পাচ্ছি, মনে হচ্ছে একটা কালো দ্বীপ।

—ঠিক ঠিক আমরা ওদিকেই যাচ্ছি। জাহাজের মাস্তুলের দোলানি আস্তে আস্তে অসহ্য হয়ে আসছে, শরীর অসুস্থ হবার আগেই আস্তে আস্তে নেমে এলাম।

রোনাল্ডো জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগল?

—অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, আপনারা ওখানে থাকেন কী করে?

—ওখানে আমরা থাকি না, মাঝে মাঝে উঠে দেখি।

একই জাহাজ অথচ এই উচ্চতার জন্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, মনে হয় খুব বেশিক্ষণ ছিলাম না। বড়জোর আধঘণ্টা, তাতেই আমার অবস্থা কাহিল। যাদের সি-সিকনেস ও খাদে পরার ভয় আছে, তাদের কাছে হার্টফেল করার সহজ উপায়।

এখন বুঝলাম আসলে দূরের দ্বীপটা ওপর থেকে দেখবার জন্য, অ্যানাউন্স করার জন্য আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্য রোনাল্ডো আমাকে ওপরে পাঠিয়েছিল— ওকে অজস্র ধন্যবাদ দিলাম।

আস্তে আস্তে সূর্য উঠল, খুব তাড়াতাড়ি উঠে গেল। দৃশ্যটা ঠিক উপভোগ করতে পারলাম না। মাথা ঘোরেনি বটে, তবে মনে হয় তার থেকেও বেশি অন্য স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। তারও প্রায় দেড়ঘণ্টা পর সেই দ্বীপটাতে এসে পৌঁছলাম। অনবরত সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়ছে, সৃষ্টি হয়েছে পুরু জলের পর্দা। আশ্চর্য দ্বীপের পিছন দিকটায় ঢেউ কম তাই জাহাজ ভেড়ার মতো একটা জায়গাও পাওয়া গেল। অর্ধমৃত যাত্রীদের জানানো হল— এই দ্বীপে আমরা দুঘণ্টা থাকব, ব্রেকফাস্ট আর বিশ্রামের জন্য।

দ্বীপের নাম রোচা, ইংরিজিতে বলে রক আইল্যান্ড। সমতলভূমির ওপর সুন্দর ঘাস ও শেওলার কার্পেট। দ্বীপে আমরা একা নই, এখানকার স্থায়ী বাসিন্দারা এসো এসো বসো বসো বলে আমাদের আপ্যায়ন জানাল। বাসিন্দা মানে অজস্র সামুদ্রিক পাখি, সি-গাল, করমোরান্ট আর হুপার বা হুপো নামে লাল ঝুঁটিওলা পাখি। গিরগিটি কামেলিয়ন আর ওই ধরনের পোকাখেকো ছোট সরীসৃপগুলো আমাদের দেখে চোখ বড় করে তাকিয়ে রইল, ভাবটা এমন যে এসেছ, ভালো, কিন্তু আমাদের দ্বীপ দখল করো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই কফি-চা-স্যান্ডউইচ বিলি করা হল, কিন্তু মনে হল কারওরই খিদে নেই, সবাই চাইছে সরাসরি বিশ্রাম। সবাই যে যার কোনা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়ল। সূর্য উঠলেও বাতাসের জন্য উত্তাপটা গায়ে লাগছে না। ছোট্ট দ্বীপে আধঘণ্টার মধ্যেই ঘুরে আসা যায়। এই দ্বীপের পাহাড়গুলো বেশ শক্ত স্লেট মতো, ঝামাপাথর নয়। সারা রাতের ক্লান্তিতে আস্তে আস্তে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল রণে ক্লান্ত সৈনিকের মতো। আমিও তাদেরই একজন।

প্রায় তিনঘণ্টা পর জাহাজের শঙ্খ বেজে উঠল। আস্তে আস্তে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা টলমল করতে করতে জাহাজে উঠলাম। একে একে জাহাজে পাল তোলা হল, মালপত্র সব হাতাহাতি করে জাহাজে ওঠানো হল। আর দ্বীপে কেনওরকম

আবর্জনা না ফেলে সব প্লাস্টিকের ব্যাগ তুলে আনা হল এমনকী সিগারেটের টুকরো পর্যন্ত। পৃথিবীকে দূষণ মুক্ত রাখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের— দ্বীপের ওপর লেখা ছোট্ট পাথরে খোদাই নোটিস। যে থামটা ধরে জাহাজে ওঠানামা করতে হয় সেই থামে লেখা, আবার আসবেন কিন্তু খালি হাতে, আমাদের দ্বীপে আমাদের জন্য যথেষ্ট খাবার আছে, নীচে একটা পেলিক্যানের ছবি।

আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম বারোটায় বারবেকিউ লাঞ্চ। কোথায় সে পরে ঘোষণা করা হবে।

এবারে পালতোলা জাহাজে সত্যি বিলাসী ভ্রমণ বলা যেতে পারে। মাঝে মাঝে মোটর চালিয়ে সময়কে ধরা হচ্ছে। এখন মাথার ওপর বেশ কড়া রোদ্দুর। ছোট প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচল। বার থেকে কফি-চা-বিয়ার সাপ্লাই আরম্ভ হল। ছাত্রছাত্রীরা রাতের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার গুঞ্জন আরম্ভ করল। ক্যাপ্টেনের নিষেধ লাঞ্চের আগে হ্যান্ড ফোন খোলা হবে না। সমুদ্রের অটো রুট ধরে জাহাজ এগিয়ে চলেছে খুব স্বচ্ছ গতিতে। ক্যাপ্টেন, গাইড আর নাবিকেরা এগিয়ে এল, এবার শুরু হল স্কিপার ট্রেনিং, আগের মতোই আবার দলভাগ করা হল; তারপর চলল তাঁবু চড়ানো আর হাওয়া ধরবার কৌশল শিক্ষা।

এতক্ষণে আমার সুযোগ হল ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করার, দেখলাম প্রায় সবাইই ইংরিজি জানে তবে কথা বলার অভ্যাস নেই বলে সঙ্কোচ। এক্ষেত্রে আমিই এলাম উপযাচক হয়ে আলাপ করতে। সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম এরা সবাই ভাস্কো-দা-গামার কথা ইতিহাসে পড়েছে কিন্তু সে কোথায় জন্মেছে সে খবর রাখে না। আমি এ দলে সবচেয়ে বেশি বয়সী, কাজেই অনেকটা প্রফেসরের মতো তাদের শোনাতে লাগলাম ভাস্কো-দা-গামার কথা। তাঁর জন্ম সিনেস নামক স্থানে আলগার্ভের উত্তরে। সেখানে কোনও নৌ-বিদ্যা শেখার সুযোগ ছিল না তাই চলে এসেছিলেন সাইগ্রেস, সাইগ্রেসেই প্রথম আটলান্টিক মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্য ইনফান্তা দ্য হেনরির— সমুদ্র ও নৌবিদ্যার স্কুল ছিল। সবাই তাঁকে চেনে প্রিন্স হেনরি দি নেভিগেটর বলে। তার মৃত্যুর আট বছর পর ভাস্কো-দা-গামার জন্ম। ভাস্কো-দা-গামার জন্মস্থানে তাঁর কোনও স্ট্যাচু নেই। ঐতিহাসিকদের মতে, তার কারণ নিজের দেশে তিনি মোটেই জনপ্রিয় ছিলেন না। তবে রাজধানী লিসবনের মিউজিয়ামে তাঁর কৃতিত্ব স্বর্ণাক্ষরে লেখা। এ পর্যন্ত বলেই থামলাম, দেখলাম আরও বেশি বললে ওরা জায়গা ছেড়ে উঠে পড়বে। স্কিপারের ট্রেনিং প্রোগ্রাম পর্তুগিজ ভাষায় চলছে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, তাই শুধু প্রশংসার দৃষ্টিতে ওদের কাজকর্ম দেখতে লাগলাম। বারোটায় কথা ছিল কিন্তু জাহাজ, ভিড়ল সাড়ে বারোটায়। আমরা আটলান্টিক ছেড়ে কাদিজ উপসাগরে (Golf of Cadiz) পৌঁছলাম, মানে আলগার্ভের দক্ষিণে।

বালির চরায় নেমেই রোনাল্ডো আবার শুরু করল তার বক্তৃতা। ভাস্কো-দা-গামার সময়ে রেফ্রিজারেটর ছিল না। খাবারের মধ্যে প্রধানত শুকনো শুয়োরের

মাংস, মধু, নানা রকমের শুকনো ফল, ফলের মোরব্বা আর মদ। জলে যদিও মাছের অভাব ছিল না কিন্তু জাহাজে আগুন লাগার ভয়ে খুব কম মাছ ধরা হত। কোনও দ্বীপে জাহাজ ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেঁকা মাছ বা মাছের স্যুপ খাওয়া হত। তবে আজকে আপনাদের অত কষ্ট করতে হবে না। আপনাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে, এখানকার বিখ্যাত ডোরাডা, সার্ডিন, স্কাবার্ড, আর সুস্বাদু হর্স ম্যাকারেল। অবশ্য আমরা মাছ ধরিনি। দুপুরের খাবারের দায়িত্ব নিয়েছে লাগোসের বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট ফ্লোরেস্টাল। ওই দেখুন ওপরে ওদের সাদা তাঁবু দেখা যাচ্ছে, আপনাদের জন্য সুস্বাদু গ্রিল্ড-ফিশ অপেক্ষা করছে। যুদ্ধে ক্লান্ত ও আহত সৈনিকদের মতো আমরা আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এলাম। বাতাসে মাঝে মাঝে ভাজা মাছের গন্ধ আমাদের খিদে বাড়িয়ে তুলল। ওপরে পার্কের মতো স্থায়ী বেঞ্চি ও টেবিল। অধিকাংশ মাটিতেই বসে পড়ল। বসার সঙ্গে সঙ্গেই খাঁটি পর্তুগিজ অ্যাপারেটিভ পোর্তো দিয়ে সবাইকে স্বাগত জানাল রেস্টুরেন্টের মালিক অথবা ম্যানেজারও হতে পারে।

খাওয়ার পরের প্রোগ্রাম সমুদ্রে নয় এই উপসাগরেই হবে। জাহাজ চালাবে ছাত্রছাত্রীরাই। আমরা সবাই নাবিক তবে ক্যাপ্টেন ও জাহাজের নাবিকরাই আমাদের হাতে ধরে শেখাবে। মাছ ভাজা, রোস্টেড, স্যাকা, পোড়ানো আর তার সঙ্গে আলুভাজা, টমাটো, বরবটি ও বিন-এর তরকারি, শেষে এল এখানকার নামকরা শুয়োরের মাংসের সসেজ। ডেসার্ট এল ডুমুরের প্যাস্ট্রি। কফি দিয়ে মুখশুদ্ধি করা হল।

আবার জাহাজে। আমি জাহাজ না বলে সাগর নৌকো বলতে পারতাম, কিন্তু কলম্বাসের জাহাজ শিপ অব কলম্বাস নামেই বিখ্যাত। তাই ওই নামই উল্লেখ করলাম। বিকেলবেলার প্রোগ্রামটা সম্পূর্ণ শিক্ষামূলক। শুরু হল দিকনির্ণয় দিয়ে। দিকনির্ণয় নৌবিদ্যার প্রথম ধাপ। নৌকোর অবস্থান কোথায় আর গন্তব্যস্থল কোথায়। আজকাল ইলেক্ট্রনিক যুগে খুব বেশি মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যন্ত্রই সব বলে দেবে তবে তার জন্য যন্ত্রের ব্যবহার জানতে হবে। আর রয়েছে স্যাটেলিক কানেকশন, হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম, সব সময় স্যাটেলিক কন্টাক্ট। এই জাহাজে পুরনো মডেলের ওপর বসানো হয়েছে অতি আধুনিক যন্ত্র।

এই জাহাজে ব্যবহার করা হয় Fx324 Map Color। সাইবার জগতের আরেক নতুন আবিষ্কার। মানচিত্র পড়া থেকে শুরু করে জলপথ সংকেত, বিপজ্জনক স্থান, কোথায় সাহায্যের জন্য মাউস ক্লিক করতে হবে সব হাতের মুঠোয়। এই সিস্টেমের নাম ম্যাজেলান। এই সিস্টেমে জলের গভীরতা আর কোন জলে কোন ধরনের মাছ বা জীবজন্তু আছে তাও বলে দেবে। আর জাহাজের কী-বোর্ডে পাওয়া যাবে স্রোতের গতি, জাহাজের গতি, বাতাসের গতি এমনকী ঢেউয়ের উচ্চতা পর্যন্ত। রাতে চলার জন্য প্রথমে দরকার ধ্রুবতারা বা পোলার স্টারকে চিহ্নিত করা, তারপর সেই অনুযায়ী দিকনির্ণয়। ক্যাপ্টেন বার বার বোঝাতে

লাগলেন যে, আজকার টাইট আন্তর্জাতিক সিকিউরিটি কন্ট্রোলের জন্য যে কোনও জাহাজে, ইয়টে বা শখের নৌকোয় ইলেক্ট্রনিক নেভিগেশন ইক্যুইপমেন্ট বাধ্যতামূলক। বিশেষ করে যারা উপসাগর, সাগর ও সমুদ্রপথে চলবে। তবে পালতোলা জাহাজে সম্পূর্ণ মেশিন বন্ধ করে দিয়ে চলবার একটা আলাদা মজা। একদিকে বিজ্ঞানের উন্নতি— জোরে আরও জোরে চালাও, আর অন্যদিকে পাল তুলে দিয়ে সম্পূর্ণ আরামে প্রকৃতির কোলে নিজেকে উৎসর্গ করে দাও গতি ও সময়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। যদিও ক্যাপ্টেনের ও গাইডের আপনকরা উৎসাহিত কণ্ঠস্বরে বারবার ওদিকে মন যাচ্ছিল কিন্তু আসলে আমার দৃষ্টি আটকে আছে জাহাজের সামনে, ঢেউ কেটে জাহাজটা কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাই এক রহস্য।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় জাহাজ পোর্তিমাও ডেকে এসে থামল। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার এক অভিজ্ঞতা। মনে গেঁথে রইল স্থায়ী হয়ে। পোর্তিমাও ফারোর আরও কাছে। উঠেছিলাম লাগোসে আর অবতরণ করলাম পোর্তিমাওয়ে। এখান থেকে ফারোর দূরত্ব ৬২ কিলোমিটার। এখান থেকে মঁসিক ১৮ কিলোমিটার। ধন্যবাদ আর ঠিকানা বিনিময় করে পরস্পর পরস্পরকে বিদায় জানালাম। বিদায় জানালাম কলম্বাসের ঐতিহাসিক জাহাজ গুড হোপকে। এটাই বর্তমান নাম।

জলদস্যুদের নৌকোয় সমুদ্র ভ্রমণ

পর্তুগালের মঁসিকে আমরা যে হোটেলে আছি সেই হোটেলটা এখানকার নামকরা থার্মাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার অথবা ক্লান্তিমুক্ত করার জন্য এই এলাকাটি রোমান যুগ থেকেই বিখ্যাত। হোটেল রেস্টুরেন্ট আর স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ঘিরে বিরাট এলাকা। এখানকার সাজানো ও প্রাকৃতিক বাগান উপভোগ করার মতো। অলিভ আর ইউক্যালিপ্টাসের জঙ্গলের ভেতর সুন্দর পাহাড়ি ঝরনা, চারদিকে পাখির ডাক আর নাম না-জানা হাজার রকমের বনফুল জায়গাটাকে স্বর্গে পরিণত করেছে। জঙ্গল বটে, কিন্তু সাজানো। হাঁটতে হাঁটতে একটু পা ধরে গেলেই আশপাশে কোথাও পাথরের টেবিল বেঞ্চি পাওয়া যাবে। জঙ্গলের ভেতরেই রয়েছে একটি ছোট্ট চার্চ, তার মধ্যে করুণাময়ী ভার্জিন মেরির অভয়মূর্তি। এখানকার পার্কের মুক্তাঙ্গনে আমরা সবাই বসি, বেশ জমিয়ে আড্ডা বসাই। সেদিন আমার কলম্বাসের জাহাজে চড়ে ভাস্কো-দা-গামার দেশে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটাই বলছিলাম। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি আমরা এসেছি কিনেসিওলজির একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। কিনেসিওলজির মূল বিষয় হচ্ছে প্রাচীন ভারত ও চিনের চিকিৎসাকে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে খাপ খাইয়ে বিনা ওষুধে চিকিৎসা করার পদ্ধতি। ইউরোপিয়ান প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগদান করেছে কানাডা ও আমেরিকার অনেকে। কথায় কথায় জন-ফিলিপ জিজ্ঞাসা করল, তুমি পাইরেটের বোটে চেপেছ?

পর্তুগালে এখনও পাইরেট আছে নাকি? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কথা শুনে ও হো হো করে হেসে উঠল।

—না পাইরেট নেই, তবে পাইরেটরা যেসব পর্বতগুহায় লুকিয়ে থাকত সেগুলো আগের মতোই আছে। আজকাল সেই অবিকল পাইরেট বোটের অনুকরণে একটা বোট তৈরি করেছে। আর সেই বোটে করে সেই পুরনো পর্তুগিজ জলদস্যুরা যেসব জায়গায় থাকত ও লুঠ করা ধনদৌলত রেখে ভাগাভাগি করত সেসব গুহা ভ্রমণ করা যায়। প্রত্যেকদিন ট্যুরিস্টদের জন্য ওয়াটার সাফারির ভালো বন্দোবস্ত আছে।

—খুব ভালো খবর দিয়েছ, বল বল কোত্থেকে বোটটা ঘোরে? আমি ভীষণ উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

—পোর্তিমাও বন্দর থেকেই ছাড়ে, আমি গত বছর ওই ট্যুর নিয়েছিলাম।

খুব ভালো, খুব ভালো কালকেই খোঁজ নেব।

আমি এদের সঙ্গে আছি বটে কিন্তু কনফারেন্সের জন্য নয়, আমি এসেছি দেবীর সঙ্গে ও এই কনফারেন্সের একজন প্রতিনিধি। আমি ওর স্বামী, সহকারী, আমার উদ্দেশ্য কনফারেন্স নয়, আমার উদ্দেশ্য ভ্রমণ। এ অঞ্চলে এর আগে আসিনি তাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা।

যেমন শোনা তেমনই কাজ। পরের ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। লোকাল বাসে মঁসিক থেকে পোর্তিমাও মাত্র আধঘণ্টা। ট্যুরিস্ট অফিসে জিজ্ঞাসা করতেই সঙ্গে সঙ্গে সব খবর পেয়ে গেলাম। এখন নটা বেজে পাঁচ, ট্যুরিস্ট অফিসের ভদ্রমহিলা ঘড়ি দেখে অনেকটা তাড়িয়ে দেওয়ার মতো করে বললেন, তাড়তাড়ি চলে যান, নটা পঁয়তাল্লিশে বোট ছাড়বে। পোর্টে পেট্রল পাম্পের পিছনেই পাইরেটশিপের অফিস।

আমি ভদ্রমহিলাকে থামিয়ে দিয়ে অনুরোধ করলাম, আমি বহুদূর থেকে আসছি, দয়া করে ওদের অফিসে একটা টেলিফোন করে দিন, বলুন আমি আসছি।

ভদ্রমহিলা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফোন করলেন, উত্তর একটু দেরিতে এল, তারপর ফোনটা রেখে দিয়ে বললেন, জায়গা পাওয়া যাবে, অসুবিধা নেই, চলে যান। ট্যুরিস্ট অফিস থেকে পোর্ট মাত্র দশ মিনিট— হেঁটে। উপযুক্ত জায়গায় এসেই দেখি একেকটা সানশেডের তলায়, একটা টেবিল ও একজন টিকিট বিক্রি করার লোককে কেন্দ্র করে একেকটা এজেন্ট। বিভিন্ন ট্যুর প্রোগ্রামের জন্য খদ্দের খুঁজছে। চেয়ারের সামনে ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করার জন্য বড় বড় সাইনবোর্ড। পাইরেট বোটের বিরাট ছবি আমাকে আকর্ষণ করল। কাছে যেতেই অল্পবয়সী হাসিখুশি একটা ছেলে আমার দিকে এগিয়ে এল।

—আপনি টেলিফোন করেছিলেন?

—আমি নই, ট্যুরিস্ট অফিস।

—আচ্ছা ওই একই ব্যাপার। আমাদের ফিকসড টেলিফোন কারওর নেই সবাই

মোবাইল টেলিফোন ব্যবহার করি। আমার নাম রালফ। বোট নটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ছাড়বে, ফিরে আসবে দুপুর একটায়। তিনঘণ্টা পনেরো মিনিটের ট্যুর। টিকিটের দাম পঁচিশ ইউরো, জাহাজে বার আছে, বিয়ার ও অন্য কোল্ড ড্রিঙ্ক কিনতে হবে। অবশ্য আপনার যদি ইচ্ছে হয়।

আমি পঁচিশ ইউরো দিয়ে টিকিট সংগ্রহ করলাম। আর দশ মিনিটের মধ্যেই পাইরেট বোট এই ঘাটে আসবে। ঠিক আছে, বলেই আমি পাশের বারে ঢুকলাম এক কাপ ছোট কফি (স্থানীয় কথায় এক্সপ্রেসো) খেতে। ইউরোপের অন্যান্য শহরের তুলনায় এখানে সস্তা। প্যারিসে ছোট কফির দাম এক ইউরো কুড়ি সেন্টিস আর এখানে মাত্র পঞ্চাশ সেন্টিস। বার থেকেই চোখে পড়ল ঠিক ছবির মতো। পাল তুলে সদম্ভে এগিয়ে আসছে সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি একটি বোট। বোটের গায়ে লেখা Santa Bernarda, Pirate Ship। মনে ভাবলাম দুদিন আগে কলম্বাসের বোটে চেপে নিজেকে কলম্বাসের গৌরবে গৌরবান্বিত করেছিলাম। এখন এই জলদস্যুর নৌকোয় চড়ে সেই এক চোখো ল্যাংড়া জলদস্যুতে পরিণত হয়ে যাব কি? দেখা যাক!

মনের মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চারের ভাব এল। এই জেটিটার নাম পোর্তো দা কাপিতানিয়া। সকলকে ওয়েলকাম জানিয়ে জাহাজে তোলা হল। ভাগ্য ভালো খুব বেশি ভিড় নেই। আমরা মাত্র দশজন যাত্রী, 'যার যেখানে খুশি বসতে পারেন, যাঁরা সাঁতার জানেন না তাঁদের অনুরোধ করব সব সময় লাইফ জ্যাকেট পরে থাকতে, এটা নিয়ম।' ঠিক সময়েই জাহাজ ছাড়ল। পালতোলা জাহাজ হলেও এর সব কিছুই মডার্ন। ডেক থেকে গভীরে আসার জন্য ইঞ্জিন ব্যবহার করা হল। তারপর পালে যেই হাওয়া ধরল সঙ্গে সঙ্গে মেশিন বন্ধ করে দেওয়া হল। জাহাজ ছাড়তেই একটা অদ্ভুত শিহরণ লাগল, জাহাজে ফিট করা লাউড স্পিকারে গাইডের স্বর ভেসে উঠল।

কোনও সন্দেহ নেই, আপনারা এখন পাইরেট বোটের যাত্রী। পুরনো মডেল কিন্তু নতুন তৈরি, আমাদের সব যন্ত্রপাতিই অতি আধুনিক। যেহেতু আমরা এখন দুহাজার তিন সালে কাজেই সেই পুরনো ডাকাতি বিদ্যা কাজে লাগাব না, আমরা পাইরেট শিপের যাত্রী যাচ্ছি সাফারিতে। ক্যাপ্টেন ও ক্রুর তরফ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাই। গাইড থামল, ভেসে উঠল ক্যাপ্টেনের গলা, ওয়েলকাম টু পাইরেট বোট। এই দুই মাস্তুলের জাহাজে চড়ে আমরা উপসাগরীয় সৈকত ও গুহা ভ্রমণ করব। আমরা পাইরেট বোটে করে ডাকাতি করব না কিন্তু এককালে সমুদ্র ও উপসাগরীয় জলদস্যুরা কোন কোন অঞ্চল তাদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করত সেটাই দেখব। উপসাগরীয় এই গুহাগুলি যদিও জলদস্যুরা ব্যবহার করত কিন্তু তার সৃষ্টি হাজার হাজার বছর আগে। বালি পাথরের স্থলভাগে ঢেউ ও সাগর-স্রোতের ফলে উঁচু দেওয়ালের মতো স্থলভাগ ভেঙে পড়ছে। আর শক্ত ঝামাপাথর থেকে যাচ্ছে যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য গুহা ঘরবাড়ি প্রাসাদ।

প্রকৃতির এক আশ্চর্য খেলা। এই জাহাজের নাম সান্তা বেরনার্দা। আমি ক্যাপ্টেন রবার্টো, আশা করি আপনাদের এই সফর ভালোই লাগবে, ধন্যবাদ।

আজ সাগর সত্যি শান্ত। আস্তে আস্তে ঐতিহাসিক পোর্তিমাও বন্দর উধাও হল। পোর্তিমাও থেকে আমরা স্থলভাগ বাঁদিকে রেখে একটা ছোট জেলেদের গ্রাম পেলাম। গ্রামটির নাম ফেরাগুডো। তারপর দুটো মধ্যযুগীয় দুর্গ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এতক্ষণ জাহাজ পাল তুলে ধীরগতিতে চলছিল, হঠাৎ ইঞ্জিন চালু হল সময় বাঁচাবার জন্য। জাহাজ চলল দক্ষিণ-পূর্বদিকে। কোস্টলাইনের সুন্দর একটি দৃশ্য। সামনেই দেখা দিল জলের পরেই স্থলভাগের পাঁচিল। আমাদের সামনে দেখা দিল পাথরের প্রাচীরবেষ্টিত সুন্দর একটি বিচ। ওপরের স্থলভাগ থেকে আসতে হলে সরাসরি আসা যাবে না। গাইড দরকার অথবা সাইনবোর্ডের লেখা নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে। এই ছবির মতো সুন্দর বিচটির নাম কারভো এইরো। জাহাজ এখন খুব আস্তে আস্তে চলছে, শুধু পালে হাওয়া ধরিয়ে। কারভো এইরোর বিচ পেরোতেই দূরের আরেকটা দৃশ্য আমাদের অবাক করে দিল— মহাসাগরের ধারে একটা রাজপ্রাসাদ। ভেতরে ঢোকবার জন্য দুটো খোদাই করা তোরণ, তারপরই বিরাট উঁচু প্রাসাদ, লাল ও গেরুয়া রঙের অসংখ্য পাথরের খোদাই কাজ। শুরু হল এক অজ্ঞাত শিল্পীর অমর ভাস্কর্য শিল্প প্রদর্শনী। কোনওটা রাজপ্রাসাদের মতো, কোনওটা মন্দির— নিজের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনওটা উত্তর ভারতীয় ধাঁচে, কোনও দ্রাবিড়ীয় ধাঁচের, মন্দির, প্যাগোডা, গির্জা সমুদ্রের ধারে এক তীর্থভূমি তৈরি করেছে। সমুদ্রের স্বচ্ছ নীল রঙা বালি, খোদাই করা গেরুয়া দেওয়াল আর হালকা রঙের প্রাসাদ— এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য আমাদের মুগ্ধ করে দিল।

জাহাজ এবার স্থলভাগের গা ছুঁয়ে চলল। একের পর এক দৃশ্য আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দিল। পাথরের এই অদ্ভুত ধরনের গঠনই পৃথিবীর এই প্রান্তের বৈশিষ্ট্য। এই অঞ্চলটির নাম আলগার সেকো। তারপর আলফানজিনা লাইটহাউসের কাছে এসে জাহাজ নোঙর নামাল। এবার পিছনে বাঁধা দুটো ছোট মোটর বোট সামনে আনা হল, এখান থেকে শুরু হবে নিকটদর্শন। পাঁচজন পাঁচজন করে দুটো বোটে আমরা উঠলাম। শান্ত ধীর ও এক আনন্দময় জগতে কে যেন বজ্রধ্বনি দিল। ছোট দুটো বোটের যন্ত্র সুরের একতানের মধ্যে হঠাৎ ভাঙা কাঁসর বাজাল।

একঘেয়ে শব্দ করতে করতে আমরা একটা দেওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম, একটু মোড় ঘোরাতেই সামনে একটা বিরাট গুহার মুখে পড়লাম। একটা জলদৈত্য হাঁ করে আমাদের গেলবার জন্য বসে আছে। ভেতরটা অন্ধকার। জল ঢুকে গেছে ভেতরে, গুহাটা পেরিয়ে আরও একটি গুহা পেলাম। এবার আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকলাম। মাথার ওপর বেশ উঁচু ছাদ। আরেকটু এগিয়ে মোড় ফিরতেই দূরে নজরে পড়ল আলো। কে যেন ওপর থেকে সার্চলাইট ফেলেছে পাশের বালুচরে। আমরা নামলাম, শুরু হল পদযাত্রা। অনেকেই জুতো নৌকোয় খুলে রাখল আর

যাদের জুতো ভিজে গেলে ক্ষতি নেই, তারা জুতো পরেই চলল। ওপরের আলোটা গুহার উন্মুক্ত ছাদ থেকে আসছে। মনে হচ্ছে গোল করে কেটে আলো আনা হয়েছে। কাছে যেতেই আরও অবাক হওয়ার পালা। যেখানে ওপর থেকে আলো এসে পড়েছে সে জায়গাটা বিরাট একটা উঠোন আর তার চারপাশে গোলাকৃতি আরও চারটে গুহা। গুহাগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট, পর পর আট-দশজন শুয়ে থাকতে পারে। নীচে বালি, একটু মাটি নেই। জোয়ারের সময় এই সব গুহা জলে ভরে যায়। গুহা থেকে বেরিয়ে আমরা আবার ছোট বোটে উঠলাম। বোট এবারে আবার সমুদ্রের ধারে এসে এগিয়ে চলল। এবার পর পর পাঁচিলের ওপর গুহার পর গুহা। মনে হচ্ছে সমুদ্র যাত্রীদের জন্য থাকবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রকৃতি কী করে সৃষ্টি করেছে এরকম গুহা বৈজ্ঞানিকরা বলতে পারবে। প্রায় সব গুহার ভেতরেই একটু উঁচুতে বালির প্ল্যাটফর্ম, কোনও কোনওটায় দাঁড়ানো যায়, কোনও কোনওটায় বসা যায়, আর কোনও কোনওটা শুধু শোবার জন্য। আরও আশ্চর্য হলাম বেনজিলের এক বিরাট গুহায় ঢুকে। বিশ্বাসই করা যায় না যে এটা প্রকৃতির সৃষ্টি। দেখেই মনে হয় এটা আর্কিটেকটের সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত। সমুদ্র দেবতার জন্যই হয়তো তৈরি হয়েছে। এই বিরাট গুহায় দুটো গোলাকৃতি তোরণ, একটা ঢোকবার জন্য, আরেকটা বেরোবার জন্য। ভেতরে ঢুকতেই পাওয়া যাবে ওপরের সার্চলাইট, গোল করে কাটা ছাদ থেকে দিনের আলো এসে পড়েছে। এখানে বোটের ইঞ্জিন চালানো বারণ, দুটো বৈঠা দিয়ে আমাদের বোটকে আরও ভেতরে আনা হল। সামনেই বিরাট উঠোন। পরিষ্কার বালি। আমরা বোট থেকে নামলাম, মাথার ওপর প্রায় সাত মিটার উঁচু গোলাকার গম্বুজ ঠিক মন্দিরের মতো। পাশের একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে অন্ধকারে দেওয়াল ধরে ধরে এগোলাম। গাইড বলল, এখানে কোনও সিঁড়ি নেই, আর নীচে বালি, কাজেই ভয় নেই। দেওয়াল দশ মিটার এগোতেই একটা মোড়, দূরে দেখা দিল আলো। আবার একটা হলঘর, ওপরটা মুক্ত, দিনের আলো এসে পড়েছে শুদ্ধ সোনালি বালির ওপর। আমরা বসলাম। চারদিকে অবাক হয়ে তাকাতে লাগলাম। দূরে আরও দুটো ছোট গুহা। সুড়ঙ্গপথ হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। গাইড বলল যে, এই সুড়ঙ্গপথে ওপরের গ্রামে ওঠা যায়। এক সময় ওপরকার গ্রামটি ছিল কুখ্যাত ভেসিন্তি পাইরেটের রাজত্ব। বহু বছর শাসকের দৃষ্টির আড়ালে, সে এই অঞ্চলে দস্যুবৃত্তি করত, সবাই জানত এটা জেলেদের গ্রাম। ভেসিন্তি প্রকৃতির সৃষ্ট এই গুহাগুলোকে কেন্দ্র করে তার দস্যুবৃত্তি ও রাজত্ব বেশ ভালোভাবেই চালিয়েছিল। দস্যুবৃত্তির জন্য তার কয়েকটি নৌবহর ছিল। আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগর থেকে যে সব বাণিজ্যতরী এ পথে যাতায়াত করত তারাই ছিল এদের মূল শিকার। দুঃখের বিষয় যে সেই সময় কোনও রাজার জলদস্যুদের ধরার জন্য কোনও সামরিক বাহিনী বা নৌবাহিনী ছিল না। অবশ্য বলাই বাহুল্য যে জলদস্যুরা ছিল। অভিজ্ঞ নাবিক আর নৌযুদ্ধে তারা ছিল অপরাজেয়। স্পেনের রাজা ল্যাটিন আমেরিকা অভিযানে এই

জলদস্যুদের মধ্য থেকেই দুর্ধর্ষ নাবিক বাছাই করেছিলেন। বলিভিয়া পেরু ও দক্ষিণ আমেরিকার ধনদৌলত লুণ্ঠন করার ইতিহাস আজ সবাই জানে। এইসব গুহাগুলো দেখে মনে হচ্ছে যে এই গুহাগুলো লুকিয়ে থাকার জন্যই তৈরি হয়েছে।

বেনজিলের গুহা দেখে তারপর আরও গুহা ও অদ্ভুত ধরনের পাথরের গঠন দেখলাম। প্রাইয়া দা মারিনহা, আর্মাচাও দে পেরা এই জায়গাগুলো উপসাগর থেকেই দেখা যায়, স্থলভাগ থেকে এ দৃশ্য দেখা যায় না। বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। অদ্ভুত ধরনের সুন্দর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দেখলেও তৃপ্তি হয় না। কয়েক হাজার গুহার এক সাজানো সৈকত দৃশ্য। আমি এসেছি শুধুই দেখতে, নয়নভরে দেখলাম। প্রায় দেড়ঘণ্টা বিভিন্ন গুহা পরিদর্শন করে আমরা আবার ফিরে এলাম আমাদের পাইরেট জাহাজে।

পাইরেটের দেশে, পাইরেটের নৌকোয়, পাইরেটের এককালীন ব্যবহৃত সৈকতের প্রাচীর বন্দর আর লুণ্ঠিত ধনদৌলত রাখার লুকনো জায়গা, রহস্যময় অজ্ঞাত বাসস্থান আর তাদেরই ভাষায় গাইডের কণ্ঠস্বর আর আবহাওয়া আমাকে সম্পূর্ণ সেই জগতে নিয়ে গেল।

ইতিহাস যাই বলুক না কেন বর্তমানে পাইরেট শিপে চড়ে আলগার্ভের এই আশ্চর্য সুন্দর গুহাগুলো দূর থেকে দেখে আর ছোট বোটে আলো অন্ধকারের আবহাওয়ায় গুহাগুলোর ভেতরে ঢুকে ট্যুরিস্ট মাত্রেই অবাক হয়ে যায়। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

সকাল নটা পঁয়তাল্লিশে জাহাজে চেপেছিলাম। ঘাটে ফিরে এলাম দেড়টায়। আধঘণ্টা বেশি লাগল। মাত্র পঁচিশ ইউরোতে এত সুন্দর একটি ট্যুর হবে আশা করিনি।

যাঁরা এই লেখা পড়ে ওখানে যাবেন তাঁরা একটা কথা মনে রাখবেন, আলগার্ভে অঞ্চলে সমুদ্রের ধারে কয়েক হাজার গুহা আছে। যাঁরা ঝুঁকি নিয়ে অ্যাডভেঞ্চারে বেরোতে চান তাঁদের প্রতি পরামর্শ গাইড নিয়ে বেরোন। কারণ অনেক গুহার মধ্যে ঘূর্ণি অথবা চোরাস্রোত আছে, হঠাৎ বিপদে পড়ার সম্ভাবনা। অনেক সময় ভাটার সময় ঢুকলে ভালোই কিন্তু জোয়ারের সময়টা জেনে রাখতে হবে নয়তো হঠাৎ জোয়ারের জল ঢুকে সুড়ঙ্গের পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ভেতরে জল ঢুকে ডুবিয়ে দিতে পারে। প্রতিদিন খবরের কাগজে জোয়ার ভাটার সময় উল্লেখ থাকে। ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারে জোয়ার-ভাটার ফর্দ পাওয়া যায়।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৩

বাঘেলখণ্ড

ত্রিদিব বসু

মার্চ মাস। বম্বে মেল শেষ রাতে ইব স্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে লাইন খারাপ। তিন ঘণ্টা সময় নষ্ট হল। কিন্তু সব পুষিয়ে গেল বেলপাহাড় স্টেশনের পর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ট্রেনটা যখন দুরন্ত বেগে ছুটছিল তখন। এক অদ্ভুত প্রশান্তি ক্রমশ নেমে আসছিল মনের ভেতর। সব কিছু ভুলে মুগ্ধ হয়ে বসেছিলাম সেই মহান মৌন অপসৃয়মাণ বনভূমির দিকে তাকিয়ে।

বিলাসপুর পৌঁছলাম সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ। বনবিভাগের বাংলোয় গিয়ে স্নান-বাজার-হাট খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে তিনটে বেজে গেল। গাড়ি আসতে আরও এক ঘণ্টা। ঠিক ছিল আজই অম্বিকাপুর পৌঁছব। সেটা বোধহয় আর হল না। তাই বিলাসপুর থেকে বিকেলবেলায় অজানা ভবিষ্যতেই আমাদের মার্শাল জিপে মাভৈঃ বলে চড়ে বসলাম।

একবার যদি ভারতের মানচিত্রে চোখ বোলানো যায় তবে দেখা যাবে একটা কাল্পনিক ত্রিভুজের তিন কোনায় রেওয়া, বিলাসপুর আর ডাল্টনগঞ্জ এই তিনটে শহর অবস্থান করছে। এই ত্রিভুজের মধ্যে বড় একটা কেউ বেড়াতে যায় না। এই অবহেলিত ত্রিভুজের বেশির ভাগ অঞ্চল জুড়ে আছে বাঘেলখণ্ড।

আমরা চলেছি বাঘেলখণ্ডের অম্বিকাপুরের দিকে। ট্রেন দেরি করায় বিলাসপুর থেকে বেরতেও দেরি হল। পথে সন্ধ্যাও হল। এক ধাবায় রাতের খাবার খেয়ে শেষমেশ বিলাসপুর আর অম্বিকাপুরের মাঝামাঝি রাত সাড়ে এগারোটায় তারা নামে এক জায়গায় ডাকবাংলোর দুটো ঘর পাওয়া গেল।

সন্ধে হয়ে যাবার ফলে হাসদো নদী পার হবার পর চাঁদের আলোয় বুঝতে পারছি সুন্দর সুন্দর পাহাড়গুলো পার হয়ে চলেছি। কিন্তু তাদের ভালো করে দেখতে পেলাম না। বাঘেলখণ্ডের আঙিনায় ঢুকলাম অথচ কিছু টের পেলাম না। তারার বাংলোটা বহু পুরনো। ব্রিটিশরা পোক্ত করে বানিয়েছিল তাই এখনও টিকে আছে। বাংলোর চারপাশে কাঁচাপাকা বাড়ির সমাবেশ। নয়নাভিরাম কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্য চারপাশে না থাকলেও দ্বাদশীর চাঁদের আলোয় প্রায়-অন্ধকার উন্মুক্ত বিশাল আঙিনায় বাংলোটা তার বয়সের কৌলীন্যে মোহময়ী হয়ে উঠেছিল।

পরদিন সকালে তৈরি হয়ে নিয়ে একটু এগিয়ে লক্ষ্মণপুরে প্রাতরাশ সেরে আমরা আটটার ভেতর কারগুজা জেলার সদর অম্বিকাপুরে পৌঁছে গেলাম। বেশ বড় শহর। স্থানীয় রাজাদের আনুকূল্যে এর জন্ম এবং শ্রীবৃদ্ধি। শহরটা প্রায় সমতল জায়গার ওপর তৈরি হলেও কুড়ি-ত্রিশ কিলোমিটারের মধ্যে উত্তর-পূর্বে, পুবে আর দক্ষিণে তিন হাজার ফুটের বেশি উঁচু অনেক পাহাড় রয়েছে। রিহান্দ নদীর জন্ম এইসব পাহাড় থেকেই। এই পাহাড়গুলো ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ। কোটি কোটি বছর আগে মাটির তলা থেকে লাভা বেরিয়ে এসেই এদের জন্ম হয়েছে।

অম্বিকাপুরে পৌঁছেই আমাদের প্রথম কাজ হল স্থানীয় ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার সোয়েনের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। আমাদের দু'জনের দলটাকে উনি খুব খাতির করে ওঁর বাংলো লাগোয়া সুন্দর লনে বসালেন। অরেঞ্জ স্কোয়াশ, নানারকম মিষ্টি, পাঁপড় ভাজা, চা দিয়ে অতিথি আপ্যায়নও খারাপ হল না। অনেক আলোচনার পর স্থির হল আজ আমরা সেমারসট বাংলোয় থাকব। কাল সেখান থেকে জঙ্গলের পথে পরতাবপুর পৌঁছে দুপুরের খাবার খাব। সেখান থেকে রওনা দিয়ে ঘুই হয়ে বিকেলের মধ্যেই আমরা তামোর-পিঙ্গলা অভয়ারণ্যের মধ্যে খোঁড়-এ গিয়ে পৌঁছব। সেখানে রাত্রিবাস। তার পরদিন আমরা রিহান্দ নদী পার হয়ে চলে যাব সঞ্জয় জাতীয় উদ্যানের দিকে।

সেমারসট বনবাংলো এমন কিছু আহামরি বাংলো নয়। জল থেকে শুরু করে অনেক কিছুর অভাব আছে। এক সময় এর চারদিকে শালগাছের ভালো জঙ্গল ছিল বোঝা যায়। এখনও তার কিছু নিদর্শন রয়ে গেছে। সামান্য দূরে সেমারসট নামে একটু সুন্দর নদীও আছে। দু-দণ্ড সেখানকার নির্জনতায় চুপচাপ বসে থাকতেও খারাপ লাগবে না। কিন্তু মার্চ মাসেই তাতে স্নানের জল অকুলান। বৃক্ষ নিধন যজ্ঞের ফল বোঝা গেল। আর বাংলোটা অম্বিকাপুর-ডাল্টনগঞ্জ হাইওয়ের ওপরে হওয়ায় এত সুন্দর নির্জনতার বাতাবরণও গাড়ির আওয়াজে বারে বারেই খানখান হয়ে ভেঙে যাচ্ছিল।

পরদিন আমাদের গন্তব্যস্থল তামোর-পিঙ্গলা অভয়ারণ্য। সেমারসট থেকে সকাল সকাল রওনা হয়ে দুপুরের একটু আগে পরতাবপুর পৌঁছে গেলাম। নির্দেশমতো সোজা বনবিভাগের সুন্দর বাংলোয় গিয়ে উঠলাম। ফরেস্ট অফিসার ভি কে মুখার্জি আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। বেশ বিধ্বস্ত চেহারা। জিজ্ঞেস করতে বললেন, আর বলবেন না, ভোর রাতে খবর পেলাম জঙ্গলে আগুন লেগেছে। লোকজন গাড়ি নিয়ে দৌড়লাম। ঘণ্টাচারেক যুদ্ধের পর আগুন বাগে এল। এই দেখুন না ভুরুর লোম সব পুড়ে গেছে। মনে মনে ভাবলাম এযুগেও এত দায়িত্বশীল অফিসার আছে তাহলে! মুখার্জি বলেই চলেছেন, আপনারা আসবেন বলে সোজা এখানে চলে এলাম। পাণ্ডববর্জিত দেশে থাকি। অনেকদিন পর একটু বাংলার লোকজনের মুখ দেখব বলে বুকের ভেতর আনচান

করছিল। আপনারা স্নানটান করে নিন। খাবার তৈরি আছে।

আমি বললাম, তা এই পাণ্ডববর্জিত দেশে এলেনই বা কী করে?

— আমার দাদু অম্বিকাপুরের রাজবাড়ির কর্মচারী হয়ে অনেকদিন আগেই পশ্চিম বাংলা থেকে এসেছিলেন। সেই থেকে রয়ে গেছি। অবশ্য আমার দাদু একা নন, অম্বিকাপুরের রাজা প্রচুর বাঙালিকে তাঁর রাজ্যে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁদের সম্মানের সঙ্গে রাজ্যের নানা উন্নতিমূলক কাজে লাগিয়েছিলেন।

আমি বললাম, অম্বিকাপুরটা ভালো করে দেখাই হল না।

মুখার্জি বলল, আর একবার আসুন— সব ভালো করে দেখিয়ে দেব। রাজার প্রাসাদ আছে। অম্বিকাপুরের ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে সইনপাট বলে যে ৩০০০ ফুট উঁচু মালভূমি আছে তার ওপরটা অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রায় সমতল। ১৯৬২ সালে সেখানে তিব্বতি উদ্বাস্তুদের বসানো হয়েছে। সেটা একটা দেখার মতো জায়গা।

দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা ভালোই হল। বাংলোর চৌকিদার যা বানিয়েছিল তার সঙ্গে বাড়ির তৈরি খাবার এনে মুখার্জি আতিথেয়তায় ভরিয়ে দিলেন।

খাওয়াদাওয়ার পর সামান্য বিশ্রাম আর মুখার্জির সঙ্গে গল্পগুজব করে পরতাবপুর থেকে আমরা উত্তরমুখী গাড়ি চালালাম। সামান্য উঁচু নিচু প্রান্তর, শীর্ণ নদী, কয়েকটা ছোট ছোট গ্রাম পার হয়ে ২৪-২৫ কিলোমিটারের মাথায় একটা মোড় পড়ল। আমরা বাঁদিকে গাড়ি ঘোরালাম। যে রাস্তা ছেড়ে দিলাম সেটা সোজা চলে গেছে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলায় ডাল্টনগঞ্জ-কাটনি রেলপথের দিকে।

সেই মোড় থেকে পশ্চিমদিকে যত এগোচ্ছি ততই দেখছি সামনে রাস্তার দুপাশে দুটো পাহাড় এগিয়ে আসছে। মোড় থেকে ১৫ কিলোমিটার যাবার পর ঘুই বলে একটা জায়গা এল। বনবিভাগের চেকপোস্ট। আমাদের নামধাম ওদের একটা খাতায় লিখে আমরা এগিয়ে চললাম।

ঘুই থেকেই শুরু হল তামোর-পিঙ্গলা অভয়ারণ্য। পশ্চিমে রিহান্দ নদী পর্যন্ত। নদীর ওপার থেকে সঞ্জয় জাতীয় উদ্যান শুরু। আমাদের রাস্তার বাঁদিকে ছিল তামোর সংরক্ষিত বনভূমি। আর ডানদিকে ছিল পিঙ্গলা সংরক্ষিত বনভূমি। দুয়ে মিলে এখন হয়েছে তামোর-পিঙ্গলা অভয়ারণ্য। ঘুই হচ্ছে এই অভয়ারণ্যের পুবের দরজা।

ঘুই থেকে বেরতে বেরতে একের পর এক গ্রাম এল— রামকোলা, ভেলকোচা, ইনজানি। ঘুই থেকে ৩০ কিলোমিটারের মাথায় খোঁড়। আলাপ হল বনদপ্তরের অফিসার ডি এফ পাণ্ডের সঙ্গে। ভদ্রলোকের স্থানীয় জঙ্গল এবং তার আদিবাসীদের সম্পর্কে যেমন অগাধ জ্ঞান তেমনই দরদ এদের রক্ষা করার জন্য। চা খেতে খেতে অনেকক্ষণ ধরে মুগ্ধ হয়ে শুধু তাঁর কথাই শুনলাম।

উনি বললেন, আক্ষরিক অর্থে পাণ্ডববর্জিত দেশ বলতে যা বোঝায় এই অঞ্চলটা তাই। তার কারণ এখানে একটা উপজাতি আছে তাদের নাম পান্ডওয়ার।

এরা নিজেদের কৌরবদের বংশধর হিসাবে ভাবে। যুদ্ধেও তারা অন্যান্য উপজাতি থেকে বেশ দক্ষ। এখন এদের বেশিরভাগই কৃষিকাজের থেকে কলকারখানায় কাজ করা পছন্দ করে। জঙ্গল থেকেও সামান্য কিছু আয় করে।

জঙ্গল বলতে এখানে মূলত শাল গাছ। তার সঙ্গে আছে সাজা, বিজা, আমলকী, কুসুম, পলাশ, ভাওয়ারা আর কাউহা। এর সঙ্গে অল্প কিছু আছে টেন্ডু, খয়ের, শিশু আর বাবলা। দুই উপত্যকার মধ্যবর্তী উঁচু অঞ্চলের মাথায় সামান্যই ঝোপঝাড়, খুব বেশি হলে বাঁশ গাছে ছাওয়া। বৃক্ষহীন নিরেট পাথরের প্রান্তরও কিছু কম নেই।

কিন্তু এখানকার আসল উপজাতি হল কোরওয়াস। এদের আবার দুটো ভাগ কিষাণ কোরওয়াস আর পাহাড়ি কোরওয়াস। কিষাণ কোরওয়াসরা একটু সমতলে থাকতে ভালোবাসে। চাষবাসের কাজই পছন্দ তাদের। পাহাড়ি কোরওয়াসরা পাহাড়ি অঞ্চলে থাকে। ঝুম চাষে অভ্যস্ত এরা। পাহাড়ি কোরওয়াসরা কিষাণ কোরওয়াসদের থেকে একটু আদিম প্রকৃতির আর কড়া ধাঁচের হয়। এদের গায়ের রং গাঢ় তামাটে, বেঁটেখাটো, বিশেষ করে শরীরের তুলনায় পা দুটো ছোট, কিন্তু এরা ভীষণ কর্মপটু, বিশেষ করে শিকারে। বন্য ভাবটা এদের মধ্যে বেশি। বাঁদর যেমন জানে জঙ্গলে কোনটা খাওয়া যায় কোনটা যায় না তেমনই কোরওয়াসরা।

এই কোরওয়াসরা ১৯১১ সালে কোনও কারণে ছোটনাগপুর থেকে এসে সারগুজা হাসপুর বা বিলাসপুর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আবার রেওয়ার দিক থেকেও একই সময়ে কোরকু নামে এক উপজাতি এই অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। বিশেষজ্ঞরা অনেকে বলেন, কোরওয়াস আর কোরকু একই উপজাতি। অনেকে বলেন কোরকুরা কোরওয়াসের একটা শাখা উপজাতি।

মিঃ পাণ্ডে বললেন, আর একবার সময় নিয়ে আসুন। এই সব উপজাতির সঙ্গে মিশলে দেখবেন কী অদ্ভুত জীবন এদের। তবে বর্ষাকালটা বাদ দিয়ে। এই অঞ্চলটা সেই সময় একটা দ্বীপের মতো হয়ে যায়। অসংখ্য নদীর ওপর অনেক জায়গাতে ব্রিজ না থাকায় আপনি কার্যত গৃহবন্দী হয়ে যাবেন। কী দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তখন এখানকার জীবন বলে বোঝানো যাবে না।

রাতে খাওয়াদাওয়া বেশ ভালোই হল। অবাক হলাম যত রাত বাড়ছে ততই তাপমাত্রা কমার বহর দেখে। শেষে শোবার সময় লেপ গায় দিতে হল। মার্চের শেষে মাত্র ১৩০০ ফুট উচ্চতায় এটা অভাবনীয়।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ সেরেই আমরা রওনা দিলাম নতুন এক জায়গার উদ্দেশে। নাম তার বাঁক। জীবনের ভ্রমণকাব্য এইখানে এসে যে সত্যি সত্যিই এক মধুর অভিজ্ঞতার বাঁকে এসে উপস্থিত হবে সেটা প্রথমে বুঝতে পারিনি।

কিন্তু প্রবাদ আছে, খোদা যব দেতা ছপ্পর ফরকে দেতা হ্যায়। আজ তাই হল। পাণ্ডে বললেন, বাঁকে যাবার আগে আপনাদের একটা সুন্দর জিনিস দেখাব। খোঁড়

থেকে কালকের রাস্তাতেই আমরা ১০ কিলোমিটারের মতো ফিরে ইনজানি গ্রামে এসে ঘুইয়ের রাস্তা ছেড়ে দক্ষিণদিকে চললাম। চারদিকে পাহাড়ের পর পাহাড়— জনমানবহীন। ন কিলোমিটার যাবার পর এক গ্রাম পেলাম টামাঙ্কি। চাষবাস তেমন কিছু নয়। মানুষগুলো কোনওরকমে বেঁচে আছে। একটা জিনিস লক্ষ করেছি অঞ্চলের বহু গ্রামেই জলের উৎস হল ঠান্ডা জলের প্রস্রবণ। টামাঙ্কিতেও তেমনই একটা প্রস্রবণের ধারে গিয়ে জল খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে গরম গরম ভাবটা একটু কাটিয়ে উঠলাম। তারপর দু কিলোমিটার আরও দক্ষিণে যেতে দেখলাম আমাদের ডানদিকে এক বিশাল নদী। রিহান্দ। নদীর কাছে যেতেই অপার বিস্ময়।

স্তরীভূত বেলেপাথরের বিশাল চাতালকে নানাভাবে ভেঙে নানা ধারায় নাচতে নাচতে নেমে এসে রিহান্দ নদী ঠিক মাঝখানে একটা মাঝারি মাপের জলাশয়ের জন্ম দিয়েছে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আরও উত্তরে চলে গেছে আপন মনে। নদীর বুকে জেগে থাকা পাথরের এইরকম স্তর দু কিলোমিটারের মতো বিস্তৃত। পাহাড়, নদী, অসীম নির্জনতা, জলের অবিরাম কলকল শব্দ— সব মিলে এক অপার্থিব পরিবেশ। মনে মনে ভাবলাম, এখনই মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ছি, চাঁদনি আলোয় এই উন্মুক্ত পরিবেশে, নদীর ধারে পাথরের ওপর বসে অপরূপ ছন্দে ভেঙে ভেঙে নেমে আসা রিহান্দের এই অনুপম সৌন্দর্যকে দেখতে পেলে না জানি কী হত!

অথচ পর্যটন মানচিত্রে এই অনিন্দ্যসুন্দর জায়গাটির কোনও স্থান হয়নি। না হয়ে অবশ্য একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। সেই জন্যই তো টামাঙ্কির কাছে রিহান্দের এই অপাপবিদ্ধ রূপ দেখতে পেলাম। ওরা এখান থেকেই খোঁড় ফিরে গেলেন। বুকভরা তৃপ্তি আর চোখে সারা জীবনের মতো রিহান্দের জলছবি এঁকে নিয়ে আমরা চললাম বাঁকের দিকে।

পথ অবশ্য সহজ ছিল না। পরতাবপুরের পাকা রাস্তা থেকে, ঘুইয়ের মোরাম দেওয়া রাস্তা, তারপর এখন টামাঙ্কির আরও খারাপ রাস্তায় এসে পড়েছি। কোথাও মোটামুটি ভালো হলেও বেশিরভাগ জায়গাই এবড়োখেবড়ো। কসরত করে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। একটা জায়গায় তো মনে হল ফোর হুইলার গাড়ি হলে ভালো হত। আরেক জায়গায় রাস্তার ঢাল এমন যে মনে হচ্ছিল গাড়িটা ডিগবাজি খেয়ে উল্টে যাবে নয়তো ব্রেক ফেল করবে। রাস্তাটুকু পার না হওয়া পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় বসেছিলাম। চালক বাবলু অসম্ভব দক্ষ হাতে রাস্তাটুকু নির্বিঘ্নে পার হয়ে এল। মাসাঙ্কি গ্রাম পার হয়ে আরও পাঁচ কিলোমিটার যাবার পর আবার রিহান্দ নদী এল। এবার গাড়ি নিয়েই নদী পার হতে হবে। অথচ নদীতে কোনও ব্রিজ নেই। প্রায় ৮০০-৯০০ ফুট চওড়া নদী। নদীর বুক পুরোটাই বালিতে ভরা। নদীর জল ছড়িয়ে বয়ে যাচ্ছে বলে গভীরতাও বেশ কম। দুই পাড়ই প্রায় ২৫ ফুটের মতো উঁচু। সেই পাড় কেটে রাস্তা নদীতে নেমে গেছে। গাড়ি নেমে এল। আমরাও সবাই নেমে পড়লাম। গাড়ি যাতে বালিতে বসে না যায়, তাই বালির

ওপর মাদুর পাতার মতো অসংখ্য আখের মাপে মোটা ডাল বা ঝোপ গাছ বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও জায়গায় তাও একটু গাড়ি ঠেলতে হল। নদীর ছড়িয়ে থাকা অল্প জল এবং তার নীচে ভেজা জমাট বালিতে অবশ্য গাড়ি অনায়াসে পার হল। উল্টোদিকের পাড়ের, অল্প হলেও, খাড়া চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে বাবলুকে ফের কসরত করতে হল। রিহান্দকে এখানে পার হতে না পারলে যে রাস্তায় এসেছি সেই রাস্তায় আমাদের অনেকটা ঘুরে একদিন পর আসতে হত। মুশকিল আসান হওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

নদী পার হবার পর দশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পুবে ধুর পৌঁছলাম, সেখান থেকে আবার দশ-বারো কিলোমিটার উত্তরমুখী এক গভীর জঙ্গলের পথে গিয়ে অবশেষে বাঁকে গিয়ে পৌঁছলাম। রিহান্দ নদীর ওপরেই অতি সুন্দর বনবিভাগের বাংলো। গভীর জঙ্গলে ঢাকা প্রায় ২,০০০ ফুট উঁচু পাহাড় পিছনে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। সামনে শাল, কুরচি, ঝাউ আর মরসুমি ফুলের নানা ছোট বড় গাছের সুন্দর সাজানো বাগান। আর তার মধ্যে নদীর একেবারে ধার ঘেঁসে ছ কোনা একটা সুন্দর চারদিক খোলা বসার জায়গা। সেখান থেকে ডাইনে-বাঁয়ে রিহান্দ নদী অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। নদীটা এখানে দক্ষিণ থেকে এসে ৩২০ ডিগ্রি একটা বাঁক নিয়ে উত্তরদিকে বয়ে গেছে। আর সেই বাঁকের মুখে বাংলোটা তৈরি করা হয়েছে। বাঁক নাম তাই অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত। নদীর সমস্ত বুকজুড়ে সেই বেলেপাথর জেগে আছে। তবে টামাঙ্কির মতো অত সুন্দর নয়। দক্ষিণে একটু দূরে প্রায় দু হাজার ফুট উঁচু একটা পাহাড়— যার মাথাটা পুরোটাই টেবিলের মতো একেবারে সমান। এই পাহাড়টা টামাঙ্কি থেকেও দেখতে পেয়েছিলাম। সর্বত্র অসংখ্য পাখি উড়ছে। আশপাশে জনবসতির চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। পাথর কেটে জল বেরিয়ে আসার শব্দ সব সময় শোনা যাচ্ছে। নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হচ্ছিল। নতুন কিছু আবিষ্কারের যেমন একটা প্রবল আনন্দ আছে, বাঁককে সেইভাবে আবিষ্কার করার এক অপার্থিব আনন্দে আমি সেই ছ কোনা চারদিক খোলা ঘরটায় বুঁদ হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। না চাইতেই সেখানে সময় মতো চা-জলখাবার এসে যাচ্ছে। ভ্রমণের যাকে বলে একেবারে তুরীয় অবস্থা।

একটু পরেই নদীর ওপরে জঙ্গলের ভেতর থেকে গলানো সোনার মতো পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। আরও কিছুক্ষণ পরে চাঁদের আলোয় নদীর জলও ঝলমল করতে লাগল। মনে হল এই অনন্ত সৌন্দর্যের সামনে মূক হয়ে বসে থাকি।

বাঁক থেকে পরদিন আমরা চললাম জনকপুরের দিকে। বাঁক থেকে উত্তরমুখী রিহান্দ নদীর পশ্চিম পার থেকেই শুরু হয়েছে সঞ্জয় জাতীয় উদ্যানের। তার পুবে খোঁড়, পশ্চিমে আছে জনকপুর। মধ্যে ২৩০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে ভারতের অন্যতম বৃহৎ জাতীয় উদ্যান সঞ্জয়। বর্তমানে এর নাম হয়েছে গুরু ঘাসিদাস জাতীয় উদ্যান। আমরা তার দক্ষিণ দিয়ে ঘুরে বৈকুণ্ঠপুর হয়ে জনকপুর পৌঁছব। সময়ে পৌঁছেও গিয়েছিলাম।

কিন্তু তার আগেই এই ভ্রমণকাব্যের একটা ছোট্ট পঙ্‌ক্তি একটু অন্যভাবে লেখা হয়ে গিয়েছিল। ফলে ভ্রমণের ছন্দটা জনকপুরে শেষ করা গেল না। যেটা টেনে নিয়ে যেতে হল পার্সিলি পর্যন্ত।

ঘটনার সূত্রপাত চুটকিতে। চুটকি জনকপুরের ২০-২৫ কিলোমিটার আগে পাহাড়ি জঙ্গলে ঘেরা কয়েক ঘরের এক ছোট্ট গ্রাম। যেখানে আমাদের রাস্তার ধারেই ছিল ততোধিক ছোট এক চায়ের দোকান। গলা ভেজাবার জন্য আমাদের গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়েছে। চা-এর কথা বলে আমরা পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর জায়গাটা ভালো করে দেখব বলে দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। ঠিক সেই সময় উল্টোদিক থেকে একটা বাইক এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। সেখান থেকে নামলেন জনৈক গোপাল সিং। আমাদের তাঁকে চেনার কথা নয়। কিন্তু তিনি আমাদের কথা শুনে চিনলেন বাঙালিবাবু বলে। এইরকম এক নামগোত্রহীন জায়গায় আমাদের এতজনকে একসঙ্গে দেখে তিনি একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলেন। স্বভাবতই জিজ্ঞেস করলেন। এবং সেটা পরিষ্কার বাংলায়। তা শুনে আমরাও অবাক। পরে জেনেছিলাম, উনি বাঙালি না হলেও কলকাতায় কয়েক বছর কাজের সুবাদে ভালো বাংলা শিখে গেছেন। অনেক বছর এ অঞ্চলে আছেন। ঠিকেদারি করেন। আমাদের ভ্রমণের পরিকল্পনা শুনে তিনি বললেন, জনকপুরে আপনারা থাকতে পারেন, তবে সব থেকে ভালো হয় যদি ঘন জঙ্গলের মধ্যে পার্সিলি বাংলোয় আপনারা থাকেন। সেই যে আমাদের মাথায় পার্সিলির ভূত চাপল তাকে আর নামানো গেল না। ফলে আমাদেরও জনকপুরে গাড়ি থেকে নামানো গেল না। যদিও সেখানে থাকার জন্য বাংলো পেয়েছিলাম। আমরা চললাম পার্সিলির সন্ধানে।

বনের মধ্যে বাংলো শুনে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে পার্সিলিতে বনবিভাগের বাংলো হবে। তাই একে তাকে জিজ্ঞেস করতে করতে অন্ধকারে আমরা যখন মাঝোলি নামে এক জায়গায় বনবিভাগের অফিসের সামনে সন্ধে সাড়ে সাতটায় এসে হাজির হলাম তখন অফিস বন্ধ করে অফিসের লোকজন সব বাড়িমুখো রওনা দিচ্ছে। ঠিক অফিসের সামনেই তাদের সঙ্গে দেখা। আমাদের সব কথা শুনে তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, ওই বাংলো তো আমাদের নয়। ওটা পি ডব্লু ডি-র। আর ওটায় থাকার অনুমতি দেন এখানকার এস ডি ও। কিন্তু সব অফিসই তো এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে।

আমি বুঝলাম আজ আর কোনও আশা নেই। রাতটা আজ হোটেলেই থাকতে হবে। তাই হোটেলের কথা জিজ্ঞেস করলাম। ওরা বললেন, না, এই ছোট্ট শহরে কোনও হোটেল নেই। শুনে আমাদের মাথায় হাত। মনে মনে ভাবলাম, জনকপুরের হাতের লক্ষ্মী বাংলোটাকে পায়ে ঠেলার এই শাস্তি। বাঁক থেকে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার গাড়িতে এসে সবাই অল্পবিস্তর বিধ্বস্ত। বাবলুর অবস্থা আরও খারাপ। এবার যদি রাত কাটাবার একটা জায়গা না পাওয়া যায়—ও নির্ঘাৎ

বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে বনবিভাগের অফিসারদের আড়াল থেকে একটি লোক এগিয়ে এল। ছোট্টখাট্টো বলিষ্ঠ চেহারা। মুখে এক গাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথায় অবিন্যস্ত চুল। একটা আধ ময়লা ফতুয়া আর খাটো ধুতি পরা। পায়ে একটা সস্তার চটি। কিন্তু মুখটা আশ্চর্যরকমের কমনীয় এবং শান্ত। চোখদুটো ততোধিক সরল। সে এগিয়ে এসে সুন্দর হিন্দিতে বলল, আমার নাম বিহারীলাল তেওয়ারি। আমি পাশের গ্রামেই থাকি। আমাকে যদি আপনারা সঙ্গে নেন তাহলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। কেননা এখন যেখানে যেখানে যেতে হবে এই রাতে সে সব জায়গা খুঁজে পেতে আপনাদের অসুবিধা হবে।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে ওকে গাড়িতে তুলে নিলাম। ওর নির্দেশমতো গাড়ি এপথ সেপথ ঘুরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে, এস ডি ও-র বাড়ির সামনে হাজির। বিহারীলালের ডাকে এস ডি ও সাহেব বেরিয়ে এলেন। বিহারীলাল তাঁকে সব বলল। তিনি বললেন, আমি থাকার অনুমতি দিতে পারি কিন্তু তার আগে পি ডব্লু ডি-র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের একটা অনুমতি লাগবে। ওরা হ্যাঁ করলে তবেই আমি হ্যাঁ করতে পারব। গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে নানাপথ ঘুরে হাজির হল সেই ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি। কপাল ভালো, তিনিও বাড়ি ছিলেন। পাশেই অফিস। বিহারীলালের তদ্বিরে তিনি না না করতে করতে শেষে হ্যাঁ করতে বাধ্য হলেন। অফিস খুলে অনুমতিপত্র নিয়ে আবার ছুটলাম এস ডি ও-র বাড়ি। রাত নটায় তার সই নিয়ে রওনা দেব পার্সিলির দিকে। বিহারীলাল হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে বলল, আরে আপনাদের তো খাওয়াই হয়নি। এখানে খাওয়ার হোটেলও তো সব বন্ধ হয়ে গেছে। ওখানেও কিছু পাওয়া যাবে না। গাড়ি ঘুরিয়ে এক বন্ধ দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সেই দোকান খুলিয়ে বিহারীলাল চাল ডাল আলু পেঁয়াজ ডিম মশলা সব কিনে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। কুড়ি-বাইশ কিলোমিটার পশ্চিমদিকে চলার পর রাত সাড়ে দশটায় গাড়ি দাঁড়াল জঙ্গলের ভেতর এক বিশাল কেতাদুরস্ত কংক্রিটের তৈরি বাংলোর সামনে। অনেকটা স্বপ্ন দেখার মতো অবস্থা। বিহারীলাল তৎপর হয়ে উঠল। চৌকিদারকে ডেকে আনল। আমাদের দেখে চৌকিদারের অবস্থাও তথৈবচ। কাগজপত্র দেখে বলল, আপনাদের একটা ঘর দেওয়া হয়েছে। আমরা আর একটা ঘরের কথা বলাতে সে বিরক্ত হল। পিছন থেকে বিহারীলাল ইশারায় এ নিয়ে কথা বাড়াতে না করল। আমরা সুবোধ বালকের মতো বাংলোর ভেতর ঢুকলাম। ভেতর দেখে চোখ ছানাবড়া হবার যোগাড়। বিশাল বসার আর খাবার ঘরের কাণ্ড কারখানা দেখে মনে হল এখানে অনায়াসে হিন্দি ছবির ফুর্তির দৃশ্যের শ্যুটিং হতে পারে। জঙ্গলের পরিবেশের সঙ্গে এ যে কী বেমানান কী বলব। যাই হোক আমাদের থাকার ঘর ওপরে। আপাতত একটা ঘরেই সবাই থিতু হলাম। ঠান্ডা বাড়ছে। দুটো বিছানায় কম্বল মাত্র দুটো। কম্বলের কথা বলতে যাব বিহারীলাল আবার ইশারা করল।

জবরদস্ত কমান্ডারের মতো বিহারীলাল বলল, আগের কাজ আগে। চাল ডাল তেল সব বার করে দিন। আমি আগে রান্নাটা চাপিয়ে দিই। আপনারা ততক্ষণ ধোপদুরস্ত হয়ে নিন। অনেক ধকল গেছে আজ। আমি এক্ষুনি চা নিয়ে আসছি। আমরা সকলে ধোপদুরস্ত হবার আগেই চা এসে গেল। সেই সঙ্গে খুশ খবর— আরেকটা ঘর ও চৌকিদারকে বলে ম্যানেজ করেছে, সুতরাং কম্বলের সমস্যাও রইল না।

এক ঘণ্টার মধ্যে বিহারীলাল চৌকিদার সহযোগে এক অনবদ্য খিচুড়ি তার সঙ্গে ওমলেট আলু ভাজা তৈরি করে আমাদের খাবার ঘরে ডাক দিল। আমাদের ভরপেট খাইয়ে তবে সে খেতে বসল। সব শেষে আমরা ঠিকমতো শুয়েছি কিনা দেখে সে নীচের কোনও ঘরে শুতে গেল।

আমি ভাবছিলাম আজ সন্ধে থেকে এখন পর্যন্ত বিহারীলালের কর্মকাণ্ডের কথা। কী অদ্ভুত যোগাযোগ আর কী অদ্ভুত ওর দরদ আমাদের মতো অজানা অচেনা কতকগুলো লোকের জন্য। ও না থাকলে কী দুর্ভোগের মধ্যে পড়তাম— তাই ভাবি। ফলে আমার ডায়রিতে আমি আজ লিখতে বাধ্য হলাম— বিহারীলালকে ঠাকুরই (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) পাঠিয়েছেন। আমি নিঃসন্দেহ।

পরদিন খুব ভোরে পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। বাংলোর দোতলা ঘর লাগোয়া বিশাল বারান্দা। ঘুম চোখে বাইরে বেরিয়ে এসে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সামনেই বানাস নদী। নদীর বুকে জেগে থাকা ছোট বড় অসংখ্য পাথরের ওপর দিয়ে সে কলকল করে বয়ে চলেছে। দুপাশে ঘন জঙ্গল। বারান্দা থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নদীর পাড়ে। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। অসীম নির্জনতা মনকে আবার অবশ করে দিচ্ছে। গতকাল রাতের বিপন্ন ব্যস্ততা আর আজকের সকালের এমন সুন্দর পরিবেশে নিশ্চিন্ত অলস পদক্ষেপের তুলনা করতে গিয়ে বারবার বিহারীলালের মুখটা ভেসে উঠছে। বেশিক্ষণ ভাবাও গেল না। বিহারীলাল দোতলার বারান্দা থেকে ডাকছে, সকালের চা তৈরি। ঘরে ফিরে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার আগেই বিহারীলাল তার আর্জি পেশ করল। আমরা যখন চা খাব ও তখন কয়েকটা ভজন গান শোনাতে চায়। না করার কোনও কারণ ছিল না। বিহারীলাল তার দরাজ গলায় বেশ কিছু জানা এবং অজানা ভজন শুনিয়ে গেল। গান শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার খেয়াল হল বিহারীলাল কাল সন্ধে থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছে। অথচ কাল রাতে ও যে বাড়ি গেল না— কোনও খবর দিল না— তা নিয়ে তো আমরা ওকে কিছু জিজ্ঞাসাও করিনি। স্বার্থপরের মতো শুধু ওর সেবাটুকু নিয়ে চলেছি। সে কথা জিজ্ঞেস করতেই বিহারীলাল এক গাল হেসে বলল, না বাবু, বাড়িতে খবর দেওয়া হয়নি। অবশ্য কেউ কিছু মনেও করবে না। আমার প্রায়ই এমন হয়। আমার তো এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে রামায়ণ গান, ভজন— এই সব শোনাবার জন্য ঘুরে বেড়াতে হয়। বাড়ির লোক জানে। ভাববে কোথাও তেমন চলে গেছি।

— কে কে আছেন তোমার বাড়িতে?

— মা আছেন, বউ, দুই ছোট ভাই, আর দুই ছেলে মেয়ে।

— তোমার এত বড় সংসার তা হলে চলে কী করে?

— দুই ভাই সামান্য যা জমি আছে আর কয়েকটা গরু আছে, তাদের দেখাশোনা করে। আর আমি সকালবেলা স্নান করে প্রথমে গুরুদেবের ছবি, তারপর মা তারপর গরুকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি। কীভাবে সারাটা দিন কাটবে আমি নিজেও জানি না।

আমি বললাম, তোমার তো তাহলে বেশ কষ্ট। বিহারীলাল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলে উঠল, একদম নয়। আমার শুধু একটাই দুঃখ। এখনও আমার গুরুদেবের পবিত্র জন্মস্থল আর লীলাস্থল চোখে দেখা হল না। আমি খুব হালকা ছলেই বললাম, কে তোমার গুরুদেব?

বিহারীলাল ভক্তির সঙ্গে মাথায় হাত তুলে নমস্কার করে বলল, কেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

আমার সামনে আচমকা একটা বোমা ফাটলেও আমি বোধহয় এতটা চমকাতাম না। পরক্ষণেই প্রশ্ন করলাম, এত দূরে থেকে তুমি তাঁর নাম জানলে কী করে? বিহারীলাল আগের মতোই তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিনয়ের সঙ্গে বলল, তাঁর কৃপাতেই আমি তাঁর নাম জেনেছি।

আমার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরলো না। শুধু কালকের ডায়রিতে লেখা লাইনগুলোর কথা মনে পড়ল। বিহারীলালকে বললাম, আমাদের সঙ্গে চল তবে। তোমার গুরুদেবের জন্মস্থল আর লীলাস্থল সব দেখিয়ে দেব। বিহারীলাল বলল, না, এখন আমার যাওয়া হবে না। এখনও সময় হয়নি। আমি পরে যাব।

পার্সিলি থেকে জলখাবার খেয়ে সকালে যখন বেরলাম, বিহারীলালের মুখ তখন ভার। আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভেবেই বোধহয় সে গম্ভীর হয়ে গেছে।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

সাহারায় বিয়েবাড়ি

দেবযানী মুখোপাধ্যায়

ছমাস হল আলজেয়ার্স এসেছি। ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা থেকে আলজেরিয়ার আলজেয়ার্স শহরে। পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম। এত সুন্দর দেশ— ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়া, আরবদেশে ফরাসি প্রভাব— সবই নতুন। তবু মন বসছিল না শুরুতে। সেদিন আমাদের স্থানীয় বন্ধু আবদুল কুরেশী বলল, 'যাবে নাকি আমাদের শহরে— জোড়া ভাইপোর বিয়ে দেখতে?' আলজেয়ার্স শহর থেকে ছশো কিলোমিটার দক্ষিণে বেরিয়ান নামে ছোট্ট মরূদ্যানে আবদুলের দেশ। আলজেরিয়া দেশে ৫১টি জেলা আছে যাকে উইলায়া বলে। গারদাইয়া উইলায়াতে সাতটি ছোট ছোট শহর— তারমধ্যে বেরিয়ান একটি। এই অঞ্চলকে এম-জ্যাব বলে। বাসিন্দারা মোজাবিত নামে পরিচিত। এরা অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং ধর্মভীরু উপজাতি। বিদেশিদের তো দূরের কথা— মোজাবিত ছাড়া অন্য অঞ্চলের কাউকে ঘরে ঢোকায় না। মহিলারা এতই পর্দানশীন যে একচোখ ছাড়া পা থেকে মাথা পর্যন্ত এদের ঢাকা থাকে সাদা কাপড়ে। শুধুমাত্র বাঁ-চোখ দিয়ে যতটুকু দেখা যায়— তাদের দেখার অধিকার ততটুকুই।

এহেন মোজাবিত বিয়েতে যাবার নিমন্ত্রণ! ঠিক হল— যাবই যদি তো সাহারা মরুভূমির আরও একটু অন্যরূপ দেখে আসব। তিমিমুন বলে একটি ছোট মরূদ্যানে আমার স্বামীর কিছু কাজ ছিল। সেটি জিনাত অঞ্চল। আগে জিনাত অঞ্চল, সেখান থেকে মজাব অঞ্চলে মোজাবিতের বিয়ে দেখা। উৎসাহ আর উত্তেজনায় রাতের ঘুম উড়ে যাবার যোগাড়।

আমরা অক্টোবরের ভোরের বিমানে আলজেয়ার্স থেকে গারদাইয়া গেলাম। জুরজুরা পর্বতমালার ওপর দিয়ে ভোরের আলোয় পাথুরে পাহাড় দেখতে দেখতে। মরুভূমির আঁচ পাচ্ছিলাম গারদাইয়া পৌঁছবার আগে থেকেই। গারদাইয়া হচ্ছে সাহারা মরুভূমির গেটওয়ে। এখান থেকে ছোট্ট বিমানে তিমিমুন পৌঁছলাম একঘণ্টা পরে মরুভূমির ওপর বেশ নিচু দিয়ে বিমান যাচ্ছিল— ফলে মরুভূমিতে বিমানের ছায়া পড়ছিল। ধু ধু বালি, কোথাও জনবসতি নেই। অনেক দূরে ছোট ছোট মরূদ্যান— তাতে খেজুর গাছ— অল্প লোকালয়। তিমিমুনে পৌঁছে রানওয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না— বালিতে ঢেকে গেছে। কয়েক চক্কর খাবার পর আমাদের

বিমান খুঁজে পেল রাস্তা। চারদিকে লাল বালি। একটা ছোট্ট ঘর নিয়ে এয়ারপোর্ট। সারা সপ্তাহে ২-৩ টের বেশি প্লেন আসে না। অলস মন্থর পরিবেশ। গরম হাওয়া আসছিল বালি থেকে। অক্টোবরের শুরু, রাজধানী শহর আলজেয়ার্সে অল্প ঠান্ডা পড়ে গেছে। কিন্তু এখানে এখনও বেশ গরম। আমাদের নিতে ডক্টর মিত্র সপরিবারে এবং স্থানীয় বন্ধু মাহ্‌মুদ বেনবেলি দুটো গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। ডক্টর মিত্র তিমিমুনে হাসপাতালের সার্জন আর তাঁর গিন্নি অ্যানেসথেসিস্ট। আমরা গেস্টহাউসে উঠলাম। চমৎকার আধুনিক সুসজ্জিত তাপনিয়ন্ত্রিত বাড়ি। বালির উৎপাতে দরজা-জানলায় স্টপার লাগানো। বাড়ির মধ্যে ঢুকলে বোঝাই যায় না আমরা মরুভূমিতে রয়েছি। এমনকী ফুলদানিতে তাজা ফুলও রয়েছে।

বিশ্রামের পর বেনবেলির সঙ্গে শহর দেখতে বেরলাম। সবই দেখি লাল রং। বাড়ির দেওয়াল, পাঁচিল, রাস্তার দুপাশ— লাল রং করা। এখানকার বালি লাল রঙের। তাই সমতা রেখে রং মিলিয়ে সব লাল রং করা হয়েছে সরকারি তরফে। তিমিমুনে এই রংটাই প্রথম দৃষ্টি কেড়ে নেয়। দোতলা বাড়ির সংখ্যা ৪-৫টার বেশি নয়। শহরের পুরনো অঞ্চলকে বলে কাসবা। সেখানকার বাড়িগুলো দুর্গের মতো। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। রাস্তার দু-পাশে লম্বা পাঁচিল, তারমধ্যে একটা করে ছোট্ট দরজা, মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। সেটাই সদর দরজা। বাড়ির ভেতরটাও চাপা। কোনও জানলা নেই। একদিকে বারমহল, অন্যদিকে অন্দরমহল। বারমহলে বসার ঘর। অন্দরমহলে প্রথমে অঙ্গন তারপর বসার ঘর। তারপর অন্যান্য ঘর, পিছনে বাগান। বাগানে আঙুর, লেবু, বেদানা, ডুমুর আর খেজুর গাছ। মোটামুটি সব বাড়ি এই ধাঁচে তৈরি। অনেকের বাড়িতে নানারকম বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম আছে। আলজেরিয়ায় সর্বত্র বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে— সুদূর সাহারার যে-কোনও মরূদ্যানেও। পেট্রোলিয়ম এদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ।

আমরা যেতে যেতে দেখি এক জায়গায় গান হচ্ছে জমজমাটভাবে। গানটিকে বলে মাকাবু। সাত মাসের প্রেগন্যান্ট মহিলার উদ্দেশে এই মাকাবু গানের আয়োজন। শুধু পুরুষেরা বসে গাইছে হাতে কিছু না কিছু বাজনা নিয়ে, গানের কথায় আছে— শরীর সম্বন্ধে মেয়েকে সাবধানবাণী, সন্তানসম্পর্কে সতর্কতা। মাকাবু গান শুনে আমরা গেলাম পামেরি দেখতে। ফলের বাগান। নানা জাতের খেজুর, লেবু, বেদানা, আঙুর ইত্যাদি। পামেরি বেশ বড় আর সাজানো। যে সেচ পদ্ধতিতে এইসব গাছের পরিচর্যা হয় তাকে বলে ফুগারা। প্রায় চারশো বছরের প্রাচীন এই পদ্ধতি ইরাকে প্রচলিত। মরূদ্যানে মাটির গভীরে যে জলের ধারা তাকে স্থানীয় লোকেরা খাল কেটে গ্রামের বিভিন্ন দিকে নিয়ে যায় এবং সেই খাল থেকে আরও ছোট নালা কেটে প্রত্যেকের বাড়িতে লোকসংখ্যা অনুযায়ী জলভাগ করা হয়। এত সূক্ষ্ম তার হিসেব যে জল সবাই ঠিকমতো পায়।

বেনবেলি ভদ্রলোক বেশ রসিক। বয়স পঞ্চাশের মতো, আরবি আর ফরাসি ভাষা জানেন শুধু। পোশাক পরেন সাদা আলখাল্লা আর মাথায় আরবদেশের

পাগড়ি। বললাম, মরুভূমি বলতে উটের কথা মনে আসে। একটাও উট দেখছি না কেন? বেনবেলি তখন শহরের একপ্রান্তে নিয়ে গেল, সেখানে দেখি প্রায় ৫০-৬০টি উট রয়েছে। একসঙ্গে এত উট? পরে বুঝলাম ওগুলো বিক্রির জন্য। গরমের সময় তারা সাহারার গরম সহ্য করতে পারে না— অন্যত্র পালায়। তাপমাত্রা কোথাও কোথাও ৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছুঁয়ে যায়। এই অক্টোবর থেকে ঘরে ফিরতে শুরু করে। পশুপাখি সবই এখন ফেরার পথে।

রাস্তায় অনেক স্তম্ভ দেখলাম— একই ডিজাইনের। সেন্ট-এর স্মৃতিতে তৈরি। তাকে বলে মারাবলু। রাস্তার ধারে এই মারাবলুগুলো গম্বুজের মতো— গায়ে আরবিক ভাষায় সন্তের বিবরণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের প্রান্তে এসে গেলাম। কয়েকটা ভাঙা দুর্গ রয়েছে। এগুলো সপ্তম দশকে ইহুদিদের তৈরি। আমাদের ল্যান্ড রোভার মরুভূমির মধ্যে দিব্যি চলল বালি ভেঙে। দূর থেকে স্যান্ড ডিউনস দেখলাম। মিনিট পনেরো যাবার পর কোনদিকে লোকালয় কিছু বোঝা যায় না। স্থানীয় লোক ছাড়া এখানে আসা বিপজ্জনক। চারদিকে ধু ধু বালি। রাস্তা হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। ডিউনসের যত কাছে যাচ্ছি তত সে জীবন্ত মনে হচ্ছে। কি যে অপূর্ব রূপ এই ডিউনসের। এমনিতে বালির পাহাড় ছাড়া কিছুই নয়। হাওয়ায় উড়ে পাহাড়ের রূপ বদলে যায়। এই ডিউনস দেখে আমি স্তম্ভিত মুগ্ধ হয়ে গেছি। মনে হচ্ছিল এখনি জেগে উঠবে সমুদ্রর ঢেউ-এর মতো। আর সেই তরঙ্গ উঠেই থাকে— আছড়ে পড়ে না। ডিউনসে উঠে বহুদূর পর্যন্ত দেখি, যতদূর দেখা যায় কোথাও লোকালয় নেই, গাছপালা নেই, শুধু ডিউনসগুলো মাথা তুলে একঘেয়েমি কাটিয়েছে। এক জায়গায় দেখি অনেকটা খাদের মতো। কোনওকালে লেক ছিল।

সঙ্গে আমরা কোদাল নিয়ে গিয়েছিলাম। মরুভূমির কোনও কোনও জায়গায় বালির নীচে একধরনের পাথর পাওয়া যায় তাকে বলে— পাথরের গোলাপ। বিশ্বাস হয় না মাটির নীচে এরকম সুন্দর একগুচ্ছ পাথরের গোলাপ জন্মাচ্ছে। খোদাই করা প্রস্ফুটিত গোলাপ— লাল বালির। এ এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। বড় বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছিল। সুদূর এই বিদেশে বিশাল বালির সমুদ্রের মধ্যে দিনের শেষবেলায় আমরা কয়েকটি প্রাণী কোদাল দিয়ে বালির গোলাপ খুঁজে বের করছি। দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে এল। সূর্যাস্ত হল। মরুভূমির সূর্যাস্ত এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। চতুর্দিক লালে ভাসিয়ে দিয়ে সূর্যদেব বালির নীচে যেন পাতালে প্রবেশ করলেন। এরপর আর থাকা যায় না— সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার। আমরা রওনা দিলাম।

এখন আমরা যাচ্ছি চায়ের নেমতন্নে মাহমুদ বেনবেলির বাড়িতে। মিত্র পরিবার এবং আমরা। অন্দরমহলের ড্রয়িং রুম-এ আমরা বসলাম। ঘরে ছোট্ট ঘুলঘুলির মতো একটা মাত্র জানলা, তাও বন্ধ আর পর্দাঢাকা। দরজা ছোট, মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। বসার ঘরটি মোটামুটি সাজানো— ঘরজোড়া সুন্দর কার্পেট, সোফাসেট, মিউজিক সিস্টেম, কিছু আর্ট অবজেক্ট, ল্যাম্পশেড, দেওয়ালে কয়েকটি চিত্র ইত্যাদি। বোরখা পরিহিতা বেনবেলির স্ত্রী আমাদের সামনে চায়ের

সব সরঞ্জাম নিয়ে এলেন— ছোট গ্যাস স্টোভ পর্যন্ত। নিচু গোল টেবিলে চায়ের ছোট ছোট গ্লাস আর টি পট সাজানো হল। ওষুধের গ্লাসের চেয়ে একটু বড়। গল্প করতে করতে চা তৈরি হচ্ছে। এই আরব মহিলা দেখতে সুন্দর। শুধু আরবি ভাষা জানে। বেনবেলি ফরাসিতে তার অনুবাদ করছিল। এদিকে কেটলির জল ফুটলে চা-পাতা দেওয়া হল। আর অনেকটা পুদিনা পাতা। প্রথম চায়ের জল ফেলে দেওয়া হল, খুব নাকি কষা। আবার গরম জল আর অনেকটা চিনি দেওয়া হল। এক গ্লাস থেকে অন্য গ্লাসে উঁচু থেকে ঢালাঢালি করে একে একে পরিবেশন করলেন বেনবেলিগিন্নী মেহেন্দি লাগানো হাতে। ততক্ষণে চা ঠান্ডা। একে বলে মিন্ট টি। ওই পাতাতেই টি পট-এ আবার গরম জল দিয়ে দ্বিতীয় প্রস্থ চা তৈরি হল। তারসঙ্গে ঘরের তৈরি কেক আর খেজুর। বেশ ভালো লাগল এরকম নতুন পরিবেশ। রাতে ছিল মিত্র-বাড়িতে ভারতীয়দের নৈশভোজ। তিমিমুনে ৪-৫ ঘর স্পেশ্যালিস্ট ডাক্তার ছাড়া আর কোনও ভারতীয় নেই। মরূদ্যানে মাছ পাওয়া যায় না সহজে— আলজেয়ার্স থেকে আনানো হয় নয়তো টিনড ফিশ ভরসা। মিত্র পরিবারের আতিথেয়তায় খুব আনন্দে কাটল আমাদের। তিমিমুন দেখা শেষ হল।

ভোর ছটায় ঘুটঘুটে অন্ধকারে তিমিমুন ছাড়লাম— বেনবেলির সঙ্গে ওর পিগেস্ট ৫০৪ গাড়িতে। আমরা একসঙ্গে এল গোলিয়া পর্যন্ত যাব। সেখান থেকে আমরা যাব গারদাইয়া আর বেনবেলি যাবে ওয়ার্গলা। এল গোলিয়া তিমিমুন থেকে চারশো কিলোমিটার দূরে আরেক মরূদ্যান। মরুভূমিতে জল আর খাবার সঙ্গে দেওয়া প্রথা। আমরা সেসব পাথেয় সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলাম। তিমিমুন ছাড়িয়ে এল গোলিয়ার রাস্তা পাওয়া গেল। চওড়া পরিষ্কার পিচের রাস্তা। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে লোকালয় অপসৃত হল। আমরা দুপাশে বালির সমুদ্র স্যান্ড ডিউনস আর ভয়ঙ্কর পাথুরে পাহাড় দেখতে দেখতে এগোলাম। বালির লাল রং এবার ফিকে হয়ে এল। পথে একটি গাড়ি নেই, জনপ্রাণী নেই, গাছপালা নেই, লোকালয় নেই। কোনও আওয়াজ নেই, নিস্তব্ধ চারধার। গাড়িতে বাজছিল 'আহলিল' সঙ্গীত। এ সঙ্গীতের উদাস সুর মরুভূমির স্তব্ধতায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছিল। এমন একেকটা মুহূর্ত রচনা হচ্ছিল যখন মনে হচ্ছিল— এখানেই পৃথিবী শেষ হয়েছে অথবা এটাই বোধহয় শুরু। সওয়া ঘণ্টা হল মাত্র তিমিমুন ছেড়েছি, মনে হচ্ছিল কতকাল পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। আরও কিছুক্ষণ চলার পরে সম্বিত ফিরে পেলাম— একটা গাড়ি আসছে দূর থেকে। উভয়পক্ষের গাড়ির গতি কমে গেল। হাত তুলে এবং জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অভিবাদন জানাল পরস্পর চালকেরা। এটা অলিখিত রীতি সাহারার। অপরিচিত দুই চালকই পরস্পরকে জিজ্ঞেস করল, সব ঠিক আছে কিনা। তাছাড়া আর উপায়ই বা কী! পথে কোনও পেট্রোল স্টেশন নেই, গাড়ি খারাপ হলে কিছু করার নেই, কোনও লোকালয় নেই, কেউ অসুস্থ হলে বা কিছু অসুবিধা হলে কিছু করার নেই।

কিছুটা যাবার পরে প্ল্যাটু ডে ট্যাডমৈতা নামে এক পর্বতশ্রেণী দেখা গেল। সূর্য

এতক্ষণে আকাশ আলো করেছে। বেনবেলি ওয়ার্গলাতে তেল কোম্পানিতে কাজ করে। দুমাসে একবার বাড়িতে যায় তিমিমুনে। এই পথেই তার যাতায়াত। অন্যবার একাই যেতে হয়, এবার আমরা সঙ্গ দিলাম।

এবার কিছু লরি দেখলাম পাথর তুলছে। এবার এক মরূদ্যান এল— এম গুয়েদেন। সেখানে গ্যাস স্টেশন, স্কুল, মসজিদ, কিছু গাছপালা, একটা ছোট ক্যাফেটোরিয়া আছে। গাড়ি থেকে নামা হল। ছবি তুললাম, কফি খেলাম। গাড়িতে তখনও আহলিল সঙ্গীত বাজছে।

আবার আমাদের যাত্রা শুরু হল। ক্রমশ পটচিত্র বদলাচ্ছে। কয়েকটা পাখি দেখা গেল। করবিন— বিরাট দাঁড়কাক, কালো কুচকুচে। কয়েকটি ছাগল। একপাল ভেড়া। কিছু গুল্ম কাঁটা ঝোপ। কিছুক্ষণ পরে এই দৃশ্য বদলে আবার বর্ণহীন, শব্দহীন, বৈচিত্র্যহীন জগৎ। আর কিছুদিন পর বেদুইন, পাখি পশু সব ফিরতে শুরু করবে গরমের শেষে। বাইরে চেয়ে চেয়ে সেসবই কল্পনা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ চলার পর এল গোলিয়ার নাম পাওয়া গেল। লোকালয় আসছে। খেজুর গাছের পামেরি শুরু হল। বেনবেলির এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল— তাকেও গাড়িতে নেওয়া হল। এই মরূদ্যানে সব কিছু লাল নয়। সাদার আধিপত্য থাকলেও অন্য রং-ও আছে, যেমন হালকা নীল, ধূসর বা হালকা গোলাপি। বেনবেলির বন্ধু ওসমানের বাড়িও পাঁচিল ঘেরা, জানলা নেই। বসার ঘরে প্রত্যেক বাড়িতেই জমকালো নানা রঙের কার্পেট। ভারি সুন্দর। বাড়ির মেয়ে বউরা ঘরে ঘরে কার্পেট বোনে। সব বাড়িতেই কার্পেট বোনার ব্যবস্থা আছে। ভেড়ার লোম নয়তো উটের। বসার ঘরে জুতো খুলে কার্পেটে বসার রেওয়াজ। চারদিকে তাকিয়া ছড়ানো। আরবরীতিতে খাবার এল। নিচু টেবিলের চারদিক ঘিরে কার্পেটে বসা হল। সেই ছোট গোলটেবিলে একটা বড় বাসনে খুসখুস, মাংস, সবজি আর সকলের জন্য চামচ দেওয়া হল। একই বাসন থেকে তুলে তুলে সকলে মিলে খাওয়া— এই হচ্ছে আরবরীতি। মেয়েদের সঙ্গে অন্দরমহলে দেখা করে এলাম। আমি আরবি ভাষা জানি না বলে কথা হল না বিশেষ।

এল গোলিয়ায় ডক্টর গুপ্তা আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন গেস্টহাউসে। গুপ্ত দম্পতি হাসপাতালের ডাক্তার। প্রথমে আমরা হাসপাতাল দেখতে গেলাম। চমৎকার বড় বিল্ডিং— সাজানো বাগান, নানা রঙের ফুল। কে বলবে সাহারা রুক্ষ মরুভূমি। হাসপাতাল আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সাজানো। প্রায় সওয়া শো বেড আছে— খুব আধুনিক ব্যবস্থা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো বটেই। এককেটা কেবিন দামি নার্সিং হোমের রুমের মতো। অথচ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। সাহারায় বসবাসের জন্য আলজেরিয়া সরকার উৎসাহিত করছে জমি দিয়ে, বাড়ি তৈরির লোন দিয়ে, চমৎকার রাস্তা, বিদ্যুৎ, সেচ, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি সব সুবিধা দিয়ে। বিমানবন্দরের ব্যবস্থা প্রায় সব বড় মরূদ্যানে আছে। হাসপাতালে ভারতীয় আর চিনা ডাক্তার নানান সুবিধা নিয়ে কাজ করছেন। মরুভূমি যেমন বর্ণহীন,

মরূদ্যানগুলো ততটাই সুন্দর। বাগানে খেজুর, বেদানা, আঙুর, কমলা, ন্যাসপাতি গাছ ফলের ভারে নুয়ে আছে। আর কতরকমের ফুল। চোখ জুড়িয়ে যায়। এল গোলিয়ার গর্ব, সেখানকার একটি লেক। এই সরোবর দারুণ জনপ্রিয় বিনোদনের স্থান হিসেবে। তিমিমুনের তুলনায় এল গোলিয়ার জল অনেক সুস্বাদু। এই জল শুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন প্রান্তে সরবরাহ হয়। আলজেয়ার্সে এই জল আমরা কিনে খাই। এখানে একটি সুন্দর ফরাসি আমলের গির্জা আছে— এখন সার্ভিস হয় না। আর আছে পাহাড়ের ওপর বিন কর নামে চতুর্দশ আমলের এক দুর্গ। সেটিও দর্শনীয় স্থান।

রাতে ছিল গুপ্ত পরিবারের সঙ্গে নৈশভোজ। সেখানেও আরও ২-৪ জন ভারতীয় ডাক্তার। একজন অধ্যাপক, দুজন ইঞ্জিনিয়ার এসেছিলেন। এরা সকলে এই মরূদ্যানে কর্মরত আছেন চার-পাঁচ বছর। পরদিন ভোরে বেনবেলি গেস্টহাউসে এসে জানাল, আমাদের নিয়ে গারদাইয়া যাবে। মরূদ্যানে পৌঁছনোর পর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে গাড়ি সাফ করা আর সার্ভিসিং করানো। বেনবেলির সেসব কাজ সারা আগের দিন। আমরাও এখান থেকে বিমানযোগে যাত্রা স্থগিত রেখে মরুভূমি দেখতে দেখতে বেনবেলির গাড়িতে যাওয়া মনস্থ করলাম। তিমিমুন যেমন ভোররাতে ছেড়েছিলাম, এল গোলিয়াও ছাড়লাম ভোরে। যখন রওনা হই তখন শহর ঘুমিয়ে। গুপ্ত দম্পতি আমাদের প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও জল রাস্তার জন্য দিয়ে দিলেন। এল গোলিয়াকে বিদায় জানিয়ে আমরা রওনা হলাম। দূর থেকে আলো ঝলমলে হাসপাতাল চমৎকার দেখাচ্ছিল। ধীরে ধীরে সব অদৃশ্য হতে লাগল। কিছুক্ষণ চলার পর গারদাইয়ার রাস্তা পাওয়া গেল। সাড়ে তিনশো কিলোমিটার রাস্তা। রাস্তা বালিতে ঢেকে গেছে। আস্তে আস্তে গাড়ি চলছিল। বালি পরিষ্কারের কাজ চলছিল রাস্তায়। একটু পরে পরিষ্কার রাস্তা পাওয়া গেল। রাস্তায় এবার অনেক পাথুরে পাহাড় দেখা গেল। একেকটা জন্তুর মতো দেখতে। কখনও মনে হচ্ছে উট শুয়ে আছে। কখনওবা হাতি। অনেক স্যান্ড ডিউনস দূরে। খানিক যাবার পর এক ঝলক সবুজ দেখা গেল। পামেরি অর্থাৎ ফলের বাগান। প্রচুর খেজুর গাছ। আমরা ক্রমশ এম-জ্যাব অঞ্চলে পৌঁছচ্ছি। এই অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে গারদাইয়া। চারদিকে পাহাড়ের মাঝে এই শহর। জনবসতি যথেষ্ট। প্রচুর দোকান, বাড়ি, গাড়ি, রীতিমতো জমজমাট। এই কদিন তিমিমুন আর এল গোলিয়ার নির্জন পরিবেশে থাকার পর গারদাইয়ায় ধাঁধা লেগে গেল। হোটেল দ লে রস্তমিদে থাকার ব্যবস্থা ছিল আগে থেকেই। বেনবেলির সঙ্গে এখানে এসে ছিন্ন হল সূত্র। কদিন আমাদের খুব ভালো কাটল বেনবেলির সাহচর্যে। কয়েক মাস পরে আলজেয়ার্সে অনেক খেজুর নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেছে।

হোটেল দ লে রস্তমিদে অনেক উঁচু পাহাড়ের ওপর— ফলে ঘরে বসেই নীচে শহর ও আশপাশের অনেকটা দেখা যায়। মোজাবিত যাদুঘর দেখতে গেলাম। মোজাবিত আদিবাসী গোষ্ঠীর পোশাক, অস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি রয়েছে। শহরটি বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। পুরো দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য মোজাবিত গোষ্ঠীর কবজায়।

বেশিরভাগ মোজাবিতই অবস্থাপন্ন ব্যবসাদার। এদের চেহারাতেও তার ছাপ আছে। দোকানগুলো সুসজ্জিত। বিদেশেও এদের বাণিজ্য প্রসারিত— স্পেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল এবং আশপাশের দ্বীপগুলোতে। আমাদের দেশে রাজস্থানের মারওয়ারি যেমন। স্বাধীনতার যুদ্ধে, ব্যবসার খাতিরে, নিজেদের স্বার্থে মোজাবিতেরা যোগ দেয়নি। এই স্বার্থপরতার জন্য কাবিলি গোষ্ঠীর সঙ্গে মোজাবিতের প্রায়ই লড়াই হত।

শহর ঘুরে দেখার জন্য ট্যুর নিলাম গাইড সহ। পাহাড়ের ওপর থেকে একটা পামেরি দেখলাম। মনে হল একটা সবুজ নদী বয়ে গেছে। এখানকার সেচপদ্ধতিকে বলে পুই-দের। তিমিমুনে দেখেছি ফুগারাপদ্ধতি। ব্যবস্থা একইরকম তবে জলের সূত্র এখানে নদী। ফলে বৃষ্টি না হলে জল শুকিয়ে গেলে খুব অসুবিধা। জল রিজার্ভ-এ থাকে। সব পামেরি-র মালিকরা অত্যন্ত ধনী। প্রত্যেকের বাগান উঁচু পাঁচিল ঘেরা। তাতে নানা জাতের খেজুর এবং অন্য ফলের গাছ। সব ফলই অত্যন্ত সুস্বাদু। একেকটা খেজুর গাছ নাকি ৮০ থেকে ১০০ কেজি খেজুর দেয়। আমাদের যেমন অনেক জাতের আম আছে এখানে তেমনই সেরা খেজুর হচ্ছে— দেগলেতনুর, তেমজুওরত, তাকে জেওয়েস ইত্যাদি। এই অক্টোবর মাস খেজুরের সময়। প্রত্যেকটি গাছ খেজুরের ভারে নুয়ে পড়েছে। মার্চ মাসে এখানে একটা উৎসব হয় তার নাম খেজুর উৎসব। যেসব খেজুর গাছে ফল ধরে না— তাদের রেণু ছড়িয়ে দেওয়া হয় যেসব গাছে প্রথম ফল আসবে তাদের মাথায় । যেসব গাছে ফল ধরে না তারা পুরুষগাছ। অনুষ্ঠান হয় সূর্য ওঠার আগে ঊষালগ্নে। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে উৎসব হয় সেটা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার মতো। পামেরি থেকে আমরা গেলাম বেনি ইসগান নামে এক অঞ্চলে। যখন বেনি-ইসগানে পৌঁছলাম তখন বিকেল পাঁচটা। উঁচু পাঁচিল ঘেরা গেট— তাতে লেখা— গেটের ভেতর ধূমপান, মদ্যপান চলবে না, গাড়ি নিয়ে ঢোকা যাবে না, ছবি তোলা চলবে না ইত্যাদি। সন্ধে সাতটায় গেট বন্ধ হবে। একটা ছোট পাহাড়ের ওপর ঘিঞ্জি শহর— এই বেনি-ইসগান। সরু সিঁড়ি উঠে গেছে। দুপাশে পাঁচিলের গায়ে একটা করে দরজা একটু দূরে দূরে। এই দরজা হচ্ছে বাড়ির সদর দরজা। দরজাগুলো মুখোমুখি বাড়ির বিপরীতে যাতে না হয় সেদিকে নজর রাখা হয়েছে। সামনাসামনি দরজা হলে বাড়ির মহিলাদের দেখে ফেলার সম্ভাবনা থাকে। মহিলারা সাদা মস্ত চাদর দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে রাখে, এম-জ্যাব অঞ্চলে শুধুমাত্র বাঁচোখ খোলা রাখে। এই বড় সাদা চাদর দিয়ে এমন কায়দা করে একটা ঘেরাটোপ তৈরি করে যাতে বাঁচোখটা ফুটোর মধ্যে খোলা এবং আর সব বন্ধ। এভাবেই পথেঘাটে চলাফেরা করে। তবে রাস্তায় মহিলাদের বড় একটা দেখলাম না বেনি-ইসগানে। দুপাশে শুধু বন্ধ দরজা দেখতে দেখতে ওপরে উঠলাম। জানলা নেই, ভেতর থেকে টিভি বা ভিডিও-র আওয়াজ আসছিল। পাহাড়ের ওপর অর্থাৎ শহরের মাথায় একটা বড় ছাদ। সেখানে বোর্জ বোলেইলা নামে একটা পর্যবেক্ষণ টাওয়ার আছে। কাবিলিগোষ্ঠী যখন মোজাবিতদের আক্রমণ করে, তখন একরাতের মধ্যে এই

টাওয়ার তৈরি করা হয় শত্রুর গতিবিধি জানার জন্য। এখান থেকে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। গারদাইয়া শহর মালিকা, পামেরি ছাড়িয়েও অনেকদূর চোখ চলে যায়। একরাস্তা দিয়ে উঠলাম আর অন্যরাস্তা দিয়ে নামলাম। পৌঁছলাম এক বড় চত্বরে। সেই চত্বরে যেন মেলা বসেছে। চারপাশ ঘিরে স্যুভেনিরের দোকান। উঠোনের মাঝখানে চলছে নিলাম। এটা দৈনন্দিন ঘটনা। রোজই নিলাম হচ্ছে— একটা কাঁচি থেকে একঝুড়ি খেজুর, কার্পেট, পুরনো টিভি, জামাকাপড়, জুতো, মশলাপাতি, জ্যান্ত মুরগি— সব নিলামে হাঁকা হচ্ছে। সবাই খুব উত্তেজিত, ব্যস্ত। এমন প্রাণবন্ত বাজারের ছবি নিতে পারলাম না বলে দুঃখ হচ্ছিল। তবে দু-চার বিদেশি পর্যটক যে চুরি করে ছবি নেয়নি তা নয়। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। স্থানীয় কোনও মহিলাকে দেখিনি বাজারে। বেনি ইসগান থেকে গারদাইয়ার হোটেল দ লে রস্তমিদে ফের এলাম সে রাতে।

পরদিন গারদাইয়া শহর দেখতে বেরলাম হেঁটেই। হোটেল থেকে বাজার খাড়া নীচে নামার পথ পাহাড় বেয়ে। বাজার থেকে খুব সরু রাস্তা উঠে গেছে ইবাদিত মসজিদ পর্যন্ত। এই মসজিদ ঘিরে ঘিঞ্জি পুরনো অঞ্চলকে বলে কাসবা। এত সরু গলি যে দুজন পাশাপাশি হাঁটা যায় না। এগুলোই মেইন রাস্তা। হাজার বছরের পুরনো এই মসজিদ। এম-জ্যাব অঞ্চলের সব মসজিদের চেহারা পিরামিডের মতো। মসজিদ বলে মনে হয় না। এগুলোকে ইবাদিত বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য প্রার্থনাগৃহ। বড় প্রার্থনাঘরের সদর দরজা মক্কার দিকে মুখ করা। এই বড় ঘরের দরজা জানলা পাম উড-এর তৈরি। এদিকে সব শহরের দুরকমের মসজিদ আছে— আরব আর মোজাবিত গোষ্ঠীর। মসজিদ দেখে আমরা কার্পেট-বাজারে অতি সুদৃশ্য কার্পেট দেখলাম। হাজার দিনার দিয়ে একটা ছোট কার্পেট কিনলাম। মার্চ মাসে এখানে কার্পেট উৎসব আর উটের দৌড় প্রতিযোগিতা বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রচুর ট্যুরিস্টের সমাগম হয়।

এখান থেকে আরেক পাহাড়ে গেলাম সিডি আয়েসার সমাধি দেখতে। জায়গাটা বড় নির্জন। এই গম্বুজের ছবি এদেশের একশো দিনারের নোটে ছাপা আছে। এবার হোটেলে ফিরে দেখি আমাদের বন্ধু আবদুল কুরেশী আমাদের নিতে এসেছে। প্রথমে চিনতে পারিনি। স্যুট-টাই ছেড়ে মোজিবিত পোশাক পরেছে— সাদা গান্ডোরা— সেটা ঢোলা কাফতানের মতো, মাথায় টুপি। আমরা গারদাইয়া দেখে এবার বেরিয়ানে যাচ্ছি আবদুলের জোড়া ভাইপোর বিয়ে দেখতে। গারদাইয়া থেকে বেরিয়ানের দূরত্ব সত্তর কিলোমিটার। মার্সেডিসে সময় লাগল মাত্র ২৫ মিনিট। চমৎকার ফাঁকা রাস্তা। রাস্তায় শুধুই পাথুরে বালি আর ছোট ছোট পাহাড়। এদিক ওদিক কিছু কারখানা।

আমরা গেলাম সোজা বিয়েবাড়িতে। পামেরিতে বিয়ে হচ্ছে। ধনী মোজাবিতের বিয়ে পামেরিতে দেওয়ার রেওয়াজ। পাঁচিল ঘেরা বড় বাগানের মধ্যে দুটো বাড়ি পুরনো ধরনের। দুই বাড়ি দুই প্রান্তে। মাঝে বাগান। একটা বাড়িতে বিয়ের

আয়োজন চলছে— মহিলাদের রাজত্ব সেখানে। অন্য বাড়িটি বিয়ের সাজে সজ্জিত। রাস্তার ওপারে পাঁচিল ঘেরা আরেকটি বাগানবাড়ি। সেখানে শুধুই ছেলেদের ব্যবস্থা। বড় বড় নতুন কার্পেট পাতা। এইসব কার্পেট বাড়িতে মেয়েরা হাতে তৈরি করে। সবুজ, হলুদ, কমলা রঙের প্রাধান্য। ঘরজুড়ে তাকিয়া ছড়ানো। আমাদের নিয়ে আবদুল প্রথমে এই বাড়িতে এল। টকটকে গায়ের রং, নাদুসনুদুস বড়সড় চেহারার কর্তাব্যক্তিরা বিশ্রম্ভালাপ করছে। তাদের সঙ্গে সাবাল খ্যার, ময়াল খ্যার এইসব অভিবাদন করে, জুতো খুলে কার্পেটে বসলাম। আবদুল দোভাষীর কাজ করছিল। বড় গ্লাসে ফলের রস এল আমাদের জন্য। তার সঙ্গে খেজুর, পেস্তা বাদাম এবং নানাধরনের শুকনো ফল। এর কিছুক্ষণ পর নিচু গোলটেবিল এল অনেক। আমরা যেখানে বসেছিলাম—সেখানেই। আমাদের টেবিলে পাঁচজন ছিলাম। অন্য টেবিলে সাত-আটজন করেও ছিল। টেবিলের উচ্চতা দেড় ফিটের মতো হবে হয়তো। পা মুড়িয়ে বসে ভালোই খাওয়া যায়। আমাদের টেবিলে আবদুল, বরের বাবা, কাকা, প্রণব ও আমি ছিলাম। একপাত্র স্যুপ আর কয়েকটি চামচ ও ন্যাপকিন এল। এইরকম স্যুপকে সোরবা বলে। তার সঙ্গে ফরাসি ব্রেড যাকে বাগেত বলে। এই বাগেত এখন সারা আলজেরিয়ায় দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভাবছি এবার সবার জন্য স্যুপ বোল আসবে। তা এল না। সেই পাত্র থেকে যে যার চামচ ডুবিয়ে স্যুপ খেতে লাগল। আমি আর স্যুপ খেলাম না। স্যুপের পাত্র সরে গিয়ে মাংসের বড় প্লেট এল। তার সঙ্গে অলিভ অয়েলের ড্রেসিং দেওয়া সালাদ। মাংসে কোনও মশলা নেই, ঝোলবিহীন সুসেদ্ধ এবং সুস্বাদু। এরপর এল ফল— অনেক রকমের ভূমধ্যসাগরীয় ফল। অর্থাৎ আপেল, ন্যাসপাতি, আঙুর, বেদানা ইত্যাদি। খাওয়ার শেষে আমাকে মহিলাদের প্রবেশদ্বারে পৌঁছে দিল আবদুল— রাস্তার অন্যপারে। এখানে প্রমীলারাজত্ব। বিয়ের রান্নার আয়োজন চলছে। আবদুলের স্ত্রী বায়া-র সঙ্গে অন্দরমহলে গেলাম। দরজায় কার্পেট ঝোলানো— সেটা পর্দার কাজ করছে। এখানের বাচ্চাদের কাজ হচ্ছে দৌত্য করা। ভেতরের খবর পুরুষদের জানানো বা অন্য কোনও খবর আনার কাজ তারাই করছে ছুটোছুটি করে। বাচ্চাদের প্রলোভন দেখিয়ে, ভালো কথায় কাজ আদায় করানো হচ্ছে। সুযোগ বুঝে তারাও দাঁও কষছে। বিশাল চাতালে কার্পেট পাতা। মহিলারা গল্প করছে, গান গাইছে, আলু ছাড়াচ্ছে, পেঁয়াজ, রসুন, টম্যাটো, কুমড়ো বা অন্য সব্জি কাটছে। একদল মাংস বাছছে। চারটে বড় বড় গ্যাসের চুল্লি। কয়েকটা কুকিং রেঞ্জ। সরগরম ভাব। আগামীকাল বিয়ে। বায়া অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল। প্রথমে কেউই সহজ নয়। ভাষার অসুবিধা তো আছেই তাছাড়া বিদেশি বলে দূরত্ব ছিল। অস্বস্তি হচ্ছিল আমার। বায়াও নিজের কাজে কোথায় চলে গেল। এদের চেহারায় আদিবাসী ভাব স্পষ্ট। পনেরো থেকে পঁচাত্তর বয়েসের মধ্যে তেমন সুন্দর কেউ নেই। সবাই ফর্সা, মাঝারি লম্বা, চৌকো মুখ। কথা বলছে মোজাবিত ভাষায়। পড়াশুনো বেশিরভাগই

জানে না। বাড়ির মধ্যে কেউ বোরখা পরে নেই। স্কার্ট বা মিডিফ্রক পরে সবাই। ন্যান্য বলে একটি মেয়ে এগিয়ে এল। তারপর এল ল্যায়লা। এই ল্যায়লার বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এরা একটু ফরাসী জানে। কিছুক্ষণ পর এল মিন্ট টি। এদের মিন্ট টি তৈরির কথা তিমিমুনে বলেছি। একইভাবে তৈরি হল চা। এতদিনে বারবার এই চা খেয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। চা খেতে খেতে সহজভাব এল সবার মধ্যে। একটু কথা, হাসি ইত্যাদি শুরু হল। বলল, আমাদের হিন্দি ফিল্ম আর ফিল্মি নাচ ওদের খুব ভালো লাগে। আর ভালো লাগে আমাদের শাড়ি। পরে আলজেয়ার্স ফিরে আবদুলের হাতে দুটো শাড়ি আর ফিল্ম-এর ভিডিও ক্যাসেট পাঠিয়ে দিলাম।

এদের বিয়ের অনুষ্ঠানে কোনও ঝামেলা নেই। আগামীকাল বিয়ে। অথচ মাংস বাছা বা সব্জি কাটা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। বলল— 'আমাদের বিয়ের পোশাক পরবে? বিয়ের কনের সাজে ভারতীয়কে কেমন দেখায় দেখব।' বললাম, বেশ! তোমাদের সঙ্গে ছবি তুলব। শুনে ওরা সকলে আঁতকে উঠল সে নাকি অসম্ভব। ছবি তোলার প্রশ্নই ওঠে না। অন্যেরা দেখে ফেলবে। খুব অবাক লাগল। এ যুগেও এত পর্দানসীন বিশ্বাস করা যায় না। আমাকে সাজিয়ে দিল অনেকে মিলে। কানের ওপর থেকে দুপাশে বিনুনি করল রঙিন মোটা মোটা উল দিয়ে। সোনার গয়না পরে, ওদের পোশাক পরলাম। যা পরেছিলাম তার ওপরেই পরলাম। ঝোলা ঝোলা পোশাক। সেই কনের সাজে যে কী কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছিল! ছবি তো অন্যদের সঙ্গে তোলা হল না। বাগানে গিয়ে একাই তুললাম। মহিলারা বিকট বিচিত্র সুরে গান গাইতে লাগল। উলুধ্বনি দেওয়ার রেওয়াজ খুব আছে। কোমর দুলিয়ে কয়েকজন নাচতে লাগল। তখন রাত বারোটা। প্রায় জমে উঠেছে আসর— এমন সময় আবদুল বাইরে থেকে একটা বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে খবর পাঠাল— আমাকে বাড়ি যেতে হবে। কনের সাজ খুলে ফেললাম। ল্যায়লার বাড়িতে আমাদের দুজনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমরা স্বামী স্ত্রী ছাড়া আর সকলে পামেরিতে রয়ে গেল। ল্যায়লার বাবা ইয়া ইয়া হচ্ছেন আবদুলের ভগ্নিপতি। তিনি ধনীব্যক্তি। শহরের কেন্দ্রে বিশাল বাড়ি। আমরা দুজনে অনেক কাজের লোকের তত্ত্বাবধানে সেখানে ছিলাম।

আজ বিয়েবাড়ি। বেলা দশটা নাগাদ গাড়ি এল। আমরা পামেরিতে গেলাম। গতকালের মতোই হৈ হৈ করে রান্নার কাজ চলছে। তিনজন মহিলা রান্নার দায়িত্বে রয়েছেন, অন্যরা সাহায্যে। তাদের সকলের মাথায় রুমাল বাঁধা। খোলাচুলে এরা রাঁধে না। আমি মহিলাদের ভিড়ে মিশে গেলাম আর আমার স্বামী রাস্তা পেরিয়ে পুরুষমহলে। রান্নার সুন্দর গন্ধ বেরচ্ছে। কিন্তু ছ্যাঁকছুঁক ভাজার আওয়াজ নেই। এদের বেশিরভাগ রান্নাই সেদ্ধ। পেঁয়াজ, রসুন, টম্যাটো আর মাখন দিয়ে রান্না। বড়জোড় ধনের গুঁড়ো। আমার ভালো লাগত এই বৈচিত্র্যহীন রান্না। খাবারের মেনু একই। ফরাসি রুটি বাগেত, স্যুপ অর্থাৎ সোরবা, মাংস, সালাদ আর ফল।

ফলে কারুর কোনও কাজ নেই, ব্যস্ততা নেই, চাতালে বসে গল্প, গান, নাচ, হাসিঠাট্টা চলছে। ভাষা তো বুঝছি না। পাঁচিল পেরিয়ে রাস্তার অন্য বাড়িতে ছেলেদের মজলিস চলছে। সেখানে গ্যাস স্টোভে ছেলেরা মিন্ট টি তৈরি করছে। দুপুরে খাবার পরে বাগানে কার্পেট পাতা হল। প্রায় আড়াইশোটা হবে। সেখানে পুরুষদের প্রবেশাধিকার আছে— মহিলাদের নয়। যে বাড়ি বিয়ের সাজে সজ্জিত সে বাড়ির ছাতে সব মহিলারা জায়গা করে বসল। ছাতে নিচু পাঁচিলে একটা করে ইট সরিয়ে ছোট ছোট ফুটো। সবাই একেকটা ফুটোয় চোখ লাগিয়ে বসল। তখন বেলা তিনটে। ঠেলাঠেলি ভিড় মেয়েদের। দু-চারটে চেয়ার ছিল। আমাকে একটা দেওয়া হল। সকলেই খুব সোনার গয়না পরেছে। গিনির ছড়া কোমরে, কপালে, গলায়, হাতে, ডিজাইন বিশেষ নেই। চারদিকে গয়নার আওয়াজ আর আতরের গন্ধ। বায়া, ন্যানা, ল্যায়লা— কাউকে চেনা যাচ্ছে না। নীচে সাদা পোশাক পরে সাদা টুপি মাথায় অতিথি, আত্মীয় পুরুষেরা আসছেন। এই পোশাক সাদা ঢোলা কাফতানের মতো—গণ্ডোরা। এটা এদের আনুষ্ঠানিক পোশাক। আমার স্বামীকেও এই পোশাকে আসতে দেখলাম। হৈ হৈ নেই, চেঁচামেচি নেই, উচ্ছ্বাস নেই। একে একে শান্তভাবে নিঃশব্দে পরস্পরকে কোলাকুলি করে কার্পেটে বসছে। মোটামুটি একটা লাইন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বাগান ভরে যাচ্ছে সাদা পোশাক আর টুপিতে। মাঝখানে মৌলবিদের বসার জায়গা স্টেজের ওপর। কয়েকটা মাইক্রোফোন। মৌলবিরা এলেন জনা কুড়িক। তাদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি একটু এগিয়ে বসলেন। ছাতের ওপর থেকে ওই অনুষ্ঠান দেখতে চমৎকার লাগছিল। গাছগুলো খেজুরের ভারে নুয়ে আছে। পরিষ্কার আকাশ। মৌলবিরা কোরাণপাঠ শুরু করলেন। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক চলল। তারপর কয়েকজনের সঙ্গে বিয়ের বর দুজন সভার মাঝে স্টেজে এল মৌলবিদের কাছে। তাদের দুজনকে বিয়ের সাজ পরানো হল। আবার কিছুক্ষণ পাঠ হল। ততক্ষণে দিনের আলো কমে এসে চাঁদ দেখা দিয়েছে। পরিবেশ অলীক মনে হচ্ছে। গাছে গাছে আলো জ্বলল। সব মিলিয়ে ঘণ্টা তিনেকের অনুষ্ঠান। তারপরেই কিছু বুঝে ওঠার আগেই তৎপরতার সঙ্গে কোনওরকম কোলাহল না করে সেই প্রায় ছশো জন লোক গোটা সত্তর-আশি সার্কেল করে নিল বসে বসেই। কী করে কোথা থেকে এসে গেল গোল গোল নিচু টেবিল। তার ওপর সাদা চাদর। ডিনার সার্ভ করা হচ্ছে। সন্ধে সাতটা বাজে। যারা সার্ভ করছে তারা দক্ষতার সঙ্গে এ কাজ করছে। মেনু ছিল খুসখুস। সুজির উপমার মতো অনেকটা। তার সঙ্গে মাংস আর মাংসের সস। এই খুসখুস আরবদের ডেলিকেসি। এক এক অঞ্চলে এই খুসখুসের স্বাদের পার্থক্য হয়। যখন ছেলেরা খাওয়া শুরু করল তখন মেয়েরা তরতরিয়ে ছাদ থেকে নামতে থাকল— ছেলেদের খাওয়া নাকি মেয়েদের দেখতে নেই। যে বাড়িতে রান্না হচ্ছিল সেখানে মেয়েদের খাবার ব্যবস্থা। একই পদ্ধতি— এক থালা থেকে অনেকে মিলে খাওয়া। রাত সাড়ে আটটার মধ্যে সকলের খাওয়া শেষ এবং বিশ্রাম। ল্যায়লার

বাড়িতে আমি আর প্রণব ফিরে গেলাম। বাকিরা পামেরিতে বিশ্রাম করল। রাত সাড়ে দশটায় আবার গেলাম পামেরিতে। এবার যেখানে বিয়ে হল সেই বাগানে মেয়েদের রাজত্ব। মাঝখানে নাচগানের জন্য অনেকটা জায়গা ছেড়ে গোল হয়ে বসা হয়েছে। দু-তিনরকমের বালতি, ড্রাম, চামচ দিয়ে সঙ্গীতের ব্যবস্থা। বিচিত্র আওয়াজের সঙ্গে গান, নাচ আর হুল্লোড়— ঝালাপালা হয়ে যাবার যোগাড়। দেখলাম সকলেই খুব উপভোগ করছে এই বিচিত্রানুষ্ঠান। বেশ শীত করছিল আমার। ঠান্ডা বাড়ছে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। বিয়ের বর দুজন গেছে মসজিদে। সেখানে কোরাণপাঠ হবে আর কনেদের নিয়ে এখানে আসবে। এটাই শেষ অনুষ্ঠান। তাদের আসার অপেক্ষাতে এই নৃত্যগীতের আয়োজন। রাত বারোটা বাজল। ততক্ষণে সকলে ক্লান্ত আর শীতও বাড়ছিল। এমন সময় গাড়ির হর্ন দিতে দিতে বর-বউদের দুটো গাড়ি এল। নাচ গান ছেড়ে মহিলারা বোরখা পরে মুখ ঢেকে নিল। গাড়ি থেকে দুজন স্বাস্থ্যবতী মহিলার পিঠে চড়ে কনেরা এল বাড়ির দরজায়। উলুধ্বনি সমানে চলেছে। কনেদের দুধ আর খেজুর দেওয়া হল খেতে। পিঠে থাকা অবস্থায় খেল তারা বোরখার ভেতর দিয়ে। একপাত্র জল মাথার ওপর দিয়ে পিছনে ছিটিয়ে দিল কনেদের শ্বশ্রূমাতা। উলুধ্বনি তুমুলবেগে কোরাসে চলছে। ঘরের মধ্যে বোরখাপরা সব মহিলাদের মাঝখানে বস্তার মতো পিঠের বোঝা নামাল মহিলা দুজন। কনেদের পরনে সেই বিচিত্র পোশাক যা আমি কাল পরেছিলাম। তবে এর রং হচ্ছে লাল এবং উলের। বিয়ের দিনের পোশাক হবে লাল উলের। তা গরমে বা শীতে যখনই বিয়ে হোক। বিয়ে হয় বৃহস্পতিবারে। পরদিনের পোশাক সাদা বোরখা— যা বিবাহিতের লক্ষণ। একসপ্তাহ পরে শুক্রবারে আবার লালরং তবে উলের নয়, সিন্থেটিক। তার পরের শুক্রবারে হলুদ। তার পরের শুক্রবারে সুবজ। এইভাবে চল্লিশ দিনের মাথায় অনুষ্ঠান শেষ হয় সাদা বোরখায়। কনেদের পিঠ থেকে নামবার পর সবাই কনে দেখল। গয়নায় মোড়া অল্প বয়সী দুটি মেয়ে। বড় জোর তের-চোদ্দ বছর হবে। এরপর বর দুটো এল এবং বিনা অনুষ্ঠানে কনেদের নিয়ে যে যার ঘরে গেল। আমরা ল্যায়লার বাড়ি ফিরলাম।

আজ আমাদের আলজেয়ার্স ফেরার দিন। দিনে আবদুল আর ইয়া ইয়ার সঙ্গে বেরিয়ান শহর ঘুরে দেখলাম। ছোট শহর সাহারার মধ্যে— সুন্দর ও আধুনিক। কিছু কলকারখানা রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বৃষ্টির জল জমিয়ে সেচের ব্যবস্থা। বিকেলে নববধূদের কাছে বিদায় নিয়ে গারদাইয়া বিমানবন্দরে এলাম আবদুলের সঙ্গে। বিকেলের আলোয় জুরজুরা পর্বতশ্রেণী দেখতে দেখতে আলজেয়ার্স পৌঁছলাম। রাজধানীকে বড় সাজানো আলো ঝলমল শহর মনে হচ্ছিল। আর এত লোক। সাহারার লাল-বালি, বালিয়াড়ি, আহলিল সঙ্গীত, মোজাবিতের বিয়ে— এইসব ঘোরের মধ্যে কদিন গেটে গেল।

'ভ্রমণ' অক্টোবর, ২০০৪

উবুদরাজের নিমন্ত্রণে

দেবযানী মুখোপাধ্যায়

জাকার্তার চেংকারাং বিমানবন্দর থেকে বালিদ্বীপের নগুরারাই বিমানবন্দরে পৌঁছলাম সমুদ্রকে প্রায় ছুঁয়ে। ছোট্ট বিমানবন্দর যেন সমুদ্রের ওপর ভাসছে। ভারত মহাসাগরের বুকে ছোট্ট একটা দ্বীপ— বালিদ্বীপ। সুদীর বলে একটি ছেলের আমাদের অপেক্ষায় থাকার কথা। আমি ভাবলাম সুধীর নাম যখন, ভারতীয় তো বটেই, বাঙালি হওয়াও আশ্চর্য নয়। কিন্তু যে ছেলেটি এগিয়ে এলেন তাঁর পরিচয়— সুদীর সুবাদিও— বালিদ্বীপের হিন্দু বাসিন্দা, মাঝারি সাইজের, একটু ক্ষয়া চেহারা আর একমাথা কালো চুল। 'নাতুর কুচা বিচ রিসর্ট'-এ আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। সমুদ্রের ওপর বড় কমপ্লেক্সে ছোট ছোট বাংলো। সুন্দর সাজানো। মনে হচ্ছিল আর কিছু দেখে কাজ নেই, এই বাংলোয় বসে দিব্যি লাগবে সমুদ্র দেখতে। তা আর হল না। সুদীর এক প্রোগ্রাম ধরিয়ে দিলেন হাতে। আমরা সকাল দশটায় পৌঁছেছি হোটেলে আর এগারোটায় 'উদয়ন' বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে। ফলে বেরিয়ে পড়লাম চা, টোস্ট অমলেট খেয়ে। এত বড় ইসলামিক দেশে হিন্দু নামগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেমন রাস্তার নাম— জালান সুদীর্মান, জালান উজয়া (বিজয়া)। 'অর্থালোকা' হচ্ছে অর্থমন্ত্রক, মহিলার নাম সুমন্ত্রা, পুরুষের নাম কুসেন্দু (কৃষ্ণেন্দু) ইত্যাদি। যেমন এখন চলেছি উদয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীরের সঙ্গে। অনেক গাছগাছালির মধ্যে শান্ত সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংস্কৃতও পড়ানো হয়। প্রফেসর শর্মা তিন-চার বছর হল অধ্যাপনার কাজে ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন। কয়েকটি মাত্র ছাত্র— কাজ কম। অলস মন্থর জীবন। বালিতে এখনও ছোট বড় চার হাজারের মতো মন্দির ছড়িয়ে আছে। সব মন্দিরই যে ব্যবহারযোগ্য তা নয়। আমরা রওনা দিলাম উলু বাতু মন্দির দেখতে। বালিদ্বীপের দক্ষিণে 'বুকিত' অঞ্চলে এই মন্দির। চারদিকে চুনের পাহাড়। সাদা পাহাড়। আশপাশে লোকবসতি নেই। মন্দিরে প্রবেশের মুখে একটা বড় দরজা— তার নাম চণ্ডী। একটা ত্রিভুজ আকৃতিকে দুভাগ করলে যেমন হয় চণ্ডী নামে গেটটি সেইরকম। কাঠের তৈরি আর কারুকার্যখচিত। সেটি দিয়ে ঢুকলে একটা বড় চত্বর। সামাজিক অনুষ্ঠান আর মোরগের লড়াইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই মোরগ লড়াইয়ের একটা উদ্দেশ্য আছে। সুদীর আমাদের

না গিয়েও তিনি ভারতকে এবং ভারতীয় দর্শনকে অনুভব করেন। পুনর্জন্ম বলে যদি কিছু থাকে তবে তিনি ভারতে জন্মাবেন। আবেগে আপ্লুত হয়ে অনেক কথা বললেন। এই বৃদ্ধের মুখ আমরা আবার দেখেছিলাম। সেটা উবুদে। বাতুবাতানের পরে এল মাস। এই গ্রামটি কাঠের কাজের জন্য বিখ্যাত। রাস্তার পাশে গাড়ি রেখে গ্রামে ঢুকতে হয়। গাড়ি ঢোকার রাস্তা নেই। গ্রামে ঢোকার জন্য সুন্দর কাজ করা গেট। রাস্তার ধারে কত যে সুন্দর মূর্তি, আসবাব, ছবির ফ্রেম, কাঠের গয়না। চমৎকার কাজ আর পালিশ। কাঠের গন্ধ, পালিশের গন্ধ ম ম করছে। একটা মূর্তি, পদ্মফুলের ওপর দাঁড়ানো সরস্বতী, হাতে বীণা নেই। মুখটা যেমন সুন্দর তেমনই কোমল। এই মূর্তিটা কিনে ফেললাম। সুদীর দাম কিছু কম করাতে পারলেন। এখানকার শিল্পীরা চেলুক বা বাতুবাতানের শিল্পীদের চেয়ে বৈষয়িক, স্মার্ট। ক্রেতা বা পর্যটকদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। অনেকেই ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, চিন এবং বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করেন, ব্যবসা করেন। 'মাস' গ্রামের পরে এল উবুদ। এই পৃথিবীবিখ্যাত শহরটি চিত্রকরের স্থান। শহরটি বড়, তাই গাড়ি নিয়ে ঘোরা গেল। উবুদ যথেষ্ট বর্ধিষ্ণু। এক রাজার রাজত্ব ছিল এটা। সে কথায় পরে আসছি। উবুদ শহরের এক নিজস্ব চরিত্র আছে। অলিতে গলিতে অনেক স্টুডিও। গাছের তলায়, রাস্তার ধারে, চিত্রকররা আঁকছেন। কাগজে, ক্যানভাসে, কাঠে, চামড়ায়, বেতের ওপর, কাপড়ের ওপর অনেক ছবি। লাল, নীল, ব্রাউন, হলুদ, সাদা, কালো— এই কটি রঙের প্রাধান্য বেশি। রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্র বা দৃশ্যের ওপর পেন্টিং অনেক রয়েছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য, বেশাখী মন্দির, রাজবাড়ির চিত্র। বর্ণনামূলক ছবির মতো যুদ্ধের দৃশ্য, শোভাযাত্রা, বিবাহ ইত্যাদি ছবিও অনেক। আমরা রাই মিউজিয়াম থেকে একটি তৈলচিত্র কিনলাম— গ্রামের দৃশ্য। আর কয়েকটি স্কেচ। তার মধ্যে চোখ আটকে গেল একটি বলিরেখাযুক্ত বৃদ্ধের মুখাবয়বে। এত পরিচিত মুখটি কোথায় যেন দেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বাতুবাতানের নব্বই পার করা বৃদ্ধের ছবি। এত জীবন্ত চোখ আর শান্তভাব তুলির টানে অতুলনীয় লাগছে। আমরা উবুদ থেকে ফিরে এলাম দেনপাসারে কুটা বিচ রিসর্টে, এইসব শিল্পসমৃদ্ধ জায়গাগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে। মনে হচ্ছিল কোনও এক স্বপ্নের দেশে ঘুরে এলাম।

পরদিন বালির প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পীদম্পতি তুয়ান বান্দেম আর স্বস্তি বান্দেম পরিচালিত 'অস্তি' নৃত্যপ্রতিষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ ছিল। স্কুলটিতে যথেষ্ট আধুনিক ব্যবস্থা। তুয়ান বান্দেম অল্পবয়সী সুদর্শন ভদ্রলোক। অনেক ছবি দেখালেন। সদলবলে যেসব দেশে নৃত্যপ্রদর্শন করেছেন, সেসব ছবি। স্বস্তি তাঁর ছাত্রী ছিলেন, পরে স্ত্রী হয়েছেন। বান্দেম দম্পতি নিয়ে গেলেন তাদের অনুশীলন ঘরে। বিশাল হলঘর। আমরা লেগং আর জেরম তেজি নাচের রিহার্সাল দেখলাম। লেগং নাচের এক বিশেষত্ব আছে। আগেকার দিনে রাজবাড়িতে এই নাচ পরিবেশিত হত। লেগং নাচে পাঁচ-ছবছরের বাচ্চাদের হাতেখড়ি দেওয়া হত আর এগারো-বারো

বছর পর্যন্ত নাচার অনুমতি ছিল। তারপর সেসব নাচিয়েদের বাদ দেওয়া হত। এমন কোমল নরম নাচ নিষ্পাপ শিশুদেরই মানায়। আজকাল অবশ্য একটু বড়রাও নাচে। এরপরের নাচ হচ্ছে জেরম তেজি। ঘোড়ায় চড়া মেয়েদের হাতে ঢাল। পায়ের ছন্দ, ভঙ্গি আর বাজনা ঠিক ঘোড়ায় ছুটে যাবার মতো। দ্রুতগতির নাচ। এই নাচে একজন রাজকুমারী থাকে, তার নাম চন্দ্রাকিরণ। চন্দ্রাকিরণ এই নাচের দলপতি, অন্যরা তাকে অনুসরণ করে। কিছুক্ষণের জন্য দর্শকের শরীরও তালে তালে দুলে ওঠে। রিহার্সল এই পর্যন্তই দেখলাম। এরপর চা-কোয়ে খেয়ে তুয়ান বান্দেমের সঙ্গে গেলাম বিশ্ববিখ্যাত মুখোশশিল্পী ওয়েত তাঙ্গাওয়ের বাড়িতে। একটা ঘরে অসংখ্য মুখোশ দেওয়ালে। অনেকরকম চরিত্রের মুখোশ। এদেশে মুখোশের নাচ প্রসিদ্ধ। নাচের মুখোশগুলো পাতলা হালকা কাঠের। দেব আর দানব বোঝাবার জন্য রং নির্দিষ্ট থাকে। মুখোশগুলো অত্যন্ত দামি। মুখোশনির্মাতা ওয়েন তাঙ্গাও প্রৌঢ় সৌম্যদর্শন ব্যক্তি। কথা বলেন মেপে মেপে। এরপর তুয়ান বান্দেমের সঙ্গে আর্ট গ্যালারিতে ছবি দেখতে গেলাম। গ্যালারিতে অনেক নামীদামি চিত্রকরের ছবি আছে। তারমধ্যে দুজন শিল্পীর নাম গুস্তি লাম্পাদ আর গুস্তি বাগুস উজয়া। এরা চিত্রের জগতে যুগস্রষ্টা। অনেক স্থাপত্যশিল্পও রয়েছে। তারমধ্যে যে দুটো দেখে আনন্দ আর গর্ব হল তা হল রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধিজির আবক্ষ মূর্তি।

রবীন্দ্রনাথ বালি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বাংলি অঞ্চলের তেম্পকসিরিং উপত্যকায় যে ডাকবাংলোয় বাস করেছেন, সেখানে এখন নতুন গেস্টহাউস তৈরি হয়েছে। পাহাড়ের নীচে তীর্থাম্পূল মন্দির। এখানে সারা বছর মাটির তলা থেকে জল ওঠে। এই জল সিমেন্টের নালা দিয়ে বয়ে যায়। আমরা পা ভেজালাম। সারাবছর এ জলের মর্যাদা থাকে না। কিন্তু অক্টোবরের পূর্ণিমার রাতে এই জল অতি পবিত্র হয়। তখন সকলে সেই পুণ্যজল ভক্তি সহকারে সারারাত ধরে লাইন দিয়ে সংগ্রহ করে। সে রাতে জলে দৈবশক্তি থাকে এই তাদের বিশ্বাস।

এই তীর্থাম্পূল থেকে অনেক নীচে নামলে গুনুং মন্দির। এখানে তীর্থাম্পূলের জলের ধারা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পৌঁছেছে। পাহাড় কেটে হাজার বছর আগে 'গজগুআ' তৈরি হয়েছে। হাতির মাথার মতো এই গুহার মুখ— তাই গজগুআ। এই পাহাড়ের গায়ে বৌদ্ধ লিপি খোদাই করা। বালিতে বৌদ্ধধর্মের এই একটি নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তামণি আগ্নেয়গিরির সর্বোচ্চ চূড়ার নাম বাতুর। তার নীচে বাতুর লেক। লেকটি সমুদ্রতল থেকে চার হাজার ফুট উঁচুতে। এই লেকের জল সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়। এত উঁচুতে দুটো মন্দির— একটা হিন্দুদের অন্যটি চিনাদের।

আজ রাতে বালিদ্বীপের রাজ্যপাল ইদা বাগুস মন্ত্রার নৈশভোজের নিমন্ত্রণ। কুটা বিচ রিসর্টে ফিরে বিশ্রাম করা গেল না। আর্ট সেন্টারের সুন্দর সাজানো লনের নরম আলোয় সবুজ কোমল ঘাসের ওপর নৈশভোজের টেবিল।

গ্যামেলনের ব্যবস্থা ছিল পাশেই। সেখানে শান্ত গম্ভীর সুরে গ্যামেলন বাজছিল। বাদকেরা বালিনীজ কেবায়া আর মারং পরেছিলেন, মাথায় টুপি। তুয়ান বান্দেম সস্ত্রীক, প্রফেসর শর্মা এবং অনেক স্থানীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা ছিলেন। রাজ্যপাল শান্তিনিকেতনে ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন দুবছর, পঞ্চাশের দশকে। তিনি নন্দলাল বোসের প্রিয়পাত্র ছিলেন। শান্তিনিকেতনের তপোবনের পরিবেশ তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল। 'আচ্ছা' 'ভালো' এইরকম দু-চারটে শব্দ এখনও মনে আছে। আমরা ইন্দোনেশিয়া ছাড়ার কয়েকবছর পরে তিনি ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত হয়ে ভারতে এসেছিলেন। তখন নিশ্চয়ই স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতনে গেছেন। খাবার টেবিল বাঁশপাতা দিয়ে জেনুর তৈরি করে সাজানো ছিল। জেনুর এদের বিশেষ শিল্প। আর ছিল কলাপাতা আর ফুল। অনেকরকম রান্না ছিল। তার মধ্যে গুলে কাম্বিং (মাংস), মাছের বুম্বুবালি, নাসি কেতান (ভাত) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষে ছিল চেরোরট। বাঁশের কোড়ের মধ্যে চালের গুড়পিঠে। বালিতে পিঠেজাতীয় খাবার জনপ্রিয়। খাবার পরে ছিল একটা অনুষ্ঠান। পাপেট শো আর নাটক। নাটকের নাম দেবা রুচি। মহাভারতের দ্রোণাচার্য বলশালী ভীমকে গোপনে মারার উদ্দেশে দুর্গম জায়গা থেকে সঞ্জীবনী সুধা আনতে পাঠান। কিন্তু ভীম দুর্গম জায়গা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় আর সঞ্জীবনী সুধা খেয়ে আরও বলশালী হয়ে ফেরে। আমাদের মহাভারতে এমন গল্প তো নেই। যাই হোক সুন্দর সন্ধ্যা কাটিয়ে রাজ্যপালকে ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেলে ফিরলাম।

বালিদ্বীপের লোকেরা অনুষ্ঠানপ্রিয়। তাদের অন্যতম উৎসব হচ্ছে শবযাত্রা। তারা বিশ্বাস করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আত্মার মুক্তি এক আনন্দোৎসব ঘটনা। হয়তো পাঁচবছর আগে কেউ মারা গেছেন। তার মৃতদেহ সাময়িকভাবে মাটির তলায় রেখে দেওয়া হয়। যখন যথেষ্ট অর্থ সামর্থ হয় দাহ করার, তখন তা ধুমধাম সহকারে পালন করে। গ্রামের সকলে সেদিন শ্রেষ্ঠ পোশাক পরে। গ্যামেলনে উৎসবের বাজনা বাজে। বিশাল ভোজের আয়োজন হয়। মহিলারা শ্রেষ্ঠ পোশাক পরিচ্ছদে মাথায় ফুল, ফল ও খাদ্যের অর্ঘ্য সাজিয়ে নেয়। সে অর্ঘ্য উঁচুতে তিন ফুট পর্যন্ত হয়। জ্যেষ্ঠপুত্র মুখাগ্নি করে। আর ভস্ম সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়।

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় আমরা তানা-লট অঞ্চলে সমুদ্রের ধারে ছোট মন্দির দেখতে গিয়ে দেখে এলাম বিশাল কমলারঙের সূর্য। বিষুবরেখার কাছে সূর্যকে খুব বড় দেখায়!

রাতে ছিল উবুদের রাজার সঙ্গে নৈশভোজ। সারাদিন ভাবছিলাম রাজবাড়িতে যাব, কেমন হবে, কী শাড়ি পরব, কী কথা বলব ইত্যাদি। সন্ধ্যাবেলায় পরিচিত রাস্তায় চেলুক, বাতুবাতান, মাস, সুখাবতী ইত্যাদি শিল্পসমৃদ্ধ গ্রামগুলো পেরিয়ে উবুদে পৌঁছলাম। বড় রাজবাড়ি। উবুদের রাজা সেদিন অতিথিদের রাজবেশে অভ্যর্থনা করলেন। সিল্কের সারং অর্থাৎ লুঙ্গি, সিল্ক কেবায়া, মাথায় টুপি, কানে ফুল, কাঁধে সিল্ক স্ট্রোল। অল্প বয়স, অবিবাহিত। লন্ডন থেকে পড়াশোনা শেষ করে

সদ্য দেশে ফিরেছেন। ঠান্ডা মাথা, শান্ত স্বর। ভালো কথা বলতে পারেন। চণ্ডী অর্থাৎ বড় দরজা পার হয়ে বড় বাগান। সেখানে দূরে দূরে কয়েকটি বাঁধানো কিয়স্ক। তারই একটিতে আমরা বসলাম। বড় ঝাড়লণ্ঠনের নীচে বড় গোল টেবিল ঘিরে চেয়ার পাতা। মণ্ডপটি উঁচুতে। পাঁচ-ছটি সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। বালিনীজ প্রথায় প্রথমে এল রাইস ওয়াইন। রাজা গল্প করছিলেন, তাঁর ঠাকুরদার ৮১টি স্ত্রী ছিলেন। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা দাসি আর মহল। রাজার বাবার এগারোটি স্ত্রী। রাজার ভায়ের কয়েক বছর হল বিয়ে হয়েছে। একটিই স্ত্রী। তাঁরা ইউরোপে থাকেন। রাজা জানালেন যদি বিয়ে করেন তো একবারই করবেন। ঠাকুর্দা এবং বাবার স্ত্রীদের যেসব ঘর খালি, সেগুলো এখন বিদেশি গেস্টহাউস। রোজগার এতে ভালোই হয়। এছাড়া এস্টেট আছে। আমরা যে মণ্ডপে বসেছিলাম, তার সামনেই অন্দরমহল যাবার দরজা। কী যে অপূর্ব কাজ সেই দরজায়! আর চাপা আলোয় তা স্বপ্নপুরী মনে হচ্ছিল। এরপর একে একে খাবার আসতে লাগল। গ্যামেলন বাজছিল। আর আমরা রাজার ঠাকুর্দা ঠাকুরমাদের গল্প শুনতে শুনতে খাচ্ছিলাম। এ পরিবেশ ভোলা যায় না। খাওয়া শেষ হলে রাজার কাছ থেকে সিল্কের সারং আর কাঠের খোদাই করা শিল্পকর্ম উপহার পেলাম। এমন আন্তরিকতা ছিল রাজার ব্যবহারে, আমরা অভিভূত হয়ে হোটেলে ফিরলাম।

পরদিন বালিদ্বীপের চারদিনের সফর শেষে জাকার্তার জনাকীর্ণ শহরে ফিরে এলাম।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

সুন্দরবনের ঘাটভাগে

ফখরুল আবেদীন মিলন

টিয়ার চরে নামার পর থেকেই খেয়াল করলাম দলের নিরাপত্তায় নিয়োজিত তিন নম্বর গার্ডটি বেপাত্তা। ২০-৩০ বছরের পুরনো বন্দুকের কার্যকারিতা নিয়ে এমনিতেই সবাই সন্দিহান, তার ওপর একজন গার্ডের নিখোঁজ-সংবাদ দিয়ে সুন্দরবন অভিযাত্রী দলের অন্য সদস্যদের নতুন করে আর টেনশনে ফেলতে চাইনি। অবশ্য দলের সবার ভয় কাটানোর গুরুদায়িত্ব একাই কাঁধে তুলে নিয়েছেন আলি ভাই। সুন্দরবন নাকি তাঁর নখদর্পণে। এমন কিছু নেই যে তিনি জানেন না। তবে একবার তাঁর গোলপাতা গাছকে সুন্দরী গাছ বলে ভুল করাটাকে আমরা স্লিপ অব টাং বলে মেনে নিয়েছি। ওইদিকে সূর্যদেবও যেন কার ওপর রাগ করে যে ঝাল ঝাড়ছে আমাদের ওপর। নয়তো এই ডিসেম্বরে কেউ এভাবে দর দর করে ঘামায় নাকি? নিচু স্বরে চলছে গাইড সাহেবের বক্তৃতা আর আদেশ উপদেশ— কথা বলবেন না, শব্দ করবেন না, সাবধানে হাঁটুন, গাছের শ্বাসমূল ভাঙবেন না। ইচ্ছে হচ্ছিল বলি, 'মিয়া, পা দুটো কি মাথায় নিয়ে হাঁটব?' গার্ড সাহেবও কম যান না। বলছেন, ১০ বছরের চাকরি জীবনে কতবার বাঘের মুখে পড়েছেন, কতবার বাঘের হাতে মৃত মানুষের দেহ উদ্ধার করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি সব গল্প। হঠাৎ সবাই চুপ। মাটির ওপর বাঘের পায়ের কাঁচা ছাপ জানান দিচ্ছে তিনি এখান দিয়েই কোথাও গেছেন, মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় বইয়ে পড়া— রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যে পথ দিয়ে যায়, সে পথেই ফিরে আসে। অর্থাৎ উনি ধারেকাছেই কোথাও আছেন। অতএব সাবধান। গার্ডদ্বয় তাদের অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত। চলছে গুটি গুটি পায়ে হাঁটা আর ফিসফিসিয়ে কথাবার্তা। হঠাৎ পাশের ঝোপঝাড়ে আলোড়ন, সড়সড় শব্দ। হুঁশিয়ার বলে গার্ডের চিৎকার। আর অমনি ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এল আমাদের হারিয়ে যাওয়া গার্ড মহোদয় মুখে একগাল হাসি নিয়ে। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের সাহস জুগিয়ে যাওয়া আলি ভাই দাঁত কপাটি সাজিয়ে সোজা বেহুঁশ। আলি ভাইয়েরই বা দোষ কী? আমরা যে চলে এসেছি ভিন্ন এক দেশে, যে দেশ দাবড়ে বেড়ায় শৌর্যে, বীর্যে অদ্বিতীয় এক প্রাণী, সে যে বাঘ। এ যে বাঘের দেশ এখানে মানুষের মতো আগন্তুকদের তো এমনই হয়।

বাঘের দেশে আমাদের প্রবেশ গতকাল সন্ধ্যায়। সেই সাত সকালে সড়কপথে

ঢাকা থেকে যাত্রা করে বিকেলে খুলনা শহরে। তারপর রূপসার জলে বুক পেতে ভেসে থাকা ছোট জাহাজ 'ভেলা'তে চড়ে বসা। শুরু হল আমাদের সুন্দরবন অভিযান। লঞ্চের ডেকে বসে পরিচিতি পর্বের চেয়ে টেবিলে সাজিয়ে রাখা নাস্তাগুলোই যেন গুরুত্ব পেল বেশি। নদীর পাড়ের ডক ইয়ার্ডগুলোতে ক্লান্ত শ্রমিকের হাতুরির ঢং ঢং শব্দ যেন সন্ধ্যা আরতির প্রস্তুতির জানান দিচ্ছে। লঞ্চের ইঞ্জিনের একটানা শব্দে এর ব্যস্ততা টের পাচ্ছি, যে করেই হোক রাত নামার আগেই একে পৌঁছতে হবে মৃগমারি ফরেস্ট অফিসে। চাঁদের আলো তেজি হবার আগেই এসে পৌঁছলাম আজকের আশ্রয়স্থলে। কুয়াশার চাদরে ঢাকা এক মায়াময় পরিবেশে আজ আমাদের রাত্রিবাস মৃগমারি ফরেস্ট অফিসের সামনের নদীর ওপর। রাতের খাবার টেবিলে বসেই সুন্দরবন সম্পর্কে মোটামুটি এক্সপার্ট হয়ে উঠলাম আলি ভাইয়ের দৌলতে। প্রায় ১০,০০০ বর্গকিলোমিটারের বিশাল এলাকা জুড়ে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এই সুন্দরবন, যাকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করেছে। বনের ৬০৪০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল বাংলাদেশ অংশে আর বাকিটা ভারতের অংশে। বাংলাদেশে পড়েছে শতকরা ষাট ভাগের কিছু বেশি।

জীববৈচিত্রে ভরপুর সুন্দরবনের সুন্দরী, ধুন্দুল, বাইন, গেওয়া, কেওড়া, ওরা, কাকড়া, গর্জন, গড়ান, খোলসে, কৃপা, গোলপাতা গাছের ছায়ার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও ঘুরে বেড়ায় চিত্রাহরিণ, শুয়োর, বানর, মেছো বিড়াল, চিতা বেড়াল, বাগদাস, ভাম সহ আরও অনেক অনেক প্রাণী। ভ্রমণজনিত ক্লান্তিতে রাতের আড্ডাটা বেশিক্ষণ জমল না। গুটিগুটি পায়ে এসে বরাদ্দ করা কেবিনে হাজির হলাম। রুম পার্টনার আলি ভাই। নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছিল। এদিকে আলি ভাই ব্যস্ত ছোট একটা কৌটো নিয়ে, জিজ্ঞেস করতেই জানাল, ওটা সাপ তাড়ানো কার্বলিক অ্যাসিডের কৌটো। এই সুন্দরবনেই নাকি বাস করে এশিয়ার সবচেয়ে বিষধর সাপ ক্রেইট বা কালাজ, আর তাই এই বাড়তি সাবধানতা। বলে কী ? নিজের গরজেই একবার চেক করলাম কেবিনটা, তারপর সোজা কম্বলের তলায় গুটি পাকিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু তখনও আলি ভাইয়ের হাতে সুন্দরবন নিয়ে লেখা মোটা একটা বই। পরদিনের লেকচার রেডি করছে বোধহয়।

সকালটা যে এত চমৎকার হতে পারে তা এখানে না এলে বুঝতাম না। কেবিনের দরজা খুলতেই এক ঝাপটা কুয়াশামাখা ঠান্ডা বাতাস দেহ মনে এনে দিল আশ্চর্য এক সজীবতা। দুধসাদা কুয়াশার চাদরে ঢাকা চারদিক, দূরের ফরেস্ট অফিসটা এখনও ঝাপসা। জোয়ারের জলে পুষ্ট নদীর গা থেকে ওঠা ধোঁয়াশা, হালকা হাওয়ায় মিশে যাচ্ছে জঙ্গলের গভীরে। কোথায় যেন শুনেছিলাম বক-রা বেজোড় সংখ্যায় উড়ে বেড়ায়। প্রমাণ পাবার চেষ্টা করলাম বেশ কয়েকবার আকাশের দিকে চেয়ে, কিন্তু হার মানলাম ওদের ব্যস্ততার কাছে। এদিকে ব্যস্ততা অভিযাত্রীদের মধ্যে নৌকোয় চড়ে বনের শিরা-উপশিরায় ঘুরে বেড়াতে। নৌকো

চলছে ফরেস্ট অফিসের পাশ দিয়ে বয়ে চলা খাল দিয়ে। 'সাবধানে বাইয়েন ভাইয়েরা, কাল রাতে মামা খালে সাঁতার দিছে।— বনকর্মীরা আমাদের অভ্যর্থনা জানাল এভাবেই। সুন্দরী গাছের মরা আগায় বসে থাকা ঘুঘু দম্পতির সাংসারিক আলাপ আর আমাদের নৌকোর পানি-কাটা ছলাৎছল শব্দের যুগলবন্দী সঙ্গীত কর্ণকুহরে আরাম ঢেলে দিল। পাড়ের অনুচ্চ গাছের ডালে বসে লাল পেট আর জমকালো নীল ডানার মাছরাঙা সকালের নাস্তার আয়োজনে ব্যস্ত। খানিক বাদেই নৌকোর কাছ ঘেঁসে একটা ডলফিন গা ভাসিয়েই আবার ডুব দিল। মুহূর্তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল সবার মধ্যে। মওকা পেয়ে আলি ভাই আউড়ে দিলেন তাঁর জলজ জ্ঞান। সুন্দরবনের জলে ঘুরে বেড়ায় তিন প্রজাতির ডলফিন। এছাড়াও চিংড়ি, ভেটকি, কান মাগুর, পারসে, ভাঙান, চিত্রা, দাতনি, কাকমেল, মেদ সহ আরও অনেক প্রজাতির মাছ। খানিকটা যেতেই চোখে পড়ল রোদে পোড়া গোলপাতা গাছের সঙ্গে প্রায় মিশে যাওয়া এক শঙ্খচিল। গভীর মনোযোগ দিয়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ করছে। ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দে একপ্রকার বিরক্ত হয়েই উড়ে গেল জঙ্গলের অন্য কোনও শুনশান কোণে।

সকালের মিষ্টি হাওয়া গায়ে মেখে আমাদের ভেলা এগিয়ে চলল ঢেউ কেটে কেটে। পিছনে সঙ্গী হল এক দল গাংচিল, লঞ্চের প্রপেলারের আলোড়নে দিশেহারা ছোট ছোট মাছগুলোকে দিব্যি টপাটপ মুখে পুরছে নির্বিচারে। নদীর পাড়ে রোদ পোহানো কুমিরের দিবানিদ্রা ভঙ্গ হল লঞ্চের আওয়াজে আর 'ওই যে কুমির, ওই যে কুমির' রবে। সাদর সম্ভাষণ পেলাম কোকিলমণি বনবিভাগের কর্মীদের কাছ থেকে। যেন কতদিনের পরিচিত আমরা। হাত ধরে একে একে সবাইকে পার করালেন নড়বড়ে কাঠের জেটিটাকে। পার হবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকে মুগ্ধ হয়ে দেখলাম কাদার ওপর দুই মাড স্কিপার বা চিংড়ি মাছের লড়াই। পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রাণীদের উপেক্ষা করে কাদা মাটিতে মাখামাখি হয়ে লড়াই করে যাচ্ছে নিজের পৌরুষ জাহির করতে। কোকিলমণি তুলনামুলকভাবে কিছুটা ব্যস্ত জনপদ। বেশ কিছু বড় বড় নৌকো বাঁধা রয়েছে ঘাটে। অফিস ঘরের পাশেই রয়েছে মিষ্টি পানির এক পুকুর। যেখানে পানি খেতে ভিড় করে বনের প্রায় সব প্রাণী। দুদিন আগেও নাকি এক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বেশ খানিকটা সময় কাটিয়েছে এর ধারে। মোটেও সুখকর সংবাদ নয়। সুপেয় পানি সহযোগে খানিকটা মনুষ্য প্রোটিন গেলার ফন্দি যে তিনি আঁটবেন না হলফ করে কে বলতে পারে? অতএব পিঠটান দেওয়াই সমীচীন মনে হল। পরবর্তী গন্তব্য ঠিক হল টিয়ার চর। শ্বাসমূলের ফাঁকে ফাঁকে পা রাখতে বিশেষ কসরত করতে হচ্ছে। মাটিতে অসংখ্য পায়ের ছাপ আর দূরে তাদের মালিকেরা ভিরু নয়নে তাকিয়ে। আর আকাশে বহু উঁচু দিয়ে উড়ে যাওয়া উড়োজাহাজের শব্দ এখানে পৌঁছয় না শুধু দেখা যায় তার ছেড়ে যাওয়া ধোঁয়ার রেখা গাঢ় নীল আকাশের পটভূমিতে। হরিণের কেওড়াপাতা প্রীতির রহস্য অনুসন্ধানে ব্যস্ত আলি ভাইকে দেখলাম

কেওড়াপাতা চিবোতে। এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। ওই বাঘের পায়ের ছাপটিই সব গণ্ডগোল করে দিল।

আজ আর নড়ছি না কোকিলমণি থেকে। লঞ্চের ছাদে চেয়ার পেতে অপলক চেয়ে রইলাম তীরের দিকে। শেষ বিকেলের ব্যস্ততা সবার মধ্যে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে কেওড়া বনের ওপারে পৃথিবীকে লাল রঙে রাঙিয়ে। নদীর জলে তার দীর্ঘ প্রতিবিম্বে যেন রঙের হোলি খেলা চলছে। রাতের নিকষ অন্ধকারকে জয় করতে জেলেপল্লির ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল কুপির আলো। দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেন হাজার জোনাকি পোকা উড়ে বেড়াচ্ছে। ঠান্ডা জেঁকে বসছে গোটা অঞ্চলে। অন্ধকারে পথ হারিয়ে কেবিনে আশ্রয় নেওয়া শীতে কাতর ছোট পাখিটিকে হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে আগলে রাখল কেউ কেউ। রাতে টিভি রুমে চলল সুন্দরবনের বাঘ নিয়ে 'ইন সার্চ অব ম্যান ইটার্স' নামের ফিল্ম। আলি ভাই চুপচাপ উঠে চলে গেলেন রুমে। এই ফিল্মটি নিয়ে একটা চমৎকার গল্প শুনলাম ওই টিমের সদস্য বিশিষ্ট বাঘ-বিশেষজ্ঞ খসরু চৌধুরির কাছ থেকে। লন্ডনের শিকাগো ফিল্ম কোম্পানি ডিসকভারি চ্যানেলের জন্য তৈরি করছিল ফিল্মটি। সুন্দরবনের কটকা অঞ্চলে একটি সাদা গরু রেখে চলল বাঘের অপেক্ষা। ডিরেক্টর টেসা ম্যাকগ্রিগর আর ক্যামেরাম্যান ডেভিড হুকস তৈরি তাঁদের ক্যামেরা নিয়ে। পেরিয়ে গেল তিনটি দিন। বাঘ এর ধারেকাছেও এল না কেবল দূর থেকে লক্ষ রাখছিল। শেষে মরিয়া হয়ে টিভি টিম শরণাপন্ন হল খসরু চৌধুরির। তাঁরই পরামর্শে হরিণের গায়ের রঙের সঙ্গে মিল রাখতে লাল রঙের গরু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ওয়্যারলেসে সংবাদ গেল খুলনায়— লাল গরু, লাল গরু, রেড কাউ, রেড কাউ। দুদিন পর খুলনা থেকে এল রেড কাউ ব্যান্ডের গুঁড়ো দুধের বেশ কয়েকটি টিন। টিভি টিমের হতাশা আরও দীর্ঘস্থায়ী হল।

কোনও কারণ ছাড়াই ঘুম ভেঙে গেল মাঝ রাতে। কেবিন থেকে বেরতেই এক অপার্থিব জগতে পা রাখলাম। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে সারা সুন্দরবন। চাঁদের অমন তেজোদীপ্ত রূপ আগে কখনও দেখিনি। ধবধবে জ্যোৎস্নায় সুন্দরবনের গা ছুঁয়ে ছুটে আসা হিমশীতল বাতাসে ভর দিয়ে কুয়াশার দলকে জল ছুঁয়ে পালিয়ে যেতে দেখছি।

পুব আকাশের শুভ্রতা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে সারা আকাশে। নাম না জানা কোনও এক পাখি তারস্বরে জানান দিচ্ছে সে খবর। জেগে উঠছে সুন্দরবন। টের পাচ্ছি তার হৃদস্পন্দন। দীর্ঘ শীতল রাত পিছনে ফেলে জেগে উঠছে জেলে পল্লি। জেলে গৃহিণীর উনুনের ধোঁয়া আর সকালের কুয়াশা মিলেমিশে একাকার। বেরিয়ে পড়ছে কেউ কেউ ছোট ডিঙি নৌকো নিয়ে চিংড়ি পোনা ধরতে। অক্টোবর থেকে মার্চ, এই ছয়টি মাস তাদের মাছ ধরার সময়। বছরের বাকি দিনগুলোতে বৈরী আবহাওয়াতে সুন্দরবনে বাস করাটাই কঠিন হয়ে যায়। মাছ ধরা তো অনেক দূরের কথা।

আবার আমাদের ছুটে চলা। আজকের গন্তব্য দুবলার চর। খানিকটা ধীরেসুস্থে চলছে আমাদের লঞ্চ। নদীর অগভীর অংশে কোমর পানিতে নেমে মেয়েরা চিংড়ি পোনা সংগ্রহে ব্যস্ত। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জন্য এর চেয়ে সহজ শিকার বোধহয় আর হয় না। জীবন বাঁচাতে জীবন বাজি রেখে কাজ করা লোকগুলোর সামনে লজ্জায় হেঁট হয়ে এল আমাদের শহুরে মাথাগুলো। সুন্দরবনে গাছ কাটা নিষিদ্ধ হলেও এখনও কিছু বাওয়ালির দল সুন্দরবন চষে বেড়ায় গাছপাতা সংগ্রহে। অন্যদিকে মৌয়ালরা মার্চ-এপ্রিল, মধু সংগ্রহ করে। আর তাই প্রতি বছরই এখানকার কোনও না কোনও পরিবারে কান্নার রোল ওঠে। কেউবা বেঁচে থাকে জীবন্মৃত হয়ে, মনু মোল্লার মতো অপলক বনের দিকে তাকিয়ে। খানিকটা পথ যেতেই চোখে পড়ল বন্য ভোদরকে পোষ মানিয়ে মজার এক কৌশলে মাছ ধরার দৃশ্য। নৌকোর একধার দিয়ে জাল নামিয়ে পানিতে ছেড়ে দেওয়া হয় ভোদরগুলো, যারা আশপাশের মাছ তাড়িয়ে নিয়ে আসে জালের ওপর। তারপর জেলের দ্রুত টানে জালে আটকা মাছ জেলের নৌকোয় ঠাঁই পায়।

হঠাৎ করেই লঞ্চের দুলুনিটা বেড়ে গেল। টের পেলাম আমরা নদী ছেড়ে সাগরে চলে এসেছি। খানিকটা সাগর পাড়ি দিয়ে দূরের আবছা ভুমিটাই দুবলার চর। আলি ভাই আজ অনেকটাই স্বাভাবিক। দুবলার চরের ওপর ছোটখাটো একটা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁসে বিস্তীর্ণ বেলাভূমি নিয়ে যে দুবলার চর তার আরেক নাম আলোর কোল। এখানে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় উৎসব। সবচেয়ে বড় মেলা, রাসমেলা। এই রাস মেলার শুরু ১৮৫৬-৬০ সালের মধ্যে, প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপে যে মেলা মকরসংক্রান্তি উদযাপন উপলক্ষে যে পুণ্যস্নানের আয়োজন হত তাতে দূরত্বের কারণে দক্ষিণ বরিশাল, খুলনা এলাকার লোকজন অংশগ্রহণ করতে পারত না, বাধ্য হয়ে এ এলাকার লোকজন মরাপশর নদীর পূর্বপাড়ে সাগর সংলগ্ন বর্তমান অফিস কিল্লা এলাকায় সাগরমেলা শুরু করে। কাদায় চর পড়ে যাওয়ায় মেলা সরিয়ে বর্তমানে দুবলার চরে স্থানান্তরিত করা হয়। মেলা কার্ত্তিক মাসের রাসপূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়। মূল অনুষ্ঠান তিনদিনব্যাপী লীলাকীর্তন, গঙ্গা, মৎসাবতার, রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মীর উপাসনা ও পূর্ণিমার ভোরে স্নান করে পাপমোচনের মাধ্যমে মেলার আয়োজনের শেষ হয়। মেলার মূল আরাধ্য দেবী কমলেকামিনী, গঙ্গার অন্যরূপ। মেলার দিনগুলোতে সর্বসম্প্রদায়ের লোকজনের পদভারে, তাদের কলকাকলিতে মুখরিত থাকে সুন্দরবনের এই অংশটা। শত শত ইঞ্জিনের নৌকোয় করে দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসে হাজারো মানুষ। ঢোল, হারমোনিয়াম, কাঁসা, মন্দিরার নাচন ধরানো ছন্দে দেবতার সন্তুষ্টির গান গেয়ে চলে দিন রাত। রাসপূর্ণিমার ভোরে পুণ্যার্থীরা দেবতার উপঢৌকন নিয়ে সার দিয়ে বসে যায় সাগরের দিকে মুখ করে, চলে বন্দনা। শেষে ভরা জোয়ারে সাগর জলে ডুব দিয়ে পাপ মোচনের বিশ্বাস নিয়ে

বাড়ি ফিরে যায় সবাই। দূরে আবছা সাগর পাড়ি দেওয়া জাহাজ। পেট ভর্তি মাল-সামান নিয়ে কোথায় চলেছে কে জানে? ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে দুবলার চর। সার দিয়ে বেঁধে রাখা মাছ ধরা নৌকোগুলো কী চমৎকারভাবেই না দুলছে। বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে ঢেউ আয়েসি ভঙ্গিতে। দূর থেকে দেখা সাগর পাড়ে একঝাঁক গাঙ্গচিল উড়ে যায়। তীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে নোঙর ফেলল আমাদের লঞ্চ। পাড়ে নেওয়ার দায়িত্ব স্পিডবোটের। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে একটি মাছ ধরার নৌকো, ভীষণ তাড়া তার। নৌকোর খোলে রাখা মাছগুলো পাড়ে নামিয়ে তবেই যদি মেলে কিছুটা বিশ্রাম। সসম্মানে ছেড়ে দিলাম তাকে। দুবলার চরে পাখিদের ব্যস্ততার যেন শেষ নেই। এত পাখিও আগে কখনও দেখিনি। বিস্তীর্ণ বেলাভূমিটা খাঁ খাঁ করছে। সূর্যের আলোয় ঝিকঝিকে বালুতে ধাঁধা লাগানো চোখ নিয়ে নৌকো ভেড়ালাম চরের ঘাটে। আপনজনের আন্তরিকতা মেশানো হাসি দিয়ে আমাদের বরণ করে নিল জেলেরা। চারদিকে কেবল মাছ আর মাছ। জেলেরা তাদের মাছ এনে নামাচ্ছে ঘাটে আর তা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পর রাখা হচ্ছে সূর্যের নীচে শুকানোর জন্য। পরবর্তীতে এই শুকনো মাছ যার স্থানীয় নাম শুঁটকি চলে যায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। বাঁশ আর ছনে তৈরি ঘরগুলোতে শুঁটকির স্তূপ। বিশাল বিশাল জাল শুকানো হচ্ছে পরবর্তী যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে। রান্নার হাড়ি চড়েছে কোথাও কোথাও। দলা পাকানো ভাতের সঙ্গে মাছের ঝোল দিয়ে তৃপ্তি সহকারে খেতে দেখলাম কয়েক জনকে। প্রায় প্রতিটি ঘরের নীচেই দেখলাম মাটির বিশাল সব হাড়ি ভর্তি মহামূল্যবান মিষ্টি পানি। প্রতিটি ফোঁটা খরচ করতে হয় হিসেবে করে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলেরা ছয় মাসের জন্য ঘাঁটি গাড়ে এখানে। জেলেপাড়ার একমাত্র ডাক্তার আব্দল জব্বার। বাঁশের মাথায় সাদা কাপড়ে তার নাম লেখা পতাকাটি পতপত করে উড়ছে বাতাসে। কেবল পতাকাই আছে, ডাক্তার নেই। নিউজিল্যান্ডের দম্পতি ডেনিস ও তাঁর স্ত্রীর খুব শখ হল লঞ্চের পিছনে উড়ে বেড়ানো পাখিদের নিজের হাতে খাওয়াবেন। তিন-চারটি ছোট মাছ চাইতেই তাঁদের হাতে জুটে গেল ২-৩ কেজি মাছের এক ব্যাগ। ভিনদেশি মানুষদুটোর জন্য সবার তরফ থেকে উপহার। এরই মধ্যে একপাশে চলছে পুজো অর্চনা। আজই বেরিয়ে যাবে তারা সাগরে। বেশ কিছু শিশুর দেখা পেলাম এখানে। এক মনে কাজ করে যাচ্ছে তারা আর বিষণ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। এমন মনখারাপ করা চাহনি আগে দেখিনি। ছ-মাসের জন্য তাদের ভাড়ায় নিয়ে আসা হয় এই কঠিন প্রান্তরে। যে বয়সে এইসব শিশুদের দলবেঁধে স্কুলে যাবার কথা, সে বয়সে তারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে অল্প কিছু অর্থের জন্য। সুন্দরবন ভ্রমণের এই অংশটাই মনের মধ্যে গভীর বিষাদের ছায়া হয়ে রইল। খানিকটা শহুরে আদর জানিয়ে চড়ে বসলাম লঞ্চে হিরণ পয়েন্টের উদ্দেশে। পিছনে পড়ে রইল দুঃখী শিশুদের কচি মুখগুলো।

দূর থেকে দেখা নীলকমল ফরেস্ট অফিসে বিশাল সাইনবোর্ডের পাঠোদ্ধার করার প্রতিযোগিতা চলল বেশ খানিকক্ষণ। সাইনবোর্ডের লেখাও পরিষ্কার হল। সেই সঙ্গে পরিষ্কার হল বনকর্মীদের উৎসুক মুখ। সবকিছুকে পিছনে ফেলে লঞ্চ চলল হিরণ পয়েন্টের দিকে। পাড় ঘেঁসা বনে যেন আহার পর্ব চলছে। চিত্রা হরিণের দল একমনে হেঁটে খাচ্ছে কেওড়া গাছ। একদল বানরকে দেখলাম কাদামাটি থেকে গাছের মূল তুলে নোনা জলে ধুয়ে মুখে পুরছে আপন মনে। এক ভোঁদর পরিবারকে দেখলাম দ্বিপ্রাহরিক খাবারের সন্ধানে ইতিউতি ঘুরতে। লঞ্চ ঘাঁটি গাড়ল হিরণ পয়েন্টে, উঁচু রংচংয়ের ওয়াচ টাওয়ারটির সাড়া উপেক্ষা করতে পারলাম না, উঠে পড়লাম তার মাথায়। কী সবুজ চারপাশ। দিগন্ত জুড়ে কেবলই সবুজের ছোঁয়া। ভাবতেই ভালো লাগছে এই সবুজের ছায়াতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে চারশোর বেশি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। কী বিশাল তার সাম্রাজ্য। ডেনিশকে বললাম, তোমার কালো চশমাটা খোল, দেখ কেমন সবুজ এ দেশ। হলদে রঙের কাঠঠোকরাটা কী আপনমনেই না ঠুকরে যাচ্ছে গাছ। একদল হরিণের একসঙ্গে ছুটে যাওয়া কিসের আন্দাজে তা নিয়ে রীতিমতো চিন্তার পড়ে গেলেন আলি ভাই। শেষ বিকেলটা কাটালাম নীল কমল বনঅফিসে। পুরো এলাকাটা যেন একটা গ্যাস চেম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে। পুকুর থেকে, নলকূপ থেকে, বিভিন্ন স্থান দিয়ে বেরিয়ে আসছে গ্যাস। শহুরে লোকদের চমকে দেওয়ার সুযোগ ছাড়বে কেন তারা? নলকূপে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সত্যিই অবাক করল আমাদের। একশো গজ দূরের হরিণের দলকে আরও কাছে আনার জন্য কেওড়াপাতার জন্য হুড়োহুড়ি পরে গেল। রাতে আয়োজন করা হল বার-বি-কিউ ডিনারের। সে এক এলাহি আয়োজন, যাকে বলে জামাই আদরে আপ্যায়ন। সুন্দরবনে এটাই শেষ রাত। তাই একে স্মরণীয় করে রাখতে প্রস্তাব করা হল নৌকো নিয়ে জঙ্গলে বেরিয়ে পড়ার। অতি উত্তম প্রস্তাব বলে রাজি হয়ে গেলাম আমরা। আলি ভাইও তাঁর হারানো ভাবমূর্তি ফিরে পাবার সুযোগটা ছাড়লেন না। গভীর রাতে চলছে আমাদের নৌকো খালের তীর ঘেঁসে। টর্চের জোরালো আলোতে জ্বলজ্বল করছে অনেক জোড়া চোখ। চাঁদের আলোয় ছয়লাপ চারদিক। নাম না জানা এক প্রাণীর আর্তচিৎকারে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। পৃথিবীর এই রহস্যময় প্রান্তে আমরা কজন যেন পথ হারানো মানুষ, চলছি অজানা গন্তব্যের দিকে। কেটে গেল দীর্ঘক্ষণ। এবার ফেরার পালা। কাল খুব ভোরে শুরু হবে ফিরতি যাত্রা।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

সুন্দরবনের তাঁবুতে রাত্রিবাস

মহাশ্বেতা সমাজদার

২০০৪-এর ডিসেম্বরের এক সকালে গোলপার্কের মৌচাকের সামনে থেকে গাড়িতে যাত্রা শুরু করে ডায়মন্ডহারবারের 'সাগরিকা' ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছলাম প্রায় দশটায়। সেখানে প্রাতরাশ সেরে আরও ঘন্টাদুয়েক পর রায়দিঘি।

রায়দিঘি থেকে বোতলের জল কিনে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বনদপ্তরের লঞ্চে উঠে বসলাম। আমাদের দশজনের দলের সঙ্গে আছেন বনবিভাগের ডি এফ ও। তাঁরই নির্দেশে রায়দিঘির বাজার থেকে দ্রুত ডেকচি, বালতি কিনে রায়দিঘির 'বিজয় হোটেল' থেকে মধ্যাহ্নভোজ সংগ্রহ করেই লঞ্চের যাত্রা শুরু হল। চলেছি সুন্দরবনের গভীরে।

মুনি নদী দিয়ে লঞ্চ চলেছে। হালকা সবুজ জল, দুপাশে সুন্দরবনের খাঁড়ি আর দ্বীপ। সুন্দরবনের এই শিরা-উপশিরার মতো খাঁড়ির সবকটির নামকরণও হয়নি। দ্বীপে ম্যানগ্রোভ অরণ্য। এখন ভাটা চলছে, তাই পাড়ের কাদায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য শ্বাসমূল।

লঞ্চের ডেকে চেয়ার পাতা। প্রাণ-জুড়নো হাওয়া লাগছে গায়ে। ডেকের ঠিক মাঝখানটায় গদি মোড়া, ইচ্ছে করলে দু-চারজন গড়িয়েও নিতে পারেন। এরই মধ্যে মাঝেমাঝেই চা এসে যাচ্ছে।

দুপুর আড়াইটে নাগাদ আমরা ঠাকুরান নালায় পড়লাম। লঞ্চের পেটের মধ্যে মধ্যাহ্নভোজন। প্লাস্টিকের চেয়ার টেবিল পাতা খাওয়ার ঘরের একপাশে বেসিন। দুটি বাথরুম, একচিলতে একটি শোবার কুঠুরি আর রান্নাঘরও আছে লঞ্চের মধ্যেই। খাওয়া হল গরম ভাত, ডাল, বেগুনি, পারশে আর রুই মাছের ঝোল।

তারপর আবার খোলা হাওয়ায় বসে সবুজ সব দ্বীপের দিকে চেয়ে থাকা। এখন আমরা চলেছি ওলিয়ান নালার ওপর দিয়ে। কোথাও কোথাও কাদা খুঁটছে কাদাখোঁচা পাখি। আর কত যে জানা-অজানা পাখি সামনে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তার লেখাজোখা নেই। প্রায়ই দেখলাম জল প্রায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে সারিবদ্ধ পাখি।

সূর্যও ইতিমধ্যে নেমে আসছে। আমরাও নামলাম 'বনি' ইকো ক্যাম্পে। দ্বীপে জনমানুষ থাকে না, থাকার বলতে একটা ওয়াচটাওয়ার আর পর্যটকদের জন্য দুটি তাঁবু ও একটি কটেজ। আর বনদপ্তরের একটি ছোট মিউজিয়াম। বনি

ওয়াচটাওয়ার থেকে সূর্যাস্ত দেখব বলে আমরা এসেছি। তাই সূর্য ডোবার আগেই ওয়াচটাওয়ারে ওঠার জন্য পড়ি-মরি করে ছুট লাগালাম। ওয়াচটাওয়ারের ওপর থেকে পশ্চিমে সুয়া আর সুন্দরীকাঠি নদীর সঙ্গম স্পষ্ট বোঝা যায়। একটু দূরের চওড়া মাতলাকেও আলাদা করে বোঝা যায়। এটা ত্রিবেণী সঙ্গম। পূর্বে ঘন জঙ্গল, তার মধ্যে কড়া নজর চালালে এক-আধটা হরিণ-বুনোশুয়োরের দেখা মিলতেও পারে।

ওয়াচটাওয়ারে খানিকটা সময় কাটিয়ে যখন নীচে নামলাম ততক্ষণে সন্ধে নেমেছে। আমাদের তৎক্ষণাৎ লঞ্চে ফিরতে বলা হল। কারণ এই দ্বীপে বাঘেরা নিয়মিত পদচারণা করে। এবং স্থানীয়দের মতে, এই অঞ্চলের বাঘেদের কাছে মানুষ অত্যন্ত প্রিয় শিকার। তার প্রথম কারণ খাদ্য হিসেবে মানুষ সুস্বাদু আর দ্বিতীয় কারণ শিকার ধরতে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয় না। এতক্ষণ লক্ষ করিনি, এখন দেখলাম আমাদের লঞ্চে বন্দুকধারী বনকর্মীও আছেন। তাঁরা চলেন সবার আগে আগে, তাই এঁদের বলা হয় অ্যাডভান্স টিম। যাইহোক অন্ধকারে লঞ্চে উঠে বসলাম। এবার শুরু হল অন্ধকারে জলযাত্রা।

কৃষ্ণপক্ষের ম্লান আলো ছড়িয়ে আছে জলে, জঙ্গলে। চারপাশের কোনও দ্বীপে কোনও জনমানব নেই। লঞ্চের সুচালো অগ্রভাগটা কেন সাদা রং করা এতক্ষণে বোঝা গেল। ওই সামান্য আকাশের আলো পড়ে ওইটুকু অংশই কেবল দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এই দেখেই সারেং পথ ঠাহর করছেন। আর একেবারে সামনে একজন সাহায্যকারীও বসে আছেন। তিনি শুধু বালতি বালতি জল ঢেলে ওই সাদা অংশটুকুকে অক্ষুণ্ণ রাখছেন আর মাঝে মাঝে হেঁকে উঠছেন—'বাঁয়ে চর, ডানে চাপো।' বা 'ডানে চর, বাঁয়ে যাও।' আর সারেং মাঝে মাঝে পথ শুধোচ্ছেন—কোথা যাব?

নিঃসীম অন্ধকারে এতগুলো শহরের মানুষ বসে আছি—বাক্যহারা। আবছা জ্যোৎস্নামাখা সুন্দরবনের এই রূপ যেন শুধু চোখে দেখার নয়, আর সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করার। এরই মাঝে মুড়ি-চানাচুর আর বেগুনি এসে গেল কাগজের থালা করে। বেশ কয়েকবার চা এসে গেল যার যেমন পছন্দ—দুধ চা, লিকার, লেবু চা। প্রায় নটা নাগাদ লঞ্চ এসে থামল বিজন দ্বীপ ধুলিভাসানি-৮-এ। এখানেও 'বনি'-র মতোই ব্যবস্থা। তবে, ওয়াচটাওয়ার অত উঁচু নয়। থাকার জন্য দুটি তাঁবু আছে, একটি কটেজও আছে। জেনারেটরের সাহায্যে আলো জ্বলে। তাঁবুর মধ্যে আটটি ক্যাম্পখাট পাতা। লাগোয়া বাথরুমে বেসিন, কমোড সবই আছে। জলের ধারাটি একটু ক্ষীণ। কটেজেও সবধরনের আধুনিক সুযোগসুবিধা আছে। ডিসেম্বরের রাতে সুন্দরবনের দ্বীপে বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়ে ক্যাম্পফায়ার হল। বনকর্মী পরেশবাবু গান গেয়ে শোনালেন দুখে, দক্ষিণরায় আর বনবিবির গল্প।

তিন লঞ্চভর্তি অতিথি, বনকর্মীদের ভিড়ে জমজমাট ক্যাম্পফায়ারের পর আলো জ্বলে উঠল। নৈশভোজে ভাত আর দিশি মুরগির ঝোল।

শোবার সময় ডি এফ ও সাহেব জানতে চাইলেন আমরা ঘরের আলো নেভাতে চাই কি না, নেভালে দ্বীপের অন্য সব আলোও নিভে যাবে। অর্থাৎ জেনারেটর চালু থাকলে সব জ্বলে, বন্ধ হলে সব বন্ধ হয়। ডি এফ ও সাহেব অবশ্য আলো জ্বালিয়ে রাখারই পক্ষে। কারণ এ দ্বীপভূমি আসলে বাঘেদেরই। তাই আলো জ্বালিয়ে রাখাটাই মানুষের পক্ষে নিরাপদ।

পরদিন ভোর সাড়ে চারটেয় আবার ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমাদের লঞ্চযাত্রা শুরু হল। এবার আমরা চলেছি জিঞ্জিরা ভারানি দিয়ে, গন্তব্য কলস দ্বীপ। কলস দ্বীপে যখন পৌঁছলাম তখন দিকচক্রবালে সামান্য মেঘ, আকাশে হাল্কা আলো। এবার আমরা জনাকয়েক উঠে বসলাম স্পিডবোটে।

স্পিডবোট দৌড় শুরু করল পূর্বদিকে। আর একেবারে জল থেকে একগজ ওপরে লাল টকটকে থালার মতো সূর্য। খানিকদূর যাবার পর চালক জানাল, এরপর থেকে বাংলাদেশ। তাই আমরা ফিরে চললাম কলস দ্বীপে। এখন সমুদ্রে ভাটার টান চলেছে। নাহলে সমুদ্রস্নানও সম্ভব কলসের সৈকতে। জুতো খুলে রেখে, প্রায় হাঁটুজলে নেমে পড়লাম। এখান থেকে হেঁটে উঠলাম কলস দ্বীপে। জোয়ারের সময় যে সব জায়গা জলপূর্ণ থাকে এখন সে সব জায়গায় থকথকে কাদা। কোথাও পা ডুবে যায় গোড়ালি পর্যন্ত, কোথাও তারও বেশি। সেই কাদায় অসংখ্য হরিণের খুরের ছাপ, বুনোশুয়োরের পায়ের ছাপ তো রয়েছেই, একটা বাঘশিশুর বাতাসার মাপের থাবার টাটকা ছাপও দেখলাম। সে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সোজা সমুদ্রে গেছে। হয়তো জল খেয়ে অন্য পথে ফিরেছে, বা সাঁতরে অন্য কোনও দ্বীপে গেছে। প্রমাণসাইজের একটি ব্যাঘ্রদম্পতির চিহ্নও পাওয়া গেল।

কলস দ্বীপে বনদপ্তরের বানানো মিষ্টি জলের পুকুরটি ভারি ভালো লাগল। সর্বব্যাপী নোনাজলের মাঝে এই পুকুরটি বন্যদের কাছে যেন সরবতের ভাণ্ড। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সেখানে গিয়ে দেখি পুকুর-পাড়ের এঁটেল মাটিতে চারটি মস্ত থাবার টাটকা ছাপ। ডি এফ ও সাহেব বললেন, এই থাবার মালিক একটি পুরুষ বাঘ। পুকুরের পাড়ের কাদায় সামনের দুটি পা গেঁথে দিয়ে সে জল খেয়েছে একটু আগে।

ভাটার সমুদ্রে সামান্য পা ভিজিয়ে আবার লঞ্চে উঠে বসি। ধুলিভাসানি—যার এখনকার নাম কলস ইকো ক্যাম্প— পৌঁছে তাঁবু থেকে মালপত্র নিয়েই আবার লঞ্চে। এই নদীর নাম চুলকাঠি ভারানি।

লঞ্চেই একফাঁকে প্রাতরাশ, স্নান ইত্যাদি সেরে নিয়ে চারদিকের নদীর জালিকা দেখা, পাখি দেখা। অসীম জলের জগতে ভাসতে ভাসতে জনহীন একেকটি সবুজ দ্বীপ দেখতে দেখতে পেরিয়ে যাওয়া।

হঠাৎ শোরগোল শুনে চমকে উঠি। বনদপ্তরেরই আরেকটা লঞ্চ বার্তা নিয়ে এসেছে—সোমবারের বাজারে বাঘ উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। ডি

এফ ও সাহেব বুঝিয়ে বলেন, 'সোমবারের বাজার' একটি জনবহুল দ্বীপের নাম।

বাঘকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানো বনদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সুন্দরবনের বাঘ এবং মানুষ এত কাছাকাছি থাকে বলে এবং দু-পক্ষই জঙ্গলের ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে বলে এরা পরস্পরের শত্রু। আক্রমণ না করলে আক্রান্ত হতে পারি—এই মনোভাব দুপক্ষেরই। তাই লোকালয়ে বাঘ চলে এলে এতকাল মানুষের আক্রমণেই তাকে মরতে হত। হালে বনদপ্তর, এন জি ও প্রভৃতির কর্মীরা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পেরেছে, বাঘের বেঁচে থাকা কেন মানুষের বেঁচে থাকার জন্যই দরকার। তাই আজকাল বাঘ পড়লে লোকে বনদপ্তরকে খবর দেয়। বাঘকে জঙ্গলে ফিরে যেতে সাহায্য করে।

যাই হোক, দুয়েকজন বনকর্মীকে আমাদের দায়িত্ব দিয়ে বাকিরা চলে গেলেন সোমবারের বাজারে।

আমরা চললাম ভগবতপুর কুমির প্রকল্পে। সেখানে সুস্বাদু মধ্যাহ্নভোজন আর গোটা পঞ্চাশেক নানা মাপের কুমির দর্শন হল। তারপর আবার সেই হালকা সবুজ জল আর গাঢ় সবুজ জঙ্গল দেখতে দেখতে নামখানার পথে এগিয়ে চলা।

নামখানা থেকে সন্ধে ছটায় গাড়ি করে কলকাতা ফেরা।

'ভ্রমণ' ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

কেদারনাথে মরসুমের শেষ যাত্রী

হিমানন্দ হিমাংশু

মাকে তীর্থ করাতে নিয়ে যাব হরিদ্বার। ১৪ অক্টোবর দুন এক্সপ্রেসে উঠব হাওড়া থেকে। মনে মনে কেদারনাথ দর্শনের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। ছুটলাম ব্র্যাবোর্ন রোডে উত্তরপ্রদেশ পর্যটনের অফিসে। ওঁরা বললেন, ১৮ অক্টোবর দীপাবলি। দুপুরে মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি ১৬ তারিখ হরিদ্বার পৌঁছবেন। ১৭ তারিখ ভোরের বাস ধরে সন্ধ্যায় গৌরীকুণ্ড। ১৮ তারিখ ভোরে বেরিয়ে দুপুর ১২টার মধ্যে কেদারনাথে পৌঁছবেন। সব ঠিকঠাক চললে দর্শন হয়ে যাবে। চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

ট্রেন লেট। ১৬ তারিখে বেলা ১১টায় হরিদ্বার। বড় রাস্তার ওপারেই গুজরানওয়ালা ধর্মশালায় সুন্দর বড় ঘর। আমাদের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল। কনিষ্ঠ আমার ছোট বোন— তারও ৫০ ছুঁই ছুঁই। আমার বয়স ৫৬।

স্নান-খাওয়া সেরেই মার কাছে ৩ দিনের ছুটি চাইলাম। তড়িঘড়ি বাসআড্ডায় এলাম। রাত পোহালে ভোরের একটা বাস আমাকে ধরতেই হবে। কিন্তু খবর শুনে হতাশ হয়ে পড়লাম। হরিদ্বার কিংবা হৃষীকেশ থেকে আগামীকাল কোনও সরকারি বাস গৌরীকুণ্ড যাবে না। প্রথম কারণ শেষদিনের জন্য যাত্রী নেই, তাছাড়া দেশ জুড়ে ডিজেলের প্রচণ্ড অভাব। এমনিতেই বাস বসে গেছে। ছুটলাম পাঞ্জাবিদের গুমটিতে। ওদের একটা বাস ভোর ৫টায় গৌরীকুণ্ডের উদ্দেশে ছাড়বে— তবে পৌঁছবার কোনও গ্যারান্টি নেই। বাসটি লোকাল বাসের মতো যাবে— ঝিকির ঝিকির করতে করতে। ওরা বলল নসিব ভালো থাকলে পৌঁছে যাবেন।

১৭ অক্টোবর ভোর ৫টায় বাস ছাড়ল। হৃষীকেশ লছমনঝোলা ছাড়িয়ে এই প্রথম আমি গিরিরাজের অন্দরমহলে প্রবেশ করলাম। আশ্চর্য এক স্বপ্নরাজ্যের মধ্য দিয়ে সাঁঝ আঁধারে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে গেলাম।

গৌরীকুণ্ড শুনশান। দোকানপাট সব বন্ধ। কাল দেওয়ালি। সব লোক বাড়ি চলে গেছে। গুপ্তকাশী, উখিমঠ আর রুদ্রপ্রয়াগ অঞ্চলে এদের বাড়ি। একজন বৃদ্ধ একটা দোকানে বসে আছে। এটাই তার বাড়ি। নীচে ছোট্ট দোকান— ওপরে কাঠের দু-তিনখানা ঘর। যাত্রীদের ভাড়া দেওয়া হয়। দশ টাকায় রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা হল।

কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম। ছোট ঘর, বিছানা পাতা আছে। মালপত্র বলতে একটা ঝোলা। ওতে আছে টুকটাক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আর বাড়তি শীতবস্ত্র বলতে একটা হাফ সোয়েটার, একটা ড্রয়ার, একটা মাফলার, একটা মাঙ্কিক্যাপ, একজোড়া গ্লাভস, একজোড়া মোজা। আর আছে ফুটবল মাঠে ব্যবহারের জন্য পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি কেনা একটা জাপানি রেনকোট। রেনকোটের যা অবস্থা— তাতে কিছু শীত আটকালেও জল-ঝড়ে রক্ষা করতে পারবে না। ফুল সোয়েটারটা ইতিমধ্যেই গায়ে উঠেছে।

রাত নেমেছে, শীত বাড়ছে। বিছানা ছেড়ে বারান্দায় দাঁড়ালাম। হাওয়া আর কনকনে ঠান্ডা কিসের যেন অগ্রিম সংকেত দিল। হিমালয়ের জল ঝড় হাওয়া তুষারপাত প্রকৃতপক্ষে কতটা মারাত্মক, তার কোনও বাস্তব অভিজ্ঞতাই আমার নেই।

যাকগে, এখন তো আকাশ অজস্র তারার মুক্তো-অঞ্চল সাজিয়ে বসে আছে। যেদিকে তাকাই ফিকে অন্ধকারের বুকে ঘন অন্ধকার পাহাড়। শনশন হাওয়া— মন্দাকিনীর বিরামহীন গর্জন আর নীচে গৌরীকুণ্ডের বন্ধ আঁধারি ঘরবাড়ি।

নীচে নেমে এলাম। দোকানে কম্বলমোড়ানো বৃদ্ধ বসে আছে। মোমবাতি টিমটিম করছে। খাবার পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাওয়ায় বলল, এগিয়ে যাও। দুটো হোটেল আজও খোলা আছে। একটা বাঙালির ভাত-ডাল-ডিমের ঝোল, উল্টোদিকে পাঞ্জাবির রুটি তরকা। বাঙালির ওখানে ১০-১২ জন শেষদিনের তীর্থযাত্রী। ঢুকে পড়লাম। এদের মধ্যে তিনটি দম্পতি সহ আটজন বাঙালি। দক্ষিণ ভারতের চারজন। ওরা বলল, ভোর সাড়ে চারটায় বেরিয়ে পড়বেন। সামনে এগিয়ে গেলে ঘোড়া পাবেন।

ঘোড়া আমার হিসেবের মধ্যে নেই। টাকাপয়সার হিসেব নয়। জীবনদর্শনের হিসেব। ঘোড়ায় চড়ে কেদারদর্শনে যাত্রা— ওটা ভাবতে খারাপ লাগে। পা দুটো আছে কী করতে? মাত্র ১৪ কিলোমিটার রাস্তা! বড়জোর ঘণ্টাচারেকের মামলা।

পা দুটোর ওপর আমার অগাধ আস্থাটা যে দম্ভের পর্যায়ে পড়ে তখন তা বুঝতে পারিনি।

খেয়ে ঘরে ফিরলাম। ঘুম যেন চারটের আগেই ভাঙে।

ঘুম ভাঙল। কিন্তু এত তর্জন-গর্জন কিসের? মুহুর্মুহু বজ্রপাত কেন? কাঠের বাড়ি কেঁপে উঠছে। টর্চের আলোয় দেখলাম ঘড়িতে রাত দেড়টা। থিতু হতেই বুঝলাম, ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত আর মন্দাকিনীর গর্জন— সব মিলেমিশে তাণ্ডব চলছে। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। হায় হায়। এখন কী হবে? এরকম কতক্ষণ চলবে? সব যে পণ্ড হবে। একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে এখন শুধুই অপেক্ষা। চারটে বাজতে চলেছে। নামেই ভোর, আসলে রাত্রি। হাওয়ার দাপট নেই, তবে বৃষ্টি আছে, অনেক কমে গেছে কিন্তু ঝিরঝিরে বলা যাবে না। প্রচণ্ড শীত। এবারে সব জামাকাপড় গায়ে চড়ালাম। মাঙ্কিক্যাপটাকে গামছা দিয়ে জড়িয়ে ঘাড়-গর্দানে

টেনে দিলাম। ওপরে সেই হতভাগা রেনকোট। নীচে নামলাম। বৃদ্ধ বসে আছে। একটা লাঠি দিল, ভাড়া দু টাকা। ইতস্তত করছি, ভাবছি বৃষ্টি একটু কমে কিনা দেখি। বৃদ্ধ বলল, বেরিয়ে পড়ো, মন্দির বারোটায় বন্ধ হবে। জয় বাবা কেদারনাথজি।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৃদ্ধের উপদেশে লাঠিটা নিলাম। লাঠি মানে পরনির্ভরতা। অন্যের বলে চলব কেন? কিন্তু পরনির্ভরতা আর পরমনির্ভরতা দুটো আলাদা ব্যাপার। লাঠি আমাকে পর আর পরমের পার্থক্য কী তা উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়েছিল। হিমালয়ের পথে সেই যে লাঠি ধরেছি— আজও তা ছাড়িনি।

সাড়ে চারটে। রাস্তায় নেমেছি। বৃষ্টি কমে প্রায় ঝিরঝিরে। এখনও বাতাস আছে। কনকনে। রাস্তা একটাই। ডাইনে-বাঁয়ে সব নিঝুম। শুধু মন্দাকিনীর গর্জন। একটু নীচেই আস্তাবল। ১৫-২০টা ঘোড়া এখনও আছে। আমাকে দেখে সব একযোগে ছেঁকে ধরল। কোনওরকমে তাদের প্রত্যাখ্যান করে এগিয়ে চললাম।

হালকা চড়াই। এক কিলোমিটারের মতো এসেছি। আর চলতে পারছি না। হাঁপ ধরে গেছে। বসে পড়লাম। চোখে পড়ল— লেখা আছে উচ্চতা ৫,৫০০ ফুট। চকিতে মনে পড়ল কেদারনাথের উচ্চতা ১১,০০০ ফুটের ওপরে। তার মানে প্রায় ৬,০০০ ফুট চড়াই ভাঙতে হবে— বাকি ১৩ কিলোমিটার রাস্তায়। সামান্য চড়াইপথে মাত্র ১ কিলোমিটারের মতো হেঁটে হাঁপাচ্ছি। সময় লেগেছে আধঘণ্টার ওপর। বারোটার মধ্যে মন্দির বন্ধ হবে। আমার বাস্তববোধ ফিরে এল। ঘোড়া নিতেই হবে। তড়াক করে উঠে পড়লাম। ফিরে আস্তাবলে যেতে হবে। দেখি দুটো খালি ঘোড়া নিয়ে একটা ছেলে আসছে। বলল, জলদি উঠে পড়ুন বাবুজি।

'কিড়িয়া কিতনা?'

'আপকা খুশি।'

ঘোড়ায় উঠে বসলাম। বাবা কেদারনাথ ক্ষমা করো।

'খালি ঘোড়াদুটো নিয়ে তু ইধার কাঁহা যাতা হ্যায়?'

'কাল দুজন যাত্রীকে কেদারনাথে রেখে এসেছি। আজ তাদের আনতে যাচ্ছি। পয়সা অ্যাডভান্স কর চুকা।'

ছেলেটির কাছেই খবর পেলাম, মহিলা-পুরুষ মিলে মোট ১৫ জন যাত্রী ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেছে। এ বছর কেদারদর্শনের এরাই শেষযাত্রী। পরের বছর অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আবার মন্দির খোলা হবে।

সবই তো বুঝলাম কিন্তু এদিকে যে বৃষ্টিতে, হাওয়াতে আর শীতে বিপর্যস্ত অবস্থা। রেনকোটের গর্দান ভেদ করে জল চুঁইয়ে মেরুদণ্ডে নামছে। হাতদুটো দিয়ে গদির সামনের রিংটাকে চেপে ধরে আছি। মনে হচ্ছে জমে গেছে। এদিকে নীচে তাকালেই আতঙ্কজনক অবস্থা। আগে চলছে আমার ঘোড়া, তারপর খালি ঘোড়া, তার পিছনে ঘোড়াওয়ালা। একেবারে খাদের কিনার ঘেঁসে চলছে ঘোড়া।

রামবাড়া এসে গেল। ঘোড়া থেকে নামলাম। পাশেই একটা চটি। এখানে নাস্তা

করতে হবে। দেখি সেই পনেরোজন যাত্রী নাস্তা শেষ করে যাত্রার তোড়জোড় করছে। আমাকে দেখে হইহই করে উঠল।

'দাদা তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সারুন— অবস্থা খুবই খারাপ।'

'সে তো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি ভাই। তা তোমরা এগিয়ে যাও, আমি আসছি।'

'এগোবেন কী মশাই? আপনি কি চোখ বুজে আছেন? সামনের দিকে দেখুন তুষারপাত হচ্ছে। আমরা ফিরে যাচ্ছি, এ যাত্রায় কেদারদর্শন ভাগ্যে নেই।'

আমি যেন সম্বিত ফিরে পেলাম। সামনের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বিহুল হয়ে গেলাম। সারা রাস্তায়— এই চটি পর্যন্ত ঝিরঝিরে বৃষ্টি। এখন দেখছি একশো গজের পর থেকেই বৃষ্টিতে আর জল নেই, আছে তুষার। ফুলঝুরির মতো আকাশ থেকে পড়ছে। গাছপালা পাহাড়-রাস্তা সব তুষারবৃষ্টিতে স্নান করছে, তারপরে ধূসর ধবল, তারপরে দৃষ্টির অগম্য। বিশ্বভুবন এই শতগজি আবেষ্টনীর মধ্যে নিজ অস্তিত্ব কোনওক্রমে বাঁচিয়ে রেখেছে।

তুষারপাত ব্যাপারটা বইতে পড়েছি— সিনেমাতেও দেখেছি। আজ নিজে তার মুখোমুখি। এখন কী হবে? ঘোড়াওয়ালা ছেলেটির চোখে চোখ রেখে তাকালাম।

'বাবুজি ডরো মৎ। ঠিক চলে যাব। দর্শন জরুর হোগা।'

এক লহমায় মন ঠিক করে ফেললাম। যাত্রীদের বললাম, আমি ফিরে যাব না। আপনারা যা ভালো বোঝেন করুন। আমার ভাগ্যে যা আছে ঘটুক।

প্রায় সবাই হইহই করে উঠল।

মহিলাদের মধ্যে একজন তাগাদা লাগাচ্ছেন, শিগগির চল— এরপরে হয়তো আর ফিরতেও পারব না।

কী সব বলতে বলতে ওরা একে একে চলে গেলেন। পড়ে রইল একরাশ নিস্তব্ধতাকে ঘিরে মন্দাকিনীর গর্জন আর স্বর্গ থেকে নেমে আসা শত কোটি শ্বেতপুষ্পের নিবিড় বর্ষণ।

ততক্ষণে গনগনে উনুনের পাশে বসে পড়েছি। দোকানে এখন আমরা চারজন। দোকানের মালিক বৃদ্ধ, তার পুত্র, আমি এবং ঘোড়াওয়ালা ছেলেটি। আর ঘোড়াদুটো। জলখাবার— আলু পরোটা, ঘোড়াদের জন্য চানা। আর যাত্রী নেই। বুড়ো চায়ের বদলে আমাকে দুধ দিল। পোশাক-আশাক সেঁকে নিলাম। শরীর তেতে উঠল। এবারে রেনকোটের ঘাড়ে গামছাটাকে ভালো করে বেঁধে নিলাম। দাম চুকিয়ে উঠে পড়লাম।

'বেটা তুমি জরুর দর্শন পাবে। হিম্মৎ রাখো বেটা। কেদারজি অবশ্যই কৃপা করবেন'— মনে হল বৃদ্ধ চটিওয়ালা আমাকে দৈববাণী শোনাল।

ঘোড়ায় উঠে বসলাম। চল— পঙ্খীরাজকা বেটে— এখন থেকে এ জান কেদারজির হাতে আর তোর পায়ের খুরে।

অতটা জুড়ে রামবাড়া। কিন্তু মাত্র দুটি চটি খোলা। শুনশান, নির্জন। রামবাড়া

মানে কেদারপথের অর্ধেক। প্রথমার্ধ কেটেছে প্রায় চোখ বুজে। দ্বিতীয় অর্ধ শুরু হল চোখ খোলা রেখে। এঁকেবেঁকে সব দুরন্ত চড়াই উতরে দিচ্ছে ঘোড়া। যত এগোচ্ছি তুষার ফুলঝুরির বর্ষণ ক্রমশ নিবিড় হচ্ছে। ৫০-৬০ গজ পর্যন্ত আবছা, ঝাপসা দেখতে পাচ্ছি। দেখছি পাহাড়ের পাদদেশে গাছপালা আর রাস্তায় তুষারের আবরণ। আমার রেনকোট, জুতো, ঘোড়ার কেশর সব তুষারাবৃত। ঝেড়ে ফেলা হচ্ছে, পর মুহূর্তে যে কে সেই। রাস্তায় তুষার জমে উঠছে। ঘোড়ার খুর উপচে সেই তুষারের আবরণ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। এখন ছেলেটি ঘোড়ার লাগাম ধরে সবার আগে চলছে। চড়াই ভাঙার সময় মাঝে মধ্যেই কোনও একটা পা পিছলে যাচ্ছে। ভয়ে কিংবা বিরক্তিতে অথবা শীতের অসহ্য কামড়ে দুটো ঘোড়াই হঠাৎ হঠাৎ চিঁ হিঁ হিঁ করে উঠছে। ছেলেটি বলছে, হৌউউস। বলছে, ঘাবড়াইয়ে মৎ বাবুজি। কিন্তু আমি যে শরীরটাকেই ম্যানেজ করতে পারছি না। সাড় নেই। মাঝে মধ্যেই পড়ে যাওয়ার উপক্রম করছে।

'আব চড়াই খতম হো চুকা। দেও-দেখনি আ-গয়া।' আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে কেদারশৃঙ্গ, মন্দির আর জনপদ দেখা যায়। দেবস্থান দেখা যায়, তাই নাম দেও-দেখনি। মোড়ের মাথায় সর্বোচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে ছেলেটা আর ঘোড়াদুটো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। জানলাম এখান থেকে কিছুটা উতরাই। তারপরে সমতল পথে তিন কিলোমিটারের মতো। ডরো মৎ বাবুজি। সবই তো বুঝলাম। এদিকে ঘোড়ার পিঠে বসেই আমি কুঁকড়ে অর্ধেক হয়ে আছি। তোর তো বেটা হাঁটুর নীচের প্রায় অর্ধেকই তুষারে ঢুকে যাচ্ছে। কোনওরকমে যদি বা পৌঁছতে পারিস— ওই দুজন যারা তোর ঘোড়া ভাড়া করে রেখেছে— তারা কি আর এই অবস্থায় ফিরবে? ফিরলেও এই ঘোড়াদুটো আর তুই, এই দুর্যোগ, এই বরফ ঠেঙিয়ে, আসবি কী করে?

দেখতে দেখতে উতরাই পথে সমতলে নেমে এলাম। দুরন্ত চড়াই অতিক্রম করে শ্রান্ত যাত্রীরা এই সমতল পথে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে কেদারজির জয়ধ্বনিতে মুখরিত করে দ্রুত এগিয়ে চলে। পরবর্তীকালে আমি তিনবার কেদার দর্শনে এসেছি। এই সমতল অঞ্চলটার মধ্য দিয়ে ঠিক রাস্তা যাকে বলে, তা ছিল না। এবড়োখেবড়ো পাথর অগোছালোভাবে পাতা ছিল। স্যাঁতসেঁতে ভেজা কোথাও জল গড়িয়ে চলছে— এইরকম ধরনের একটা রাস্তার মতো নিশানা সেই দেবস্থানের দোরগোড়ায় মন্দাকিনীর ওপর জোড়া ব্রিজ পর্যন্ত। শেষবার ২০০০-এর অক্টোবরে দেখেছি সুন্দর রাস্তা হয়েছে। আমি তখন ঘোড়ার পিঠে দেও-দেখনি অতিক্রম করে সমতলে নেমেছি। তুষারপাত বেড়েছে, ঘোড়ার পা আরও ডুবছে, কিন্তু বুঝতে পারছি নীচে সমতল ভূমি। ছেলেটি ঘোড়ায় উঠে পড়ল— ভরসা দিল, বাবুজি আরাম করো, আব মন্দির নজদিগ হ্যায়। কোথায় মন্দির! চতুর্দিকে বিশ্বচরাচর তুষাব পিঞ্জরে আবদ্ধ।

কপালে সুখ নেই। দেবকে পেতে হলে আমাকে যে সব দিতে হবে, আর কবে

বুঝব। কেদারনাথজি চরম পরীক্ষায় ফেলে দিলেন। হঠাৎ একেবারে সামনে দেখি তুষার আচ্ছাদিত মনুষ্যাকার দুই প্রেতমূর্তি। লাঠি ঠুকে বরফ ভেঙে এক পা-দুই পা করে এগিয়ে এসে আমার ঘোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। ঘোড়াওয়ালা ছোকরা পিছনের ঘোড়া থেকে একলাফে নেমে ওই দুই মূর্তির কাছে হাত জোড় করে বলল, গলতি হো গয়া সাব। মৌসম খুবই খারাপ। দেরি হয়ে গেছে। মাফি মাঙতা হুঁ। যা বুঝলাম এই দুই ব্যক্তিই ঘোড়াদুটি আগাম টাকা দিয়ে বুক করে রেখেছিল। এদিকে দুর্যোগ আর ঘোড়া আসতে দেরি হচ্ছে দেখে ধৈর্য রাখতে পারেনি। তুষার বৃষ্টির মধ্যেই কেদারনাথের আশ্রয় ত্যাগ করে নেমে এসেছে। আমার পক্ষে ব্যাপারটা হল যেন সাক্ষাৎ দুই যমদূত নেমে এসেছে। ছোকরা আমাকে ঘোড়া থেকে তৎক্ষণাৎ নামিয়ে দিল। দুই মূর্তি ঘোড়াদুটিতে উঠে পড়ল। এত ঝামেলার মধ্যেও ছোকরা কিন্তু টাকার ব্যাপারটা ভোলেনি। বললে, বাবুজি পয়সা দিজিয়ে। হাত অসাড়— হিপ পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করার ক্ষমতা নেই। ইশারা করতেই ছোকরা পকেট থেকে ব্যাগ বার করে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে ওটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে দিল। ঘোড়ার মুখ দুটো উল্টোদিকে ঘুরে গেল। কদম বাড়াল। 'নমস্তে বাবুজি, মন্দির নজদিগ হ্যায়, করিব এক মাইল হোগা'— ধীরে ধীরে ওরা সর্বগ্রাসী তুষার পিঞ্জরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এরপরে আর কোনওদিন হিমালয়পথে আমি অশ্বের ভরসা করিনি। পদযুগলই আমাকে ধন্য করেছে।

হতাশার ঘোর কাটতেই আমি সম্বিত ফিরে এলাম। এ আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? হাঁটুর নীচের অর্ধেক পা ডুবে আছে বরফে। কোথায় কেদারনাথ? কোথায় তার মন্দির? তুষার-কুজ্ঝটিকাতে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, কখনও একেবারে বদ্ধ।

হঠাৎ সম্বিত ফিরল মন্দাকিনীর গর্জনে। আমার ডানদিকে অনতিদূরে মন্দাকিনীর গর্জনই আমাকে পথ দেখাবে। বইতে পড়েছি এই মন্দাকিনীর অবতরণ কেদারপীঠের গা ঘেঁসে। তবে তো ডানদিকে মন্দাকিনীর গর্জনকে রেখে আমি এগিয়ে যাই। যত ধীরে হোক, এক লাঠি দুই লাঠি এমনি করে বরফ ঠুকে ঠুকে একপা দুপা করে অনেক পা এগোব। এক মাইল দূরত্ব যত দীর্ঘই হোক আমি পারব। জয় বাবা কেদারনাথ। লাঠি বাড়িয়ে দিলাম।

পদে পদে আশঙ্কা। কোথায় খানা, কোথায় খন্দ কে জানে? লাঠি জানে। লাঠি ঠুকছি— আর পা রাখছি। দেহ বিধ্বস্ত, কিন্তু মন জাগ্রত, একাগ্র। চরৈবেতি-চরৈবেতি। কত যে কাল কাটল জানি না। কত যে মৃত্যু পরাজিত হল গুনিনি। শুধু শুনেছি চরৈবেতি— আগে বাড়ো।

সামনেই নীচে এবং তার একটু ওপরে দুটো ব্রিজ নীচে মন্দাকিনী।

নীচের ব্রিজ দিয়ে ওপারে গেলাম। একটু চড়াই পথে বাঁদিকে সোপানশ্রেণী। তুষারাবৃত। জনমনিষ্যি নেই। শুধু একটানা তুষারপাত। ওপরে আবছা ঘরবাড়ি। সোপানশ্রেণীতে পা রাখলাম। এক পা দুই পা, আর উঠতে পারছি না। পা দুটো চরম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে— হৃৎপিণ্ড থেমে যাবে, মনে হচ্ছে— চক্ষু তুষার-

ঝাপটায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওখানেই শুয়ে পড়লাম।

খুব অস্পষ্ট মনে হল— কারা যেন আমাকে তুলে নিল। তারপর চেতনায় ফিরে এসে দেখি একটা ঘর। দুটো সিঙ্গল খাট— মাঝে একটু ফাঁক। তাতে বসানো আগুনে-উনুন। আমাকে সেঁক দেওয়া হচ্ছে। গোটা দেহটা ওই তাপ শুষে নিচ্ছে। পেস্তা বাদাম আরও সব কী দেওয়া উত্তপ্ত পানীয় চামচ দিয়ে গলাধঃকরণ করাল। আমি উঠে বসলাম। ওইরকম দু গ্লাস পানীয় খেলাম।

এটা মহারাষ্ট্র অতিথিনিবাস। দুজনে আমাকে এখানে তুলে এনেছে। একজন বললেন, মন্দির বন্ধ হওয়ার সময় হচ্ছে। দর্শন করার ইচ্ছা থাকলে এক্ষুনি যেতে হবে। নইলে পরের বছর সেই অক্ষয় তৃতীয়ায়। চক্ষিতে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। তুষার ঠেঙাতে ঠেঙাতে গলিপথের প্রান্তদেশে কেদারজির বাড়ি। সেই বিখ্যাত মন্দির।

বাইরে কেউ নেই। একটিমাত্র দোকান তখনও খোলা। পূজার ডালি হাতে নিলাম। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। নন্দীজিকে হাসিমুখে নমস্কার জানালাম।

ভারি দরজা তখনও খোলা। অন্দরে প্রবেশ। সৌরভে ম ম। তিনজন পূজারী। ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত। কোনও বাধা নেই— শিবজিকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর আর বহির্জগতের কথা কিছু জানি না। যখন জানলাম তখন বুঝলাম পূজারী তিনজন চুপ করে বসে আছেন। তাঁদের নমস্কার করে বাইরে এলাম। পাক্কা আধঘণ্টা শিবজিকে ছাড়িনি। এবারে মন্দির বন্ধ হবে। আমিই শেষ দর্শনার্থী।

ফিরে এলাম অতিথিশালায়। ওইসব শুকনো ফল ছাড়া আর কোনও খাবার নেই।

ইতিমধ্যে মন্দির কমিটির দুজন লোক এলেন। কোথা থেকে এসেছি— কেমন করে এসেছি— কারা সঙ্গে ছিলেন— এখন কী করবেন ইত্যাকার একরাশ প্রশ্ন। আমি সংক্ষেপে সব জানালাম। বললাম, বাইরে আকাশ ভেঙে পড়ছে। দুয়েকদিন এখানে থেকে যাওয়া ছাড়া তো অন্য উপায় দেখছি না। ওঁরা শুনলেন, তারপর বললেন, আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনা নেই, বরং আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা আছে। আজকে গৌরীকুণ্ড, আর কাল সন্ধ্যায় হরিদ্বারে না ফিরতে পারলে তার পরিণাম কী হবে ভেবেছেন? যারা রামবাড়া পর্যন্ত এসে ভয়ে ফিরে গেছে তারা হরিদ্বারে রটিয়ে দেবে একটা উন্মাদ তুষারপাতকে অগ্রাহ্য করে কেদারের পথে চলে গেছে। কাল হরিদ্বারে না ফিরলে ধরে নেওয়া হবে— আপনি আর নেই। আপনার তুষার সমাধি হয়ে গেছে। আপনি উন্মাদ কিনা সে বিচারে যাব না, কিন্তু আপনার মা-দাদা আপনার শোকে অবশ্যই উন্মাদ হয়ে যাবে। শরীরে 'থোরাসা তাগিদ হ্যায় কি নেহি? আপকো ওয়াপাস যানা জরুরি হ্যায়। শোচিয়ে।'

তাই তো! এভাবে তো ভাবিনি। পরিস্থিতিটা প্রাঞ্জল হয়ে গেল। মায়ের আকুল প্রতীক্ষা, দাদার উদ্বেগ-রুদ্ধ মানসিক অবস্থা আমার চিত্তপটে উদিত হওয়া মাত্র সাতপাঁচ না ভেবে রেনকোটটা গায়ে চাপিয়ে গামছাটা গলায় বেঁধে অন্ধের যষ্টিটা

হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। ফিরতে আমাকে হবেই।

আবার তুষার, আবার সিঁড়ি, আবার সেই মন্দাকিনীর সেতু পেরিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। উতরাই পথে গড়গড় করে চলে এসেছি। এখন সম্মুখে তুষার পারাবার। এখন আমার 'পাটোয়ারি' বুদ্ধি জাগ্রত— আমার মন সংসার অভিমুখে। এখন আমার দরকার একজন গাইডের। ভাবছি যাই ফিরে যাই, টাকাপয়সা দিয়ে একজন লোক যদি গাইড হিসেবে পাই! ওইসব লোক যারা গেস্টহাউসে আর মন্দির কমিটিতে আছে তাদের ধরলে নিশ্চয়ই পাব।

ভাবছি— হঠাৎ দেখি একটা কুকুর আমার পাশ কাটিয়ে ৩-৪ হাত এগিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ইয়া মোটা মাথা, মিশকালো নাদুস চেহারা। দাঁড়িয়ে গেল কেন? দেখি ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে বারে বারে তাকাচ্ছে। লেজটাকে নাড়ছে। একপা দুপা এগিয়ে যাচ্ছে, আবার দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছে, লেজ নাড়ছে। তিনবারের বার আমি চকিতে বুঝে নিলাম ও আমাকে বলছে, আমাকে অনুসরণ করো। ক্ষণিকের দ্বিধা, তারপর এগিয়ে গেলাম, ওর পিছু ধরলাম। কুকুরটা এগোয় আবার পিছু তাকায়। আমি ওর পদক্ষেপে পথের নিশানা পাচ্ছি। ওর পায়ের চিহ্নে পা রাখছি। চমৎকার ব্যাপার। বিনে খরচার গাইড। তরতর করে এগোচ্ছি। দেখতে দেখতে দেও-দেখনি ছেড়ে গেলাম। সেই প্রাণঘাতী ভয়ঙ্কর চড়াই এখন সুখপ্রদ উতরাই। দ্রুত হাঁটছি, শরীরে রক্তসঞ্চালন হচ্ছে। এখন ঘোড়ানির্ভর অচল পদার্থ নই, এখন আমি নিজ পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত আত্মবিশ্বাসী একজন মানুষ। সামনে আমার নিজস্ব গাইড।

কুকুরটাকে যে খেতে দেব সে উপায়ও নেই। আমার তো হরিমটর অবস্থা, কোনও দোকানও নেই। কে জানে রামবাড়ায় সেই চটি খোলা পাব কিনা। ওদের তো গুপ্তকাশীতে চলে যাওয়ার কথা। আজ ওদের ঘরে ঘরে দীপাবলি। আর বেশি দূর নয়, আগে তো রামবাড়া পৌঁছই। তুষারপাতে ক্লান্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ঘনত্ব ক্রমশ কমছে, অবিশ্রাম ধারাপাতের বিরাম নেওয়ার মতিগতিও লক্ষ করা যাচ্ছে।

অবশেষে তুষারপাত বন্ধ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। দৃষ্টি ফিরে পেলাম। রামবাড়া এসে গেলাম। আরে! দোকানের ঝাঁপ এখনও খোলা। বিশ্রাম নেব, আর যদি কিছু পাই নিজেও খাব— কুকুরটাকে পেট ভরে খাওয়াব। অনেক পয়সা আর ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়ে দিল।

দোকানের একেবারে সামনে এসেছি। কুকুরটা দাঁড়িয়ে গেল। ঘুরে একবার আমার দিকে তাকাল। আমি জিব দিয়ে চু চু শব্দ করে আশ্বাস দিলাম নিশ্চয় খেতে দেব।

সারমেয়প্রবর প্রথমে গুটিগুটি— তারপরে এক দৌড়ে উল্টোদিকের পাহাড়ের গা বেয়ে তড়িৎগতিতে উঠে ঘন শ্যামল বনানীর মধ্যে প্রবেশ করে নিমেষে উধাও হয়ে গেল।

আমি হতভম্ব হয়ে দোকানে ঢুকলাম। দেখি বৃদ্ধ আর তার পুত্র সব সমান-উমান গোছগাছ করে বসে আছে। দর্শন হয়েছে শুনে বৃদ্ধ খুব খুশি। পুত্রটি ইতিমধ্যেই বস্তা খুলে আটা নিয়ে চাপাটি বানিয়ে উনুনের শেষ আগুন উস্কে দিল। দুধ আর অড়হর ডাল গরম করা হল। পরম স্নেহে বৃদ্ধ আমাকে খাবার হাতে ধরিয়ে দিল।

কুকুরটার জন্য এবার সত্যিই মন খারাপ লাগছে। এত খাটল কিছুই দিতে পারলাম না।

বৃদ্ধকে সব বললাম। উনি হেসে বললেন, বাবুজি কেদারজিকে দেখার জন্য প্রাণটা বাজি রেখেছিলে আর তিনি তোমাকে দেখবেন না! অ্যায়সা কভি হোতা নেহি। আমাদের কেদারজি বহত উচ্চাই, বহত মহান।

বাবুজি, উও কোই মামুলি কুত্তা নেহি। উও খুদ কেদারজিকা ভৈরব। আপকা দেখভাল করনেকে লিয়ে খুদ কেদারজিনে ভেজা। ওর কাজ শেষ। ও যাঁর, তাঁর কাছে ফিরে গেছে।

আপনিও ধীরে ধীরে গৌরীকুণ্ডে আসুন। আমাদের কাজও শেষ। আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আমরা একটু তুরন্ত যাচ্ছি। বাস ধরতে হবে।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

মহাশূন্যে চলছে কে কে

অমিতাভ ঘোষ

ভ্রমণ অষ্টাদশ শতক অবধি ছিল অভিজাত সম্প্রদায় ও অভিযাত্রীদের জন্য। অষ্টাদশ শতকে কোনও অভিজাত ইংরেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ বিবেচিত হত না যদি না তিনি কোনও শিক্ষকের (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্মযাজকের) সঙ্গে যে কোনও প্রকার যানবাহনে, পথের যে কোনও কষ্ট স্বীকার করে, নতুন কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেহ-মনের সজীবতা বৃদ্ধি করতেন। প্রাচ্যে ভ্রমণ ছিল প্রধানত অভিযান— অনেক ক্ষেত্রেই যা মহাপ্রস্থানের পথের নামান্তর।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে রেলপথে চলাচল শুরু হওয়া, সড়কপথের উন্নয়ন, হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদির প্রচলন হওয়াতে ভ্রমণের দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হল সর্বসাধারণের জন্য। বিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আকাশপথে যাত্রাও আর অধরা রইল না। কিন্তু স্থলপথ, জলপথ বা আকাশপথ— যে পথেই হোক, ভ্রমণ সীমাবদ্ধ ছিল পৃথিবীর মধ্যেই।

চমকপ্রদ ঘটনার শুরু ২০০১ সালে। কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা নয়, আন্টার্কটিকা অভিযান নয়, আলাস্কা ভ্রমণ নয়— মহাকাশ ভ্রমণে আগ্রহী হলেন আমেরিকার কোটিপতি ব্যবসায়ী ডেনিস টিটো। মহাশূন্যে মানুষের তৈরি কোনও স্পেস স্টেশন ও সামগ্রিকভাবে মহাশূন্যের রূপ দেখার জন্য তিনি রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও তাঁর ইচ্ছাপূরণের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। রাশিয়া তাঁর ইচ্ছাপূরণে সম্মতি দেয়। অতঃপর ডেনিস টিটো রাশিয়ার সুয়েজ স্পেস ট্যাক্সিতে মহাশূন্যে পাড়ি দেন ও ৬ দিন ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে থেকে নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

ঘটনার পুনরাবৃত্তি ২০০২-এ। দুর্গম ও ব্যয়বহুল হলেও পথের সৃষ্টি হলে পথিকেরও অভাব হয় না। এবার মহাকাশের পথিক হন দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী শাটলওয়ার্থ। তিনি প্রথাগত মহাকাশ-বিজ্ঞানী নন। যে ষোলটি দেশ মিলে মহাশূন্যে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন গড়ে তুলেছে, তাঁর দেশ সেই জোটে নেই। অভিনব এই ভ্রমণের জন্য মহাকাশচারীদের মতো সবরকম প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি মহাকাশযাত্রা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল— মহাকাশ দেখা, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকদের কাজে আসবে এমন কিছু পরীক্ষা করা ও

এর মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও গণিতে আকর্ষণ করা।

২০০৫-এর এপ্রিলে হওয়া সম্ভব এইরকম আরও এক মহাকাশ ভ্রমণ, যার জন্য এই মুহূর্তে রাশিয়ার মস্কোর কাছে Zvezdny Gorodok-এ ট্রেনিং নিচ্ছেন আমেরিকার ব্যবসায়ী গ্রেগরি অলসন। স্বাস্থ্যের কারণে অসম্ভব না হলে গ্রেগরি অলসন হবেন ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে তৃতীয় ভ্রমণার্থী। পরপর এই তিনটি ঘটনাই কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র? না মানুষের মহাকাশ ভ্রমণ শুরু হয়ে গেল?

কল্পনায় অন্তরীক্ষ ভ্রমণের শুরু যুগাতীত কাল থেকে। মানুষ তখন আকাশের দিকে চেয়ে ভাবত— কী আছে এই অপরূপ স্থানে। পাখি, মানুষের মতো কোনও প্রাণী, মনুষ্যেতর কোনও জীব বা দেবদেবী? মানুষের এই চিন্তাধারা রূপ পায় তার লেখনিতে। দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে চাঁদে যাওয়ার কল্পনা রূপ পায় গ্রিস দেশের লুসিয়ান-এর লেখায়। লুসিয়ান ইউফ্রেটিস নদীর ধারে সামোসাটায় জন্মগ্রহণ করেন। ইউলিসিস-এর জাহাজ ঘূর্ণাবর্তে পড়ে কীভাবে সাতদিন বাদে চাঁদে গিয়ে পৌঁছয়, তাঁর কল্পনাশ্রিত কাব্যে তার সুন্দর বর্ণনা আছে। এর বহুদিন পরে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ জোহানেস কেপলার-এর ১৬৩৪ সালে লেখা সাহিত্যকীর্তি 'সোমনিয়াম'-এ চাঁদের বুকে দাঁড়িয়ে অপরূপা পৃথিবীকে দেখার কথা আছে। এরপরে ১৭৫২তে ভলটেয়ার-এর লেখা 'মাইক্রোমেগাস', ১৮৬৫তে জুল ভার্ন-এর 'ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন' ও ১৯০১-এ এইচ জি ওয়েলস-এর 'দি ফার্স্ট মেন ইন দি মুন' উল্লেখযোগ্য কল্পনাশ্রিত মহাকাশ কাব্য।

মানুষের কল্পনা অকস্মাৎ ১৯০৩-এর ১৭ ডিসেম্বর বাস্তব রূপ পায়। উইলবার ও অরভিল রাইট— দুজন আমেরিকান বাই-সাইকেল মিস্ত্রি এক মিনিটের কম সময় উড়োজাহাজ চালিয়ে মানুষের ওড়ার স্বপ্নের বাস্তব রূপের সূচনা করেন। ১৯২৭-এ চার্লস লিন্ডবার্গ একা বিমান চালিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পার হন। আজ শুধুমাত্র আমেরিকায় বছরে ৬০০ মিলিয়ন বিমানের টিকিট বিক্রি হয়। এদিকে বিমান দ্বারা মানুষ যখন আকাশ বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর, সেই সময়ে বিজ্ঞানী গডার্ড আমেরিকায় ও অবারথ আকাশে নিক্ষেপের জন্য প্রথম রকেট নির্মাণে প্রবৃত্ত হলেন। রকেটের উন্নততর সংস্করণ হতে ১৯৬৯-এ মানুষ চাঁদের মাটিতে পা রাখতে সক্ষম হল। মানুষ ভাবতে শুরু করল— চাঁদ, তারা তত দুরধিগম্য নয়। বিংশ শতক শেষ হল। একবিংশ শতকে মহাকাশের দ্বার উন্মোচিত হল ভ্রমণ ইচ্ছুক মানুষের জন্য। টিটো, শাটলওয়ার্থ ও আগামী দিনে গ্রেগরি অলসন মূলত ভ্রমণের উদ্দেশেই মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন ও দেবেন। এঁদের মহাকাশ ভ্রমণের নাম অরবিটাল ফ্লাইট।

তাঁরা কীভাবে এই ভ্রমণ করেছেন ও করবেন? আমেরিকার স্পেস অ্যাডভেঞ্চারার্স নামক সংস্থা রাশিয়ান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড স্পেস এজেন্সি, ইউরি গ্যাগারিন কসমোনট স্পেস সেন্টার ও রকেট স্পেস কর্পোরেশন এনার্জিয়া নামক সংস্থাগুলির সহায়তায় এই ভ্রমণের ব্যবস্থা করছে। এই সংস্থায় পুঙ্খানুপুঙ্খ

শারীরিক পরীক্ষা ও ভারশূন্যতায় থাকার প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে মহাকাশে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। এঁদের তিনজনেরই মহাকাশ ভ্রমণের খরচ ২০ মিলিয়ন ডলার।

এখন প্রশ্ন, শখ থাকলেও কতজন মানুষ ভ্রমণের জন্য এই বিপুল ব্যয়ভার বহনে সক্ষম? সমীক্ষা করে দেখা গেছে, আমেরিকার ধনীদের মধ্যে শতকরা ৭ জন এই বিশাল ব্যয়বহুল ভ্রমণে এখনই আগ্রহী। সমীক্ষায় এও দেখা গেছে—২০২১ সাল নাগাদ অরবিটাল ফ্লাইটের ব্যয়ভার অনেক কমে যাবে ও বছরে প্রায় ৬০ জন ইচ্ছুক ভ্রমণার্থী পাওয়া যাবে।

স্পেস অ্যাডভেঞ্চারার্স কি এই বিপুল ব্যয়বহুল ভ্রমণ ছাড়া আর কোনওরকম ভ্রমণের ব্যবস্থা করছে?

হ্যাঁ, স্পেস অ্যাডভেঞ্চারার্স অন্য ধরনের মহাকাশ ভ্রমণেরও ব্যবস্থা করছে—যার একটির নাম সাব-অরবিটাল ফ্লাইট ও যার ব্যয় প্রায় ১,০০,০০০ ডলার। এই ধরনের যাত্রায় মহাকাশযান ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতায় নিয়ে যাবে, প্রথাগতভাবে যেখান থেকে স্পেস শুরু। আমেরিকার প্রথম মহাকাশচারী অ্যালান শেপার্ড ১৯৬১ সালে এই ধরনের মহাকাশ যাত্রায় গিয়েছিলেন। সাব-অরবিটাল ফ্লাইটে মহাশূন্যে ভারহীনতায় থাকার জন্য চারদিনের প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

স্পেস অ্যাডভেঞ্চারার্সের সি ই ও-র কথা অনুযায়ী প্রায় ১০০ জন ইতিমধ্যেই এই ভ্রমণের আসন সংরক্ষণ করেছেন। এই ধরনের মহাকাশ ভ্রমণ ২০০৬-এর মধ্যে শুরু হয়ে যাবে আশা করা যায়। ইউ এস এয়ারওয়েজে ১০ মিলিয়ন মাইল ওড়ার ইতিহাস থাকলে মহাশূন্যের এই ভ্রমণে অংশগ্রহণ করা যাবে বিনাব্যয়ে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যাঁর মহাকাশ ভ্রমণের স্বপ্ন আছে কিন্তু এত ডলার পাথেয় নেই, তাঁদের স্বপ্নপূরণের কি কোনও উপায় আছে? স্পেস অ্যাডভেঞ্চারার্স বলেন, 'হ্যাঁ'। সংস্থার জিরো গ্র্যাভিটি ফ্লাইট যার ব্যয় ৬,৯৯৫ ডলার, তাতে মহাকাশের ন্যূনতম স্বাদ পাওয়া যেতে পারে। ২২ জুলাই ও ২৬ আগস্ট ২০০৪-এ এই ধরনের মহাকাশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়া ২৫ কিলোমিটার উচ্চতায় যাবার জন্য আছে আরও এক ধরনের আকাশভ্রমণ। ভ্রমণার্থী রাশিয়ান যুদ্ধবিমান মিগ ২৫-এ শব্দের দ্বিগুণ গতিতে স্পেসের প্রান্তভাগে পৌঁছে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবে। ২৯ অক্টোবর ২০০৪ পর্যন্ত এরকম ১০টি যাত্রার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মহাকাশ ভ্রমণ জনপ্রিয় করার জন্য ১৯৯৬ সালে আমেরিকার এক্স-প্রাইজ ফাউন্ডেশন ঘোষণা করে, যে সংস্থা প্রথম তিনজন মানুষকে নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০০ কিলোমিটার উচ্চতায় উঠে, মহাকাশ দেখিয়ে, সেই মহাকাশযানেই দুসপ্তাহের মধ্যে আবার ৩ জন মানুষকে নিয়ে মহাকাশ অভিমুখে যাত্রা করবে, সে ১০ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার পাবে। ৭টি দেশের ২৭টি সংস্থা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। এই পুরস্কারের নাম আনসারি এক্স-প্রাইজ।

আজ অবধি এই পুরস্কারের দৌড়ে প্রথম নাম স্কেল কম্পোজিটস-এর। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত বুর্ট রুটান, আনসারি এক্স-প্রাইজ-এর জন্য আধা রকেট ও আধা জেট প্লেনের সমন্বয়ে একটি মহাকাশযান প্রস্তুত করেন, যার নাম স্পেসশিপ ওয়ান। শুধুমাত্র চালক নিয়ে স্পেসশিপ ওয়ান গত ২১ জুন ১০০ কিলোমিটার বা ৬২.৫ মাইল উচ্চতা যাকে প্রথাগতভাবে স্পেস বা মহাকাশ বলে, সেখানে আরোহণ ও সফল অবতরণে সাফল্য লাভ করেছে।

তত্ত্বের আলোচনা ও অঙ্কের হিসাব এখানেই শেষ করছি। এর পরেও আছে একটি বিরাট জিজ্ঞাসা— কেমন লাগবে মহাকাশ ভ্রমণ, যদি আপনার গন্তব্য হয় ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন?

২০ মিলিয়ন ডলারের মহাকাশযাত্রায় মহাকাশযানের মধ্যে আপনাকে যথেষ্ট শক্ত বাঁধনে বন্দী হতে হবে। মহাকাশযান সাধারণ বিমানের মতো যাত্রা শুরু করবে। অনেক উচ্চতায় ওঠার পরে মহাকাশযানের রকেট ইঞ্জিন চালু হয়ে যাবে। যাত্রী আপনি শব্দের থেকে অনেক দ্রুতগতিতে মহাকাশের পথে ধাবিত হবেন। আপনার চারপাশে দেখবেন নীলাকাশের অদ্ভুত রূপান্তর, তাতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমাবেশ। এ রূপ আগে কোনওদিন দেখা হয়নি। এই অনুভূতি আগে কোনওদিন বোধে আসেনি। এ সম্পূর্ণই অনাস্বাদিত। প্রায় ৪০০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে পৌঁছতে আপনার লাগবে ২ দিন। এই ২ দিনে আপনি বহুবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবেন। সম্প্রতি ৪ এপ্রিলের মহাকাশচারীদের কর্মোপলক্ষে ISS যাত্রায় তাঁরা ৩৪ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন। ঘণ্টায় হাজার হাজার মাইল বেগে পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে আপনি বহুবার নীচের পৃথিবীর অপরূপ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মুগ্ধ দর্শক হবেন।

মহাকাশ থেকে ফেরার পথে মহাকাশযানের রকেট ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হবে। ভারহীনতার জন্য মহাকাশযানের মধ্যে আপনি সাঁতার কাটার অনুভূতি পেতে পারেন। তারপর পৃথিবীর আবহাওয়ায় ঢোকার পরে আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে কোনও উড়ন্ত পাখির। আপনার মনে পড়ে যাবে, এই পাখিই আমাদের ওড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। আজ বিজ্ঞানের অপরিসীম দাক্ষিণ্যে পাখি রইল আকাশে; আমার ভ্রমণ হল মহাকাশে।

'ভ্রমণ' অক্টোবর, ২০০৪

কচ্ছের জলে ডাঙায়

জয়দীপ সরকার

জামনগর থেকে কচ্ছ উপকূল ধরে যাব আরবসাগরের তীরে দ্বারকা হয়ে ওখা এবং বেট দ্বারকা। সেখান থেকে আমরা যাব নলসরোবর এবং বুনো গাধার দেশ ক্ষুদ্র রণ। মূল উদ্দেশ্য গুজরাটের উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলের প্রকৃতি দেখে বেড়ানো।

দীর্ঘপথের সাথী ছিল তাপ্তি, নর্মদা, সবরমতী, রেড়িখেত আর সাদা ফেনায় মোড়া কাপাস তুলোর খেত। জনমানবহীন ঝকঝকে স্টেশন চত্বর পেরিয়ে অটোরিকশা করে শহরের অতি পরিচিত 'তিন দরোয়াজা'র কাছেই হোটেল রাজধানীতে।

শহরের এই জায়গাটা বেছে নেওয়ার বাড়তি সুবিধা হল যে একেবারে হাতের নাগালে ফরেস্ট এবং কাস্টমস দপ্তর। এই দুটো দপ্তরই আমাদের এবারের যাত্রার জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি।

কচ্ছ উপসাগরের মেরিন ন্যাশনাল পার্কে প্রবেশ ও থাকার জন্য বনবিভাগ আর কাস্টমস দপ্তরের অনুমতিপত্রের প্রয়োজন। সময় করে দেখে নিলাম ফরেস্ট মিউজিয়াম। ম্যানগ্রোভে ঘেরা কচ্ছ উপকূলের নানা অঞ্চলসহ মেরিন ন্যাশনাল পার্কের বিভিন্ন অংশ আর সেখানকার ইকো সিস্টেমকে বোঝানো হয়েছে ম্যাপ ও মডেলের সাহায্যে। তার সঙ্গেই মিউজিয়ামে আছে নানা প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীর সংরক্ষিত দেহ এবং সুন্দর আলোকচিত্র। সামনেই বিশাল কাচঘরে রাখা আছে ২০০২-এ কচ্ছ উপসাগরের ঢেউয়ে ভেসে আসা ৩৫ ফুট লম্বা মৃত এক নীলতিমির কঙ্কাল।

খিজাড়িয়া পক্ষিনিবাস

জামনগর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে এন্ট্রি ফি জমা দিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে অটোরিকশা নিয়ে যখন খিজাড়িয়া পক্ষিনিবাসে পৌঁছলাম তখন বিকেল পৌনে পাঁচটা। তখনও রোদের বেশ তেজ। সূর্যাস্ত হতেও ঘণ্টাদেড়েক দেরি। এই হল পাখি দেখার বেশ ভালো সময়। ভোরে এদের দেখা গেলেও শীতে কুয়াশার জন্য অনেক সময় আলো কম থাকে।

জামনগর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে মাত্র ৬.০৫ বর্গ কিলোমিটারব্যাপী

বিস্তীর্ণ জলাজমি নিয়ে এই পক্ষিনিবাস। মাঝে লম্বা লম্বা ঘাসের ঝোপেঝাড়ে এঁকেবেঁকে চলেছে স্বচ্ছ জলস্রোত। মাঝে মাঝে জঙ্গলে ঘেরা ছোট ছোট দ্বীপের মতো অংশ। সেখানে নীলগাই, বুনোশুয়োর, সজারু, হরিণ— এইসব বন্যপ্রাণীদের বিচরণ। অজস্র খাঁড়িপথে জোয়ারের সময় উপসাগরের নোনা জল ঢোকে এই জলায়। ফলে মূলত ঈষৎ লবণাক্ত পরিবেশ এখানকার জল আর মাটিতে।

জলাভূমির বুকচিরে মাঝ বরাবর গাড়ি যাবার সরু রাস্তা। মাঝে মাঝে ওয়াচটাওয়ার। রাস্তার দুপাশে বাবলা জাতীয় কাঁটাগাছের ঝোপ জলার ধারের ঘাসজমিতে নানা রঙের ফড়িংয়ের মেলা। ঝোপেঝাড়ে নানা রঙের প্রজাপতি, প্রেয়িং ম্যানটিস আর গ্র্যাসোফারের আনাগোনা।

এবছর বৃষ্টি বেশি হওয়ায় গুজরাটের সব জলাভূমিতেই জলের পরিমাণ কমতে দেরি হচ্ছে। ফলে পরিযায়ী পাখিদের আড্ডাও জমে ওঠেনি ভালো করে। এযাত্রায় কয়েক প্রজাতির ওয়াটার বার্ড দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। ফেরার সময় নজরমিনারে উঠে চোখে পড়ল এক নীলগাই। দূরে বাবলা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে কিছু একটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

ঘাসজমির পিছনে যখন সূর্যদেব পাটে বসছেন তখন জলাজমির আঁকাবাঁকা জলে যেন গলানো সোনা। তারপরেই সারা আকাশে লাল-কমলার নানা শেডের খেলা।

পিরোটানের পথে

পরদিন হোটেল থেকে বেরলাম ভোর সাড়ে তিনটেয়। আলোয় সাজানো শহর তখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তীব্র ঠান্ডা হাওয়ায় শহরের মসৃণ রাজপথ ধরে অটো ছুটল ৬ কিলোমিটার দূরে বেদিবন্দর জেটির দিকে। বন্দরের চেকপোস্টে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখিয়ে পোর্টের এন্ট্রি ফি দিয়ে সোজা জেটিতে। আলোয় ঝলমল করছে বন্দর।

আমরা যাব ১৫ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে পিরোটান দ্বীপে। সাগরের ঠান্ডা হাওয়া মোকাবিলার জন্য বোটে আগুন জ্বালা হল। জলের স্রোত আর হাওয়ার প্রতিকূলে ধীরগতিতে এগিয়ে চলা। পূর্ব আকাশে রং ধরলে খাঁড়ির জলে তার অপূর্ব প্রতিফলন। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ম্যানগ্রোভে ছাওয়া ছোট ছোট আইল্যান্ড। গাছের মাথায় মাথায় তখনও বিশ্রামে মগ্ন বক আর সারসের দল। খাঁড়িপথ বেয়ে উপসাগরে পড়তেই শুরু হল ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ। ঠান্ডা নোনাজলের ঝাপটা এসে পড়ছে চোখে মুখে। দূরে দ্বীপের বাতিঘর নজরে আসতেই আমাদের লক্ষ্য করে ওপার থেকে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতেই স্বাগত জানাল কয়েকটা হোয়াইট আইবিস। প্রায় ঘণ্টাতিনেক বাদে যখন হাঁটুজলে বোট থেকে নামলাম তখন সবে ভাটা শুরু হয়েছে।

কচ্ছ উপসাগরের ৪২টি দ্বীপসহ ১৬২.৮৯ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে ১৯৮২ সালে 'মেরিন ন্যাশনাল পার্ক' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে

অন্যতম প্রবাল প্রাচীরে ঘেরা এই পিরোটান আইল্যান্ড। ঘন সবুজে মোড়া দ্বীপের একপ্রান্তে বনদপ্তর। অন্য প্রান্তে লাইটহাউস। বনবিভাগের দুটো থাকার ঘরই গত বছরের সাইক্লোনে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সেখানেই একমাত্র বনকর্মী বৃদ্ধ আদমভাই থাকেন সবুজ দ্বীপের রাজা হয়ে। দ্বীপের গাছপালা, পাখি আর সামুদ্রিক প্রাণীদের আনাগোনা তার নখদর্পণে। তাঁর কাছেই জানলাম এই পার্কে প্রায় ২২০ প্রজাতির পাখির আনাগোনা। তাদের মধ্যে ১১০টি পরিযায়ী।

দ্বীপের সোনালি বালুকাতটের সীমানায় কাদাজমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ম্যানগ্রোভ, শ্বাসমূল আর নানারঙের শ্যাওলা। গোটা বালুকাতট জুড়ে মৃত প্রবাল, শামুক আর ঝিনুকের টুকরো। চরে বেড়াচ্ছে রিফ হেরন, ইগ্রেট, ক্র্যাবপ্লোভার আর অয়েস্টার ক্যাচারের দল। বেলা প্রায় ১টা নাগাদ ভাটার টানে জল প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে সরে গেলে আদমভাইকে গাইড করে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় অতি কষ্টে পাথুরে জমি আর কাদাজমি ভেঙে পৌঁছলাম প্রবালরাজ্যে। হাঁটুসমান জলের তলায় যেন রংবাহারি চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বাগান। ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা প্রজাতির নানা নকশার প্রবাল, স্পঞ্জ এইসব। সঙ্গে রঙিন মাছেদের চকিত আনাগোনা। দূরে জলের রং কখনও সবুজ, কখনও নীল, কখনও বেগুনি। বিকেল প্রায় চারটে পর্যন্ত জলের তলার এই অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করে আবার জোয়ার শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলাম মেনল্যান্ডে।

নারারা টাপু

সাগরগর্ভে ধীরে ধীরে পলি-নুড়ি জমা হয়ে তটভূমির সঙ্গেই জেগে ওঠা চরকে বলা হয় 'টাপু'। ভাটার সময় পদব্রজেই যাওয়া যায় এখানে। জামনগর-ওয়াড়িনাড় হাইওয়ে ধরে ওয়াড়িনাড় পৌঁছে সেখান থেকে ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশনের এলাকা ছাড়িয়ে ডানদিকে দশ কিলোমিটার দূরে নারারা ক্যাম্প। বনবিভাগের গেস্টহাউসে থাকার সুন্দর ব্যবস্থা। খাবার কোনও ব্যবস্থা নেই। তার জন্য আসতে হবে ওয়াড়িনাড়ে। রেশন সঙ্গে নিয়ে গেলে অবশ্য কেয়ারটেকার রান্নার ব্যবস্থা করে দেয়। সল্ট প্ল্যান্টের জলে দুলকি চালে ভেসে চলেছে একদল রোজি পেলিক্যান। তটভূমি জুড়ে ম্যানগ্রোভ প্ল্যান্টেশনের কাজে ব্যস্ত বনবিভাগ। তেল কোম্পানি আর একের পর এক বন্দরের দৌলতে পরিবেশ দূষণ বেশ চোখে পড়ার মতো। ফলে প্রবাল তটভূমিও অতি সঙ্কটের মুখোমুখি।

দ্বারকা থেকে পোশিত্রা

পরদিন সকালে উঠে বোঝাই দায় যে আজ ইংরিজি নববর্ষ। ব্রেকফাস্ট সেরে বেরলাম সকাল দশটায়। দ্বারকা পৌঁছবার ঘণ্টাখানেক আগে চড়কলার কাছে রঞ্জিতপুর গ্রামে মেলা বসিয়েছে হাজারখানেক ডেময়জেল ক্রেনের। ক্যাকর ক্যাক আওয়াজে কান পাতা দায়। বেশ বড় আকারের এই পাখির দল প্রতি বছরই

এখানে উড়ে আসে সুদূর মাঞ্চুরিয়া, ইউক্রেন এইসব অঞ্চল থেকে। পায় গ্রামের লোকের আতিথেয়তা আর ভালোবাসা। এখান থেকে কিছুটা এগিয়ে ডানদিকে মোরাম রাস্তা গেছে ওখা রণের বুকচিরে। দুপাশে নোনাজল আর নোনামাটি অনেকটা বিস্তীর্ণ ব্যাকওয়াটারের মতো। তবে গাছপালা প্রায় নেই। শুধুই থৈ থৈ জলে লেসার ফ্লেমিংগোর গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলা। সঙ্গে কিছু স্পুনবিল, আইবিস, পেলিক্যান।

প্রায় সন্ধ্যা ছটা নাগাদ উঠলাম একেবারে আরবসাগরের ধারে গায়ত্রী শক্তিপীঠের লজে। পাশেই সাজানো পার্ক আর লাইটহাউস। এখান থেকে মিনিট দশেকের হাঁটাপথে দ্বারকাজির মন্দির। দ্বারকায় থাকার আসল উদ্দেশ্য পরদিন এখান থেকে গাড়ি নিয়ে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে সাগরপাড়ে পোশিত্রা ঘুরে আসা। পোশিত্রার সাগরপাড়ে বেশ কিছু ছোট বড় গ্রাম। পোশিত্রা যাবার পথের সৌন্দর্য অসাধারণ। সরু কাঁচারাস্তার দুপাশে যতদূর চোখ যায় দেড় মানুষ সমান উঁচু ক্যাকটাসের ঝাড়। গ্রাম থেকে এক যুবককে পাকড়াও করে তাকেই গাইড সাজিয়ে আমরা পৌঁছলাম মাঝসাগরে ভারুবেটের লাকু পয়েন্টে। ভাটা না হলে অবশ্য এখানে যাওয়া অসম্ভব। বিরাট এলাকা নিয়ে অজস্র কোরাল পুল। অর্থাৎ পাথরে ঘেরা ছোট ছোট জলাশয়ের মাঝে সাগরের জমা জলের তলায় প্রবাল রাজ্য। তাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা রঙের সাগরপ্রাণী।

দ্বারকা থেকে ওখা

ভোরবেলা বেরিয়ে মাত্র ঘণ্টাখানেকের জার্নিতেই ওখা। রেলস্টেশনের পাশে বাজার পার হয়ে হোটেল স্টার-এ থাকার জায়গা মিলল। কাছেই লাইটহাউস, ফিশারিজ মিউজিয়াম ও অ্যাকোয়ারিয়াম এবং ওখাপোর্ট। একদিকে আরবসাগর, অন্যদিকে কচ্ছ উপসাগর। এই হল ওখার ভৌগোলিক অবস্থান। ফিশারিজ মিউজিয়ামে রাখা আছে নানা জাতের প্রবাল, শঙ্খ, ঝিনুক, স্পঞ্জ, মাছ, সাপ, কাঁকড়াসহ নানা প্রজাতির সামুদ্রিক আগাছার সংরক্ষিত দেহ।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে ওখা পোর্ট সংলগ্ন জেটি থেকে লঞ্চে ভেসে চললাম বেট দ্বারকা। বেট কথার অর্থ দ্বীপ বা আইল্যান্ড। আমাদের লঞ্চের পিছনে পিছনে সঙ্গী হয়ে সবুজ রঙা সাগর জলের ওপরে ডানা মেলে চলল এক ঝাঁক সি-গাল। মিনিট কুড়ির জার্নিতে বেট দ্বারকা। দ্বীপের রাস্তায় যানবাহন বলতে মূলত দৈত্যাকৃতির একধরনের মোটরবাইকের পিছনে যাত্রীবাহী শকট। দ্বারকাজির মন্দিরকে পাশে রেখে সেই যানেই সওয়ারি হয়ে চললাম দ্বীপের অপর প্রান্তে হনুমানডান্ডি পয়েন্টে। এ ধরনের গাড়ি চড়ে দশ কিলোমিটার ধুলো ওড়া ভাঙাচোরা পথ অতিক্রম করা যে কতটা সুখকর হতে পারে তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। দ্বীপের চারদিকে নীল জল। সোনালি সাগরতটে ছড়িয়ে আছে অজস্র ঝিনুকের সঙ্গে অবিকল ছোট ছোট হাতির দাঁতের মতো দেখতে একধরনের অপূর্ব

সামুদ্রিক শামুকের খোল। সোনালি তটভূমির ওপর শুকনো বালিতে তাঁবু গেড়েছে এন জি ও। চলছে প্রকৃতি পড়ুয়াদের নিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য শিক্ষাশিবির। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আবার ওখায় ফিরে চলা। আকাশ আর সাগরের জলে তখন পলাশ রঙের খেলা।

ক্ষুদ্র রণ

গুজরাট সফরে এবারে ওখা থেকে ধ্রাংগধরায়। পথ ২৯৫ কিলোমিটার। ধ্রাংগধরা থেকে অতি কম সময়ে পৌঁছনো যায় কচ্ছের লিটল রণে। ধ্রাংগধরা যখন পৌঁছলাম তখন রাত সাড়ে নটা। অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তাঘাট শুনশান। ওই শীতের রাতে অনেক খোঁজখবর করে ঠাঁই মিলল লিটল রণ ভ্রমণের আয়োজক সংস্থা 'ধ্রাংগধরা প্রকৃতি মণ্ডল'-এর কর্ণধার দেওজিভাই ধামেচার বাড়িতে। ভোলা যায় না অমন আতিথেয়তা। রাতে জুটল গরমাগরম খিচুড়ি, চাপাটি আর ভেজিটেবলকারি।

রণ ভ্রমণে যারা ইচ্ছুক তাদের জন্য থাকা ও খাওয়া সমেত প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা করেন দেওজিভাই। তাছাড়া ধ্রাংগধরায় থাকবার কোনও হোটেল নেই।

দেওজিভাই খুলে বসলেন বিরাট ম্যাপ। ম্যাপসহ নানা বইপত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেখালেন তার তোলা ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফ। সঙ্গে চলল বুনোগাধা, ফ্লেমিংগো, ক্যাসপিয়ান টার্ন, স্পাইনিটেলড লিজার্ডের নানা তথ্য সমৃদ্ধ লেকচার। রাতে শুতে শুতে প্রায় একটা বেজে গেল।

ভোরে উঠেই হাড়কাঁপানো জানুয়ারির শীতে হাতের কাছেই গরম জল রেডি। আটটার ভেতর স্নান, ব্রেকফাস্ট সেরে লাঞ্চ প্যাক নিয়ে হুডখোলা এক লজঝড়ে জিপে চেপে দেওজি ভাইয়ের সঙ্গে রওনা হলাম রণের পথে। বনবিভাগের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে তবে রণে প্রবেশ। ধ্রাংগধরা থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে রণের প্রবেশপথ।

দুপাশের কাঁটাঝোপের মাঝখান দিয়ে সঙ্কীর্ণ সর্পিল বালুকাময় পথ। প্রধানত প্রোসোপিস আর ম্যানগ্রোভে ঘেরা ৫,১৮০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রণের বিস্তৃতি। তবুও সে লিটল রণ। মাঝে আছে ৭৪টি ছোট বড় আইল্যান্ড। চারপাশে কোথাও মাইলের পর মাইল ফুটিফাটা রুক্ষ প্রান্তর, কোথাও বা ঝোপঝাড় ঘাসজমি নিয়ে অনেকটাই মরুপ্রকৃতির রূপ। একসময় কচ্ছ উপসাগরের অংশ ছিল এই রণ। ক্রমে নদীবাহিত পলি সঞ্চয়ের ফলে এবং ভূ-প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই অঞ্চল উঠে আসে জলতলের অনেক ওপরে। এখনও বর্ষায় কচ্ছ উপসাগরের জলে প্লাবিত হয় গোটা রণ অঞ্চল। সে সময় বন্যপ্রাণীরা আশ্রয় নেয় দ্বীপে। ফলে নোনা মাটি, নোনা জল এই নিয়েই বেড়ে ওঠা এখানকার গাছপালা, পশুপাখিদের। শীতে জল শুকিয়ে গেলেও জল জমে থাকে শুধু খাঁড়িগুলিতে আর কিছু জলাজমিতে। সেখানেই আড্ডা জমায় শীতের অতিথি হয়ে দূরদূরান্ত থেকে

আসা পরিযায়ী পাখির দল। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ওঠে প্রায় ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। আবার কোনও কোনও শীতের রাতে তাপমাত্রা নেমে যায় ১ থেকে ২ ডিগ্রির কাছাকাছি। রণের ৭০টি আইল্যান্ডসহ ৪,৯৫৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে ১৯৭৩ সালে ওয়াইল্ড অ্যাস স্যাঙ্কচুয়ারি গড়ে উঠলেও এ অঞ্চলের ওপর নির্ভর করে এখনও জীবিকা নির্বাহ করে চারপাশের একশোর বেশি গ্রামের মানুষজন। লবণ সংগ্রহ, অল্প কিছু চাষবাস, পশুচরানো এবং মাছ ধরাই এদের জীবিকা। দেশের প্রায় ২০ শতাংশ লবণ উৎপাদন হয় এই রণ অঞ্চল থেকেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্রমেই জলুস হারাচ্ছে এশিয়ার বুনো গাধার এই অভয়ারণ্য।

ওয়াচটাওয়ারে উঠে একনজরে দেখে নেওয়া যায় রণের প্রকৃতি। হাতের নাগালেই বুনো গাধার দল চরে বেড়াচ্ছে। একটু এগোলেই পিছন ফিরে দৌড়য়। দেখলাম একদল নীলগাই। দলের একজনই পুরুষ সদস্য। রাস্তা পেরিয়ে ঘাসের জঙ্গলে ঢুকে গেল এক ধূসর রঙা ডেজার্ট ফক্স। সদ্য খোঁড়া গর্ত দেখতে পেলেও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও দেখা পেলাম না স্পাইনি টেলড লিজার্ডের। এদের সংখ্যাও যথেষ্ট কমছে। লেজ থেকে ওষুধ তৈরির জন্য পোচিং হয়, ধরাও পড়ে।

ফিরতি পথে অনেক খোঁজাখুঁজির পর ঘাসের আড়ালে দেখা দিল একজোড়া হুবাড়া বাস্টার্ড। আর বাজানা ক্রিকে মিলল বেশ কয়েক প্রজাতির ওয়াটার বার্ডস।

আরেকটা কথা বলে রাখি, মরীচিকা দেখার আদর্শ জায়গা এই রণ। সামনেই মনে হচ্ছে জল আর গাছের ছায়া। যতই এগনো যায় ততই যেন পিছিয়ে যায়। রণ দেখে ফিরে আসতে রাত আটটা বেজে গেল।

নলসরোবর পক্ষিনিবাস

ভোরে ধ্রাংগাধরা থেকে রওনা হয়ে জিপে করে আমেদাবাদ পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। থাকার ব্যবস্থা হল হোটেল রায়পুর গেটের কাছে 'বনসাই ইন'-এ। পাশেই সুসজ্জিত রেস্তোরাঁ 'অবতার'। এখানেও থাকার ব্যবস্থা ভালো।

পরদিন সকাল সাতটায় এস টি বাসস্ট্যান্ড থেকে সরকারি বাসে রওনা দিলাম ৬৪ কিলোমিটার দূরে নলসরোবর পক্ষীনিবাসের পথে। শহরটাকে দুভাগ করে বয়ে চলেছে সবরমতী।

১২০ বর্গ কিলোমিটারব্যাপী এই জলাভূমি বিশ্বের রামসার সাইটগুলোর মধ্যে অন্যতম। পক্ষীনিবাসে পৌঁছতে ঘণ্টাদুয়েক সময় লাগে। সরোবরের গেটে পৌঁছবার দুকিলোমিটার আগে থাকতেই শুরু হয়েছে জলাভূমি। এখানেই বনদপ্তর থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে সরোবরে প্রবেশ। সরোবর চত্বর জুড়ে নৌকাওয়ালাদের হাঁকডাক। ঘাসে ঢাকা অগভীর সরোবরে ঘোরার জন্য লগিঠেলা বোটের ব্যবস্থা। রেঞ্জার সাহেবের কাছ থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে সরোবর সংলগ্ন বনদপ্তরের ক্যান্টিনে প্রাতরাশ সেরে বোটে চেপে শুরু হল সরোবর

পরিভ্রমণ। সরোবরের কোথাও হাঁটু সমান, কোথাওবা বুক সমান জল। মোট ৩৫০টি দ্বীপের মধ্যে ৩৬টি দ্বীপ বাদ দিয়ে সবগুলোই বছরের অধিকাংশ সময় জলমগ্ন থাকে। জলে আছে অফুরন্ত রুই, কাতলা, ট্যাংরা। সামনের এক দ্বীপে পর্যটকদের টাটকা মাছভাজা খাওয়াবার ব্যবস্থাও আছে।

বহু আগে মধ্য গুজরাট ও পূর্ব সৌরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী এই নিচু অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল উত্তরে লিটল রণ এবং দক্ষিণে খাম্বাত উপসাগরের। নলসরোবর সেই উপসাগরের ভগ্নাবশেষ বলে মনে করা হয়। জলও ঈষৎ লবণাক্ত। ১৯৬৯ সালে এই জলাভূমি চিহ্নিত হয় পক্ষীনিবাস হিসাবে। এর পরে রামসার সাইটের মর্যাদা পায় ১৯৭১-এ। পরিযায়ী পাখিসহ মোট ২৫০ প্রজাতির পাখির আনাগোনা এই সরোবরে। এদের মধ্যে পেলিক্যান, পেন্টেড স্টর্ক, লেসার ফ্লেমিংগো, সারস ক্রেন, ডেময়জেল ক্রেন উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও নানা প্রজাতির সরীসৃপ, পতঙ্গ স্তন্যপায়ীর অবাধ বিচরণ সরোবরের দ্বীপগুলোকে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঘুরে এযাত্রায় হাতের নাগালে দেখা দিল পেলিক্যান, ব্রাহ্মিণী হাঁস, সারস ক্রেন, কুট, পিনটেল, কটনটিল আর আইবিস। আমেদাবাদ ফিরে এলাম সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার বাসে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে আমেদাবাদ হয়ে জামনগর যাওয়া এবং আসার সবচেয়ে ভালো এবং সুবিধাজনক ট্রেন হাওড়া-পোরবন্দর (হাপা) দ্বিসাপ্তাহিক সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস। ট্রেনে প্যান্ট্রিকার না থাকলেও বিভিন্ন স্টেশন থেকে ট্রেনে খাবার সরবরাহ করার ব্যবস্থা আছে এবং খাবারের মানও বেশ ভালো। প্রয়োজনে আমেদাবাদ এক্সপ্রেসে আমেদাবাদ পৌঁছে সেখান থেকে বাসে বা গাড়িতে অথবা ট্রেন বদল করেও জামনগর পৌঁছনো যায়। তবে সময় অনেক বেশি লাগবে।

কীভাবে বেড়াবেন

জামনগরসহ অন্যান্য জায়গায় শর্ট ট্রিপের জন্য অটোই সুবিধাজনক। বেশ দরাদরি করতে হয়। স্টেশন থেকে হোটেল রাজধানীর অটোভাড়া ৪০ টাকা। লংট্রিপের জন্য জামনগর থেকে হোটেলের মালিকের সঙ্গে কথা বললে এরাই গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন। সবসময় গাড়ি থাকলে সুবিধা হয় এবং খরচ অ্যাম্বাসাডরের ক্ষেত্রে দিনপ্রতি ৮০০ থেকে ১,০০০ টাকা। ড্রাইভারকে নাইট স্টে বাবদ দিনপ্রতি ১০০ টাকা দিতে হয়। মেরিন ন্যাশনাল পার্কে এন্ট্রি ফি প্রতিদিন জনপ্রতি ৩০ টাকা এবং শিশুদের ১০ টাকা। স্টিল ক্যামেরা চার্জ ৫০ টাকা এবং ভিডিও ক্যামেরা ২,৫০০ টাকা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে তার জেরক্স কপি কাস্টমস অফিসে দেখিয়ে পারমিশন অবশ্যই নেবেন। দ্বীপে যাবার জন্য জোয়ার-ভাটার সময় অবশ্যই জেনে নেবেন ফরেস্ট অফিস থেকে। বেদি পোর্ট থেকে সকালে পিরোটান দ্বীপে গিয়ে সারাদিন ঘুরে সন্ধ্যায় ফিরে আসতে আগে থেকে কথা বলুন কোনও ফিশিং ট্রলার

অপারেটর বা সরাসরি কোনও বোটম্যানের সঙ্গে। দক্ষিণা ছোট বোটের জন্য ৮০০ থেকে ১,০০০ টাকা। সঙ্গে সারাদিনের পানীয় জল, খাবার, গ্লুকোজ ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রসহ ফাস্ট এইড অবশ্যই রাখা উচিত। সঙ্গে বাইনোকুলার বা টুপি থাকা এবং পায়ে কেডস পরে থাকা বাঞ্ছনীয়। গাইডকে ১০০ থেকে ২০০ টাকা দক্ষিণা দেওয়া চলে।

ওখা থেকে বেট দ্বারকার লঞ্চভাড়া যাতায়াত জনপ্রতি ১০ টাকা। যন্ত্রচালিত রিকশায় হনুমান ডান্ডি পয়েন্টের ভাড়া যাতায়াতে জনপ্রতি ৩০ টাকা। ওখার ফিশারিজ মিউজিয়াম ও অ্যাকোয়ারিয়াম খোলা থাকে শনি, রবি ও ছুটির দিন বাদে সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত। জামনগর ও ওখার এই মিউজিয়ামে কোনও প্রবেশমূল্য লাগে না।

জামনগর থেকে খিজাড়িয়া ঘোরার জন্য তিন থেকে চার ঘণ্টার জন্য অটোভাড়া ১৫০-২০০ টাকা। প্রবেশমূল্য জনপ্রতি ৩০ টাকা। শিশুদের ১০ টাকা। স্টিল ক্যামেরা চার্জ ৫০ টাকা, ভিডিও ক্যামেরা ২,৫০০ টাকা।

ধ্রাংগধরা থেকে দেওজিভাই ধামেচার বাড়িতে একদিনের থাকা-খাওয়া সমেত প্যাকেজ ট্যুরের দক্ষিণা জনপ্রতি ৬৫০ টাকা (পরদিনের প্রাতরাশ সহ)। প্রায় চল্লিশজনের থাকার ব্যবস্থা আছে এখানে। রণের প্রবেশমূল্য ৩০ টাকা জনপ্রতি। শিশুদের ১০ টাকা। স্টিল ক্যামেরা ৫০ টাকা, ভিডিও ক্যামেরা ২,৫০০ টাকা।

ধ্রাংগধরা থেকে আমেদাবাদের পথে স্থানীয় গ্রামে তিলের খেতে এবং ঘাসজমিতে সহজেই দেখা পাওয়া যায় ব্ল্যাকবাক বা কৃষ্ণসার মৃগের।

আমেদাবাদ পৌঁছবার ঘণ্টাদুয়েক আগে অল্প সময়ে আগ্রহী পর্যটকরা দেখে নিতে পারেন লোথালে হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন।

আমেদাবাদে রেলস্টেশন থেকে এস টি বাসস্ট্যান্ড অটোতে ৭-৮ মিনিটের পথ। ভাড়া ১৫ টাকা।

নলসরোবর যাবার একমাত্র বাস সকাল সাতটায় এবং বেলা ৩টেয়। একপিঠের বাসভাড়া জনপ্রতি ২৫ টাকা। এন্ট্রি ফি জনপ্রতি ৩০ টাকা, শিশুদের ১০ টাকা। স্টিল ক্যামেরা ৫০ টাকা এবং ভিডিও ক্যামেরা ২,৫০০ টাকা। সরোবরের পাশে ক্যান্টিনে অর্ডার অনুযায়ী ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ পাওয়া যায়। বোটচার্জ ঘণ্টাপ্রতি ১৫০ টাকা অথবা জনপ্রতি ২০ টাকা প্রতি ঘণ্টায়। সারাদিন ঘুরতে ৮০০ থেকে ১,০০০ টাকা লেগে যায়। নৌকাওলাই গাইডের ভূমিকা নিয়ে সুন্দরভাবে পাখি চেনায়। খুঁজে বের করে কোন দ্বীপে কোন পাখি ঘাঁটি গেড়েছে। তাই ঘোরার শেষে আবদার করে বখশিস চাইলে ১০০-২০০ টাকা ওদের হাতে দেওয়া চলে। ফেরার শেষ বাস বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। রণে ঘোরার জন্য যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়:

Devjibhai Dhamecha, Devkrupa, Jin Plot, Dhrangadhra
☎ (02754) 280560, 98255 48090

কোথায় থাকবেন

জামনগরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অসংখ্য হোটেল। ভাড়া দ্বিশয্যাঘর ৩০০ থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে। প্রতি হোটেলেই গরমজলের সুবন্দোবস্ত আছে। খাবার ব্যবস্থাও ভালো। নারারা টাপুতে ফরেস্ট রেস্টহাউসে ১টি ডর্মিটরিসহ ২টি বাথরুম সংলগ্ন দ্বিশয্যাঘর।

ভাড়া ঘরপ্রতি ৪০০ টাকা। থাকার অনুমতি জামনগর থেকে নিতে হবে। টাকা দেবেন নারারাতে। এখানে খাবার ব্যবস্থা দশ কিলোমিটার আগে ওয়াড়িনাড়ে। বেশ কিছু হোটেল এবং ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশনের ক্যান্টিন আছে। নারারাতে কোনও দোকানপাট নেই। দ্বারকাতে গায়ত্রী শক্তিপীঠের শান্তিবন লজে সরাসরি ২ দিনের বুকিং দেওয়া হয়। ভাড়া ২০০ থেকে ৩৫০ টাকার মধ্যে। সমুদ্রের সামনে দোতলা ও তিনতলার ঘর বেশ ভালো। খাবার জন্য মন্দির ও বাজার চত্বরে ছড়িয়ে আছে অজস্র রেস্তোরাঁ, বেশ সস্তায় খাওয়া যায়। জামনগর, নারারা বা ওয়াড়িনাড়, দ্বারকায় সবই নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা।
পোশিত্রায় কোনও থাকার জায়গা নেই। ওখা থেকে গাড়ি নিয়ে সঙ্গে পানীয় জল ও শুকনো খাবার নিয়ে সারাদিন ধরে ঘুরে আসতে হয়। পোশিত্রায় গাইড ইব্রাহিমের খোঁজ করুন। ওখাতে বিভিন্ন মানের হোটেল আছে। ওখানে আমিষ খাবার পাবেন। তবে ভালো খাবারের জন্য যে হোটেলে থাকবেন সেখানেই খাবেন। হোটেলভাড়া দ্বিশয্যাঘর ৩০০ থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে।

কখন যাবেন

গুজরাটের প্রকৃতি শুষ্ক। সারাবছর বেশ গরম। শীতে তীব্র ঠান্ডা এই অঞ্চলে। তবুও সবচেয়ে ভালো সময় নভেম্বর থেকে জানুয়ারি।

কেনাকাটা

প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার জন্য গুজরাটি সম্ভারের সম্ভার কেনাকাটা করুন দ্বারকা এবং বেট দ্বারকা থেকে। এছাড়া জামনগর ও আমেদাবাদেও পাবেন নানা প্রকার গুজরাটি উপহার সামগ্রী।

কী করবেন না

মেরিন পার্কে কোনও গানবাজনার সরঞ্জাম নিয়ে এবং প্লাস্টিক জিনিস নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। এ অঞ্চলসহ গোটা গুজরাটে মদ সঙ্গে বহন করা ও পান করা নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়। জীবন্ত প্রবালের ওপর হাঁটবেন না বা তার ওপর দাঁড়াবেন না।
যোগাযোগের ঠিকানা:

Conservator of forests
Marine National Park, Ganjiwada Nagar
Nagnath Gate Police Chowki, Jamnagar
☎ (0288) 552077, 679371

'ভ্রমণ' জুলাই, ২০০৪

মান্নার উপসাগরের উপকূলে

জয়দীপ সরকার

তুতিকোরিন থেকে আমরা যাব মান্দাপাম-পাম্বান-রামেশ্বরম হয়ে ধনুষ্কোটি। মান্নার উপসাগরকে বেষ্টন করে পথ। প্রবাল ও বাজানোর শঙ্খ সহ নানান সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যে ভরা ভারতের পূর্ব উপকূলের এই উপসাগরটি ১৯৮৯ সালে মেরিন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের শিরোপা পায়। আপাতত এটিই ভারতের প্রথম এবং একমাত্র মেরিন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ। তামিলনাড়ু উপকূল বরাবর কমবেশি দূরত্বে শিঙ্গলি, ক্রুসাদাই, পুল্লিভাসাল, মানাউলি, হেয়ার, মুল্লি, ভালাই, আপ্পা, ভন ইত্যাদি মজাদার নামের ছোট ছোট একুশটি বসতিবিহীন দ্বীপ নিয়েই ছোট্ট সংসার মান্নার উপসাগরের। অধিকাংশ দ্বীপ ঘিরেই সমুদ্রের তুঁতে নীল জলের তলায় রঙিন প্রবাল, সাগরকুসুম, রংবাহারী ক্লাউন ফিশ, ঘোড়া মুখো সি হর্স, আর নানান বর্ণের স্টারফিশের রাজত্ব। এছাড়াও স্বচ্ছ জলের তলায় সাগর ঘাসের ঘন সবুজ বনে চরে বেড়ায় সমুদ্রগরু। ভারতের একমাত্র এই অঞ্চলেই টিমটিম করে নিজের অস্তিত্বকে এখনও টিকিয়ে রেখেছে ডুগং নামের বিপন্ন প্রজাতির এই স্তন্যপায়ী প্রাণীটি।

জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেও দিনেরবেলায় ঘাম ঝরানো গরম এই অঞ্চলটায়। গতকাল কন্যাকুমারী থেকে নাগেরকয়েল হয়ে তুতিকোরিন পৌঁছেছি। এখনও সেভাবে পর্যটক মহলে তুতিকোরিনের নামডাক না থাকায় খুব বেশি হোটেলও নেই। বন্দরনগরী তুতিকোরিন মূলত মৎস্য ব্যবসায়ী, নুনের কারবারিদের একচেটিয়া রাজত্ব হলেও সংলগ্ন মান্নার উপসাগরের জলে মুক্তো চাষের সুবাদে এর খ্যাতি 'পার্ল সিটি' নামে। সাগরপাড়ে কোনও থাকার হোটেল না থাকায় আমাদের বাধ্য হয়েই থাকতে হল শহরের বাসআড্ডার অল্প দূরে বিলাসবহুল হোটেল 'সুগম'এ। ভোরবেলা একখানা অটোরিকশায় করে চলে যাই সাগরপাড়ের জেলেপট্টিতে। কয়েক মাইল এলাকা জুড়ে সামুদ্রিক মৎস্য সহ লবস্টার, স্কুইড, ক্র্যাব, ক্যটল ফিশের রমরমা ব্যবসা। এখানেই জেলেদের বাজার-হাট, ঘর-সংসার। সমুদ্রে ধরা এইসব মাছ প্রসেসিং করার পর বরফবন্দী হয়ে চালান যাচ্ছে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে। আবার জালে ওঠা ফেলে দেওয়া স্টার ফিশ, শামুক, আর্চিন, স্যান্ড ডলার রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে হাঁস-মুরগির খাদ্য প্রস্তুত হচ্ছে পোল্ট্রিতে চালান দেওয়ার জন্য।

বিকেলে একখানা গাড়ি রিজার্ভ করে চললাম পোর্টের দিকে। ফিশারি ইনস্টিটিউট পার হতেই পোর্ট এলাকার শুরু। চেন্নাইয়ের মতোই বেশ বড় সি পোর্ট বাঁহাতে। রাস্তার ধারে মাইলের পর মাইল শুধু সল্ট বেসিন। সমুদ্রের জল আটকে নুন তৈরির ব্যবসা করছে নুনের কারবারিরা। কোথাও কোথাও স্তূপীকৃত করা আছে সাদা মোটা দানার নুন। লকগেট পেরিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরে পৌঁছে গেলাম সৈকতে। যতদূর দৃষ্টি যায় চওড়া সোনালি বালুকাতট। পিছনটায় ঝাউ আর কেয়াগাছের ঘন ঝোপ। এই সৈকতে প্রবেশ করার ঠিক আগেই ডানহাতে মনোরম পরিবেশে পোর্ট ট্রাস্টের গেস্টহাউস। আগে থেকে সংরক্ষণ করা থাকলে থাকা যায়। বাঁদিকেই পোর্ট। বিরাট বিরাট মালবাহী জাহাজের আনাগোনা। উত্তাল সমুদ্রকে বাঁয়ে রেখে বেশ কিছুটা এগোতেই অবাক কাণ্ড। গোটা বিচ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবহেলায় পড়ে আছে অজস্র হলুদ, লাল, কমলা, গোলাপি রঙের ঝাউপাতার মতো প্রবাল আর স্পঞ্জ। সকালে মাছ ধরার জালে উঠেছিল এইসব প্রাণীকুল। এখন সকলেই মৃত। লম্বা নাইলনের সুতোয় বাঁধা সার সার বঁড়শিতে জ্যান্ত শামুকের নরম দেহটাকে গেঁথে টোপ ফেলে ঢেউয়ের মাথায় ছুঁড়ে দিয়ে পার্শে জাতীয় মাছ ধরছে একদল কিশোর বালক। সন্ধ্যায় সমুদ্রের জলে লাল নীল আলোর প্রতিফলনে ঝলমল করে গোটা পোর্ট এলাকা। আমাদের অনুমতিপত্র থাকায় বেশ কিছু মৃত প্রবাল, স্পঞ্জ সংগ্রহ করে ফিরে আসি হোটেলে।

পরদিন ভোরে ব্রেকফাস্ট সেরে বাসে রওনা হলাম মান্দাপামের পথে। বাসে পর্যটক বলতে আমরা চারজন। এছাড়া দু-চারজন স্থানীয় মানুষজন। তেল চকচকে কালো পিচরাস্তা ধরে বাস ছুটল। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ রাস্তা দেখে মনে হয় কেউ যেন সযত্নে ঝাড়ু দিয়ে পথ পরিষ্কার করে রেখেছে। রাস্তার দুপাশ ধরে কেবলই এক পায়ে দাঁড়ানো তালগাছের সারি। তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে নীলচে ধূসর পূর্বঘাট পর্বতমালার গিরিশ্রেণী। আবার পাহাড়ের নীচেই দূরে হাল্কা সবুজ ধানের খেত। সব মিলিয়ে অনন্য সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ। মান্দাপাম পৌঁছলাম বেলা একটায়। মান্দাপামের 'বেবি মেরিন এক্সপোর্ট অথরিটি'র মালিক সুধাকরণ নায়ার আমাদের জন্য তামিলনাড়ু পর্যটনের 'হোটেল তামিলনাড়ু' বুক করেই রেখেছিলেন। নায়ার কেরালার অধিবাসী। কিন্তু সামুদ্রিক চিংড়ি, কাঁকড়া, স্কুইডের রপ্তানি-ব্যবসার সূত্রে বহুদিন আছেন এখানে। পূর্বপরিচিতির সূত্র ধরেই কলকাতা থেকে টেলিফোনে আমাদের এই সফরের কথা জানাতেই নানাভাবে সাহায্য পেয়েছিলাম।

মান্দাপামের হোটেল তামিলনাড়ুর কটেজের দরজা খুলে বারান্দায় বেরোতেই দেখি একেবারে হাতের নাগালেই ছলাৎ ছলাৎ শব্দে বালুকাতটে ভাঙছে ছোট ছোট ঢেউ। খোলা বারান্দার পাঁচিল টপকে এক লাফে বিচে নেমে স্নান করার খাসা ব্যবস্থা। এছাড়া খিড়কির দরজা খুলেও বিচে যাওয়া যায়। ভরা কোটালের জোয়ারে জল চলে আসে একেবারে কটেজের গোড়ায়। পূর্ণিমায় মান্নার উপসাগরের জ্যোৎস্নাস্নাত ঢেউয়ের রূপ বলে বোঝানোর নয়। প্রতিদিনই সকাল

সন্ধ্যায় সারাটা আকাশ আর সাগরের জলে চলে ফিরোজার সঙ্গে নানান শেডের লাল, কমলা, হলদে রঙের সাজবদলের খেলা। বিচের বাঁদিক ধরে চলতে চলতে পৌঁছনো যায় পাম্বান সেতুর গোড়ায়। প্রায় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ এই পাম্বান সেতু ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে রামেশ্বরম দ্বীপের। তুতিকোরিন যেমন মান্নার উপসাগরের দক্ষিণ সীমা নির্দেশ করে, তেমনি উত্তর সীমায় এই পাম্বান সেতু। এটাই ভারতের একমাত্র সমুদ্র সেতু। এই রেল সেতুর সমান্তরালে অনেক উঁচু দিয়ে চলেছে ভারতের বৃহত্তম সড়ক সেতু 'ইন্দিরা সেতু'। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানটা বেশ মজার। সেতুর ডাইনে মান্নার উপসাগর আর বাঁয়ে 'পক বে' (পক উপসাগরীয় লেগুন)। আর মূল ভূখণ্ডটা সরু হয়ে সেতুর গোড়ায় যেখানে শেষ হয়েছে তার দুদিকে একইসঙ্গে চোখে পড়ে উত্তর দক্ষিণ দুই উপকূল। মান্দাপাম সৈকতের বিপরীতেই রামেশ্বরম দ্বীপের পাম্বান সৈকত। এখানেও ভোর হতেই মাছ ধরে ফেরে শ'য়ে শ'য়ে মাছধরা নৌকো। সেগুলোকে ঘিরেই আমাদের বেশি কৌতূহল। মাছের সঙ্গে জালে ধরা পড়েছে ইয়া বড় বড় লাল-নীল নকশা আঁকা কাঁকড়া, লবস্টার, স্টার ফিশ, আর্চিন এইসব প্রাণী। এখানেই প্রথম ঢেউয়ে ভেসে আসতে দেখলাম পর্তুগিজ-ম্যান-অব-ওয়ার নামের লম্বা কর্ষিকাওয়ালা তুঁতে নীল রঙের ছোট্ট জেলি ফিশ। অনভ্যস্ত হাতে বেকায়দায় ধরলেই হাতে ফুটিয়ে দেয় তীব্র জ্বালা ধরানো বিষমাখা হাজারো তীরের ফলা। সকলের বারণ সত্ত্বেও ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে নির্বিঘ্নেই সেদিন ধরে এনেছিলাম ওই ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রাণীটিকে।

সন্ধেবেলায় জ্যোৎস্নামাখা ফুরফুরে নোনা হাওয়ায় বারান্দা টপকে বিচে নেমে দেখি কোথা থেকে হাজির হয়েছে আগন্তুকের মতোই শ'য়ে শ'য়ে হলদে রঙা কাঁকড়ার দল। মাথার ওপর সাদা দুটো চোখ। নাম এদের ভূত কাঁকড়া। পশ্চিমবঙ্গ আর ওড়িশার উপকূলের সাগরতটেও এদের দেখা যায়। তবে তাদের রং টকটকে লাল। কাঁকড়াদের ব্যাপার স্যাপার ভালো করে বুঝে উঠতে না উঠতেই সঙ্গীর চিৎকার 'ও মশাই অক্টোপাস'। পায়ের পাতা ডোবা জলে সত্যিই দেখি, সাঁতরাচ্ছে মাঝারি সাইজের এক অক্টোপাস। গবেষণার জন্য এখান থেকেই জ্যান্ত অক্টোপাস ধরে নিয়ে যাবার সুবিধা থাকায় আমাদের এখানে আসার এটাও একটা উদ্দেশ্য ছিল বৈকি। তবে বাছাধন আপনিই এসে ধরা দেবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় তাকে ধরে বালতিতে জল দিয়ে যখন আনা হল তখন আমাদের উল্লাস দেখে কে। ঠিক হল ওকে অক্সিজেন প্যাক করে কলকাতা নিয়ে গিয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, 'ভ্রমণ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক রতনলাল ব্রহ্মচারীকে চালান দেওয়া হবে গবেষণার জন্য। জ্যান্ত ঝিনুক আর কাঁকড়ার বাচ্চা ধরে অক্টোপাসকে খাওয়ানোর চেষ্টা করতে করতে শেষপর্যন্ত আমাদের রাতের খাওয়াদাওয়া, ঘুম মাথায় উঠল। অথচ ওই নিশাচর প্রাণীটিকে না খাওয়ালেই নয়। সে তো বেরিয়েছিল খাবারের সন্ধানে। না খাওয়ালে তো বেচারা উপোসী থাকবে সারা রাত।

আমাদের অদম্য উৎসাহ দেখে উপকূল রক্ষীবাহিনীর দপ্তর থেকে নায়ার ক্রুসাদাই দ্বীপে যাবার ছাড়পত্র যোগাড় করে আনলেন। এক কথায় তা অসাধ্যসাধন। শুধু তাই নয়, কোস্টগার্ড দপ্তরের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বিনা খরচে বিশেষ একটি লঞ্চ বরাদ্দ হল। রওনা হলাম ক্রুসাদাই দ্বীপের দিকে। মান্দাপামের উপকূল রক্ষীবাহিনীর জেটি থেকে ছেড়ে 'পক বে' পেরিয়ে লঞ্চ যখন পাম্বান সেতু অতিক্রম করে মান্নার উপসাগরে পড়বে তখনই স্বচ্ছ জলের তলায় শুরু হল রঙিন জগৎ। বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে প্রবালের রাজত্ব। প্রায় ঘণ্টাখানেকের জার্নিতে পৌঁছলাম ক্রুসাদাই। জলের গভীরতা কম থাকায় লঞ্চ থাকল প্রায় মাঝ সাগরে। লঞ্চ থেকে উপকূল রক্ষীরা ইশারা করতেই একখানা বড়সড় মাছ ধরার নৌকো চলে এল আমাদের নিতে। ওই নৌকোয় চেপে আরও কিছুটা এগোলেও বালি চরায় নৌকো আটকে যাওয়ায় নৌকো থেকে আমাদের লাফিয়ে নামতে হল কোমর জলে। সেখান থেকে হেঁটে তবে ক্রুসাদাই দ্বীপে পা রাখলাম। দ্বীপের সামনেই প্রবেশ পথের পাশে লেখা আছে— 'Krusadai Island- Paradise for Marine Biologist'. দ্বীপের এপাশের সমুদ্রে মাচা থেকে খাঁচা ঝুলিয়ে তাতে মুক্তো চাষ হচ্ছে। পায়ে চলার পথ ধরে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের মধ্য দিয়ে পৌঁছলাম দ্বীপের অপর প্রান্তে। গোটা দ্বীপজুড়ে কেয়াগাছ। তাতে অবিকল পাকা আনারসের মতো ফল ঝুলছে। জোয়ার এসে পড়ায় খুব ভালো করে জীববৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করা গেল না ঠিকই। তবে বেশ কিছুক্ষণ আমরা দ্বীপের তীর বরাবর হেঁটে ভালোভাবে এই দ্বীপের প্রকৃতিকে উপভোগ করে আবার ফিরে এলাম মান্দাপাম। সেদিন দুপুরেই বিশেষ ভোজে নিজের প্রাসাদোপম বাড়িতে আপ্যায়িত করলেন নায়ার। নায়ারের কুক চোদ্দ বছর বয়সী এক কেরল কিশোর। নারকেল দিয়ে নানারকম সামুদ্রিক কাঁকড়া, চিংড়ি, ভেটকি, পার্শে মাছের নানান দক্ষিণী পদের স্বাদ আজও মুখে লেগে আছে। ওই দিন সন্ধ্যায় তাঁর ফার্মের এক কর্মচারীর বিবাহ উৎসব উপলক্ষে আমরা আবার নিমন্ত্রিত হলাম। তবে খুবই সমস্যায় পড়লাম উপহার নিয়ে। প্রথমত, ওদের উপহার সংক্রান্ত রীতিনীতি জানা নেই, তার ওপর ধারে কাছে কোনও কিছু উপহার সামগ্রী কেনার কোনও দোকান নেই। অগত্যা বিনা উপহারেই সেই প্রথম কেরল যুবকের বিবাহ উৎসবে যোগদান করতে বাধ্য হলাম। বিবাহ অনুষ্ঠান আমাদের এখানকার মারোয়াড়িদের মতো অনেকটাই। তবে খাদ্য তালিকাটা বেশ অদ্ভুত। কলাপাতায় আস্ত একখানা করে কলা। সঙ্গে সুগন্ধি চালের ভাত, নারকেল দিয়ে সবজির ও মাছের নানান পদ এবং পাউরুটি টোস্টের সঙ্গে নারকেল দিয়ে মুরগির মাংসের বিশেষ এক পদ। শেষ পাতে টক দই ও মিষ্টিমুখের পর গরম কফি।

পরদিন ভোরে ব্রেকফাস্ট সেরে ট্রেনে চেপে চললাম সেতু পেরিয়ে রামেশ্বরমের পথে। মিটার গেজ লাইন ধরে সেতু পেরতে প্রায় পনেরো মিনিট সময় নেয় ট্রেন। পাম্বান সেতুর ওপর দিয়ে ট্রেনে চেপে যাওয়াটা বেশ উপভোগ্য।

আদ্দিকালের এই সেতু এতই নিচু যে ঢেউয়ের জল পিলারের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ছিটে লাগে ট্রেনের গায়ে। মনে হয় জানলা দিয়ে হাত বাড়ালেই সমুদ্রকে ছোঁয়া যাবে। ট্রেন চলে দুলকি চালে— 'ঢুক ঢুক' 'ঢুক ঢুক' শব্দে। সেতু পেরলেই পাম্বান স্টেশন। এর পরের এবং শেষ স্টেশন রামেশ্বরমে নেমে একখানা অটো নিয়ে গেলাম মন্দিরে। শহরটা বেশ অপরিচ্ছন্ন। রামনাথস্বামীর মন্দির একেবারে সমুদ্র লাগোয়া। পুব-পশ্চিমে গোপুরম। পুবের গোপুরমই প্রধান ফটক। সামনের রাস্তা গেছে অগ্নিতীর্থম বিচের দিকে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম রামেশ্বরম মন্দির একাধারে শৈব ও বৈষ্ণব তীর্থ। দ্রাবিড়ী শৈলিতে এই মন্দির নির্মাণে সময় লেগেছিল প্রায় সাতশ বছর। ভারতের দীর্ঘতম (প্রায় ১,২০০ মিটার) অলিন্দ বা করিডোর আছে এই মন্দিরেই। মন্দিরের দেওয়ালে ও স্তম্ভের গায়ের কারুকার্য অতি চমৎকার।

মন্দির দর্শন সেরে অটোরিকশা ভাড়া করে চললাম কুড়ি কিলোমিটার দূরে দ্বীপের শেষ বিন্দু ধনুষ্কোটির উদ্দেশে। সরু ভূখণ্ডের মাঝ বরাবর পিচরাস্তা গেছে ধনুষ্কোটি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত। রাস্তার বাঁয়ে ঝাউ আর কেয়া ঝোপের পিছনে শান্ত অগভীর জলের পক বে আর ডাইনে উত্তাল মান্নার উপসাগর। প্রায় দশ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে যখন চলেছি তখনই চোখ গেল বাঁয়ে। 'পক বে'র শান্ত নীল জলে দুলকি চালে খাবার সন্ধানে ব্যস্ত কয়েকশো লম্বা গলাওয়ালা গোলাপি পালকে ঢাকা ফ্লেমিংগো। অটো দাঁড় করিয়ে অনেকটা সময় ব্যয় করতেই হল ওদের চালচলন দেখতে। ধনুষ্কোটির বাসস্ট্যান্ডেই পিচরাস্তা শেষ। শেষ সাত কিলোমিটার যেতে হবে শুকনো বালি ভেঙে। এক মিলিটারি ট্রাকে স্থানীয় আদিবাসী আর জেলেদের দল যাচ্ছে দেখে আমরাও গুঁতোগুঁতি করে সেঁধিয়ে গেলাম ত্রিপল ঢাকা ওই ট্রাকের পেটে। এক সময় ধনুষ্কোটি ছিল এক ব্যস্ত বন্দর। ধনুষ্কোটি ও শ্রীলঙ্কার তালাই মান্নারের মধ্যে ছিল শিপিং কর্পোরেশনের ফেরি সার্ভিস। ছিল পাসপোর্ট অফিস, গির্জা, রেলস্টেশন। ১৯৬৪ সালের বিধ্বংসী সামুদ্রিক ঝড়ে সবকিছুই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় যাত্রী বোঝাই এক ট্রেন। এর পর থেকেই কোলাহলমুখর ধনুষ্কোটিতে নিস্তব্ধতার শুরু। এখন সবই ভগ্নস্তূপ। ট্রাক থেকে যখন ধনুষ্কোটি নামলাম, গরমে একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থা। এর কিছুটা উত্তরে পক প্রণালী পথে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে ভারত মহাসাগরের মিলন। ফিরতি পথে দেখি ধনুষ্কোটির মাছের বাজারে বিক্রি হচ্ছে সদ্য ধরা লাল রঙের অর্নামেন্টেড স্টার ফিশ। মাত্র দশটা টাকার জন্য এভাবেই নির্বিচারে মারা পড়ছে এইসব সাগর-প্রাণী। রামেশ্বরম পৌঁছে চলে গেলাম পাম্বান বিচে। বিচের একপাশে জেলে বসতি আর অকশান ইয়ার্ড। এখান থেকে মান্নার উপসাগর, পক বে, সেতুসমুদ্রমের পুরো দৃশ্যটা চমৎকার দেখায়। মান্নার উপসাগর আর তার তটভূমির ল্যান্ডস্কেপকে ষোলআনা উপভোগ করে বিকেলে রামেশ্বরম এক্সপ্রেসে রওনা হলাম চেন্নাইয়ের পথে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে দক্ষিণগামী যে কোনও এক্সপ্রেস ট্রেনে (করমণ্ডল এক্সপ্রেস ও চেন্নাই মেল অধিক সুবিধাজনক) চেন্নাই সেন্ট্রাল পৌঁছে ঠিক উল্টোদিকের 'পার্ক' স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেনে তাম্বরম পৌঁছন। এখান থেকে মিটার গেজ ট্রেনে রামেশ্বরম। ৬৭১৩ সেতু এক্সপ্রেস বেলা ১টায় ছেড়ে মাদুরাই ছুঁয়ে পরদিন ভোর ৬টা ৫০ মিনিটে এবং ৬৭০১ রামেশ্বরম এক্সপ্রেস রাত ৮টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে পরদিন দুপুর ১টা ২০ মিনিটে রামেশ্বরম পৌঁছয়। যাঁরা দক্ষিণ ভারত সফরে কন্যাকুমারী হয়ে আসতে চান তাঁরা কন্যাকুমারী থেকে সরাসরি (অথবা নাগেরকয়েলে বাস পরিবর্তন করে) বাসে আসুন তুতিকোরিন। তুতিকোরিন থেকে আবার বাসেই চলুন রামেশ্বরম। মান্দাপামে থাকতে চাইলে ট্রেনে বা বাসে নামুন মান্দাপাম। রামেশ্বরম থেকে সরাসরি মাদুরাই, চেন্নাই, তুতিকোরিন ও কন্যাকুমারীর বাস সার্ভিস আছে। ধনুষ্কোটি যাবার জন্য রামেশ্বরম বাসস্ট্যান্ড থেকে আধঘণ্টা অন্তর বাস ছাড়ে। এছাড়াও ২০০-৩০০ টাকায় পুরো অটো ভাড়া করে যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন

মান্দাপামে একমাত্র থাকার ও খাওয়ার নির্ভরযোগ্য স্থান তামিলনাড়ু পর্যটনের হোটেল তামিলনাড়ু। এখান থেকে বাসস্ট্যান্ড আধ কিলোমিটার ও মান্দাপাম রেলস্টেশন এক কিলোমিটার। রামেশ্বরমে হোটেল তামিলনাড়ু মন্দির লাগোয়া সমুদ্রের ধারে। রামেশ্বরমে ইউথ হোস্টেল আছে। এছাড়াও গোটা রামেশ্বরম শহর সহ মন্দির এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অজস্র খাবার ও থাকার হোটেল আছে। ধনুষ্কোটিতে থাকার কোনও নির্ভরযোগ্য হোটেল নেই। তুতিকোরিনে থাকার নির্ভরযোগ্য হোটেল সুগম। সমস্ত হোটেলেই স্পট বুকিং হয়। হোটেল তামিলনাড়ুতে অগ্রিম বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায়:

জি-২৬, দক্ষিণাপণ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৬৮ ☎ ২৪২৩-৭৪৩২

রামেশ্বরমে বাসস্ট্যান্ডের কাছে মন্দির কমিটির অফিস। কমিটির নিজস্ব রেস্টহাউস ও কটেজের বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায়:

এক্সিকিউটিভ অফিসার

আরুলমিগু, রামনাথস্বামী, রামেশ্বরম, তামিলনাড়ু-৬২৩ ৫২৬

তুতিকোরিনে সমুদ্রের ধারে পোর্ট ট্রাস্টের গেস্টহাউসে থাকতে হলে যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায়:

পাবলিক রিলেশন অফিসার

তুতিকোরিন পোর্ট ট্রাস্ট, তুতিকোরিন-৪

কী খাবেন

এই অঞ্চলের সমস্ত রেস্তোরাঁয় নিরামিষ আহারের সঙ্গে ডিম সেদ্ধ পাবেন। সঙ্গে টক দই, ইডলি, ধোসা, উত্তপম, উপমা, বাঁধাকপির পুর দেওয়া সিঙাড়ার স্বাদ নিতে ভুলবেন না। অবশ্যই মিনারেল ওয়াটার অথবা জিওলিন মেশানো জল খাবেন।

কী কিনবেন

কড়ি, ঝিনুকের নানান ধরনের ঘর সাজাবার শৌখিন দ্রব্যের সঙ্গে ছোট উপহার সামগ্রী পাবেন। এছাড়াও পাবেন দক্ষিণী শৈলীর হাতের কাজের নানান সম্ভার। এসবই পাবেন রামেশ্বরমের মার্কেটে এবং মন্দির লাগোয়া অঞ্চলে। কড়ি, শঙ্খ, ঝিনুকের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান মুসলিম স্ট্রিটের আব্দুল কালামের দোকান। শঙ্খ কিনলে অবশ্যই রসিদ নেবেন।

মনে রাখবেন

সাগর প্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুসারে প্রবাল, শঙ্খ, স্টার ফিশ কেনা বা সঙ্গে অনুমতিপত্র ছাড়া বহন করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এইসব সামগ্রী সঙ্গে থাকলে ফেরার সময় ট্রেনে চেকিং হলে সমস্ত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে মোটা অঙ্কের স্পট ফাইন হতে পারে।

হাতে সময় থাকলে মান্দাপাম থেকে বাসে দু কিলোমিটার গিয়ে 'মান্দাপাম ক্যাম্প' স্টপেজে নেমে সেন্ট্রাল মেরিন ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর মিউজিয়াম ও সামুদ্রিক মাছঘর অবশ্যই দেখে আসুন। মাছ ঘরে দেখবেন কচ্ছপ, অক্টোপাস, রঙিন মাছ, স্টার ফিশ, সি হর্স, সাগর কুসুম সহ বিস্ময়কর জীবন্ত সাগর-প্রাণীদের কীর্তিকলাপ। মিউজিয়ামে ঢোকার মুখে আছে নীল তিমির বিরাট চোয়াল। এছাড়াও আছে সমুদ্রের প্রাণী ও উদ্ভিদের সংরক্ষণ করা নমুনার সঙ্গে পরিচয় করার সুন্দর আয়োজন।

ক্রুসাদাই দ্বীপে অনুমতিপত্র ছাড়া যাবেন না। কারণ দর্শিয়ে ওখানকার মৎস্য দপ্তরে আবেদন করলে মৎস্য দপ্তরের কোনও কর্মীর তত্ত্বাবধানে ওখানে যাবার অনুমতি মেলে। তবে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কথা বলে বোটের জন্য বেশ দরাদরি করতে হয়। ক্রুসাদাই ঘুরে আসতে প্রায় হাজার দুয়েক টাকা নেয় পুরো বোটের ভাড়া হিসেবে। তবে ক্রুসাদাই সহ যে দ্বীপেই যান না কেন কোনও পলিথিন প্যাকেট বা প্লাস্টিক সামগ্রী নিয়ে যাবেন না বা ওখানে ফেলে আসবেন না। তাছাড়া কোনও উদ্ভিদ বা প্রাণীর নমুনা অনুমতি ছাড়া সংগ্রহ করে আনবেন না।

'ভ্রমণ' জুলাই, ২০০৫

আমার ভ্রমণসঙ্গীরা

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

'ভ্রমণ'-এর প্রথম সংখ্যা থেকেই এখন পর্যন্ত আমি নিয়মিত পাঠক। লেখকদের নানারকম ভ্রমণ অভিজ্ঞতা পড়েই আমার অনেক দেশে মানসভ্রমণ হয়ে গেছে। আমি স্বপ্নে প্রবালদ্বীপে বাড়িও গড়ে ফেলেছি। আমার ভ্রমণস্মৃতি এসবের তুলনায় খুবই কম। তার প্রধান কারণ আমি কলকাতা থেকে ঠাঁইনাড়া হয়েছি বছরে একবার করে মায়ের বাড়ি হাজারিবাগ যেতে অথবা নারী আন্দোলনের নানারকম সম্মেলনে অংশ নিতে। বেড়ানোর ছক কষে বেড়াতে যাওয়া বিভিন্ন কারণে হয়নি।

কাছাকাছি শান্তিনিকেতন, দুর্গাপুর-আসানসোল এবং দূরের দার্জিলিং হল আমার ভ্রমণের দৌড়। কিন্তু নারী আন্দোলন ও মানবী চর্চার সম্মেলনের দৌলতে আমার তিরুবনন্তপুরম, কালিকট, ওয়ালটেয়ার, মুম্বই, দিল্লি, পাটনা, জয়পুর, হায়দ্রাবাদ দেখা হয়েছে, অল্প ঘোরাও। লেখার কাজ নিয়ে আগরতলা, পোর্টব্লেয়ার, পুরী, কোনারকে ঝাঁকিদর্শন হয়েছে। আর পতিদেবতার অফিসের সঙ্গে ম্যাকলাস্কিগঞ্জ ও রাঁচিও গিয়েছি। কাজের ফাঁকে বেড়ানো উপভোগও করেছি। কারণ এইটুকুই আমার দৈনন্দিন চালডালের হিসেব থেকে অবকাশের মুহূর্ত।

আমার সারাজীবনই কুকুরের সঙ্গে জড়িয়ে সেই ছোটবেলা থেকে। এমনকী যেখানেই গেছি কাজে অথবা বেড়াতে সেখানেও আমি অযাচিতভাবে কুকুরের ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব পেয়েছি। সেই সঙ্গীদের কথাই বলব।

আমরা প্রথম আনকোরা নতুন জায়গায় বেড়াতে যাই ১৯৭৪ সালে। ব্যক্তিগত একটি দুঃখের ঘটনার জন্য মনে হয় কোথাও অল্প কদিনের জন্য ঘুরে এলে ভালো হয়। আমার ভাই তাদের ব্যাঙ্কের দার্জিলিংয়ের হলিডে হোম হোটেল তুষারমৌলিতে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। গন্তব্যে পৌঁছে ঠিকানা দেখাতে কেউ জায়গাটার হদিস দিতে পারল না। সন্ধে হয়ে গেছে, বেশ শীতও করছে। একদম অচেনা জায়গায় কোথায় যাব এইসব ভাবছি। মুশকিল আসানের মতো এক স্থানীয় ছেলে হঠাৎ বললে, 'আমি জায়গাটা জানি। আসুন আমার সঙ্গে।' বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে আমরা তার সঙ্গেই চলতে থাকলাম। খানিকটা যাবার পর রাস্তার ঢালু বেয়ে সে একটা সরু গলির মতো জায়গায় পৌঁছে থেমে গেল। হাত

তুলে একটি অত্যন্ত মলিন চেহারার বাড়ি দেখিয়ে বলল, ওই হল হোটেল তুষারমৌলি। চারিদিকের ঘিঞ্জি নোংরা পরিবেশ দেখে আমরা অসম্ভব দমে গেলাম।

সেখানে খাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। কেয়ারটেকার ভদ্রলোক এককাঁড়ি টাকার বদলে যা খাবারের ব্যবস্থা করলেন তা অতি খিদের মুখেও খেতে ইচ্ছে করল না। ভালোর মধ্যে বিছানাপত্র বেশ পরিষ্কার ছিল। তাকে সেই রাতেই পরদিনের সকালের চা-জলখাবার ও দুপুরের খাওয়ার টাকা দিয়ে দিতে হল।

সকালে অবশ্য জানলার বাইরে তাকিয়ে মনটা একটু ভালো হয়ে গেল। শোবার ঘর থেকে লয়েডস বটানিক্যাল গার্ডেনের পিছনটা দেখা যাচ্ছে। 'এখান থেকে ভালো আবহাওয়ায় কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখা যায়।' আমাদের আশ্বস্ত করতে ভদ্রলোক বললেন। তারপর আমরা বেরলাম। উঠছি তো উঠছি—ওঠার আর শেষ নেই। প্রায় যখন দম ফুরিয়ে যাবার মতো অবস্থা তখন আরও কয়েক ধাপ সিঁড়ি পার হয়ে আমরা কেভেন্টার্সে পৌঁছলাম। আমাদের গন্তব্য ম্যল, একটাই লক্ষ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা। কিন্তু মেঘলা দিনের জন্য দর্শন মিলল না। কিন্তু অন্য লাভ হল। আমরা স্থানীয় মানুষের কাছে কোথায় কী দেখার আছে জেনে নিলাম। 'আপনারা কোথায় উঠেছেন?' কেউই নাম শোনেনি। যখন আমি বললাম বটানিক্যালের পিছনদিকের সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে হলিডে হোম তার কাছাকাছি। একজন দোকানি চোখ কপালে তুলে বলল, 'সে তো অনেক নীচে। আপনাদের ওঠানামা করতেই তো সময় বেরিয়ে যাবে।'

আমরা দুজনেই কথাটা নিয়ে ভাবলাম। দুপুরে খেতে নীচে নামব। একটু বিশ্রাম করে আবার ওপরে উঠব। সত্যিই অনেক সময় চলে যাবে। শুধু ওঠানামা করতে আমরা বেড়াতে আসিনি। কিন্তু দশদিনের আগাম ভাড়া দেওয়া আছে। এখন ছাড়লেও সেটা ফেরত পাওয়া যাবে না। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে আমরা নীচে নামলাম।

দুপুরে খাওয়ার ছিরি দেখে আমার চোখে জল এসে গেল। কিশোরের অবস্থাও তথৈবচ। আমরা দুজনেই ঠিক করলাম যা থাকে কপালে এই অখাদ্য আর খাব না— আমরা বেশিক্ষণ আলস্যে না কাটিয়ে কেয়ারটেকারকে বলে গেলাম রাতে খাব না। ম্যলে টহল মারবার সময় অনেক খাবার জায়গা নজরে এসেছিল। আমরা সেখানেই রাতের খাবার সেরে নেব। অবস্থা বুঝে পরদিন দুপুরেও আমরা জানিয়ে দিলাম সে কথা। ভদ্রলোক একটু অখুশি হলেন অবশ্য। দুবার ভরপেট ও সকালের জলখাবারের টাকায় আমরা যথেষ্ট বোকা বনেছিলাম। সেই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল।

একপ্রস্থ চড়াই ভেঙে আবার ওপরে ওঠা। কিছু মুখে দিতে ক্যাভেন্টার্সেই ঢুকলাম। সেখানে কিন্তু খাদ্যতালিকার সঙ্গে দাম দেখে মনে হল আমাদের পকেট খুব হালকা হবে না। একটু ভেবেচিন্তে অর্ডার দিলেই হবে। আমরা ম্যলে এসে

বেঞ্চিতে বসে আছি। কয়েকজন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দিব্যি ভাব হয়ে গেল। তারা আমাদের অনেক দর্শনীয় স্থানের হদিস দিল যেগুলো পায়ে হেঁটেই সারা যায়। যেমন মহাকাল মন্দির ও শ্রীধরধাম। দেশবন্ধুর বাড়ি, চিড়িয়াখানা, বটানিক্যাল গার্ডেন, হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, লেবং রেসকোর্স, তিব্বতীয় পুনর্বাসন বিপণি কেন্দ্র, নর্থ পয়েন্ট স্কুল, জলা পাহাড়ের ওপর সেন্ট পলস স্কুল মোটামুটি জানা জায়গা। মাসটা যেহেতু সেপ্টেম্বর তাই সবাই বলল, টাইগার হিলে গিয়ে কোনও লাভ নেই। ধসের কারণে টয়ট্রেন বন্ধ। ঘুম অন্যভাবে যেতে হবে। ওঠানামার পথে কোনটা দেখে নেওয়া যায় তাও এরা বুঝিয়ে দিল। আমরা ঠিক করেছিলাম দার্জিলিংয়ে যতটা সম্ভব পায়ে হেঁটে ঘুরব। অবশ্যই লেবং ইত্যাদি এর বাইরে ছিল। জলা পাহাড় যাব ঘোড়ায় চড়ে।

মেঘলা দিন হলেও দিনের আলো মরেনি। আমরা ম্যলে পায়চারি করতে করতে দেখি দূর থেকে তুলোর বলের মতো দুটো লোমওলা কুকুর লাফাতে লাফাতে আসছে। আমি তো আহ্লাদে আটখানা। বাড়ির দুটো খুদের জন্য হঠাৎ মনের ভেতর মুচড়ে উঠল। আমি কাছে গিয়ে তাদের আদর করে ডাকলাম। তারা পাত্তা না দিয়ে রাগি গলায় ডাকতে লাগল। সঙ্গের লোকটি বলল, 'ওরা একটু বদমেজাজি'।— কী নাম! ভুটো আর ভুটি। কুকুরদুটি ভুটিয়া জাতের। প্রথমবারের ধমক উপেক্ষা করে আমি খুব আদরের গলায় বললাম, কিরে ভুটো ভুটি রাগ করছিস কেন? গলার আওয়াজ বা নাম যাইহোক এবার কিন্তু মুখের রাগি চেহারা বদলে গেল। তারা দুজনেই ল্যাজ নেড়ে কাছে এসে চারপাশে গোল হয়ে ঘুরে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে আমাদের হাঁটুতে সামনের থাবা দুটি ঠেকিয়ে আদরে গলে গেল। সঙ্গের লোকটি অবাক। ওরা কিন্তু এত চট করে ভালোবাসা দেখায় না। আমি দুটোকে বাংলায় যতরকম আদরের কথা আছে বলে যাচ্ছি আর ওদের আহ্লাদে ল্যাজ প্রায় খসে পড়ার উপক্রম। আমি ভুটোকে বললাম, কিরে খেলনা বুড়ো! ভুটির দিকে তাকিয়ে বললাম, আরে পুতুল বুড়ি! ওমা আদরে গদগদ হয়ে তারা চার হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। ওদের দেখতে ছিল ঠিক খেলনার দোকানের বড়মাপের ঝাঁকড়াচুলো কুকুরের মতো। অন্ধকার হয়ে আসছে দেখে শেরিং ওদের গলায় চেন পরিয়ে বলল, 'হ্যান্ডশেক কর', দুজনেই থাবা বাড়িয়ে আমাদের হাতের মুঠোয় ধরা দিল। তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বাড়ি চলে গেল।

শেরিং দুটো খাবার জায়গার নাম বলেছিল। তবে সাবধান করে বলেছিল, খুব ঝাল খেতে যদি না পারেন তবে গ্লেনারিসে দেখতে পারেন। গ্লেনারিস খুবই অভিজাত জায়গা।। ১৯৭৪ সালে অন্তত তাই ছিল। আমরা দুরুদুরু বক্ষে ঢুকে কোনার টেবিলে বসে খাদ্যতালিকা দেখলাম। খুব বড়মানুষী না করলে এখানে বাকি কদিনের খাবার ম্যানেজ হয়ে যাবে। সকালে বিকেলে কেভেন্টার্স, দুপুরে রাতে গ্লেনারিস, প্রতি বিকেলে ভুটো-ভুটির সঙ্গে খেলা। মনটা ফুরফুরে হয়ে

গেল। তুষারমৌলির পরিবেশটা এত নোংরায় ভর্তি যে ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। ম্যল আলো ঝলমল করছে। আমরা আটটা নাগাদ উঠে নামতে লাগলাম। পৌঁছতে প্রায় নটা হয়ে গেল। কেয়ারটেকার অপ্রসন্ন মুখে জানালেন, এত দেরি করবেন না। বাজার এলাকাটা ভালো নয়। একদম বাজে কথা। তখন দার্জিলিং অশান্ত হয়নি।

আমাদের সবকিছু দেখা হয়ে গেছে। এমনকী রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এভারেস্ট নায়ক তেনজিংয়ের সঙ্গে হ্যান্ডশেক এবং অটোগ্রাফ নেওয়াও। শুধু বাকি কাঞ্চনজঙ্ঘা। একদিনও আকাশ পরিষ্কার ছিল না। আমরা স্রেফ অন্যরকম অভিজ্ঞতার জন্য সকালে পাংখাবাড়ি রোড ধরে হেঁটে ঘুম পৌঁছলাম। রাস্তাটা খুবই ফাঁকা ও নির্জন ছিল। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে এখনকার মতো বাড়ি-ঘরদোর গজিয়ে ওঠেনি। রাস্তার সৌন্দর্যে পথের ক্লান্তি গায়েই মাখলাম না। ফেরার সময় অবশ্য আর হাঁটার দম ছিল না। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে ল্যান্ডরোভারে এলাম।

পরদিন প্রথম দার্জিলিংয়ে রোদ্দুর দেখলাম। পরিষ্কার নীল আকাশ। উঠতে উঠতেই শুনলাম লোকজন বলাবলি করছে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাবে। আমরা নাহয় বেড়াতে এসেছি। কিন্তু স্থানীয়দের আনন্দে মালুম হল কাঞ্চনজঙ্ঘার মাহাত্ম্য। যত উঠছি শুনতে পাচ্ছি একজন আর একজনকে চেঁচিয়ে বলছে, 'আজ দেখা দিয়েছে।' আমাদের তর সইছিল না। কোনও মতে কেভেন্টার্সের গরম দুধ শেষ করে দৌড় লাগালাম। ওয়েটাররাও আহ্লাদে ডগমগ। এই কদিনে মুখচেনা হয়ে গিয়েছিল। তাদের মতে আমাদের বরাত খুব ভালো। কারণ সেপ্টেম্বরের এই সময় এত মেঘ থাকে যে এই মহাদর্শন কেউ আশাই করে না। নীল আকাশের গায়ে ধপধপে সাদা হিমালয় চুড়ো সত্যিই শিহরন আনল। এতদিন ছবিতেই দেখেছি। দিনটা এত পরিষ্কার ছিল যে মনে হল কাঞ্চনজঙ্ঘা নাগালের মধ্যে। সেদিন ম্যলেও আনন্দের ফোয়ারা। ঘোড়াওয়ালা, পথের বিক্রেতা সবাই খুশিতে ঝলমল করছে।

এত আনন্দের মধ্যেও বিকেলে ভুটো-ভুটির সঙ্গে খেলা করতে করতে মনে পড়ে গেল আর মোটে একদিন ওদের সঙ্গে দেখা হবে। পরদিন সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। আমাদের মন খারাপ হয়ে গেল মেঘলা দিন দেখে। আরও মন ভার হয়ে গেল সেদিন ভুটো-ভুটিকে না দেখে। ম্যলটাই ফাঁকা লাগছিল। বোধহয় মেঘলা দেখে ওদের বেড়াতে পাঠানো হয়নি। হঠাৎ ম্যলের অন্যপ্রান্ত থেকে শোনা গেল সেই পরিচিত ঘৌ ঘৌ। আমাদের দেখতে পেয়ে খরগোশের মতো লাফাতে লাফাতে ভুটো-ভুটি আসছে। আমরা না ওরা, কে বেশি খুশি হল বলা শক্ত। সেদিন ওরা একটু সময় বেশি বেড়ালো। ফেরার সময়ে বললাম, 'ভুটো-ভুটি গুড বাই।' ওরা ঠিক বুঝল। লোমের আড়াল ভেদ করে চোখের মধ্য দিয়ে দেখি দুঃখের ভাষা।

ত্রিশ বছর পরেও ওদের ভুলিনি। খেলনার দোকানে ওদের মাপের কুকুর দেখলেই মনে পড়ে।

২

১৯৭৮-এ আমি বন্ধু ও তার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে ঢাকা গেলাম। এই আমার প্রথম দেশের বাইরে যাওয়া। বন্ধুর বাড়ি ধানমন্ডিতে মুজিবের বাড়ির দুটি রাস্তা পরে। ওদের বাড়িটি খুবই সুন্দর ছিল। সামনে পিছনে বাগান। পরদিন ভোরে উঠে আমি বাগানে পায়চারি করতে করতে দেখলাম সুন্দর একটি ব্রাউন রঙের কুকুর বাড়ির পিছন থেকে আসছে। কাছে আসতে দেখলাম অন্নদাশঙ্করের ভাষায়, 'আস্ত ক্যালকেশিয়ান'। আমরা বলতাম রোড টেরিয়ার। আমায় দেখেই সে ভাব জমাবার চেষ্টা করল। বাড়ির কাজের লোকরা ছাড়া সবাই ঘুমোচ্ছে। আপা চা ডাক শুনে আমি বারান্দায় এসে সিঁড়িতে বসলাম। বিস্কুট নিয়ে ডাকতেই কুকুরচন্দ্র ল্যাজ নাড়তে নাড়তে একলাফে আমার পাশে। আমার চা পর্বের প্রথম রাউন্ড শেষ হতে হতে বন্ধুর স্ত্রী কোলেত এল। সিঁড়ির ওপর ধাপে কুকুরচন্দ্রকে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকে বিশুদ্ধ ফরাসি ভাষায় নেমে যেতে বলল। সে বেচারি কোনওমতে আর এক টুকরো বিস্কুট নিয়ে ঝড়ের বেগে নেমে গেল। বিকেলে আমি আবার চায়ের কাপ নিয়ে বাগানে বসে তখন ওদের রাঁধুনি খোদেজার মা এসে আমায় বলল, 'আপা লাসিয়ারে রাতে কী খানা দিব?' লাসিয়া? আমি বুঝতেই পারিনি কার কথা বলছে। লাসিয়া কে? 'কেন পিছনের বাগানের কুকুরটা'! নামটা তো ভারি অদ্ভুত। কে নাম দিয়েছে। 'বেগম সাহেবা তো ওই নামেই কয়। ও হরি। তখন নাম রহস্য বুঝলাম। কোলেত ওকে 'Les Chien' (ফরাসি মানে কুকুর) বলে। সেটাই এদের কানে লাসিয়া হয়ে গেছে। লাসিয়াও দেখলাম ওই নামে দিব্যি অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

দুদিনের মধ্যেই লাসিয়া আমার ভারি নেওটা হয়ে গেল। সকাল বিকেল বিস্কুট ছাড়াও আমি গেট খুলে হাঁটতে বেরলেই লাসিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে যেত। তখন ধানমন্ডির রাস্তাগুলো হাঁটার পক্ষে আদর্শ ছিল। প্রায় সব বাড়িই বাংলোর ধাঁচে। বাগানে গাছ, রাস্তায় গাছ। সেগুন বাগিচা রোডের দুপাশে বড় বড় গাছ। বুঝিবা একটু নিরাপত্তার অভাব ছিল। বন্ধু বলে দিয়েছিল অন্ধকার হবার আগে যেন বাড়ি ফিরে আসি আর প্রত্যেকদিন যেন একই রাস্তায় না হাঁটি। লাসিয়ার সঙ্গে আমি রীতিমতো গল্প করতে করতে যেতাম। ও হাসিমুখে ল্যাজ নাড়ত।

একদিন আহ্লাদের আতিশয্যে আমাদের সবার চা পর্ব শেষ হবার পর আমরা উঠেছি, ভেতরে যাব, লাসিয়া এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসল। সে আমার সঙ্গে বারান্দায় উঠে এসে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করল। সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল। কোলেত রাগি গলায় বকতে লাগল, 'Les Chien'। বাকিটা বুঝলাম না। এখানে আমার মনে হল লাসিয়ার পক্ষ নিয়ে কিছু বলা উচিত। আমি বললাম, 'বুঝতে পারিসনি। না রে লাসিয়া?' আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে লাসিয়া আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমেই বাড়ির পিছন দিকে চোঁ দৌড় মারল। ভদ্রভাবে আমিও বকুনি খেলাম। 'তুমি ওকে একদম আস্কারা দেবে না।'

এরপরে যে কদিন ছিলাম লাসিয়া সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে বিস্কুট নিয়ে বাগানে বসে খেত। আমি বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে না বেরলে কাছাকাছি হাঁটতে বেরতাম। সঙ্গে যেত লাসিয়া। ওর দৌলতে দুয়েকজন পথচলতির সঙ্গে আমার ভাব হয়ে যেত। 'কুত্তাটা খুবসুরত আছে।' এক বাগানের মালি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল। আমার বেশভুষা দেখে বলত, 'আপা কোথা হইতে আইছেন?' ওখানে মানুষের স্থল টকের মধ্যেও বেশ আন্তরিকতার সুর থাকত।

যাবার দিন সকালে লাসিয়া বিস্কুট খাওয়ার পর আমি তাকে বললাম, লাসিয়ারে আজ চলে যাচ্ছি। ওর চোখদুটো অদ্ভুত সুন্দর মায়াবী ছিল। ও বোধহয় বুঝল। মালপত্র নিয়ে যখন গাড়িতে উঠছি তখন চোখ তাকে খুঁজলেও দেখতে পেল না। যাকগে, সামনের বছরও বন্ধুর মেয়ে রুনার বিয়েতে আবার আসব। তখন ফের লাসিয়া সুন্দরীর সঙ্গে দেখা হবে। ও নিশ্চয় আমায় চিনতে পারবে। কিন্তু লাসিয়ার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। আমি চলে যাবার পরদিন লাসিয়া সকালে আমার খোঁজে ভেতরের বারান্দা অবধি চলে এসেছিল। প্রচুর বকাঝকা সত্ত্বেও তার পরদিনও সে সামনের বারান্দায় উঠে পড়েছিল। তখন সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হল ধানমন্ডির বাড়ি থেকে লাসিয়াকে নির্বাসন দিতে হবে। যে ছেলেটি রোজ চা দিত তারই সঙ্গে তাকে বুড়িগঙ্গার ওপারে তার গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই বাড়ি থেকে লাসিয়া কয়েকদিন পরে হারিয়ে যায়। আমার বুকের ভেতর অসম্ভব কষ্ট হল। এক বছর যে বাড়িতে মুখের কাছে খাবার পেত সে কি আর রাস্তায় গিয়ে পাঁচটা কুকুরের সঙ্গে কামড়াকামড়ি করে খাবার জোটাতে পারবে? তাছাড়া লাসিয়ার স্বভাবটাও খুব শান্ত ছিল। ২৬ বছর পরেও আমি লাসিয়ার কথা ভুলতে পারিনি। তার ওই পরিণতির জন্য আমার নিজেকেই দায়ী মনে হয়।

৩

১৯৮৬তে মানবীচর্চার এক সম্মেলনে চণ্ডিগড় গিয়েছিলাম। অক্টোবরে দ্বিতীয় সপ্তাহে চণ্ডিগড়ের ভোরবেলা অতি মনোরম। হালকা শীতের আমেজে আমি মৌজ করে সকালের চা-বিস্কুট নিয়ে বিশাল ছড়ানো চত্বরের একটা বেঞ্চে বসলাম। পাশে দুজন পরিচিত প্রতিনিধি। চারদিকে লনে নানা রংবেরঙের পাখি নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। সুন্দর নরম রোদ সবে উঠছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছি দেখি একটি গম রঙা রোড টেরিয়ার অল্প দূরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে। হাতছানি দিতেই সে হাসি হাসি মুখ করে কাছে এল আর বিস্কুটের ভাগ নিল। 'তোকে তো একটা নাম দিতে হয়।' পাঞ্জাবের রীতি মেনে আমি নাম দিলাম খোকন্দর। চণ্ডিগড়ে পাঁচদিন ছিলাম, আমার সব থেকে পেয়ারের দোস্ত হয়ে গেল খোকন্দর। পরদিন ভোরে বরাদ্দের বাইরে আমি দুটো বেশি বিস্কুট নিলাম। ক্যান্টিনবয়ের কোঁচকানো ভুরু উপেক্ষা করে লনে হাঁটতে হাঁটতে খোকন্দরকে খুঁজলাম। ওই তো সে। আমার ডাক শুনেই চোখেমুখে হাসি ফুটিয়ে পাশে এল। আমি বিশুদ্ধ কলকাত্তাইয়া

বাংলায় তার সঙ্গে গল্প করে গেলাম, সে ল্যাজ নেড়েই গেল। চা শেষ করে আমি পেয়ালা ফেরত দিয়ে নিজেদের থাকার জায়গার দিকে হাঁটা দিলাম। খোকন্দর আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল। কিন্তু সে বারান্দায় উঠল না।

সারাদিন ঝড়ের মতো কাটিয়ে অনেক রাতে শুতে গিয়েও প্রত্যেকদিন আমার ঠিক সময়ে ঘুম ভেঙে যেত। চণ্ডিগড়ে পৌঁছনো মাত্র আমাদের বলে দেওয়া হয়েছিল যেন আমরা সবসময় দলবেঁধে ঘুরি আর সম্মেলন কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে দূরে না যাই। ১৯৮৪-র অপারেশন ব্লুস্টারের পর রাস্তায় যেদিকে তাকাও মেশিনগানধারী সেনাবাহিনী। তার মাঝে একমাত্র আনন্দের ফুটকি ছিল খোকন্দর। যখন বাসে দিল্লি ফিরছিলাম ওর কথা খুব মনে হচ্ছিল।

৪

আমার কুকুরপুরাণ শেষ করব জোরোর গল্প দিয়ে। ১৯৯৮-এ দার্জিলিং ইনার হুইল ক্লাবের রজতজয়ন্তীতে মূলবক্তার আমন্ত্রণ পেয়ে ঠিক ২৪ বছর পরে আবার দার্জিলিং গেলাম। পৌঁছে মনে হল, না এলেই হত। কোথায় সেই শান্ত শহর! প্রতিখাঁজে বাড়ি উঠেছে পরিবেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। অনেক ঐতিহ্যমণ্ডিত বাড়ি রাজনৈতিক তাণ্ডবে আগুন লেগে পুড়ে গেছে। পাংখাবাড়ি রোড তেনজিংয়ের স্মৃতিতে তেনজিং নোরগে রোড হয়েছে। সেটা ঠিক হয়েছে। কিন্তু কোথায় সেই নির্জন সৌন্দর্য? রাস্তার দুধারের ঢালে বাঁকে বাঁকে বাড়িতে ভর্তি।

আমি ছিলাম সেই সময়ের ক্লাবের সভাপতি চিত্রা দত্তের বাড়িতে। তিনি ও তাঁর স্বামী রণেন দত্ত চমৎকার মানুষ। তাদের বাংলো ছিল যে রাস্তায় সুবাস ঘিসিংয়ের বাড়ি সেখানে। আমাদের নিরাপত্তা বলয় পেরিয়ে যেতে হত। ম্যল থেকে একটু উঁচুতেই ওদের বাড়ি, আরও টংয়ে ঘিসিংয়ের বাংলো। আমি বাড়ি পৌঁছনোর পরেই উনি টেবিলে চা দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। বাড়িতে দুটি গোল্ডেন ল্যাবরাডর জোরো ও জেরিনা। জোরো খুবই গায়ে পড়া, জেরিনা একটু আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো। আমি বিস্কুট নিয়ে ইশারা করতেই জোরো এসে হাত থেকে নিল। দুবার নেওয়ার পর দত্ত দম্পতির চোখে পড়ে গেল। ওঁরা আমায় খুব বিনীত অনুরোধ করলেন টেবিল থেকে খাবার না দিতে। অভ্যেস খারাপ হয়ে যায়। জোরো বুঝল তার ব্যবহারে মালকিন ও মালিক অখুশি। সে সরে গেল। দুপুরে খাওয়ার পর অল্প বিশ্রাম করে আমি আগামীকালের বক্তৃতার লিখিত কপি মন দিয়ে পড়ছি। দরজায় টোকা দিয়ে বেয়ারা এসে চা দিয়ে গেল। সঙ্গে বিস্কুট। তার পিছনে পিছনে দেখি খুব সন্তর্পণে সবার চোখ এড়িয়ে জোরো ঢুকেছে। কেউ দেখতে পায়নি। সমঝনেওয়ালা সমঝ গয়ে। আমি কট করে জোরোকে একটি বিস্কুট খাইয়ে দিলাম। তারপরে চা ঢেলে নিজের বিস্কুট খেতে খেতে ওকে আরেকটা দিলাম। চা শেষ হয়েছে কি হয়নি বেয়ারা ট্রে নিয়ে বেরিয়ে গেল পিছনে নিঃশব্দ চরণপাতে জোরো। তারপরেই চিত্রা দত্ত ঘরে এলেন। আমরা দুজনেই ধরা

পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম।

পরদিন সকালে বেড-টি নিয়ে বেয়ারা পিটার হাজির। ও চলে যাবার পরেই কানে এল দরজা আঁচড়ানোর আওয়াজ। আমি গিয়ে খুলে দিতেই আহ্লাদিমুখে জোরো ঢুকে পড়ল। আমার সঙ্গে দুটো বিস্কুট খাওয়ার পর আমি আর কোনও ঝুঁকি না নিয়ে দরজা খুলে তাকে বের করে দিলাম। চালাক জোরো বুঝে গেল। এরপর সকাল বিকেল চলল আমার আর জোরোর গোপন অভিসার। যখন ব্রেকফাস্ট খেতে টেবিলে আসতাম তখন জোরো সভ্যভব্য, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। জেরিনা কিন্তু প্রতিদিন মাঝে মাঝে একটু ল্যাজ নাড়া ছাড়া আমায় বিশেষ পাত্তা দেয়নি। ফেরার দিন বিকেল হবার আগেই বেরতে হল। জোরোকে গুডবাই করলাম। সে বুঝল পরদিন সকাল থেকে তার ক্ষণিক সুখের দিন শেষ। বেচারাকে একটু ম্রিয়মাণ লাগল। আমার মনে পড়ে গেল আমাদের কলকাতার বন্ধু সিদ্ধার্থের কথা। সে অসম্ভব কুকুর ভালোবাসত। সে যেখানেই যেত কুকুরকে প্লেট থেকে খেতে দিত। কেউ বারণ করলেই বলত 'কুকুর ক্যাংলা হবে না তো কী মানুষে হবে?'

তিরুবনন্তপুরমের কুকুরঁণ, শ্রীনিকেতনের আমার কুটিরের কুক্কুমুক্কসহ আরও অনেকের কথা বলতে গেলে 'কুকুরভারত' হয়ে যাবে। শুধু এইটুকু বলেই যাত্রাপথের আনন্দগান শেষ করব, যাঁরা কুকুর ভালোবাসে তাঁরা নতুন দেশ দেখে যে উত্তেজনা অনুভব করে সেখানকার কুকুরদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েও একই ধরনের আনন্দ পায়। একটুও বাড়িয়ে বলছি না!

'ভ্রমণ' অক্টোবর, ২০০৪

৪৩ বছর আগে

জলপথে অস্ট্রেলিয়া

পারুল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৬২ সালের ২৫ ডিসেম্বর রাতে, কলকাতার কিংজর্জ ডক থেকে জাহাজে যাত্রা করলাম অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে। জাহাজের নাম 'স্টেট অব উত্তরপ্রদেশ'। আমি এ জাহাজের যাত্রী নই, কর্মীও নই। আমার স্বামী এ জাহাজের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সেই সুবাদে আমি এ জাহাজের সদস্য, এদের অন্দরমহলের লোক।

সুন্দরবনের জল-জঙ্গল, চট্টগ্রাম, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর পর্যন্ত জাহাজ নানা জায়গায় থেমেছে। সিঙ্গাপুর থেকে আর কোথাও থামা নয়, এবার সোজা চলেছি অস্ট্রেলিয়া। সিঙ্গাপুর থেকে অস্ট্রেলিয়া যেতে সময় লাগবে প্রায় আটদিন। প্রথম বন্দর ওয়ালারু, এরপর লিঙ্কন, প্রেইরি ইত্যাদি। এগুলি সবই দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত। অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল দিয়ে দক্ষিণে যাওয়া হবে।

প্রাচীনকালে বিষুবরেখা অতিক্রম করার সময় জলাধিপতি বরুণের উৎসব হত তাঁকে প্রীত করতে, তাঁর আজ্ঞা নিয়ে দক্ষিণ গোলার্ধে প্রবেশ করতে হত। আমাদের জাহাজেও একটি ছোট উৎসব হয়েছিল, এখন এটি মজার ব্যাপার হিসেবে পালিত হয়।

অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ, ক্ষুদ্রতম মহাদেশ, দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। এখন সেখানে গ্রীষ্মকাল। তার চতুর্দিক ঘিরে ঘনবসতি, লোকালয়, বড় জনপদ, বন্দর। মধ্যখানে ধু-ধু মরুভূমি, বিস্তীর্ণ জঙ্গল। দক্ষিণ সাগরে অদূরে জনবিরল টাসমানিয়া দ্বীপ। দক্ষিণে 'অস্ট্রেলিয়া বাইট' অতিক্রম করতে অশান্ত সমুদ্রের প্রচণ্ড দোলানি সহ্য করতে হয়েছিল।

সন্ধ্যাবেলায় ধূসর গোধূলিতে পা দিলাম অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে, 'ওয়ালারু' বন্দরে। খুব ছোট বন্দর, পাহাড়ের গায়ে ছবির মতো সুন্দর শহর। দিনেরবেলা বেশ গরম, রাতে ঠান্ডা। মানুষজন সহৃদয়, বন্ধুত্বপূর্ণ। ষাট দশকের কথা, তখন এখানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের বসতি এত ঘন হয়ে ওঠেনি। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর জন্য নানা ফলের সমারোহে এ দেশ সমৃদ্ধ। নানা জাতের লেবু, পিচ, আপেল, আঙুর, নাটরিন ইত্যাদি প্রধান। অস্ট্রেলিয়ার আদিম

অধিবাসীরা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গভীর অরণ্যে বাস করে। ব্যুমেরাং তাদের বিখ্যাত অস্ত্র।

যাত্রীরা প্রথম বন্দর ওয়ালারুতে নেমে গেল। এখানে দুদিন থাকা হবে। গভীর রাত পর্যন্ত পথঘাট লোকজন ভরা, দোকানপাট, বিশেষ করে খাবার দোকানগুলি খোলা থাকে। সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে জাহাজের কর্মীরা, তাই সন্ধ্যার পর সবাই বাইরে যায়। এরপর লিঙ্কন ও প্রেইরি বন্দরে জাহাজ গম সংগ্রহ করতে গেল। পাশাপাশি বন্দর হওয়ায় যেতে একবেলা বা একদিন সময় লাগে। তাই সমুদ্রযাত্রা আরও মনোরম হয়েছিল।

এরপর আমরা গেলাম অ্যাডিলেড বন্দর শহরে। বড় ও সুদৃশ্য শহর। এখানে সব শহরেই দেখছি বড় বড় পার্ক আছে, ঘন সবুজ ঘাসের কার্পেট মোড়া, বৃহৎ বনস্পতির শ্যামলিমায় আচ্ছন্ন। ম্যাকডোনাল্ড ও ফিশ অ্যান্ড চিপসের দেশ। পার্কের মধ্যে মধ্যে এদের দোকান গাড়িতে করে চলে। এক অস্ট্রেলীয় দম্পতি অ্যাডিলেড দেখাতে নিয়ে গেলেন। প্রথমেই গেলাম অ্যাডিলেড বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে। খোলামেলা বিশাল জায়গা জুড়ে এখানের প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থান। অ্যাডিলেড বিখ্যাত তার ওয়াইনারির জন্য। এখান থেকে সারা পৃথিবীতে মদ রপ্তানি করা হয়।

অ্যাডিলেড থেকে রওনা হয়ে আমরা গেলাম মেলবোর্নে। মেলবোর্ন তখন অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। যেমন সুন্দর, তেমন কর্মচঞ্চল। তেমন সুন্দর। মেলবোর্নের অদূরে সেখানের আদিম অধিবাসীদের একটি সংরক্ষিত গ্রাম আছে। সেখানে প্রবেশ নিষেধ। যাতায়াতের পথের মধ্যে কখনও কখনও তাদের দর্শন পাওয়া যায়। অর্ধনগ্নদেহ, বাদামি দেহবর্ণ, কুঞ্চিত কেশ, মনুষ্যজাতির আদিমতার চিহ্ন অঙ্গে সুস্পষ্ট। তাদের সংরক্ষিত গ্রামের বাইরে, তাদের শিল্পকলার ছোট প্রদর্শশালা আছে, এবং সেখানে বিক্রিও হয় হস্তশিল্পগুলি।

মেলবোর্ন শহরের অদূরে পাহাড়ের ওপরের স্থানটি অত্যন্ত সুদৃশ্য, সেখান থেকে সমস্ত শহরটির সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। ছোট রেস্টুরেন্টও আছে। বেশ ঠান্ডা, গ্রীষ্মকালেও গরম কাপড়ের প্রয়োজন। এখানে গাড়ির চালকরাই নিপুণ গাইডের কাজ করে। আমি যখন অস্ট্রেলিয়ায় গেছি, তখন ভারতবর্ষে অস্ট্রেলিয়ার ব্যবসাবাণিজ্য খুব উন্নত। সেখান থেকে তখন আসত শস্য, বিশেষভাবে গম। ভারতবর্ষে তখন নিদারুণ খাদ্যাভাব— জাহাজের পথ চেয়ে বসে থাকত 'ফুড করপোরেশন অব ইন্ডিয়া'।

ভারতীয় জাহাজ বন্দরে এলেই সেখানকার ভারতীয় ও অস্ট্রেলীয়রা আসতেন নিমন্ত্রিত হয়ে অথবা জাহাজের কোনও কর্মচারীর অতিথি হয়ে। অস্ট্রেলিয়ায় তখন এদের কল্যাণে ভারতীয় 'শাড়ি' ও 'কারি' বেশ জনপ্রিয়। অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে বেশিরভাগ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। মহিলারা পার্টিতে আসতেন সর্বদা শাড়ি পরে এবং এঁরা নিজেদের ভারতীয় বলেই পরিচয় দিতেন।

ভারতীয় জাহাজের পথ চেয়ে এঁরা অপেক্ষা করতেন। অস্ট্রেলিয়ায় তখন ডকে প্রবেশের অনুমতির প্রয়োজন হত না। এঁরা তখন বন্ধু মনোভাবাপন্ন ছিলেন। নিজে থেকে এসে আলাপ পরিচয় করতেন। নিজেদের বাড়ি নেমন্তন্ন করে নিয়ে যেতেন।

মেলবোর্ন থেকে আমরা এলাম সিডনিতে। অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় বন্দর-শহর। আবহাওয়া ইংল্যান্ডের মতো ঠান্ডা, রিমঝিম বৃষ্টি হচ্ছে মধ্যে মধ্যে। এখানের বাড়িগুলির সঙ্গে ইংল্যান্ডের বাড়িগুলির সাদৃশ্য আছে আকারে ও গঠনে। এখান থেকে আমরা গম নিয়ে যাব দেশে। শস্য নিতে হলে, সমস্ত জাহাজ ঔষধিকরণ করা হয়, যাতে পোকামাকড় ইঁদুর ইত্যাদি শস্য নষ্ট না করতে পারে। এ সময় জাহাজ খালি করে দিতে হয়। সে সময় কোম্পানি জাহাজের কর্মীদের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে। আমরা কয়েকজন স্থির করলাম এই সময়ে আমরা নবগঠিত জাতীয় রাজধানী ক্যানবেরা বেড়িয়ে আসব। পাহাড়ের ওপর নবগঠিত শহর, বিশ্ববিদ্যালয়, দেশের শাসনবিভাগের সমস্ত অফিসসমূহ, এছাড়া বিশাল জনবসতি গড়ে উঠেছে। পাহাড়ের ওপর অরণ্যসমৃদ্ধ অপূর্বসুন্দর শহর। শান্ত-স্তব্ধ-শীতলসুন্দর।

গাইডেড ট্যুরে আমরা এক শুক্রবার রওনা হলাম ক্যানবেরার পথে। রাতে কুরাজঙ্গ বলে একটি ছোট শহরে রাত্রিবাসের জন্য থাকব।

রাত প্রায় দশটায় 'হোটেল কুরাজঙ্গ'-এ পৌঁছলাম। সন্ধ্যায় পথের মধ্যে এক রেস্টুরেন্টে নৈশভোজ করা হয়েছিল।

রাতে কফি, চা ও পানীয় পরিবেশিত হল নীচের লাউঞ্জে। বেশ রাত পর্যন্ত আমরা গল্প করছি, নানা দেশীয় অতিথি আছেন সেখানে। এমন সময় একটি শ্যামবর্ণা তরুণী উঠে এল আমার কাছে, এসে ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি ভারতীয়? আমি হ্যাঁ বলাতে সে খুশিতে ঝলমল করে উঠে বলল, আমিও ভারতীয়, আপনি কি হিন্দি জানেন?

আমি 'হ্যাঁ' বলাতে, সে বলল আমিও হিন্দি জানি। বলেই সে হিন্দিতে 'নমস্তে' বলে নমস্কার করল।

বেচারির ওই একটি হিন্দি শব্দই সম্বল। ত্রিনিদাদের ভারতীয় মেয়ে, সেখানে ডাক্তারি পড়তে এসেছে। প্রপিতামহ বিহার থেকে গিয়েছিলেন। মেয়েটির নিজের দেশ দেখার খুব বাসনা। পড়া শেষ হলে পিতৃপিতামহের দেশ দেখতে আসবে।

শাড়ির একটা গুণ আছে, পৃথিবীর যেখানেই যাই, সবাই ভারতীয় বলে চিহ্নিত করে।

আমাদের একটু দূরে বসেছিলেন এক চিনা ভদ্রলোক। তিনি এলেন আলাপ করতে, হাত বাড়িয়ে দিলেন অভিবাদনের জন্য। আমাদের সঙ্গীবন্ধু হেসে বললেন, আপনাদের সঙ্গে তো আমাদের যুদ্ধ চলছে।

তিনি হেসে বললেন, যুদ্ধ তো রাজনীতির, আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা বন্ধু।

· পরদিন খুব ভোরে রওনা হলাম ক্যানবেরার উদ্দেশে। তখন ক্যানবেরার নির্মাণকার্য চলছে পুরোদমে। শহরের একাংশে সাধারণ মানুষের বসতি। ক্যানবেরার বিশ্ববিদ্যালয়টি অপূর্বসুন্দর, আধুনিক স্থাপত্যকলার নিদর্শন। আমাদের দেশের 'চণ্ডিগড়' শহরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানকার 'ওয়্যার মেমোরিয়াল মিউজিয়াম'টি খুব বিখ্যাত। দুই বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, এমনকী সাবমেরিন পর্যন্ত এখানে রক্ষিত আছে। উদ্দেশ্য যাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর না সংঘটিত হয়, এইসব মারণাস্ত্রের ভয়াবহতা স্মরণ করে। এখানের বাগানে বিশাল সাবমেরিন রক্ষিত আছে।

সরকারি বাসভবনগুলি, রাজভবন সবই সুদৃশ্য, শিল্পমণ্ডিত। ক্যানবেরার অনতিদূরে একটি ডেয়ারি ফার্ম দেখতে গেলাম। সেখানের দুগ্ধবতী সুন্দরী গাভীগুলিকে দেখে আমাদের শাস্ত্রোক্ত 'গাভীমাতা'দের কথা স্মরণ হচ্ছিল। বিকেলে গাভীগুলিকে গরমজলের ফোয়ারায় স্নান করিয়ে শুচিশুদ্ধ করা হল। তারপর গরম ধোঁয়া ওঠা তোয়ালের দ্বারা গরুর বাঁটগুলি সস্নেহে মুছিয়ে পরিষ্কার করে দুগ্ধ দোহন মেশিনের সামনে দাঁড় করিয়ে বাটে মোটা পাইপ পরিয়ে দিয়ে দুধ দোয়া শুরু হল। বিশাল বিশাল ড্রামে প্রায় ৪০-৫০ কেজি পরিমাণ দুধে ভরে গেল। মনে হল যেন 'কামধেনু'। সারাদিন দ্রষ্টব্যস্থানগুলি বেড়িয়ে রাতে আবার হোটেল কুরাজঙ্গে আশ্রয় নিলাম। ক্যানবেরার অনতিদূরে পাহাড়ের ওপর একটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র দেখতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ক্যানবেরা শহরে জলবিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

পরদিন আবার সিডনিতে ফিরে এলাম। এখানে তিন-চার দিন জাহাজ থাকবে— খুব দ্রুত মাল ওঠানামা করছে। সিনিয়র কয়েকজন অফিসারদের খুব চিন্তিত মনে হচ্ছিল। অতি সতর্কতার সঙ্গে বড় বড় প্যাকেট হোল্ডের ভেতর রাখা হচ্ছিল।

সিডনির চিড়িয়াখানা 'টোরঙ্গা পার্ক জু' মুক্ত আকাশের নীচে খোলামেলা পরিবেশে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। অ্যাকোয়ারিয়ামটিতে সমুদ্র থেকে টানেল কেটে সমুদ্রের জল এনে, দেওয়ালের মধ্যে বড় বড় কাচের চৌবাচ্চা বানিয়ে নানা জাতের সামুদ্রিক মাছ রাখা হয়েছে। মাটির নীচে বড় বড় গুহা নির্মাণ করে সিংহ, বাঘ ইত্যাদি প্রাণীর বাসস্থান রয়েছে। প্রতিটি প্রাণী হৃষ্টপুষ্ট। বেশ কয়েকটি বিশালাকৃতি গরিলা রুদ্ধ আক্রোশে অবিরত গর্জন করে চলেছে।

সিডনিতে এক বাঙালি মহিলা জ্যোতিকণা রায়, নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের শিষ্যা, তাঁর ভারতীয় নৃত্যকলার স্কুল আছে। একটি ভারতীয় খাদ্যের ছোট রেস্টুরেন্ট, এছাড়া ভারতীয় চা ও শাড়ির ব্যবসাও আছে। তিনি সকলের প্রিয় 'জ্যোতিদি' নামেই সুপরিচিত। সিডনির পর্ব শেষ হলে, রওনা হলাম নিউ ক্যাসলের উদ্দেশে। একদিনেই পৌঁছনো গেল নিউ ক্যাসলে। ডকে ঢোকামাত্রই এক সাংবাদিক এলেন, আলাপ করতে ও ছবি তুলতে। ভারতীয় জাহাজের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হলেও,

জাহাজে ভারতীয় মহিলার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় নেই, তাই কৌতূহল। পরদিন 'নিউ ক্যাসল টাইমস'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় বড় ছবি দিয়ে ইন্টারভিউ প্রকাশিত হল।

সংবাদ দেখে অনেকে এসেছিলেন আলাপ করতে। হর্ন দম্পতি বাড়িতে একদিন ডিনার খাওয়ালেন। তিনপুরুষ একসঙ্গে একবাড়িতে বাস করছেন একত্রে। সুখী পরিবার। এঁদের ক্যাকটাস সংগ্রহ অসাধারণ। গৃহসংলগ্ন হট হাউসে পৃথিবীর প্রায় সবদেশের অভিনব ক্যাকটাস আছে। এর থেকে একটি অতিসুন্দর ক্যাকটাস আমায় উপহার দিয়েছিলেন, তাঁদের বন্ধুত্বের প্রতীক স্বরূপ।

সিডনি, ক্যানবেরা, নিউ ক্যাসেলে গ্রীষ্মকাল হলেও বেশ ঠান্ডা আবহাওয়া। সিডনিতে এক বাঙালি পরিবার এলেন, যাত্রী হয়ে কলকাতায় যাবেন। আরেক অস্ট্রেলীয় দম্পতি, যাবেন সিঙ্গাপুর।

এবার জাহাজের গন্তব্যস্থল সুদূর টাসমানিয়া দ্বীপের বার্নি। সমুদ্র বেশ অশান্ত, আকাশ রাত্রিকালে ঘন কালো, উজ্জ্বল নক্ষত্রের দ্যুতিতে আভাসিত। দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে 'সাদার্ন ক্রশ' পথ দেখাচ্ছে, উত্তর গোলার্ধে যেমন ধ্রুবতারা। উত্তর গোলার্ধ থেকে 'সাদার্ন ক্রশ' দেখা যায় না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দক্ষিণ আকাশ জুড়ে পাখা মেলে বিরাট আলবাট্রস দেখা দিল। এই প্রথম আলবাট্রস দেখলাম। নাবিকদের জীবনে শুভ সঙ্কেত বহন করে আনে বলে বিশ্বাস।

বার্নির মতো এত নির্জন ধু-ধু প্রান্তর খুব বিরল। জনবিরল দেশ। আপেলের জন্য বিখ্যাত। এখানে কয়েকজন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ভারতীয় জাহাজ এলেই তাঁরা ছুটে আসেন, দেশের স্বাদ নিতে।

ওড়িশাবাসী মহান্তি এলেন, তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে। বার্নি শহর থেকে বেশ দূরে, পেয়িংগেস্ট হয়ে এক বৃদ্ধা ইংরেজ মহিলার কাছে থাকেন। ওই বৃদ্ধাও টাসমানিয়ার মতো নিঃসঙ্গ, নির্জন, একাকী। ভারতীয় পেয়িংগেস্টরাই তাঁর জীবন ও জীবিকা। পিতামহী ও পৌত্রের সম্পর্ক। এই দীর্ঘপথের দৃশ্য অবর্ণনীয় সুন্দর। একপাশে মাইলের পর মাইল শুধু আপেল খেত, পাকা আপেল গাছ ঢেকে আলো করে আছে। পথের ধারে, বাক্সভর্তি আপেল রাখা। লেখা আছে, 'দয়া করে নিয়ে যান'। আর অন্যপাশে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্র আছড়ে পড়ছে তীরভূমিতে। বার্নি থেকে যাত্রা করলাম ফ্রিম্যানটাল ও পার্থের উদ্দেশে। তিন-চারদিনের পথ।

রাতে ডেকে বসে আছি, হঠাৎ সকলেরই চোখে পড়ল, অন্ধকার সমুদ্রের বুকে আলোর মালায় শোভিত এক বিশাল জাহাজ চলছে। চলমান অবস্থায় জাহাজের মাস্তুলের ক্ষীণ আলোটি ছাড়া বাইরে কোনও আলো জ্বলা নিয়ম নয়। তখন ইংল্যান্ডের রানি দ্বিতীয় এলিজেবেথ অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করছেন জাহাজে। দক্ষিণ মহাসাগরে এই সুসজ্জিত জাহাজটি তাঁরই বোঝা গেল।

চারদিন পরে ফ্রিম্যানটালে পৌঁছলাম। পার্থ শহরটি সমুদ্রের তীর ঘেঁসে। মসৃণ প্রশস্ত পথ প্রসারিত। রাত্রিতে আলোর মালায় সুসজ্জিত হলে পার্থ আরও সুন্দরী হয়ে ওঠে। তখন সেখানে গরমকাল, আমাদের গরমকালের মতো। ফ্রিম্যানটাল

থেকে পনেরোশো অস্ট্রেলীয় ভেড়া উঠছে, যাবে সিঙ্গাপুরের স্লটার হাউসে। এখান থেকে টিনজাত মাংস হয়ে গেলে মূল্য আরও বেড়ে যায়, সেজন্য এখান থেকে জীবন্ত যাবে। নীচের খোলা ডেকে কাঠের তক্তা কেটে স্কোয়্যার তৈরি হল, তাদের ঘর। কিন্তু কিছুতেই তাদের জাহাজে চড়ানো যাচ্ছিল না। তখন দলপতি একটি ভেড়া এনে তাকে চড়ানো হল কাঠের সিঁড়িতে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভেড়ার দল নির্বিবাদে উঠে এল জাহাজে। একেই বলে গড্ডালিকা প্রবাহ!

পরদিন জাহাজ ছাড়ার কিছু আগে অগ্ন্যুৎপাতের ওপর একটি মর্মান্তিক সিনেমা দেখেছিলাম 'ডেভিল অ্যাট ফোর ও ক্লক' বলে। তখন জানতাম না যে কয়েকদিনের মধ্যেই তার বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করতে হবে।

ফ্রিম্যানটাল থেকে সিঙ্গাপুর প্রায় সাতদিনের যাত্রাপথ। জাহাজ ছাড়ার পর জানি না, কিসের অনিশ্চিত ভয়ে অসহায় ভেড়াগুলি স্তব্ধ হয়ে গেল। ওপরের ডেক থেকে দেখতাম খাওয়া পরিত্যাগ করেছে, নির্বাক নিস্পন্দ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। পথের মধ্যে দু-একটির মৃত্যু ঘটল। অস্ট্রেলিয়া থেকে সিঙ্গাপুর যাওয়ার কয়েকটি জলপথ আছে ছোট ছোট দ্বীপের মধ্য দিয়ে। আমরা যাব বালি দ্বীপের পাশ দিয়ে। সেদিন সকাল থেকে সকলেই ডেকে বসে আছে। দীর্ঘকাল জলের মধ্যে থাকার পর মাটির দৃশ্য-স্পর্শ মনকে আনন্দে উৎফুল্ল সজীব করে তোলে। লাঞ্চ শেষ করে সবাই সাগ্রহে ডেকে বেরিয়ে এসেছে, বালি দ্বীপের দর্শনে। দূর থেকে দৃশ্যমান উঁচু পাহাড় জঙ্গল সমেত বালি দ্বীপের ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে জাহাজ, এমন সময় চারদিক কালো করে মেঘে ঢেকে গেল, তীব্র বেগে বাতাস বইতে শুরু করল, গায়ে ছোট ছোট বালি ও পাথর কুঁচি এসে বিঁধতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গরম কাদার বৃষ্টি মুষলধারে। সকলেই ছোটাছুটি করে কেবিনের দিকে ছুটলাম। সেখানে খোলা জানলা দিয়ে গরম কাদার ছাঁট এসে একাকার হয়ে গেছে। সকলেই বিস্ময়ে হতবাক। বাইনোকুলার দিয়ে দেখা গেল সামনের পাহাড়ের মাথা বিদীর্ণ করে কালো ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের লেলিহান শিখা। নীচে জ্বলন্ত লাভাস্রোত গড়িয়ে আসছে গাছপালা ঘরবাড়ি প্লাবিত করে। জাহাজকে একটু সরিয়ে নেওয়া হল দূরে, তাতে সমস্ত দৃশ্যটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। রেডিও খুলতেই জানা গেল গতরাত্রি থেকে বালি দ্বীপের পাঁচশত বছরের সুপ্ত আগ্নেয়গিরি, যাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই 'আগুং' পাহাড় জেগে উঠেছে। বহু জনবসতির ওপর দিয়ে জ্বলন্ত লাভাস্রোত নেমে আসছে তীব্রবেগে। পরবর্তীকালে ইতালির এটনা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত দেখেছি কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাতে। এটনার মুখগহ্বর থেকে ঊর্ধ্বাকাশে আগুনের লেলিহান শিখা, আর নীচে গড়িয়ে পড়ছে জ্বলন্ত লাভাস্রোত সমুদ্রের জলে। ধারেকাছে কোনও লোকবসতি নেই। কিন্তু এখানে 'আগুনের' অগ্ন্যুৎপাত নিশ্চিন্ত জীবনধারাকে বিপর্যস্ত বিহ্বল করে তুলেছে। এ যেন প্রকৃতির মারণযজ্ঞ। প্রায় একঘণ্টা আমরা এ দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রইলাম। সমস্ত জাহাজ যেন কাদার সমুদ্রে স্নান করে উঠল। বড়

বড় হোসপাইপ দিয়ে সমুদ্রের জলে সমস্ত জাহাজকে ধুয়ে পরিষ্কার করা হল। বেশ কয়েকটি ভেড়ার মৃত্যু ঘটল এ ঘটনায়।

পরদিন দুপুরে সিঙ্গাপুর পৌঁছনো হল। ভেড়ার দল নেমে গেল তাদের শেষ গন্তব্যস্থলে। সিঙ্গাপুরে খুব দ্রুত কাজ শেষ হল। এর মধ্যেই টাইগার বাম পার্ক দেখে এলাম। এখান থেকে কলম্বো হয়ে আমরা মাদ্রাজ যাব। সমুদ্র মোটামুটি আরামদায়ক ছিল। কলম্বো বন্দরে পৌঁছে জাহাজ সোজা ডকে প্রবেশ করল, বাইরের সমুদ্রে নোঙর করে থাকতে হল না। জাহাজ প্রবেশের অনুমতি পায় তার কার্গোর গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে। তখনও জানি না, আমাদের জাহাজের এত গুরুত্ব কিসের জন্য। কলম্বো বন্দরশহরটি অপূর্ব সুন্দর। ভারতবর্ষের সঙ্গে তখন শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক বন্ধুত্বের। কলম্বোর অদূরে একটি প্রাচীন বৌদ্ধমঠে সান্ধ্য উপাসনার সময় গিয়েছিলাম। ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ, ধূপের ধোঁয়ায় চতুর্দিক আমোদিত। বিশাল শায়িত বুদ্ধদেব— মূর্তিটি পাথরের, শিল্পকার্যে অতুলনীয়। কলম্বো থেকে রওনা হয়ে জাহাজ পৌঁছল মাদ্রাজ বন্দরে। মাদ্রাজও সামুদ্রিক বন্দর। সেখানেও অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু আমাদের তা করতে হল না। মাদ্রাজে জাহাজ পৌঁছনো মাত্রই আগে এল পর্দাঢাকা মিলিটারি বড় বড় ট্রাক ও মিলিটারি অফিসাররা। নিঃশব্দে সমস্ত 'কার্গো' অর্থাৎ ভারত-চিন যুদ্ধের মারণাস্ত্র চলে গেল, হিমালয় সীমান্তের যুদ্ধক্ষেত্রে, সেখানে আমাদের সৈনিকরা অসহায় অস্ত্রহীন হয়ে যুদ্ধরত।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

তাড়োবার জঙ্গলে

তন্ময় চৌধুরী

তাড়োবা হল মহারাষ্ট্রের প্রথম ঘোষিত অভয়ারণ্য। প্রথমে এর আয়তন ছিল খুবই ছোট, মাত্র ১০০ বর্গ কিলোমিটারের কিছু বেশি। আস্তে আস্তে এর সঙ্গে আন্ধেরি সংযুক্ত হয়। তারপর এর আয়তন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০০ বর্গ কিলোমিটারের কিছু বেশি। তাড়োবা আর আন্ধেরি উভয় অংশেই বাঘ আছে। লেপার্ড, বুনো কুকুরও এখানে অমিল নয়। ভাল্লুক, বুনো শুয়োর, গাউর ছাড়াও এখানে বিভিন্ন ধরনের হরিণ এবং নীল গাইয়ের দেখা মিলবে। আর পাখির কথা তো বলে শেষ করা যাবে না। নীলকণ্ঠ, বিভিন্ন ধরনের কাঠঠোকরা, বিভিন্ন ধরনের মাছরাঙা ছাড়াও তাড়োবা আর কোলসার লেকের ধারে একরাশ জলপাখির ভিড়। আর শিকারি পাখিদের মধ্যে ক্রেস্টেড ঈগল, বাজ, শিকরার উপস্থিতি সর্বত্রই। মূলত বাঁশ আর তেন্ডুর জঙ্গল। তাই জঙ্গলে পারিপার্শ্বিক গ্রামগুলো থেকে অধিবাসীদের আনাগোনাও বেশি। তবে এই জঙ্গলের বিশেষত্ব হল ভূত গাছ। গামকারু ট্রি। মোটা সাদা গুঁড়ির ওপর অসংখ্য পাতাহীন ডালপালা দেখলে রাতে ভূত বলে ভুল হতেই পারে।

কলকাতা থেকে নাগপুর। নাগপুর থেকে সোজা তাড়োবা বা কোলসা মোটামুটি ১৪০ কিলোমিটার। কিন্তু চন্দ্রাপুর হয়ে গেলে পথের দূরত্ব আরও বেড়ে যাবে। আমরা যখন নাগপুর স্টেশনে নামলাম তখন ঘড়ির কাঁটা ছটা ছুঁয়েছে। বনদপ্তরের গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সময় নষ্ট না করে আমরা রওনা হলাম কোলসার উদ্দেশে। এবারের সফরের মেয়াদ পাঁচদিন। জুন মাসের এ সময়টায় থার্মোমিটারের পারা প্রায়শই ৪৮-৫০ ডিগ্রি ছুঁয়ে যাবে এটা জানা কথা। আর আমরাও সেটাই চাই। খররৌদ্রে তেষ্টায় ছাতিফাটা হয়ে অথবা একটু শীতলতার খোঁজে শ্বাপদকূল ওয়াটার হোলের কাছে দেখা দেবে— এটাই হিসাব, এটাই কাম্য। কিন্তু নাগপুর শহর ছাড়াতে না ছাড়াতেই ঈশান কোণে বিদ্যুৎরেখা, আর খানিকক্ষণ পরে তো তুমুল বৃষ্টি, আমাদের সমস্ত হিসাব উল্টে দিল। গাড়ির কোণে আমাদের মুখভার। বৃষ্টির ফলে রাস্তায় আমাদের দাঁড়িয়ে পড়তে হল কারণ সামনে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আর খিদেও পেয়েছিল খুব। তাই রাস্তার পাশের এক ধাবাতে আমরা ক্ষুন্নিবৃত্তিতে উৎসাহী হলাম। বৃষ্টি থামল যখন তখন

ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে, রাস্তায় জায়গায় জায়গায় জল, তার মধ্যেই আমরা আবার রওনা হলাম। কোলসা পৌঁছলাম প্রায় রাত বারোটায়। চৌকিদারকে জাগিয়ে ঘরের দখল নিতে নিতে আরও মিনিট পনের। কারেন্ট নেই। ভেতরে গুমোট গরম। কিন্তু ক্লান্তি এবার সুদে আসলে দেনা মিটিয়ে নিতে চাইল। গরমের মধ্যেই কখন যে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছি জানি না।

সকালবেলার রোদ্দুর যখন আমাদের ঘুম ভাঙাল তখন সাড়ে পাঁচটা। চৌকিদার চা নিয়ে হাজির। হাজির রেঞ্জার সাহেবও। বারান্দায় এসে দেখি বাংলোর সামনেই সুন্দর বাগান। অসংখ্য জানা আর অজানা পাখি। বাগান পেরিয়ে কোলসা লেক। জলস্তর নেমে গেছে শেষসীমায়। কোনও কোনও জায়গায় তো ডাঙা বেরিয়ে পড়েছে। লেকে অসংখ্য জলজ পাখি। চায়ের পালা সাঙ্গ করে আমরা রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে তাঁর জিপেই বেরিয়ে পড়লাম। তিনি জানালেন, কোলসা-তাড়োবাতে সবে ওয়াটার হোল সেন্সাস শেষ হয়েছে। সেন্সাস চলাকালীন যেসব বাঘের দেখা মিলেছে তার ভিত্তিতে বলা যায় আন্ধেরি অঞ্চলে প্রায় গোটা ১৬ বাঘের আনাগোনা। বাচ্চাসহ মা বাঘের দেখা মিলেছে ৪টি। তবে আন্ধেরি অংশে ট্যুরিস্টদের যাতায়াত কম। তাই গাড়ির শব্দকে এরা ততটা উপেক্ষা করে না। বরং তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ে। তাই এদের দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। ঘুরতে ঘুরতে আমরা চলে এলাম এক ওয়াটার হোলে। গত পরশু রাতে এখানে বাঘের দেখা মিলেছে সেন্সাস কর্মীদের। পায়ের দাগও পাওয়া গেল। কিন্তু পাওয়া গেল না পায়ের দাগের মালিককে। দূরে একপাল ভিতু হরিণ আস্তে আস্তে সতর্ক পায়ে ওয়াটার হোলে আসছে। অনেকের পিঠেই ইগ্রেট। হরিণের পিঠ থেকে পোকা বেছে খাচ্ছে। অপর পারে নজরমিনার। দুজন বসার উপযুক্ত। সব মিলিয়ে স্বপ্নিল পরিবেশ। জায়গাটা ছেড়ে চললাম অন্যত্র। আবার ওয়াটার হোল। আর তার পাড়ে অসংখ্য লালমাথা টিয়া। কিন্তু ওয়াটার হোল খালি। রেঞ্জার সাহেব জানালেন, গত রাতের বৃষ্টিতে জঙ্গলের সব নিয়ম ওলটপালট হয়ে গেছে। সহজে শ্বাপদকুলের দেখা মিলবে না। কারণ গভীর বনেও এখন জলের অভাব নেই আর ল্যানটানার ঝোপ বা বাঁশঝাড়ের নীচে ভেজা মাটি বাঘের বিশ্রাম নেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত। চললাম এগিয়ে। দেখা মিলল এক পাল গাউরের। জিপের শব্দে তারা দ্রুত জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হল।

ফিরে এলাম বাংলোয়। প্রাতরাশ সম্পন্ন করে চললাম লেকে। সঙ্গী আমার ক্যামেরা আর আমার ভাই। দুজনে মিলে সোজা নেমে গেলাম জলের কাছাকাছি। একটা পানকৌড়ির দিকে ক্যামেরা তাক করতেই সে সোজা উড়ে পালাল। দেখি সাদা-কালো ছিট ছিট একটা মাছরাঙা— প্রায়ই জলে ঝাঁপ দিচ্ছে আর মাছ নিয়ে পালাচ্ছে। উড়ন্ত অবস্থাতেই ক্যামেরায় ধরা দিল সে।

ঠিক আছে বিকেলে আমরা একটা ওয়াটার হোলের ওপর নজরমিনারে বসব। বিকেলে আমাদের নিয়ে গাড়ি চলল নজরমিনার। বনের রাস্তা ছেড়ে বেশ

খানিকটা ভেতরে এই নজরমিনারের অবস্থান। চারদিকে বেশ ঘন জঙ্গল। কাঠের তৈরি নজরমিনার, সবুজ রং করা, ওঠবার জন্য লোহার সিঁড়ি। চারজনে কোনওক্রমে বসলাম, এবার নজর রাখার পালা। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এবার একটা কিছু ঘটবে। চুপচাপ বসে আছি। ক্যামেরা বাগিয়ে।

হঠাৎ আমাদের ডানদিকে খসখস শব্দ। দুটো গাউর। বেশ রোগা। খুব সন্তর্পণে এল জলে। কিন্তু এমন জায়গা দিয়ে এল যে পড়ে গেল গাছের আড়ালে, ছবি নেওয়ার কোনও উপায় নেই। অবশেষে আমাদের ধৈর্য ভঙ্গ ঘটল, একটু সরে যেই ছবি নেওয়ার জন্য জায়গা নিতে গেছি অমনি ক্যাচ কোচ আওয়াজ আমাদের উপস্থিতির জানান দিল, হুড়মুড় করে উল্টো দিকে দৌড়ল গাউর। আবার অপেক্ষার পালা। বসে আছি। একটু পরে এল একপাল বুনো শুয়োর। বাচ্চাগুলোর গায়ে ছোপছোপ। কাদার মধ্যে কী তাদের খেলা! শুয়োরের দল চলে যাবার পর বাঁদিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটা কাঁকর। প্রচণ্ড ভিতু। প্রতিটা শব্দে সে মুখ ঘুরিয়ে চারদিক দেখছে। দেখে আশা জাগল হয়তো বা বনের রাজা কাঠেপিঠেই আছে, নইলে এত সন্ত্রস্ত ভাব কেন হরিণের? ওয়াটার হোলে সরাসরি না গিয়ে সে চলে এল ডানদিকে। তারপর ধীরে ধীরে সে চলল জলে। সন্ধে হয়ে এসেছে, আমাদের গাড়ির ফিরে আসার-আওয়াজে সে চলে গেল জঙ্গলে। আর আমরাও নজরমিনার থেকে নেমে ফিরে চললাম বনবিশ্রামগৃহে। একটা পুরো দিন কেটে গেল। শ্বাপদকূল বাদে আর সবকিছুর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গেছে। পরদিন যেতে হবে তাড়োবা। দুপুর নাগাদ। এর মধ্যে প্রকৃতিদেবী আর বিরূপ হবেন না এই আশা নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে আবার বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি কোলসার প্রত্যন্ত সীমানায়, পাশেই গ্রাম। গ্রামের বনকর্মী জানালেন, বাঘ জঙ্গলের সীমানা কোনটা জানে না! প্রায়শই গ্রামের পুকুরে চলে আসে। তবে সে হচ্ছে প্রকৃত ভদ্রলোক। তাকে উত্যক্ত না করলে কখনও সে আক্রমণ করে না। মুখোমুখি হলে সে সরে যাবে জঙ্গলে। ফিরে চললাম কোলসার বন-আবাসের দিকে অন্যপথে, পরে শুনেছিলাম যে পথে এসেছিলাম সে পথে ফিরলেই দেখা হয়ে যেত বাঘ পরিবারের সঙ্গে— তারা ওপথেই গ্রামের পুকুরের দিকে আসছিল, একেই বলে কপাল! মধ্যাহ্নভোজন সেরে চেপে বসলাম গাড়িতে। গন্তব্য তাড়োবা। দূরত্ব প্রায় ২৬ কিলোমিটার। এখানে বনদপ্তরের প্রতিটা গাড়িই একে অপরের সঙ্গে ওয়াকিটকিতে যুক্ত। তাড়োবা পৌঁছবার পর শুনলাম বনের রাজা পথের পাশে ওয়াটার হোলে বসে আছেন। তাড়াতাড়ি ছুটলাম সেইদিকে। তাড়োবা চন্দ্রাপুর রোডের ধারে ওয়াটার হোলে জলক্রীড়া সাঙ্গ করে সে তখন বিশ্রাম নিচ্ছে বাঁশঝাড়ের পিছনে। দেখা যাচ্ছে তাকে বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে, তবে পূর্ণাবয়ব নয়। তবু মন্দের ভালো। তাড়োবায় আমাদের ব্যাঘ্র দর্শন শুরু হল।

তাড়োবা বনবিশ্রামগৃহটি অনন্য। টিলার ওপর তার রাজকীয় অবস্থান। নীচে

পুরো তাড়োবা লেকটাকে দেখা যাচ্ছে। ছবির মতো সুন্দর। বিশাল লেক। কুমিরে ভর্তি। লেকের পাশে সাইনবোর্ড 'Swimming is prohibited, survivors will be prosecuted'। বুঝুন কাণ্ড! জলে নামলে বেঁচে ফেরার আশা নেই বললেই চলে। গতকাল নাকি সারাটা সকাল এক বাঘবাবাজি লেকের পাড়ে গাছের ছায়ায় বসে বিভিন্ন রকম পোজ দিয়েছেন পাপরাৎজিদের। ভাবখানা ছিল কত ছবি তুলবে, তোলো! অবশেষে রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যাবার পর সে উঠে জঙ্গলে ঢুকে যায়। আমাদের এসব খবরে কপাল চাপড়ানো ছাড়া উপায় নেই। মালপত্র ঘরবন্দি করেই চললাম জঙ্গলে। এদিকে আকাশের মুখভার। খানিক পরেই নামল বৃষ্টি বড় বড় ফোঁটায়। ক্যামেরা বাঁচিয়ে আমরা ভিজব ঠিক হল। একটু এগিয়ে হঠাৎ দেখি পাশের জঙ্গল দিয়ে বনের রাজা চলেছেন দুলকি চালে। রং ফ্যাকাশে— মানে বেশ বয়স হয়েছে। আমাদের সঙ্গে দূরত্ব প্রায় দেড়শো ফুট। চলেছেন, চলেছি আমরাও, কিন্তু কোথাও ঠিক পরিষ্কার ছবি নেওয়ার জুত পাচ্ছি না। একটু এগিয়ে বনের মাঝে ফাঁকা রাস্তা, যে পথে সে চলেছে তাতে তাকে রাস্তা পেরিয়ে যেতে হবে। আমরা ক্যামেরা তাক করে দাঁড়ালাম। কিন্তু কোথায় কী? অনেকক্ষণ কেটে গেলেও তার দেখা নেই। তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে বুঝতে পেরে সে সুযোগ বুঝে বসে পড়েছে, বা সরে গেছে গভীর জঙ্গলে, আর তাকে খুঁজে বের করার কোনও উপায় নেই।

চললাম পান্ডরপৌনির দিকে। জঙ্গল এদিকে কিছুটা হালকা। আছে ধূসর জমি— সবে বৃষ্টি পেয়ে তাতে ঘাস গজাতে শুরু করেছে, আর আছে মনুষ্যসৃষ্ট ওয়াটার হোল আর নজরমিনার। সন্ধে প্রায় সাড়ে ছটা। বৃষ্টি হবার পর বলতে গেলে কোনও ট্যুরিস্ট গাড়িই আর চোখে পড়ছে না। পান্ডরপৌনি পৌঁছতেই দেখি প্রকাণ্ড মদ্দা বাঘ জল খাচ্ছে। জল খাওয়া পর্ব চলল আরও মিনিট তিনেক। তার সতর্ক চোখ আমাদের গাড়ির দিকে। অবশেষে উঠে দাঁড়াল সে। ফিরে ওয়াটার হোলের পাড় বেয়ে ওপরে উঠে আমাদের দিকে ধীর পায়ে এগোল। তারপর নেমে গেল পুকুরের উল্টোদিকে আমাদের চোখের আড়ালে, আমাদের দিনটা পরিপূর্ণতায় ভরিয়ে দিয়ে। একটা দিনে তিনটে বাঘ। কপাল ভালো না থাকলে সচরাচর এরকম ঘটে না।

'কপাল ভালো' শব্দটা শুনে অন্তর্যামী হেসেছিলেন। সেই রাতেই আবার শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। দাবদাহ থেকে মুক্তি পেলাম ঠিকই, কিন্তু শ্বাপদকূলের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনাও প্রায় শূন্যে গিয়ে ঠেকল।

ঠিক করলাম এবার মন দেব অন্যদিকে। বাঘ বাঘ করে অন্য সব জন্তু দেখার দিকে মনই দেওয়া যাচ্ছে না। বৃষ্টির পর ঘাসের ওপর সমস্ত ময়লা ধুয়ে গেছে। ঘাসগুলো, গাছের নতুন পাতা যেন আরও সবুজ, আরও উজ্জ্বল, চোখের আরও আরাম। পাখিদেরও স্নানের পর যেন অন্য রং। এমনই অবস্থায় একটি নীলকণ্ঠকে পেয়ে গেলাম ক্যামেরার নাগালের মধ্যে।

সবুজ জমির ওপর বৃষ্টির পরে চিতলের দল বেরিয়ে এসেছে। পাল পাল চিতল। এতদিন তো এত চিতল দেখিনি। অনেকে আবার দুপায়ে দাঁড়িয়ে উঁচু গাছের পাতা খাবার চেষ্টা করছে। সব মিলিয়ে প্রকৃতির অন্য রূপ।

বন-আবাসের ঠিক পিছনেই পাহাড়ি রাস্তায় কিছুদূর যাবার পর দেখা মিলল একদল সম্বরের। বড় লাজুক। নিমেষে দৌড় দিল পিছন পানে। আরও দূরে দুটি কাঁকর। হঠাৎই তাদের অ্যালার্ম কল। আমরা সচকিত। ধীর লয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল। দুপাশে সতর্ক চাহনি। আবার অ্যালার্ম কল। এবার একটু দূরে। অর্থাৎ শ্বাপদটি চলমান। ধীরে ধীরে অ্যালার্ম কল দূরে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল। অর্থাৎ এ যাত্রায় আর তাকে দেখা হল না। ঘন বাঁশবনের মধ্য থেকে আমরা ফিরে চললাম।

লেকের পাড় দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎই আমাদের গাইড তুলসীর চোখে পড়ে গেল পাড়ে কুমির রোদ পোয়াচ্ছে। আমাদের উপস্থিতি টের পেতেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। আরেক জায়গায় চোখে পড়ল সদ্য ফোটা কুমিরের ডিমের খোলা। তুলসী জানাল, সেদিনও কুমির মা পাহারা দিচ্ছিল ডিমগুলো, ছানা বেরোবার পরে তারা চলে গেছে জলে।

বন-আবাসের সামনের গাছে দেখা মিলল এক অদ্ভুত-দর্শন গিরগিটির। সামনেটা লাল, পিছনটা কালো। মাঝে মাঝেই সে উঁচু হয়ে কী যেন দেখছে! ভালো করে লক্ষ করে দেখা গেল রংবাহারি পুরুষটি হতকুৎসিত এক মেয়ে গিরগিটির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু সে সেযাত্রায় সফলকাম হল না, মহিলা গিরগিটি দৌড় লাগাল অন্যত্র।

বন-আবাসের চারদিকে বাঁদরের ভিড়। বৃষ্টিতে ভিজে তাদের চেহারাও বেশ খোলতাই। নানা বয়সের নানা সাইজের বাঁদর যেন সর্বক্ষণই ট্রাপিজের খেলা দেখাচ্ছে। বিকেলে বেশ রোদ। আবার চললাম পান্ডরপৌনির দিকে। বাঁশগাছের ঝাড়ের নীচে মহারাজ আয়েশে ঘুমোচ্ছেন। ঘুম ভাঙানোর চেষ্টায় রত অন্তত পঞ্চাশটি গাড়ি। অবশেষে কোনও বেকুব ড্রাইভারের হর্নে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। দ্রুত পালাল সে গভীর জঙ্গলে।

শেষদিন। আমাদের প্রত্যেকেরই মন ভারাক্রান্ত। কালকেই আবার ইট কাঠ পাথরের দেশে ফিরে যেতে হবে। মন না চাইলেও। আমাদের ড্রাইভার আজ প্রতিজ্ঞা করেছে আমাদের সে বড়মিঞার কাছে নিয়ে যাবেই। সারাটা সকাল তারই খোঁজ চলেছে ইতস্তত। কিন্তু দেখা মেলেনি। যখন আমরা প্রায় হাল ছেড়েই দিয়েছি তখনই হঠাৎ আমাদের গাড়ি ঢুকে পড়ল এক বাঁশবনে। সরু পথে এগোতেই দেখি একটা নালা। নালার ওপারে পড়ে আছে একটা গাছের গুঁড়ি। তার পিছনে ছিলার মতো টানটান হলুদ কালো বিশাল বাঘ। এক মুহূর্ত। চোখে চোখ। ব্যাস সে দৌড় লাগাল। আমাদের চাহনি তাকে দ্রুত অনুসরণ করতে চাইল। কিন্তু ঘনবনে দ্রুত সে মিলিয়ে গেল। পরে জেনেছিলাম এই বিশেষ বাঘটির ট্যুরিস্টদের

তাড়া করার ব্যাপারে খ্যাতি আছে। সুতরাং আমরা ভাগ্যবান যে তাড়া খাইনি।

শেষ বিকেল, মালপত্র নিয়ে বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। যাব নাগপুর। রাতটা ওখানে কাটিয়ে কাল চলে যাব কলকাতা। যাবার বেলায় জঙ্গলে আমাদের শেষ চক্কর। আবার চললাম পান্ডরপৌনির দিকে। কারণ ওয়াকিটকিতে ভেসে এসেছে জলে বসে আছে বাঘ— এই সংবাদ। দ্রুতলয়ে পৌঁছে দেখি সোনা রঙের ওপর কালো ডোরা ভিজে গা থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে। না এটা দ্বিতীয় দিনের বাঘ নয়— অন্য বাঘ। বয়স কম। মেয়ে। জল থেকে উঠে সে চলল বিশ্রামে।

চলে গেল সে জঙ্গলে। আমাদেরও যাবার পালা জঙ্গল ছেড়ে। জানি না আবার কবে ফিরে আসব।

প্রয়োজনীয় তথ্য

বনবাংলোর যোগাযোগের ঠিকানা:
ডেপুটি কনজারেভটর অব ফরেস্ট, তাড়োবা-আন্ধেরি টাইগার রিজার্ভ
চন্দ্রপুরা, মহারাষ্ট্র-৪৪২ ৪০১ ☎(০৭১৭২) ২৫১৪১৪
তাড়োবায় মহারাষ্ট্র পর্যটনের ট্যুরিস্ট লজ বুকিংয়ের ঠিকানা:
মহারাষ্ট্র পর্যটন উন্নয়ন নিগম, তাড়োবা, মোহারালি, চন্দ্রপুরা
কলকাতায় বুকিং করেন: **হিমালচূড়া ট্র্যাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস** (☎২৩৭০-৮০০৪)

'ভ্রমণ' জানুয়ারি, ২০০৫

পূর্ণিমায় মুন্সিয়ারি

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

আলমোড়া থেকে গণনাথ ঘুরে গতকালই বাগেশ্বর এসেছি। দোকানপাট কোলাহল মুখরিত জনাকীর্ণ বাগেশ্বরে ট্যুরিস্ট বাংলোটি সত্যিই ভালো। পথের ধারে হলেও ছিমছাম এবং শান্ত। আরও সুন্দর এর স্বল্প পরিসরের গোলাপবাগানটি। লতানে গোলাপ, হাজারি গোলাপ আরও কত ধরনের বিচিত্র সব গোলাপ গাছ। বাগেশ্বরে শেষ সময়টুকু এইসব গোলাপের মধ্যে কাটিয়ে আজ ভোরের আলো ফুটতেই চলেছি মুন্সিয়ারির দিকে। বাংলো ছাড়িয়ে কয়েক পা-দূরে, সেতুর কাছে আসতে সরযু-গোমতীর পুণ্য-সঙ্গমে বাগেশ্বরের আগেকার চেহারাটা ধরা পড়ল। নদী যদিও এখানে শীর্ণকায়া তবু সেই বাগনাথ মন্দির, শ্মশান, পাহাড়ঘেরা গোমতী-সরযুর স্নিগ্ধ কলতান মুহূর্তে যেন পুরনো বাগেশ্বরকে মনে করিয়ে দিল।

বাজার-দোকান, সেতু পেরিয়ে গাড়ি ক্রমশ চড়াই পথ ধরল। নদীসঙ্গম ক্রমশ চোখের আড়ালে চলে গেল। নিবিড় বনানীর মধ্য দিয়ে চড়াই পথ এগিয়ে চলে। গাড়ির কুমায়ুনী চালক নন্দন রাওয়ালের মতে, মুন্সিয়ারি থেকে বাগেশ্বরে ফেরার কোনও যাত্রী পাওয়া যায় না। তাই সে আমাদের থল পর্যন্ত নিয়ে যাবে। থল থেকে মুন্সিয়ারি যাবার ঘনঘন জিপ ও অন্য ভাড়ার গাড়ি মেলে। আমরা সেইমতো আপাতত থল পর্যন্ত চলেছি।

মসৃণ পিচঢালা চড়াই পথ বেয়ে টাটাসুমো ছুটে চলেছে। সকালের স্নিগ্ধ হাওয়ায় শরীর-মন জুড়িয়ে যাচ্ছে। আজ সারাদিন অনেকটা পথ যেতে হবে। বাগেশ্বর থেকে মুন্সিয়ারি প্রায় ১৪০ কিলোমিটার পথ। প্রথমে স্থির ছিল, কাপকোট-সামা-তেজাম হয়ে আমরা যাব কিন্তু পরে খবর নিয়ে জানলাম সামা-তেজামের পথের কিছুটা জায়গায় ধস এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি। এপথে এলে কিলোমিটার কিছুটা কম হয় কিন্তু বিধি বাম! অগত্যা চিরাচরিত পথ ধরে আসা।

ভারি সুন্দর এক অরণ্যপথ ধরে আমরা চলেছি। দুপাশে দীর্ঘ, ঋজু সব গাছগাছালি। তারই ফাঁকে ফাঁকে যে শৃঙ্গগুলো মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছিলাম এক লহমায় তারা এখন চোখের সামনে নীলাকাশের ক্যানভাসে পরপর দাঁড়িয়ে,

নন্দাদেবী, চৌখাম্বা পঞ্চচুল্লি। অরণ্য ছাওয়া পথ ছেড়ে আমরা এখন খোলা আকাশের নীচে চলে এসেছি। এসে পৌঁছেছি চৌকরিতে।

আজ থেকে আট বছর আগে চৌকরিতে দুরাত কাটিয়েছিলাম। তখন মা বেঁচেছিলেন। তখন এখানে এইসব ছোট ছোট কটেজ তৈরি হয়নি। ভ্রমণপিপাসু মানুষ খুব কম জনই চৌকরির খবর রাখতেন। শুধুমাত্র পিণ্ডারি-কাফনি-সুন্দরডুঙ্গা পদযাত্রীদের মুখে মুখে ঘুরত চৌকরির নাম। পূর্ণিমার রাতে চৌখাম্বা-পঞ্চচুল্লি-নন্দাদেবীর অসাধারণ রূপলাবণ্য সেদিন আমাদের অবাক করে দিয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত সবাই জেগেছিলাম। মা-ও খুব খুশি হয়েছিলেন। মুন্সিয়ারি থেকে ফিরে এখানে একটা দিন থাকার ইচ্ছে আছে। তাই ঘর বুক করে পুনরায় যাত্রা করলাম।

চলেছি থল-এর দিকে। গাড়ি চলেছে টানা পিচরাস্তা বরাবর। এখানে সর্বদা হিমালয় চোখের সামনে। কাছাকাছি নয়, অরণ্যানী সব দূরে দূরে। এখন প্রকৃতি যেন সামনেই অনেকটা ব্যাপ্তি নিয়ে। বাগেশ্বর থেকে চৌকরি ৪৪ কিলোমিটার, চৌকরি থেকে থল মাত্র ২৩ কিলোমিটার। সুতরাং কিছুক্ষণের মধ্যে থলে পৌঁছে গেলাম। রামগঙ্গা নদীর কোলে থল রীতিমতো ব্যস্ত গঞ্জ। চারপাশে দোকান-বাজার, থাকবার জন্য সাধারণ মানের হোটেল, স্কুল, ব্যাঙ্ক, বাসস্ট্যান্ড, ট্যাক্সিস্ট্যান্ড— মোটকথা এলাহি ব্যাপার। হঠাৎ মনে হল, কোনও এক পার্বত্য জনপদের মেলায় এসে হাজির হয়েছি। থল সড়কপথে কুমায়ুনের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী কেন্দ্রবিন্দু। আলমোড়া-বাগেশ্বর থেকে চৌকরি হয়ে, কিংবা পিথোরাগড় থেকে দিদিহাট হয়ে আবার তাওয়াঘাট-জৈলজীবী-ওগলা থেকে থল ছুঁয়ে মুন্সিয়ারি যাওয়া যায়।

থল পৌঁছতেই আকাশের চেহারা কিছুটা গম্ভীর হয়ে এল। আমরা গাড়ি ছেড়ে দিলাম। নন্দন রাওয়াল বিদায় জানিয়ে বাগেশ্বর ফিরে গেল। ততক্ষণে আরেকটি টাটাসুমো আমাদের নিয়ে যেতে হাজির হয়েছে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে তাড়াতাড়ি মালপত্তর গুছিয়ে পুনরায় রওনা দিলাম। এবার চালক মদনমোহন বয়সে তরুণ এবং খুব হাসিখুশি। প্রতিদিন তাকে ৩-৪ বার করে মুন্সিয়ারি যাতায়াত করতে হয়। স্টিরিও চালিয়ে দিয়েই সে গাড়ি স্টার্ট দিল। বৃষ্টি হয়ে চলেছে তবে অল্প এবং ক্রমশ আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। থল ছেড়ে কিছুটা যাবার পর চারপাশের প্রকৃতি আবার পাল্টে গেল। প্রসারিত নিসর্গ, বিস্তীর্ণ উপত্যকা জুড়ে রামগঙ্গা দুর্বার গতিতে বয়ে চলেছে। দূরে নীলাকাশ জুড়ে হিমালয়ের স্নিগ্ধ অভিভাবকত্ব। নাচনি ছাড়িয়ে তেজামের দিকে চলেছি। আবার পাহাড়ি পথ জুড়ে চির-পাইন-দেওদারের একচ্ছত্র রাজত্ব। ক্যুইটি— অদ্ভুত নাম জায়গাটির। সামান্য ক'টি দোকান নিয়ে ছোট্ট গঞ্জ। কুমায়ুনী চালক মদনমোহন বলল, এখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে নিন। পথে আর খাওয়ার জায়গা মিলবে না। তাছাড়া এখানে নাকি মাছ-ভাত পাওয়া যায়। মাছের কথা শুনে সাগ্রহে সবাই নেমে পড়লাম। রাস্তার

ধারেই দোকান। ছোট্ট এবং মাটির। মালিক-যুবক নিজেই সর্বেসর্বা। খাবার দিচ্ছে, পরিবেশন করছে, হাত ধোবার জল দিচ্ছে, আবার পয়সা নিচ্ছে— সব একাই। মিল-চুক্তিতে খাওয়া। মাছের প্লেট পনেরো টাকা আলাদা।

আঁশহীন, অল্প-কাঁটাযুক্ত ছোট ছোট মাছ (ট্রাউট মাছের আত্মীয় হবে) অনেকটা কলকাতার বাটা-মাছের মতো দেখতে। এরা মাছের পাখনা কাটে না। সবটাই রান্না করে। স্বাদ কিন্তু বেশ ভালো। বহুদিন বাদে মাছ-ভাত পেয়ে খাওয়াটা ভালোই জমল। বিশেষত আমার সঙ্গের শিশু দুটি এ যাত্রায় এই প্রথম খুব আনন্দ করে খাবার খেল। আহার পর্ব মিটতেই যাত্রা করলাম। পথ ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে। পাহাড়-নদী-ঝরনা-সবুজ সব নিয়ে প্রকৃতি চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কেমন বিচিত্র সব রং ফুটিয়ে তুলেছে। বিরথি অসাধারণ একটি পাহাড়ি-ঝরনা। অনেক ওপর থেকে জল নামছে। অপূর্ব এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সংলগ্ন বাংলোটিও মনোরম। এমন একান্ত নির্জনে ঝরে যাওয়া দেখে মনে হল, নামটা বিরথি না হয়ে বিরহী হলে দারুণ রোমান্টিক হত।

সামনেই কালামুনি পাসের পথ। রাস্তা ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। সবুজের সমারোহ এখানে কিছুটা কম। ঘুরে ঘুরে পথ উঠেছে শীর্ষে। সেইমতো ধুলো-পাথর-মাটির কাঁচাপথ ধরে গাড়ি চড়াই ভেঙে ওপরের দিকে উঠে চলেছে। পথের ধারেই খাদ, খাদের গভীরতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এ পথ মোটেই মসৃণ নয় তবে তেমন বিপজ্জনকও নয়। এ হল বিশ্বপ্রকৃতির ভালো-মন্দ রূপ— দুইই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং বৈচিত্র্যময়।

একটানা চড়াই পথের প্রান্তে আমরা কালামুনি গিরিবর্ত্ম শীর্ষে পৌঁছলাম। সামনেই ডানদিকে পথের ধারে একটি কালীমন্দির। ভারি অবাক হলাম। ততক্ষণে ড্রাইভার মদনমোহন পুজো দেওয়ার উদ্দেশ্যে গাড়ি থামিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেছে। আমরাও নামলাম। এটি আসলে এক নগ্নসাধক নাঙ্গাবাবার ঘণ্টামন্দির। তিনি কয়েকবছর হল মারা গেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আরাধ্যদেবী সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা— পাথরের কালীমূর্তি, স্থানীয় মানুষজন এবং গাড়ির চালকদের কাছে অত্যন্ত জাগ্রত। তাই দুর্গম কালামুনি পাস অতিক্রম করার পর প্রতিটি গাড়ির চালক এখানে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পুজো দেয়। কালামুনি টপের উচ্চতা (৯,৫০০ ফুট) থেকে উতরাই পথ বেয়ে গাড়ি ছুটেছে তীব্র বেগে। সামনেই, চোখের ওপর ভেসে উঠল অসাধারণ এক রূপ। পঞ্চচুল্লি তার উদ্ধত, তীক্ষ্ণ পাঁচটি শ্বেতশুভ্র শিখর নিয়ে দাঁড়িয়ে। শুভ্রতাও যে কত তীব্র এবং চোখ ঝলসানো হতে পারে জীবনে এই প্রথম অনুভব করলাম। আর এত কাছে! বিচিত্র এক শিহরণ খেলে গেল সারা শরীরে। পেলিং থেকে হাত বাড়ানো দূরত্বে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছিলাম। কিন্তু এখানে পঞ্চচুল্লি একেবারে চোখের সামনে। মনে হচ্ছে স্বয়ং দ্রৌপদীর হেঁসেলে আমরা ঢুকে পড়েছি।

চমৎকার পিচঢালা পথ ধরে গাড়ি তরতর করে নীচে নেমে চলেছে। ভারি

সুন্দর বনপথের আলো-আঁধারির মধ্য থেকে রৌদ্রস্নাত পর্বতরাজি-ধরা দিচ্ছিল এতক্ষণ। সহসা অদ্ভুত এক মেঘ-রৌদ্রের খেলা শুরু হল। পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের পার্বত্য জনপদ মুন্সিয়ারিকে অপূর্ব লাগছে। আকাশ মাথায় করে আমারা ট্যুরিস্ট বাংলোয় এসে পৌঁছলাম। গাড়ি থেকে নামতেই ঘন ঘন ডেকে উঠল আকাশ। সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুতের শব্দ-ঝলকানি ক্রমশ বাড়তে লাগল। কোথায় গেল সোনা-ঝরা রোদ! বরফধৌত তুষারকিরীট! প্রবল বৃষ্টি শুরু হল। আমরা মুন্সিয়ারি পৌঁছলাম। থল থেকে দূরত্ব ৭৩ কিলোমিটার, উচ্চতা ৭,৫০০ ফুট।

দোতলার ওপর সুপার ডিলাক্স রুম। আধুনিকতার সব উপকরণসহ দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ঘরগুলি খুবই সুন্দর। তার ওপর জানলা খুললেই চোখের সামনে নয়নাভিরাম পঞ্চচুল্লির সর্বদা অবস্থান। প্রায় ঘণ্টাখানেক একটানা বৃষ্টির পর আকাশ শান্ত হল। পাহাড়, জঙ্গল, পাথুরে পথ ধুয়েমুছে সাফ করে বৃষ্টির জলধারা তীব্রস্রোতে ছুটে চলল অনেক নীচের গৌরীগঙ্গার দিকে। শার্সি ঢাকা জানলা, কার্পেটে মোড়া মেঝে, নরম গদিওয়ালা আরামদায়ক বিছানা-সোফায় বসেও বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা বোধ হল। পথেই সেরেছি দুপুরের আহার। এখন এককাপ করে কড়া কফি হলে দারুণ জমে। সুতরাং, নেসকাফের ইনস্ট্যান্ট কফিমিক্সচার বাংলোর সুদৃশ্য ফ্লাস্কের গরমজলে গুলে মুহূর্তে সকলের হাতে হাতে কফির গ্লাস। বন্ধ জানলার ওধারে উজ্জ্বল স্নিগ্ধ মুন্সিয়ারি, আর তার সাদা মেঘ-কালো মেঘ মাখামাখি বিচিত্র আকাশমঞ্চ। সাদা-ধোঁয়ারঙা মেঘ আর ভয়াল নেউল মেঘ দেখে সহসা মনে হল— এই বুঝি সেই স্থান যেখানে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ইজেলে ক্যানভাস সাজিয়ে সাদা প্যালেটে রামধনু ঢেলে মেঘ থেকে ছবি আঁকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এ কথা মনে হতেই ততোধিক বিস্ময়ে লক্ষ করলাম আকাশ-পাহাড়-বনানী-মৃত্তিকা স্পর্শ করে স্বল্পালোকে কেমন অবাককরা সপ্তরঙা রামধনু ফুটে উঠেছে। মুন্সিয়ারি ক্রমশ আমাদের পেয়ে বসল।

সন্ধ্যা হয়ে এল। বাংলোর সব আলো এতক্ষণে জ্বলে উঠেছে। আসার পর থেকে পর্যটক আবাসটি ঘুরে দেখার সুযোগ পাইনি। ওপর-নীচে মিলিয়ে মোট দশটি (আটটি দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ও দুটি চারশয্যাবিশিষ্ট) ঘর এবং দুটি তলাতেই আটশয্যার একটি করে ডর্মিটরি। প্রত্যেকটি ঘরই সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো বিশেষত সুপার ডিলাক্স ঘরগুলি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। এছাড়া ডাইনিং হলটিও ছোটর মধ্যে বেশ ছিমছাম ও সুন্দর। ডাইনিং হল ও ঘরগুলির সংযোগ হিসেবে সুন্দর একটি করিডরও আছে। করিডরের দুপাশে দুটি খোলা জানলা। বাংলোর চারপাশটা আরও মনোরম করে তোলার জন্য প্রস্তুতি চলছে। সব মিলিয়ে পর্যটক আবাসটির অবস্থান ও ব্যবস্থা দুটোই লোভনীয়।

কথায় কথায় বাংলোর লনে এসে দাঁড়ালাম। আকাশ কখন পরিষ্কার হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি। চারপাশে অদ্ভুত এক আভা ফুটে উঠেছে। খেয়াল করতেই মনে পড়ে গেল আজ পূর্ণিমায়। কলকাতায় বসে যখন ভ্রমণসূচি তৈরি করছিলাম তখন

অজান্তেই মুন্সিয়ারি থাকার দিনটি পূর্ণিমায় পড়েছিল। সুতরাং আজ সেইদিন। জ্যোৎস্নালোকে পঞ্চচুল্লি দেখার দুর্লভ সুযোগ কোনওভাবেই বৃথা গেলে হবে না। বাংলোর ডানপ্রান্তের অদূরে উঁচু টিলাটার গা-বেয়ে, মাথা টপকে ধীরে ধীরে চাঁদ উঠছে।

ডিনার পর্বের পর ঘরে ফিরে এলাম। আলো নিভিয়ে জানলা খুলে অপলক বাইরে চেয়ে আছি। জ্যোৎস্নালোক গাঢ় হলেও তেমন নয় যাতে পঞ্চচুল্লি অবাক করতে পারে। বুঝতে পারলাম— রাত জাগতে হবে! খোলা জানালা বেয়ে সিরসিরে হাওয়া ঘরের পরিবেশকে শীতলতম করে তুলল সহসা। জানালা বন্ধ করে, পর্দা সরিয়ে শুতে গেলাম। বালিশের তলায় টর্চ ও হাতঘড়ি।

শিয়রে পূর্ণিমার চাঁদ। জানালার পাশেই শ্বেতশুভ্র পঞ্চচুল্লি। চাঁদের আলো একটু একটু করে তীক্ষ্ণ হচ্ছে। রাত বারোটা নাগাদ চমকে উঠলাম। ঘরের মেঝে, বিছানা-চাদর সবকিছু জ্যোৎস্নায় ভাসছে। পূর্ণিমার আলোয় পঞ্চচুল্লির প্রতিটি চূড়া জ্বলজ্বল করছে। গাছপালা, ঘরবাড়ি মায় বাজারের দিকে চলে যাওয়া এবড়ো খেবড়ো পাথুরে পথ তীব্র চন্দ্রালোকে ভাসছে। পঞ্চচুল্লির সংসারে চাঁদের সে কী অসাধারণ আলোক-বিচ্ছুরণ। দীর্ঘকায় ঋজু প্রথম শিখরটির মাথায় এবং দুপাশে ছোট ছোট তারারা মুক্ত হয়ে জ্বলছে। দিগন্ত-প্লাবী জ্যোৎস্নাধারায় সমগ্র মুন্সিয়ারি ভেসে যাচ্ছে, অথচ সে রূপ কী শান্ত, কী স্নিগ্ধ, কী অপরূপ মায়াবী। সবার অজান্তে বিশ্বপ্রকৃতিতে কেমন অবলীলায় রং-রূপের খেলা চলেছে। এমন নেশা জাগানো পাগল করা প্রকৃতির মাঝে জেগে থেকে মনে হল যেন স্বপ্নলোকে আছি। কলকাতা থেকে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। স্ট্যান্ডে ক্যামেরা সেট করে দীর্ঘ তিরিশ মিনিট ধরে জ্যোৎস্নাধারায় পঞ্চচুল্লি, চাঁদনি রাতের মুন্সিয়ারিকে সেলুলয়েডে ধরে রাখলাম। শীতের তীব্রতা কাবু করলেও পূর্ণিমা রাতের মুন্সিয়ারি হৃদয়-মন কানায় কানায় পূর্ণ করে দিল। জানলা বন্ধ করে পরিতৃপ্ত হৃদয়ে পুনরায় শুতে গেলাম। তখনও চাঁদ ঘরের কার্পেট, বিছানার চাদরে অফুরান আলো ঢেলে চলেছে।

সবে ভোর হয়েছে, এখনও সূর্য ওঠেনি। বিছানা ছেড়ে বসে আছি সেই কখন থেকে। দিনের প্রথম সূর্যালোকে পঞ্চচুল্লিকে দেখব বলে। সকালের ফুরফুরে হাওয়ায় শরীর-মন স্নিগ্ধ হয়ে উঠছে। তখনও মুন্সিয়ারি তেমনভাবে জেগে ওঠেনি হঠাৎ পুবদিকের কোণটি জুড়ে মৃদু সোনালি আলোর রেখা ফুটে উঠল। পঞ্চচুল্লির খর্বকায় প্রথম শিখরটির মাথায় জমে থাকা বরফের মুকুট সূর্যের আভায় একটু একটু করে গলছে আর তা থেকে উত্থিত বাষ্পকুণ্ড অদ্ভুত এক মায়াজাল রচনা করেছে।

আজ সূর্যকরোজ্জ্বল একটি সোনালি দিন মুন্সিয়ারি আমাদের উপহার দিল। সকাল থেকেই প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রৌদ্রস্নাত তুষারকিরীট পঞ্চচুল্লি। চলেছি বাজারের দিকে। বাংলোর সামনে দিয়ে অসমান পাথুরে পথ সোজা নীচের দিকে নেমে মিলেছে মূল রাস্তায়। এটাই বাস ও জিপস্ট্যান্ড। আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে

কিছু দোকান। একটি চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে পুনরায় একটি পথ আরও নীচের দিকে নেমে মূল বাজারে মিলেছে। এখানে স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দোকান-বাজার, জেলাশাসকের অফিস, সাধারণ মানের লজ, ধর্মশালা গান্ধিআশ্রম সব নিয়ে বেশ জমজমাট জায়গা। প্রায় ২০০টির বেশি গ্রাম নিয়ে মহকুমা শহর মুন্সিয়ারি। কয়েক বছর আগেও এখানে থাকবার জায়গা বলতে পূর্তবিভাগের বাংলোই সব। বর্তমানে পর্যটক আবাস ছাড়া দুয়েকটি রিসর্ট এবং ভালো-মন্দ মিলিয়ে বেশ কয়েকটি হোটেল আছে।

মূল রাস্তা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, তারপর গ্রাম-বসতির পাশ দিয়ে হাঁটাপথ সবুজ বনানী ভেদ করে নেমেছে গৌরীগঙ্গার দিকে। সেখান থেকে কখনও উতরাই, কখনও চড়াই পথ বেয়ে দারকোট, লিলাম, বুগদিয়ার, রিলকোট, মিলামগ্রাম হয়ে ৬১ কিলোমিটার দূরে গৌরীগঙ্গার উৎস মিলাম গ্লেসিয়ার যাওয়া যায়। আবার অন্য পথ লিলাম হয়ে পাটন, সোফিয়ার, ওড়িয়ার হয়ে গেছে রালাম হিমবাহে। মিলামের তুলনায় রালামের পথ অপেক্ষাকৃত দুর্গম। মিলামে থাকবার মোটামুটি বন্দোবস্ত থাকলেও রালাম গ্লেসিয়ার পদযাত্রায় তাঁবুর বিশেষ প্রয়োজন। মোটকথা মুন্সিয়ারি হল মিলাম এবং রালাম গ্লেসিয়ারের বেসক্যাম্প। এখানে নভেম্বরের শেষ থেকে মার্চের শেষ পর্যন্ত ঠান্ডার আধিক্য। তখন প্রবল তুষারপাতে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও ব্যাহত হয়। বাংলো থেকে নামার পথে মূল রাস্তার কাছে এক কুমায়ুনী বয়স্ক মহিলার চায়ের দোকান। দেখলাম, সে তখন বৈকালিক সামোসার উপকরণ নিয়ে ব্যস্ত। তাকে আমাদের সান্ধ্য চা-সিঙারার অর্ডার দিলাম। এরা সবাই কেমন হাসিখুশি, আন্তরিক। মূল রাস্তা ধরে পূর্বপ্রান্তের পাহাড়ি টিলার দিকে এগিয়ে চললাম। ঘোরানো পিচের রাস্তা ছেড়ে পাথুরে সিঁড়িপথ ক্রমশ ওপরে উঠে গেছে। আমরাও চড়াই পথ ধরে ক্রমশ ওপরে উঠে এলাম। টিলার শীর্ষদেশে ইন্টারন্যাশনাল কলেজ, ষাণ্মাসিক পরীক্ষা চলছে। কী অপূর্ব এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, নীল আকাশের আঙিনায় বরফের মুকুটপরা নগাধিরাজ— হিমালয়ের শৃঙ্গরাজি, কাছে-দূরে সর্বত্র বিপুল সবুজের সমারোহ, স্বাস্থ্যকর হিমেল বাতাস। সব মিলিয়ে মনে হল এটাই বিদ্যায়তনের প্রকৃত স্থান। এসব পরিবেশেই তো মানুষের গড়ে ওঠা, বেড়ে ওঠার কথা ছিল।

সময় শেষের ঘণ্টা পড়তেই ছেলেমেয়ের দল হৈ হৈ করে উতরাই পথে নামতে লাগল। ওদের অনুসরণ করে আমরাও নেমে এলাম। নামতে নামতে দেখলাম বাঁদিকে প্রসারিত একটি সমতল প্রান্তর। এটিই মুন্সিয়ারির হেলিপ্যাড। এখান থেকে সমগ্র মুন্সিয়ারিকে ভারি সুন্দর দেখতে লাগে। এখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাংলোয় ফিরে এলাম। তারপর দুপুরের আহারপর্ব সাঙ্গ হতেই বাংলোর সামনের ছোট্ট অথচ পরিচ্ছন্ন বাগানে দ্বিপ্রাহরিক রোদ পোয়ানোয় কেটে গেল বেশ কটি ঘণ্টা। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সারাটা দিন চোখের সামনে উজ্জ্বল উপস্থিতির

স্বাক্ষর রেখে দিল শ্বেতবরনা পঞ্চচুল্লি। এখন সূর্য সবে পশ্চিম পাটে নেমেছে। তারই সোনাগলা রং ধরেছে শিখরগুলোর দেহে— সে আরেক পাগলকরা দৃশ্য। সেই মহিমময় রূপ অবলোকন করতে করতে নেমে চললাম বাসস্ট্যান্ডের দিকে যেখানে কুমায়ুনী মহিলার চায়ের দোকানে গরম গরম সামোসা আমাদের অপেক্ষায় আছে।

আজ মুন্সিয়ারিতে আমাদের দ্বিতীয় সন্ধ্যা। পূর্ণিমার পরের দিন। কফির গ্লাস হাতে জানালার সামনে গিয়ে বসলাম। পূর্ণিমার পরের দিন, তাই চাঁদ উঠতে সামান্য দেরি হবে। আজ শীতের মাত্রাও বেড়েছে। পূর্ণ চাঁদের মায়ায় ক্রমশ মুন্সিয়ারি অপরূপ রূপে সেজে উঠল।

আজ ডিনারে মেনু ছিল তন্দুরি রুটি, মাটন-কষা ও স্যালাড। শুতে গেলাম যখন মধ্যগগনে চাঁদ তখন ভরা-জ্যোৎস্নায় ভাসছে।

মুন্সিয়ারিতে এবারে পালা সাঙ্গ হবার মুহূর্ত। আজও সোনালি রোদে ঝলমল করছে মুন্সিয়ারি। ঠিক দশটা নাগাদ আমরা রওনা দিলাম। গাড়ি ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগল কালামুনি পাসের দিকে। চোখের আড়াল হবার আগে পর্যন্ত অপলক চেয়ে রইলাম অপরূপা পঞ্চচুল্লির দিকে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে কাঠগোদাম এক্সপ্রেসে সরাসরি হলদোয়ানি বা কাঠগোদাম পৌঁছে কিংবা অমৃতসর মেলে লখনউ থেকে নৈনিতাল এক্সপ্রেসে লালকুঁয়া অথবা যে-কোনও ট্রেনে দিল্লি, দিল্লি থেকে ৫০১৩/১৪ রানিখেত এক্সপ্রেস ধরে কাঠগোদাম পৌঁছে নৈনিতাল, আলমোড়া, কৌশানি, বাগেশ্বর, চৌকরি থেকে মুন্সিয়ারি যাওয়া যায়। অন্যপথে (যাঁরা মায়াবতী এবং পিথোরাগড় ঘুরতে চান) নৈনিতাল এক্সপ্রেসে পিলভিট-টনকপুর হয়ে, লোহাঘাট, মায়াবতী, পিথোরাগড়, দিদিহাট অথবা চৌকরি ঘুরে থল হয়ে মুন্সিয়ারি যেতে পারেন। পনেরো দিনের ভ্রমণসূচিতে (ট্রেনে কাটানো সময় বাদে) ভালোই ঘোরা যায়।

এপ্রিল থেকে জুনের শেষ, আবার সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি। এপ্রিলের শুরুতে এবং নভেম্বরে বরফের দেখা মিলতে পারে।

কোথায় থাকবেন

সর্বত্র কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের পর্যটক বাংলো আছে। মুন্সিয়ারিতে ঘরভাড়া ৫০০ টাকা থেকে শুরু; ডর্মিটরিতে শয্যাপ্রতি ৬০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:

ম্যানেজার
সেন্ট্রাল রিজার্ভেশন সেন্টার, যাত্রিক সুবিধাকেন্দ্র
ট্যুরিস্ট রেস্টহাউস, সুখতাল, নৈনিতাল ☎(০৫৯৪২) ৩১৪৩৬/৩৬৩৭৪

হুইলস ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস
৫১, একডালিয়া রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯
☎২৪৬০-১৮৮৬ টেলিফ্যাক্স: ২৪৪০-৮৯৪২
ই-মেল: wheelstt@hotmail.com

হিমালচূড়া ট্র্যাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস
পি-২৬৩, সি আই টি রোড, স্কিম-৪(এম)
কলকাতা-৭০০ ০১০
☎২৩৭০-৮০০৪, ২৩৬৩-৩০০০
ফ্যাক্স: ২৩৫০-১৬১৬

ডায়মন্ড ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস
৩০, যদুনাথ দে রোড
কলকাতা-৭০০ ০১২
☎২২২৫-৯৬৩৯ ফ্যাক্স: ২২৩৭-৬৭১৪

'ভ্রমণ' মার্চ, ২০০৪

গাড়িতে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা

ধীমান ঘোষ

কাঠমান্ডু থেকে আমাদের ২৮ জনের দল বাসে করে রওনা দিলাম ১১৪ কিলোমিটার দূরের শহর কোডারির উদ্দেশে। কোডারি হল নেপাল-চিন সীমান্তের শেষ শহর। এখানেই ভোটেকোশি নদীর ওপর ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ পেরিয়ে ও চেকপোস্টে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখিয়ে আমরা চিনে প্রবেশ করলাম। আমাদের দলে ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের অভিজ্ঞ ডাক্তার শিবময় দাস, সঙ্গে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার। তিনি কাঠমান্ডুতে আমাদের একদফা ডাক্তারি পরীক্ষা করেছিলেন, কারণ মানসের পথের বেশিরভাগই যেতে হবে ১৪,০০০ ফুট উচ্চতা দিয়ে, বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম, তাই সুস্থ থাকা জরুরি। আমাদের সফর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সমীর রায়, যিনি চিনের দিক দিয়ে সংগঠিত দুটি এভারেস্ট অভিযানে পশ্চিমবঙ্গের দুটি অভিযাত্রী দলে ছিলেন। আমাদের কুক হিসাবে ছিলেন দার্জিলিংয়ের আংনিমা, যিনি দেশি-বিদেশি বহু অভিযাত্রী দলের সঙ্গে এভারেস্ট সহ কাশ্মীর, গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের অনেক পর্বতশৃঙ্গ অভিযানে গিয়েছিলেন।

ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ পেরিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল ৭টি ল্যান্ডক্রুজার গাড়ি। এই গাড়িগুলিই আমাদের নিয়ে যাবে মানস সরোবর পর্যন্ত। প্রথমে আমরা গেলাম ৯ কিলোমিটার নো-ম্যানস ল্যান্ড পেরিয়ে চিনের সীমান্ত শহর ঝাংমুতে। এখানেই চিনা ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমসে ভিসা, পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র দেখিয়ে মানস যাবার ছাড়পত্র নিতে হবে। আমাদের পরিকল্পনা ছিল চিনা ইমিগ্রেশন দপ্তরের ছাড়পত্র পাবার পর ৭,০০০ ফুট উচ্চতার ঝাংমু থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরের শহর নিয়ালামে গিয়ে দুদিন বিশ্রাম নেব। নিয়ালামের উচ্চতা ১২,০০০ ফুট। মানসের পথের উচ্চতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এটা একান্তই জরুরি ছিল। কিন্তু কাঠমান্ডু থেকে কোডারি আসার পথে রাস্তায় ভীষণ ধস নামার জন্য প্রায় তিনঘণ্টা আটকে ছিলাম। যখন ঝাংমু পৌঁছলাম, ইমিগ্রেশন অফিসার জানিয়ে দিলেন যে আমরা দেরি করে ফেলেছি তাই আজ ঝাংমুতেই থাকতে হবে। আমাদের পাসপোর্ট জমা নিয়ে নেওয়া হল। পরদিন সকাল সকাল কাজ সেরে আমরা পৌঁছে গেলাম নিয়ালাম। ঝাংমু থেকে প্রথম কিছুটা পথ নদীর

পাশে পাশে পাহাড় ঘেঁসে এবং দুপাশের পাহাড়ে ঘন জঙ্গল। কিন্তু যতই উচ্চতা বাড়তে লাগল, বড় গাছের সংখ্যা কমে আসতে লাগল এবং নিয়ালামের আগের থেকেই শুরু হয়ে গেল রুক্ষ ন্যাড়া পাহাড়, এখানে ওখানে ছোট ছোট জংলি ঘাসের ঝোপ।

পাহাড়ের কোলে ছোট তিব্বতি শহর নিয়ালাম। শুনেছি এক বছর আগেও ছোট ছোট বাড়ি, দোকান এবং পোস্ট অফিস ছাড়া কিছু ছিল না। কিন্তু এখন দেখলাম বেশ বড় বড় হোটেল, বাড়ি, পাকা বাঁধানো রাস্তা, রেস্তোরাঁ, পানশালা, দোকান ইত্যাদি। আমরা ডিনার সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

পরদিন আমাদের গন্তব্য সাগা, নিয়ালাম থেকে দূরত্ব ২৫০ কিলোমিটার। হোটেল থেকে একটু এগিয়ে ব্রিজ পেরিয়ে ডানহাতে নদী রেখে এগিয়ে চললাম। এখানে চেকপোস্টে কাগজ দেখাতে হল। চারপাশে রুক্ষ ন্যাড়া পাহাড়। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। প্রায় দেড়ঘণ্টা চলার পর কয়েকটা বাঁক পার হয়ে উঠে এলাম ১৬,০০০ ফুট উচ্চতার নিয়ালাম পাসে এবং চারপাশের সৌন্দর্য দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। যেন হাতের নাগালে দাঁড়িয়ে আছে শিসা পাংমা শৃঙ্গ ও নাম না-জানা আরও অনেক পর্বতচূড়া। মনে হচ্ছে তিনদিক থেকে তারা আমাদের ঘিরে ফেলেছে। পৃথিবীতে মাত্র ১৪টি পর্বতশৃঙ্গ আছে যেগুলি ৮,০০০ মিটার বা তার বেশি উচ্চতার। তার একটি হল এই শিসা পাংমা, নেপালে এরই নাম গোঁসাইথান। মানসের পথে আমরা ৮,০০০ মিটারের বেশি উচ্চতার আরও তিনটি শৃঙ্গ দেখেছি— অন্নপূর্ণা, মানাসলু ও ধবলগিরি। এত কাছ থেকে এত বিখ্যাত একটি পর্বতচূড়া দেখতে পাব কল্পনাও করিনি। মনে হচ্ছিল দৌড়ে উঠে পড়তে পারব। নেপাল থেকে আমরা যে পাহাড় চূড়াগুলো দেখে থাকি তাদেরকেই এবার আমরা উল্টোদিক থেকে অর্থাৎ তিব্বতের দিক থেকে দেখছি। কিন্তু গোঁসাইথানের মতো এত কাছ থেকে কাউকেই দেখা যায় না।

নিয়ালাম পাস পেরিয়ে আরও এগিয়ে যেতে যেতে শুরু হল মরুভূমির বালিয়াড়ি। তিব্বতের বেশিরভাগটাই শীতল মরুভূমি। কোথাও এই মরুভূমির বুক চিরে বয়ে গেছে পাহাড়ি নদী, মাঝে মাঝেই দেখা যায় ছোট বড় জলাশয়, কোথাও হলুদ বা সোনালি রঙের ঘাসজমি। আমাদের বাঁদিকে গোঁসাইথান। ডানদিকে অনেক দূরে দেখা গেল নীল জলের এক বিশাল লেক, কখনও চোখের সামনে কখনও পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে হারিয়ে যাচ্ছে। আরও কিছুটা যাবার পর এসে পড়লাম পৃথিবীর সর্বোচ্চ মিষ্টি জলের হ্রদ পেলকুৎসোর ধারে। আমার মতে, এটাই এ পথের সবচেয়ে সুন্দর হ্রদ। এর আগে লাদাখের বিখ্যাত লেকগুলি দেখেছি। কিন্তু জলের এত মনভোলানো সুন্দর নীল রং আর দেখিনি, এমনকী মানসের জলও নয়। সমুদ্রের রংও হার মেনে যায়। এখন শিসা পাংমাকে আর দেখা যাচ্ছে না, দেখা যেতে লাগল অন্য কিছু চূড়া। আমাদের ডানদিকে পেলকুৎসো আর বাঁদিকে একদম সামনে মচ্ছপুচ্ছার শৃঙ্গ। নেপাল থেকেও এত

কাছ থেকে দেখা যায় না।

বিকেলে পৌঁছলাম ব্রহ্মপুত্রের ধারে। তিব্বতে এর নাম তাচোক সাংপো। ফেরিতে করে মানুষ ও গাড়ি পারাপার করতে হয়। নদী পেরিয়ে সাগাতে গিয়ে আজকের বিরতি। বর্তমানে সাগা একটি জমজমাট জায়গা। প্রচুর বড় বাড়ি, হোটেল, পানশালা, দোকান ইত্যাদি তৈরি হয়েছে।

সাগার উচ্চতা সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুট। সাধারণত যাঁরা ভালোভাবে সাগা অতিক্রম করতে পারেন তাঁদের মানস পর্যন্ত আর কোনও শারীরিক অসুবিধা হয় না। কারণ নিয়ালাম থেকে সাগা আসতে সবথেকে বেশি ধকল যায় এবং সাগার উচ্চতাও খুব বেশি বলে এখানেই প্রথম শ্বাসকষ্ট অনুভব হয়। অনেক যাত্রীই এই সাগাতে এসে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই ঝাংমুতে নামিয়ে আনতে হয়, না হলে জীবনের ঝুঁকি থেকে যায়।

সাগাতেই প্রথম দেখা মেলে প্রাচীন সিল্ক রুটের। লাসা থেকে শুরু হয়ে সাগা ছুঁয়ে মানসের ধার দিয়ে মধ্য এশিয়ায় এই সিল্ক রুট চলে গেছে। ঝাংমু থেকে নিয়ালাম হয়ে সাগার রাস্তাটি এই সিল্ক রুটের সংযোগকারী পথ। এই রকম কয়েকটি পথ ভারত থেকেও আছে। লে থেকে খারদুং-লা হয়ে শিয়ক নদীর ধার বরাবর একটি রাস্তা কারাকোরাম পাস হয়ে সিল্ক রুটে মিলেছে। আরেকটি রাস্তা গিয়েছে কারগিল থেকে।

সাগা থেকে ২৬০ কিলোমিটার দূরে পারিয়াং। এবার রাস্তা পুরোপুরি মরুভূমির বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে। সে বালিয়াড়ির কত রূপ। কখনও হাল্কা ঢেউখেলানো, বেশিরভাগই ঘাসে ঢাকা, কখনও বিশাল বড়। এক সময় এত বড় বড় বালির পাহাড় দেখতে লাগলাম যে হিমালয়ের অংশ বলে ভুল হচ্ছিল। বালির মধ্যে গাড়ির চাকার গভীর গর্ত আর তার মধ্য দিয়ে ল্যান্ডক্রুজার ছুটে চলেছে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে। দুপাশে যতদূর চোখ যায় পাহাড় ঘেরা বিস্তৃত উপত্যকা। দূরে দেখা যাচ্ছে অন্নপূর্ণা, ধবলগিরি ও মানাসলু। নিয়ালাম থেকে মানস পর্যন্ত প্রায় পুরো রাস্তাটাই দুদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা বিশাল উপত্যকার বুক চিরে, অন্যান্য পাহাড়ি রাস্তার মতো খাদের কিনারা দিয়ে পাহাড়ের বাঁক ঘুরে পথ নয়।

এক জায়গায় দেখলাম অদ্ভুত দৃশ্য। সামনে যতদূর চোখ যাচ্ছে বালির ঢেউ। অনেকটা ইংরিজি 'ইউ' আকৃতির। যাঁরা লাদাখের নুব্রা ভ্যালি গিয়েছেন তাঁরা এই ধরনের বালিয়াড়ি দেখেছেন। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্র, তার ঠিক পিছন দিকেই অন্নপূর্ণা ও ধবলগিরি শ্রেণী আর বালির মধ্যে জমাট বেঁধে আছে বরফ। পাহাড়, নদী, বরফ ও মরুভূমি একই সঙ্গে, বালির মধ্যে বরফ জমে থাকতেও এই প্রথম দেখলাম।

পথে পড়ল জোংবা গ্রাম। চিন বিপ্লবের সময় চিনা ফৌজ বিদ্রোহীদের ধরতে হানা দেয় এই গ্রামে। কিন্তু তাদের না পেয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় গ্রামটিকে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে জেগে উঠে আজ প্রাণচঞ্চল জোংবা।

তিব্বতিরা ভীষণ গরিব। পথে যেখানেই আমরা কোনও লোকালয়ে থেমেছি, বাচ্চা থেকে বয়স্ক, গ্রামের সবাই আমাদের কাছে ছুটে এসেছে খাবারের জন্য। মরুভূমির বুকে উন্নত প্রযুক্তি ছাড়া চাষ সম্ভব নয়। তাই এদের একমাত্র জীবিকা পশুপালন। ছাগল বা ইয়াকের মাংস এদের প্রধান খাদ্য। মাঝে মাঝে লাসা থেকে সবজি বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আসে। ইয়াকের মাংস কেটে শুকিয়ে রাখা হয় শীতকালের জন্য। কোনও জায়গাতেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র চোখে পড়েনি। তিব্বতিদের বাড়ি তৈরি হয় পাথর ও মাটি দিয়ে। বাড়ির ছাদ তৈরি হয় পাথর, আর কাদা মাটির ওপর বিয়ারের বোতল সাজিয়ে সাজিয়ে।

পারিয়াং থেকে মানস ৩০৫ কিলোমিটার। পুরোটাই বালিয়াড়ির মধ্য দিয়ে। এটাই এ পথের সবথেকে দীর্ঘ অংশ। নিয়ালাম থেকে মানস সারাক্ষণই তীব্র গতিতে হাওয়া বয়ে চলে, প্রায় একশো কিলোমিটার বেগে। গাড়ির বাইরে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। তার সঙ্গে ধুলো। মানসের কিছু আগে বাঁদিকে আরেকটি বিশাল বড় নীল জলের লেক দেখা যায় যা আকৃতিতে মানসের মতোই বড়। আমরা পার হলাম এই পথের উচ্চতম অংশ মায়ুম পাস— ১৭,০০০ ফুটের কিছু বেশি।

বিকেলে এসে পৌঁছলাম মানসের ধারে। আমাদের বাঁদিকে, একদম সামনে গুরলা মান্ধাতা পর্বতশ্রেণী, যার নীচেই আছে মানস সরোবর। সামনে অনেক দূরে দেখা গেল স্বপ্নের কৈলাস শৃঙ্গ। এই পথেই গুরলা মান্ধাতা ছাড়িয়ে প্রায় ৪০ কিলোমিটার এগিয়ে গেলে টাকলাকোট শহর। সেখান থেকে আরও ১৬ কিলোমিটার দূরে লিপুলেখ পাস। এই লিপুলেখ পাস দিয়েই ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রক যাত্রীদের মানস সরোবর নিয়ে আসেন। আমরা যাচ্ছি উত্তরদিক থেকে আর টাকলাকোটের রাস্তা দক্ষিণদিক থেকে। আমরা গাড়িতে মানস পরিক্রমা করে মানসের পাশেই আমাদের ঘাঁটিতে এলাম। পথে ডানদিকে একেবারে কাছ থেকে কৈলাসের পুরো অংশটাই দেখা গেল। আমরা যেখানে ছিলাম তারপাশেই একটি উঁচু পাহাড় চূড়ার ওপর শিউ মনাস্ট্রি এবং দ্রাক্ষায়নী মন্দির, সতীর ৫১ পীঠের অন্যতম। কথিত আছে, এই শিউ মনাস্ট্রিতে এসেছিলেন অতীশ দীপঙ্কর। পায়ে পায়ে হেঁটে উঠলাম মনাস্ট্রির ওপর। কিন্তু এত সংঘাতিক জোরে হাওয়া বইছে যে হাত-পা ঠান্ডায় অসাড় হয়ে যাচ্ছে। দূরে দেখলাম রাক্ষসতাল এবং সামনেই মানস সরোবরের নীল জল। সেই মানস সরোবর যাকে দেখার জন্য ছোটবেলা থেকে অপেক্ষা করেছিলাম।

রাতে তাপমাত্রা নেমে গেল মাইনাস পঁয়ত্রিশ ডিগ্রিতে। পরদিন সকালে সবাই গেলাম মানস সরোবরের ধারে। সেখানে পুজোর আয়োজন করা হল। মানসের জলের রঙে নানা বৈচিত্র। কোথাও গাঢ় নীল, কোথাও পান্না সবুজ, কোথাও বা তুঁতে রং। চারদিক পাহাড়ে ঘেরা। একদিকে গুরলা মান্ধাতা, অন্যদিকে দূরে কৈলাস। জল অসম্ভব ঠান্ডা। জলের মধ্যে নানা রঙের নুড়িপাথর। আমরা যেখানে

ছিলাম তার পিছনদিক দিয়ে চলে গেছে একটি নালা যা মানস সরোবর এবং রাক্ষসতালের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেছে। এখানে একটি উষ্ণপ্রস্রবণ রয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটি বাথরুম, যেখানে গরম জলে স্নান করার সুন্দর ব্যবস্থা।

পরদিন গেলাম দারচেন। আমরা মানসের ধারে যেখানে ছিলাম সেখান থেকে দারচেনের দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার। ছোট একটি জনপদ এই দারচেন। এখান থেকেই কৈলাস পরিক্রমা শুরু হয়। কিন্তু দারচেন থেকে কৈলাসের শুধু মাথার একটুখানি অংশ দেখা যায়। আসলে দারচেন থেকেই কৈলাস পরিক্রমা শুরু হয় বলে এর এত গুরুত্ব।

কৈলাস পরিক্রমা করতে গেলে শারীরিক অবস্থা খুব ভালো থাকা প্রয়োজন। কারণ এই পরিক্রমায় মোট ৫২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয় হেঁটে। পুরো পথটাই গড়ে ১৫,০০০ থেকে ১৭,০০০ ফুট উচ্চতার মধ্যে। এই পথে পার হতে হয় সাড়ে আঠেরো হাজার ফুট উচ্চতার দোলমা পাস। যাঁদের শ্বাসকষ্ট আছে বা রক্তচাপের সমস্যা আছে তাঁদের কখনওই এই পরিক্রমায় যাওয়া উচিত নয়, কারণ মাঝপথে শরীর খারাপ হলে কোনওভাবেই চিকিৎসা করা যাবে না এবং জীবন সংকট হতে পারে।

তিব্বতের পথে অনেক ধরনের বন্যপ্রাণী দেখা যায়। ভারাল বলে এক ধরনের হরিণ জাতীয় প্রাণী দেখেছি। এছাড়া কিয়াং ও মারমট চোখে পড়েছে। শুনলাম এখানে হায়না আছে, যদিও তারা রাত না হলে বেরোয় না। আর আছে নানা ধরনের পাখি। রাস্তায় অনেক জায়গায় দেখেছি মাইলের পর মাইল হলুদ ও সোনালি রঙের ঘাসজমি তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ওই ঘাসজমি সংরক্ষিত রাখা হয়েছে বুনো তৃণভোজী প্রাণীদের চারণভূমি হিসাবে। ওখানে কেউ তাদের পোষা ইয়াক বা ভেড়া চরাতে গেলে তাকে জরিমানা দিতে হয়।

আমাদের এবারের দলের দুয়েকজন বাদে সকল সদস্যই সুস্থ শরীরে মানস কৈলাস দর্শন করে এসেছি। আসলে যাঁরা কৈলাস দর্শনে যান তাঁদের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে। এ তাঁদের সারা জীবনের স্বপ্ন এবং এর জন্য তাঁরা যে কোনও ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত থাকেন। শারীরিক অসুস্থতা গোপন করেও রওনা দেন। যেমন আমাদের দলের এক সদস্যা। হাই ব্লাড সুগার, হাই ব্লাড প্রেসার ও অন্যান্য শারীরিক জটিলতা— সব কিছুই তিনি ডাক্তারের কাছে গোপন করে গিয়েছিলেন কারণ তাঁর ভয় ছিল যে একবার এসব জানাজানি হয়ে গেলে ডাক্তার তাঁকে যাবার অনুমতি দেবেন না। তিব্বতে গিয়ে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রায় প্রতিদিনই অক্সিজেন, স্যালাইন ও ইঞ্জেকশন দিয়ে দলের ডাক্তাররা তাঁকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। ওই অসুস্থ শরীরেই তিনি কৈলাস দর্শন করে ফিরে এলেন। বিমানবন্দর থেকে হুইল চেয়ারে করে নিয়ে আসতে হয়েছিল, পরে নার্সিংহোমেও তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল। অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি যা দেখে

এলেন তা তাঁর সারা জীবনের সম্পদ হয়ে থাকল।

আরেকজন সদস্য প্রায় দিনই না খেয়ে বা কম খেয়ে কাটাতেন। দুর্বল শরীরে মানসের সাংঘাতিক ঠান্ডা জলে স্নান করে এমন অসুস্থ হয়েছিলেন যে তাঁকে স্যালাইন পর্যন্ত দিতে হয়েছিল। ওই অবস্থায় নেপাল ফিরে এলেন এবং তারপর তিনি মুক্তিনাথ দর্শন করেও ফিরে এসেছেন।

'ভ্রমণ' মার্চ, ২০০৪

পোল্যান্ডে কিছুদিন

দেবব্রত দত্ত

পোল্যান্ডের লিয়ঁ কজমিনস্কি ইনস্টিটিউট সেদেশের সর্বাপেক্ষা বড় ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাকেন্দ্র। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে বাজার অর্থনীতিতে পোল্যান্ডের উত্তরণের পর বেসরকারি উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বাজারব্যবস্থা পুরোদস্তুর চালু হওয়ার পর ওদেশের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা পড়ার আগ্রহ প্রচুর। বাজার অর্থনীতির নিয়মে এই ছাত্রছাত্রীরা বেশিরভাগই এখন ইংরিজিমাধ্যমে পড়তে চাইছে, আমাদের দেশের মতোই বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইংরিজিমাধ্যমে পড়াশুনা করা ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা বেশি। সেইজন্য কজমিনস্কি ইনস্টিটিউট ইংলিশ ও পোলিশ দুই ভাষাতেই পাঠক্রম চালু রেখেছে। ইংলিশমাধ্যম শাখায় তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিশেষজ্ঞদের অতিথি হিসেবে নিয়ে যায়— আমাকে আমন্ত্রণও একই উদ্দেশে। ওখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থনীতি ও এশিয়া মহাদেশে ব্যবসা বিষয়ে কিছু ক্লাস নিতে হবে ও বক্তৃতা করতে হবে।

প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর ইতিহাসে অনেক মজার ঘটনা থাকে। একটা মজার অভিজ্ঞতার কথা না বলে থাকতে পারছি না। পোল্যান্ড যাওয়ার ভিসা করার জন্য দিল্লি গেছিলাম। অটোরিকশাকে চাণক্যপুরী শান্তিপথে পোল্যান্ড দূতাবাসে যেতে বললাম— অল্পবয়স্ক চালক ছেলেটি নিয়ে গেল হল্যান্ড এম্ব্যাসিতে। পোল্যান্ড এম্ব্যাসিতে যাব বলাতে সে বেশ কর্তৃত্বব্যাঞ্জক সুরে বলল— 'হল্যান্ড পোল্যান্ড এক হি হ্যায়-অন্দর চলা যাও, কাম বন জায়েগা।' আমি তাও আপত্তি করায় ছেলেটি শেষ পর্যন্ত পোলিশ এম্ব্যাসি খুঁজে বের করল বটে কিন্তু সারা রাস্তা বোঝাল যে আগের অফিসেও কাজ হত।

যাওয়ার আগের দিন আরেক বিড়ম্বনা। ট্র্যাভেল এজেন্ট ফোন করে জানাল যে আমাকে যেহেতু লন্ডনে প্লেন বদল করতে হবে আর যেহেতু আমি এক অধম ভারতীয় তাই হিথরো বিমানবন্দরে দু-ঘণ্টা থাকার জন্য আমাকে ব্রিটিশ সরকারের ট্রানসিট ভিসা করাতে হবে। সেদিন শনিবার ব্রিটিশ কনস্যুলেট বন্ধ। আগের দিনই নাকি ব্রিটেন ভারতীয়দের জন্য এই নতুন নিয়ম চালু করেছে। পরে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম যে ব্রিটিশ সরকারের অশেষ অনুগ্রহ, তারা আপাতত

যেতে দেবে কিন্তু ফেরার সময় ব্রিটিশ সরকারকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে হিথরোতে ঘণ্টাদুয়েক থাকার অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে।

যাইহোক, এই সব সমস্যা কাটিয়ে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ শহরের উদ্দেশে রওনা হলাম। হিথরোয় বিমান বদল করে স্থানীয় সময় রাত এগারোটায় ওয়ারশ পৌঁছলাম। অক্টোবরের শেষ, পোল্যান্ড পূর্ব ইউরোপের ভয়ঙ্কর শীতের আশঙ্কায় দিন গুনছে। অবশ্য ওই সময় তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ইনস্টিটিউটের অর্থনীতির বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সোহা এবং আমার ছাত্র সেইসময় ওখানকার অধ্যাপক জয়দীপ রায় বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলেন। অভিবাসনের নিয়মকানুন মিটিয়ে আমরা ইনস্টিটিউটের উদ্দেশে রওনা হলাম, ওখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা। ছবির মতো সুন্দর শহর ওয়ারশ। শহরের মধ্য দিয়ে ভিস্টুলা নদী। নদীর দুধারেই জনবসতি, আমাদের কলকাতা ও হাওড়া শহরের মতো। মূল শহর ভিস্টুলা নদীর দক্ষিণে, আমাদের ইনস্টিটিউট নদীর উত্তরে, সেখানেই রয়েছে বেশ কিছু বড় বড় কারখানা। এই দিকটায় গড়ে উঠছে অনেক নতুন নতুন বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট। এরকম এক নতুন ফ্ল্যাটে এক নিমন্ত্রণে গিয়ে জেনেছি যে মূল শহরের বাসিন্দাদের একটু নাক উঁচু ভাব আছে এবং এই সব নব্য অঞ্চল সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধা আছে যদিও নতুন বসতি অঞ্চলে সুযোগসুবিধা যথেষ্ট ভালো।

মূল ওয়ারশ শহরের চারধারেই এখন নির্মাণের ছড়াছড়ি, বাজার অর্থনীতি শুরু হওয়ার পর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে পোল্যান্ড, চেক ও শ্লোভাকিয়ার উন্নয়ন হার সর্বাধিক। ফলে এরা প্রচুর পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগ টানছে। সব অঞ্চলেই সুন্দর সুন্দর শপিং মল তৈরি হচ্ছে। প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে আগেরটার থেকে আরও বড় করে তৈরি করার। সর্বত্রই ম্যাকডোনাল্ড, বার্গার কিং বা কেন্টাকি ফ্রায়েড চিকেনের ফুড প্লাজা, কিন্তু তাদের সঙ্গে আবার সমানতালে পাল্লা দিচ্ছে ছোট ছোট চিনা রেস্তোরাঁ। ওয়ারশকে এই নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা অবশ্য পোল্যান্ডের নতুন অভিজ্ঞতা নয়। ইউরোপের দুই বড় শক্তি রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে পড়ে পোল্যান্ড বারবার বিধ্বস্ত হয়েছে। মধ্যযুগের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানে উন্নত কোপার্নিকাসের পোল্যান্ড সপ্তদশ শতাব্দীতে সুইডেন, রাশিয়া আর তুরস্কের হাতে বিধ্বস্ত হল, আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাশিয়া প্রুশিয়া আর অস্ট্রিয়ার মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়ে মানচিত্র থেকেই হারিয়ে গেল। তারপর আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে স্বাধীনতা পাওয়া পোল্যান্ড জার্মানির হাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গুঁড়িয়ে গেল। যুদ্ধের পর ওয়ারশ শহরের একটি অংশকে যুদ্ধপূর্ব শহরের আদলে গড়ে তোলা হয়েছে যাতে ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখা যায়।

পুরনো কমিউনিস্ট জমানার সাক্ষ্য বহন করছে শহরের কেন্দ্রস্থলে সুউচ্চ প্যালেস অব কালচার। পুরনো স্থাপত্যের আদলে তৈরি এই ভবনে পোল্যান্ডের বিখ্যাত কনসার্ট দেখতে গেছিলাম। কনসার্ট বা গানের অনুষ্ঠানে পোলিশদের

উৎসাহ লক্ষণীয়। অনুভব করলাম এই জাতীয় অনুষ্ঠান উপভোগ করার ক্ষেত্রে ভাষা কোনও বাধা হয় না। হলে ঢোকার আগে শীতের সব ভারি পোশাক জ্যাকেট টুপি ইত্যাদি জমা রাখতে হয় কারণ ভেতরে হিটিং আছে। জমা দিতে সমস্যা নেই কিন্তু অনুষ্ঠান শেষের পরে সবাই একসঙ্গে বেরোয় বলে জমা দেওয়া পোশাক ফেরত পেতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু কিছু করার নেই। ঠান্ডার দেশে এটুকু মূল্য তো দিতেই হবে।

কিন্তু ঠান্ডার দেশ বলে আর একটা মূল্য দিতে হয় যা আমাদের মত গরম দেশের লোকদের বেশ গায়ে লাগে। এখানে আমরা হুটহাট করে বেরিয়ে পড়তে পারি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা খোলা আকাশের নীচে ঘুরতে পারি। এ যে কত বড় স্বাধীনতা, ঠান্ডার দেশে না গেলে বোঝা যায় না। মাইনাস পাঁচ-ছ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কিছুক্ষণ খোলা জায়গায় ঘুরলে কষ্ট অসহনীয় মনে হয়। তাই দিল্লির আজমল খান মার্কেট বা ব্যাঙ্গালোরের এম জি রোডে ঘুরে নানান সওদা দেখে বেড়ানোর মজা ওয়ারশ শহরে শীতকালে পাওয়া সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা বলা যাক। ওয়ারশ শহরে একটা সুন্দর চিড়িয়াখানা আছে। চিড়িয়াখানার মূল আকর্ষণ বিভিন্ন মেরুপ্রদেশের জীব, যেমন পেঙ্গুইন, মেরু ভল্লুক ইত্যাদি। জন্তু-জানোয়ারে বেশ সমৃদ্ধ এই চিড়িয়াখানায় খুব উৎসাহ নিয়ে ঘুরতে শুরু করলাম। কিন্তু সেদিন তাপমাত্রা শূন্যের নীচে, ফাঁকা জায়গায় কনকনে হাওয়া বইছে, আকাশ মেঘলা, রোদের লেশমাত্র নেই। একটু পরেই শরীর যেন জমে যাচ্ছে মনে হতে লাগল। সেই সময় একটা বোর্ড চোখে পড়ল— ইন্ডিয়ান এলিফ্যান্ট। ছুট লাগালাম সেদিকে। একটা ঘরের মধ্যে এশিয়া আর আফ্রিকার জন্তুদের রাখা আছে। সেই ঘরে ঢুকে কী শান্তি, হিটিংয়ের মধ্যে এই সব জন্তুদের রাখা হয়েছে। ভারতীয় হাতিকে আর ছেড়ে আসতেই ইচ্ছে করছে না।

প্রাণিজগতের আরেকটি বন্ধুকেও পোল্যান্ডে গিয়ে জেনেছি। পোল্যান্ডের লোকজনের অনেকেরই ভারত সম্পর্কে আগ্রহ। তাঁরা জানতে চান আমি ভারতের কোন জায়গা থেকে এসেছি। বেঙ্গল বললেই তাঁরা বলে ওঠেন যে তাঁরা বেঙ্গল জানেন কারণ তাঁরা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সম্পর্কে পড়েছেন। সুন্দরবনের বাঘ যে আমার পরিচয় বোঝানোর সহায়ক হবে তাও আগে কখনও ভাবিনি।

ইউরোপের হিসেবে পোল্যান্ড দেশটা মোটামুটি বড়, প্রায় চার কোটির মতো জনসংখ্যা। দেশটা মোটামুটি সমতল কিন্তু কিছু পাহাড়ি এলাকা আছে। এরকম একটি বিখ্যাত পাহাড়ি শহর জ্যাকোপানেতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। কাজের চাপে বেড়ানোর সুযোগ পাওয়া যায় না— কিন্তু জ্যাকোপানেতে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ নয়ম্যানের শতবর্ষ উপলক্ষে একটা সেমিনার হচ্ছিল— সেখানে আমন্ত্রিত হলাম। জ্যাকোপানে পোল্যান্ডের পুরনো রাজধানী ক্র্যাকাওয়ের ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে টাটরা পাহাড়ের ওপর সুন্দর শৈলশহর। টাটরা পাহাড়ের ওপারে শ্লোভাকিয়া দেশ। ওয়ারশ থেকে দুঘণ্টার ট্রেন সফর করে ক্র্যাকাও। একাদশ

থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ক্র্যাকাও ছিল পোল্যান্ডের রাজধানী। ওয়ারশর মতো ক্র্যাকাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়নি। ফলে পুরনো শহরের চেহারা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। ক্র্যাকাওয়ের মূল আকর্ষণ মধ্যযুগে তৈরি পোল্যান্ডের বৃহত্তম গির্জা, যে গির্জার একসময় কর্ণধার ছিলেন সদ্যপ্রয়াত পূর্বতন পোপ। এই গির্জায় ঠিক দুটোর সময় সর্বোচ্চ জানালা উন্মুক্ত হয় এবং কিছুক্ষণ বেহালা বাজে। জনশ্রুতি আছে যে ওই জানালা থেকে শত্রুপক্ষের ওপর নজর রাখা হত এবং বেহালা বাজিয়ে পুরবাসীদের সতর্ক করা হত। কিন্তু এই বেহালা বাজানোর সময় তুর্কি সেনার নিক্ষিপ্ত তীরে বেহালাবাদকের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনাকে স্মরণ করেই এই নির্দিষ্ট সময়ে বেহালা বাজানোর প্রথা।

ক্র্যাকাওতে চোখে পড়ল বিভিন্ন দেশের প্রচুর ভ্রমণার্থী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীর সংখ্যাবিচারে পোল্যান্ড পৃথিবীর প্রথম দশটি দেশের মধ্যে পড়ে। এই ভ্রমণার্থীরা মূলত আসে ক্র্যাকাও, জ্যাকোপানে এবং বাল্টিক সমুদ্রতীরের বিভিন্ন বিচ রিসর্ট পরিভ্রমণে। সমুদ্রতীরে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়নি কিন্তু বাস ধরে ১০০ কিলোমিটার দূরের জ্যাকোপানে গিয়ে মোহিত হয়েছিলাম। জ্যাকোপানে পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যার অন্ধকারে কিন্তু পরের দিন সকালে ছবির মতো সুন্দর শহরকে দেখে এক অভিনব আনন্দ অনুভব করেছিলাম। পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে যদি আর্থিক বৈভব-সৃষ্ট সৌন্দর্যায়নের মেলবন্ধন ঘটে তবে যে বিস্ফোরক সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয় তারই নিদর্শন জ্যাকোপানে। জ্যাকোপানে থেকে ক্র্যাকাও পর্যন্ত ১০০ কিলোমিটার রাস্তা একইরকম নয়নাভিরাম যা উপভোগ করতে পারলাম দিনেরবেলায় ফেরার জন্যে।

ফেরার পথে ক্র্যাকাও রেলস্টেশনে অপেক্ষা করার সময় বেশ কিছু ভিখারির উৎপাত দেখেছিলাম। এর দুটি কারণের কথা শুনেছি— কমিউনিস্ট আমলের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অবলুপ্তির পর বেশ কিছু মানুষ আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে আর বেশ কিছু বছর ধরেই পূর্ব ইউরোপে নেশার প্রাদুর্ভাব খুব বেশি যা অনেককে ভিক্ষার পথে ঠেলে দিচ্ছে।

পোল্যান্ডে মাসাধিককাল থাকার সূত্রে সবচেয়ে বড় উপলব্ধি এই যে মানুষে মানুষে মেলবন্ধন ঘটাতে ভাষা সংস্কৃতি কোনও বাধা হয় না যদি পরকে আপন করার মতো হৃদয় থাকে। এমনিতে পোলিশ শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্য বিস্ময়কর। যেমন সংস্কৃতের তাত পোলিশে তাতা (বাবা), ভ্রাতা পোলিশে ভ্রাত। সংস্কৃতের অগ্নি পোলিশে অগ্নে, উদক পোলিশে হোদা, চন্দ্র আবার চাঁদোয়া। বোঝাই যায় দুই ভাষারই উৎপত্তি একই অঞ্চল থেকে। পোল্যান্ডে এখনও ইংরিজি বলতে পারা লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় যদিও তরুণ প্রজন্ম প্রাণপণে ইংরিজি শেখার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভাষার ব্যবধান অনতিক্রম্য নয়।

ভিসার জন্য ব্রিটিশ দূতাবাস যাব। উঠে পড়েছি ভুল ট্রামে। ভুল বুঝতে পেরে

মাঝপথে নেমে গেলাম, অসহায় অবস্থা। এক ভদ্রমহিলাকে কাগজে লেখা দূতাবাসের ঠিকানা দেখিয়ে সাহায্য চাইলাম, ভদ্রমহিলা ইংরিজি বোঝেন না। আমার কাছ থেকে কাগজটা টেনে নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোককে পোলিশ ভাষায় কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর ফিরে এসে আমার হাত ধরে রাস্তা পেরিয়ে প্রায় ১০০ মিটার দূরের একটা বাসস্টপে আমাকে দাঁড় করিয়ে বোর্ডে লেখা একটা নম্বরের ওপর বার বার আঙুল বোলাতে লাগলেন। এরপর দূতাবাস পৌঁছতে আমার আর কোনও অসুবিধা হয়নি। আর একবার সুপার মার্কেটে গেছি, বড়দিনের আগে সাংঘাতিক ভিড়। একটা বাজার করার বাস্কেটের জন্য এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। এক কর্মচারী ভদ্রমহিলা এসে কী সব বলে গেলেন— কিছুই বুঝলাম না। ও মা, মিনিট দুয়েক পরে দেখি কোত্থেকে একটা বাস্কেট এনে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। কথা না বলে বা বুঝে, সাইনবোর্ড না পড়তে পেরে প্রায় দু মাস ঘুরেছি, বাস, ট্রাম মেট্রো, ট্যাক্সি চড়েছি, বাজার-হাট করেছি, তেমন কোনও অসুবিধা হয়নি। শুধু ট্যাক্সিতেই একটু অনিশ্চিত লাগত— কী জানি কোথায় নিয়ে চলে যায়!

পোল্যান্ডের মেয়াদ শেষ, এবার ফেরার পালা। যাওয়ার আগের দিন কিছু ছাত্র রসগোল্লা দিয়ে গেল। ওয়ারশ শহরে কোত্থেকে খুঁজে-পেতে যোগাড় করেছে। ওয়ারশ লন্ডন নয় সুতরাং ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল না।

ফেরার দিন ট্যাক্সি বুক করা ছিল, ভোর চারটের সময় মাইনাস দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম বিমানবন্দরের উদ্দেশে। এই প্রথম দেখলাম ট্যাক্সি ড্রাইভার ইংরিজি জানেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, দেশে ফিরে যাচ্ছ, দেশ কোথায় তোমার? বললাম, ইন্ডিয়া, গেছো নাকি কখনও? ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, না, যাইনি কখনও। তারপর বললেন, চলো, তোমায় একটা শর্টকাট রাস্তায় নিয়ে যাই, মিটার অনেক কম উঠবে। কেন নিয়ে যাব জানো, আমি সাঁইবাবার শিষ্য— সাঁইবাবা অব ইন্ডিয়া। আমি চমকে উঠলাম, বললাম তুমি সাঁইবাবাকে দেখনি, শিষ্য হলে কী করে? ট্যাক্সি ড্রাইভার জানালেন যে নাম শুনে আর ছবি দেখে কেমন করে যেন সাঁইবাবার ভক্ত হয়ে পড়েছেন। দেশকালের গণ্ডি ছাড়িয়ে কতভাবেই না মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে আত্মিক বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

বর্ষায় গুরুদোংমার

পৃথ্বীরাজ ঢ্যাং

আমরা চলেছি এক হ্রদের উদ্দেশে। ভারত ও তিব্বত সীমান্ত এলাকায় অবস্থান বলে যাবার বিস্তর কড়াকড়ি আছে। আর ১৭,০০০ ফুটের কাছাকাছি উচ্চতার জন্য যাওয়া একটু কষ্টকর।

সুযোগ পেলাম বর্ষাকালে, অর্থাৎ জুনের শেষ সপ্তাহে। জানি এটা মোটেই পাহাড়ে যাবার সময় নয়। কিন্তু ভিড় এড়াতে আর পারমিটের ঝামেলা কমাতে কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়া গেল।

গ্যাংটকে পৌঁছে হোটেলের ব্যবস্থা করে যখন বাইরে বাজার এলাকায় এলাম তখন শেষ বিকেল। আগামীকালের আগে আর অনুমতিপত্র ও অন্যান্য ব্যবস্থা হবে না। ট্র্যাভেল এজেন্টের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে কিছু অগ্রিম আর নাম ঠিকানা জমা দিয়ে ফিরে এলাম। এখন পারমিটের ব্যবস্থা ট্র্যাভেল এজেন্টরাই করে দেয়।

সকালে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস, শুকনো খাবার, ওষুধপত্র কেনাকাটা সেরে খেয়েদেয়ে বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ রওনা দিলাম। জিপ ছাড়ল উত্তর সিকিমের স্ট্যান্ড থেকে। গন্তব্য লাচেন প্রায় ১২০ কিলোমিটার, সাত ঘণ্টার পথ। ঘণ্টা আড়াইয়ের মধ্যে পৌঁছে গেলাম ফোদং হয়ে মঙ্গন। বেশ বড় লোকালয়। কয়েকটি লজ, খাবার হোটেল আর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান নিয়ে বেশ জমজমাট। পরিষ্কার আকাশে এখান থেকে দেখা যায় সিনিয়ালচু ও আরও কয়েকটি তুষারশৃঙ্গ। সামান্য বিশ্রাম আর চা পানের পর আমরা রওনা দিলাম সিংগিক হয়ে চুংথাংয়ের উদ্দেশে। উত্তর সিকিমের সিংঘিক থেকেই পরিষ্কার আকাশে সবথেকে সুন্দর দেখায় কাঞ্চনজঙ্ঘা-শ্রেণীকে। এ পথেই সেই বিখ্যাত নদী 'মায়াং'। স্থানীয় ভাষায় মায়াংচু। পুরো নদীটাই পাশের পাহাড় থেকে নেমে এসে রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে নীচের খাদে জলপ্রপাতের মতো পড়ছে। বর্ষাকালে এর চেহারা ভয়ঙ্কর। ভালোয় ভালোয় জিপ পেরিয়ে যেতেই স্বস্তির নিশ্বাস এবং আরও একটু এগিয়ে থার্টি আসাম রাইফেলসের এলাকার কাছাকাছি বিশ্রাম।

ভালো মন্দ উঁচু নিচু পথ পেরিয়ে চুংথাং পৌঁছলাম বেলা চারটের সময়। দোকান, হোটেল, লজ, ইনফরমেশন অফিস, জিপস্ট্যান্ড, লামাদের হেঁটে যাওয়া, সাঁই সাঁই করে ইউমথাং যাত্রীদের জিপের আওয়াজ নিয়ে বেশ ব্যস্ত জায়গা।

এখানেই লাচেন থেকে লাচেন চু এবং লাচুং থেকে লাচুং চু এসে মিলিত হয়ে তিস্তা নামে প্রবাহিত। আকাশ বেশ মেঘলা, গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি আর শীত শীত ভাব নেহাৎ খারাপ লাগল না। সামনের দোকানে তিব্বতী পাত্রে গরম ঝোল ঝোল নুডলস, কালো চা খেয়েই আবার রওনা আরও উত্তরে। চুংথাং থেকেই রাস্তা দুভাগ হয়ে একটা গেছে লাচুং-এর দিকে, অপরটা লাচেনে। লাচুংয়ের দিকের রাস্তা বহু ব্যবহৃত, ভালো আর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। ইয়ুমথাংয়ের যাত্রীরা এই পথে যান। লাচুং জনপদটি বড় না হলেও জবরদস্ত হোটেল, রিসর্ট ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত। লাচেনের দিকের রাস্তা বেশ চড়াই আর অবস্থা তুলনামূলক খারাপ। তবে রাস্তার দুঃখ ভুলিয়ে দেয় চারদিকের সবুজ প্রকৃতি। এত ঘন সবুজ বর্তমানে খুবই কম জায়গায় দেখা যায়। চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল একটানা জিপের ইঞ্জিনের আওয়াজ। এরপর চেকপোস্ট, বেশ কয়েকটা ঝরনা। দুরন্ত পাহাড়ের বাঁক পেরিয়েই আসাম রাইফেলস ট্রানজিট ক্যাম্প জিমা-ওয়ান। আর তার থেকে অল্প সময় এগিয়েই জনপদ শুরু। সন্ধ্যা ছটা পঁচিশ, কমে আসা আলোয় কাঠের বেড়া সরিয়ে জিপ ঢুকল লাচেনের হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি হোটেল সিনিয়ালচুর উঠোনে। আমাদের রাতের আস্তানা।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি, বেশ ঠান্ডা আর অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে আমরা নামলাম প্রায় কালো হয়ে আসা সবুজ পাহাড়ের কোলের সুপ্রাচীন জনপদটিতে। সামনে পাহাড়ের কোলে উঁচুতে আলো জ্বলেছে লাচেন মনাস্ট্রিতে। গরম কালো চা সদৃশ পানীয় আর বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করলেন হোটেলের মালকিন। মালপত্র রেখে খানিক পরে বেরোলাম অন্ধকারে পায়চারি করতে। ন হাজার চারশো ফুট উচ্চতা, দু-তিনটি দোকান, পোস্ট অফিস, প্রাচীন ডাকবাংলো, ছোটখাটো দুয়েকটি হোটেল আর ভুটিয়া অধিবাসী নিয়ে লাচেন। মিনিট তিনেক এগোলেই গ্রামের আলো শেষ। চারদিকে ঘন কালো অন্ধকার। গ্রাম ছেড়ে আরেকটু এগোতেই বরফের মতো ঠান্ডা শনশনে ঝোড়ো হাওয়া আর টিপ টিপ করে বৃষ্টি। চারদিকের কালো প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে নিজের হাতের তালুও দেখা যাচ্ছে না। শোঁ শোঁ হাওয়ার শব্দ, নানান কীটপতঙ্গের গিটকিরি আর নিজেদের ফিসফিসে গলা অন্য কোনও জগতে নিয়ে এসে ফেলেছে বলে মনে হল। হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি প্রায় এক কিলোমিটারের কাছাকাছি। ঠান্ডা হাওয়ার দাপটে ফিরে যাওয়াই মনস্থ করলাম। ফেরার পথে ঝোপের মধ্যে আবিষ্কার করলাম জোনাকির মতোই কিন্তু তুলনামূলক ম্লান আলো সমেত একজাতীয় পোকা। বৃষ্টির গতি বাড়তেই প্রায় দৌড়ে ফিরে সামান্য কিছু গলাধঃকরণ করেই কম্বলের তলায়।

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ প্রাতরাশ সেরে রওনা দিলাম লাচেন ছাড়িয়ে আরও উত্তরে। রাস্তা আরও খারাপ। টানা ঘণ্টা দুয়েক চড়াই পেরিয়ে পৌঁছলাম সুন্দর সবুজ এক উপত্যকায় দুদিকে পাহাড় আর মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে নদী। এই সুন্দর সবুজ রমণীয় উপত্যকার নাম থাঙ্গু। আছে হাওয়া কল আর জলের

ধারাকে কাজে লাগিয়ে শস্য পেষাই করার অতিকায় যাঁতা। থাঙ্গুতে থাকা খাওয়ার জায়গা আর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান আছে। ঠান্ডা আর উচ্চতাজনিত অসুবিধা সইতে পারলে এখানে রাত্রিবাস করা যেতে পারে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা আরও এগিয়ে চললাম। এরপর রাস্তা প্রায় নেই বললেই চলে। চারদিকের পাহাড়ি জমির ওপর দিয়ে আর্মির গাড়ি গিয়ে গিয়ে তৈরি হয়েছে রাস্তার দিশা। চারদিকের অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে আমরা চললাম। এই এলাকায় মানুষ, জীবজন্তু বড়সড় গাছ সবই অপ্রতুল। পরপর দুটো চেকপোস্টে জিজ্ঞাসাবাদের পর পারমিট দেখিয়ে প্রবেশ করলাম এক বন্ধুর, ধূসর এলাকায়। চারদিক থেকে বাজখাঁই সব পাহাড় ঘিরে ধরল আমাদের। একটানা চড়াই, পাশে ছোট ছোট গুল্মের মতো রডোডেনড্রন গাছ। নীল ও বেগুনি ফুলে ভরে আছে, পাতা দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে প্রিমুলা আর অন্যান্য নাম না জানা পাহাড়ি লতাগুল্ম। হঠাৎ বাঁক ঘুরে দেখা হল একপাল চমরি গাইয়ের সঙ্গে। তাদের প্রায় সবার রংই কালো বা কালো-সাদা ছোপ ছোপ। দলের বাচ্চারা গাড়ির শব্দে লাফালাফি করে পালাল। ইঞ্জিনের ইন্ডিকেটরে তাপমাত্রা আশি ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। থামতে হল, নেমে পড়লাম। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা, উচ্চতা পনেরো হাজার ফুটের কাছাকাছি। ধূমপান বারণ তবু সঙ্গে আনা গ্যাস লাইটার জ্বালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। বায়ুর চাপ কম হওয়ায় আগুন জ্বলল না।

মিনিট পনেরো পর আবার যাত্রা শুরু এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সর্বশেষ চেকপোস্ট গায়গং। দেরি হয়ে গেছে, তাই আর এগোনো মানে বিপদ। আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেলে সুস্থভাবে ফেরার নিশ্চয়তা দিতে পারলেন না তাঁরা। অনেক অনুরোধ-উপরোধ, অবশেষে ছাড়পত্র। বললেন, হ্রদের ধারে আধঘণ্টার বেশি থাকবেন না যেন। অসম্ভব ঠান্ডা মাথায় তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খ পথ বুঝিয়ে দিলেন চালককে। সঠিক পথের সামান্য বাইরে গেলে পথ হারাবার সম্ভাবনা কারণ পথের তেমন কোনও পরিষ্কার চিহ্ন নেই। না আছে কোনও সঠিক ল্যান্ডমার্ক। শুধু দিক ঠিক করে যেতে হবে। মাঝে মাঝে আগের যাওয়া গাড়ির চাকার দাগ পাওয়া যেতে পারে। বেশি ডাইনে বাঁয়ে করলে ল্যান্ডমাইন-জোনে চলে যাবার সম্ভাবনা। গাড়ির চাকার দাগে যে হালকা রেখা মতো তৈরি হয়েছে তা অনুসরণ করে যাওয়াই নিরাপদ। কিন্তু প্রবল হাওয়ার দাপটে তা যেখানে সেখানে মুছে গেছে। প্রত্যেককে প্রশ্ন করলেন। জেনে নিলেন মাথার যন্ত্রণা, গা বমি ভাব বা অন্য কোনও শারীরিক অস্বস্তি আছে কিনা। যদি ফেরার সময়ও কিছু হয় তা হলেও লুকোতে বারণ করলেন। তাড়াতাড়ি বাধ্য ছেলের মতো সবটাতে মাথা নেড়েই চেকপোস্ট পেরিয়ে সোজা ঢুকে পড়লাম বন্ধুর উচ্চ হিমালয়ের মরুভূমিতে। একটানা পথের রেখা অনুসরণ করে চললাম প্রায় মিনিট কুড়ি। শুরুতেই দেখেছি বোর্ডের গায়ে লেখা 'ওয়েলকাম টু টিবেটান প্লেটো'। পথের রেখা চলেছে সরু ফিতের মতো। এটা ট্রান্স হিমালয়ান ডেজার্ট অর্থাৎ শীতল মরু অঞ্চল। শুধু টানা

মালভূমি, বালি, কাঁকর আর ঢিবিতে ভরা। আবার জিপের ইঞ্জিন গরম, তাই থামতে হল। মনে মনে এরকমই চাইছিলাম। দরজা খুলে সটান নেমে পড়েই চমকে উঠলাম। বাইরে অসম্ভব ঠান্ডা আর ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। নিমেষে হাত, পা, মুখ আর কান এত ঠান্ডা হয়ে গেল যে তাড়াতাড়ি জিপে ঢুকে, সবকিছু ঢেকে ঢুকে আবার বেরোতে হল। আমরা থেমেছি একটা ছোট জলাশয়ের পাশে। পিছনেই বিশাল পর্বত। চারদিকে শক্ত পাথুরে মাটি, সবুজের কোনও চিহ্নই নেই। যেখানে সেখানে মেঘ কেটে বেরিয়ে আছে গাঢ় নীল আকাশ। তামাটে, ধূসর আর নীল রঙের পর্বত। মেঘ সরে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে তাদের শিখরের তুষার। ভয়ঙ্কর সুন্দর সেই উপত্যকায় শুধু আমরা ক'জন। মিনিট দশেকের মধ্যেই আবার চলা শুরু। মেঘের হঠাৎ নেমে আসা, পরক্ষণেই অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া। বন্ধুর পাহাড় আর ততোধিক বন্ধুর জমি পেরিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছলাম একটা গিরিশিরার ওপর। বামদিকে সর্বধর্মস্থল। সামনে তামা রঙের সেই পাহাড় আর ডানদিক চেপে থুলেখাং আর মাউন্ট কাঞ্চনজাউ। আর একদম সামনে তামা রঙের পাহাড়ের ঠিক নীচে গিরিশিরা থেকে প্রায় চল্লিশ মিটার নীচে বাঁকা, ঘন নীল আর ফিরোজা মেশানো রহস্যময় ভয়াল সুন্দর গুরুদোংমার হ্রদ।

গাড়ি থামতেই সেনাবাহিনীর জওয়ানরা অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে ছুটে এলেন। উচ্চতা সতেরো হাজার একশো ফুটের কাছাকাছি। ঈশ্বরের অসীম কৃপায় আমরা সুস্থ। সর্বধর্মস্থলে বুদ্ধ, পদ্মসম্ভব, গুরু নানক, রামকৃষ্ণদেব ও অন্যান্য দেবদেবীরূপ ঈশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে বাইরে এলাম। সেনাবাহিনীর কর্মীদের তৈরি গরম গরম চা আর ঘিয়ের হালুয়া প্রসাদ অমৃততুল্য লাগল। হ্রদের জলের কাছে গেলাম। পবিত্র সেই জল আর জলাশয়ের বামদিক থেকে সৃষ্টি হয়েছে একটি ক্ষীণ জলধারার। এই জলধারাই তিস্তার একটি উৎসধারা। নীচে হাওয়ার দাপট কিছুটা কম। ঠান্ডার দাপটে ক্যামেরা সোজা ধরা যাচ্ছে না। কষ্ট করে কয়েকটা ছবি নিয়ে ওপরে উঠে এলাম। প্রচণ্ড হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে হ্রদের তীরের লুংদারগুলোকে। ঘড়িতে প্রায় দুপুর দুটো। ঠান্ডার আক্রমণ ক্রমেই বাড়ছে। ফৌজিরাও আমাদের ফিরে যেতে বললেন। তারপর এমন একটা সময় এল যখন আমরা গিরিশিরাতে একা। সামনে নীল জলের অনিন্দ্য সুন্দর রূপ। সেই ভয়াল সুন্দর হ্রদের নিঃস্তব্ধ প্রান্তে আবেগে সবার চোখে জল। সময়ের সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা শুরু হল। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হ্রদের তীরে কাটিয়ে শেষবারের মতো প্রণাম জানিয়ে আমরা ফিরে চললাম। সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চলল কাঞ্চনজাউ পর্বত আর নীল জলের জলছবি।

প্রয়োজনীয় তথ্য

হাওড়া বা শিয়ালদা থেকে ট্রেনে একরাত কাটিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি। স্টেশন থেকে গাড়ি বা সিকিম ন্যাশনালাইজড ট্রান্সপোর্ট-এর বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে বা গাড়িতে

গ্যাংটক। গ্যাংটক থেকে সিকিম ট্যুরিজমের বা অন্যান্য বেসরকারি ট্র্যাভেল এজেন্টদের দুই রাত তিন দিনের প্যাকেজ ট্যুর আছে। ভাড়া জন প্রতি দুই থেকে তিন হাজার টাকা। পুরো গাড়ি পনেরো হাজার টাকার কাছাকাছি। প্যাকেজের মধ্যে থাকা খাওয়া ধরা আছে। নিজেরাও শুধু গাড়ি ভাড়া করে যাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদেরই করে নিতে হবে। খরচ খুব বেশি তফাত হয় না। তবে বর্ষাকালে বা অফ সিজনে গেলে অনেক কম খরচ। বর্ষার আরেক সুবিধা হল গুরুদোংমারের পুরো নীল জলটাই দৃশ্যমান থাকে। তবে বর্ষায় পাহাড়ে ধস নামে। তাই বর্ষায় গেলে আগাম খবর নিয়ে এগোবেন, আর হাতে দুয়েকদিন বেশি রাখবেন। গ্যাংটকে সরকারি-বেসরকারি হোটেল, লজ, গেস্টহাউস, হলিডে হোমের অভাব নেই। লাচেনে অল্প দুয়েকটি হোটেল। সরকারি বাংলো আর অসুবিধায় পড়লে গ্রামের লোকের বাড়ি থাকার জন্য পাওয়া যাবে। থাঙ্গুতেও থাকার বন্দোবস্ত আছে। এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা খুব বেশি হওয়ার জন্য এবং একদম শেষ দিকে অক্সিজেনের অপ্রতুলতার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। হৃৎপিণ্ডের অসুখ বা উচ্চ রক্তচাপজনিত অসুখ থাকলে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করে সঙ্গে রাখতে হবে। শারীরিক অসুস্থতা গোপন করে এগোলে হিতে বিপরীত হতে পারে। বছরের যে-কোনও সময়েই ভালোমানের গরম পোশাক সঙ্গে নেওয়া জরুরি।

'ভ্রমণ' জুলাই, ২০০৫

ডাংখার তাল ডেমুল গ্রাম

অনিন্দ্য মজুমদার

লাহুল উপত্যকায় চন্দ্র নদীর পাড়ধরে বাস চলছে। গাড়ি চলারই রাস্তা, তবে ছোট বড় নুড়িপাথরের ওপর দিয়ে বাস যখন লাফাতে লাফাতে চলে, ইষ্টনাম জপা ছাড়া উপায় নেই। তাতেও সবসময় কাজ হয় না, স্থানীয় সহযাত্রী জানান, এই তো কয়েকদিন আগে কাজা থেকে সুমোয় করে একদল গ্রামবাসী যাচ্ছিলেন ত্রিলোকনাথদর্শনে। পথ-মধ্যে গাড়ি ছিটকে পড়ে চন্দ্রগর্ভে।

ভোররাতে মানালি থেকে বেরিয়েছি। দুপুরবেলা বাস দাঁড়াল বাতাল (৩,৯৬০ মিটার)। মধ্যাহ্নভোজের জন্য ত্রিশ-চল্লিশ মিনিটের যাত্রাবিরতি। দেখতে দেখতে উল্টোদিক থেকে মানালিগামী বাস হাজির। মুহূর্তের মধ্যে বাতালের একমাত্র ধাবাটি জমজমাট। তুষারশৃঙ্গ আর কল্লোলিনী নদী নিয়ে বাতাল। এখান থেকে পথ গিয়েছে চন্দ্রতালের উদ্দেশে। আর বাঙালি পর্বতপ্রেমীর মনে বাতাল বলতেই ভেসে ওঠে কারচানালার সেই দুর্ঘটনার কথা। ২৬ আগস্ট, ১৯৭০ সালে ললনাশৃঙ্গ জয় করে ফেরার পথে বাতালের কাছে কারচানালা পার হওয়ায় ব্যর্থ চেষ্টায় মারা যান ভারতীয় মহিলা পর্বতারোহণ ইতিহাসের পথিকৃৎ সুজয়া গুহ ও কমলা সাহা।

আবার চলা, আঁকাবাঁকা চড়াইপথ। পৌঁছে যাই স্পিতির সিংহদুয়ার কুনজুম গিরিপথের মাথায় (৪,৫৫১ মিটার)। এখান থেকেও পথ গেছে চন্দ্রতালের দিকে। বাতালের তুলনায় দূরত্ব কম, চড়াই-উতরাই বেশি। কুনজুম লায় একটি বিশাল চোর্তেন আছে। সহযাত্রীরা তাকে প্রদক্ষিণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কাছেই তুষারশৃঙ্গ, পাহাড়ের ঢালে হলুদ ফুলের কার্পেট— মনে হয় অন্য এক পৃথিবীতে পৌঁছে গেছি, আবার চলার শুরু। উতরাই পথে নেমে আসা লোসার গ্রামে (৪,০৭৯ মিটার)। তারপর স্পিতি নদীর পাড় ধরে ধরে বাস পৌঁছে যায় কাজায় (৩,৬০০ মিটার), রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হল পি ডব্লু ডি-র সার্কিট হাউসে।

সময় বাঁচাতে অনেকেই দ্বিতীয় দিন ট্রেকিং শুরু করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে শরীর উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে না নিতে পারলে অসুস্থতা নিশ্চিত। তাই আমরা দুটো দিন কাটালাম কাজায়। স্পিতির মহকুমা সদর কাজা পর্যটক মহলে ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চল হওয়ার কারণে বছর কয়েক আগে

পর্যন্ত স্পিতিভ্রমণে নানান নিষেধাজ্ঞা ছিল। সে সব উঠে যাওয়ার ফলে মরসুমের সময় দেশি-বিদেশি পর্যটকে ভর্তি থাকে কাজা। প্রয়োজনের তুলনায় হোটেল-লজের সংখ্যা খুব বেশি নয়, যদিও নতুন নতুন হোটেল গড়ে উঠেছে। অনেকসময় বেশি দেরি করে পৌঁছনো বিদেশি পর্যটকদের হোটেলের খাবার ঘরে শুতে দেখেছি। তা বলে যদি ভেবে থাকেন কাজা মানে লোকজনে জমজমাট এক ব্যস্ত শৈলশহর, তা হলে ভুল হবে। স্পিতি নদীর পাড়ের এই ছোট্ট জনপদটির সঙ্গে হিমালয়ের কোনও জনপ্রিয় শৈলশহরের তুলনা চলে না। চারদিকে রুক্ষ, রঙিন পাহাড়ে ঘেরা কাজাকে মনে হয় তিব্বতের কোনও অচিন গ্রাম— ভাবগম্ভীর গুম্ফা, রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়ানো বৌদ্ধ লামার দল, তিব্বতিদর্শন গ্রামবাসী। কাজা দর্শনের পাশাপাশি আমাদের পদযাত্রার প্রস্তুতি চালিয়ে যাই। বাজারটা খুব বড় না হলেও মুদিখানায় সবকিছু পাওয়া যায়। কেরোসিন যোগাড় হল পেট্রল পাম্প থেকে। মুশকিল শুধু টাটকা সবুজ সবজি জোটানো, সমতল ভারতবর্ষ থেকে দু-দুখানা গিরিপথ অতিক্রম করে আসতে আসতে তাদের শরীর-স্বাস্থ্যের রূপলাবণ্য অনেকটাই ঝরে যায়।

চতুর্থদিন সকালের রেকংপিওগামী বাস ধরলাম। স্পিতি নদীর বামতীর ধরে বাসযাত্রা। কাজা থেকে ২৩ কিলোমিটার পার হতে আতারনু ব্রিজ। রাস্তার বাঁহাতে পাহাড়ের গায়ে সারিবদ্ধ রকপিলার, হঠাৎ মনে হয় কেউ যেন পাথর কেটে তৈরি করেছে। বাস আমাদের নামিয়ে দিল শিচলিং। এখান থেকে যেতে হবে ডাংখার (৩৭০ মিটার)। দূরত্ব বেশি নয়, বড়জোর কিলোমিটার পাঁচেক হবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা একমাত্র গাড়ির মালিক হেঁকে বসল আড়াইশো টাকা। দলে মাত্র দুজন— ভাস্কর আর আমি! বড়জোর পঞ্চাশ দিতে পারি। —দেখছ না দুজন! গম্ভীর মুখে বললাম। —বিকেল পাঁচটায় যান। শেয়ারে জনপ্রতি পঁচিশ টাকায় হয়ে যাবে। এখন গেলে আড়াইশো লাগবে। আরও গম্ভীর জবাব। অনেক অনুনয় বিনয়ের পরে দুশোয় রাজি করানো গেল। দশ মিনিটে গাড়ি পৌঁছে গেল ডাংখার গুম্ফার সামনে। থাকার ব্যবস্থা হল গুম্ফার গেস্টহাউসে। সাধারণ মূল্যে সাধারণ ব্যবস্থা। খাওয়ানোর দায়িত্ব নেন গুম্ফাসেবক লোট্টে; তবে কিছু সময় লাগবে। সেই ফাঁকে ঘুরে আসি ডাংখারের সুপ্রাচীন গুম্ফা। গুম্ফার বেঁটে বেঁটে ঘর, আলোআঁধারি গলিপথ, অদ্ভুতদর্শন তিব্বতি দেবমূর্তি— সবমিলিয়ে গা ছমছমে সম্ভ্রম জেগে ওঠে। গুম্ফার মাথায় পাহাড়ের টংয়ে ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ। সেখান থেকে অসাধারণ লাগে চারধার। বহু ধারায় বিভক্ত হয়ে স্পিতি নদী বয়ে চলেছে; তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে পিন নদী। চারদিকের রুক্ষ পাহাড়ের মধ্যে ধাপে ধাপে নেমে গেছে মোলায়েম সবুজ কড়াইশুঁটির খেত; সেদিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। সেই মুহূর্তে বুঝিনি যে ওই খেতই আমাদের চোখের বালি হয়ে উঠবে।

দুপুরের খাবার খেতে খেতে লোট্টেকে জানালাম আগামীকাল ট্রেক শুরু করব। মাল বওয়ার জন্য লোক লাগবে, কিংবা ঘোড়া।

—লোক কোথায়? সবাই কড়াইশুঁটির খেতে কাজে ব্যস্ত।

স্পিতির মূল অর্থকরী ফসল কড়াইশুঁটি। এখানকার কড়াইশুঁটি ট্রাকবন্দী হয়ে চলে যায় দিল্লির সবজিমান্ডিতে। স্পিতিবাসীর অর্থনৈতিক জীবনে কড়াইশুঁটি ফলানো ও বেচা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এসময়ে তাদের অন্য কোনও দিকে তাকানোর সময় নেই। সমগ্র উপত্যকায় কড়াইশুঁটি একই সঙ্গে যায় না— প্রথমে মানে, তারপর জাংখায়, তারপর কাজা কিংবা লাংজা, দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়ে ডাংখার গ্রামের ফসল উঠছে। গ্রামবাসীরা ভোররাত থেকে সন্ধের পর পর্যন্ত খেতে ব্যস্ত, শুধু কয়েকজন অথর্ব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আর বাচ্চা ছেলেমেয়েরা রয়েছে। সন্ধের পরে লোকেরা ফিরলে কথা বলতে হবে; যদিও লোট্টের মতে, আগামী তিন-চারদিনের মধ্যে কাউকে পাওয়া যাবে না। আপাতত যখন কিছু করার নেই, বেরিয়ে পড়ি ডাংখার তালের উদ্দেশে। তালে অনায়াসে ঘুরে আসা যায় এবং প্রাপ্তি অনেক। মিনিট চল্লিশের চড়াইপথ, মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখে নেওয়া ডাংখারের রকপিলার, গুম্ফা, আরও নীচে স্পিতি ও পিনের সঙ্গম। আমাদের পথের দুপাশে গোলাপি পাহাড়ি গোলাপের ঝোপ। একসময় চড়াই শেষে সমতলে পৌঁছে যাই। অসাধারণ জায়গা। চারপাশে উঁচু উঁচু পাহাড়; দক্ষিণ-পূর্বে মানেরাং অঞ্চলের কিছু তুষারশৃঙ্গ; আর আমার সামনে ঘননীল জলের সরোবর। চরম নৈঃশব্দ্যের মধ্যে এই হ্রদ আমাদের এবারের ভ্রমণের সেরা প্রাপ্তি। ডাংখার তালের জল আসে শীতের বরফ গলে, যদি কোনও বছর বরফ কম পড়ে তা হলে কিন্তু তালের ব্যাপ্তি তথা সৌন্দর্য অনেক কমে যাবে।

গতকাল রাতে গ্রামের লোকজনের সঙ্গে কথা বলা যায়নি। ভোরে, আমরা ঘুম থেকে ওঠার আগে এবং গ্রামবাসীরা খেতে বের হওয়ার আগে, লোট্টে তাদের সঙ্গে কথা বলে এসেছেন। আমাদের জন্যে ভদ্রলোকের পরিশ্রম সত্যি প্রশংসনীয়। যাই হোক, লোক পাওয়া যায়নি, একটি খোতার (গাধা) ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সে এখন জঙ্গলে। ঘণ্টা তিন-চার লাগবে তাকে আনতে। জঙ্গল শুনে অবাক হই, কারণ স্পিতিতে গাছই পাওয়া যায় না প্রায়; সেখানে একটা আস্ত জঙ্গল! পরে বুঝলাম জঙ্গল বলতে যেখানে তৃণভূমি আছে এমন জায়গা। আপাতত আমাদের করার মতো কোনও কাজ নেই। মালপত্র গুছিয়ে খোতার অপেক্ষা। আজকে দিনটা রৌদ্রোজ্জ্বল, কিন্তু সে উজ্জ্বলতা আমাদের মনকে স্পর্শ করে না। একটা চাপা, উৎকণ্ঠা— খোতা যদি না আসে কী হবে। মালবাহকের জন্য অনেক সময় একাধিক দিন ব্যয় করতে হতে পারে। কিন্তু এবারে আমাদের এত ছোট্ট ছুটি যে একদিন নষ্ট মানে একদিন কম ট্রেকিং। অবশেষে সকল চিন্তার অবসান ঘটিয়ে দুপুর সাড়ে এগারোটায় খোতার প্রবেশ। সঙ্গে একটা খোকা। নাম তাসি; কাজা স্কুলে পড়ে। ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। বাড়ির লোকজন আমাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়েছে। ছোটখাটো চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখের মালিক তাসিকে একমুহূর্তে ভালো লেগে যায়। খোতার পিঠে মাল তুলে, ভালো করে বেঁধে দিলেন

লোটে। মাঝদুপুরে আমাদের হাঁটা শুরু হল। ডাংখার তালের জন্য আমাদের যেতে হয়েছিল উত্তর-পূর্ব দিকে, এখন চললাম পশ্চিমের পানে। কিছুক্ষণের মধ্যে ডাংখার পাহাড়ে আড়াল হয়ে গেল। প্রথমে পথ চলা জিপ রাস্তা ধরে, তারপর পাকদণ্ডি ধরি, আজ আমরা চলেছি লালুং গ্রামের দিকে। আমাদের লক্ষ্য পরবর্তী দিনগুলিতে ডেমুল, কোমিক, লাংজা হয়ে কাজায় ফিরে আসব। বিদেশিদের কাছে এই রুটটি পরিচিত হলেও, বাঙালি হিসেবে আমরাই প্রথম দল। বিকেলবেলা পৌঁছলাম লালুং (৩,৬৮০ মিটার)। লিংটি উপত্যকায় প্রধান গ্রাম লালুং। তুঁতে রঙা নদীর বামতীর থেকে ধাপে ধাপে কড়াইশুঁটির খেত। তারপর গ্রামটি। আজ আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল গ্রামপ্রধানের বাড়িতে। ঘরটির ভাড়াটিয়া, স্থানীয় স্কুলের মাস্টারমশাই, ছুটিতে বাড়ি গেছেন। দেওয়ালজোড়া বলিউডি নায়ক-নায়িকার ছবি দেখে মনে হয় মাস্টারমশাইয়ের বয়েস বেশি না। মালপত্র ঘরে ঢুকিয়ে বেরলাম গ্রাম দেখতে। অনেকটা অঞ্চল জুড়ে গ্রামটা ছড়ানো। গ্রামের মাথায় গুম্ফা। গুম্ফাটি তাবো গুম্ফার সমসাময়িক অর্থাৎ প্রায় হাজার বছরের পুরনো এবং তাবোর মতো অত জমকালো না হলেও এখানে ওধরনের বিভিন্ন দেওয়ালচিত্র আছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে লালুংগুম্ফার কোনও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেই, ফলে গুম্ফাটি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে।

পরদিন হাঁটা শুরু করলাম ডেমুল গ্রামের উদ্দেশে। পথে ভালো চড়াই আছে। গতকাল বুঝে গেছি তাসি ভালো ছেলে, ভালো সঙ্গী। কিন্তু ভালো চালক নয়। ওর কোনও দোষ নেই। বেচারা ক্লাসে স্ট্যান্ড করে, বড় হয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়; কিন্তু খোতাকে চালনা করা, তার পিঠে মাল বাঁধার কায়দাকানুন ওর জানা নেই। আজ মাল বেঁধে দিল গ্রামবাসীরা, পরের দিনগুলিতেও তাই হয়েছে। এ অঞ্চলের লোকেরা তাসিকে মেধাবী ছাত্র হিসেবে ভালোবাসে। সুতরাং সাহায্যকারীর অভাব হয়নি। ডেমুল যাওয়ার পথ লালুং গ্রামের খেতের মধ্য দিয়ে, সেতুতে লিংটি নদী পার হয়ে, আবার ডেমুল নালা পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাসির খোতা ওই নড়বড়ে সেতু কিছুতেই পার হবে না বলে জানিয়ে দিল তাসি। আগেও দেখেছি এক উপত্যকার ঘোড়া (বা খোতা) অপরিচিত নদী পার হতে চায় না। সুতরাং ঘোতার ইচ্ছায় কর্ম। তিন-চার কিলোমিটারের বেশি হেঁটে রামা গ্রাম ঘুরে আমাদের যেতে হবে। সেখানে গাড়ি পার হওয়ায় উপযুক্ত ব্রিজ আছে। মুশকিল হল যখন ঘোতা সেই ব্রিজ পার হতেও অনিচ্ছা জানাল। মাথায় হাত বুলিয়ে, কিংবা পশ্চাতে পদাঘাত করেও যখন তাসি ঘোতাকে নাড়াতে পারল না, সবাই মিলে হাত লাগালাম। লাগাম ধরে তাসি টানছে, আর আমরা দুজন ঠেলছি। একটা খোতার গায়ে যে এরকম অমানুষিক শক্তি হয় জানা ছিল না। শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে ঠেলে টেনে ঘোতাকে ব্রিজের মাঝখান পর্যন্ত এনে তিনজনই হাঁফাতে শুরু করলাম। সেই মুহূর্তে সে যদি লালুং, ডেমুল কিংবা ডাংখারের দিকে দৌড় লাগাত, তাকে দৌড়ে ধরার ক্ষমতা কারোর ছিল না। কিন্তু লিংটি নদীর

জলোচ্ছ্বাস শুনে সেও নড়তে চড়তে সাহস পেল না। এমন সময় দেবদূতের মতো কিছু গ্রামবাসী ঘটনাস্থলে পৌঁছাল। তাদের একজন পকেট থেকে খানিকটা গুড় বের করে খোতার মুখের সামনে ধরলেন। তারপর আমরা ঠেলি, তাসি টানে, লোকটা পিছোয়, খোতা এগোয়। পরিষ্কার সুকুমার রায়ের পদ্ধতিতে তাসির ঘোতা লিংটি ব্রিজ পার হল। লিংটি থেকে ডেমুল চড়াইপথ। পাথুরে ভাস্কর্যের মতো পাহাড় দেখতে দেখতে পৌঁছলাম ডেমুল (৪,৩০০ মিটার)। একনজরেই ডেমুলকে ভালো লেগে যায়। সমগ্র অঞ্চল জুড়ে সবুজ ভেলভেটের মতো ঘাসের কার্পেট। পরিচিত রুক্ষতার মধ্যে এ যেন এক অচেনা স্পিতি। শুনলাম এখানকার মাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চলছে। ডেমুলে থাকার ব্যবস্থা হল এক গ্রামবাসীর ঘরে। এখানে ভাড়াটিয়া একজন দিদিমণি। যথারীতি ছুটিতে তিনি বাড়িতে। মহিলার ঘর বলেই হয়তো পরিপাটি করে সাজানো গুছানো। আমাদের বেশ সুবিধা হল। এই পদযাত্রায় তাঁবুর প্রয়োজন হয়নি। এখানে রান্নার বাসনকোসন কিছু লাগল না।

পরদিন ডেমুলকে বিদায় জানাতে ইচ্ছা করছিল না। তবু যেতে হয়। সবুজ ঘাসের ঢালে ফুলের মেলা— কোথাও হলুদ হয়ে আছে, কোথাও গোলাপি, কোথাও সাদা। স্পিতিতে এ ধরনের দৃশ্য দেখব কোনওদিন ভাবিনি। তাদের পাশে বসি, ছুঁই, ছবি তুলি। চলার গতি শ্লথ হয়ে যায়। তাসির সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে। একসময় দেখি অনেকদূর এগিয়ে গেছে তাসি। তাড়াতাড়ি পথ চলি, পিছন ফিরলে একাধিক তুষারশৃঙ্গ চোখে পড়ে। কিন্তু আকাশের মেঘ তাদের প্রায় সবাইকে ঢেকে দিয়েছে। অবশেষে পৌঁছে যাই ডেমুল গিরিপথের মাথায় (৪,৭০০ মিটার)। তুষারহীন গিরিপথ, একটা চোর্তেন, আর কিছু পতাকা। গ্রামবাসীরা এপথ ব্যবহার করেন। গিরিপথের ওধারে একাধিক পায়েচলা পথ। তাসি এদিকে আগে আসেনি, ঝামেলা এড়াতে মালপত্র আর ঘোতা নিয়ে আমরা অপেক্ষা করলাম পথের ধারে; তাসি নেমে গেল দূরের একটা তাঁবু লক্ষ্য করে, খবর আনতে। বসে আছি তো আছিই। অনেকক্ষণ বাদে তাসি ফিরে জানাল পথের খোঁজ পেয়েছে। আবার চলা, নেমে চলা, এদিকেও কিছু সবুজ ঘাস আছে ফুল আছে তবে ডেমুলের মতো নয়। একটা জায়গায় দেখলাম একপাল ভেড়া সবুজ ঘাসের ওপর চরে বেড়াচ্ছে, ঠিক যেন একটুকরো গাড়োয়াল। বিকেলবেলা পৌঁছে গেলাম কোমিক গ্রামের মাথায় থাংগুড গুম্ফায় (৪,৪৫০ মিটার)। আজ রাত্রিবাস এই গুম্ফার গেস্টহাউসে। মূল গেস্টহাউসের চাবি নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত লামা কাজা গেছেন। আমরা আশ্রয় নিলাম নির্মীয়মাণ একটি অংশে।

পরদিন পথ অল্প। গাড়ি চলার উপযুক্ত সহজ পথ ধরে হাঁটা। পথের বামহাতে হিক্কম গ্রামকে রেখে আমাদের চলা। পথ চলতে চলতে নজর কাড়ে চৌ চৌ কাং নেলজা তুষারশৃঙ্গ, পর্বত মহলে যার আদরের নাম সি সি কে এন (৬,৩০৩ মিটার)। আজও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বেশ জমাট কালো মেঘ। বেলা বাড়লে বৃষ্টি

হবে মনে হয়। লাংজা গ্রামটা (৪,৩০০ মিটার) প্রায় সি সি কে এন-এর কোলে বসানো। ছড়ানো গ্রাম, প্রচুর খেত, এখানে একটি হোটেল আছে। আমাদের এবারের ট্রেকে তাঁবু আনাটা বেকার হল। প্রতিটি গ্রামেরই ঘরে থাকার ব্যবস্থা করা গেছে। লাংজা গ্রামের অন্যতম আকর্ষণ এখানকার ফসিল-পার্ক। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে পথনির্দেশিকা নিয়ে আমরা সেখানে গেলাম, কিন্তু আমাদের অ-প্রশিক্ষিত চোখ কিছুই দেখতে পেল না, কিংবা, হয়তো আমরা সঠিক জায়গায় পৌঁছতেই পারিনি। ফসিল দেখার জন্য অবশ্য এত কষ্ট করার দরকার নেই। আপনার উৎসাহ থাকুক বা না থাকুক, গ্রামের প্রতিটি বাচ্চা পকেট ভর্তি ফসিল নিয়ে আপনাকে কেনার জন্য পীড়াপীড়ি করবে। গ্রামের আশপাশে ঘোরাঘুরি করছিলাম। হঠাৎ এক ঝটকা হাওয়া— ঠান্ডা, ভিজে ভিজে, মেঘলা আকাশে বিকেলবেলাতেই অকাল সন্ধ্যা নেমে এসেছে। দূরে দেখি ঘন কালো মেঘ থেকে হাতির শুঁড়ের মতো শাখাপ্রশাখা নেমে এসেছে পাহাড়ের মাথায়। আন্দাজ করি তেড়ে বৃষ্টি আসছে। ছুট লাগাই ঘরের দিকে। বৃষ্টিছায় স্পিতিতে বৃষ্টিভয়ে দৌড়তে মজাই লাগছিল। তারপর এল বৃষ্টি, চলল অনেকক্ষণ ধরে।

পরদিন লাংজা থেকে সিধে নেমে যাব কাজা। সকাল থেকেই গ্রামের মেয়ে বউরা খেতের কাজে ব্যস্ত। খেতের মধ্যে দিয়ে গাড়ির রাস্তা ধরি। এপথে সপ্তাহে একদিন বাস চলে, তবে কাজা থেকে ছোট গাড়িভাড়া করে আরামসে যাওয়া যায়। পথের ডানদিকে শিলা গর্জ। অনেক নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শিলা নদী। ক্রমশ আশপাশের সবুজ কমে যাচ্ছে, বাড়ছে রুক্ষতা। অর্থাৎ আমরা আবার ফিরে আসছি রুখা-শুখা চেনা স্পিতিতে। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ। একটা সময়, দূরে চোখে পড়ে কাজা। আমরা আমাদের পদযাত্রায় শেষ পর্বে উপস্থিত হয়েছি। খেয়াল করলাম তাসি একটু অন্যমনস্ক, একটু জড়োসড়ো হয়ে গেছে। অনেক কিন্তু কিন্তু করে, কাঁচুমাচু মুখ করে জানাল কাজা শহরে তার অনেক সহপাঠী-সহপাঠিনী আছে। তাদের সামনে ঘোতা নিয়ে গেলে হাস্যস্পদ হতে হবে। বেচারা সেই অনাগত লজ্জাতে মনমরা হয়ে আছে। সত্যি তো, উঠতি কিশোর যদি কিশোরী বান্ধবীদের সামনে খোতাচালক হিসেবে পরিচিত হয়, তবে আর বেঁচে থাকার মানে কী! মাভৈঃ তাসি, এতদিন তুমি আমাদের জন্য অনেক করেছ। এবার প্রতিদানের পালা। খোতার লাগাম আমি হাতে নিলাম, ছড়ি হাতে ভাস্কর, তার পিছনে। অনেকদূর থেকে আমাদের অনুসরণ করে তাসি, যেন অপরিচিত কোনও ব্যক্তি। গাড়ি-ঘোড়া-হট্টগোলের মধ্যে খোতাকে হাঁটানো বেশ কঠিন কাজ। ব্যস্ত বাজারের মধ্য দিয়ে এক অনিচ্ছুক খোতাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে গলায় ক্যামেরা ঝোলানো দুই বাঙালি ট্রেকার— কাজার লোকজন হয়তো বহুদিন পর্যন্ত দৃশ্যটা মনে রাখবে।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

নিরালা খিরসু

সুধাংশুভূষণ ভট্টাচার্য

গাড়োয়াল হিমালয়ের বুকে খিরসু একটি গ্রাম, একটি শান্তির নীড়। পর্যটকের কাছে এর পরিচিতি ছিল না। গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের উদ্যোগে খিরসুকে একটি মনোরম ট্যুরিস্ট স্পট হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। পৌড়ি যাওয়ার দুটো রাস্তা আছে হৃষীকেশ থেকে। একটি রাস্তা দেবপ্রয়াগ, মালেথা ও শ্রীনগর হয়ে পৌড়ি। আরেকটা দেবপ্রয়াগ থেকে সরাসরি (শ্রীনগর এড়িয়ে) পৌড়ি। দ্বিতীয় রাস্তাটি নতুন তৈরি হয়েছে এবং নতুন পথেই পৌড়ির দূরত্ব কম। পৌড়ি থেকে খিরসু ১৯ কিলোমিটার। খিরসু যাওয়ার জন্য ১০-১৫ মিনিট অন্তর শেয়ারের জিপ পাওয়া যায় পৌড়ির জি এম ভি এন ট্যুরিস্ট রেস্টহাউসের নীচের রাস্তায় মন্দিরের কাছ থেকে।

ভোর থেকেই বেশ কয়েকটি বাস আছে হৃষীকেশ থেকে শ্রীনগর যাওয়ার। তাছাড়া ভোরের দিকে আছে শেয়ারের জিপ, টাটা সুমো, অ্যাম্বাসাডার। বাসভাড়ার চেয়ে শেয়ার জিপে ভাড়া কিছুটা বেশি, কিন্তু সময় লাগে কম।

সকাল ৬টা নাগাদ হৃষীকেশের দেরাদুন রোডের মোড় থেকে বাস ধরে ব্যাসী, দেবপ্রয়াগ, কীর্তিনগর হয়ে শ্রীনগর পৌঁছলাম দশটায়। শ্রীনগর বহু

বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রের ওপর বিশাল শহর। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় সবই আছে এই শহরে। এখানে রয়েছে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের বৃহত্তম ট্যুরিস্ট রেস্টহাউস। জনবহুল কর্মব্যস্ত শহর তথা বৃহৎ ব্যবসা কেন্দ্র।

হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ ২৪ কিলোমিটার। হৃষীকেশ থেকে দেবপ্রয়াগ ৭০ কিলোমিটার এবং দেবপ্রয়াগ থেকে শ্রীনগর ৩৫ কিলোমিটার। হৃষীকেশ থেকে বাসে সরাসরি শ্রীনগর পৌঁছতে সময় লাগে চার ঘণ্টার কিছু কম। ভাড়া ৬৩ টাকা। শ্রীনগর থেকে পৌড়ি যাবার অনেক বাস আছে। দূরত্ব ৩২ কিলোমিটার। ভাড়া ১৭ টাকা। সময় লাগে সওয়া এক ঘণ্টা।

শ্রীনগরে বাস বদল করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে গেলাম পৌড়ির বাস, শ্রীনগর থেকেই ছাড়ছে। প্রায় সওয়া এক ঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম পৌড়ি। এই পথে চলাচলকারী বাসের অভাব নেই।

পৌড়ি প্রকৃতিপ্রেমীর একটি কাঙ্ক্ষিত স্থান, উচ্চতার তারতম্যের কারণে পাহাড়ের গায়ে বহু স্তরে বিন্যস্ত ঘনসন্নিবিষ্ট একটি বড় শহর। হিমালয়ের অত্যুচ্চ তুষারশুভ্র শৃঙ্গশ্রেণীর জন্য পৌড়ির খ্যাতি আছে। প্রথমেই নজর কাড়ে তুষারশৃঙ্গের স্থির শোভাযাত্রা।

পৌড়ির উচ্চতা ৬,৩০০ ফুট। শহরের সর্বোচ্চ স্থানে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের বেশ বড় পর্যটক আবাস, সঙ্গে আছে রেস্তোরাঁ। এছাড়া বাসস্ট্যান্ডের কাছে আছে খাওয়ার হোটেল, সেখানে নিরামিষ ভোজন মাত্র কুড়ি টাকায়। এখানে অনেক দোকানপাট, সব কিছুই পাওয়া যায়। শহরের সুযোগ-সুবিধাযুক্ত হিমালয় দর্শনের এই মুক্তমঞ্চ হিমালয়প্রেমিকের ছুটি কাটাবার পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি সুন্দর জায়গা। শহরের কৃত্রিমতা ও কোলাহল সত্ত্বেও কেদারডোম, চৌখাম্বা, বদ্রীনাথ, নীলকণ্ঠ ইত্যাদি শৃঙ্গশ্রেণীর নৈসর্গিক শোভা মনের অন্তঃস্থলকে স্পর্শ করে।

পৌড়িই যখন গন্তব্যস্থল, তখন শ্রীনগর না গেলেও চলে। হৃষীকেশ থেকে নতুন পথে সরাসরি পৌড়ি যাওয়ার জন্য শেয়ারের জিপ পাওয়া যায়— ভাড়া যাত্রীপিছু ১০০ টাকা। ট্যাক্সিও পাওয়া যায় হৃষীকেশ এবং দেবপ্রয়াগ থেকে। নতুন পথে হৃষীকেশ থেকে পৌড়ি ১২১ কিলোমিটার, পুরনো পথে শ্রীনগর হয়ে দূরত্ব ১৩৭ কিলোমিটার। জিপে হৃষীকেশ থেকে দেবপ্রয়াগ হয়ে নতুন পথে পৌড়ি পৌঁছতে সময় লাগে ৪ ঘণ্টা, পক্ষান্তরে বিকল্প রাস্তায় শ্রীনগরে বাস বদল করে পৌড়ি পৌঁছতে লাগে প্রায় ৫ ঘণ্টা। সময় কম, আরাম বেশি। নতুন পথ খুবই সুন্দর পিচরাস্তা, মোটর চলাচলের উপযুক্ত, নিরাপদ।

পৌড়ি থেকে যেতে হবে খিরসু। নিগমের ট্যুরিস্ট রেস্টহাউসের নীচের রাস্তা থেকে শেয়ারের জিপ ধরলাম। ১৯ কিলোমিটার পথ, মাথাপিছু ভাড়া ১৫ টাকা, সময় লাগে প্রায় ৪৫ মিনিট।

খিরসুতে জিপ থেকে নেমে অল্প একটু হাঁটলেই গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের ট্যুরিস্ট রেস্টহাউস। রেস্টহাউস সংলগ্ন ফুলবাগান পর্যন্তও পৌঁছে দিতে পারে জিপ কিছু অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে।

খিরসুতে জনবসতি খুবই অল্প। নগরের কোলাহল ও কৃত্রিমতার নাগালের বাইরে নির্ভেজাল গ্রাম্য পরিবেশে একটি আদর্শ জায়গায় নিগমের এই সুন্দর পর্যটক আবাস ১৯৯৪ সালে গড়ে উঠেছে। এই আবাসের ফুলে ফুলে ভরা বাগানে পদার্পণ করা মাত্র নজর কেড়ে নেয় সারিবদ্ধ তুষারশৃঙ্গের বহু-বিস্তৃত, উন্মুক্ত, অবাধ দৃশ্য। আড়াল সৃষ্টি করার অভিপ্রায় নিয়ে ধারে-কাছে একটিও গাছ নেই।

পর্যটক আবাসের ম্যানেজার শৃঙ্গগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। গঙ্গোত্রী ১, ২ ও ৩ কেদারডোম, চৌখাম্বা, বদ্রীনাথ, নীলকণ্ঠ, নন্দাদেবী ইত্যাদি।

খিরসুর উচ্চতা ৬,৮০০ ফুট। নভেম্বরেই এখানে বেশ শীত। শীতের রাত

আরামে কাটাবার জন্য পর্যটক আবাসের পরিপাটি কামরায় লেপ এবং কম্বলের উষ্ণ আয়োজন। কামরা-সংলগ্ন বৃহৎ স্নানঘরে রয়েছে গিজারের আনুকূল্যে।

এখানে পর্যটক আবাসে ছটি কামরা, প্রতিটি দ্বিশয্যাবিশিষ্ট। আর আছে দুটি ডর্মিটরি, প্রতিটি কামরায় ছটি করে শয্যা। ছটি দ্বিশয্যা কামরার মধ্যে চারটি ডিলাক্স, ভাড়া ৬০০ টাকা মরসুমে এবং ৩৫০ টাকা অফ সিজনে। আর দুটি কামরা ইকনমি, ভাড়া ৪০০ টাকা মরসুমে এবং ২৮০ টাকা অন্য সময়ে। ডর্মিটরিতে শয্যাপ্রতি ভাড়া মরসুমে ১২০ টাকা এবং অন্য সময়ে ৭০ টাকা। মে-জুন এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর— এই চার মাস এখানে মরসুম। পর্বতমুখী ডাইনিং হল থেকে বহির্দৃশ্য এত সুন্দর যে হলটি মুহূর্তে মন জয় করে নেয়।

খিরসুতে নিবিড় অরণ্যাচ্ছাদিত ঘন সবুজ একটি পাহাড়ের পাশেই রয়েছে সম্পূর্ণ সমতল বিশাল একটি খেলার মাঠ। পর্যটক আবাসের কাছেই এই মাঠটি।

খিরসুতে তুষারপাত বা তুষারাবৃত খিরসুকে দেখতে হলে আসতে হবে জানুয়ারির মাঝামাঝি। তখন তাপমাত্রা মাইনাস দু-তিন ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসে। সেই সময় আকাশ থাকে সুনীল, মেঘমুক্ত।

প্রয়োজনীয় তথ্য

সরাসরি হরিদ্বার যাওয়ার জন্য দুটি ট্রেন রয়েছে হাওড়া থেকে। ৩০০৯ দুন এক্সপ্রেস এবং ৩০১৩ উপাসনা এক্সপ্রেস। দুন এক্সপ্রেস (প্রত্যহ) হাওড়া ছাড়ে রাত ৮টা ১০ মিনিটে। উপাসনা এক্সপ্রেস (কেবল মঙ্গলবার) দুপুর ১টা ১০ মিনিটে ছেড়ে পরদিন বিকেল ৪টে ৪৬ মিনিটে হরিদ্বার পৌঁছয়। স্টেশন থেকে বেরিয়েই শেয়ারের অটো মাথাপিছু ১৫-২০ টাকার বিনিময়ে পৌঁছে দেবে হৃষীকেশ। বাসস্টেশনও হরিদ্বার রেলস্টেশনের খুব কাছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে একের পর এক বাস চলছে হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ।

ট্যুরিস্ট লজের বুকিং পাবেন এই ঠিকানায়:

গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম, রুম নম্বর ২২৪, মার্শাল হাউস
৩৩/১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১ ☎২২৬১-০৫৫৪

কলকাতায় গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের অনুমোদিত সংস্থা:

হিমালচূড়া ট্র্যাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস
পি-২৬৩, সি আই টি রোড, স্কিম-৪(এম), কলকাতা-৭০০ ০১০
☎২৩৭০-৮০০৪, ২৩৬৩-৩০০০
ফ্যাক্স: ২৩৫০-১৬১৬

হুইলস ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস
৫১, একডালিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯
☎২৪৬০-১৮৮৬, ৯৮৩১০-২৪৬২৮

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর, ২০০৪

জিম করবেটের জঙ্গলে

পার্থ দে

১৯৩৫ সালে যখন করবেট ন্যাশনাল পার্কের জন্ম হয়, তখন এর নাম ছিল হেইলি ন্যাশনাল পার্ক। ১৯৫৭ সালে নাম পরিবর্তন করে হয় করবেট ন্যাশনাল পার্ক। এটা হল ভারতবর্ষের প্রথম ন্যাশনাল পার্ক। ফলে বিদেশি ট্যুরিস্টদের আনাগোনা সম্ভবত রণথম্ভোরের চেয়েও বেশি। ৪০০ থেকে ১,১০০ মিটার উচ্চতায় ৫২০.৮ বর্গকিলোমিটার বনভূমি নিয়ে এই ন্যাশনাল পার্কের উত্তরে শিবালিক রেঞ্জ। আর জঙ্গলের বুক চিরে এঁকেবেঁকে চলে গেছে রামগঙ্গা নদী।

গতবছর ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ কাঠগুদাম থেকে রামনগর যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা বারোটা। রামনগরের ফরেস্ট অফিস থেকে জঙ্গলে ঢোকার অনুমতিপত্র, বাংলো বুকিংয়ের কাগজ এইসব জোগাড় করে নিতে ঘণ্টাখানেক গেল। করবেটের ভেতরে থাকার সুযোগ একমাত্র ফরেস্ট বাংলোতেই। মোট পাঁচটি বাংলো। ঢোকার গেট পেরিয়ে পাঁচ-ছয় কিলোমিটারের মুখে সুলতান আর বিজরানীর বাংলো। উনিশ কিলোমিটারের মাথায় গৈরাল, পঁচিশ কিলোমিটারে খিনাউলি আর ত্রিশ-বত্রিশ কিলোমিটারে শেষ বাংলো ধিকালা। আমরা থাকব গৈরালে। রামনগর থেকে বনে ঢোকার দু-তিন কিলোমিটার আগে পর্যন্ত রয়েছে বেশ কিছু প্রাইভেট থাকার জায়গা। সবগুলিই বেশ বিলাসবহুল এবং ইকো-ফ্রেন্ডলি।

জঙ্গলে ঢোকার গেটে যেখানে কাগজ দেখাতে হয় ওখানে দিব্যি ঘুরে বেড়ায় একটা নীলগাই। ট্যুরিস্টদের হাতে খাবার খায়, আদর খায় আবার বিকেল হলে কাছাকাছি জঙ্গলে রাত্রিবাস করে আসে।

তার মাথায় হাত বুলিয়ে হুডখোলা জিপে জঙ্গলে ঢুকে পড়তেই বেশ ঠান্ডা লাগল। শাল, মহুয়া, বয়রা, হরীতকীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ পাহাড়ি—এঁকেবেঁকে, উঠে নেমে চলা। 'ভ্রমণ'-এ বেশ কয়েকবার করবেট পার্কের লেখা পড়েছি, কিন্তু নিজে এলাম এই প্রথম, অথচ তাও এত চেনা চেনা লাগছে কেন? হঠাৎ দূরে পাহাড়ের রেঞ্জ। এই শীতে মাঝেমধ্যে পাহাড়ি ঝোরার শুকনো বেডের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা— সবকিছু আমাদের বাংলার ডুয়ার্স। কানহা,

বান্ধবগড়, রণথম্ভোর নয়। সেই আমাদের অতি পছন্দের ভেজা ভেজা, অন্ধকার জঙ্গল। তার মধ্য দিয়ে ফেটে আসা সূর্যের আলো হঠাৎ বার্কিং ডিয়ারের গায়ে পড়া— আরে এও তো তরাই। ভূগোলে পড়েছিলাম না?

জঙ্গলের অলিগলি ঘুরে যখন গৈরাল বনবাংলো পৌঁছলাম তখন বিকাল ৫টা। এর মধ্যে সত্যি বলতে কি সবচেয়ে অবাক হয়েছি বার্কিং ডিয়ারের প্রাচুর্য দেখে। দুঘণ্টার মধ্যে এত বার্কিং ডিয়ার আগে কখনও দেখিনি। বাংলোর ক্যাম্পাসে ঢুকে দেখি এলাহি ব্যাপার। ক্যান্টিন, থাকার জায়গা সব রয়েছে বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ব্রিটিশ আমলের কাঠের বাংলো। বিরাট উঁচু ছাদ। অব্যবহৃত ফায়ার প্লেস। পুরনো আয়না। বিশাল ঘরের পাশে আরও বিশাল বৈঠকখানা। আসবাবপত্রের মেহগিনি রং। বেশ লাগল। আধুনিক ঠাটবাট নেই। দেশের প্রথম জাতীয় উদ্যানের সঙ্গে মানানসই প্রাচীন ব্যাপারস্যাপার। জেনারেটরে আলো জ্বলবে সন্ধেবেলা তিনঘণ্টা। ক্যান্টিনে নিরামিষ খাবার, ডিম মিলবে।

বাংলোর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে রামগঙ্গা নদী। একটি ওয়াচ টাওয়ার নদীর বেড আর বাংলোর মধ্যবর্তী স্থানে। ব্যাগট্যাগ রেখে ক্যামেরা নিয়ে ঝট করে চলে গেছি নদীর ধারে। বিরাট বালুচরে পাখির ছবি তুলতে তুলতে খেয়াল করছি সম্বর, চিতল হরিণের ক্ষুরের দাগ। হাতির বিষ্ঠা। আর লেপার্ডের থাবার ছাপ। সন্ধে নামছে। নদীতে লাল আলোর প্রতিফলনে সাদা-কালো বড় মাছরাঙাটিকে কী সুন্দর লাগছে! এই তো বনবাংলোর মজা। কটা দিন না-মানুষদের মধ্যিখানে রাত্রিযাপন। হঠাৎই প্রচণ্ড ধমকে সম্বিত ফিরল। রাগারাগি করতে করতে এগিয়ে আসছেন বনকর্মীরা। এখানে পদচারণা নিষিদ্ধ। বিপজ্জনক এলাকা। এতব সুড়সুড় করে ঘরের ছেলে ঘরে।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যায় নানা পাখির কলতানে। নদী থেকে বয়ে আসা ঠান্ডা হাওয়া হাড় জমিয়ে দেয়। হাতি ছাড়ে বাংলোর ক্যাম্পাস থেকেই। আগে থেকে বলে রাখা ছিল। উঠে বসি। দুলকি চালে হাতি ঢুকে পড়ে গভীর বনে, যেখানে জিপ যায় না। এক্সপার্ট মাহুত। বাঘের থাবার ছাপ দেখতে দেখতে এগিয়ে যাওয়া— রহস্যের গন্ধ। এই রোমাঞ্চের নেশাতেই তো বারবার জঙ্গলে যাওয়া। হঠাৎই ভেসে আসে চিতলের অ্যালার্ম কল। বোঝা যায় কাছেপিঠেই বাঘ আছে। অবশেষে সেই মুহূর্ত। দেখা সাব? দেখছি তো। ক্যামেরায় চোখ চলে যায়। শাটার পড়ে। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দেখেন। সকালের অপূর্ব আলো তার গায়ে। মিনিট পাঁচেক। তারপর জঙ্গলের ঘাসবনে মিলিয়ে যান। ফেরার পথে চোখে পড়ল বিরাট পাইথন। ঠান্ডায় জবুথুবু। বাংলোয় ফিরে এসে মন ভরে যায়। গোটা ক্যাম্পাসে কতরকমের পাখি। মন ভরে ছবি তুললাম সবুজ লিনিয়েটেড বারবেট আর পিট্টার।

বিকেল তিনটেয় জিপ নিয়ে চললাম খিনাউলির দিকে। খুব ধীরে ধীরে গাড়ি নিয়ে দেখতে দেখতে চলা। রামগঙ্গার তীরে রোদ্দুর পোহাচ্ছে ঘড়িয়াল। নদীর

জলে ভেসে বেড়াচ্ছে বিরাট বিরাট মহাশোলের ঝাঁক। জল এত স্বচ্ছ যে মাছের ছায়া পড়ছে জলের তলায়— সেটাও দিব্যি দেখা যাচ্ছে। চোখে পড়ল চিতলের দল, বার্কিং ডিয়ার। আর মনে ধরল ছোট্ট বাচ্চাকে নিয়ে সম্বর মায়ের সতর্ক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকা। অনাবিল সুন্দর রাস্তা। বড় বড় ঝোরার শুকনো খাতের ওপর পড়ে থাকা পাথরের ওপর দিয়ে যাওয়া। বর্ষায় এ রাস্তা অগম্য হয়। একসময় খিনাউলি এলাম। বাংলো ক্যাম্পাসটি দারুণ সুন্দর। তিনটি ঘর। ভি আই পি না হলে থাকার সুযোগ পাওয়া মুশকিল। ওয়াচ টাওয়ারটি বেশ উঁচু। ওপরে উঠে পাখির চোখে করবেট দর্শন। দূরে নীল পাহাড়ের সারি আর জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে গেছে গভীর নীল রামগঙ্গা। খুব মনে পড়ল নামদাফার নোয়াডিহিং নদীটির কথা। পড়ন্ত রৌদ্রে চারপাশ মায়াবী হয়ে ওঠে। সম্বরের অ্যালার্ম কল কোথা থেকে যেন ভেসে এল।

তৃতীয়দিন সকালে সোজা ধিকালার উদ্দেশে রওনা হলাম। খিনাউলির পর জঙ্গল বদলাতে শুরু করে। ক্রমশ শালের জঙ্গল শেষ হয়ে শুরু হয় ঘাসবনের জঙ্গল। যতদূর চোখ যায় এলিফ্যান্ট গ্রাসের প্রান্তর। সত্যি বুঝলাম কাকে বলে এলিফ্যান্ট গ্রাস। গোটা তিনেক হাতি সেই লম্বা ঘাসবনে একরকম যেন ডুবে আছে। পিঠটুকু জেগে আছে শুধু। দুদিকে ঘাসবনের মধ্য দিয়ে রাস্তা চলে গেছে রামগঙ্গার বুকে। গাড়ি থামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। চুপচাপ। ব্ল্যাক প্যাট্রিজের কালো আর উজ্জ্বল কমলা রঙের ছেলেটি টুকটুক করে ঘাসবন থেকে বেরিয়ে এসে, খানিক রাস্তা ধরে চলে— আবার ঢুকে যায়। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ধিকালার বাংলোর সামনে দাঁড়াই কিছুক্ষণ। প্রচুর থাকার ঘর, অনেক লোক আর গাড়ির ভিড়। প্রথম দর্শনে ভালো লাগে না— আমাদের নিরিবিলি গৈরালই ভালো। ফিরতে ফিরতে সাক্ষাৎ হয় হস্তিযুগলের সঙ্গে। পাহাড়ের ধার ঘেঁসে, সবুজ প্রান্তরে তাদের প্রস্তরবৎ মূর্তি— আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি।

দুপুরে বাংলোয় লাঞ্চ সেরে ফেরার পালা। এখন যাব করবেটেরই স্মৃতিবিজড়িত মুক্তেশ্বরে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে সরাসরি জিম করবেট জাতীয় উদ্যান যেতে হলে রেলপথে নামতে হবে মোরাদাবাদ। মোরাদাবাদ থেকে ট্রেন পরিবর্তন করে পৌঁছতে হবে জাতীয় উদ্যানের নিকটতম স্টেশন রামনগর। রেলস্টেশন থেকে জাতীয় উদ্যানের দূরত্ব ৪৯ কিলোমিটার। রামনগর থেকে বাস যাচ্ছে করবেটের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত। সরাসরি মোবাদাবাদ যাচ্ছে হাওড়া থেকে হাওড়া-জম্মু-তাওয়াই হিমগিরি এক্সপ্রেস, দুন এক্সপ্রেস, অমৃতসর মেল, অমৃতসর এক্সপ্রেস, দেরাদুন-উপাসনা এক্সপ্রেস। শিয়ালদা থেকে শিয়ালদা-জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস, অকাল তখত এক্সপ্রেস। কলকাতা থেকে

মোরাদাবাদের দূরত্ব ১,৩০৫ কিলোমিটার। মোরাদাবাদ হয়ে রামনগর যাচ্ছে ৫০১৩এ দিল্লি-রামনগর করবেট পার্ক লিঙ্ক এক্সপ্রেস। ট্রেনটি দিল্লি ছেড়ে মোরাদাবাদ পৌঁছয় ভোর ২টো ১৫ মিনিটে এবং মোরাদাবাদ ছেড়ে রামনগর পৌঁছচ্ছে ভোর ৪টে ৪৫ মিনিটে।

কোথায় থাকবেন

জাতীয় উদ্যানের আশপাশে থাকার ব্যবস্থা হিসেবে রয়েছে রামনগরে কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের ট্যুরিস্ট হলিডে রিসর্ট (☎২৫১২২৫)। দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫৫০ টাকা। আর ধাকুলিতে রয়েছে টেন্টের ব্যবস্থা। ভাড়া ৫৫০ টাকা। বুকিং করতে হবে রামনগর থেকেই। এছাড়া রয়েছে প্রচুর বেসরকারি হলিডে রিসর্ট।
জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্তরে রয়েছে বনদপ্তরের পাঁচটি বাংলো— সুলতান, বিজরানী, গৈরাল, খিনাউলি ও ধিকালা। বনদপ্তরের বাংলো এবং পারমিটের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:

ফিল্ড ডিরেক্টর
টাইগার প্রোজেক্ট, রামনগর, উত্তরাঞ্চল ☎২৫১৪৮৯
কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের হলিডে রিসর্ট ও তাঁবু বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:

কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম
৫০, জওহরলাল নেহরু রোড (দ্বিতীয় তল)
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-৭২৯৫
রামনগরের এস টি ডি কোড: ০৫৯৪৭।

'ভ্রমণ' এপ্রিল, ২০০৫

নামদাফার গভীরে

পার্থ দে

ডিসেম্বরের শীত শীত সকালে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে ঘণ্টাদেড়েকে পৌঁছে গেলাম ডিব্রুগড়। ডিব্রুগড় থেকে ঘণ্টাখানেক বাসে তিনসুকিয়া। তিনসুকিয়ায় রাত্রিবাস। পরদিন ভোরের বাসে ঘণ্টা চারেকে মিয়াও। মিয়াও থেকে জিপে ছাব্বিশ কিলোমিটার বনপথ। ঝোরা পেরিয়ে পৌঁছে যাব বনের গভীরে দেবান নদীর পাশে ছবির মতো সুন্দর ফরেস্ট বাংলোয়। তার পরদিন নামদাফার জঙ্গলে হেঁটে বেড়ানো। তাঁবুতে রাত্রিবাস। নামদাফা— সেই ছোটবেলার রহস্যময়ী 'নেফা'-র সবচেয়ে আজানা, সবচেয়ে দুর্গম জঙ্গল। আমাজনের রেন ফরেস্টে কোনওদিন যেতে পারব কিনা তো জানি না, আমার দেশে রেন ফরেস্টের স্বাদ নিতে এই আমার স্বর্গ। নামদাফার অধিকাংশ স্থানেই এখনও মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি— এমনকী মিলিটারির কাছেও যার কোনও নির্ভরযোগ্য মানচিত্র নেই। নীল পাহাড়ের কোলে এই সেই অরণ্য যেখানে দুশো ফুট উচ্চতার গাছেদের ছায়ায় বনপথ অন্ধকার হয়ে থাকে সারাদিন। এই সেই অরণ্য যেখানে সেদিনও ভারতের বুকে প্রথম আবিষ্কৃত হয় অতিক্ষুদ্র 'পাতাহরিণ'। এই সেই অরণ্য যেখানে পক্ষীপ্রেমীরা এখনও স্বপ্ন দেখে বহু বছর আগে লুপ্ত গোলাপি মাথার হাঁস পুনরাবিষ্কারের। এই সেই প্রকৃতিউদ্যান যেখান থেকে বটানিস্টরা খুঁজে পায় নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ।

অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং জেলায় ২০০০ বর্গকিলোমিটারের এই অরণ্য ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৮৩ সালে। এর মধ্যে ১৭৭ বর্গকিলোমিটার বাফার এরিয়া, বাকিটা কোর এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত। জঙ্গলের নাম নামদাফা হয়েছে নামদাফা নদীর নামে। নামদাফা নদীর জন্ম বরফাবৃত দাফাবুম শৃঙ্গ থেকে যা জঙ্গল চিরে একসময় মিলিত হয়েছে নোয়াডিহিং নদীর সঙ্গে। সম্ভবত নামদাফাই পৃথিবীর একমাত্র ন্যাশনাল পার্ক যা বিছিয়ে আছে দুশো মিটার থেকে চার হাজার পাঁচশো মিটার উচ্চতা পর্যন্ত। এই অসাধারণ উচ্চতা বৈচিত্রের কারণেই এখানের জৈববৈচিত্র এত আকর্ষণীয়। এ হল পৃথিবীর একমাত্র অরণ্য যেখানে বাঘ, লেপার্ড, ক্লাউডেড লেপার্ড, স্নো-লেপার্ড এই চারজনেরই দেখা পাওয়া যায়।

মিয়াও-তে ফিল্ড ডিরেক্টর, নামদাফা টাইগার রিজার্ভের অফিস থেকে যাবতীয় অনুমতিপত্র নিয়ে নিতে হবে। জঙ্গলে ঢোকার চেকপোস্ট আরও কয়েক কিলোমিটার

পর। রাস্তা মোটেই সুবিধার নয়। চেকপোস্ট পেরিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করতেই ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসে দিনের বেলাতেই। চারদিকে নানারকম পাখি ও পোকার ডাক। ডালে ডালে নেচে বেড়াচ্ছে লাল স্কারলেট মিনিভেটের ঝাঁক। এইরকম স্যাঁতস্যাঁতে রাস্তার শেষ হয় নোয়াডিহিংয়ের ধারে বেশ একটা সবুজ খোলা জায়গায় এসে। এখানেই নদীর পাশে দেবান বাংলো, ফরেস্ট অফিস, বনকর্মীদের কোয়ার্টার্র, ক্যান্টিন। সবই বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে। শীতের মিঠে রোদ। নীল পাহাড়। গাঢ় নীল নদী। নদীতে মার্গেনসার হাঁসেদের ঝাঁক, বড় পানকৌড়িদের কলোনি। ঘরের পাশেই ওড়াউড়ি করছে লেজঝোলা গ্রিন ম্যাগপাই, এমারেল্ড ডাভ। বনবিভাগের হাতি বাঁধা আছে একপাশে। সদ্য শেষ হওয়া ব্যাঘ্র গণনার কাজে টানা পরিশ্রম করে ওরাও ক্লান্ত। নইলে ট্যুরিস্টরা হাতির পিঠে করে জঙ্গলের গভীরে ঢুকতে পারেন। জঙ্গলের ভেতরে এমন চমৎকার বন্দোবস্ত, বনকর্মীদের অসম্ভব ভালো ব্যবহার— আর বেশি কী আশা করা যায়। সন্ধেবেলায় বহু আশা করে বসে থাকলাম উড়ুক্কু কাঠবিড়ালির জন্য। নিরাশ হতে হল, অথচ প্রায়ই নাকি দেখা যায় ওদের। রাত হতে নদী আর পাহাড়ের দিক থেকে বয়ে আসা ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়া হাত-পা জমিয়ে দিচ্ছিল। আর ছিল খুব কাছেপিঠে থেকে আসা বার্কিং ডিয়ারের আওয়াজ।

পরদিন ভোরবেলা ফরেস্টের হাতে টানা বোটে গভীর নীল নোয়াডিহিং পেরিয়ে ট্রেকিং শুরু। সঙ্গে আছেন ফরেস্ট গাইড রানাজি আর পোর্টাররা। রেন ফরেস্ট কাকে বলে মালুম পাওয়া গেল আস্তে আস্তে। তিন-চার ধাপের জঙ্গল। সবচেয়ে উঁচু গাছগুলি দেড়শো-দুশো ফুট— আকাশ ছুঁয়ে আছে। তার পরের ধাপে চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুটের বৃক্ষরাজি। আর নীচের ধাপে ফার্ন, লতাপাতায় ফুট দশেকের ঘন আন্ডারগ্রোথ। এত ঘন যে অসংখ্য পাখির ডাক শুনছি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। বনের মধ্য দিয়ে সরু পায়ে চলা পাহাড়ি রাস্তা ছেড়ে এদিক-ওদিক দু ফুটও যাবার উপায় নেই এর জন্য। এমনকী অনেক সময় রানাজিকে দা দিয়ে এই আন্ডারগ্রোথ কেটে রাস্তা করে নিতে হচ্ছে। তৃষ্ণা মেটাবার জন্য আছে রাস্তার পাশে ছোট ঝোরা। আঁজলা করে নিশ্চিন্তে জল পান করুন। খাঁটি মিনারেল ওয়াটার। হঠাৎই শুরু হল নৈঃশব্দ ভেঙে হুলুক গিবনের হুকু হুকু আওয়াজ। বাংলায় যে এদের বলে উল্লুক— ভুল কিছু নয়। উল্লুকের মতোই বিশ্রী, কর্ণবিদারী চেঁচামেচি। এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ নজরে এল শ-দেড়েক ফুট উঁচু ডালে স্বামী-স্ত্রী-সন্তান খুব উৎসাহ নিয়ে আমাদেরই লক্ষ করছে। ছেলেটি কালো, সাদা ভুরু, মেয়েটি আর বাচ্চাটি খয়েরি রঙের। সকলেরই বিরাট লম্বা হাত। বেশ কিছু সময় পর, ওই লম্বা হাতেই ডাল ধরে দোল খেতে খেতে গোটা পরিবার অদৃশ্য হল। ঘণ্টা পাঁচেক বাদে হর্নবিল পয়েন্ট পৌঁছলাম। এখানেই তাঁবুতে রাত্রিবাস। সারা বিকেল ধনেশের প্রত্যাশায় থেকেও দেখা পেলাম না, কেবল শুনতে পেলাম তাদের ডানা ঝাপটে উড়ে যাওয়ার প্রায় হেলিকপ্টারের মতো শব্দ। বন গভীর, গহন চারপাশে। নিজেদের সুরক্ষার কারণেই তাঁবুর বাইরে সারারাত আগুন জ্বালিয়ে রাখা হল।

পরদিন লম্বা হাঁটা, যতদূর মনে পড়ে আঠারো কিলোমিটার। বুলবুলাইয়া, রানিঝিল হয়ে নোয়াডিহিংয়ের ধারে এমবিয়ং। রাস্তা গভীর জঙ্গলেরই মধ্য দিয়ে, উপরন্তু ভালোই চড়াই-উতরাই। চলার পথের বর্ণনা নতুন কিছু নয়। এ রাস্তার বাঁকে বাঁকে বৈচিত্র নেই, বৈচিত্র আছে অরণ্যের গোপন কোণে। কোথাও ফুটে আছে অপূর্ব মালার মতো অর্কিড, কোথাও রক্তলাল ফুল একেবারে পায়ের নীচে, কোথাও ছোট পাখি সিলভার ইয়ার্ড মিমিয়া একবার দেখা দিয়েই ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল, কোথাও হলক গাছের ডানা লাগানো বীজ দুশো ফুট উঁচু থেকে হাওয়ায় ফ্যানের মতো ঘুরতে ঘুরতে মাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে বহুদূরে নিজের প্রজাতি রক্ষার বাণী বুকে নিয়ে, কোথাও হঠাৎই লেপার্ডের পাগমার্ক দেখে সাবধান হওয়া— পৃথিবীর প্রবীণতম অরণ্যকে এইভাবে অনুভব করে পথ চলা। রাস্তার মাঝে পড়ে থাকে বিরাট গাছের গুঁড়ি। দশ-বারো বছর পড়ে থাকতে থাকতে একদিন মাটির সঙ্গে মিশে যায়। রানিঝিলের জলে দেশলাই জ্বাললে জলতলের ওপরের বাতাস বেশ কিছুক্ষণ জ্বলতে থাকে। এও এক মজার দৃশ্য।

নোয়াডিহিংয়ের ধারে এমবিয়ং আসতে পেরতে হল মাথা সমান উঁচু টাইগার গ্রাস। সেখান থেকে একটু দূরত্ব রেখে তাঁবু খাটানো হল। দারুণ লাগছে বরফে ঢাকা দাফাবুমকে দেখতে। এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। কিছু দূরে দইমুখ। এখানে নামদাফা আর নোয়াডিহিং মিলিত হয়েছে। এই স্থানটিও কম সুন্দর নয়। টাইগার গ্রাস, ঘন অরণ্য, বরফাবৃত শৃঙ্গ, পাহাড়ি স্বচ্ছতোয়া নদী— এরই মাঝে ইতস্তত হেঁটে বেড়ানো, সম্বরের টাটকা পায়ের ছাপ, বাঘের কিছু পুরনো পাগমার্ক চোখে পড়া, নদীর মাছ বাঁশের মধ্যে ঢুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে এক অদ্ভুত স্বাদের রান্না, পোকার চাটনি, সারা রাত থেকে থেকে টাইগার গ্রাসের দিকে টর্চ মারা— সব মিলিয়ে এমবিয়ং এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

এমবিয়ংয়ে নামদাফা পেরিয়ে আরও তিন-চারদিনের রাস্তা ধরে হেঁটে পৌঁছনো যায় বিজয়নগর, গান্ধিগ্রাম। বার্মা সীমান্তের শেষ গ্রাম। এ যাত্রায় তা আর হল না। আমরা ফিরে চললাম। ফেরার পথে রাত কাটালাম রাজাজি ঝিলে। এখানে আন্ডারগ্রোথ অসম্ভব ঘন, জোঁকের উপদ্রবও বেশি। রাতে আগুন ছেড়ে দশ ফুট যেতেই বেশ ভয় ভয় লাগে।

ফেরার পথে আমার সাত বছরের কন্যা বনকর্মীদের কাছে বিশেষ অভ্যর্থনা পেল। ওর বয়সী কোনও মেয়ে এর আগে নামদাফার এত গভীরে রাত কাটায়নি।

যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারির শেষ। ঠান্ডার কামড় খুব বেশি নয়, তবু ভারি উলের জামা ভালো। জোঁক এবং পোকার সমস্যা আছে। যোগাযোগ:

ডিরেক্টর, নামদাফা প্রজেক্ট টাইগার

☎০৩৮০৭-২২২২৪৯ (অফিস) ☎০৩৮০৭-২২২২৫৩ (বাড়ি)

ডঃ এস এস চন্দ্রমণি, রিসার্চ অফিসার ☎০৩৮০৭-২২৩১২৬

'ভ্রমণ' জুন, ২০০৫

শীতের স্বর্গারোহিণী

অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

দিল্লির আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাস থেকে সরকারি বাসটা বেলা বারোটায় ছেড়ে ঘণ্টাছয়েকের মধ্যে পৌঁছে দিল দেরাদুন। বাসের ছাদ থেকে লটবহর নামানোর সময়ই এসে হাজির দেবেন্দার রানা আর শোভন মার্তোলিয়া। হাতে হাতে মালপত্র নিয়ে রাতের আশ্রয় মিলল হোটেলে। পরদিন ভোররাতে ঘুম চোখে উঠে বসলাম পুরোলার বাসে। আধোঘুম, আধো জাগরণে আমরা এগিয়ে চললাম পশ্চিম গাড়োয়ালের গহনে। দুপুর বারোটার মধ্যেই বাস এসে গেল পুরোলা। বাসযাত্রার আপাতত ইতি। খবর পাওয়া গেল সাঁকরির পথে অগণিত ধস। ফলে বাস তো যাচ্ছেই না। উপরন্তু কত বার যে পায়ে হেঁটে ধস পার হতে হবে তার ঠিক নেই।

পুরোলার বাজার থেকে একটা টাটা সুমোতে আমাদের পাঁচজনের দলের লটবহর এঁটে গেল। এগিয়ে চললাম মোরির পথে। পেরিয়ে এলাম জারমোলা পাস (৭,৫০০ ফুট)। মোরির একমাত্র টেলিফোন বুথের পাশেই পেয়ে গেলাম রামলাল পাঁওয়ারকে। ও আমার অপেক্ষাতেই ছিল। রামলালের কথাতেই জানা গেল সেদিন সাতসকালেই এক টাটকা ধসে নৈটওয়ারের পথও বিচ্ছিন্ন। নৈটওয়ারের ধসটির প্রান্ত অবধি গাড়ি আমাদের লটবহর সমেত নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেল পুরোলা (৫,৫০০ ফুট)। ঘাড়ে পিঠে করে সব লটবহর নিয়ে ধস পার হয়ে পৌঁছলাম নৈটওয়ার (৪,৬০০ ফুট)। ব্যবস্থা হল আরেকটি গাড়ির। কিন্তু সাঁকরির আগে আবার এক বিশাল ধস। অতএব আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এই ধসের অঞ্চলটার নাম ফাফরালা। পায়ে হেঁটে ধস পার হয়ে আবার একটি গাড়ির ব্যবস্থা। এইভাবে সারাদিনের ধকল শেষে দেরাদুন থেকে সাঁকরি ১৯৩ কিলোমিটার পথ আসতে গাড়ি বদলাতে হল চারবার। পথের ধারের ছোট্ট হোটেলে থাকাই ঠিক হল। সাঁকরির উচ্চতা ৫,০০০ ফুট। সন্ধে নামল। আমরা সারলাম কিছু জরুরি কেনাকাটা এবং মালবাহক নির্বাচন।

পরদিন সকাল সকাল জলখাবার সেরে ট্রেক শুরু তালুকার পথে। দূরত্ব ১২ কিলোমিটার। সাধারণত গাড়ি চলে এপথে। কিন্তু ধস এখানেও সঙ্গী। তাই গোটা পথটাই হাঁটা শ্রেয়। উপত্যকার কোল ঘেঁসে মনোরম পথ। নৈটওয়ারের পর

থেকেই গোটা অঞ্চলটাই 'গোবিন্দ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য'। লাগে বিশেষ প্রবেশকর। বিদেশি এবং ভারতীয়দের জন্য পৃথক মূল্য। আজকের পথ মৃদু চড়াই। ঘণ্টাতিনেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম তালুকা। উচ্চতা ৬,৫০০ ফুট। আশ্রয় নিলাম গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের পর্যটক আবাসে। আমাদের মালবাহকেরা এসে পৌঁছল আরও ঘণ্টাখানেক পরে। বাকি দিনটা কাটল নভেম্বরের মিঠে রোদে পিঠ রেখে এদিক সেদিক ঘুরে।

১৩ নভেম্বর ২০০৩, সকাল আটটার মধ্যেই ট্রেক শুরু। প্রথমে সামান্য উতরাই। তারপর প্রায় সমতল পথে তমসা নদীর বামতীর বেয়ে তিন কিলোমিটার উজানে গিয়ে পাওয়া গেল টাটমির নালা ও তমসার সঙ্গমস্থল। টাটমির নালা পেরিয়েই একটু উঁচুতে গাছের ছায়ায় একফালি সবুজ। পথ থেকে বেশ ওপরেই টাটমির গ্রাম। আরও এগিয়ে অপর দিকে নদীর পশ্চিম পারে গঙ্গাড় গ্রাম। এপারে ছোট্ট চা-দোকান। দুপুর একটার মধ্যে পৌঁছে গেলাম সীমা। উচ্চতা ৮,৩০০ ফুট। ঠাঁই মিলল গাড়োয়াল মণ্ডলের বাংলোয়। এই উপত্যকায় জি এম ভি এন-এর বাংলোগুলি নতুন কিন্তু এদের গঠনশৈলী দৃষ্টিনন্দন নয় মোটেই। স্থানীয় ঘরবাড়ির মধ্যে একেবারেই খাপছাড়া। নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হর-কি-দুনের যাত্রী নেই একদম। সীমা গ্রামের দোকানপাট সব বন্ধ। সবাই চলে গেছে ওসলা গ্রামে। বিকেল থেকেই পশ্চিম আকাশ জুড়ে সিরাম আর মিরো-কিউমুলাস মেঘের ছড়াছড়ি। খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাস। শঙ্কা নিয়েই শুতে গেলাম।

আশঙ্কা মতোই সকাল এল মেঘলা আকাশ নিয়ে। জলখাবার সেরে পথে নামা। তমসার বামতীর ধরে হালকা চড়াই পথ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই উঠে এলাম দেবসু বুগিয়ালে। কুয়াশায় দিগন্ত ঢাকা। নয়তো পুব আকাশে দেখা যেত কালানাগ এবং স্বর্গারোহিণী-৩ শৃঙ্গরাজি। দেবসু বুগিয়ালের পর পথ দ্রুত উতরাই বেয়ে নেমেছে রুইসারা নদীর ...তলে। ছোট্ট কাঠের সেতু পার হয়ে চলে এলাম অপরপাড়ে। পথ এবার আগাগোড়া রুইসারা নদীর ডানতীর ধরে। বেশ কিছুটা উপত্যকার উজানে ওঠার পর অরণ্যের আওতার শেষ। খোলামেলা তৃণভূমির পথে চড়াই পথ। ছ ঘণ্টা হাঁটার পর পৌঁছে গেলাম রুইসারা তাল। উচ্চতা ১২,০০০ ফুট। নিঃ উপত্যকায় নেমে গেছে ভেড়ার পালের শেষ দলটিও। রুইসারা হ্রদের জলের ওপর বরফের কঠিন আস্তরণ। শীত আসন্ন। তারই চিহ্ন চারদিকে।

রুইসারা তালের পাড়ে বনবিভাগের তৈরি ছোট্ট কুটিরে জমল আমাদের রান্নাঘর। ম্যাকপ্যাকের ছোট্ট, হালকা তাঁবুটা লাগাল নিউজিল্যান্ডের ডারেন হুক্স আর তার অস্ট্রেলিয়ার বন্ধু গ্লেন পিটার্স। রান্নাঘরের মৃদু আঁচে খোসগল্পে জমে উঠল সন্ধ্যা।

১৫ নভেম্বর, মেঘলা আকাশ। তুষারপাতের পূর্বাভাস। থমথমে আবহাওয়া। তারই মধ্যে পথ চলা শুরু। স্বর্গারোহিণী শৃঙ্গমালা থেকে নেমে আসা গিরিশিরা

ঢাল ধরে আজকের গন্তব্য কিয়ারকোটি। দক্ষিণে, রুইসারা নদীর অপরপাড়ে একের পর এক ছোট উপত্যকা। তাদের উজানে যমুনোত্রী এবং রুইসারা উপত্যকার জলবিভাজিকা গিরিশিরা। ছোট ছোট উপত্যকাগুলির নামও মজার। স্কি ভ্যালি-১, স্কি ভ্যালি-২, টুথ-এক্ ভ্যালি। স্কি ভ্যালি-২-এর উজানে রয়েছে ১৬,০১০ ফুট উচ্চতার বালি পাস। চারঘণ্টায় হেঁটে পৌঁছে গেলাম কিয়ারকোটি। উচ্চতা ১৩,৫০০ ফুট। মালবাহক বন্ধুরা ফিরে গেল সীমার পথে। আগামী দশ-বারো দিনের জন্য বসল আমাদের শিবির।

পশ্চিম গাড়োয়ালের রুইসারা উপত্যকায় এই শীতকালীন অভিযানের সদস্য নিউজিল্যান্ডের ডারেন হুক্স, অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন পিটার্স, সাঁকরির রামলাল পাঁওয়ার, যোশিমঠের দেবেন্দার রানা, শোভন মার্তোলিয়া এবং আমি। ১৬ নভেম্বর ছিল বেসক্যাম্পে বিশ্রাম এবং উচ্চতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর দিন। কিন্তু বিকেল থেকেই শুরু হল তুষারপাত। তুষারপাত চলল একনাগাড়ে পরবর্তী দুদিন। আমরা তাঁবুবন্দী হয়ে থাকলাম। ১৮ নভেম্বর, আবহাওয়া উন্নতির কোনও লক্ষণ নেই। তবু সিদ্ধান্ত নিলাম এক নম্বর শিবিরের পথে এগোব।

কিয়ারকোটি ছাড়ার পরই বিপজ্জনকভাবে আলগা, নরম তুষার আমাদের পদে পদে নাজেহাল করতে লাগল। নড়বড়ে মোরেন পাঁচিলের ওপর তুষারের প্রলেপ ব্যাপারটাকে করে তুলল আরও বিপজ্জনক। কালানাগ (২০,৯৫৬ ফুট) শৃঙ্গের নির্ধারিত এক নম্বর শিবিরের অল্প আগেই দেওবাসাতে লাগাতে হল প্রথম শিবির। বিকেলের দিকে বেড়ে গেল তুষারপাতের হার এবং ঝোড়ো হাওয়া। সারারাত তাঁবুর মধ্যে আলোচনা চলল। গত তিন-চার দিনে অবিরাম তুষারপাত কালানাগ শিখরের পথকে করে তুলেছে আরও বিপজ্জনক। গ্লেন পিটার্স ঝুঁকি নেওয়ার বেলায় সুখী নয়। ডারেনও ফিরে যেতে চাইল মূল শিবিরে। নরম তুষার কালানাগের শীর্ষে তৈরি করেছে বিশাল ঝুলন্ত কার্নিস। যে কোনও সময়ই যা নেমে আসতে পারে বিশাল অ্যাভালাঞ্চের রূপে। দেবেন্দার এবং আমি ফিরে আসাটা মেনে নিতে পারছিলাম না সহজে। কিন্তু সহ-অভিযাত্রীরা নিজেদের দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দিহান তাই আমাদেরও ফিরে আসা ছাড়া পথ ছিল না। কালানাগ শিখরে শীতকালে আরোহণ করার মতলব বাতিল করে পরদিন ফিরে চললাম কিয়ারকোটি।

২০ নভেম্বর, বিদেশি বন্ধুরা জানাল তারা শিখর আরোহণ না করে যেতে চায় বালি পাস-এর পথে। অতএব আমরা যথাসম্ভব মালপত্র নিজেদের পিঠে চাপিয়ে নেমে চললাম রুইসারা তালের পথে। আবহাওয়া এবার যেন ক্রমশ ভালো হচ্ছিল। মেঘলা আকাশ কেটে গিয়ে দেখা যাচ্ছিল নীলের আভাস। রুইসারা তাল নামার পথে লক্ষ করলাম বালি পাসের গোটা উপত্যকাটাই এক হাঁটু তুষারের তলায়। ডারেন এবং গ্লেন তবু উৎসাহ হারাল না। দিনদুয়েক রোদ্দুর উঠলে নরম তুষার অনেকটাই গলে যাবে। সেই আশাতেই বুক বেঁধে আমরা পৌঁছে গেলাম

রুইসারা তাল। পরদিন আরও একবার বেসক্যাম্প অঞ্চল থেকে বাকি মালপত্র নামিয়ে আনা হল রুইসারা তালে। রামলাল চলে গেল সাঁকরির পথে— মালবাহক জোগাড়ের আশায়। রুইসারার শিবিরে রয়ে গেলাম বাকি পাঁচজন।

রুইসারা তালের কাছে উত্তর-পূর্বদিক থেকে, অর্থাৎ স্বর্গারোহিণী শিখর অঞ্চল থেকে একটি ছোট নালা জন্ম নিয়ে মিশেছে রুইসারা নদীতে। আমার মন বলছিল এই পথে গেলে কেমন হয়! মানচিত্র বলছিল, এই নালার উজানে রয়েছে স্বর্গারোহিণীর তিনটি শিখর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, স্বর্গারোহিণী শিখরগুচ্ছের মোট ছয়টি শৃঙ্গ। উচ্চতা যথাক্রমে ২০,৫১২ ফুট, ২০,৪৯৫ ফুট, ২০,৩৫৮ ফুট, ১৯,৯৭৩ ফুট, ১৯,৬৩২ ফুট এবং ১৯,১৭৬ ফুট। রুইসারা তাল অঞ্চল থেকে উত্তর-পূর্বে খাড়া ঘাসের দেওয়াল বেয়ে উঠলে পৌঁছনো যাবে স্বর্গারোহিণীর এই তিনটি শৃঙ্গের পায়ের তলায়। তারা হল যথাক্রমে তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শিখর।

২২ নভেম্বর, ডারেন হুকস, গ্লেন পিটার্স এবং শোভন চলল বালি পাসের পথে। রুইসারা নদীর ওপর ছোট্ট কাঠের সেতু পার হয়ে তারা প্রবেশ করল স্কি ভ্যালি-২তে। সকাল থেকে ছয় ঘণ্টা চড়াই ভেঙে তারা তাঁবু লাগাল বালি পাসের তলায়। পরদিন ভোররাতে এক হাঁটু বরফ ভেঙে তারা পৌঁছল বালি পাসের শীর্ষে। বেশ কিছুটা সময় পাসের মাথায় কাটিয়ে ওরা ধরল রুইসারা তাল ফেরার পথ।

সেদিনই দেবেন্দার ও আমি যথাসম্ভব খাবারদাবার ও পাহাড় চড়ার সরঞ্জাম নিয়ে রওনা হলাম স্বর্গারোহিণী শিখরগুচ্ছের পথে। ছয় ঘণ্টা বুকভাঙা চড়াই ভেঙে উত্তর-পূর্ব মুখে চলার পর লাগালাম আমরা প্রথম শিবির। উচ্চতা প্রায় ১৬,০০০ ফুট। সেদিনের পথে আমরা পেলাম পুরনো কোনও এক অভিযানের চিহ্ন। তাদের ফেলে আসা প্লাস্টিকের অবশেষ। সম্ভবত রুইসারা তালের পর এটি ছিল তাদের প্রথম শিবির। আমরা অবশ্য দুদিনের পথ একদিনে পার হলাম। পরদিন অর্থাৎ ২৩ নভেম্বর, শিবির ছেড়ে উঠলাম এক বিশাল মোরেন দেওয়ালের শীর্ষে। চোখের সামনে খুলে গেল যেন এক অজানা সাম্রাজ্য। আমাদের সামনে স্বর্গারোহিণী ৩, ৫ এবং ৬ নম্বর শৃঙ্গ। এক বিশাল ভাঙাচোরা হিমবাহ। একটি হিমবাহ হ্রদও চোখে পড়ল। স্বর্গারোহিণী-৩কে দেখে মনে পড়ল দুদশক আগে এই হিমবাহ পথেই একটি দল পাঁচটি শিবির লাগিয়ে আরোহণ করেছিল শৃঙ্গটিতে। নজর দিলাম তার উত্তর-পশ্চিম গিরিশিরায় অবস্থিত পঞ্চম শৃঙ্গে। স্বর্গারোহিণী-৫ (১৯,৬৩২ ফুট) এবং ৬ নম্বর (১৯,১৭৬ ফুট) শিখরের ঠিক মাঝখান থেকে নেমে এসেছে এক বিশাল হিমপ্রপাত। বীভৎস তার চেহারা। হাজার হাজার বরফের স্তম্ভ তার সারা গায়ে। হিমপ্রপাতের ঠিক পায়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে যখন আমরা ক্লাইম্বিং বুটে কাঁটা লাগাচ্ছি— ঠিক তখনই বিকট শব্দ করে ভেঙে গেল একটি বরফের স্তম্ভ বা সেরাক। বুকের স্পন্দন বাড়িয়ে দিয়ে সে নেমে গেল দ্রুত।

দেবেন্দার ও আমি রজ্জুবদ্ধ হয়ে আরোহণ শুরু করলাম সেই বিশাল হিমপ্রপাতের দেওয়ালে। কঠিন বরফের দেওয়ালে ক্র্যাম্পন এবং আইসঅ্যাক্সের সাহায্যে ভারসাম্য রেখে স্পাইডারম্যানের মতো উঠে চলা। বিপজ্জনকভাবে ঝুলন্ত সেরাকগুলিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে উঠে চললাম দুজনে। দীর্ঘ সময় হাই-অল্টিচিউডে কাটানোয় দুজনেই শারীরিকভাবে অত্যন্ত সক্ষম। তাই অস্বভাবিক দ্রুততায় আমরা উঠে চললাম পাথরের মতো কঠিন বরফের সেই দেওয়াল বেয়ে। ১,৫০০ ফুটের হিমপ্রপাত পার হতে সময় লাগল চারঘণ্টা। তারপর সঙ্কীর্ণ তুষার গলি বেয়ে আরও দুঘণ্টার চেষ্টায় উঠে এলাম স্বর্গারোহিণীর পঞ্চম শৃঙ্গের শীর্ষে। আমার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত ক্যামেরা হতাশ করল। শাটার লক হয়ে বঞ্চিত হলাম দুর্লভ শিখরের ছবিতে। সময় নষ্ট না করে আবার নামার পথ ধরলাম।

কঠিন বরফের দেওয়াল দুপুরের রোদে এখন একটু নরম। বিপদের সম্ভাবনা এখনই বেশি। তাই আইস পিটন ব্যবহার করে দড়ি ঝুলিয়ে সাবধানে করলাম অবরোহণ। তারপর থিচ বাই থিচ রিলে সিস্টেমে নেমে এলাম দুর্গম সেরাক অঞ্চল। দিনের শেষে যখন আবার আমরা দুজন নেমে এলাম সমতলের নিরাপত্তায়— তখন দুজনেই খুব ক্লান্ত। পড়ন্ত বিকেলের আলোয় ফিরে এলাম প্রথম শিবিরে। কালো চা তৈরি করে খেয়ে তাঁবু গুটিয়ে ধরলাম রুইসারার পথ তৎক্ষণাৎ। সন্ধের অন্ধকার ঘন হবার আগেই পৌঁছে গেলাম রুইসারা তাল। ডারেন এবং গ্লেন তখন ক্যাম্পফায়ারের আঁচ পোহাতে ব্যস্ত। একটি দীর্ঘ দিনের মধুর সমাপ্তি হল। শেষ হল পশ্চিম গাড়োয়ালে আমাদের শীতকালীন অভিযান।

'ভ্রমণ' জানুয়ারি, ২০০৪

এস্কিমোদের দেশে

অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

এ বছরের মে মাসের শেষে কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে কোপেনহেগেন। সেখান থেকে বিমান বদল করে আইসল্যান্ডের রাজধানী রিকিয়াভিক। রিকিয়াভিক থেকে একটি ছোট ফকার ফিফটি বিমানে কুলুসুক। কুলসুক থেকে একটি ছোট হেলিকপ্টারে চেপে পৌঁছে গিয়েছিলাম পূর্ব গ্রিনল্যান্ডের সদর শহর তাসিলাকে।

কালালিৎ নুনাৎ

পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড। ২,১৭৫,৬০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে তার বিস্তার। উত্তর মেরুর নিকটতম এই ভূখণ্ডের নব্বই ভাগের কাছাকাছি অংশটাই বরফের চাদরে মোড়া। এর পোশাকি নাম 'ইনল্যান্ড আইস'। ইনল্যান্ড আইসের তুষার পাঁচশো থেকে একলক্ষ বছরের পুরনো। কোথাও কোথাও এর গভীরতা সাড়ে তিন মাইল।

বিশাল এই দ্বীপের তটরেখাটিই কেবল আইসক্যাপের আওতার বাইরে। তটরেখা তথা আইসক্যাপের সীমানা বরাবর রয়েছে অসংখ্য পর্বতশিখর। রয়েছে সমুদ্রের যোগসূত্রে অজস্র খাঁড়ি, উপসাগর। আর রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছোট ছোট বসতি। রয়েছে হাতে গোনা কয়েকটি আধা শহর, শহর। অর্থাৎ যেখানে হয়তো হাসপাতাল, স্কুল এবং দোকানপাট আছে। একমাত্র গ্রিনল্যান্ডের রাজধানী নুক-এ কয়েকটি রেস্তোরাঁ আছে। আধুনিকতার ছোঁয়া আছে নুকের পথেঘাটে।

গোটা গ্রিনল্যান্ডের জনসংখ্যা মাত্র ৫৬,০০০। তার ১৫ শতাংশ ডেনমার্কের লোক। বাকিরা গ্রিনল্যান্ডের আদি বাসিন্দা 'এস্কিমো'! তাদের ভাষায় গ্রিনল্যান্ডের আসল নাম 'কালালিৎ নুনাৎ'।

ইনুইট

এস্কিমো শব্দটা কিন্তু অচল আজকের গ্রিনল্যান্ডে। 'এস্কিমো' কথার অর্থ কাঁচা মাংস ভক্ষক। আজকের গ্রিনল্যান্ডবাসী অনেকটাই আধুনিক। তারা কেবল টিভি দেখে, ইন্টারনেট ঘাঁটে এবং ডেনিশ বিয়ার খায়। এস্কিমো থেকে আজ তাদের বলা

হয় ইনুইট, যার অর্থ মানুষ।

ছোটবেলায় ভূগোল বইতে পড়া এস্কিমোদের দেশ আজ আর ঠিক সেইরকম নেই। আসলে দেশটা একই আছে। মানুষগুলো বদলে গেছে। বদলে গেছে তাদের পোশাক। ইগলুতে তারা আর থাকে না। ডেনমার্ক ঘরানায় তৈরি সুন্দর কাঠের তৈরি কটেজে তারা থাকে। মাতৃভাষা ছাড়া একমাত্র ডেনিশ ভাষায় তারা কথা বলতে পারে এবং বুঝতে পারে। এখনও পর্যন্ত গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের শাসনাধীন। স্বায়ত্তশাসনের কথাবার্তা অবশ্য এগোচ্ছে।

যদিও তথাকথিত পশ্চিমী সভ্যতার আঁচ ইনুইটরা পেয়েছে, তবুও হারিয়ে যায়নি তাদের নিজস্বতা। আজও তারা শিকার করে। তবে হারপুন দিয়ে নয়। আধুনিক রাইফেল দিয়ে। সিলমাছ, তিমি, পোলারবিয়ার, ওয়ালরাশ, মাস্ক অক্সেন— কিছুই বাদ যায় না শিকারের তালিকা থেকে। ডেনমার্ক থেকে প্রচুর পরিমাণে ভালোমন্দ খাবারদাবার জাহাজ চেপে এলেও কাঁচা মাছ ও কাঁচা মাংস এখনও পছন্দের তালিকার শীর্ষে। তাসিলাক ও কুলুসুকে থাকার সময় আমিও কাঁচা মাছ হেলা ও ল্যাক্স খেয়েছি। খেয়েছি রোদে শুকানো কাঁচা কড মাছ। মন্দ লাগেনি। শুকনো কড মাছ তো ইনুইট শিশুদের দারুণ প্রিয় স্ন্যাক্স। খেয়েছি তিমির মাংস। সত্যিই সুস্বাদু! সিল শিকার করলেও চেখে দেখা হয়নি তার স্বাদ। তবে দেখেছি গঙ্গার ইলিশের মতোই তার চাহিদা।

প্রত্যেক পরিবারেরই আট-দশটা করে স্লেজ টানার কুকুর আছে। নভেম্বর থেকে এপ্রিল— পুরু বরফে ঢাকা পড়ে যায় গোটা গ্রিনল্যান্ড। তখন কুকুর টানা স্লেজ গাড়িই একমাত্র ভরসা। গ্রামবাংলার গরুর গাড়ির মতোই এই বাহন কণ্ঠস্বর-নির্ভর।

সবুজ নয় গ্রিনল্যান্ড

নামটা 'গ্রিন' হলে কী হবে, সবুজের দেখা পাওয়া ভার এ দেশে। একমাত্র দক্ষিণ গ্রিনল্যান্ডের কিছু অংশে সবুজ ঘাস-গুল্ম পাওয়া যায়। বাকি দেশটা তো ঢাকা বরফে। আর তার মধ্য থেকে উঁকি দিচ্ছে কালো গ্র্যানাইটের পাহাড়। আসলে ৯৬০ খ্রিস্টাব্দে আইসল্যান্ড দ্বীপ থেকে এরিক দ্য রেড নামে এক ভাইকিং জলপথে প্রথম এসে পৌঁছয় দক্ষিণ গ্রিনল্যান্ডের উপকূলে। আইসল্যান্ড ধূসর লাভার দেশ। সেখান থেকে এসে দক্ষিণ গ্রিনল্যান্ডের ঘাসজমি দেখে বেজায় খুশি হয় এরিক। দেশে ফিরে সবাইকে সে বলে এই সবুজ দেশের কথা। সেই থেকেই দ্বীপটার নাম দাঁড়িয়ে যায় গ্রিনল্যান্ড।

গ্রিনল্যান্ডের আসল রং হল নীল। বরফের নীল, আকাশের নীল, সাগরের নীল আর হিমশৈলের নীল। সবের মধ্যেই এক অপার্থিব নীলিমা। মোটামুটি চার রকমের বরফ দেখা যায় গ্রিনল্যান্ডে। হিমবাহের বরফ, আইস ফ্লো, প্যাক আইস এবং হিমশৈল।

গোটা গ্রিনল্যান্ডের মধ্যে পূর্ব গ্রিনল্যান্ডকেই বলা যায় সবচেয়ে কম পর্যটকের দেখা দেশ। সবেমাত্র একশো বছর হয়েছে পূর্ব গ্রিনল্যান্ডে পা দিয়েছে পাশ্চাত্যের মানুষ। ফলে ইনুইটদের আদি ও অকৃত্রিম ব্যাপারটা এখনও কিছুটা রয়েছে এই পূর্ব গ্রিনল্যান্ডেই। গোটা সাত-আট গ্রাম আর একটা আধা শহর— এই নিয়েই পূর্ব গ্রিনল্যান্ড। আয়তনে গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, ইতালি ও ফ্রান্সের মিলিত আকারের থেকে বড়। কিন্তু বাসিন্দা মাত্র সাড়ে তিন হাজার ইনুইট। পূর্ব গ্রিনল্যান্ডের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কুলুসুক। এবং তার সদর শহর তাসিলাক। আমার গন্তব্য ছিল এখানেই।

পোলহেলমস ফেল্ড

তাসিলাকে পৌঁছনোর পরদিন থেকেই আবহাওয়া খারাপ। সারাদিনই মেঘলা আকাশ। টিপটিপ করে বৃষ্টি। অবশ্য মজার ব্যাপার হল দিন ও রাতের পার্থক্য ছিল না তাসিলাকে। কারণ আকাশে থাকত মধ্যরাতের সূর্য। জুন-জুলাই মাসে সূর্য অস্ত যায় না এখানে। রাত দুপুরেও দিব্যি দিনের আলো।

তাসিলাক যাওয়ার পরিকল্পনা পর্বেই ই-মেল মারফত আলাপ হয়েছিল মার্টিন ম্যাডসেনের সঙ্গে। মার্টিন ডেনিশ। থাকে তাসিলাকেই। হোটেল ন্যানসেনের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া সে একজন শক্তিশালী পর্বতারোহীও বটে।

প্রথম দিনেই মার্টিন বলেছিল,' যদি ক্লাইম্বিংই করতে চাও তাহলে চড়ো ওই পাহাড়টায়। বলে আঙুল দেখিয়ে চিনিয়েছিল আমার অভীষ্টকে। মার্টিন বলে যাচ্ছিল, পাহাড়টার নাম পোলহেলমস ফেল্ড। উচ্চতা ১,০০৩ মিটার। তাসিলাক জেলার সবচেয়ে উঁচু আর সবথেকে কঠিন পিক। বাকি যত পাহাড় দেখছ সবই সহজ। কিছুটা হেঁটে, কিছুটা হাঁচোড় পাঁচোড় করে ওঠা যায়। কিন্তু আসল উত্তেজক ক্লাইম্ব করতে চাইলে যাও পোলহেলমসে।

মার্টিন বকে যাচ্ছিল। আমি হারিয়ে যাচ্ছিলাম পাহাড়টার গিরিশিরায়। শিখরটি দেখতে ঠিক যেন নেপালের আমাদাবলাম। তুষারবিহীন আমাদাবলাম। মনে মনে ছকার চেষ্টা করেছিলাম শিখরে ওঠার পথ। ভাবছিলাম পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের পর্বতারোহীর ইগোকে উসকে দিতে পারে এই পাহাড়টা। অনেকেই বলেন, পর্বতারোহীরা পাহাড় চড়েন নিজেদের ইগো স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য। কথাটা অনেকটাই সত্যি মনে হল আমার।

বোধহয় মনের কথা পড়ে ফেলেছিল মার্টিন। সে বলল, যদি যাবেই স্থির করো তো অ্যান্ডার্সের সঙ্গে দেখা করে নিও। ও এখানকার পর্যটন অফিসার। পোলহেলম ফেল্ড ক্লাইম্ব করতে যাওয়ার আগে ওকে জানিয়ে যাওয়া জরুরি। যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে ওই একমাত্র উদ্ধারের ব্যবস্থা নিতে পারবে।

দিনদুয়েক পরে ট্যুরিস্ট অফিসে যেতেই পেয়ে গেলাম অ্যান্ডার্সকে। অ্যান্ডার্স স্টেনবাকেন' পূর্ব গ্রিনল্যান্ডের একমাত্র ট্যুরিস্ট ম্যানেজার। পাশাপাশি এক

পৃথিবীবিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চার রেস 'আর্কটিক টিম চ্যালেঞ্জ'-এর ডিরেক্টর। হাত মেলাতে মেলাতে অ্যান্ডার্স বলল, মার্টিন আমায় তোমার কথা বলে রেখেছে। তুমি পোলহেলমসে উঠতে চাও। কিন্তু একা ব্যাপারটা একটু বেশিই ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে না কি? আমি বললাম, কিছু করার নেই। আমি তো একাই। তাছাড়া ওই পাহাড়টা চড়তে আমায় হবেই।

কথা না বাড়িয়ে অ্যান্ডার্স ম্যাপ খুলে পোলহেলমসের ভূগোলটা বোঝাতে লাগল। আগের কিছু আরোহীর তোলা বিভিন্ন ছবিও অ্যান্ডার্সের কাছে ছিল। তা দেখে বোঝা গেল, সামিট অর্থাৎ শীর্ষের ঠিক নীচেই রয়েছে একটা নব্বই ডিগ্রি খাড়া পাথরের দেওয়াল। যার গায়ে ঝোলাতে হবে একটা দড়ির মই। শিখরে পৌঁছনোর গিরিশিরা পুরোটাই পাথুরে। কিন্তু পাহাড়ের গোড়ার অংশে রয়েছে নরম তুষারের চাদর। তাসিলাক থেকে মোটর বোটে চেপে প্রথমে পার হতে হবে Kong Oscar's Haun নামের উপসাগর। নৌকো বাঁধা থাকবে পাহাড়ের গোড়ায়। তারপর শুরু হবে ক্লাইম্ব! কিন্তু, একা! একটু একটু ভয় এবার আমারও করতে লাগল।

পরদিন উঠলাম সোম্যান্ডস ফেল্ড নামের এক পাহাড়ে। পাহাড় চড়ার কোনও পদ্ধতি বা শৈলী এই পাহাড় চড়তে লাগে না। হেঁটে ওঠা। তবে গ্রিনল্যান্ডের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যই এই পাহাড় চড়াটা জরুরি ছিল। সেদিন বিকেলে আবার দেখা হল অ্যান্ডার্সের সঙ্গে। অ্যান্ডার্স বলল, তোমার ক্লাইম্বিং পার্টনার যোগাড় করে ফেলেছি। দারুণ খবর! একজন বেলজিয়ামের বাসিন্দা। অন্যজন নরওয়ের। ওরা আছে হোটেল ন্যানসেনে। ওদের সঙ্গে যাবে মিকেল। মিকেল ডেনমার্কের ছেলে। তাসিলাকের স্কুল শিক্ষক। মিকেল একজন শক্তিশালী পর্বতারোহীও বটে। এর আগে পাঁচবার পোলহেলম ফেল্ড ক্লাইম্ব করেছে মিকেল। তাই অ্যান্ডার্সের বিশ্বাস মিকেল দলে থাকায় অভিযানটা নিশ্চিত এবং নিরাপদ হবে।

আরোহণ

৩ জুন, ২০০৪। সকাল থেকেই আবহাওয়া খারাপ। এমন দিনে পাহাড় চড়ার কথা ভাবতেও আমরা অভ্যস্ত নই। তাসিলাকের বন্দরে জড়ো হলাম আমরা চারজন। কেটল (নরওয়ে), পাস্কাল (বেলজিয়াম), মিকেল (ডেনমার্ক) আর আমি। সকলেই তৈরি পর্বতারোহণের সরঞ্জাম ও পোশাকে। ছোট্ট, সাদা মোটরবোটটা চালিয়ে এগিয়ে চললাম খাঁড়ির অন্য পাড়ে। কুয়াশা কেটে গিয়ে দেখা দিল পোলহেলম ফেল্ড। ডেনিশ ভাষায় ফেল্ড কথার অর্থ 'পাহাড়'।

বেশ কিছুক্ষণ হাড় কাঁপানো ঠান্ডার পর বোট পৌঁছল পোলহেলমসের পায়ের তলায়। পাথরে দড়ি দিয়ে নৌকোটা বেঁধেই আমাদের অভিযান শুরু হল। প্রথমেই খাঁড়িকে বাঁহাতে রেখে একটা সাবধানী ট্র্যাভার্স। জল থেকে সটান উঠে এসেছে

নরম তুষারের ঢাল। এদিক-ওদিক হলেই সোজা সমুদ্রের জলে। আর এখানকার সমুদ্রের জলে দশ মিনিট পড়ে থাকলেই মৃত্যুকে ডেকে আনা। সবসময় জলের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে।

তিন হাজার ফুটের খাড়া পাহাড়। জায়গায় জায়গায় আক্ষরিক অর্থেই ক্ষুরধার গিরিশিরা। স্বদেশে হলে দড়িদড়া না লাগিয়ে এগোতামই না। রোপ ফিক্স করা হত, একখানা সামিট ক্যাম্প করা হত, তবে ক্লাইম্ব করার কথা ভাবা যেত। কিন্তু এরা ফ্রি ক্লাইম্ব করে অভ্যস্ত, তাই বিন্দুমাত্র ভুলচুক হওয়া চলবে না। সমুদ্র সমতল থেকে একদিনে একটানা তিন হাজার ফুট উঠে আবার নেমে আসতে হবে।

এক ডানপিটে দৈত্যের মতো উঠে চলেছে মিকেল। তার ঠিক পিছনেই নিরাপদ দূরত্বে আমি। তারপর আসছে কেটল আর পাস্কাল। একটা নরম তুষারের সরু গালি বেয়ে উঠে পড়লাম পোলহেলমসের সেই গিরিশিরায়, যেটা সোজা উঠে গেছে শীর্ষে। বরফ আর নেই। এবার খাঁটি রক ক্লাইম্বিং। সরু গিরিশিরার দুদিকেই অন্তত দুহাজার ফুটের খাদ।

পড়ে যাওয়ার ভয়টাকে পেয়ে বসতে দেওয়া চলবে না। মুহূর্তের মানসিক দুর্বলতা সব শেষ করে দিতে পারে। সামনের দেওয়ালটায় কেবল কয়েকটা সংকীর্ণ পিঞ্চ হোল্ড। আঙুলের জোরে শরীরকে তুলতে হবে। গ্লাভস খুলতেই হল। কালো গ্র্যানাইটের দেওয়াল যেন বরফের ছুরি। শীতল পাথর যেন কামড়ে ধরছে আঙুলের চামড়া।

এবার একটা বিপজ্জনক ফ্রি ট্রাভার্স। তারপর একটা ফাটলে হাত আটকে ক্লাইম্ব। পৌঁছে গেলাম সামিটের পথে শেষ বাধা সেই দেওয়ালটার পায়ের তলায়। খাড়াই দেওয়াল দেখে পাস্কাল বেশ খুশি। চ্যালেঞ্জের মাত্রা যত বাড়ছে দলটা যেন আরও চনমনে হয়ে উঠছে। কয়েক মিনিটের শ্বাস রোধকরা ক্লাইম্ব। এক জায়গায় ব্যবহার করতে হল একটা দড়ির মই। তারপর খুব মসৃণ আর পিছল এক পাথরের গা বেয়ে হাল্কা চালে চড়া, তারপর সামিট। চারজন কোনওমতে পাশাপাশি বসা গেল।

মেঘ কাটল কিছুটা। অনেক দূরে পায়ের তলায় উপসাগরের নীল বিস্তার। চারদিকে গ্রিনল্যান্ডের অপার্থিব সুন্দর পাহাড়ের মিছিল। ভারত ছাড়ার আগে মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর হাত থেকে নেওয়া ভারতের পতাকা দিলাম কেটল আর মিকেলের হাতে। ছবি তুললাম। ঘড়িতে সময় তখন রাত আটটা। কিন্তু মিডনাইট সানের দৌলতে অন্ধকারের ছিটেফোঁটা নেই আকাশে।

নামার সময় অন্য পথ নিলাম। সামিটের নিচ থেকেই একটা স্নো গালি ধরে সটান নীচের স্নো বেসিনে। বোট চালিয়ে তাসিলাকের বন্দরে যখন পৌঁছলাম তখন রাত বারোটা। কেটল আর পাস্কাল ফিরে গেল ওদের হোটেলে। মিকেল ঘরে ফেরার আগে বলল, আগামীকাল ডিনারে তোমাদের নেমন্তন্ন রইল। চারজন অপরিচিত মানুষ। পৃথিবীর চার ভিন্ন দেশের নাগরিক। যাদের পরিচয় মাত্র

দুদিনের, হঠাৎই নিকট বন্ধু হয়ে গেলাম।

তথ্যের প্রয়োজনে জানিয়ে রাখা যেতে পারে, পোলহেলমস ফেল্ড সাধারণত ক্লাইম্ব হয় জুলাই-আগস্ট মাসে। আমাদের আরোহণ জুন মাসের গোড়ায়, ২০০৪-এর প্রথম ক্লাইম্ব। মিকেল যে আগে পাঁচবার পোলহেলম ক্লাইম্ব করেছে— কোনওদিনই জুন মাসে এ মুখো হয়নি। এবং অবশ্যই এই প্রথম কোনও ভারতীয় এই পাহাড়চুড়োয় পা রাখল।

কিন্তু এইসব রেকর্ড আসলে গৌণ গ্রিনল্যান্ডের ব্যাপ্ত প্রকৃতির কাছে। নেহাতই তুচ্ছ হঠাৎ গড়ে ওঠা নতুন সখ্যর কাছে। কারণ অ্যাডভেঞ্চারের প্রকৃতস্বরূপ সেটাই।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৪

কিলিমাঞ্জারোর চূড়ায়

অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

নাইরোবি বিমানবন্দরে পাসপোর্ট পরীক্ষা করতে করতে এক ইমিগ্রেশন অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, আমার তানজানিয়া যাবার উদ্দেশ্য। বললাম, কিলিমাঞ্জারো শিখরে ওঠাই আমার লক্ষ্য। শুধুমাত্র কিলিমাঞ্জারো চড়তেই এসেছি ব্যাপারটা বোধহয় বিশ্বাস হল না তাঁর। তাই একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি হল।

নাইরোবি থেকে আমার পরবর্তী গন্তব্য দার-এস-সালাম। উড়ান সকাল সাড়ে সাতটায়। ১৪ নম্বর গেট থেকে একরকম দৌড়েই যেতে হল ৪ নম্বর গেটে। চেক-ইন করলাম শেষ মুহূর্তে দার-এস-সালামগামী উড়ানে। একঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের উড়ান। সকাল নটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম দার-এস-সালাম বা সংক্ষেপে দার। বিমানবন্দর পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম। নাইরোবির মতো জাঁকজমক এখানে নেই। কিন্তু কোনও পর্যটক সহায়তা কেন্দ্র চোখে পড়ল না। অগত্যা রুকস্যাক ঘাড়ে বিমানবন্দর ত্যাগ করলাম। বিমানবন্দরেই একটি বিদেশি মুদ্রা বিনিময়ের দোকানে ঢুকে দেখি ভদ্রলোক ভারতীয়। ১০০ মার্কিন ডলার ভাঙিয়ে এক লক্ষ তেরো হাজার পাঁচশো তানজানিয়ান শিলিং পাওয়া গেল। আর খোঁজ পেলাম দার-এস-সালামের সস্তা হোটেলের, ট্যাক্সিভাড়ার মানচিত্র আর আরুশা যাবার বাসের হদিশ। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল যাবার পথেই পড়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়া বাস কোম্পানির অফিস। তাই মাঝরাস্তায় ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে কেটে নিলাম পরদিনের আরুশাগামী বাসের টিকিট। ভাড়া ১,৫০০ তানজানিয়ান শিলিং। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চোদ্দ ডলার।

দার-এ আস্তানা জুটল যে হোটেলটায়, তার নাম ইকনো লজ। নিবিয়া স্ট্রিটে তার অবস্থান। ছিমছাম সাধারণ মানের ঘর। বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট। অর্থাৎ ঘরভাড়ার মধ্যে প্রাতরাশের খরচা ধরাই আছে।

হাকুনা মাটাটার দেশে

দার-এস-সালামে একটা দিন কাটিয়ে বাস ধরলাম আরুশা যাবার। আরুশা হল তানজানিয়ার উত্তর প্রান্তের একটি ছোট্ট শহর। দার থেকে দূরত্ব প্রায় সাড়ে ছশো কিলোমিটার। বাসে সময় লাগল মাত্র নয় ঘণ্টা। তানজানিয়ার হাইওয়েগুলি

অসম্ভব ভালো, তাই গাড়ি চলে অত্যন্ত দ্রুত। রাতে হাইওয়েতে গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ। দুর্ঘটনা কমানোর জন্যই এমন ব্যবস্থা।

বাস চলছিল দুরন্ত গতিতে। কাচের জানালায় দৃশ্যপট বদলাচ্ছিল। কখনও লাল পাথুরে মাটি, কখনও ধু-ধু প্রান্তর, কখনও সবুজ ঢেউ খেলানো পাহাড়শ্রেণী, কখনও নদীর পাড়ে একলা গাছ বাওবাব। এ দেশে বাস করে ১২৩টির বেশি উপজাতি! তাদের প্রত্যেকের ভাষা পৃথক। তারা কথা বলে কিন্তু একটিই ভাষায়— সোয়াহিলি। ১২৩টি উপজাতি একে অপরের সঙ্গে কখনওই দাঙ্গা মারামারি করেনি। পড়শি রাষ্ট্র কঙ্গো, রোয়ান্ডা, উগান্ডা কিংবা জিম্বাবোয়ের সঙ্গে এখানেই তানজানিয়ার তফাত। স্বাধীনতার পর থেকেই এখানে সংসদীয় গণতন্ত্র। পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ হয়েও দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ প্রবল। অশিক্ষিত হয়েও মানুষ ভদ্র এবং সভ্য। আমার মনে হল অনেক কিছুই শেখার আছে পূর্ব আফ্রিকার এই মানুষগুলির কাছে।

বহু প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর হয়েও এই দেশ আজও দরিদ্র। তার অন্যতম কারণ অবশ্য বিদেশি শক্তির শোষণ। একসময় আরব, তারপর জার্মানি ও শেষে ব্রিটিশ সরকার নিঙড়ে নিয়ে গেছে আফ্রিকার সম্পদ। নিঙড়ে নিয়েছে, তবু শেষ হয়নি তার প্রাকৃতিক ভাণ্ডার। তানজানিয়া আজও সমৃদ্ধ হিরে, সোনা, মূল্যবান পাথর, প্রাকৃতিক গ্যাস, লোহা, টিন, ফসফেট, কয়লা এবং নিকেল-এ।

আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য! তার তো তুলনাই নেই। একদিকে রয়েছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টি জলের হ্রদ, নীল নদের উৎস লেক ভিক্টোরিয়া। রয়েছে পৃথিবীর দ্বিতীয় গভীরতম হ্রদ ট্যাঙ্গানিকা। আর রয়েছে মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো। কিলিমাঞ্জারো আফ্রিকা মহাদেশের উচ্চতম শৃঙ্গ (১৯,৩৪০ ফুট), পৃথিবীর উচ্চতম একক শৃঙ্গ, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ আগ্নেয়গিরি এবং সেভেন সামিটস-এর একটি। সেভেন সামিটস হল বিশ্বের সাতটি মহাদেশের সাতটি উচ্চতম শৃঙ্গ। সারা পৃথিবীর পর্বতারোহীদের কাছে সেভেন সামিটস আরোহণ করা এক দুর্দান্ত চ্যালেঞ্জ।

পৌঁছে গেলাম আরুশা। বন্ধু রেজিনা আমার অপেক্ষাই করছিল। ওর গাড়িতে উঠে পড়লাম। দশ মিনিটের মধ্যেই হোটেল লা জাকারান্ডা। উষ্ণ জলের অবগাহনে মুছে গেল সারাদিনের বাসযাত্রার ধকল। ভাবছিলাম সারাদিনে যত স্থানীয় মানুষের সঙ্গেই কথা বলেছি বারেবারেই তাদের মুখে একটা কথাই এসেছে। 'হাকুনা মাটাটা'! সোয়াহিলি ভাষার কথাটার অর্থ হল No Worries অর্থাৎ , চিন্তার কিছুই নেই! অপরিচিত মানুষও এখানে আলাপ জমান হেসে। সমস্যার সমাধান হতে এবং প্রশ্নের উত্তর পেতে মোটেই কাঠখড় পোড়াতে হয় না। সত্যিই এটা হাকুনা মাটাটার দেশ।

প্রস্তুতি

সারাদিন সকালটা ঘুরে বেড়ালাম আরুশার পথে-ঘাটে। ১২৫ বছরের পুরনো শহর। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন। ডাউন-টাউনে একটু ফেরিওয়ালাদের উপদ্রব আছে।

এদের বলা হয় 'মাচিংগা'। এরা সাধারণত ট্যুরিস্ট দেখলেই ছেঁকে ধরে। বিক্রি করে বাটিকের বেডশিট, স্থানীয় পোশাক 'কাংগা', কিংবা নানারকম হাতের কাজ। কেনাকাটায় সেই মুহূর্তে আগ্রহ ছিল না। তাই মাচিংগাদের পাশ কাটিয়ে চললাম। জার্মান রাজত্বের সময়ই তৈরি হয়েছিল এই শহর। শহরের পুরনো দিকটায় এখনও দেখা যায় পুরনো ধাঁচের বাংলোবাড়ি। তানজানিয়ার এই অংশটায় মূলত ছিল আরুশা এবং মেরু উপজাতির আদি বাসস্থান। পরবর্তীকালে অবশ্য মাসাইরাও ঢুকে পড়ে এবং আধিপত্য হয় মাসাইদেরই। মাসাইদের 'যুদ্ধং দেহি' ভাবের জন্য কেউই ওদের ঘাঁটায়নি। তাই আরুশা উপজাতির 'কিরুশা' ভাষাতেও মাসাইদের 'মা' ভাষার প্রভাব প্রবল। আরুশা শহরের আরও এক সৌন্দর্য হল মাউন্ট মেরু। মেরু একটি আগ্নেয়গিরি। অবশ্য ঘুমন্ত! শহরের প্রায় সব জায়গা থেকেই মেরুকে দেখা যায়। মেরুর উচ্চতা সাড়ে পনেরো হাজার ফুট।

বিকেলে রেজিনা এল আমার হোটেলে এবং শুরু হল কিলিমাঞ্জারো চড়ার প্রস্তুতি। অভিযান হবে আমার একার। সঙ্গে থাকবে তিনজন মালবাহক এবং একজন পাচক। এরা যাবে সামিট ক্যাম্প অর্থাৎ শিখর শিবির পর্যন্ত। তানজানিয়া সরকারের আইন অনুসারে একজন গাইড নেওয়া এখন আবশ্যিক। তাই একজন গাইডও থাকবে আমাদের দলে। কিলিমাঞ্জারোর শীর্ষে ওঠার সাত-আটটি প্রচলিত পথ রয়েছে। যেমন মারাংগু, লেমোশো মাচামে, ময়েকা, ওয়েস্টার্ন ব্রিচ ইত্যাদি। এদের মধ্যে সবথেকে সহজ এবং জনপ্রিয় রুটটি হল মারাংগু। তাই এর ডাক নাম 'কোকাকোলা রুট'। আর সবথেকে কঠিন বিচিত্র এবং আকর্ষণীয় পথটি হল 'মাচামে' রুট। এই পথের ডাক নাম তাই 'হুইস্কি' রুট। হুইস্কি রুটে সময়ও বেশি লাগে এবং বেশ কিছু জায়গায় পাথরের দেওয়াল বেয়ে উঠতে হয়। যাকে বলে Scramfling। উত্তেজনায় রাতে ঘুম এল না। কিলিমাঞ্জারো অভিযান তাহলে বাস্তব হতে চলেছে আমার জীবনে।

ক্লাউড ফরেস্ট

আরুশা ছেড়ে আমাদের ফোর হুইল ড্রাইভ গাড়ি মাচামে গ্রামের উদ্দেশে রওনা দিল। দেড় ঘণ্টার ড্রাইভ। পৌঁছে গেলাম মাচামে গ্রাম ছাড়িয়ে মাচামে গেট। কিলিমাঞ্জারো ন্যাশনাল পার্কের প্রবেশপথ। কিলিমাঞ্জারোর পাদদেশের সমতল-ভূমিতে বাস চাগা উপজাতির। গোটা পূর্ব আফ্রিকায় এরাই সবথেকে সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত উপজাতি। মাটিও এই অঞ্চলে খুব উর্বর। মূলত কফি, ভুট্টা আর কলার চাষ করে চাগারা।

যাইহোক, ন্যাশনাল পার্কের প্রবেশপথে প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র সংগ্রহ করা হল। মালবাহকদের বোঝা ভাগ করে দেওয়া হল। ২৫ কেজির বেশি বোঝা মালবাহকদের ঘাড়ে চাপানো সরকারিভাবে নিষিদ্ধ। বনরক্ষীদের কড়া নজর তার ওপর। দেখে ভালো লাগল। হাঁটা শুরু করলাম। আজ যেতে হবে ১৮ কিলোমিটার

পথ। হাঁটা শুরু ৫,০০০ ফুট উচ্চতা থেকে। আজকের ক্যাম্প হবে প্রায় ১০,০০০ ফুট উচ্চতায়। পথ চওড়া থেকে ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হতে লাগল। স্যাঁতসেঁতে, ভিজে বাতাস। তার ওপর ঘন কুয়াশা। ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে মাঝে মাঝে। সব মিলিয়ে রেন ফরেস্টের যোগ্য পরিবেশ। পথ কখনও চড়াই কখনও উতরাই।

কিলিমাঞ্জারোর পাদদেশের এই অরণ্যকে বলা হয় ক্লাউড ফরেস্ট। নামকরণ সার্থক। রয়েছে বিশাল ট্রি-ফার্ন, পোডোকার্পাস আর কর্পূর গাছ। এই ক্লাউড ফরেস্টের বাসিন্দা হল ব্লু মাঙ্কি, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কলোবাস এবং বুসবেবি (গালাগো)। লেপার্ডও আছে। তাদের খাদ্য অবশ্য মাউন্টেন রিডবাক এবং অ্যাবটস ডুইকার। রিডবাক এবং ডুইকার দুটিই অ্যান্টিলোপ বংশোদ্ভূত।

শেষদিকে পথ এবার শুধুই ঊর্ধ্বমুখী। শরীর যখন একেবারেই ক্লান্ত তখন হঠাৎ মেঘ কেটে গিয়ে দেখা দিল কিলিমাঞ্জারো। অনেক উঁচুতে আর মনে হল যেন বহু দূরে সেই শিখর। মাত্র পাঁচদিনে কী করে সেখানে পৌঁছব ভেবে পেলাম না। আজকের শিবির অরণ্য সীমার বাইরে। ট্রি-লাইনের ঊর্ধ্বে। ক্লাউড ফরেস্টের কুয়াশা আর স্যাঁতসেঁতে ভাব এখানে নেই। আজ থেকেই শুরু আমার দলের রাঁধুনি ম্যাটিয়াসের জাদু। নুডলস, মাংসের কিমা আর সেদ্ধ শাকসব্জি খেয়ে ঢলে পড়লাম গভীর ঘুমে।

শিরা-বারাংকো-বারাফু

পরদিনের হাঁটা মাত্র ৯ কিলোমিটার। কিন্তু উঠতে হবে আড়াই হাজার ফুট। আজকের হাঁটায় পৌঁছে গেলাম শিরা অঞ্চলে। উচ্চতা ১২,৫০০ ফুট। গাছপালা একদমই নেই এখানে। বৃষ্টিপাতের হারও একেবারেই কম। ধু ধু করছে লালচে লাভা আর ভলক্যানিক অ্যাশের মালভূমি। মাঝেমধ্যে কিছু ঝোপঝাড়। একে বলা হয় অ্যাফ্রো অ্যালপাইন মুরল্যান্ড। এই অঞ্চলেই দেখলাম অদ্ভুত সুন্দর গাছ লোবেলিয়া আর দৈত্যাকার সেনেসিও। একেকটা সেনেসিও-র বয়স প্রায় দুশো বছর।

শিরা ক্যাম্পে একরাত কাটিয়ে পরদিন চললাম বারাংকোর উদ্দেশে। লম্বা পথ। প্রায় সাড়ে পনেরো হাজার ফুট উচ্চতায় উঠে আবার দীর্ঘপথ নেমে আসতে পাওয়া গেল বারাংকোর ক্যাম্প। বারাংকো শিবিরের উচ্চতা সাড়ে বারো হাজার ফুট। বহু লোবেলিয়া আর সেনেসিও গাছের ভিড় এখানে। উত্তর দিক জুড়ে আছে কিলিমাঞ্জারোর দক্ষিণ দেওয়াল। পাঁচ হাজার ফুটের বেশি তার ঋজু উত্থান। তার গায়ে ঝুলে আছে কিছু হিমবাহ। আর পূর্বদিকে রয়েছে 'দ্য গ্রেট বারাংকো ওয়াল'— এক বিশাল পাথরের দেওয়াল। একে টপকাতে হবে আগামীকাল।

সারারাত ঝড়ের মতো হাওয়া বইল বারাংকো ক্যাম্পে। হাওয়ার গর্জনে ভালো করে ঘুমতেই পারলাম না। পরদিন বারাংকো ওয়াল বেয়ে উঠে চললাম। এক ঘণ্টায় পার হলাম বারাংকোর পাথুরে প্রাকার, তারপর দীর্ঘ নেমে চলা কারাংগা

ভ্যালির পথে। তারপর আবার চড়াই, এবার একটানা উঠে চলা। এবার কারাংগা শিবিরে না থেমে আমরা এগিয়ে চলি বারাফু ক্যাম্পের উদ্দেশে। বারাফু ক্যাম্পের উচ্চতা সাড়ে পনেরো হাজার ফুট। এটাই আমাদের সামিট ক্যাম্প। অর্থাৎ শিখরে ওঠার পথে এটাই শেষ শিবির। এক দীর্ঘ দিনের পথ চলার শেষে যখন বারাফু পৌঁছলাম তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল।

কিলিমাঞ্জারোর চূড়ায়

বারাফু শিবিরের পর থেকে শিখর পর্যন্ত অ্যাফ্রো অ্যালপাইন ডেজার্ট অঞ্চল। মূলত জমে জাওয়া লাভার গুঁড়ো আর ছাই। জল বা গাছপালার চিহ্ন নেই। কিলিমাঞ্জারোর এই দৃশ্যের জন্যই বোধহয় একসময় একে 'চাঁদের পাহাড়' বলা হত। রাত বারোটায় শুরু হল শিখর আরোহণ। পথ অত্যন্ত খাড়াই। সাড়ে পনেরো হাজার ফুট থেকে একদিনে চার হাজার ফুট আরোহণ করে আবার নেমে আসা দশ হাজার ফুটে সোজা কাজ নয়। হেডটর্চ জ্বালিয়ে একটা নির্দিষ্ট ছন্দে উঠে চললাম। ছুরির ফলার মতো বিঁধছে ঠান্ডা হাওয়া। মাঝে মাঝে আশ্রয় নিচ্ছি পাথরের আড়ালে, আবার উঠে বসছি। ছ ঘণ্টার সংগ্রামে পৌঁছে গেলাম স্টেলা পয়েন্ট-এ ১৮,৪০০ ফুট উচ্চতায়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে তাল রেখে উঠে চললাম বাকি পথটুকু। উঠতে হবে আরও এক হাজার ফুট। অবশেষে সকাল সাতটায় পৌঁছে গেলাম কিলিমাঞ্জারোর শীর্ষে (১৯,৩৪০ ফুট)। তানজানিয়া স্বাধীন হবার পর কিলিমাঞ্জারোর সর্বোচ্চ বিন্দুর নামকরণ হয়েছে উহুরু পিক। সোয়াহিলি ভাষায় 'উহুরু' কথার অর্থ 'স্বাধীনতা'।

সফল হল আমার অনেকদিনের স্বপ্ন। সফল হল আমার একক প্রচেষ্টায় কিলিমাঞ্জারো অভিযান।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

জলদাপাড়ার জঙ্গলে

কাজল দত্ত

শিলিগুড়ি থেকে সাতসকালে বেরিয়ে জয়গাঁগামী একটা বাসে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক বরাবর ময়নাগুড়ি, ধুপগুড়ি, গয়েরকাটা, বীরপাড়া হয়ে ঘণ্টা তিনেকে মাদারিহাটে এসেছি। গন্তব্য জলদাপাড়া অভয়ারণ্য। এই মাদারিহাটই জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের এন্ট্রি পয়েন্ট। মার্চ মাস কিন্তু গরম আছে। পথে বীরপাড়া বেশ বড়সড় জনপদ। এখান থেকে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ফালাকাটা হয়ে কোচবিহারের দিকে চলে গিয়েছে। বীরপাড়া থেকে মাদারিহাট সামান্য রাস্তা। অহরহ গাড়ি চলাচল করে। আবার মাদারিহাট পার হয়ে সামান্য এগোলেই হাসিমারা। পিচরাস্তার দুপাশে মাইলের পর মাইল চা-বাগান। এদিকটাতে বাগানগুলো সমতলে। পথ এগিয়েছে ভুটান সীমান্ত জয়গাঁ-ফুন্টশোলিংয়ের দিকে, পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের পরিচালনাধীন মাদারিহাটের জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজটি প্রায় রাস্তার পাশেই। আমাদের আগাম বুকিং রয়েছে, মাদারিহাট থেকে, জঙ্গলের গভীরে আরও সাত কিলোমিটার দূরে বনদপ্তরের হলং ফরেস্ট বাংলোয়।

জঙ্গলের পথে প্রবেশের মুখেই বনদপ্তরের চেকপোস্ট। মাদারিহাট থেকেই একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি নেওয়া হয়েছে হলংয়ে যাওয়ার জন্য। চেকপোস্টের খাতায় এন্ট্রি পারমিট দেখিয়ে, নামধাম নথিভুক্ত করিয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে মোরাম বিছানো পথে ঢুকতেই জঙ্গলের একটা হালকা মিষ্টি গন্ধ মন ভরিয়ে দিল। বসন্তের সমাগমে জঙ্গলে হরেকরকম ফুলের সুবাস। নিভৃত রাস্তার দুপাশে শাল, সেগুন আর লম্বা সাদা মসৃণ ইউক্যালিপ্টাসের সারি। অবশেষে এসে পড়ি হলং বাংলোর দোরগোড়ায়। জঙ্গলের গভীরে রাজকীয় বনবাংলো। দুপুরের খাওয়াদাওয়া সংলগ্ন ক্যান্টিনে।

জলদাপাড়ার খ্যাতি একশৃঙ্গী গণ্ডারের জন্য— রাইনোসোরাস ইউনিকর্নিস। অবাধ চোরাশিকারের ধাক্কায় লুপ্তপ্রায় এই প্রজাতির গণ্ডার সংরক্ষণের জন্য ১৯৪১ সালে গড়ে উঠেছে কোর এবং বাফার এরিয়া নিয়ে প্রায় ১২০ বর্গ কিলোমিটার এই অভয়ারণ্য। বেশ কয়েকটি গ্রামও রয়েছে এর মধ্যে। গণ্ডার ছাড়াও জলদাপাড়ায় রয়েছে প্রচুর বাইসন, স্পটেড ডিয়ার, বার্কিং ডিয়ার, সম্বর, হগ ডিয়ার, জংলী হাতি, বুনো শুয়োর, চিতাবাঘ প্রভৃতি। আর রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির সরীসৃপ এবং পাখি। বিশেষত এখানে প্রচুর ময়ূর রয়েছে। জঙ্গলমহলের

বুক চিরে বয়ে চলেছে তোর্সা নদী এবং সেইসঙ্গে মালঙ্গী।

বনবাংলোয় সামনের দিকে ঘর বরাদ্দ হল। এই ঘরগুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে ঘরের আরামকেদারায় বসে চা খেতে খেতে সামনের সল্ট লিকে জন্তু দেখা যায়। ঘরগুলোতে বাতানুকূল যন্ত্র বসানো আছে। অতিরিক্ত এ সি চার্জ দিলে এগুলো চালু করে দেওয়া হয়। খানিকটা মাচার ঢঙে কাঠের বাড়ি। অনেকগুলি ঘর এবং লাউঞ্জ আছে। সংলগ্ন ক্যান্টিনের ডাইনিং হলটিও সুদৃশ্য। নুড়িপাথর বিছানো রাস্তা, ফুলের বাগান ইত্যাদি নিয়ে সুবিশাল কমপ্লেক্স। পাশেই বনদপ্তরের বিট অফিস এবং বনকর্মীদের আবাস। বাংলোয় বিদ্যুৎ, টেলিফোন রয়েছে। জলের সরবরাহ ডিপ টিউবওয়েল থেকে।

এখানে আমরা থাকব দুটি রাত। সন্ধেবেলা বাংলোর বেড়ার বাইরে ঘোরাফেরা করা নিষেধ। বাংলোর সামনেই একটা সরু ঝোরা তিরতির করে বয়ে চলেছে। তার ঠিক সামনেই বিশাল ঘাসজমি। পিছনে ঘন সবুজ জঙ্গল। ঘাসজমিতে সল্ট লিক রয়েছে। অর্থাৎ এখানে মাটিতে নুন মিশিয়ে রাখা হয়। সেই নুনের লোভে দলে দলে জন্তু-জানোয়ারেরা আসে সেখানে মাটি চেটে খেতে। দিনকতক ধরে একটা দলছুট হাতি নাকি জঙ্গল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সন্ধের মুখে তার বৃংহনে আকাশ বাতাস মুখরিত হল। দেখি যে হাতিটি সল্ট লিকে দাঁড়িয়ে। আমরাও সতর্ক। বাংলোর সামনের ঝোরাটায় একটা শানবাঁধানো ঘাট রয়েছে। শেষ বিকেলে জমিয়ে আড্ডা চলছিল সেখানে। ঝোরার ওপারে জংলী হাতি। আমাদের উপস্থিতি তার না-পসন্দ। ক্যামেরা তাক করতেই হুঙ্কার ছাড়ল। ঝোরাটি বাঁদিকের জঙ্গলের মধ্যে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। আধো আলোয় তাকিয়ে দেখি বহুদূরে দুটি শিশু গণ্ডার ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছে। সারাটা বিকেল সেই ঘাসজমির সল্ট লিকটি একটি ময়ূর মাতিয়ে রেখেছিল। জংলী হাতি চড়াও হতে সেও উধাও। ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আমরা এসে বসলাম বাংলোর ক্যান্টিনের হাতায়। হাতে হাতে এসে পড়ল পেয়ালাভর্তি সুবাসিত দার্জিলিং চা। ব্যধ্যতামূলক খাদ্য তালিকার প্রাথমিক পর্ব।

বাংলোর অন্যান্য ঘরে আরও কয়েকটি পরিবার এসেছে। সবকটা শিশু খুব সহজেই নিজেদের মধ্যে ভাব করে নিয়েছে। তিনতলার লাউঞ্জে রঙিন টিভি ও ভিডিও মজুত। সেইসঙ্গে রয়েছে জঙ্গলের ওপরে নির্মিত অজস্র সিনেমা এবং তথ্যচিত্র। খুদে দর্শকদের চাহিদামতো চালু হল বিখ্যাত সিনেমা বর্ন ফ্রি। আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছি রাতের অন্ধকারে জন্তু দেখার আশায়। রাত আটটা নাগাদ লাউঞ্জ থেকে একজন বনকর্মী জঙ্গলে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সার্চলাইট ফেললেন। দেখা গেল খানকতক গণ্ডার। সল্টলিকে মহানন্দে নুন চেটে খাচ্ছে। রাতে ডিনার সেরে বাংলোর সামনে লনে এসে বসলাম। পূর্ণিমার চাঁদ তখন মাঝ আকাশে।

বনভ্রমণে অভিজ্ঞমাত্রেই জানেন রাতে জঙ্গলের একটা নিজস্ব রূপ আছে। জঙ্গলের রাত বেশ আকর্ষণীয়। রাতে জঙ্গলে একটানা ঝিঁঝির ডাক ছাড়াও অদ্ভুত সব আওয়াজ শোনা যায়। নিশাচরদের ঘুম ভাঙে তখন। দিনে আর যাই করুক না

করুক রাতে সব জানোয়ারই হাঁকডাক পাড়ে। বার্কিং ডিয়ার, কোটরা, হরিণ, বুনো কুকুর, পেঁচার ডাক এবং শুকনো পাতার ওপর দিয়ে সরীসৃপদের চলাচলের শব্দ— সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতি হল।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল বেড-টির হাঁকডাকে। কর্মরত বনকর্মী জানিয়ে দিলেন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে সকাল সকাল হাতির পিঠে গভীর জঙ্গলে ঘুরে নেওয়াই শ্রেয়। অন্যথায় মাদারিহাট থেকে ট্যুরিস্ট এসে হৈ হট্টগোল বাধিয়ে দেবে এবং তখন পুরো ব্যাপারটা পঁচিশে ডিসেম্বরের চিড়িয়াখানা হয়ে যাবে। চড়া রঙের রঙিন পোশাক, উগ্র সেন্ট আর ধূমপানে অভ্যস্ত মরসুমি ট্যুরিস্ট হাতির পিঠে গভীর জঙ্গলের অন্দরমহলে ঢুকবেন। সে যাইহোক হাতির পিঠে যুতসইভাবে বসা গেল। মাহুত স্থানীয় আদিবাসী বনকর্মী। ইউক্যালিপ্টাসের মিষ্টি গন্ধে চারদিক ম ম করছে। শান্ত নির্জন পথে হাতি চলল দুলকিচালে। পায়ের কাছে শিশু হাতি। মা সরকারি ডিউটি করার সময়েও আগলে রেখেছে। প্রথমে খানিকটা মোরেম রাস্তা ধরে পথ চলা। তারপথে হাতিগুলো সারিবদ্ধভাবে রাস্তা ছেড়ে ঘাসজমির পথে। তারপরে হলং বাংলোর সামনের সল্ট লিকের সেই ঘাসজমি পার হয়ে, নদীর স্রোত পার হয়ে গিয়ে ঢুকল গভীর জঙ্গলে। ঘন বনের পাশাপাশি রয়েছে হাতি সমান উঁচু এলিফ্যান্ট গ্রাসে ভর্তি ঘাসজমি এবং জলাজমি। জলকাদা মাড়িয়ে জঙ্গল ঠেলে এগিয়ে চলল হাতির দল। ভোরের নরম আলোয় জঙ্গল তখন যেন শিশিরস্নাত কুমারী। জঙ্গল গভীর থেকে গভীরতর হয়। বেশ বুঝতে পারি আমরা কোর এরিয়ায় এসে পড়েছি। এই অবস্থায় বাঁশগাছের ঝোপের কঞ্চির খোঁচায় চশমা, ক্যামেরা, ব্যাগ, টুপি সবই সামলানো দায় হল। অনবরত হাতে পায়ে খোঁচাখুঁচি চলল খানিকক্ষণ। জঙ্গলের এই অন্দরমহলে হাতি ছাড়া আসাই অসম্ভব। জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের এই অংশে নাকি বাঘেদের আস্তানা। মাহুত ইশারায় দেখিয়ে দিল বাঘেদের ন্যাচারাল হাইড আউট। ঘণ্টাখানেকের সফর বেশ ভালোই। জঙ্গলের অভ্যন্তরে অনবরত শোনা গেল পাখির ডাক। ফেরার সময়ে অন্যপথে আসা গণ্ডারের খোঁজ চলল অনেকক্ষণ। অবশেষে এলিফ্যান্ট গ্রাসের মধ্যে একটা গণ্ডারের সন্ধান পেতে একসঙ্গে চারটি হাতি ঘিরে ধরল। হতভম্ব গণ্ডারটি পালানোর পথ খুঁজতে লাগল। অবশেষে বনবাংলোয় ফিরে আসা। জঙ্গলমহলের চারদিক তখন কৃষ্ণচূড়া এবং পলাশের আগুনে লাল হয়ে রয়েছে।

বাংলোয় ফিরে প্রাতরাশ সেরে শুরু হল জমিয়ে আড্ডা। দুপুরের খাওয়া বাধ্যতামূলক নয়। যেহেতু আমরা সেদিনটা থেকে যাব তাই কিছুটা ফরমায়েশ মতো রাঁধিয়ে নেওয়া গেল। রোদের উত্তাপ কমতে বিকেলে বনদপ্তরের গাড়িতে বনপথে অরণ্যভ্রমণ শুরু হল। পথের ধারে অজস্র হরিণ এবং বাইসনের দেখা মিলল। সন্ধে নাগাদ আবার বাংলোয় হাজির। কেয়ারটেকারের পরামর্শমতো ফোন করিয়ে পরদিন গাড়ির জন্য আগাম ব্যবস্থা করতে হল। রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের অর্কেস্ট্রা শুনতে শুনতে মনে হল শুরু হল যাত্রা শেষের প্রস্তুতি।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

শিয়ালদা অথবা হাওড়া থেকে ট্রেনে সরাসরি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে রিকশা, অটো অথবা ট্যাক্সিতে পৌঁছে যান শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ডে। সেখান থেকে আলিপুরদুয়ার অথবা জায়গাঁগামী বাসে মাদারিহাট।

কোচবিহারের বাস ধরলে বীরপাড়ায় নেমে যেতে হবে। সেখান থেকে ভাড়ার গাড়িতে সরাসরি হলংয়ে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজটি প্রধান সড়কের ধারে। ফেরার পথে বীরপাড়া এসে বাস বা ট্যাক্সিতে শিলিগুড়ি চলা যেতে পারে। কারণ মাঝপথে মাদারিহাট থেকে বাসে উঠে বসার জায়গা পাওয়া কঠিন। শিলিগুড়ি থেকে মাদারিহাটের দূরত্ব ১৪০ কিলোমিটার।

কোথায় থাকবেন

মাদারিহাটে পর্যটন দপ্তরের জলদাপাড়া টুরিস্ট লজের ভাড়া ডর্মিটরিতে মাথাপিছু ৩০০ টাকা, দ্বিশয্যাঘরে ১,০০০ টাকা। বনদপ্তরের পরিচালনায় হলং ট্যুরিস্ট বাংলোর ভাড়া ডবল বেডে ১,০০০ টাকা প্রতিদিন। খাওয়া বাধ্যতামূলক। এই বাধ্যতামূলক অংশে মাথাপিছু ১৭৫ টাকায় বিকেলের চা, রাতের খাবার, সকালের চা এবং প্রাতরাশ ধরা আছে। দুপুরের খাওয়া এবং অন্যান্য খরচ আলাদা। মাদারিহাটে সাধারণ মানের কয়েকটি বেসরকারি হোটেল আছে। বীরপাড়াতেও লজ আছে।

কীভাবে বেড়াবেন

মাদারিহাটে থাকলে ট্যুরিস্ট কাউন্টারে বলে জঙ্গলের মধ্যে ঢোকার পারমিট এবং গাড়ির ব্যবস্থা করা যাবে। হলংয়ে রাত্রিবাস করতে চাইলে বীরপাড়া অথবা মাদারিহাট থেকে গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করতে হবে। প্রতিক্ষেত্রেই জঙ্গলের চেকপোস্টে গাড়ির জন্য এন্ট্রি ফি দিতে হয়। হলংয়ের ক্ষেত্রে জঙ্গলে ঢোকবার পারমিট বুকিংয়ের সঙ্গেই দিয়ে দেওয়া হয়। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে কোনও কারণে যাওয়া না হলে হলংয়ের বনবাংলোর বুকিংয়ের টাকা কিন্তু ফেরত দেওয়া হয় না। হাতির পিঠে এবং বনদপ্তরের গাড়িতে অরণ্যভ্রমণের চার্জ মাথাপিছু হিসাবে দিতে হয়। অরণ্যভ্রমণের নিয়মকানুন অবশ্যই মেনে চলা উচিত।

কখন যাবেন

প্রতিবছরে বর্ষার সময়ে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর জলদাপাড়া অভয়ারণ্য পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকে। অক্টোবর থেকে জুন খোলা থাকে। বসন্তকালে এই অঞ্চল ভ্রমণের উপযুক্ত সময়।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ:

Tourism Centre
West Bengal Tourism, 3/2, B B D Bag (East), Kolkata-700 001
☎ 2248-8271 Fax : +91-33-2248-5168
Website : www.wbtourism.com or www.westbengaltourism.com

'ভ্রমণ' জানুয়ারি, ২০০৩

বাগিনি হিমবাহ ও চ্যাংব্যাং বেসক্যাম্প

শান্তনব জানা

বিখ্যাত বাগিনি হিমবাহের সৌন্দর্যের প্রশস্তি পদযাত্রীদের মুখে শুনেছি। চ্যাংব্যাং, কলঙ্ক, দ্রোণাগিরি পর্বতাভিযানের বেসক্যাম্পও ওই অঞ্চলেই। তাই বাগিনির রূপ দর্শনের জন্য প্রথমে কালকা মেলে দিল্লি ও তারপরে বাসে করে হরিদ্বার এলাম ২৪ মে। হরিদ্বার থেকে সকালের বাস আমাদের বিকেলে যোশিমঠ নামিয়ে দিল। বাস থেকে নেমেই মহাবীর রানার হাসিমুখ দেখতে পেলাম। মহাবীর জনপ্রিয় গাইড রাজু ভাটের ভাগ্নে। গাইড দেবেন্দ্র রানার ভাইপো ও নিজেও গাইড। এখন যোশিমঠে এজেন্সি খুলেছে। আমরা যোশিমঠ আপার বাজারে হোটেল বিবেক-এ উঠলাম।

পরদিন প্রথমে গেলাম যোশিমঠে নন্দাদেবী জাতীয় উদ্যানের কার্যালয়ে। বাগিনি হিমবাহ নন্দাদেবী বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে পড়ে। তাই আবেদনপত্র ও ইকো ফি জমা দিতে হল। দেখা হল ডি এফ ও ব্যানার্জি সাহেবের সঙ্গে। ১৯৮২ সাল থেকে বন্ধ থাকার পর আবার ২০০৩ সালের মে মাসে খুলেছে জাতীয় উদ্যানের পথ। তবে আপাতত লতাখড়ক হয়ে ধরাসি পর্যন্তই যেতে দেওয়া হবে। আমরা ওখান থেকে অনুমোদনপত্র নিয়ে চলে এলাম এ ডি এম-এর কার্যালয়ে। এখানে পরিচয়পত্র দেখিয়ে ও ফটো জমা দিয়ে অনুমোদনপত্র সংগ্রহ করা হল। বিকেলের দিকে বাজার থেকে আনাজপত্র কিনে নিলাম। মূল রেশন আমরা সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

২৬ মে সকাল নটার বাস ধরে যোশিমঠ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে জুম্মা পৌঁছলাম প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ। সঙ্গে গাইড শোভন ও পোর্টার অশোক। জুম্মা থেকে একটু এগিয়ে চলে এলাম শ্যামা। এখান থেকে আমাদের হাঁটা শুরু। প্রথমে ধৌলিগঙ্গার ওপর ঝোলাপুল পার হয়ে রাস্তা ওপরে উঠে গেছে। এরপর পথ কখনও চড়াই, কখনও বা উতরাই। আবহাওয়া পরিষ্কার। সুন্দর পথ, হাঁটতেও ভালো লাগছে। এইভাবে প্রায় দেড়ঘণ্টা হাঁটার পর আমরা পৌঁছলাম তিন কিলোমিটার দূরে রুইং গ্রামে। চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর গ্রাম। অনেক নিচ দিয়ে ধৌলিগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। গোটা গ্রামটাই পাইন ও ফার গাছে ভরা। তবে গ্রামে বাড়িঘর বেশি নেই। আমরা আশ্রয় নিলাম গ্রামের এক কোণে ধর্মশালায়।

তিনখানা পাকা ঘর করা আছে। এখানে থাকতে এখনও কোনও টাকা লাগে না। গ্রামে কোনও স্কুল নেই। একটা গ্রিনহাউস দেখলাম। জড়ি-বুটির চাষ হচ্ছে। গ্রামে মেয়েদের কাজ করতে দেখলাম। প্রায় সবারই কপালে বেশ বড় ঝুড়ি ফিতে দিয়ে বাঁধা। পুরুষেরা ভেড়া ও গরু চরাতে পাহাড়ে গেছেন। ধর্মশালায় বসে দূরে মালারির রাস্তায় দুয়েকটা গাড়ির আনাগোনা দেখতে ভালোই লাগে। পূর্বদিকে দুটো পাহাড়ের মাঝে লাম্পাক গিরিশ্রেণী উঁকি মারছে।

বিকেলের দিকে দেখলাম গ্রামের কিছু পুরুষ ওপরের পাহাড় থেকে নেমে আসছেন। হাতে একটা করে পলিব্যাগ ঝোলানো। ভেতরে কিছু রয়েছে। কৌতূহল হল। একজনকে কাছে ডাকলাম। দেখি ভেতরে উৎকৃষ্ট মাশরুম। ওপরের পাহাড়ে হয়। গ্রামে বসেই ১,৬০০-১,৮০০ টাকা করে কিলো লোকে নিয়ে যায়। দেশি-বিদেশি হোটেলের মহার্ঘ পদ এই মাশরুম।

পরদিন আমরা সকাল আটটায় রুইং থেকে দ্রোণাগিরি গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। পাইন, দেবদারু ও ফারের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বমুখী রাস্তা। দ্রোণাগিরি নদীর পাড় ধরে প্রায় আধঘণ্টা হাঁটার পর দ্রোণাগিরি নদী দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। একটু এগিয়ে চলার পর বাগিনি নালার সঙ্গে প্রথম দেখা হল। দ্রোণাগিরি নদীর থেকে সরু, কিন্তু জল প্রচণ্ড বেগে বয়ে যাচ্ছে। মাঝে বাঁদিকে ছাজা ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড পেরিয়ে এলাম। ক্যাম্প করার সুন্দর জায়গা, জলও আছে। পথ এখন ক্রমশ ওপরে উঠছে। বাঁদিকের গিরিশ্রেণী আস্তে আস্তে উন্মুক্ত হচ্ছে। এরপর রিজ ধরে চলা। কখনও বোল্ডারের ওপর দিয়ে। কখনও ঝুরো পাহাড়ের পাশ দিয়ে। শেষদিকে পথে জলের অভাব। লজেন্স গালে পুরে হাঁটছি। এইভাবে তিনটি রিজ পেরোলাম। তারপর চাষের খেত ও পাথরের সীমানা চোখে পড়ল। দূরে দ্রোণাগিরি গ্রামও দেখা যাচ্ছে। গ্রামে প্রবেশ করলাম বেলা বারোটা নাগাদ। রুইং থেকে দূরত্ব সাত কিলোমিটার। বেশ বড় গ্রাম। গ্রামে দোতলা বাড়ির সংখ্যাই বেশি। পাথরের তৈরি দেওয়াল। ওপরে শ্লেটপাথরের ছাদ। গ্রামের সব লোকজন এখনও নিচ থেকে উঠে আসেননি। এই গ্রামটি চামোলি ও নন্দপ্রয়াগের মাঝে ম্যাঁঠারা গ্রামের গ্রামবাসীদের গ্রীষ্মাবাস। গ্রামে শিক্ষিতের হার বেশ ভালোই। আমরা গ্রাম ছাড়িয়ে উঠলাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের ছোট মাঠে। ওখানেই টেন্ট লাগানো হল। জায়গাটি ভালো, কিন্তু পশ্চিমদিক খোলা থাকায় দুপুরে খুব হাওয়া বয়। পাশেই গ্রামের অতিথিশালা। স্থানীয় লোকেরা বলেন 'মিলনকেন্দ্র'। একটাই ঘর। তার মধ্যে চারটি খাট পাতা আছে। তবে আমরা অতিথিশালার চাবি পাইনি। ফেরার পথে এখানে ছিলাম। তখনও চাবি পাইনি। খোলা জানলা দিয়ে অতিথিশালায় অনাহূত অতিথির মতো প্রবেশ করতে হয়েছিল। গ্রামের পিছনের পাহাড়ে কানাড়ি খাল দেখা যাচ্ছে। ওঠাই রিজের সর্বনিম্ন স্থান। গ্রামের মহিলামঙ্গল দলের কার্যালয়ে গিয়ে আমাদের জাতীয় উদ্যানের কার্যালয় থেকে আনা অনুমোদনপত্রের প্রতিলিপি জমা দিলাম। জেনে খুশি হলাম যে পদযাত্রীদের

ওপর ধার্য করা ইকো ফি-র টাকা রুইং ও দ্রোণাগিরি গ্রামের উন্নয়নে ব্যয় হয়।

২৮ মে সকাল আটটায় আমরা এখান থেকে বাগিনি খরক রওনা হলাম। গ্রামের ওপর দিয়ে পূর্বমুখী পথ। একটু পরেই রডোডেনড্রন জঙ্গলের মধ্যে পথ চলা। নীল ও সাদা রঙের ফুলই বেশি দেখলাম। অন্যান্য অ্যালপাইন ফুলও ফুটে আছে। দুটো রেডবিলড চাউ-র আকাশে পাক খাওয়া দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। সামনে পূর্ব দ্রোণাগিরি, সাতমিনল, ঋষিপাহাড়, হরদেউল পিকগুলি সকালের নরম আলো গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে হাতি পর্বত উঁকি মারছে। খানিকটা এগিয়ে বাগিনি নালার সঙ্গে আবার দেখা। দশ ইঞ্চির একটা নড়বড়ে লগের ওপর দিয়ে নালা পার হলাম। বাগিনি নালা আমাদের ডানদিকে চলে গেল। এরপর কতকগুলো রিজ পেরিয়ে প্রায় চারঘণ্টা হাঁটার পর পৌঁছলাম থাকাপানি। এটা একটা ক্যাম্পসাইট। আই টি বি পি-র জওয়ানেরা অনেক সময় এখানে ক্যাম্প লাগান। এখানে শুকনো খাবার ও লেমন জুস খেয়ে আবার হাঁটা শুরু। কিছুক্ষণ চলার পর শুরু হল মোরেন অঞ্চল। একটার পর একটা মোরেন অঞ্চলের ঢেউ আসছে। সঙ্গে চড়াই। দমে ঘাটতি হচ্ছে। বিশ্রাম নিচ্ছি কিছুক্ষণ পর পরই। আবার হাঁটছি। ইতিমধ্যে চলার মাঝে আবহাওয়া খারাপ হয়েছে। অল্প তুষারপাতও হল। দলের এক সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমরা বিকেল প্রায় চারটে নাগাদ বাগিনি খড়ক পৌঁছলাম। দ্রোণাগিরি গ্রাম থেকে এখানের দূরত্ব সাত কিলোমিটার। মেঘের দল আমাদের ঘিরে ফেলেছে। বিস্তীর্ণ ক্যাম্পসাইট। দেখি আরও ক্যাম্প লাগানো আছে। এক আমেরিকান দম্পতি কলঙ্ক অভিযানে গেছেন। এখানে কুক দীপেন্দর ও লিয়াজঁ অফিসার শঙ্কর রয়েছেন। ওঁদের কিচেন টেন্টেই আমাদের সবার রান্না হল। দীপেন্দর রুটি বানালেন, শোভন সবজি, শঙ্করের কামেট অভিযানের কাহিনী শুনতে শুনতে আমরা সঙ্গে আনা কে সি দাসের রসগোল্লার সদ্ব্যবহার করলাম। কিছু আমেরিকান দম্পতির জন্যও রাখলাম।

পরদিন অর্থাৎ ২৯ মে সকাল সাতটা নাগাদ আমাদের হাঁটা শুরু হল বাগিনি হিমবাহ ও তার পার্শ্ববর্তী পিকগুলোকে ভালো করে দেখার জন্য। আকাশ পরিষ্কার, ডানদিকে বাগিনি নালাকে রেখে ঘাসে ছাওয়া উপত্যকা দিয়ে চললাম। আধঘণ্টার মধ্যে চ্যাংব্যাং ও কলঙ্ক বেসক্যাম্প পৌঁছলাম। এখানেও ঘাসের রেখা আছে ও ওপর থেকে নালা নেমে এসেছে। জলের অসুবিধা নেই। তবে এখান থেকে চ্যাংব্যাং পিক দেখা যাচ্ছে না। বাগিনি হিমবাহ ক্রমশ উন্মুক্ত হচ্ছে। সত্যিই অনন্য এ দৃশ্য। দৃশ্যত এই হিমবাহ অন্যান্য হিমবাহের থেকে স্বতন্ত্র। মোরেনের মাঝে অসংখ্য ছোট ছোট বরফচূড়া ছোট একেকটা আইল্যান্ডের মতো দেখাচ্ছে। আগেই বাগিনি নালার স্নাউটটি চোখে পড়েছে। বেসক্যাম্প পেরিয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট হাঁটার পর একটি মোরেন অঞ্চল ধরে উত্তর-পূর্বদিকে উঠতে থাকলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর ডানদিকে ট্রাভার্স করে ঋষিপাহাড়কে সামনে রেখে এগোতে

থাকলাম। চারদিকে ইতস্তত বরফ পড়ে রয়েছে। এরপর আরও এগিয়ে এমন একটা জায়গায় এলাম যেখান থেকে চ্যাংব্যাং পিক গোড়া থেকে সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে। এক অসাধারণ ঋজুতা তার গঠনে। দেখে মুগ্ধ হলাম। বাগিনি হিমবাহের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন পুরো চোখের সামনে। অবাক হয়ে দেখছি। ভয়াল সুন্দর। নীচে, প্রায় মাঝখানে একটি ছোট কিন্তু অপূর্ব হিমবাহ হ্রদ দেখতে পেলাম। জলের রং পান্না সবুজ। আর চারপাশের পাহাড়গুলির বর্ণনা দেব! আমাদের সামনে দ্রোণাগিরি (৭,০৬৬ মিটার), চ্যাংব্যাং (৬,৮৬৪ মিটার), কলঙ্ক (৬,৯৩১ মিটার), ঋষিপাহাড় (৬,৯৯২ মিটার), সাতমিনল (৬,৯১৩ মিটার), হরদেউল (৭,১৫১ মিটার) পিকগুলি ঘন নীল আকাশের নীচে রাজকীয় মহিমায় বিরাজমান। বিরাজ করছে আরও নাম না-জানা অনেক পাহাড়। প্রায় ২৭০ ডিগ্রির বেশি জুড়ে প্রকৃতির এ এক অনবদ্য অ্যাম্ফিথিয়েটার। এর দর্শক হতে পেরে ভীষণ রোমাঞ্চিত হচ্ছি। সব কষ্টের শেষ হল প্রকৃতির এই আনন্দলোকে। পরিতৃপ্ত মন নিয়ে ফিরে এলাম আবার বাগিনি খড়কে।

মনে পড়ে গেল আজকের দিনটি পর্বতারোহণের এক বিশেষ দিন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৫৩ সালের এই দিনটিতে তেনজিং ও হিলারি মাউন্ট এভারেস্ট আরোহণ করেছিলেন। আজ তার সুবর্ণ জয়ন্তী।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে খাওয়াদাওয়ার পর প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ আমরা দ্রোণাগিরি গ্রামের উদ্দেশে নামতে আরম্ভ করলাম।

৩০ মে আমরা দ্রোণাগিরি গ্রাম থেকে রুইং হয়ে জুম্মা নেমে এলাম। তারপর জুম্মা থেকে জিপে করে যোশিমঠ ফিরে গেলাম। এছাড়া অন্যপথে দ্রোণাগিরি গ্রাম থেকে দোবলা খড়ক হয়ে সুরাইটোটা গ্রামে নেমে সেখান থেকে জিপে করে যোশিমঠে ফেরা যায়।

প্রয়োজনীয় তথ্য

সচিত্র পরিচয়পত্র ও দুই কপি পাসপোর্ট মাপের ছবি সঙ্গে নেবেন। যোশিমঠের নন্দাদেবী জাতীয় উদ্যানের এবং এ ডি এম-এর কার্যালয় থেকে অনুমোদন নিতে হবে। ভালো সময় মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এছাড়া সেপ্টেম্বর-অক্টোবরেও যাওয়া যেতে পারে। টেন্ট, রেশন ও রান্নার সরঞ্জাম সঙ্গে নিতে হবে।
গাইড ও পোর্টারের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:

মহাবীর সিং রানা
প্রযত্নে 'হাই অ্যাডভেঞ্চার', আপারবাজার
যোশিমঠ-২৪৬ ৪৪৩, উত্তরাঞ্চল ☎০১৩৮৯-২২২৯১৩
ই-মেল: highadventure_joshimath@ rediff.com

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৩

গরুমারা চাপড়ামারি অরণ্যে

চিন্ময় চক্রবর্তী

খুনিয়া মোড় থেকে তিনটে রাস্তা চলে গেছে তিনদিকে। সোজা রাস্তা— জাতীয় সড়ক ৩১সি, বানারহাট, বিন্নাগুড়ি হয়ে বীরপাড়াতে মিশেছে আসামের পথে জাতীয় সড়ক ৩১এ। বাঁহাতি পাকা রাস্তাটা গভীর জঙ্গুলে পথে চলে গেছে জলঢাকা। সে পথে কিলোমিটার দুই চলে, বাঁদিকের কাঁচা পথ আদিম জঙ্গল চিরে গেছে চাপড়ামারি অভয়ারণ্যের গভীরে। চাপড়ামারি বনবাংলোয় শেষ হয়েছে সে পথ। এখন আমাদের যাত্রা গভীরতর জঙ্গলের বুক চিরে ডানহাতি পিচ ঢালা রাস্তা ধরে মূর্তি বনবাংলোর দিকে। অন্য পথে, শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, লাটাগুড়ি, বাতাবাড়ি হয়েও যেতে পারতাম মূর্তি। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে মংপং, মাল, চালসা আর খুনিয়া হয়ে মূর্তির পথে গেলে শিলিগুড়ির যানজট পেরিয়েই মহানন্দা অভয়ারণ্য। বুনো-বুনো সোঁদা পথ-গন্ধের একটু রেশ মিলোতে না মিলোতেই মংপং-এর পাহাড়ে। বাগরাকোট পর্যন্ত পাহাড় আর নদী পথসঙ্গী। ছোট্ট গঞ্জ ডামডিম পেরিয়ে মাল আর চালসা। বেশ শহর-শহর ভাব। ডামডিম থেকে একটা পথ গেছে গরুবাথান হয়ে লাভায়। আর চালসা থেকে গেছে মেটেলি, সামসিংয়ের পথ। খুনিয়া মোড় থেকে সাত কিলোমিটার গা ছমছমে গভীর বনপথে, মূর্তি নদীর কাঠের সাঁকো পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের মূর্তি প্রকৃতি-পরিবেশ বীক্ষণ কেন্দ্র 'বনানী'।

বনবাংলোয় পৌঁছেই দিলখুশ। মূর্তি নদীর পাড়ে যত্নে লালিত বিশাল কেয়ারি করা বাগানের মাঝে সাজানো-গোছানো দোতলা ঝকঝকে বাংলো। পরিবেশের সঙ্গে মানানসই লগ হাউসও আছে। বাংলোর একতলায় তিনটে নন-এসি ঘর-ইংডং, গরাতি আর ডায়না। দোতলায় চারটে এসি ঘর-তিস্তা, মূর্তি, জলঢাকা আর তোর্সা। চারদিকে ঘর; মাঝে চেয়ার-টেবিল আর নরম সোফাশোভিত খাবার আর বসার জায়গা। সেখানে টিভি। এছাড়াও একটি ফ্যামিলি রুমও আছে।

আফসর আলি— বনানীর কেয়ারটেকার, আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে যান দোতলায়। আমরা পেলাম জলঢাকা। ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় মূর্তি নদী। ঘরের সঙ্গে একটা ছোট্ট ব্যালকনি। আর ঝকঝকে বাথরুমে অঢেল আয়েসের আয়োজন— ঠান্ডা, গরম জল। চা খেয়ে বেরই চারপাশ দেখতে আর ছবি তুলতে। নদীতীরে ১০-১৫ বিঘা জায়গায় তৈরি করা হয়েছে বাগান। তারই মাঝে ছড়িয়ে

ছিটিয়ে ছোট্ট ব্যালকনি সহ দু-তিনটে কাঠের কুঁড়েঘর। মাটি থেকে ফুট ছয়েক ওপরে কাঠের গুঁড়ির ওপর টিনে ছাওয়া ঘর। বিকেল বিকেল আবার বেরিয়ে পড়া ১৮ কিলোমিটার দূরের গরুমারা অভয়ারণ্য সফরের উদ্দেশে। আফসর আলি বন্দোবস্ত করে রেখেছেন।

মূর্তি বনবাংলো থেকে বেরিয়ে গ্রাম ছুঁয়ে, ধানখেতের পাশ দিয়ে বাতাবাড়ি মোড়। সেখান থেকে বাঁদিকে ঘুরে গাড়ি চলে লাটাগুড়ির দিকে। লাটাগুড়ি পৌঁছনোর আগেই বাঁহাতি পথ গেছে গরুমারার গভীরে। সে পথে কিলোমিটার পাঁচেক গেলে গরুমারার বনবাংলো আর ওয়াচ টাওয়ার।

বড়দিঘি চা বাগানের মধ্য দিয়ে কাঁচা পথ গেছে বনের গভীরে। দেখতে দেখতে ঘন বন দখল নেয় পথের। যেন দয়া করে আমাদের জন্য এক চিলতে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে। এই পথে হরবখত শুয়োর, হরিণ, গাউর এমনকী গণ্ডারও দেখা যায়। আমরা রুদ্ধশ্বাস। একটা গাউর নিশ্চিন্তে চরছিল। গাড়ি থামিয়ে ছবি তুলতে যেতেই লেজ তুলে দৌড়। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল গোটা কতক ময়ূর। গাড়ির শব্দে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে নিরাপদ দূরত্বে গাছের ডালে।

১৯৪২ সালে, স্বাধীনতার আগেই গরুমারাকে সংরক্ষিত শিকারভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে ১৯৪৯ সালে গরুমারা পায় অভয়ারণ্যের মর্যাদা। ১৯৭৬-এ একে অভয়ারণ্য বলে ফের ঘোষণা করা হয়। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের শিরোপা পায় ১৯৮০ সালে। আয়তনও ৮.৬২ বর্গ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে করা হয় ৭৯.৪৫ বর্গকিলোমিটার। একদিকে মূর্তি নদী অন্যদিকে জলঢাকা নদী; মাঝের সমতলে গরুমারার বিস্তার। উঁচু বনাঞ্চলে শাল, বহেড়া, ওদাল, জাম, চিকরাশি; আর নিচু বনাঞ্চলে শিমুল, শিরীষ আর খয়ের গাছের দেখা মেলে। বন্যজন্তুর মধ্যে হাতি, গাউর, শুয়োর, সম্বর, কাঁকর, লেপার্ড, ভালুক আর বিখ্যাত একশৃঙ্গী গণ্ডারের বাস গরুমারায়। নানান প্রজাতির পাখি আর অসংখ্য ময়ূরেরা আলো করে রাখে গরুমারার গাছ-গাছালি।

দেখতে দেখতে এসে পড়ি বনবাংলো চত্বরে। সুদৃশ্য কাঠের দ্বিতল বাংলো। পাশেই বনকর্মীদের আবাস। বেশ খানিকটা জায়গা জঙ্গল মুক্ত করে গড়ে তোলা হয়েছে বাড়ি-ঘর, হাতির খোঁয়াড় আর বন্যজন্তুদের সাময়িকভাবে রাখার খাঁচা। একটি বাচ্চা হাতি সহ বেশ কটি হাতি আর দুটো লেপার্ড বাচ্চা রাখা আছে সেখানে। তবে ট্যুরিস্টের সে চত্বরে প্রবেশ নিষেধ। বাংলোর হাতায় ওয়াচ টাওয়ার। গুটিগুটি সেখানে গিয়ে বসি। টাওয়ারের নিচে খাড়া খাদ নেমে গেছে। সে খাদে বয়ে চলেছে খাল-সদৃশ ইংডং নদী। বেশ দূর পর্যন্ত দেখা যায়। তবে জন্তু-জানোয়ার কিছু দেখা গেল না। এবার চলি যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচ টাওয়ারের দিকে। ঘন জঙ্গলের মাঝে, বাংলো থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে, মূর্তি নদীর কিনারে যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচ টাওয়ার গরুমারার বিখ্যাত কুনকি হাতি যাত্রাপ্রসাদের নামে। ১৯৭১ সালে আসাম থেকে আনা হয় তাকে। সুদীর্ঘ ২৮ বছর দক্ষতার সঙ্গে কাজ

করে ১৯৯৭ সালের ১৪ জুলাই মারা যায় যাত্রাপ্রসাদ। বনদপ্তর থেকে যাত্রাপ্রসাদের একটা সিমেন্টের মূর্তিও করা হয় এখানে। কিন্তু বুনো হাতি এসে ভেঙে দেয় সে মূর্তি। আবার গড়া হয়। আবারও হাতিরা ভেঙে দেয়।

গভীর জঙ্গলে, গা ছমছমে পরিবেশে যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচ টাওয়ারের ঠিক নিচেই খাড়া খাদ নেমেছে মূর্তি নদীর সমতলে। নদী এখানে ধনুকের মতো মস্ত একটা বাঁক নিয়ে বয়ে চলেছে আপন ছন্দে—যেন পটে আঁকা নিখুঁত এক নৈসর্গিক ছবি। চারপাশে পাখিদের ভারি কোলাহল। গোটাকতক ময়ূর আর একটা গাউর। ফিরছি, হঠাৎ দেখি দূরে বনের সুঁড়ি পথ জুড়ে বিশালকায় দুই হাতি আসছে হেলেদুলে। আমাদের চুল খাড়া। ওই পথেই যে ফিরতে হবে আমাদের। হাতিরা একটু কাছে এলে দেখা যায়, তাদের পিঠে মানুষ। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে আমাদের। চন্দ্রচূড় ও শিলাবতী বেরিয়েছে রোদে। বনদপ্তরের দুই কুনকি চলেছে টহলে।

রাতে মূর্তি বনবাংলোয় তোফা ভূরিভোজের পর গভীর ঘুমিয়ে, সকালে আমরা প্রস্তুত চাপড়ামারির জন্য। চাপড়ামারি একেবারে আদিম অরণ্য। সেখানকার বনবাংলোর বুকিং পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে দিনাদিনি যেতে পারেন যে কোনও পর্যটক। চালসার রেঞ্জ অফিসারের কাছে হত্তা দিয়ে পড়ে থেকে, তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে, তাঁরই চেষ্টায় জলপাইগুড়ির ডি এফ ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে, অবশেষে পাওয়া যায় সংরক্ষণ। রেঞ্জ অফিসার ভদ্রলোক আমাকে তাঁর অফিস থেকে বার করতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

চালসা থেকে রেশন নিয়ে, আবার ফিরে চলা খুনিয়া মোড়ে। এবার বাঁহাতি পথ ধরে জলঢাকার দিকে চলা। এ পথও জঙ্গলের মাঝ দিয়ে। দুই কিলোমিটার মতো পথ চলে, রেললাইন পেরিয়ে, বাঁদিকের কাঁচা পথে আরও দেড় কিলোমিটার এগিয়ে চাপড়ামারির বনবাংলো। কাঁচা পথে জঙ্গল আরও ঘন, যেন গিলে খেতে চাইছে আমাদের। যে-কোনও মুহূর্তে পথের ওপর এসে যেতে পারে হাতি বা অন্য কোনও বন্যজন্তু। সত্যিই চুল খাড়া করা এই দেড় কিলোমিটার পথ পরিক্রমা।

বাংলোর ঠিক সামনেই তিনতলা নজর মিনার। টিনের চালে ছাওয়া আর নীল রঙের কাঠের দ্বিতল বাংলো একেবারে পিকচার পোস্টকার্ড। ঘরের সামনে বিশাল বারান্দা। সেখানে বসে দেখা যায় সামনের ঘাসের প্রান্তর। সে প্রান্তরের মাঝ বরাবর এক ছোট্ট ঝিল। তারই পারে সল্ট লিক। ঝিলকে ঘিরে গভীর অরণ্য। এই ঝিলের পাড়েই নাকি ভোরে আর সন্ধ্যায় বন্যজন্তুর মেলা বসে। পুরো বাংলো ঘেরা গভীর পরিখা দিয়ে। তারপর শক্ত-পোক্ত ইলেক্ট্রিফ্যাইড ফেন্সিং। কোনওভাবেই যাতে বন্যজন্তুরা বাংলোয় ঢুকতে না পারে।

৯.৬০ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপ্ত এই অরণ্য অভয়ারণ্যের স্বীকৃতি পায় ১৯৭৬-এ। গরুমারার মতো এখানেও পাওয়া যায় হাতি, নানান প্রজাতির হরিণ, গাউর, বুনো শুয়োর আর অসংখ্য পাখি। এখানে পর্যটকরা বন্যজন্তুর দেখা পাবেনই। প্রায় শ'খানেক প্রজাতির অর্কিড আর ৮৩ ধরনের ঘাসের অরণ্য চাপড়ামারি।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামতে না নামতেই সে হাজির। যার আশায় আশায় বনে বনে ঘোরা। বিশাল এক হাতি। ঝিলপাড়ে ঘুরে-ফিরে হেলেদুলে চরে বেড়ায়। ঘণ্টাখানেক কেটে যায় তার রকমসকম দেখে। সন্ধের মুখে ছোট ছোট তিনটে হাতি বেরয় জঙ্গল থেকে। ধীর পায়ে দুলকি চালে তারা আসে ঝিলের দিকে। বড় হাতিটা তখন একটু আড়ালে ছিল। ছোট হাতিগুলোকে দেখে তিনি আড়াল থেকে বেরিয়ে আসেন। তাকে দেখে ছোট হাতির দলটা লেজ তুলে সে কী ছুট! বড় হাতিটা ধীরে-সুস্থে দলটার পিছনে পিছনে জঙ্গলে ঢুকে যায়। আমাদের মন খারাপ। ভাবি, বড়টাকে দেখে ছোট হাতির দলটা ভয় পেয়ে পালিয়েছে; আর আসবে না। জঙ্গলের ব্যাকগ্রাউন্ডে ঝিলপাড়ের নাট্যমঞ্চ কুশী-লব হীন। তারপরই আমাদের অবাক করে চারটে হাতির এক দল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে। ছোট তিনটি হাতির সেই দলটাকে লিড করে বড় হাতিটা। ঠিক যেন, বড় দাদাকে দেখে ছোট ভাইরা ভয় পেয়ে পালিয়েছিল; তাই দাদা নিজে গিয়ে আশ্বাস দিয়ে ছোট ভাইদের সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। শুনেছিলাম হাতিরা নাকি ভারি সমাজবদ্ধ জীব। এখানে তা প্রত্যক্ষ করলাম। তারপর রাত গভীর হওয়া পর্যন্ত ওরা চরে বেড়াল ওই মাঠে। একটা গাউর এল হাতিদের সঙ্গ দিতে।

রাত নামে চাপড়ামারিতে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। আকাশে চাঁদ নেই। অন্ধকার গভীর হয়। আমাদের চারপাশে আদিম অরণ্যে অসংখ্য ঝিঁঝিপোকার বিরামহীন ঐকতান নিয়ে আসে এক অপার্থিব পরিবেশ। বুঁদ হয়ে বসে থাকি বনবাংলোর বারান্দায়।

ভোরে ঘুম ভাঙে কাদের প্রবল কোলাহলে। আধো ঘুমে মনে হয়, এ-তো মানুষের স্বর নয়। কিন্তু কারা এই কাকভোরে চেঁচাচ্ছে। ঘুম পুরোপুরি ভাঙতে বুঝি, পাখি ডাকছে। বাংলোর চতুর্দিকে অসংখ্য নাম জানা, নাম না-জানা পাখি ডাকছে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

গরুমারা আর চাপড়ামারির বনবাংলোর সংরক্ষণ পাওয়া কঠিন। তারচেয়ে মূর্তিকে কেন্দ্র করে এই দুই অভয়ারণ্য ঘুরে নেওয়াই শ্রেয়। মূর্তিতে ঘরের জন্য যোগাযোগ:

পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার, আর্য ম্যানসন, ৮ম তল

কলকাতা-৭০০ ০১৩ ☎২২৩৭-০০৬০/৬১

এরা প্যাকেজেও নিয়ে যায়। গাড়ি ছাড়া বনে ঢোকা বারণ। তাই গাড়ি ভাড়া করতেই হবে। শিলিগুড়ি বা চালসাতে পছন্দ মতো গাড়ি পাওয়া যাবে।

বনবাংলো সংরক্ষণের জন্য লিখুন:

ডি এফ ও, ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশন-II, অরণ্য ভবন

জলপাইগুড়ি-৭৩৫ ১০১ ☎৯৫৩৫৬১-২২৪৯০৭

'ভ্রমণ' অক্টোবর, ২০০৪

পার্বতী সরোবরের তীরে আদি কৈলাস

তুষারকান্তি দাস

কুমায়ুন হিমালয়ের পার্বতী সরোবরের তীরে আদি কৈলাস দর্শন ও সরোবর পরিক্রমা করতে চলেছি। ১১ সেপ্টেম্বর রবিবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ আমরা নামলাম উত্তরপ্রদেশের রাজধানী শহর লখনউ স্টেশনে। সন্ধ্যায় লখনউ থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে রিকশায় চেপে এলাম মিটার গেজ লাইনের স্টেশন আয়েশবাগে। এখান থেকে আমরা যাব রাত ৮টা ৫০ মিনিটে ছোট ট্রেন নৈনিতাল এক্সপ্রেসে টনকপুর।

১২ সেপ্টেম্বর সোমবার ভোর ৪টেয় ট্রেন থামে পিলভিট জংশন স্টেশনে। আমাদের টনকপুরগামী কামরা দুটি কেটে রেখে মূল ট্রেনটি চলে যায় নৈনিতালমুখী লালকুয়া স্টেশনের দিকে। এখন আমাদের কামরা দুটি জুড়ে যাবে টনকপুরগামী ট্রেনের সঙ্গে, ছাড়বে সকাল সাড়ে সাতটায়। এই ফাঁকে ছবির মতো শান্ত পরিচ্ছন্ন খেলনা স্টেশনের আশপাশ ঘোরাঘুরি করি। দারুণ সুন্দর সূর্যোদয় দেখলাম পিলভিটে।

ঠিক সময়ে ট্রেন আবার ছাড়ে। ট্রেন ছুটে চলে কুমায়ুন হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের বনজঙ্গল, খেতখামার, বাড়িঘর ছুঁয়ে। বনবসা থেকে নজরে পড়ে ঘন সবুজে ঢাকা ঢেউ খেলানো হিমালয়।

টনকপুরে ট্রেন থেকে নামি সকাল নটায়। ট্রেনেরও চলার এখানেই ইতি। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা কমান্ডার জিপ রিজার্ভ করা হয় ধারচুলা যাওয়ার জন্য। টনকপুর থেকে ধারচুলা পর্যন্ত দীর্ঘ ২৪৩ কিলোমিটার পাহাড়ি পথ। এ পথে আমরা পেরিয়ে যাব চম্পাবত, লোহাঘাট, পিথোরাগড়, জৌলজিবি ইত্যাদি কুমায়ুন হিমালয়ের বিখ্যাত সব জনপদ।

বেলা সাড়ে এগারোটায় সিন্নারিতে জিপ চলার বিরতি দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য। বিকেলে লোহাঘাটে জিপের বদল হয়। আমরা উঠি ওপর থেকে আসা জিপে এবং ওপর থেকে আসা যাত্রীরা ওঠেন আমাদের জিপে। এটাই এখানকার দস্তুর। কোনও জিপ সরাসরি যায় না। যদিও ভাড়া করার সময় বলেছিল সরাসরি যাবে। ভাড়া নিয়ে বোঝাপড়া হয়ে যায় দুই চালকের মধ্যে। অবশ্য এ নিয়ে যাত্রীদের কোনও ঝামেলা পোয়াতে হয় না, নামাওঠা ছাড়া। খুব সুন্দর ছবির মতো

পাহাড়ি শহর লোহাঘাট। এখান থেকে খুব অল্প দূরে স্বামী বিবেকানন্দের পদরেণুধন্য মায়াবতী আশ্রম। মেঘমুক্ত আকাশে মায়াবতী থেকে পঞ্চচুল্লি শৃঙ্গ খুব কাছেই দৃশ্যমান। ছুটন্ত জিপ থেকে একটা বাঁকের মুখে আমরাও দেখলাম সে নৈসর্গিক দৃশ্য। আবারও একবার জিপের বদল ঘটে সন্ধের মুখে পিথোরাগড়ে। রাতের অন্ধকারে ধারচুলা নামি, ৯টা ১৫ তখন। পাহাড়ি শহর ধারচুলা শুনশান। মাথা গোঁজার ঠাঁই হয় হোটেল গণেশ-এ। টনকপুর থেকে পিথোরাগড়ের দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার। আর পিথোরাগড় থেকে ধারচুলা ৯২ কিলোমিটার।

১৩ সেপ্টেম্বর আমরা ধারচুলায় থাকব কারণ এখানকার তহসিলদারের কাছে আমাদের যাত্রাপথের বিশেষ অনুমতি নিতে হবে, নিজেদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে। এপথ নেপাল ও তিব্বতের সীমান্তবর্তী হওয়ার কারণে ইনারলইন পারমিট লাগে। যাত্রাপথে সমস্ত গ্রামে ইন্দো-টিবেট বর্ডার পুলিশের অফিসারেরা সেই পারমিট চেক করে তবেই যাওয়ার ছাড়পত্র দেন। এমনকী ফেরার সময়ও চেক-আউট করে আসারই নিয়ম। ধারচুলায় গণেশ হোটেলের যে ঘরটায় আমরা ছিলাম, ঘরটির অবস্থান একদম কালী নদীর তীরে। ঘরের জানলা দিয়েই দেখা যায় কালী নদী। শোনা যায় তার মৃদু গর্জন। দেখা যায় নদীর ওপারে প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালের ঘরবাড়ি। কালী নদীর ওপারে নেপালের অংশের নাম দারচুলা। জেলাও দারচুলা। আর এপারে ভারতের অংশের নাম পিথোরাগড় জেলার অন্তর্গত ধারচুলা। সীমান্তবর্তী হওয়ার কারণে ধারচুলায় শুল্ক বিভাগের কড়াকড়ি আছে দেখলাম। বিশেষ করে স্থানীয় মানুষজনের ব্যাগ তল্লাশি হচ্ছে কঠোরভাবে, নদীর ওপর পুল পারাপারের সময়ে। আমরাও অফিসারদের বলে সবুজ-সাদা ঝোলাপুল পেরিয়ে ঘুরে এলাম বিদেশ নেপাল থেকে। উষ্ণ অভিনন্দন জানালেন নেপাল সীমান্ত পুলিশ। চা খেলাম বিদেশের চায়ের দোকানে। নেপালে ছোটখাটো দোকানেও অবাধ বাণিজ্য হওয়ার কারণে বিদেশি পণ্যের ছড়াছড়ি। তবে এপারে আনা মানা। নেপাল যাওয়ার রাস্তার পাশেই কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের বিশাল বাংলো, একদম কালী নদীর ওপর। ওম পর্বতের ছবি দেখলাম নিগমের বাংলোয়। এই পর্বত দেখা যায় গুঞ্জি গ্রাম থেকে বামদিকে মানস-কৈলাস যাওয়ার পথে নাবিচ্যংয়ের কাছে। প্রকৃতির আপন খেয়ালে পর্বতের মাথায় আপনা হতেই বরফের 'ওঁ' লেখা হয়ে যায়। সারাদিনই এইভাবে অলস ঘোরাঘুরি করে পাহাড়ি জনজীবনের ছবি তুলে সময় কাটে। বিকেলে তহসিলদার আসার পর অনুমতিপত্র হাতে পাই।

১৪ সেপ্টেম্বর। আমরা রওনা দিলাম গরবাধারের উদ্দেশে। গতরাতেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল একটা টাটা-২০৭ পিক আপ ভ্যান অর্থাৎ মালবওয়া গাড়ি। যাই হোক যাত্রাপথ মাত্র ৪২ কিলোমিটার। সুতরাং এ অল্প পথ চলে যাব স্বচ্ছন্দে, গরবাধার থেকেই আমাদের হাঁটাপথের শুরু। ধারচুলায় খোঁজখবর করে জানতে পারি— এ পথে সমস্ত গ্রামেই দোকান আছে। প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার এবং থাকার জায়গা, বিছানাপত্র সবই পাওয়া যাবে। তাই রান্নার সরঞ্জাম, তাঁবু সবই

রেখে যাই গণেশ হোটেলের হেফাজতে। ফলে মালবাহক এবং পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হয় না। নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিসের সঙ্গে শুধুমাত্র শুকনো খাবারের প্যাকেটগুলো ভাগ করে নিই রুকস্যাকে। এছাড়া সমস্ত গ্রামে কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের বাংলো অথবা টেন্ট আছে।

ধসের জন্য গরবাধার থেকে প্রায় দেড়-দু কিলোমিটার আগেই গাড়ি আমাদের নামিয়ে দেয় মাংতিনালায়। এখান থেকেই শুরু হয়ে গেল আমাদের দীর্ঘ পদযাত্রা। সকাল ৯টা এখন। মাঝে কালী নদী বয়ে চলেছে সগর্জনে। ডানদিকের পাহাড়টা নেপালের অংশ আর বামদিকেরটা ভারতের। আমরা হাঁটছি বামদিকের অংশ ধরে। নেপালের দিকেও পাহাড়ের বুকে সরু পায়ে চলা পথ লক্ষ করা যায়। তবে এপারের তুলনায় রাস্তা অনেকটাই সরু ও ভাঙাচোরা। চলে গেছে ঝোপজঙ্গল ভেদ করে। স্থানীয় মানুষজন ও ছাগল ভেড়া চলাচল করছে দেখলাম। কোনও কোনও জায়গা আবার ধসে বন্ধ হয়ে গেছে। ওপারে এক জায়গায় একটা রুক্ষ পাহাড়ের অনেক উঁচু থেকে ছোট-বড় পাথর গড়িয়ে পড়ছে সশব্দে কালী নদীর গর্ভে। পাথর পড়ে চলকে উঠছে নদীর জল। সে দৃশ্য ভয়ঙ্কর সুন্দর। এলাকাটা ধসপ্রবণ। সাবধানে পেরিয়ে যাই। সারা পথেই দুই পারে ছোট-বড় অনেক ঝরনা। দু-দেশেরই ঝরনার জল গড়িয়ে পড়ছে মাঝের কালী নদীতে। আমাদের এপারের পথ গুঞ্জি পর্যন্ত কৈলাস-মানস সরোবরের তীর্থযাত্রার পথ হওয়ার কারণে বেশ চওড়া পাথর বাঁধানো। হাঁটতে খুব একটা কষ্ট হয় না। শুরুতে বেশ খানিকটা চড়াই ভেঙে উঠে যাওয়া তারপর হালকা চড়াই-উতরাই পথ ধরে চলা। সব সময় পাশে কালী নদী। তার উচ্ছল জলরাশি বড় বড় পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে বয়ে চলেছে নীচে। এক জায়গায় নেমে আসি একদম নদী কিনারায়। ডানপাশে নদীর উদ্দাম জলস্রোত আর বামপাশে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল, মাঝে সংকীর্ণ পথ। জায়গায় জায়গায় আবার পথের পাথর সরে গেছে জলের তোড়ে, সেখানে গাছের ডালপালা ফেলে কোনওরকমে পথটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। মাঝে লক্ষ্মণপুরের কাছে একটা বেশ বড়সড় ধসে মূল রাস্তা বন্ধ, প্রায় ২ কিলোমিটার। নীচে নদীর কিনারা পর্যন্ত ছোট-বড় বোল্ডার ছড়িয়ে। সেই বোল্ডারের গায়ে সবুজ রং লাগিয়ে তীরচিহ্ন এঁকে পথনির্দেশ করা। সেই তীরচিহ্ন দেখে চার হাত-পায়ে কোনওরকমে নেমে উঠে আবার মূল রাস্তায় ওঠা। ভয় হয় আবার না পাথর গড়িয়ে পড়ে। তাড়াহুড়োতে তীরচিহ্ন গুলিয়ে ফেললে পথ হারাবার সম্ভাবনা। ওপরে আবার একটা পথরেখা চলে গেছে অসম্ভব চড়াই পথে। জিপতি, গালা হয়ে তাওয়াঘাট। আগে এ পথেই যেতেন মানস-কৈলাস যাত্রীরা তাওয়াঘাট থেকে মালপায়। আর আমরা হাঁটছি নীচ দিয়ে নতুন পথে কম পরিশ্রমে। ফেরার সময় আমাদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য অমরেশ এই জায়গায় পথ হারায়। প্রায় ৪ কিলোমিটার অতিরিক্ত চড়াই ভেঙে আবার ফিরে আসে মূল পথে।

প্রচুর পাখি আছে এ অঞ্চলে, আছে হরেক প্রজাতির ফুল, প্রজাপতি।

অসাধারণ সৌন্দর্য পথশ্রম ভুলিয়ে দেয়। এ পথের রূপের বর্ণনা করি তেমন জোর আমার কলমে নেই। দু-তিনটে জায়গা আবার ওভারহ্যাঙের তলা দিয়ে হাঁটা। ওপর থেকে সহস্র ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। জামাকাপড়, পিঠের ব্যাগ ভিজে একশা। হাঁটতে হাঁটতে গায়েই শুকিয়ে যায়। এভাবেই মাংতিনালা থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার হেঁটে টিপটিপ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মালপায় প্রবেশ করি বেলা ২টোয়। এই মালপাতেই ১৯৯৮ সালে এক বিধ্বংসী ধসে চাপা পড়ে মারা যান প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী প্রতিমা বেদী সহ কয়েকশো কৈলাস-মানস সরোবরের তীর্থযাত্রী। এখানেই আমাদের প্রথম দিনের পদযাত্রার বিরতি। রাতের আশ্রয় জোটে এক প্রৌঢ় পাহাড়ি দম্পতির ঝোপড়ি হোটেলে। পল্টুদা নাম দেয় কাকা-কাকির হোটেল। দুপুর ২টো থেকেই আবহাওয়া ভেজা-ভেজা, স্যাঁতসেঁতে। বৃষ্টি হয়েই চলেছে। ভেড়ার লোমে তৈরি দেহাতি কম্বল আর ভেড়ার ছাল পাতা বিছানায় শুলাম আরাম করে। কিন্তু রাতে পিসু পোকা সারা শরীর জুড়ে সুড়সুড়ি দেওয়ায় ঘুম হল না ভালো করে। মালপায় এই হোটেলের সামনে রাস্তার ওপর একটা শিবের মূর্তি তৈরি হয়েছে ১৯৯৮ সালে চাপাপড়া হতভাগ্য মানুষদের স্মৃতির উদ্দেশে। কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের বাংলোটা একটু ওপরে। সেই সময়ের ধস থেকে এই বাংলোটাই বেঁচে যায় শুধু।

পরদিন সকালে উঠে দেখা গেল আকাশ মেঘলা। টিপটিপ বৃষ্টি হয়েই চলেছে। সকাল ৮টা নাগাদ চলা শুরু করে ৫ কিলোমিটারের মাথায় লামারি পৌঁছলাম বেলা সাড়ে দশটায়। লামারিতে একটা ইন্দো-টিবেট বর্ডার পুলিশের ক্যাম্প আছে। আছে একটা ছোট চায়ের দোকান। এখানে চা-পানের সঙ্গে খানিক বিশ্রাম। পারমিট পরীক্ষা। তারপর আবার চলা শুরু। লামারি ছেড়ে এসে পথে পড়ে অসাধারণ দুটি ঝরনা। তার মধ্যে একটিকে জলপ্রপাত বললেই মানায় ভালো। অনেক উঁচু থেকে ধোঁয়ার আকারে সাদা ওড়নার মতো যেন ঝুলে আছে কালো পাথরের গায়ে। ওর তলা দিয়েই পথ। কেউ যেন মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে দিল। ক্যাসকেডের মতো। অনেক ধারায় বিভক্ত হয়ে ধাপে ধাপে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। কিছুটা পথ পেরিয়ে যাই জঙ্গলের গাছপালার ছায়ায়। বুঁদি ঢোকার আগে একটা ভালো চড়াই উঠতে হয়, নদীর ওপর পুল পেরিয়ে। এখানে জলের রং স্বচ্ছ তুঁতবর্ণ। এখন বেলা ১টা, রোদ উঠেছে ঝিকমিকিয়ে। এই বুঁদিতেই আমাদের রাতের আস্তানা। মালপা থেকে বুঁদি প্রায় ৯ কিলোমিটার। তাই আজ তাড়াতাড়ি হাঁটা শেষ।

এখানে আলাপ হয় রিষড়ার ছেলে ইন্দো-টিবেট বর্ডার পুলিশের কর্মী রবীন দাসের সঙ্গে। বেশ ভাব হয়। অনেকদিন পরে দেশের মানুষজন পেয়ে ও খুবই খুশি। এখানে রাতে থাকার জায়গার সমস্যা হয়। কারণ ওপর থেকে মানস-কৈলাস ফেরত যাত্রীরা কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের বাংলো এবং আশপাশের দোকানের ঘর সবই ভর্তি করে ফেলেছেন। আমরা দিশেহারা, এরপর আর

এগনো সম্ভব নয়, সঙ্গে তাঁবুও নেই। অগত্যা মুশকিল আশান করে রবীন। ওর চেষ্টাতেই আশ্রয় জোটে উত্তরাঞ্চল পুলিশের ক্যাম্পের একটা ঘরে। কাজে লাগে নিজেদের ম্যাট্রেস আর স্লিপিং ব্যাগ। এছাড়া আমাদের সাতজনের রাতের খাবার, কয়েকবার চা, সকালের প্রাতরাশ সবকিছুরই ও, ওর নিজের খরচেই ব্যবস্থা করে। কিছুতেই দাম দিতে দেয় না। ভীষণ সংকোচ হয়। নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়ে একটা উঁচু চাতালের মতো জায়গায় অনেকক্ষণ আড্ডা চলল রোদ পিঠে লাগিয়ে। বুঁদিতে কয়েকঘর পাহাড়ি মানুষজনের বাস। আছে নিগমের নীল রঙের ফাইবার গ্লাসের ডোম টেন্ট। আছে ইন্দো-টিবেট বর্ডার পুলিশ ও উত্তরাঞ্চল পুলিশের ক্যাম্প এবং দুয়েকটি খাবার হোটেল কাম দোকানঘর যেখানে রাতে থাকারও ব্যবস্থা আছে। বাংলোর চত্বর থেকে গ্রামের ঘরবাড়ি অনেকটাই নীচে।

বুঁদিতে ১৬ সেপ্টেম্বর সকালটা মোটেই আশানুরূপ হল না। আবহাওয়া প্রতিকূলই বলা যায়। স্থানীয় লোকজন কেউ কেউ বললেন, এই আবহাওয়ায় এতক্ষণে কুটিতে নাকি বরফ পড়া শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং কুটি থেকে আরও ওপরের দিকে অর্থাৎ জোয়েলিংকং বা আদি কৈলাস-পার্বতী সরোবর যাওয়া সম্ভব হবে না। শুনে একটু আশাহত হলাম। যাই হোক, তবুও বৃষ্টি মাথায় নিয়েই চলা শুরু হল সকাল ৭টা ২৫ মিনিটে গুঞ্জির উদ্দেশে। রবীন বুঁদি গ্রামের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেল, যাত্রাপথের শুভ কামনা করে। আজ আমাদের পথচলার কঠিনতম দিন। বুঁদি গ্রামের প্রান্ত থেকেই একদম টানা চড়াই ৭০-৮০ ডিগ্রি ঢাল বরাবর, টানা তিন কিলোমিটার শুধুই উঠে যাওয়া। পাকদণ্ডি পথে একটা পাহাড়ের তলা থেকে উঠতে হবে একদম মাথায়। জায়গাটার নাম 'শিয়ালেখ টপ', উচ্চতা ৩,৩৫০ মিটার। সকলেরই বেদম অবস্থা। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বৃষ্টির গতি। অনেক কষ্টে মাঝেমধ্যে দম নিয়ে উঠে এলাম টপের মাথায়। এখানে কয়েকটা দোকান আছে। চা, খাবার ইত্যাদি পাওয়া যায়। আমরাও এক তিব্বতি মহিলার দোকানে, চাইনিজ বাওলে খেলাম তিব্বতি ওমলেট আর চা। শিয়ালেখের সৌন্দর্য অসাধারণ। টপের মাথাটা অনেকটাই সমতল। রয়েছে প্রচুর ফুলের গাছ। এটিও গাড়োয়ালের 'ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স'-এর মতো ফুলের উপত্যকা। তবে বৃষ্টির কারণে সবই কেমন ঝাপসা জলছবি। কিছুক্ষণ দম নিয়ে আবার চলা শুরু।

শিয়ালেখ থেকে গারবিয়াং পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার পুরো পথটাই উতরাই। শিয়ালেখের ইন্দো-টিবেট বর্ডার পুলিশের ক্যাম্পটা বেশ বড়। এখানেও পারমিট চেক হয়। জলকাদায় পথের অবস্থা খুবই করুণ। কয়েক জায়গায় এত উঁচুতেও শুধুই মাটির পথ। কাদায় জুতোর গ্রিপ ভরে গিয়ে দু-চার কিলো করে ভারি হয়ে গেছে। ঢালু পথে পা হড়কাচ্ছে। আছাড় খেলাম কয়েকবার। তবে বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। কখনও বসে বসে নামতে থাকি। বৃষ্টি হলে উতরাই পথে নামা বড়ই কঠিন। এভাবেই গারবিয়াং এসে পৌঁছই। ঠান্ডায় কাঁপুনি ধরেছে। গরম চা খেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হওয়া গেল। বেলা দশটাতেই যেন আঁধারে ঢেকে গেছে। অঝোরে

ঝরেই চলেছে বাদলধারা। এ পথের গারবিয়াং গ্রাম বেশ বর্ধিষ্ণু ছিল একসময়। ছিল ভারত-তিব্বত রেশম পথের এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। কিন্তু মহাকালের কবলে আজ জরাজীর্ণ। ভৌগোলিক কারণে পুরো গ্রামটাই মাটির নীচে বসে যাচ্ছে। সুন্দর সুন্দর কারুকাজ করা কাঠ ও পাথরের বাড়িঘরগুলো আজ পরিত্যক্ত। খুব কমই মানুষ বাস করেন। যাঁরা এখনও ভিটের মায়া কাটাতে পারেননি, তাঁরাই। সরকার থেকে গ্রামের মানুষদের নীচে ধারচুলায় জমি দেওয়া হয়েছে পুনর্বাসনের জন্য। তবে আজ গ্রামে বেশ কিছু লোকের আনাগোনা। শোনা গেল মন্দিরে তিব্বতি দামামার শব্দ। ভালো পোশাক পরে পুরুষ ও মহিলারা আসছেন ওপর ও নীচ থেকে। তাঁদের মধ্যে মহিলারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ গ্রামে আজ 'বারানি উৎসব'। মন খারাপের মাঝেও ভালো লাগে। জেগে উঠেছে প্রাণের স্পন্দন।

গারবিয়াং থেকে কিছুটা এগিয়ে দেখা যায় কালী নদীর ওপর একটা কাঠের পুল, দু-ভাগে ভাগ করা। নদীর মাঝখানে একটা বড় পাথরের দু-দিকের অংশকে সংযুক্ত করেছে। ভারি সুন্দর সীমানা ভাগ করা। এই পুল দিয়েই নেপাল ও ভারতের মধ্যে স্থানীয় মানুষজন যাতায়াত করেন। ওপারে নেপালের ছাং-রু গ্রামের মন্দির দেখা যায়। মন্দিরের মাথায় লাল পতাকা উড়ছে হাওয়ায়। আরও এগিয়ে গুঞ্জি ঢোকার মুখে নেপাল থেকে আসা কালী নদীর সঙ্গে মিশেছে ভারতের কুটি নদী। দেখা যায় দূরে গুঞ্জি গ্রামের ইন্দো-টিবেট বর্ডার পুলিশের ক্যাম্প ও কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের বাংলো। এই কালী নদী ধরেই গুঞ্জি থেকে আদি কৈলাস ও মানস কৈলাসের পথ দুভাগ হয়ে গেছে। বামদিকে নেপালের কালী নদীর ধার দিয়ে মানস সরোবরের রাস্তা, কালাপানি, নাবি ঢং, ওম পর্বত, লিপুলেখ পাস, তাকলাকোট হয়ে পৌঁছে গেছে তিব্বত। বুঁদি থেকে গারবিয়াং ৭ কিলোমিটার আর গারবিয়াং থেকে গুঞ্জি ১০ কিলোমিটার। এই ১৭ কিলোমিটার রাস্তা পুরোটাই কাকভেজা হয়ে কাঁপতে কাঁপতে গুঞ্জি গ্রামে প্রবেশ করি বিকেল সাড়ে ৫টায়। আশ্রয় জোটে গ্রামে ঢোকার মুখে পঞ্চায়েত ভবনে। ভিজে জামাকাপড় পরিবর্তন করে মোটা মোটা রজাই গায়ে চাপিয়ে মিটিং বসে আগামীদিনের কর্মসূচির। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের এখনও দুদিনে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার পথ বাকি। কিন্তু আবহাওয়া উত্তরোত্তর খারাপের দিকে। কেউ কেউ এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে। আমি, অসীমদা আর সমিত এই প্রতিকূল আবহাওয়ায় আর এগোতে নারাজ। কারণ, মেঘের মধ্যে কোনও শৃঙ্গেরই দর্শন পাব না, এত কষ্ট করে গিয়ে। যাই হোক, সকালের আবহাওয়া বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এই ঠিক করে কম্বলের উষ্ণতায় শরীর এলিয়ে দিই।

১৭ সেপ্টেম্বর সকালে পঞ্চায়েত ভবনের বাইরে এসে দেখি বৃষ্টি আর পড়ছে না। তবে সমস্ত আকাশ জুড়ে মেঘ ঝুলে আছে। যে-কোনও মুহূর্তে আবার নেমে পড়তে পারে। সুতরাং এই অবস্থায় আমরা তিনজন এখানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই, আর বাকি চারজন পল্টু, অঙ্কুরদা, দেবল ও অমরেশ কুটির দিকে

এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আমরা দু-দলে ভাগাভাগি হয়ে যাই। মন খারাপ লাগে, তবে কথা দিই যদি আবহাওয়ার উন্নতি হয় তাহলে আমরাও এগিয়ে যাব। ওরা ১০ কিলোমিটার দূরে নামফা বলে একটা জায়গায় অপেক্ষা করবে, আমরা পরে ওদের সঙ্গে মিলিত হব। গ্রামের প্রান্ত পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিয়ে গুঞ্জির ঘরে ফিরে আসি, দোকানে দুপুরের খাবারের অর্ডার দিয়ে। অসীমদা আর সমিত ঘরে বিশ্রাম করে আর আমি ক্যামেরা কাঁধে গ্রামটা ঘুরতে বেরোই। গ্রামটা পুরনো হলিউডি ছবিতে দেখা গ্রামের মতো। ঘরবাড়িগুলো পাথরের দোতলা, দরজা-জানালায় সুন্দর কাঠের কারুকার্য করা। সব বাড়ির সামনে একটা লম্বা পাইন গাছ পোঁতা, ডালপালা ছাঁটা অবস্থায়। মাথার দিকে কিছুটা ঝাঁকড়া পাতা আছে। আর সেখানে সাদা সাদা কাপড়ের টুকরো। গাছটার শীর্ষ থেকে নীচ পর্যন্ত একটা লম্বা সাদা কাপড়ের ফালি ঝুলছে। এটা ওদের ধর্মীয় সংস্কার। সংসারের শুভাশুভ জড়িয়ে আছে এই রীতির মধ্যে। ঘুরতে ঘুরতে একটা বিয়ের অনুষ্ঠানের ছবি তোলার সুযোগ মিলে যায়। বিয়েটা বছরখানেক আগে হয়ে গেছে। ওদের নিয়ম স্বামী-স্ত্রী একবছর একসঙ্গে বসবাস করবে, তারপর একবছর পরে অনুষ্ঠান হবে। সেই অনুষ্ঠানেরই তোড়জোড় চলছে। বড় বড় ডেকচিতে রান্না হচ্ছে। অনেক লোক জড়ো হয়েছে। বাদ্য বাজছে।

বেশিক্ষণ এই অনুষ্ঠানে, ইচ্ছে থাকলেও উপস্থিত থাকতে পারি না। কারণ ইতিমধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। আশপাশে উঁকি মারছে বেশ কয়েকটি তুষারশৃঙ্গ। ঝলমলে রোদে ভিজে জিনিসপত্র শুকিয়ে বেলা সাড়ে বারোটায় গুঞ্জি গ্রামকে বিদায় জানিয়ে রওনা দিই নামফার উদ্দেশে। কারণ ওখানেই বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। হয়তো ওরা ওখানে অপেক্ষায় আছে। গুঞ্জি গ্রাম ছাড়িয়ে শুরু হয় ঘন পাইনের জঙ্গল। রাস্তা প্রায় সমতল। জঙ্গলের মাঝে গুঞ্জি গ্রামের একটা কালীমন্দির। ২ কিলোমিটারের মতো জঙ্গল পার হয়ে রাস্তা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বামদিকেরটা গেছে রোকং গ্রামে আর ডানদিকের রাস্তা গেছে নাবিগ্রাম হয়ে কুটির দিকে। হালকা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে কুটি নদীকে সঙ্গী করে বিকেল সাড়ে ৪টেয় নামফা এসে পৌঁছই। কিন্তু বন্ধুদের দেখা মেলে না। চায়ের দোকানের ছেলেটির কাছে জানতে পারি ভালো আবহাওয়া পেয়ে ওরা কুটি গ্রামের দিকে এগিয়ে গেছে। গুঞ্জি থেকে নামফা প্রায় ১০ কিলোমিটার রাস্তা। কিন্তু থাকার ব্যবস্থা ভালো নয়। একটা চট ও পলিথিন ঘেরা চায়ের দোকান। মেঝেতে পাথরের ওপর কম্বল পাতা। ছেঁড়া চটের ফাঁক-ফোকর দিয়ে কনকনে হিমেল হাওয়া ঢুকছে হু হু করে। এখানে রাতে থাকলে খুবই কাহিল হতে হবে। আবার এখান থেকে কুটি গ্রাম এখনও ৯ কিলোমিটার। ঘড়িতে বাজে বিকেল সাড়ে ৪টে। পৌঁছনো যাবে কিনা বুঝতে পারি না। আমরা দ্বিধাগ্রস্ত। স্যাকের ওজনও আর বওয়া যাচ্ছে না। দেখা হয় কুটি গ্রামের দুই মহিলা ও তাঁদের এক ভাইয়ের সঙ্গে, আসছেন গারবিয়াং থেকে। বারানি উৎসবে যোগ দিতে

গিয়েছিলেন, এখন গ্রামে ফিরছেন। দেখে আমরা চিনতে পারি। গতকাল দেখা হয়েছিল গারবিয়াংয়ে। 'ওঁ নমঃ শিবায়' বলে যাত্রাপথের শুভ কামনা জানিয়েছিলেন। নমস্কার বিনিময়ের পর ওঁরাও আমাদের দেখে চিনতে পারেন। ওঁদেরই উৎসাহে আরও এগিয়ে কুটিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, একটু দম নিয়ে। একজন মেষপালককে পাওয়া যায় মালবাহক হিসেবে। ও নামফায় এসেছিল ভেড়-বকরী চরাতে, এখন ফিরবে কুটিতে। আরও ৯ কিলোমিটার হেঁটে রাত সাড়ে সাতটায় কুটি গ্রামের প্রান্তে উপস্থিত হই। কিন্তু আবছা আলো-আঁধারিতে কুটি গ্রামের ঘরবাড়ির আলো চোখে পড়ে না। শেষে একটা নালা পেরিয়ে একটা ভালো চড়াইয়ে উঠে, খেতের মধ্য দিয়ে আরও প্রায় ২ কিলোমিটার পরে ঘরবাড়ির ক্ষীণ আলো দেখা যায়। চিৎকার করে বন্ধুদের নাম ধরে ডাকতে থাকি। অবশেষে একদম কাহিল অবস্থায় বন্ধুদের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটে কুটির কুঁয়ার সিং কুটিয়ালের হোটেলে।

১৮ সেপ্টেম্বর কুটি গ্রাম আমাদের একটা সুন্দর ঝলমলে সকাল উপহার দিল। কুটি গ্রামটা একটা ছোট উঁচু চ্যাটালো জায়গায়। গ্রামের ঘরবাড়িগুলো সব কেমন ঠাসাঠাসি করে গায়ে গায়ে লাগানো। কোনটা দিয়ে কোন ঘরের প্রবেশপথ বোঝা মুশকিল। মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে অনেক তুষারশৃঙ্গ। নতুন উদ্যমে হাঁটা শুরু করেছি। পিঠের ব্যাগপত্র কুঁয়ার সিংয়ের হেফাজতে রেখে শুধুমাত্র শুকনো খাবার, গরম জামাকাপড় আর ক্যামেরা নিয়ে হালকা হয়ে পথ চলছি। আজ আমরা যাব কুটি থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে জোয়েলিংকং। জোয়েলিংকংয়ে থাকার ব্যবস্থা কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের টেন্টে। কম্বল, বিছানা সবই পাওয়া যাবে। সুতরাং স্লিপিং ব্যাগ প্রয়োজন নেই। কুটির পর আর কোনও গ্রাম নেই। বড় গাছের সারিও কখন শেষ হয়ে গেছে। মালভূমির মতো হালকা চড়াই-উতরাইয়ের মাঝে সরু পায়েচলা পথরেখা। মাঝে মাঝে কয়েকটা ভুজ গাছ এদিক-সেদিক। অনেক নীচে কুটি নদীর সরু তুঁতে রংয়ের জলধারা বয়ে চলেছে। রুক্ষ পাহাড়ের মাথায় দুধসাদা বরফের চুড়ো। যত এগোচ্ছি বরফের শিখরগুলি ততই যেন কাছে এসে যাচ্ছে। একটার পর একটা হাম্প পেরিয়ে জোয়েলিংকংয়ের ইন্দো-টিবেট বর্ডার পুলিশের ক্যাম্পে প্রবেশ করি বেলা দেড়টায়। ক্যাম্পের অনেক আগেই ইন্দো-টিবেট বর্ডার পুলিশের কয়েকজন জওয়ান জল ও চায়ের পাত্র নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। ওঁ নমঃ শিবায় বলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এই আন্তরিকতায় আমরা আপ্লুত। ক্যাম্পে পৌঁছতেও সকলকে আবার চা-চিপস খাওয়ান। এখানে প্রচুর হাওয়া। চারদিকেই গোল করে স্টেডিয়ামের মতো তুষারশৃঙ্গগুলি ঘিরে রয়েছে আমাদের— যেমন পঞ্চপাণ্ডব, হরিপর্বত, ব্রহ্মা, কুন্তি, পার্বতী-মুকুট এবং সবার ওপরে স্বমহিমায় ভাস্বর আদি কৈলাস শিখর। চোখ ফেরানো যাচ্ছে না। একদল হিমালয়ান 'চুখ' চক্রাকারে ঘুরপাক খাচ্ছে পাহাড়ের ফাঁকে। পাখিগুলি দেখতে কাকের মতো, রংটাও কুচকুচে কালো কিন্তু ঠোঁট ও পা

দুটি কমলা। ক্যাম্পের চত্বরে সাদা-কালো ওয়াগটেল নেচে বেড়াচ্ছে লেজ নেড়ে। ধূসর ও কালোর ওপর ছিটছিট হিমালয় থ্রাশ খাবারের সন্ধানে ঘাসজাতীয় ঝোপের মাঝে, পাথরের খাঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আগেই বলেছি প্রচুর পাখি আছে এ অঞ্চলে। দেখলাম— রেড স্টার্ট, হোয়াইট ক্যাপ রেড স্টার্ট, চিল, ঈগল এবং মুনিয়া জাতীয় পাখি। আমি সব পাখি চিনি না তাই হয়তো ঠিকঠিক নাম বলতে পারলাম না, পক্ষীবিশারদেরা বলে দিতে পারতেন। এ পথে আর আছে প্রচুর প্রজাপতি ও রংবেরঙের ফুল। এছাড়া ঝরনা, নদী তো আছেই। প্রকৃতি তার রূপ উজাড় করে দিয়েছেন। আর কয়েক দিন পরেই বরফ পড়া শুরু হয়ে যাবে। আট-দশ ফুট পর্যন্ত বরফে ঢেকে যাবে এ অঞ্চল। তখনও কিন্তু অতন্দ্রপ্রহরায় সীমান্ত আগলে ঘরবাড়ি, আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে দেশসেবায় ব্রতী থাকবেন এইসব মানুষেরা। জোয়েলিংকংয়ের ইন্দো-টিবেট বর্ডার পুলিশের ক্যাম্পের দেবীমন্দিরে প্রণাম সেরে গুটিগুটি পায়ে এগোতে থাকি নিগমের ক্যাম্পের দিকে। আরও প্রায় ২ কিলোমিটার এগিয়ে, দূর থেকে নজরে পড়ে বিশাল ময়দানের মাঝে কমলা রঙের ফাইবার গ্লাসের টেন্ট। আজ আমরা ওইখানেই থাকব। এতগুলো রাত ছোট দোকানঘরে থেকে এসেছি, তুলনায় এ যেন রাজপ্রাসাদ। টেন্ট থেকে দূরে ছোট ঘরে টয়লেটের ব্যবস্থাও আছে। পাশ দিয়ে বইছে সরু জলধারা। সেই ময়দানে কয়েকটা ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে। এখানকার দায়িত্বে আছেন কুটি গ্রামের মানুষ কেদার সিং কুটিয়াল। বেলা আড়াইটায় টেন্টে ঢুকি। কেদার সিং সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কাপ ধরিয়ে দেন হাতে হাতে। এই মানুষটাও ভীষণ আন্তরিক পরিষেবা দেন এই নির্বান্ধব পুরীতে। বিকেলে বরফচূড়া রাঙিয়ে সূর্যদেব অস্ত গেলেন। সে দৃশ্য লিখে বা বলে বোঝানো যায় না। প্রচণ্ড হাওয়ার চোটে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডার কামড় মালুম হয়। টেন্টে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কম্বল গায়ে চাপিয়ে চলে আড্ডা। স্কাই লাইট দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় টেন্ট বেশ প্রাকৃতিক আলোয় আলোকিত। মোমবাতি নিভিয়ে দিই। অনেকক্ষণ পরে, রাত ৯টা তখন, কেদার সিংয়ের ডাকে বাইরে বেরিয়ে দেখি জ্যোৎস্নালোকের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। বোধহয় পূর্ণিমা আজ। ভালো করে শীতবস্ত্রে ঢেকে ওর সঙ্গে প্রায় আধ কিলোমিটার এগিয়ে চন্দ্রালোকে ছোট কৈলাসের যা রূপ দেখলাম, বিস্ময়ে বিমূঢ় ভাব কাটতে সময় লাগল কিছুক্ষণ। এক পরম ভালো লাগার আবেশ নিয়ে ফিরে আসি টেন্টে।

পরদিন ঘুম ভাঙে খুব সকালে। ১৯ সেপ্টেম্বর, সোমবার আমরা চলেছি পার্বতী সরোবর দেখতে ও ছোট কৈলাস শৃঙ্গকে আরও কাছ থেকে দেখব বলে। বেশ কিছুটা চলার পর একটা হাম্প পেরিয়ে দেখা যায় এই রুক্ষতার মাঝে এক টুকরো ধানজমি। ছোট ছোট চারা ধানগাছ হয়ে আছে। এখানে নাকি আপনা হতেই ধানগাছ জন্মায়। প্রকৃতির কী অদ্ভুত লীলা! আদি কৈলাস পর্বতকে পরিপূর্ণরূপে দেখা যাচ্ছে এখন। একদম মোরেন অঞ্চল থেকে, বরফের হিমবাহ থেকে সরু

ফিতের মতো নদীর জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে নীচে বয়ে আসছে। হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যাবে আদি কৈলাসের পাদমূল। ছবি তোলা হয় ক্লাবের ব্যানার নিয়ে। অবশেষে আরও দুটো হাম্প পেরিয়ে ওপর থেকে দেখা যায় সেই স্বপ্নের সরোবর। আমরা এসে গেছি বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের জগতে। নীল টলটলে জলের পার্বতী সরোবর, হাওয়ায় তিরতির করে ঢেউ উঠছে। চারদিকে চক্রাকারে তুষার মৌলি হিমালয়, তার প্রতিবিম্ব ভাসছে সরোবরের জলে। মাঝেমধ্যে পাতলা কাচের মতো স্বচ্ছ বরফের আস্তরণ জমে আছে সরোবরে। সে এক অপূর্ব, স্বর্গীয় ছবি, স্বর্গ আর কোথাও আছে কিনা জানি না। বোধহয় হিমালয়ই আসল স্বর্গ! পায়ে পায়ে নেমে আসি সরোবরের তীরে। সরোবরের একপাশটা উঁচু করে বাঁধের মতো পাথর দিয়ে বাঁধানো। পাথরের ফাঁক দিয়ে তিরতির করে সরোবরের জল বেরিয়ে বয়ে যাচ্ছে। একটু উঁচু জায়গায় জলের ধারে টিন ও পাথর দিয়ে তৈরি দোচালা মন্দির। বাঁধটা পেরিয়ে আমরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করি। ভেতরে হরপার্বতীর ছোট শ্বেতপাথরের মূর্তি। পল্টুদার আনা বাতাসা ও নারকেল নাড়ু দিয়ে পুজো দেওয়া হয়। পরিক্রমা করা হয় সরোবরের তীরে সরু পথ ধরে। অক্সিজেনের খুবই অভাব, তার সঙ্গে তীব্র কনকনে হাওয়া তীরের মতো বিঁধছে চোখেমুখে। কথা বলতে হাঁফ ধরে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ এই স্বপ্নের স্বর্গপুরীতে কাটিয়ে একই পথে নেমে আসি জোয়েলিংকংয়ে। এখানে কেদার সিংয়ের তৈরি রুটি-সবজি কোনওরকমে গলাধঃকরণ করে বিকেলের মধ্যেই নেমে আসি কুটি গ্রামে। রাতের আশ্রয় সেই কুঁয়ার সিং কুটিয়ালের হোটেলে। আজ কুটি গ্রামে কোনও উৎসব আছে বোধহয়। ওদের ঠাকুরের থানে ভেড়া কেটে তার মাংস বিতরণ করা হল গ্রামের সব পরিবারের মধ্যে। পঞ্চায়েতের উঠোনে মাইকে গান বাজিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত চলল নাচ। তবে সে নাচ-গানের মধ্যে কুমায়ুনের লোকসংস্কৃতির কোনও ছাপ নেই। সবই বলিউডের হিন্দি ছবির চটুল গান-নাচের অনুকরণ। ভুবনায়নের কী অপার মহিমা!

২০ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার সকাল ৮টায় কুটি গ্রামকে বিদায় জানিয়ে, একই পথে ঝলমলে আবহাওয়ায় নামতে থাকি গুঞ্জির উদ্দেশে মনভর্তি পরিতৃপ্তি নিয়ে। বেলা দশটায় এসে পৌঁছই নামফা। দেখি কেদার সিং আগেভাগেই ওঁর চায়ের দোকানে এসে চা-পকোড়া, ঘুগনি তৈরি করে রেখেছেন। জোয়েলিংকংয়ের নিগমের টেন্টে এ বছরের মতো তালাচাবি মেরে তিনি নেমে যাচ্ছেন নীচে। কারণ এ বছরের মতো আদি কৈলাস যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল। এরপর আগাগোড়া পুরু বরফে মুড়ে দেবে প্রকৃতি। তখন সাধারণ মানুষের অগম্য হয়ে উঠবে সে স্থান। আমরাই এবারের শেষ দল। নামফা থেকে দেখা গেল নেপালের দিকে তুষার মৌলি হিমালয়ের বিশাল রেঞ্জ, যা আসার সময়ে মেঘের জন্য চোখে পড়েনি। জানা গেল এটি অন্নপূর্ণা রেঞ্জের অন্যদিক। স্থানীয় মানুষেরা একে 'আপ্পি' বলেন। গুঞ্জি গ্রামে ঢুকি বেলা পাঁচটায়। তখন নেপালের দিকের তুষারচূড়ার অস্তগামী রবির আলোয়

মনে হয় যেন শিখরে আগুন লেগেছে। পঞ্চায়েতের ঘরে আশ্রয় মিলে যায়।

২১ সেপ্টেম্বর, বুধবার সকাল আটটায় গুঞ্জি থেকে নামা শুরু বুঁদির উদ্দেশে। এই পথটা আসার সময় এসেছিলাম ভিজতে ভিজতে, আছাড় খেতে খেতে জলকাদায়। আর আজ ভালো আবহাওয়ায় শুকনো পথে নামছি অনেক নিশ্চিন্ত মনে। গারবিয়াং এসে পৌঁছই বেলা ১১টায়। আর শিয়ালেখ টপে বেলা দেড়টায়। এরপর উতরাই পথে বুঁদি বিকেল ৪টেয়। আবার দেখা হয় রবীনের সঙ্গে। কিন্তু থাকার জায়গার অভাব দেখা দেয়। আগের দিনের উত্তরাঞ্চল পুলিশের ক্যাম্পে ওদের লোকজনে ভর্তি হয়ে গেছে। রবীন একটু অপ্রস্তুত। বারবার অক্ষমতার জন্য মাফ চায়। শেষে ওরই চেষ্টায় আশ্রয় জোটে ছোট একটা দোকানঘরে।

২২ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার সকালে উঠে দেখি রবীন ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি। ওকে বিদায় জানালাম, কথা দিলাম কলকাতায় আবার দেখা হবে। বুঁদি থেকে সকাল সাতটায় আমরাও রওনা দিলাম মালপার উদ্দেশে। আজও আবহাওয়া খারাপ, টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ভিজতে ভিজতে মালপায় আসি বেলা সাড়ে দশটায়। সেই কাকা-কাকির হোটেলে খানিক বিশ্রাম। রুটি-তরকারির মধ্যাহ্নভোজ সেরে আবার চলা শুরু। লক্ষ্মণপুরের কাছে দেখি, যাওয়ার সময় যে দোকানটায় চা খেয়েছিলাম, সেটা ওপর থেকে পাথর পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে। মানুষজনের কোনও ক্ষতি হয়নি বটে, কিন্তু বেচারার জিনিসপত্র অনেক নষ্ট হয়েছে। বৃষ্টি কমে গেছে। গরবাধারে আসি বিকেল ৪টেয়। মেঘের ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত রোদের ওমে শরীরে উত্তাপ ফিরে পাই। গরবাধারে এসে জানা যায় মাংতিনালার আগে জিপের রাস্তা ধসে বন্ধ। নীচ থেকে কোনও গাড়ি আসছে না। ধসটা পেরোলে তবেই গাড়ি মিলবে। সুতরাং এই শেষ বেলায় পায়ের ওপর ভরসা রেখে জিপের রাস্তা ধরে সামনের দিকে এগিয়ে চলা। ধসের জায়গাটা কোনওরকমে বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে জলকাদা মাড়িয়ে নেমে উঠে পেরিয়ে এলাম। কিন্তু পিচরাস্তায় উঠে কোনও গাড়ির দেখা মিলল না। এগোতে এগোতে সন্ধ্যা নেমে গেল। প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছে। সেই সকাল সাতটা থেকে চলা শুরু হয়েছে। আজ গাড়ির আশা ছেড়েই দিয়েছি। অগত্যা জিপের রাস্তা ধরে রাতের অন্ধকারে হেঁটে পাংলা নামের একটা ছোট জায়গায় এসে থামি। এখন এ অঞ্চল শুনশান। একটা মাত্র দোকান খোলা আছে। ওই দোকানির সাহায্যে পাশের একটা দোকানের গুদামঘরে জোটে রাতের আশ্রয়। জানা গেল, কাল সকালের আগে আর গাড়ি মিলবে না। আজ বুঁদি থেকে পাংলা পর্যন্ত হাঁটাপথ ও জিপ রাস্তা মিলিয়ে হাঁটা হল প্রায় ৩১ কিলোমিটার। ১২ ঘণ্টা সময় ধরে। পায়ের অবস্থা খুবই কাহিল।

২৩ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার পাংলা থেকে জিপ ধরে ঘণ্টা দুয়েক ধারচুলা। ধারচুলায় রাত্রিবাস। ২৪ সেপ্টেম্বর, শনিবার ভোর ৫টায় রিজার্ভ জিপে ধারচুলা থেকে টনকপুর বিকেল ৪টে। টনকপুর স্টেশনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আবার বৃষ্টি নামল অঝোর ধারায়। আমাদের লখনউ যাওয়ার ট্রেন সন্ধে ৬টা ২৫ মিনিটে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে অনেক ট্রেনেই লখনউ যাওয়া যায়। লখনউ যাওয়ার টিকিটের সঙ্গেই টনকপুরের ছোট গাড়িরও রিজার্ভেশন করা যায়। আমরা লখনউ গিয়েছিলাম ৩০০৫ আপ অমৃতসর মেলে। লখনউ থেকে ২ কিলোমিটার দূরে আয়েশবাগ স্টেশন। ওখান থেকেই টনকপুরের গাড়ি ছাড়ে। যেতে হবে রিকশায়। টনকপুরের গাড়ি ছাড়ে রাত ৮টা ৫০ মিনিটে। পৌঁছয় পিলভিট জংশন হয়ে পরদিন সকাল ৯টায়। টনকপুর থেকে ধারচুলা পর্যন্ত জিপ ভাড়া কমবেশি ২,০০০ থেকে ২,৩০০ টাকা। আবার ধারচুলা থেকে গরবাধার জিপভাড়া ৪০০ টাকা। হাঁটাপথের সর্বত্রই কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের বাংলো নয়তো ফাইবার গ্লাসের টেন্ট আছে। এছাড়া দোকানঘরগুলিতেও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাড়তি মাল বইবার প্রয়োজন নেই। তীর্থযাত্রার পথ হওয়ার কারণে পুরোটাই প্রায় বাঁধানো পথ আছে। যাঁরা হাঁটতে পারবেন না তাঁদের জন্য ঘোড়া-খচ্চর ইত্যাদি ভাড়ায় পাওয়া যাবে।

'ভ্রমণ' জানুয়ারি, ২০০৬

কুঞ্জনগর

জগন্নাথ ঘোষ

উত্তরবঙ্গ মানেই যেন কাঁচা সুপুরির গন্ধ, মেস্তা-পাট আর তক্তা বাড়ি— চিকরাশি, শাল শিরীষের। খাটো হলুদ পথ চলতে থাকে, দুপাশে গেরস্থর চাষবাস ছুটে যায়। জনপদ শেষ করে এক সময় বাগিচা দেখা গেল, গাছের কেয়ারি। তার আগে ভালুকা নদীর সাঁকো চলে গেছে, অর্থাৎ সামনে কুঞ্জনগর।

কাঠের ব্যারাক-বাংলো, টানা লম্বা। সামনে ছাঁটা ঘাসের লন— নরম, মসৃণ, দিগন্ত জুড়ে। তার মাঝে নুড়িপথ, আর দুপাশে গাছ— জিগানি, খয়ের, মালতা। সকালের মুখে পৌঁছন, ফলত ঘাসে ঘাসে তখনও শিশির। পায়ের পাতা আলতো ভিজে যায়, বুটের ডগায় শিশির লেগে থাকে। আর টিয়ার শেষ ঝাঁক কাদম্বিনী চা-বাগান ছুঁয়ে উড়ে যেতে একটা হাওয়াই কোরাস ফেলে গেছে এ প্রান্তে। স্থানীয় বিটবাবু এসে পড়েছেন খবর পেয়ে— উপানন্দ রায়। অচিরেই সুগন্ধি চা এসে পড়ে পড়ে শোভন পেয়ালায়। জানি না পাশেই ময়রাডাঙা চা-বাগিচার সুবাদে কিনা। তারপর ঘাসে ঘাসে এগিয়ে চলা।

ওই তো টাওয়ার— চল্লিশ ফুট। ওপরে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা, আর নিচে সেই নদী— যার নাম বুড়ি তোর্সা। বুড়ি কেন? উপানন্দ বলেন, তোর্সা এর দেড়শো গুণ চওড়া। এটাকে তোর্সা-ছুট শাখা বলতে পারেন। তার ওপারে অটুট অন্ধকারে জলদাপাড়া। অর্থাৎ কুঞ্জনগর আর জলদাপাড়া এক লাফের দূরত্ব, আমি বলি। উপানন্দ শুধরে দেন, তাও নয়। চিতলের এক লাফ, চিতাবাঘের আধখানা আর বাঘের কাছে তো ছেলেখেলা। বাঘও আছে? বিলক্ষণ— বিটবাবুর দৃঢ়কণ্ঠ। অভয়ারণ্য আছে বাঘ নেই, লেপার্ড নেই, রাইনো-সম্বর-হগ ডিয়ার-প্যাঙ্গোলিন নেই ভাবলেন কী করে? সরাসরি বলতে গেলে ১৯৭৬ সালে এই অভয়ারণ্যের সূচনা হল, ২১৬ বর্গ কিলোমিটার আয়তনে। এ অরণ্যে ৩৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ২৪০ প্রজাতির পাখি, ১৬ ধরনের সরীসৃপ, ৩০ প্রকারের মাছ এই মতো সব আছে। একটা অভয়ারণ্যের ছাড়পত্র পেতে গেলে চাই মজবুত জঙ্গল, ভরপেট বন্যপ্রাণী এবং তাদের পরিবেশ। এখানে আরও আছে ৩০ শতাংশ তৃণভূমি এবং জলাভূমি, নইলে গণ্ডার থাকবে কেন? টাওয়ারে বসে নিচের দৃশ্য দেখি— ওই জাল ছুড়ছে ধীবর। বিটবাবু ওপর থেকে হঠাৎ হেঁকে ওঠেন, জাল ফাঁস কেড়ে

নিয়ে একেবারে ফাটকে পুরে দেব ব্যাটা। সে কী মশাই! নদী যে প্রকৃতি, তার বুকের মাছও প্রাকৃতিক। বাবু বলেন, মানুষ যে এখানে মরে যায় নিমেষে প্রকৃতিরই হাতে। দেখছেন লোকটা বাঘের মুলুকে ঢুকেছে। এবারে বুঝি নদীর এপারে জীবন ওপারে মৃত্যু। ঘুরতে ঘুরতে তোর্সার কিনারে এসে পড়েছি। পাশেই এক রাশ চিতল, সম্বর বিশ্রামরত। দুটি ছটফটে চিতাবাঘও চোখে পড়েছে। তারের খাঁচায় ওঠে, নামে কাঁচা মাংসখণ্ড দুপায়ে ধরে খায়। মাত্র কয়েক লাফ দূরেই ওদের ইয়ার দোস্তের মুক্ত ক্রীড়াভূমি, আর এদের হাজত বাস— এই বৈপরীত্য কেন? বিটবাবু হাসেন, গ্রামে হামলা করে ওদের সাজা হয়েছে, একটু ভদ্র হলেই চলে যাবে বনে। কথায় কথায় এসে পড়েছি সাঁকোর কাছে। নদীর ওপারে বিপদভূমি। শুধু বনবিভাগের কর্তারা ফরেস্ট রোডে গাড়ি ছুটিয়ে ওপারে এসে থামলে ব্রিজের তালা খুলে দেওয়া হয়। তবুও কি 'মহাশয়দের' রোখা যাচ্ছে? না। হাতি, গণ্ডার চিতাবাঘ হামেশাই পার হচ্ছে নদী। চিতাবাঘ জ্যোৎস্নারাতে আসে এই বাগিচায়। হাতিও আসে। তারা মালতা গাছ, পুন্ড্রি পাতা চেটেপুটে খেয়ে চলে যায় ময়রাডাঙা চা বস্তিতে।

অমিয় বর্ধনের সঙ্গে আলাপ হল। মিরিক, সুকনা শেষ করে এখন জলদাপাড়ার সাঁকোবাবু তিনি। চোরাশিকারি আগলাতে তাঁর নজরদারি। সারাটা দিন একশো মাইলের জঙ্গল বুকে নিয়ে, বন্যপ্রাণীর ডেরা ছুঁয়ে, নির্জনতা গায়ে মেখে জীবন কাটানো— কী করে পারেন? স্রেফ অভ্যাস মশাই। বলেন বর্ধনবাবু। একলা ব্রিজের গুমটি ঘরে বসে তিনি দেখেন গণ্ডার ঘুরছে তোর্সা নদীর জল ছুঁয়ে, হাতির দল চেপ্টি ঘাস ছিঁড়ে খায়, বনশুয়োর খয়ের গাছের শিকড় খুঁড়ছে। সন্ধ্যার মুখে ঝপ ঝপ ধনেশ পাখি উড়ে যায় মারাখাতার জঙ্গলে। আর বাঘের ভয়? গণ্ডার থাকলে তার কাছে বাঘ কোথায়? বর্ধন বলেন। গণ্ডারের প্রস্রাবের তীব্র ঝাঁঝ ওরা সইতে পারে না। এখানে বদলি হওয়া ইস্তক বাঘ বাবাজির হুঙ্কার তিনি পেয়েছেন, চোখে পড়েনি এখনও।

রাত বেড়েছে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। কোথায় কোটরা ডাকে। হাতির মৃদু বৃংহন। কাঠের বাংলোয় বসে দৃষ্টি পাতা আছে সবুজ প্রাঙ্গণে। চাঁদ লেগেছে টাওয়ারে। কুয়াশার ধোঁয়া উড়ছে বাতাসে। এই সময় কোন সুন্দর যেন নেমে আসে কুঞ্জনগরে। টুপটাপ রুদ্রাক্ষের পাতা ঝরা শব্দে সে আসে, চাম্পা ফুলে সফেদ জ্যোৎস্নাচ্ছটায় তার আবির্ভাব। আকাশে উড়ে উড়ে রাতচরা সেই বার্তা জানায়। বুড়ি তোর্সায় চাঁদ লেগে ঝিকমিক। পিচ কালো করিডোরে ঘোরে দামাল বাইসন, হগ ডিয়ার, টাস্কার।

১৯৯৬ সালে পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি গঠিত হল এখানে। স্থানীয় মানুষকে জঙ্গল নিধন থেকে ফেরাতে তাদের উন্নয়নকল্পে কিছু উপায়ের কথা ভাবা হল। এই নদীর তীরে পিকনিক স্পট থেকে ভাবনার সূত্রপাত আর ১৯৯৯ সালে তার কার্যকারিতার শুরু। এখানে পর্যটন ঘিরে যত উন্নয়ন হবে তার থেকে উপার্জিত

অর্থের একটা অংশ সংলগ্ন গ্রাম পাবে। ভাবনা আর কর্ম এগোতে থাকে বনদপ্তর এবং পঞ্চায়েতের বোঝাপড়ায়। কাজে গতি লাগল বন আধিকারিক কল্যাণ দাস যুক্ত হতেই। অরণ্যে, উদ্যানে, সবুজ প্রাঙ্গণে, টাওয়ারে, নৈঃশব্দের মায়াজালে সর্বোপরি পর্যটক আবাসে শোভিত হয়ে কুঞ্জনগর এক দারুণ ট্যুরিস্ট স্পট হিসাবে উপস্থিত হল ২০০৩-এর শেষে। পর্যটকের ঢেউ লাগল কুঞ্জনগরে। ততদিনে জঙ্গলে চোরাশিকার বন্ধ হয়েছে। গাছ কাটা কমেছে। কুঞ্জনগরের সমগ্র কর্মকাণ্ড থেকে গৃহীত অর্থের একটা অংশ গ্রাম তহবিলে জমা হতে থাকল। লছমনডাবরি, ময়রাডাঙা, কাদম্বিনী, কুঞ্জনগরের মানুষ পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প থেকে পেল আয়ের ঠিকানা। আর রহস্য-রোমাঞ্চের এই পরমনিধি পেয়ে ট্যুরিস্ট যে তুষ্ট, অকপটে কবুল করতে বাধা নেই।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

শিয়ালদা থেকে তিস্তা-তোর্সায় পরদিন ভোরে ফালাকাটা নেমে স্টেশন থেকেই মোটরে ৮ কিলোমিটার কুঞ্জনগর।
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন:
ডি এফ ও
কোচবিহার, বন্যপ্রাণী বিভাগ, নীলকুঠি
ডাক ও জেলা- কোচবিহার
চারটি ঘর। প্রতি ঘরে দ্বিশয্যা। ঘরপ্রতি ২০০ টাকা প্রতিদিন। খাওয়া— ন্যূনতম মূল্য ১০০ টাকার মধ্যে মাথাপিছু প্রতিদিন। সঙ্গে মশার দাওয়াই, জিওলিন রাখবেন।

'ভ্রমণ' অক্টোবর, ২০০৪

পাহাড়ি গ্রাম রকশম

কৌশিক মিত্র

গ্রামের নাম রকশম। অনেকে বলে রকচ্ছম। উচ্চতা ২,৯০০ মিটার। সিমলা থেকে হিমাচলের পূর্ব দিকে ২২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এগিয়ে, একে একে রামপুর, জিওরি, টাপরি পেরিয়ে পৌঁছলাম করচ্ছম। ইতিমধ্যেই 'দেবভূমি কিন্নর' লেখা তোরণ পেয়েছি। পেরিয়েছি শতদ্রুর ওপর গা ছমছমে 'ওয়াংটু' ব্রিজ। সিমলার খানিক পর থেকেই পথের সঙ্গী শতদ্রু। করচ্ছমে আরেকবার শতদ্রু পেরোতে হল। সিমলা থেকে করচ্ছম ২২০ কিলোমিটারের মতো। করচ্ছমেই প্রথম দেখা মিলল বসপার। শতদ্রুর বুকে এসে মিশেছে। করচ্ছম থেকে রকশমের পথ গিয়েছে বেঁকে। ২০ কিলোমিটার এগোলে সাংলা। আরও ১০ কিলোমিটার পর রকশম— এক পাহাড়ি গ্রাম।

রকশম যেদিন পৌঁছিলাম সেদিন বিকেলের শেষ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। সন্ধ্যায় তুমুল বৃষ্টি, সন্ধে গড়িয়ে রাত হচ্ছে, তখনও চলছে বৃষ্টি। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তবে কি হিমাচলের সবচেয়ে সুন্দর উপত্যকা এ যাত্রায় মেঘলা থেকে যাবে! বৃষ্টির গতি দেখে মনে আরেক উত্তেজনা। কতটা বৃষ্টিপাতের পরে তুষার ঝরা হয়? খবর এল ১০ কিলোমিটার দূরের গ্রাম ছিটকুলে বরফ পড়ছে। রাত নটা নাগাদ বৃষ্টি পুরোপুরি থেমে গেল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। তারাদের দেখা নেই।

পাহাড়ে ঘুম খুব গাঢ় হয়। মাঝরাতে একটু আধটু ঘুম ভাঙে ঠিকই, কিন্তু অনায়াসে লেপ আরেকটু টেনে নিয়ে ঘুমের রাজ্যে চলে যাওয়া যায়। মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে পুরনো অভ্যেস জানলার পর্দা সরিয়ে একবার দেখা। রাত দুটোয় জানলার কাছে গিয়ে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের মুখোমুখি। গোটা উপত্যকা চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। ঝকঝকে জ্যোৎস্নায় নদীর জল একেবারে রুপোলি।

ভোরে উঠে বেরিয়েছি। গতকালের পাহাড়গুলো সব সাদা শিরস্ত্রাণ পরেছে। সারারাত বরফ পড়েছে। এও এক অভিজ্ঞতা, ছিল কালো, হয়ে গেল সাদা। গাড়ির কাচেও বরফের হালকা আস্তরণ। মুখোমুখি পাহাড়ের মাথায় হলুদ আলো এসে পড়েছে। এত কাছে, মনে হয় এক্ষুনি হেঁটে পৌঁছনো যাবে। চারপাশের পাহাড় বেশ উঁচু হওয়ায় সূর্য অনেকটা উঠে যাওয়ার পর আলো এসে পৌঁছচ্ছে। ঘরে ফিরলাম। ঘড়িতে সকাল আটটা। থার্মোমিটার বলছে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি।

'রক' অর্থাৎ 'পাথর', 'ছম' অর্থাৎ 'সেতু'— দুয়ে মিলে পাথরের সেতু। নদীর নাম বসপা।

রকশমের প্রতিটা বাড়িই হিমাচলি শৈলীতে তৈরি। তবে আজকাল ছাদে স্লেট পাথরের বদলে টিনের ব্যবহারই বেশি। গ্রামে স্কুল আছে, একটা ডাক্তারখানাও রয়েছে। আর আছে বসপা। সারাদিন নিজের ছন্দে বয়ে চলেছে। রাতে ঝমঝম আওয়াজে এক অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়। রকশমে থাকলে বসপার কাছে যাওয়া যায়, ইচ্ছে হলে জলে পা ডুবিয়ে বসেও থাকা যায়। নদীর ওপর একটি কাঠের সেতু। ওপারে একটি ছোট্ট তিব্বতি বসতি। আর সবুজ মাঠ। কাঠের সেতু মানুষ যত না পেরোয় তার বেশি পেরোয় বোধহয় গ্রামের গরু আর ভেড়ারা। ওরা রোজ ওপারে ঘাসের খোঁজে যায়।

সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে বসপার দিকে ওপর থেকে দৃষ্টি নামিয়ে আনলে পরপর চোখে পড়ে— নীল আকাশ, বরফ ঢাকা পাহাড়চূড়া, উপত্যকার সবুজ সমতল আর বসপার স্বচ্ছ সবুজ জল। অসংখ্য ছোট বড় পাথরের মধ্য দিয়ে বাঁধ না মানা জল সহস্রধারায় বয়ে চলেছে। কখনও পাথরে ধাক্কা খেয়ে চলকে উঠছে। প্রকৃতির কাছে গেলে, জগতের চিরকালীন ঘটনাগুলো যে কত সুন্দর তার উপলব্ধি হয়। একেকটা সূর্যোদয়, পাহাড়ি বাঁকে হঠাৎ দেখতে পাওয়া তুষারচূড়ার সারি, নদীর জলের ঝিলিমিলি এমন সব খণ্ডমুহূর্তের জন্ম দেয় যাকে আঁকড়ে থাকা যায় সারাজীবন।

রকশম গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। নাম রাজেশ। সেই হল আমাদের গাইড। আমরা যাব সাংলা। তবে বড় রাস্তা দিয়ে নয়। গ্রামের পথে, আপেল খেতের মধ্য দিয়ে। ইচ্ছে ছিল বসপার তীর ধরে হাঁটার। রাজেশ বোঝাল সেটা বেশ কঠিন কাজ। একেবারে নদী বরাবর হাঁটা অসম্ভব। বেশ কিছুটা জায়গায় নদীর গতিপথ সরু গিরিখাতের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। তার ওপর সাংলার কাছাকাছি গিয়ে পাহাড় দূরে সরে গিয়ে উপত্যকা আরও চওড়া হয়েছে। বসপা বয়ে চলেছে তার এক ধার দিয়ে। বড় রাস্তা এবং সাংলার জনবসতি তার অপর প্রান্তে। সেই কারণে সাংলায় বসপাকে চোখে পড়ে, কিন্তু তার সঙ্গ পাওয়া যায় না। অন্তত ঘণ্টাখানেক হেঁটে গেলে নদীতীর।

গাড়ি চলাচলের রাস্তা থেকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেলাম। খানিক নামতেই দুদিকে আপেলবাগান। অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে গাছগুলোতে অঢেল আপেলের সমারোহ। সাংলা অঞ্চলের আপেল পাড়া হয় অক্টোবরে। অথচ হিমাচলের আরেক বিখ্যাত আপেলের জায়গা কুলু উপত্যকায় আপেল পাড়া তখন শেষ। কুলুতে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই গাছ ফাঁকা। সাংলার আপেল টকটকে লাল। অত্যন্ত সুস্বাদু! রাজেশ বলল, হাঁটতে হাঁটতে তেষ্টা পেলে আপেল খেতে। পরখ করে দেখলাম কথাটা একশোভাগ ঠিক। দুপাশের বাগান থেকে খানিকক্ষণ অন্তর রাজেশ আপেল তুলে আনছিল। আমার পিঠের ছোট ব্যাগটা ছিঁড়ে পড়ার

জোগাড়। পথে কিছু গ্রামের বাড়িও পড়ল। আপেলের মরসুম হওয়াতে চারদিকে ব্যস্ততা। আপেল তুলে বাছাই করে বাক্সবন্দী করা, তারপর সেগুলো রাস্তায় দাঁড়ানো ট্রাকে বোঝাই করা। মাঝেমধ্যেই গাছের নিচে আপেলের স্তূপ চোখে পড়ছে, বাক্সবোঝাই হওয়ার অপেক্ষায়। পাহাড়ি পথে খেত থেকে ট্রাকে আপেলের বাক্স বয়ে নিয়ে গিয়ে রোজগার হচ্ছে গ্রামের ছেলেদের। একেকবারে ৩০০ টাকা পিঠে ৬০ কেজির বোঝা। তবে কিনা এমন রোজগারের সুযোগ এই একটা মাস। প্রত্যেক কিন্নরবাসীর মাথায় অবিকল এক সবুজ টুপি। কুলুর লোকেদেরও এক নিজস্ব ডিজাইনের টুপি আছে। কিন্তু তার ব্যবহার কম। বরং সেটা ট্যুরিস্টদের কেনাকাটার তালিকায় স্থান পায় বেশি। কিন্নরের টুপি এক কাঠি এগিয়ে। কুলুর টুপি যদি ২৫ টাকা, তো কিন্নরের টুপি ২৫০ টাকা। মাথার কাছটা গরম কাপড়ে তৈরি আর চারপাশের গোল অংশটা সবুজ কাপড়ের। সবুজ কাপড়টা একটা ফ্ল্যাপের মতো। দরকার পড়লে সেটা নামিয়ে কান ঢাকা দেওয়া যায়। এছাড়া আছে কিন্নরীদের শাল। কমপক্ষে ২,০০০ টাকা। সাদামাটা ছাই রঙের গা আর এক সরু রঙিন পাড়। খাঁটি পশম।

আরও এগিয়ে পৌঁছে গেলাম সাংলা উপত্যকার সবচেয়ে বড় গ্রাম বটসেরিতে। অন্তত দুশো লোকের বাস। বহু পুরনো একটি মন্দির ছিল। এক বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে যায়। সেই একই জায়গায় একটি নতুন মন্দির তৈরি হচ্ছে গ্রামের লোকেদের শ্রমে এবং অর্থে। সকালে রওনা দিয়ে ইতিমধ্যেই দুপুর দেড়টা। শহুরে শরীরে আর হাঁটার ধকল সইল না। অগত্যা বড় রাস্তায় ফিরে গাড়ি চেপে সাংলা।

প্রয়োজনীয় তথ্য

রকশমে থাকা কিন্নর ভ্রমণের একটা অংশ। সারাহান, সাংলা, কল্পার মতো জনপ্রিয় জায়গাগুলির পাশাপাশি রকশমের মতো অল্পচেনা জায়গাতে থাকাও বেশ আনন্দের। দুরাত অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায়। একটিই ভালো থাকার জায়গা রকশমে—
রূপিন রিভার গেস্টহাউস। মালিক কৈলাস বিলানতু।
গেস্টহাউসে পাঁচটি ঘর— দুটি সংলগ্ন বাথরুম সহ। তিন শয্যাবিশিষ্ট ঘরটির অবস্থান সবচেয়ে ভালো।
রামপুর ও কল্পা দুদিক থেকেই বাস যাচ্ছে সাংলা। সাংলা থেকে ছিটকুলগামী বাসে (দিনে চার-পাঁচটি বাস) গিয়ে নামতে হবে রকশম। সাংলা বাজার থেকে স্থানীয় গাড়ি ভাড়া করেও যাওয়া যায়।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৩

আন্দামানের দ্বীপে

মৃণাল গুপ্ত

মেঘমেদুর আকাশ। নিচে দিগন্ত প্রসারিত কালাপানি। পর পর তিনদিন জাহাজে বসে একই দৃশ্য দেখে চিত্ত প্রায় বিকল। ঠিক তার পরদিন সকালে ঘুম চোখে কেবিনের জানলায় চোখ রেখে দিগন্তে যাকে প্রথম দেখি তার নাম মায়াবন্দর। আকাশ জুড়ে তখনও মেঘ। অথচ সবুজ শ্যামল মায়াবন্দরের মাথার ওপর সাতরঙের বিশাল রামধনু। মায়াবন্দরের মায়ায় বাঁধা পড়লাম। তড়িঘড়ি জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালাম। রামধনু মিলিয়ে গেছে। কোথা থেকে একফালি রোদ ফ্লাড লাইটের মতোই মায়াবন্দরের মাথায় এসে পড়ল। জাহাজ জেটিতে ভিড়ল। ব্যস্ততা শুরু হল। সিঁড়ি লাগল। যাত্রী নামল। মাল খালাস হল। এরই মধ্যে মায়াবন্দরের ওপর সজোরে বৃষ্টি নামল। জাহাজ থেকে না নেমেই সেই প্রথম মায়াবন্দরকে দেখেছি।

২০০২-এর ২৮ সেপ্টেম্বর। এবার চলেছি মায়াবন্দর। ভোর ৫টায় পোর্টব্লেয়ার থেকে মারুতি ছাড়ল। ১২ ঘণ্টার সুদীর্ঘ পথ। প্রথমে ১০২ কিলোমিটার সরাসরি উত্তরে গেলে দক্ষিণ আন্দামানের এক প্রান্তে মিডল স্ট্রেট জেটি। এই পথটি বড় বৈচিত্রময়। পোর্টব্লেয়ার সিটির শহুরে মেজাজ— অফিস, পাকা বসতি, এয়ারপোর্ট— ছাড়িয়ে এসে শহরতলি। ছাড়া ছাড়া বসতবাটি। সামনে ফুলের কেয়ারি। এগুলো সরে গেলে দুপাশে চোখে পড়ে যেন হাল্কা হলুদ মাখানো সবুজের শ্যামলিমা। ধানখেত, সুপারি-নারকেলের বাগিচা। তাদেরই ছায়ায় ছোট ছোট ছিমছাম বসতবাটি। আঙিনায় জবা, টগর, বাতাবি লেবুর গাছ। এরপর এল পাহাড়ি নির্জন বনপথ। চলতে গিয়ে একবারও মনে হয়নি যে দুই পাশেই সমুদ্র আমাদের সঙ্গে চলেছে। সকাল ৮টায় পৌঁছে গেলাম মিডল স্ট্রেটে। গাড়ি পারাপারের জন্য বার্জ দাঁড়িয়ে। অপেক্ষা করতে হল ২-৩টি যাত্রীবাহী গাড়ির জন্য। আসামাত্রই বার্জ ছাড়ল। সমুদ্র এখানে ঘন নীল। এই জন্যই কি পরপারের জেটির নাম নীলাম্বর জেটি? জেটি পেরিয়ে যে জায়গায় উঠলাম তার নাম বারাটাং। তামিল মালয়ালাম বসতি। এখানে পুলিশ পোস্টে এগোবার অনুমতিপত্র দেখাতে হল। পর পর গাড়ির কনভয়ের সামনে পিছনে পুলিশ ভ্যান। ঘন বনের

মধ্য দিয়ে ২২ কিলোমিটার ঢেউ খেলানো পাহাড়ি পথে চলেছি। জারোয়া আদিবাসীদের বসতির মধ্য দিয়ে অনেকটা পথ।

বারাটাং দ্বীপ প্রায় শেষ হয়ে এল। আমরা এখন গান্ধীঘাটের কাছাকাছি।

হঠাৎ গাড়ি থামতেই হাত আর লাঠি দিয়ে দুমাদুম গাড়ির বডিতে মারতে শুরু করল ছোট্ট একটা জারোয়াদের দল। দরজা খুলতে চায়, জানলার কাচ নামাতে চায়। পোর্টব্লেয়ার থেকে এক কাঁদি কলা, বিস্কুট, চানাচুর এনেছিলাম। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হব জেনেই। জানলার ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে তা বিলি করতেই আমাদের গাড়ি ছেড়ে অন্য গাড়ি ধরল। এইটুকুই তো আব্দার। একটু সহ্য করলে ক্ষতি কী!

বার্জে পর পর গাড়িগুলো উঠে গেল। আমরাও দাঁড়াবার জায়গা করে নিলাম। নোনা জলের ধারে শিকড়ে ভর দিয়ে অজস্র ঠেসমূল গাছ।

উত্তরা জেটিতে নামলাম। এবার মায়াবন্দরে পৌঁছবার জন্য বাকি ১২৪ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৪৫ কিলোমিটার জারোয়া এলাকা। বেলা বারোটার আগেই রঙ্গত পৌঁছে গেলাম। গাড়িতে রঙ্গতের প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে বেটাপুরের আম্রকুঞ্জে এসে থামলাম। অসাধারণ বিচ! হাত পা ছড়িয়ে নানা ধরনের গাছ বিচে শুয়ে। কাছাকাছি একটা গেস্টহাউস আছে। নাম হক বিল নেস্ট। ডিসেম্বর থেকে এপ্রিলের মধ্যে যাঁরা এখানে আসেন তারা বিচে চাঁদের আলোয় অজস্র কচ্ছপের সমাবেশ দেখেন। ওরা ডিম পাড়তে বিচে আসে। শুনলাম কিছুটা দূরে পঞ্চবটী বলে একটি স্পট রয়েছে। সূর্যোদয় বিচ থেকে অপূর্ব দেখায়।

বেলা দেড়টায় আমরা স্বদেশনগরে এসে গেলাম। ছোট গঞ্জ। স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দোকান-পসার আছে। আর আছে সবুজের শ্যামলিমা। ধানখেত, বাঁশঝাড়, সুপারিবন, কেয়াঝোপ।

বিকেল সাড়ে চারটায় মায়াবন্দরে ঢুকলাম। পঞ্চাশের দশকে পি সি রায় নামে এক বাঙালি এখানে কাঠের ব্যবসার জন্য ছোট বসতির পত্তন করেন। তাঁর স্ত্রীর নামেই নাকি বন্দরের নামকরণ। ব্যবসা যখন জমে ওঠে তখন মেইন ল্যান্ড থেকে কাঠ টানার জন্য হাতি আসে, ঢালু পাহাড়ে লাইন পাতা হয়। এখন ব্যবসার সেই দিন নেই। এখন এখানে প্রায় ১৫ হাজার লোকের বাস। পূর্ত, সেচ, বন, মৎস্য, শিক্ষা, পুলিশ, হাসপাতাল— সব ব্যবস্থাই আছে। রয়েছে হেলিপ্যাড। পোর্টব্লেয়ার থেকে রাতে নিয়মিত এখানে জাহাজ ছাড়ে। কলকাতা থেকে দুমাসে একবার বড় জাহাজ থামে।

আমাদের গাড়ি পি ডাব্লু ডির বাংলো, চত্বরে ঢুকে গেল। সমুদ্রপাড়ে জেটির অদূরে বিস্তীর্ণ চত্বরে থাকার খাসা ব্যবস্থা। সবুজ লনের প্রান্ত সীমায় পাকা সিঁড়ি পাকদণ্ডী হয়ে সমুদ্র পর্যন্ত নেমে গেছে। শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখবার জন্য মাথার ওপর চাঁদোয়া। ডাইনে বাঁয়ে বড় বড় মাকড়া পাথরের সারি। তার ওপর

জোয়ার আছড়ে পড়ে। কাঁকড়ারা বসে থাকে।

২৯ সেপ্টেম্বর। প্রাতরাশ সেরেই মায়াবন্দর দেখতে বেরোলাম। চার কিলোমিটার গাড়িতে গিয়ে কারমাটাং সি বিচ। পথে ট্যুরিজমের চমৎকার গেস্টহাউস। মহাত্মা গান্ধি ডিগ্রি কলেজ, বার্মিজ বসতি। কারমাটাং বিচেও নানা ধরনের কাটুম-কুটুম পড়ে আছে। জানি না অবনঠাকুর আন্দামানে এলে কী করতেন। মায়াবন্দরের ঠিক ২ কিলোমিটার দূরে বালুডেরা বিচ। বনানী ঘেরা মায়াময় বিচ। ছোট অথচ আকর্ষণীয়।

মায়াবন্দর থেকে দৃষ্টির নাগালেই পাঁচটি দ্বীপ। এদের মধ্যে একটির নাম এভিস আইল্যান্ড। জনবসতি শূন্য। ট্যুরিস্টদের ভিড় নেই। যাতায়াতে সামান্য ঝুঁকি। তাই সে এখনও রত্নদ্বীপ। ডুঙি চড়ে আমাদের এবারের যাত্রা। যা আন্দামানের আদিবাসীরা ব্যবহার করে থাকে। একটু আধুনিক সংযোজন অবশ্য ছিল। দাঁড়ের বদলে ডিজেল ইঞ্জিন। বার কয়েক টাল খেয়ে জেটি থেকে কোনওমতে আটজন ডুঙিতে উঠলাম। ঢেউয়ের মাথায় দুলতে দুলতে আমরা এগিয়ে চললাম। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর এভিস দ্বীপে নামলাম।

নির্জন দ্বীপ। নারকেলবীথির প্রাধান্য। বড় বড় প্যাডক, সুন্দরী, শিরীষ ও গর্জন গাছও আছে। দ্বীপকে ঘিরে বালুকাবেলা। সেখানে নানা রং ও নানা মাপের ঝিনুক, শঙ্খ, মৃত কোরাল, ড্রিফট উড। নির্জন প্রকৃতির কোলে যেন এক প্রাকৃতিক সংগ্রহশালা।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

ভ্রমণ মরসুমে প্লেন ও জাহাজের টিকিট নিশ্চিত করা জরুরি। জাহাজে টিকিটের খবরাখবর:

শিপিং হাউস

১৩, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

☎ ২২৪৮-২৩৫৪, ২২৪৮-৪৯২১

পোর্টব্লেয়ার বাসস্ট্যান্ড থেকে ভোর ৫টায় মায়াবন্দর যাবার এ সি, নন-এ সি বাস ছাড়ে। সময় ১০ ঘণ্টা। ভাড়া গাড়ি নিলে পথের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে যাওয়া যায়। পোর্টব্লেয়ার থেকে রাতে স্টিমার সার্ভিস আছে। ভাড়া খুব কম। আশপাশে সবকিছু দেখে রঙ্গত ও হ্যাভলক ঘোরা যায়। রঙ্গত-হ্যাভলক-পোর্টব্লেয়ার জাহাজ যাতায়াত করে।

কী দেখবেন

চলতি পথে সমুদ্রের সৌন্দর্য ছাড়া হাতে ৪-৫ দিন সময় থাকলে লঞ্চে কালীপুর, কালীঘাট, ডিগলিপুর যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন

রঙ্গতে কাটবার্ট বে-র কাছে সরকারি আবাস হক্সবিল নেস্ট। বিচ থেকে দূরে কম ভাড়ার হোটেলও আছে।

হ্যাভলক দ্বীপে থাকার জন্য রয়েছে সরকারি ডলফিন কটেজ।

তাপমাত্রা

২৩ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সারা বছর সুতির হাল্কা জামাকাপড় আরামপ্রদ। আন্দামান নিকোবরের খবরাখবরের জন্য যোগাযোগ করুন:

আন্দামান ও নিকোবর পর্যটন

৩-এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০১৭

☎৩০৯৪-৩৬৩০

ভ্রমণের ভালো সময় অক্টোবর থেকে মার্চ।

'ভ্রমণ' মে, ২০০৩

কুসুমাস্তীর্ণ বার্সে

সন্দীপন মজুমদার

কুসুমাস্তীর্ণ পথ। আক্ষরিক অর্থেই। বার্সেতে পৌঁছনোর জন্য হিলে থেকে পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ যে রাস্তায় আমরা ট্রেকিং করলাম তার অনেকটাই রডোডেনড্রন ফুলের পাপড়িতে আবৃত। গোটা রাস্তাটাই রডোডেনড্রন ফুলের দৃশ্যে অসাধারণ। রাস্তার দুপাশে সারি সারি রডোডেনড্রন গাছ দাঁড়িয়ে প্রকৃতির খেয়ালে। কী অসাধারণ তাদের ফুলের রং, কী অসাধারণ তাদের বৈচিত্র্য। লাল, গোলাপি, সাদা— কত রকমের রডোডেনড্রন থোকা থোকা ঝুলে রয়েছে। আবার এই রংগুলির মধ্যেও গাঢ়, হাল্কা মিশিয়ে হরেক রকমের বৈচিত্র্য। অসাধারণ এই পায়ে পায়ে পথ চলা। সিঙ্গালিলা অভয়ারণ্যের এই অংশে হেমলক, বাঁশ, দেবদারু, ওক, ফার এইসব বড় বড় গাছ ছাড়াও আসল সৌন্দর্য এই রডোডেনড্রন। এই পাহাড়ি রাস্তায় রডোডেনড্রন দর্শনে রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ল—'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রোডোডেনড্রন গুচ্ছ'।

বার্সে আসার আগে আমরা গিয়েছিলাম রাবংলা, পেলিং। সেখানে প্রকৃতির মুখ ভার, কাঞ্চনজঙ্ঘা অস্পষ্ট। আমাদের মনও ভারাক্রান্ত। পেলিং থেকে জিপে যখন বার্সের উদ্দেশে রওনা হলাম তখনও আকাশে মেঘের খেলা। মাঝেমধ্যে দুয়েক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে। পেলিং থেকে জোরথাং হয়ে হিলে যেতে সময় লাগে আড়াই ঘণ্টা। রাস্তা খুব সুন্দর। ছোট ছোট ছবির মতো পাহাড়ি গ্রাম, ধাপ চাষ, এঁকেবেঁকে বয়ে চলা নাম না জানা নদী। পথে পড়ল ছোট্ট সুন্দর গ্রাম দ্রামদিন, সোমোবারিয়া, ওখরে। ওখরে সিঙ্গালিলা অভয়ারণ্যের বাইরে বলে এখানকার লজগুলিতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে নয় কিলোমিটার দূরে হিলে সিঙ্গালিলা অভয়ারণ্যের ঘোষিত এলাকার মধ্যে বলে এখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। সেরকম ভালো কিছু লজও নেই। ফরেস্ট রেস্টহাউসের অবস্থা বেহাল। প্রসঙ্গত বলে রাখি, বার্সে যাবার পথে হিলে পর্যন্ত গাড়ি যায়। এরপর দুটি পা-ই ভরসা। আমরা যখন হিলে পৌঁছলাম তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আমরা রাতে গ্রামের একটি বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। স্থানীয় মানুষের ব্যবহার খুবই আন্তরিক। রাতের খাবার ব্যবস্থা এঁরাই করলেন। বার্সে যাবার উৎসাহী যাত্রীদের উচিত হবে রাতে ওখরেতে আরামদায়ক ব্যবস্থার মধ্যে কাটিয়ে পরদিন গাড়িতে হিলে পৌঁছে

বার্সের উদ্দেশে হাঁটা শুরু করা।

এপ্রিল-মে মাস বার্সে এবং তার আশপাশের অঞ্চল চলে যায় ফুলেদের দখলে। বসে যায় রং- বেরঙের ফুলেদের জলসা। শুধু ফুল আর ফুল। যেদিকে দুচোখ যায় শুধু ফুল। কোথাও যেন লাল রডোডেনড্রনের বনে আগুন লেগেছে, আবার কোথাও সাদা রডোডেনড্রনের শ্বেতচন্দন ফোঁটায় নিজেকে সাজিয়ে নিয়েছে সুন্দরী বার্সে। এছাড়াও হলুদ, বেগুনি, নীল হরেক কিসিমের ফুল ফুটে আছে পথের ধারে। আর আছে স্নেক লিলি, কোবরা লিলি ইত্যাদি বিরল প্রজাতির অসংখ্য অর্কিড। বছরের এই সময়টাতে সত্যিই নন্দনকানন হয়ে ওঠে বার্সে।

দশ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত বার্সেতে থাকার জায়গা একমাত্র 'গুরাস কুঞ্জ'। সিকিমি ভাষায় গুরাস শব্দের অর্থ রডোডেনড্রন, সেই থেকেই এই নামকরণ। এই উচ্চাতায় ভালো থাকা খাওয়ার জন্য ধন্যবাদ দিতেই হয় অধীর পাল মশাইকে। সদালাপী, মিষ্টভাষী এই বাঙালি ভদ্রলোক লিজ নিয়ে চালাচ্ছেন এই গুরাস কুঞ্জ। অধীরবাবুই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন গুরাস কুঞ্জের চারপাশ। ডেন্টাম ও সোরেং থেকেও হেঁটে আসা যায় বার্সেতে। তবে দু জায়গা থেকেই হাঁটা রাস্তার পরিমাণ হিলে থেকে অনেকটাই বেশি। অভয়ারণ্যের মধ্যে বলে এখানেও বিদ্যুৎ নেই।

ট্যুরিস্টের ভিড়বর্জিত বার্সেতে শান্ত পরিবেশে শুধু প্রকৃতিকে উপভোগ করা যায়। এখানে হিমালয়ান ফেজেন্ট, ব্লু এবং ব্ল্যাক ম্যাগপাই ইত্যাদি আরও নাম না জানা পাখির বাস। আর আছে রংবেরঙের প্রজাপতি। ভাগ্য ভালো থাকলে এই অঞ্চলে বার্কিং ডিয়ার, রেড পান্ডা, ভালুকেরও দেখা মিলতে পারে। আমাদের অবশ্য শুধু বার্কিং ডিয়ারের ডাক শুনেই খুশি থাকতে হল এ যাত্রায়। মখমল ঘাসের গালিচার ওপর নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ানো যায় যেদিকে দু চোখ যায়।

প্রথম দিনটা কাটল মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। বিকেল হতে না হতেই বৃষ্টি শুরু হল। রাতে যখন ঘুমোতে যাচ্ছি তখনও ঘরের ছাদে বৃষ্টির টুং টাং পিয়ানো। ভোরবেলা ঘুম ভাঙল চৌকিদারের ডাকে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি সামনে বিশাল রাজকীয় কাঞ্চনজঙ্ঘা। সূর্যের প্রথম নরম লালচে আলো রূপালি কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়াও পান্ডিম, কুম্ভকর্ণ, সিনিয়লচু, নেপালের বেশ কিছু শৃঙ্গ এমনকী ডানদিকে ভুটানের থ্রি সিস্টার শৃঙ্গও পরিষ্কার দৃশ্যমান এখান থেকে। রডোডেনড্রনে ছেয়ে থাকা চারপাশ আর সামনে এই মহিমময়, রাজকীয় কাঞ্চনজঙ্ঘার অনবদ্য উপস্থিতি থেকে বিদায় নিতে মন চায় না।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

যে কোনও ট্রেনে বা বাসে নিউ জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি পৌঁছে সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে জোরথাং হয়ে সরাসরি হিলে। যেহেতু এই রাস্তায় বাস চলাচল কম তাই

গাড়ি ভাড়া করে চলাই উচিত হবে।ওখরেতে রাত্রিবাস করলে সেখান থেকেও সকালে গাড়ি নিয়ে নয় কিলোমিটার দূরে হিলে আসতে হবে। হিলে থেকে পাঁচ কিলোমিটার হাঁটাপথ বার্সে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে হিলে পুরো জিপ ভাড়া পড়বে ১,৫০০-১,৬০০ টাকা। ফেরার দিন জানিয়ে হিলেতে গাড়ি আগে থেকে বলে রাখতে হবে। হিলে থেকে বার্সে পর্যন্ত মাল বইবার জন্য পোর্টার কাম গাইড পাবেন ১৫০-২০০ টাকার মধ্যে।

কোথায় থাকবেন

হিলেতে ফরেস্ট রেস্টহাউস বা কোনও স্থানীয় লোকের বাড়িতে রাত কাটাতে পারেন। খাওয়াও সেখানেই। ওখরেতে এম এন শেরপার লজ আছে। ডাবল বেডরুম ২৫০-৩০০ টাকা। খাওয়া জনপ্রতি প্রতিদিন ১০০ টাকা। ডর্মিটরিও আছে। বার্সেতে থাকার জায়গা 'গুরাস কুঞ্জ'। একটি ডাবল বেডরুম ১০০০ টাকা। আর আছে দুটি ডর্মিটরি ২৫০ টাকা প্রতিশয্যা। খাওয়া ওখানেই জনপ্রতি প্রতিদিন ৩০০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ:

এস কে ভৌমিক, এনডেভার ট্যুরস ☎২৪৮৬-০৫৮৩, ২৪৭৪-৯১৯৫

'ভ্রমণ' এপ্রিল, ২০০৫

পাংগোটের চিতাবাঘ

দীপঙ্কর ঘোষ

জিপের হেডলাইট নেভানো, ভেতরে বসে আছি আমরা চারজন। চারপাশ যদিও অন্ধকার, তবুও দশমীর চাঁদের আলোয় ঝোপঝাড় ও গাছপালার একটা অস্পষ্ট অবয়ব চেনা যাচ্ছে। রাত এগারোটার কিছু পরে আমরা ভাবছি আর অপেক্ষা করব না, হঠাৎই সামনের নালার পাশে নজর পড়তে মনে হল সেখানে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। গাড়ির হেডলাইট নিচু নালা পর্যন্ত পৌঁছবে না, তাই স্পটলাইট জ্বালাতে হল। নালার জল পান করছে একটা চিতাবাঘ। অন্ধকারের মধ্যে কীভাবে চুপিসাড়ে সেটি নেমে এসেছে, আমরা বুঝতেও পারিনি। জোরালো আলো চোখে পড়াতে কয়েক সেকেন্ড হতবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপরে বাঁপাশে ঝোপের ভেতর একলাফে সেঁধিয়ে গেল সেই চিতাবাঘ। ক্যামেরা বার করে ফ্ল্যাশের আলো চিতাবাঘ পর্যন্ত পৌঁছবে কিনা, তা ভাবার আগেই সাবজেক্ট অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। এ হেন অভিজ্ঞতা কোনও সংরক্ষিত এলাকা, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বা জাতীয় উদ্যানে হওয়া দুষ্কর, কারণ রাতের অন্ধকারে সেখানে ঘুরে বেড়ানো নিষেধ।

আমরা ছিলাম কুমায়ুন হিমালয়ের নৈনিতাল উত্তর-পশ্চিম ফরেস্ট রেঞ্জের অন্তর্গত পাংগোট গ্রামের নিকটবর্তী জঙ্গলে। এটা কোনও সংরক্ষিত এলাকা নয়— তাই কোনও সময় ঘুরে বেড়ানোর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। সেদিন সকালেই আমরা এসে পৌঁছেছি পাংগোটে জাঙ্গল লোর বার্ডিং লজে। বিশ ঘর লোকের বসবাস এই ছোট্ট গ্রামে। আর গ্রামের সীমানা ঘেঁসে তৈরি হয়েছে বার্ডিং লজ। কয়েকটি কটেজ আর তাদের সামনের বাগান নিয়ে এই লজের বিস্তৃতি। তবে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষের জন্য রয়েছে জঙ্গলের ভেতরেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাঁবুর ব্যবস্থা। পর্বতারোহণে ব্যবহৃত ছোট তাঁবু নয়— ত্রিপলের তৈরি নাইলনের জালের জানলা লাগানো বেশ বড়সড় স্যুইস টেন্ট। ভেতরে দুটি ক্যাম্পখাট ও ছোট বেডসাইড টেবিল পাতা। গ্রামের লোকেরাই কাজ করেন এই লজে। চাল-ডাল, তেল আর মাছ বাদ দিয়ে খাওয়াদাওয়ার বাকি রসদ গ্রাম থেকেই কেনা হয়। জৈবিক সারে পুষ্ট শাক-সবজির স্বাদ অপূর্ব।

প্রথমদিন ট্রেনে কাঠগোদাম পৌঁছে সেখান থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের রাস্তায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে নৈনিতাল পৌঁছে তারপর আরও ১৫ কিলোমিটার দূরে বড়াপাথর, স্নো ভিউ পয়েন্ট, কিলবারি হয়ে পাংগোট পৌঁছতে বেলা দশটা। তাড়াতাড়ি লাঞ্চ

খেয়ে বেরিয়েছিলাম কিলবারির রাস্তায় পাখি দেখতে। আকাশ পরিষ্কার থাকায় কিলবারি থেকে ত্রিশূলের বরফঢাকা শৃঙ্গত্রয় খুব ভালো দেখা গেল। রাস্তার পাশে পাইন, ওক আর রডোডেনড্রন গাছের জঙ্গল। ইউহিনা, ব্লু ম্যাগপাই, লাফিং থ্রাশ আর সানবার্ডের জন্য যখন গাছের ডালপালার আনাচেকানাচে চোখ ঘোরাফেরা করছে, সঙ্গের একজন দেখাল ঝোপের পাশে আরেকটি পাখি। প্রথমে একটি পুরুষ কালিজ ফেজ্যান্ট চোখে পড়ল। দূরবীন চোখে দেখলাম আশপাশে আরও কয়েকটি কালিজের বাচ্চাসমেত স্ত্রী পাখিটিকে। নিশ্চিন্তে তারা জঙ্গলের মাটি থেকে কী যেন খুঁটে খাচ্ছে। রাস্তা ছেড়ে নালার ধারে নামছি, উল্টোদিকের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে গিয়ে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে একটি বার্কিং ডিয়ার। একপলক দাঁড়িয়ে সে ডাকতে ডাকতে জঙ্গলের ভেতর পালিয়ে গেল। সঙ্গের গাইড বললেন, সন্ধ্যার পরে নালায় চিতাবাঘ প্রায়ই জল খেতে নামে। তখনই স্থির করেছিলাম রাতে ফিরে আসব ওই জায়গায়। তবে পায়ে হেঁটে না গিয়ে গাড়িতে যাওয়াই সমীচীন হবে, বললেন গাইড। এরপর প্রথমদিন রাতের অভিজ্ঞতা তো আগেই লিখেছি। রাতে স্কপস আউলের ডাক শুনে ঘুমিয়ে পড়েছি।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে কিছুটা দেরি হয়ে গিয়েছিল। কটেজের দরজা খুলে বেরিয়ে দেখি সামনে এক আশ্চর্য দৃশ্য। কাঠের পাটাতনের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া ভাত খাচ্ছে একঝাঁক স্ট্রিকড লাফিং থ্রাশ আর দুটি ব্ল্যাক হেডেড জে। কিছুটা ছোট থ্রাশগুলিকে ভাগিয়ে বেশি ভাত খেয়ে যাচ্ছে দুটি জে। তাদের পিছনে মাটি থেকে ভাত খুঁটে খাচ্ছে একটি ব্ল্যাক পারট্রিজ বা কালো তিতির। পাশে নাম না জানা বুনো ফুলের ঝাড়ে দুটি সানবার্ডের তড়িঘড়ি আনাগোনা। বেশ চলছিল পাখিদের খাওয়াদাওয়া। হঠাৎ তাদের পিকনিকে বাধ সাধল এক বাঁদর। বাঁদরামি করে সমস্ত ভাত পাটাতন থেকে মাটিতে ফেলে জল ছড়িয়ে বাঁদর সেখান থেকে চলে যেতেই আবার পাখিগুলি হাজির। লজের মালিক মোহিত আগরওয়াল বিশেষত পাখি দেখানোর জন্যই এই জায়গাটিকে বেছে নিয়েছেন। তাই লজ বানানোর পর যাতে সেখানে মানুষের সঙ্গে দু-চারটি পাখিরও কিছু খাবার জোটে, তার ব্যবস্থা রেখেছেন। প্রত্যেকদিন সকালে ভাত আর পাখির দানা দেওয়া হয়। বাঁদর যাতে সবসময় পাখিদের খাবারে ভাগ না বসাতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখেন লজের কর্মচারীরা। অন্তত পনেরোটি প্রজাতির পাখির আনাগোনা শুধুমাত্র লজের সামনের লনে। বেলায় রোদের তেজ বাড়তে লজের বারান্দায় বসে স্পটিংস্কোপে চোখ লাগিয়ে দূরের পাহাড়ের গাছে প্লাম-হেডেড প্যারাকিট বা ফুলচুসা পাখির ঝাঁক দেখছি। আকাশের দিকে চোখ পড়তে দেখি হাজির রামায়ণের গরুড় পাখি। ল্যামারগিয়ার বা দাড়ি শকুন এবং হিমালয়ান গ্রিফন ভালচার বা গরুড়ের একটা ঝাঁক আকাশে সোরিং করছে। ডানার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত অর্থাৎ উইংস্প্যান ছয় ফুটের বেশি শকুন গোত্রের এই পাখিগুলির। মরা জন্তুর হাড় ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে দাড়ি শকুন আকাশে উড়তে উড়তে কোনও পাথরের ওপর সেই হাড় ফেলে দেয়। পতনের আঘাতে হাড় ভেঙে গিয়ে ভেতরের মজ্জা বেরিয়ে এলে দাড়ি শকুন তা খায়।

লজের পাশের ভুট্টার খেতে হঠাৎ দেখি হাজির হয়েছে এক কেস্ট্রেল বা পোকামার

পাংগোটের চিতাবাঘ

দীপঙ্কর ঘোষ

জিপের হেডলাইট নেভানো, ভেতরে বসে আছি আমরা চারজন। চারপাশ যদিও অন্ধকার, তবুও দশমীর চাঁদের আলোয় ঝোপঝাড় ও গাছপালার একটা অস্পষ্ট অবয়ব চেনা যাচ্ছে। রাত এগারোটার কিছু পরে আমরা ভাবছি আর অপেক্ষা করব না, হঠাৎই সামনের নালার পাশে নজর পড়তে মনে হল সেখানে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। গাড়ির হেডলাইট নিচু নালা পর্যন্ত পৌঁছবে না, তাই স্পটলাইট জ্বালাতে হল। নালার জল পান করছে একটা চিতাবাঘ। অন্ধকারের মধ্যে কীভাবে চুপিসাড়ে সেটি নেমে এসেছে, আমরা বুঝতেও পারিনি। জোরালো আলো চোখে পড়াতে কয়েক সেকেন্ড হতবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপরে বাঁপাশে ঝোপের ভেতর একলাফে সেঁধিয়ে গেল সেই চিতাবাঘ। ক্যামেরা বার করে ফ্ল্যাশের আলো চিতাবাঘ পর্যন্ত পৌঁছবে কিনা, তা ভাবার আগেই সাবজেক্ট অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। এ হেন অভিজ্ঞতা কোনও সংরক্ষিত এলাকা, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বা জাতীয় উদ্যানে হওয়া দুষ্কর, কারণ রাতের অন্ধকারে সেখানে ঘুরে বেড়ানো নিষেধ।

আমরা ছিলাম কুমায়ুন হিমালয়ের নৈনিতাল উত্তর-পশ্চিম ফরেস্ট রেঞ্জের অন্তর্গত পাংগোট গ্রামের নিকটবর্তী জঙ্গলে। এটা কোনও সংরক্ষিত এলাকা নয়— তাই কোনও সময় ঘুরে বেড়ানোর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। সেদিন সকালেই আমরা এসে পৌঁছেছি পাংগোটে জাঙ্গল লোর বার্ডিং লজে। বিশ ঘর লোকের বসবাস এই ছোট্ট গ্রামে। আর গ্রামের সীমানা ঘেঁসে তৈরি হয়েছে বার্ডিং লজ। কয়েকটি কটেজ আর তাদের সামনের বাগান নিয়ে এই লজের বিস্তৃতি। তবে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষের জন্য রয়েছে জঙ্গলের ভেতরেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাঁবুর ব্যবস্থা। পর্বতারোহণে ব্যবহৃত ছোট তাঁবু নয়— ত্রিপলের তৈরি নাইলনের জালের জানলা লাগানো বেশ বড়সড় স্যুইস টেন্ট। ভেতরে দুটি ক্যাম্পখাট ও ছোট বেডসাইড টেবিল পাতা। গ্রামের লোকেরাই কাজ করেন এই লজে। চাল-ডাল, তেল আর মাছ বাদ দিয়ে খাওয়াদাওয়ার বাকি রসদ গ্রাম থেকেই কেনা হয়। জৈবিক সারে পুষ্ট শাক-সবজির স্বাদ অপূর্ব।

প্রথমদিন ট্রেনে কাঠগোদাম পৌঁছে সেখান থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের রাস্তায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে নৈনিতাল পৌঁছে তারপর আরও ১৫ কিলোমিটার দূরে বড়াপাথর, স্নো ভিউ পয়েন্ট, কিলবারি হয়ে পাংগোট পৌঁছতে বেলা দশটা। তাড়াতাড়ি লাঞ্চ

খেয়ে বেরিয়েছিলাম কিলবারির রাস্তায় পাখি দেখতে। আকাশ পরিষ্কার থাকায় কিলবারি থেকে ত্রিশূলের বরফঢাকা শৃঙ্গত্রয় খুব ভালো দেখা গেল। রাস্তার পাশে পাইন, ওক আর রডোডেনড্রন গাছের জঙ্গল। ইউহিনা, ব্লু ম্যাগপাই, লাফিং থ্রাশ আর সানবার্ডের জন্য যখন গাছের ডালপালার আনাচেকানাচে চোখ ঘোরাফেরা করছে, সঙ্গের একজন দেখাল ঝোপের পাশে আরেকটি পাখি। প্রথমে একটি পুরুষ কালিজ ফেজ্যান্ট চোখে পড়ল। দূরবীন চোখে দেখলাম আশপাশে আরও কয়েকটি কালিজের বাচ্চাসমেত স্ত্রী পাখিটিকে। নিশ্চিন্তে তারা জঙ্গলের মাটি থেকে কী যেন খুঁটে খাচ্ছে। রাস্তা ছেড়ে নালার ধারে নামছি, উল্টোদিকের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে গিয়ে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে একটি বার্কিং ডিয়ার। একপলক দাঁড়িয়ে সে ডাকতে ডাকতে জঙ্গলের ভেতর পালিয়ে গেল। সঙ্গের গাইড বললেন, সন্ধ্যার পরে নালায় চিতাবাঘ প্রায়ই জল খেতে নামে। তখনই স্থির করেছিলাম রাতে ফিরে আসব ওই জায়গায়। তবে পায়ে হেঁটে না গিয়ে গাড়িতে যাওয়াই সমীচীন হবে, বললেন গাইড। এরপর প্রথমদিন রাতের অভিজ্ঞতা তো আগেই লিখেছি। রাতে স্কপস আউলের ডাক শুনে ঘুমিয়ে পড়েছি।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে কিছুটা দেরি হয়ে গিয়েছিল। কটেজের দরজা খুলে বেরিয়ে দেখি সামনে এক আশ্চর্য দৃশ্য। কাঠের পাটাতনের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া ভাত খাচ্ছে একঝাঁক স্ট্রিকড লাফিং থ্রাশ আর দুটি ব্ল্যাক হেডেড জে। কিছুটা ছোট থ্রাশগুলিকে ভাগিয়ে বেশি ভাত খেয়ে যাচ্ছে দুটি জে। তাদের পিছনে মাটি থেকে ভাত খুঁটে খাচ্ছে একটি ব্ল্যাক পারট্রিজ বা কালো তিতির। পাশে নাম না জানা বুনো ফুলের ঝাড়ে দুটি সানবার্ডের তড়িঘড়ি আনাগোনা। বেশ চলছিল পাখিদের খাওয়াদাওয়া। হঠাৎ তাদের পিকনিকে বাধ সাধল এক বাঁদর। বাঁদরামি করে সমস্ত ভাত পাটাতন থেকে মাটিতে ফেলে জল ছড়িয়ে বাঁদর সেখান থেকে চলে যেতেই আবার পাখিগুলি হাজির। লজের মালিক মোহিত আগরওয়াল বিশেষত পাখি দেখানোর জন্যই এই জায়গাটিকে বেছে নিয়েছেন। তাই লজ বানানোর পর যাতে সেখানে মানুষের সঙ্গে দু-চারটি পাখিরও কিছু খাবার জোটে, তার ব্যবস্থা রেখেছেন। প্রত্যেকদিন সকালে ভাত আর পাখির দানা দেওয়া হয়। বাঁদর যাতে সবসময় পাখিদের খাবারে ভাগ না বসাতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখেন লজের কর্মচারীরা। অন্তত পনেরোটি প্রজাতির পাখির আনাগোনা শুধুমাত্র লজের সামনের লনে। বেলায় রোদের তেজ বাড়তে লজের বারান্দায় বসে স্পটিংস্কোপে চোখ লাগিয়ে দূরের পাহাড়ের গাছে প্লাম-হেডেড প্যারাকিট বা ফুলচুসা পাখির ঝাঁক দেখছি। আকাশের দিকে চোখ পড়তে দেখি হাজির রামায়ণের গরুড় পাখি। ল্যামারগিয়ার বা দাড়ি শকুন এবং হিমালয়ান গ্রিফন ভালচার বা গরুড়ের একটা ঝাঁক আকাশে সোরিং করছে। ডানার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত অর্থাৎ উইংস্প্যান ছয় ফুটের বেশি শকুন গোত্রের এই পাখিগুলির। মরা জন্তুর হাড় ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে দাড়ি শকুন আকাশে উড়তে উড়তে কোনও পাথরের ওপর সেই হাড় ফেলে দেয়। পতনের আঘাতে হাড় ভেঙে গিয়ে ভেতরের মজ্জা বেরিয়ে এলে দাড়ি শকুন তা খায়।

লজের পাশের ভুট্টার খেতে হঠাৎ দেখি হাজির হয়েছে এক কেস্ট্রেল বা পোকামার

পাখি। শূন্যে হেলিকপ্টারের মতো স্থির হয়ে ভেসে থেকে শিকার তাক করে ছোঁ মেরে তা তুলে নেওয়ায় বেশ পটু এই পোকামার পাখি। এক্ষেত্রে দুবারের চেষ্টায় একটা বড়সড় ঘাসফড়িং ধরল পাখিটি।

তৃতীয় দিন গেলাম চিনা পিকের রাস্তায় ট্রেকিংয়ে। ভোর চারটেয় অন্ধকার থাকতেই আমরা রওনা দিয়েছিলাম সূর্যের প্রথম আলো ফোটার আগেই পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছনোর আশায়। সেখানে দেখা মিলল হিমালয়ান মোনাল আর কোকলাশ ফেজ্যান্টের। হিমালয়ান মোনালের গায়ে সাত রঙের পালকে সূর্যের আলোয় রামধনুর ছটা বেরোচ্ছে। জঙ্গলের ভেতর থেকে কাঠের ওপর পেরেক ঠোকার আওয়াজ পেয়ে এগিয়ে দেখি ব্রাউন হেডেড উড়পেকার। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখিদের আওয়াজ বেড়ে চলল। হিল পারট্রিজ বা পাহাড়ি তিতিরের কোরাস শেষ হতে না হতেই শুনতে পেলাম হিল বারবেট বা পাহাড়ি বসন্তবৌরির ডাক। বেলা দুটো নাগাদ লজে ফিরে এসে ব্যাগ গুছিয়ে রওনা দিলাম নৈনিতাল হয়ে কাঠগোদামের রাস্তায়। রাতে ট্রেন ধরব দিল্লি যাওয়ার জন্য।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে সরাসরি অথবা দিল্লি হয়ে ট্রেনে কাঠগোদাম পৌঁছে যান। কাঠগোদাম থেকে দেড় ঘণ্টার রাস্তায় নৈনিতাল পৌঁছে শহরের মধ্য দিয়ে গিয়ে বড়াপাথর হয়ে কিলবারি পেরিয়ে পাংগোট গ্রামে পৌঁছতে আধঘণ্টা লাগে। কাঠগোদাম থেকে সরাসরি মারুতি ভ্যান ভাড়া করে পাংগোট যেতে ভ্যানপ্রতি ৩৫০-৫০০ টাকা লাগে। জিপে বা বাসে নৈনিতাল পৌঁছে সেখান থেকে স্থানীয় ট্যাক্সি বা জিপ ধরে আরও কম খরচায় পাংগোট পৌঁছনো যায়।

কখন যাবেন

যাবার আদর্শ সময় অক্টোবর থেকে মে। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি ঠান্ডার প্রকোপ বেশি থাকায় বরফ পড়ার অভিজ্ঞতা রোমাঞ্চকর হয়।

কোথায় থাকবেন

থাকার ব্যবস্থা প্রধানত দুটি জায়গায়। নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করে আগাম বুকিং করে রাখুন: **জাঙ্গল লোর বার্ডিং লজ,** প্রযত্নে, মোহিত আগরওয়াল
বি-৯, সেক্টর ২৭, নয়ডা-২০১ ৩০১ ☎(০১২০) ২৫২৪৮৭৮/৮৭৪/২৫৫১৯৬৩
ফ্যাক্স: (০১১) ৯৩৯৪৮৭৮ ই-মেল: wildindiatours@vsnl.com
অথবা
মাউন্টেন কোয়েল ক্যাম্প ☎০৯৮১১০১০৬১৬

সঙ্গে কী নেবেন

শীতকালে যথেষ্ট শীতবস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যাবেন। অন্যান্য সময় ফুলহাতা সোয়েটার ও হালকা জ্যাকেট বা উইন্ডচিটার দিয়ে কাজ চলে যায়। ট্রেকিং শু্য আর টর্চলাইট অবশ্যই নেবেন। ক্যামেরা, বাইনোকুলার আর পাখির বই সঙ্গে রাখলে ভালো হয়। ছাতা সঙ্গে রাখা উচিত।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

প্রধানপট

বিশ্বদীপ দত্ত

ওড়িশার উত্তরদিক দিয়ে রাজ্যটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে পার হয়ে গেছে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক। কেওনঝড় থেকে সম্বলপুরের মাঝামাঝি জায়গায় সেই পথের ধারে ছোট্ট শহর দেওগড়। ওড়িশার সুপরিচিত জায়গাগুলো থেকে বহু দূরে, ভিন রাজ্যের মানুষের সাধারণ যাত্রাপথের বাইরে পাহাড়ি এলাকায় প্রায় অপরিচিত এক শহর। সরকারি হিসেবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য আলাদা জেলার রূপ দিয়ে তাকে সদর শহর করে রাজ্যের এই দিকের উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে এখন। ধীরে ধীরে পৌঁছচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি প্রকরণ, উন্নত যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা। জেলা সদর হওয়ার কারণে প্রশাসনের বিশেষ নজর পাওয়ার আশা জেগে উঠেছে দেওগড়ের বাসিন্দাদের মনে। যে সৌভাগ্য ছিল তাদের বহুদিন আগে রাজার শাসনের উজ্জ্বল দিনগুলোতে।

শুনলে অবাক হতে হয়, প্রায় অজ্ঞাত এই শহরে বহুদিন আগেই স্থানীয় রাজার রাজত্বকালে পাশের পাহাড় থেকে নেমে আসা প্রপাতের জলে বিদ্যুৎ তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছিল টারবাইন বসিয়ে। ব্রিটিশ ভারতে সম্ভবত সেটাই ওড়িশার প্রথম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। রাজবাড়ি ঘিরে দেওগড় তখন জমজমাট শহর। যার চিহ্ন এখনও দেখা যায় দেওগড়ের পথে পথে। আর এখনও সেখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের মনে অমলিন সেই রাজতন্ত্রের স্মৃতি। যার প্রভাব আরও স্পষ্ট অনুভব করা যেত বছর কয়েক আগেও দেওগড়ের আকাশে বাতাসে।

প্রথম যখন সেখানে গিয়েছিলাম সব সময় মনে হয়েছিল সেখানকার জীবনযাত্রায় সুদূর অতীতের ছাপ ধরা রয়ে গেছে। মাত্র বছর পনেরো আগের সেই সময়ে মনে হচ্ছিল রাজার প্রতি আনুগত্য, নানা সংস্কার নিয়ে শহরটা যেন পড়ে আছে পঞ্চাশ বছরের আগের যুগে। বাইরের লোকের থাকার জন্য দেওগড়ে তখন ভালো হোটেলের অভাব। রাজবাড়ির গেস্টহাউস ছিল, হয়তো সেখানে থাকার অনুমতিও পাওয়া যেত, কিন্তু রাতের দিকে পৌঁছে আমাদের আর তার ব্যবস্থা করার সময় ছিল না সেদিন। উঠতে হয়েছিল সরাইখানাতুল্য এক সাধারণ হোটেলে। পরদিন ভোরে রিকশা নিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম ছোট্ট শহরের প্রান্তে খাড়া পাহাড় বেয়ে প্রবল বেগে নেমে আসা বিশাল প্রধানপট জলপ্রপাত।

দেওগড়ের গর্ব সেই দুর্দম জলধারা। বিদ্যুৎ তৈরি হয়েছে সেখানে। শহরের খাওয়ার জলও আসে সেখান থেকে।

সেবারে আমাদের দেওগড়ে থাকার পরিকল্পনা ছিল না। জুলাই মাসের ঘোর বর্ষায় চলার পথে আটকে পড়তে হয়েছিল এখানে। মধ্যপ্রদেশে ঘুরতে ঘুরতে অমরকণ্টক থেকে সম্বলপুর হয়ে যাচ্ছিলাম কেওনঝড়ে। জানা ছিল না যে এদিকে এমন পাহাড়ি রাস্তা। বিকেলবেলায় সম্বলপুর থেকে বাস ধরে ঘণ্টাখানেক সমতল প্রান্তরে দ্রুত ছুটে চলার পর শুরু হল ঘাটপথ। বিস্তীর্ণ মাঠের শেষে দূর গাছের সারির আড়ালে গোল থালার মতো সূর্যটা ডুবে গিয়ে অন্ধকার নেমে আসছে ততক্ষণে। সন্ধের আকাশে কখন যে মেঘ করল বোঝা যায়নি। হঠাৎই নামল বৃষ্টিটা। এত বৃষ্টি যে সামনের কাচ ঝাপসা হয়ে গিয়ে এগিয়ে চলাই কঠিন হয়ে উঠল। পাহাড়ি রাস্তায় ঘন ঘন বাঁক। ড্রাইভার বাস থামিয়ে দেননি, কিন্তু খুব সাবধানে আস্তে আস্তে চালিয়ে উঠছেন ওপর দিকে। প্রত্যেক বাঁকের আগে হর্ন বাজিয়ে অপেক্ষা করছেন উল্টোদিক থেকে গাড়ি আসে কিনা। অন্য হর্নের আওয়াজ পেলে আলো কমিয়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে থাকছেন। পাহাড়ের আড়াল থেকে দুটো আলো বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মুখোমুখি হয়ে থেমে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে উল্টোদিকের গাড়িটা কত বড়। তারপর আবার গাড়িদুটো যে যার পথ ধরছে। এভাবে কেওনঝড় পৌঁছতে মাঝরাত হয়ে যাবে বুঝতে পারছিলাম। পথে কোনও জায়গায় হোটেল পাওয়া গেলে সেখানে নেমে যাওয়া উচিত মনে হচ্ছিল। কন্ডাক্টর দেওগড়ে নেমে যেতে পরামর্শ দিলেন। বাসে দুই যুবককে পাওয়া গেল যাদের বাড়ি দেওগড়ে। জানা গেল দেওগড়ে হোটেল, ধর্মশালা, সব আছে। সেখানে রাত কাটাতে অসুবিধা হবে না।

সম্বলপুর থেকে মাত্র ৯১ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে দেওগড় পৌঁছতে রাত নটা বেজে গেল। সহযাত্রী যুবকরা খুবই আনন্দিত। সুদূর কলকাতা থেকে দুজন অতিথি এসেছে তাদের শহরে, এটা সাধারণ ঘটনা নয়। ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে বিখ্যাত নয় দেওগড়। রাজার অতিথিরা আসেন কখনও কখনও। কাছাকাছির লোকেরা আসেন প্রধানপট প্রপাতের কাছে পিকনিক করতে। আর কদাচিৎ ওড়িশা পর্যটনবিভাগের প্যাকেজ ট্যুরের বাস সম্বলপুর থেকে পর্যটক নিয়ে প্রধানপট বেড়িয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু করেছে এখন। যুবক দুজন বারবার অনুরোধ করল প্রধানপট আর রাজবাড়ির ছবি তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যাতে কলকাতায় আমাদের বন্ধুবান্ধব জানতে পারে দেওগড়ের সৌন্দর্যের কথা। তাদের আক্ষেপ—ওড়িশার কত জায়গায় লোকে বেড়াতে আসে, দেওগড় অনেক জায়গার চেয়ে বেশি সুন্দর, লোকে নাম জানে না বলে আসে না। বৃষ্টির মধ্যেও তারা আমাদের হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল।

গতবছর আবার দেওগড় গিয়ে দেখি এখন সেই হোটেল অনেক বড়সড় আর আধুনিক হয়ে গেছে। তখন তার চেহারা খুব উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। তবু ভাগ্য

ভালো, দোতলার একটা ঘর খালি পাওয়া গেল। ম্যানেজার জানালেন, সাধারণত ব্যবসার কাজে আসা লোকজনই থাকেন সেখানে, তবে ফ্যামিলি নিয়েও অনেকে আসেন। আমাদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেদিকে তিনি খেয়াল রাখবেন। তাঁর উদ্যোগে রাতের খাবারদাবারও জোগাড় হয়ে গেল ভালোই। সামনের পানের দোকান থেকে দুজনের জন্য দুটো পানও আনিয়ে দেওয়া হল। সব মিলিয়ে মন্দ হল না দেওগড়ে প্রথম রাত কাটানোর বন্দোবস্ত।

মনে আছে রাতের খাওয়ার পর সেদিন হোটেলের বারান্দাতে অনেকক্ষণ গল্পগুজব হয়েছিল অন্য ঘরের বোর্ডারদের সঙ্গে। হোটেলের দুয়েকজন কর্মচারীও ছিলেন সেখানে। তাঁরা স্থানীয় লোক। দেওগড়ের হালচালের খোঁজখবর দিচ্ছিলেন তাঁরা। বলছিলেন, কত পবিত্র এই প্রধানপটের জল। পাহাড়ের ওপরে কয়েকটা কুণ্ড আছে। প্রধানপটের ধারা নেমে আসছে সেখান থেকে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনেও সেই ধারা শুকিয়ে যায় না। জল পাওয়া যায় সারাবছর। আমরা পাহাড়ের ওপর কুণ্ড দেখতে যাওয়ার কথা ভাবছি দেখে একজন বোর্ডার সাবধান করলেন, অবশ্যই যেন স্থানীয় কাউকে সঙ্গে নিয়ে তবে পাহাড়ের দিকে যাওয়া হয়। আর কখনওই যেন ঝরনার জলে স্নান না করা হয়। ভদ্রলোক রাউরকেল্লা থেকে এসেছিলেন ব্যবসার কাজে। বললেন, 'ঝরনায় স্নান করার কথাই তুলবেন না। এই জল এরা খাওয়ার জন্য ব্যবহার করে। শুধু তাই নয়, প্রধানপটকে এরা দেবতার মতো মনে করে। এর জলে পা ঠেকানো পাপ।' পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখার জন্য পাপপুণ্যবোধ মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া ক্ষতিকর নয়। আশা করা যায়, কাপড়জামাও কাচা হয় না ঝরনার জলে। কথা হচ্ছিল হিন্দিতে। হোটেলের কর্মচারীরা হিন্দি ভালো জানেন না। তাঁরা বলছেন ওড়িয়াতেই। কিন্তু কাপড় কাচার কথাটা বুঝতে পারলেন একজন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কান মলে জিব কাটলেন। বললেন, 'প্রধানপটের জল শুধু খাওয়ার জন্য। অন্য কিছু করা যায় না। রানিমার নিষেধ।' আরেকজন বললেন, 'নিচে প্রধানপটের জল তবু ছোঁয়া যায়। পাহাড়ের ওপরে উঠে জল ছুঁলে ঘোরতর অকল্যাণ হয়। সাতদিনের মধ্যে তার পরিবারের কেউ মারা যায়। একজন বিশ্বাস করত না। পাহাড়ে উঠে মা-কুণ্ডের জলে স্নান করেছিল। তিনদিন পরে বমি করতে করতে তার স্ত্রী মারা গেল।' গল্প শোনা যাচ্ছিল এরকম আরও অনেক। জানা গেল, পাহাড়ে সবচেয়ে ওপরে আছে দুটো কুণ্ড। মা-কুণ্ড আর ঝি-কুণ্ড। সেই কুণ্ড থেকে জল আসছে কবাটদুয়ারে। কবাটদুয়ার থেকে বেরিয়ে আসছে প্রধানপট। প্রথমে এসে জমা হচ্ছে সপ্তকুণ্ডতে। সেই সাতটা কুণ্ড থেকে আবার জল নেমে আসছে পাহাড় বেয়ে দেওগড়ে। সে দৃশ্য দেখলেও পুণ্য হয়। কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে বোঝা যাচ্ছিল না। তবে জায়গাটা আগ্রহজনক মনে হচ্ছিল। কিন্তু কুণ্ডের নাম মা আর ঝি কেন? সে আরেক গল্প। মা মানে রানিমা। দেওগড়ের রানিমাতা এই কুণ্ডের মালিক। এর জল সবাই খেতে পারে। কিন্তু ঝি-কুণ্ডের জল খেলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। অনেককাল আগে এক

রাজকুমারী ওই কুণ্ডের জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। সেই থেকে ওই কুণ্ডের জল বিষ হয়ে আছে, খাওয়া যায় না।

তাহলে প্রধানপটের জল আসছে মা-কুণ্ড থেকে? এই প্রশ্নে কর্মচারীদের একটু মতভেদ দেখা দিল। নিজেদের মধ্যে একচোট উত্তেজিত আলোচনার পর শেষে রায় জানানো হল, 'জল আসছে দুটো কুণ্ড থেকেই। মা-কুণ্ডের জল অমৃত। ঝি-কুণ্ডের জল এসে মা-কুণ্ডের জলে মেশাতে সব বিষ কেটে যাচ্ছে। মানুষ সেই জল খেতে পারছে।' শুনে রাউরকেল্লার ভদ্রলোক ইংরিজিতে বললেন, 'এরা প্রধানপট সম্বন্ধে যা বলে বিশ্বাস করে নিন। অবজ্ঞা দেখাবেন না। আর রাজারানি সম্পর্কে কোনও কাহিনীও অবিশ্বাস করবেন না। এরা খুব রাজার ভক্ত।' সেটা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। বাস থেকেই শুনছি লোকে রাজা-রাজা করছে। রাজার রাজত্ব নেই। থাকেনও শুনছিলাম বিদেশে। তবু এখনও এত প্রতাপ! ভদ্রলোক বললেন, 'রয়্যাল ফ্যামিলির কেউ কেউ এখনও আছেন এই বাড়িতে। ছেলেমেয়েরা বোধহয় বিদেশেই পড়াশুনো করে। এদের জিজ্ঞেস করে দেখুন। না হলেও কালকে বেরিয়ে খবর পেয়ে যাবেন।'

পরদিন বেরোনোর ব্যাপারে সাহায্য করতে সবাই প্রস্তুত। আড্ডার সবচেয়ে কমবয়সী সদস্য এক কিশোর। তারই বেশি উৎসাহ। সিনেমার দৌলতে সে হিন্দিটা বুঝতে পেরে যায়, কিন্তু বলাটা তেমন রপ্ত করতে পারেনি। শুরু করছে হিন্দিতে। কিছুক্ষণ ভাঙা ভাঙা বাক্যে চেষ্টা করে শেষে বক্তব্য পেশ করছে বিশুদ্ধ ওড়িয়াতে। সঙ্গে আমাদের সুবিধার্থে মূকাভিনয়ও চালাচ্ছে। সে বলেছিল হোটেলের পাশে একজন রাতে রিকশা রেখে যায়, তাকে নিয়ে আমরা সকালে বেরোতে পারব। তেমন হলে আমাদের সুবিধাই হত। খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়তে চাইছিলাম। কিন্তু সেদিনই সেই রিকশাওয়ালা রিকশা রাখতে এল না। আর আমাদের খুব ভোরে বেরোনোর পরিকল্পনাও আড্ডার কেউ সমর্থন করতে পারলেন না। ভালোমতো সূর্য ওঠার পরই ঝরনার ধারে যাওয়া ভালো। কিশোরটি জানাল, অন্ধকারে দেওগড় বিপজ্জনক। বেশি রাতে এখানে কেউ বাড়ি থেকে বেরোয় না। রাতে রাস্তা পাহারা দেয় শনপৎ বুড়ি। পথে কাউকে দেখতে পেলে গলা টিপে রক্ত খেয়ে নেয়। অন্যরাও কিশোরের কথা সমর্থন করল। রাউরকেল্লার ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'জঙ্গলের ধারে ঝরনা। ভোরের দিকে না যাওয়াই ভালো। জন্তু-জানোয়ার ঘোরাঘুরি করতে পারে। এই শনপৎ বুড়িটা কে তা অবশ্য আমি জানি না। শন্নিপত দেবীর নাম শুনেছি। এখান থেকে ২০-২৫ কিলোমিটার দূরে কেওনঝড়ের পথে তাঁর মন্দির। যাওয়ার সময় আপনারা বাস থেকে দেখতে পাবেন। জানি না তিনিই দেওগড় পাহারা দেন কিনা।'

যে-ই পাহারা দিক, তাকে কি আড্ডার কেউ দেখেছে? কিশোরটি দেখেছে। শনপৎ বুড়ি ঘুরে বেড়ায় ঘোড়ায় চড়ে— মাথায় পাকা চুল— গায়ে সাদা আলখাল্লা। আড্ডার অনেকেই রাতে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনেছেন। তবে

রাতে শনপৎ বুড়িকে দেখা ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের ব্যাপার। বলেই আবার নতুন গল্প শুরু হয়ে গেল। তাদের সব গল্প শুনতে গেলে বোধহয় রাত কাবার হয়ে যেত। বোর্ডাররা একে একে শুতে চলে যাচ্ছিলেন। আমরাও উঠে পড়লাম। ভোরবেলা বেরনোর পরিকল্পনা তখনও বাতিল করিনি।

দেওগড়ের প্রধান রাস্তাটাকে এখন অনেক চওড়া করে ফেলা হয়েছে। সেবার নিতান্তই এক সরু গলিপথ ধরে বাস গিয়ে থেমেছিল শহরে। গাছপালা বেশি ছিল এর চেয়ে। রাজার পুরনো বাড়িঘরের জন্য একটা পুরনো ধাঁচ ছিল শহরটার। পরদিন সকালে যখন বেরিয়েছিলাম, সারা রাত বৃষ্টির পরে তখন সবে বৃষ্টি থেমেছে। পাহাড়ি জায়গা তাই রাস্তায় জল দাঁড়ায়নি, কিন্তু সবদিকে একটা ভেজা ভেজা ভাব। গাছের পাতা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে। কিছু দূরেই বৃষ্টি ভিজে দাঁড়িয়ে আছে অন্য বাড়িঘরের তুলনায় প্রকাণ্ড রাজবাড়ি। পথে লোকজন নেই। নিঝুম দেখাচ্ছে সাদা রঙের বাড়িটাকে। বৃষ্টির সকালে ঘুম ভাঙেনি তখনও দেওগড়ের।

মোড়ের কাছে একটা রিকশা পাওয়া গেল। রাজবাড়ির পাশ দিয়ে রওনা দেওয়া হল প্রধানপটের দিকে। যেতে যেতে রিকশাওয়ালা বলে দিচ্ছে কোনদিকে রাজার লোকজন থাকে, কোনদিকে রাজার পুরনো কাছারিবাড়ি, কোন জলাশয় রানিমা বানিয়ে দিয়েছিলেন। যা দেখা যাচ্ছে প্রায় সবই রাজার জিনিস। প্রধানপটের কাছাকাছি এসে দেখা গেল রাজার অতিথিশালা। বসন্তনিবাস আর ললিতবসন্ত। সেখানে খুব আরামে থাকা যায় জানাল রিকশাওয়ালা, আমরা যেহেতু বাইরের লোক, রাজা আমাদের থাকার অনুমতি দেবেন। আবার ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। মিহি জলের কণা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। রিকশাওয়ালা মাথায় একটা গামছা বেঁধে নিয়েছে। এই বৃষ্টিতে যদিও ওর জামাটাও ভিজছে না। রাজা কি এখন এখানে আছেন, তার সঙ্গে দেখা করা যায়? জানতে চাইছিলাম আমরা। রিকশাওয়ালা একটু ইতস্তত করল, তারপর বলল, ‘মনে হয় আপনারা দেখা করতে পারবেন’। ছোট্ট শহরের প্রান্তে এসে পড়েছি তখন। ওপরে একটা পথ উঠেছে অতিথিনিবাসের দিকে। নিচের পথে প্রধানপট। রিকশায় আর বেশিদূর এগনো গেল না। নেমে পড়তে হল সিঁড়ির মুখে। কয়েক ধাপ নেমে তারপর পাহাড় বেয়ে নিচে যেতে হচ্ছে। পথ তৈরি করাই আছে। যত এগনো হচ্ছে জলের শব্দ বাড়ছে। আওয়াজেই বোঝা যাচ্ছে এটা ছোট প্রপাতের ধারা নয়। আবার সিঁড়ি দিয়ে বেশ কিছুটা নেমে যেতে হল। বাঁক ঘুরতেই সামনে থেকে পাহাড়ের আড়াল সরে গিয়ে দেখা দিল বিশাল প্রধানপট। অনেকটা জায়গা জুড়ে ধারায় ধারায় জল নেমে আসছে উঁচু পাহাড় থেকে। এত বড় প্রপাত দেখতে পাব কল্পনাই করিনি। প্রচণ্ড গর্জনে খাড়া পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে নামার জন্য ধোঁয়ার মতো তৈরি হয়েছে নিচের দিকে। হাওয়ায় উড়ছে জলকণা। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেই সিঁড়ির ধাপের একপাশে খাড়া পাহাড়। আরেক পাশে ঝাঁকড়া গাছের সারি।

বৃষ্টিভেজা গাছপালায় আবছা অন্ধকার ঘিরে আছে সে জায়গাটাকে। আর নিচে সামনের স্থির জলে ভরা খোলা জায়গাটার ওপারে দেখা যাচ্ছে বিস্তীর্ণ উজ্জ্বল জলধারা। সকালের মেঘলা আকাশের নিচে কুচকুচে কালো পাহাড় থেকে ভীমবেগে নেমে আসা দুধসাদা প্রপাতে এক আশ্চর্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে নির্জন জঙ্গলে।

রিকশাওয়ালাও এসেছিল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। দৌড়ে নিচের জলের কাছে নেমে গেল সে। লাফিয়ে চলে গেল পাথরে পাথরে। জলে নামা বারণ মনে ছিল আমাদের। পাইপ লাইন দেখা যাচ্ছে, পাহাড় ঘেঁসে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছে শহরের দিকে। গাছগাছালিতে ঠাসা এই খাড়া পাহাড় বেয়ে কোনদিক দিয়ে ওপরে ওঠা সহজ হবে বোঝা যাচ্ছিল না। রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম কবাটদুয়ার যাওয়া যায় কোন পথে! 'কবাটদুয়ার? সে ওই ওপরে। এখান থেকে দেখা যায় না। পাহাড়ে উঠতে হবে।' কতটা উঠতে হবে? 'সে অনেক। দু-তিন মাইল তো হবেই। সেখানে আছে সপ্তকুণ্ড। আরও ওপরে মা-ঝি কুণ্ড, কুড্ডুকুট।' কুড্ডুকুট! সেটা আবার কী? 'কুড্ডুকুট নয়, কোড্ডরকুট' ধমকে উঠল রিকশাওয়ালা 'কোড্ডরকুট আছে পাহাড়ের ওপরে'। রিকশাওয়ালার জবানি থেকে কোড্ডরকুট রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারলাম না। ফিরে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করলাম পাহাড়ের ওপরে যাওয়ার পথ সে চেনে কিনা। জানা গেল, পথ সে বিলক্ষণ চেনে। গেছেও অনেকবার। আমরাও যেতে পারব আমি তো বটেই, বহ্নিনজিরও অসুবিধা হবে না। একটু সাহস থাকলেই হয়। সপ্তকুণ্ড পর্যন্ত তো সবাই যায়। কোড্ডরকুটে যাওয়াও শুনলাম সহজ। তবে সে আজ নিয়ে যেতে পারবে না। টাকা দিলেও না। কারণ তার অন্য কাজ আছে। তাতে আমরা হতাশ নই, সে যেদিন যেতে পারবে সেদিনই আমরা যেতে রাজি। কিন্তু সে কবে যেতে পারবে? এ বিষয়ে রিকশাওয়ালা মৌন। চড়াইপথে রিকশা ওপরে তুলতে ব্যস্ত সে। অন্য কথায় কান দেওয়ার আগ্রহ নেই। যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে গেছে।

শহরের দিকে ফিরে চলেছিলাম আমরা। সকালে কিছু খাওয়াদাওয়া হয়নি। রাজবাড়ির কাছেই নাকি একটা ভালো খাবারের দোকান আছে। সেখানে ব্রেকফাস্টের পর যাব গোকর্ণেশ্বর, গোপীনাথ, জগন্নাথ মন্দিরগুলো দেখতে। সেদিকে যেতে রিকশাওয়ালার আপত্তি নেই। যেতে যেতে আবার গল্প শুরু করেছিল সে। বলল, পাহাড়ের ওপরে তারা বারবার যায়। একা একাও সে অনেকবার গেছে। মা-কুণ্ড তো দেখেছেই। মা-কুণ্ড সবাই দেখে। তার জল ভালো। তাহলে কি ঝি-কুণ্ড সে দেখেনি? তাও দেখেছে একবার। কালো জল। তাকালে দেখা যায় জলের মধ্যে সোনার মাথা চকচক করে ভেসে-ভেসে উঠছে, আবার ডুবে যাচ্ছে। শুনে আমরা হতবাক। এরা দেখি সবাই গল্পের রাজা!

বাসস্ট্যান্ডের কাছে সকালের বাজার জমজমাট হয়ে উঠেছে। মেঘ সরে গিয়ে তখন সোনালি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে শহরের ওপর। লালমাটির পথের ধারে

পুরনো বাড়িঘরে হলদেটে ছোপ লেগেছে সেই সোনালি রোদের। সকালের আলোয় দেখে আরও ভালো লেগে গেল শহরটাকে। রিকশা গিয়ে দাঁড়াল বিশাল কাছারিবাড়ির উঁচু পাঁচিলের উল্টোদিকে একটা মিষ্টির দোকানের কাছে। ছোট্ট পাকা ঘরের সামনে চালার নিচে বেঞ্চ পাতা রয়েছে। লোকে ভিড় করেছে সেই চালাঘর ঘিরে। খুবই চাহিদা দেখা যাচ্ছিল সে দোকানের জিনিসের। ব্যস্ত দোকানদারের হাত চলছে দ্রুত। ঝপাঝপ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে শালপাতার ঠোঙাভরা জিলিপি। রিকশাওয়ালা ভেতরে ঢুকে দোকানদারের কানে কানে কী যেন বলল। দোকানদার ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাচ্ছিলেন। রিকশাওয়ালা বোধহয় একটু স্পেশ্যাল ট্রিটমেন্ট দিতে বলেছে, দোকানদার ঘাবড়ে গিয়ে ভাবছে এরা আবার কোথাকার রাজাগজা এল! 'আমি কলকাতার এক মহারাজ এসেছি' বিনীতভাবে জানালাম দোকানদারকে, 'আপনার দোকানে ভালো কী আছে তিন প্লেট দেখান।' এবার দোকানদার বুঝতে পেরেছেন। আসতে আজ্ঞা হোক, বসতে আজ্ঞা হোক শুরু করেছেন। ভেতর থেকে একটা বেঞ্চ বের করে দেওয়া হল। রিকশাওয়ালা কিছুতেই বসল না, আরও বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে। দুটো করে সিঙ্গাড়া এল, সঙ্গে ক্রিকেট বলের সাইজের একটা করে মিষ্টি।

গতবছরে গিয়ে দেখি দোকানটা এখন একেবারে হাল আমলের রেস্টুরেন্ট হয়ে গেছে। বড় ঘর করে সানমাইকা দেওয়া টেবিলচেয়ার পাতা হয়েছে। হাত ধোয়ার বেসিন বসেছে। আগের বার যে হোটেলে ছিলাম সেটা যে আগের তুলনায় ভালো হয়েছে তা আমাদের পক্ষে মঙ্গলের কথা। কিন্তু কর্মচারীরাও বদলে গেছেন। একজন পুরনো লোক রয়েছেন, যিনি আমাদের চিনতে পারলেন না। সেই রিকশাওয়ালাকেও এবার খুঁজে পেলাম না। গতবারে বাজারে আলাপ হয়েছিল আরও কয়েকজনের সঙ্গে। তাঁদের দেখা পাওয়ার প্রশ্ন নেই, কিন্তু বাজারের ধরনধারণই পাল্টে গেছে মনে হচ্ছিল। পুরনো কাছারিবাড়িটা রয়েছে। জেলা সদর হওয়ার পর নতুন সরকারি অফিস বসেছে সেখানে। সব মিলিয়ে শহরটা একটু যেন অচেনা হয়ে গেছে আমাদের কাছে। সবচেয়ে খারাপ লাগছিল চালাঘরের মিষ্টির দোকানটা অন্যরকম হয়ে যাওয়ায়। মালিক বয়সে নবীন। আগে যিনি ছিলেন তাঁর ছেলে নন। এই ভদ্রলোক দোকানটা পরে কিনে বড় করেছেন। সম্ভবত বাইরের শহর থেকে এসেছেন। তবে দোকানের খাবারদাবার ভালো। পুরি, কচুরি সবই পাওয়া যাচ্ছে। শুধু সবকিছু বড্ড কেতাদুরস্ত হয়ে গেছে। সন্দেশগুলোর চেহারা বদলেছে। দেওয়ালে আবার কোল্ডড্রিঙ্কসের বিজ্ঞাপন। এবারের যাত্রায় যে বালক আমাদের নতুন সঙ্গী, তাকে যে চালাঘরের দোকানটার মিষ্টি খাওয়াতে পারলাম না এটা খুবই দুঃখের কথা। যাইহোক, ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে গেলাম রাজবাড়িটা দেখাতে। গতবারে তার ভেতরে ঢুকিনি আমরা, শহরের আশপাশেই কেটে গিয়েছিল সারাদিন।

কাছে গিয়ে দেখি রাজবাড়িটাও আর আগের মতো সাদা নেই। দেওয়ালে

শ্যাওলার ছাপ ঘষে পরিষ্কার করা হয়েছে কিন্তু রং করা হয়নি বেশ কিছুদিন। তবে বাড়ির সামনে পুরনো রাজার বিশাল মূর্তিটা ঝকঝক করছে। পাথরের দোচালার নিচে বেদির ওপরে আসীন রাজা বাসুদেব সুধলদেব। জন্মকাল লেখা রয়েছে ১৮৫০-১৯০৩। এঁর আমলেই দেওগড়ের সমৃদ্ধির সূচনা। তাঁর মূর্তির পিছনের বাগানচত্বর পেরিয়ে ঢুকে এলাম বাড়ির চৌহদ্দিতে। কোনও লোকজন দেখা যাচ্ছিল না। দোতলার ছাদের ধারে একপাশে হেলে পড়েছে একটা বড় টিভি অ্যান্টেনা। সাধারণ দেখতে একটা দরজা খোলা ছিল একদিকে। আমরা ঢুকে পড়লাম ভেতরে। এটা সিংদরজা নয়। তবে মনে হচ্ছে এটাই ব্যবহার হয় বেশিরভাগ সময়ে। সরু একটা গলি পেরিয়ে সামনের দরজাটা বন্ধ। সেটা পার হলে মনে হচ্ছিল ভেতরে একটা উঠোন আছে। বাঁদিকের অন্য আরেক দরজা দিয়ে আমরা ঢুকে এলাম আরেক উঠোনে। সিমেন্ট বাঁধানো প্রাঙ্গণ। চারদিক ঘেরা একতলা দোতলার ঘরের বেশিরভাগ জানলাই বন্ধ। একপাশে গাড়িবারান্দা রয়েছে। তার দোতলার জানলাগুলো খোলা পড়ে আছে অবহেলায়। মনে হল ঘরে কিছু নেই। ফাঁকা পড়ে আছে এদিকের মহলটা। বেরিয়ে আসছিলাম আমরা, গলিপথের সামনের দরজা খুলে দেখা দিলেন এক ব্যক্তি। সম্ভবত বাড়ির কেউ নন। জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কার সঙ্গে দেখা করতে চাই। ঠিক কারও সঙ্গে দেখা করতে চাই না। এমনই রাজবাড়িটা দেখছিলাম। শুনেছি তাতে আপত্তি নেই। 'না, আপত্তি নেই। ভেতরে যেতে পারেন।' রাজা কি আছেন বাড়িতে? বা অন্য কোনও লোকজন? নাকি খালিই পড়ে থাকে বাড়িটা? 'রাজা নেই, কিন্তু লোক আছে ভেতরের মহলে। চৌকিদার আছে সামনে। আপনারা ঢুকতে পারেন।' বলে বেরিয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক। দরজায় উঁকি দিয়ে আমরা কোনও চৌকিদারের দেখা পেলাম না। এভাবে বসতবাড়ির ভেতরে ঢুকে যেতে ভালো লাগছিল না। বেরিয়ে এলাম আমরাও। বাইরে মালি আগাছা পরিষ্কার করছিল। আমাদের দিকে একবার তাকাল কিন্তু কোনও কৌতূহল দেখাল না। সকালের জমজমাট রাস্তার সামনে নিঝুম দাঁড়িয়ে আছে হেলে পড়া অ্যান্টেনার বাড়িটা। একটা রিকশা ধরে আমরা রওনা দিলাম প্রধানপটের দিকে।

শহরের এদিকটায় এখনও ফাঁকা ফাঁকা ভাব। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে রাজার অতিথিশালা বসন্তনিবাস। তারও ওপাশে ললিতবসন্ত। কিন্তু জঙ্গল অনেক কমে গেছে সেদিকে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা পিঠে ব্যাগ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শহরের স্কুলের দিকে যাচ্ছে। আগের সিঁড়ির পথটাও আর নেই। জঙ্গল পরিষ্কার করে পিচের ঘোরানো রাস্তা চলে গেছে বিশাল বাঁক নিয়ে পাহাড় ঘেঁসে ঝরনার দিকে। অনেকটা খোলা জায়গা দেখা যাচ্ছে এক নজরে। পিছনদিকে কিছু বাড়িঘর আছে পথের ধারে। বেশ ছিমছাম দেখাচ্ছে সেদিকটা।

প্রধানপট কিন্তু সেরকমই রয়েছে। বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে সেই উঁচু থেকে ঘোর গর্জনে নেমে আসছে দুর্দম জলধারা। আরণ্যক ধরনটা না থাকলেও ম্লান হয়নি

তার সৌন্দর্য। একটু শহুরে জেল্লা এসেছে তার পরিবেশে। গাছপালা যে নেই তাও নয়। পাহাড় বেয়ে উঠেছে মহীরুহের সারি। সবুজ হয়ে আছে চারদিক। আমাদের বালকসঙ্গী যেহেতু আগে প্রধানপট দেখেনি তাই এই রূপেই সে মুগ্ধ। এমন একটা জায়গারই নাকি ছবি আছে টারজানের বইতে। জামাজুতো খুলে সে জলপ্রপাতে স্নান করার জন্য তৈরি। প্রধানপটে যে স্নান করা যায় না তা ভুলে যাচ্ছিলাম আমরাও। জলে হাতছিপ ফেলে মাছ ধরছিল দুই কিশোর, তারা স্মরণ করিয়ে দিল কথাটা। তবে পাইপ লাইনের মুখ ছাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলে স্নান করা যেতে পারে। প্রধানপটের জল এখন বইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অনেকটা। সেখানে স্নানও করে লোকে।

পুজোর ছুটির সময় বলেই বোধহয় প্রধানপটে এসেছে আরও কিছু দর্শনার্থী। তাদের এড়িয়ে আমরা পাহাড়ের ওপরে রওনা হব ভাবছিলাম। দেখে আসা যাক এবারে কোড্ডরকুট আর সপ্তকুণ্ড। রিকশাওয়ালা দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। তাকে অপেক্ষা করতে বলে উঠে এলাম কিছুদূর পাকদণ্ডী পথে। গাছপালার মধ্য দিয়ে কাঁধে কাঠকুটো নিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে আসছিল একজন। থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছি আমরা! হাতি নেমে এসেছে এদিকের পাহাড়ে। আজ ওপরে যাওয়া ভীষণ বিপজ্জনক। মহিলা আর শিশু নিয়ে তো যাওয়া উচিতই হবে না।

হাতি চলে আসে নাকি এদিকের পাহাড়ে? প্রধানপট পুরোপুরি শহুরে হয়নি তাহলে? হাতি তো আসেই, জানাল কাছেই মিউনিসিপ্যালিটির ট্যুরিস্ট হোমের কেয়ারটেকার যুধিষ্ঠির নায়েক। অন্য বন্যজন্তুও আছে পাহাড়ে। উষাকোটি অভয়ারণ্যের প্রান্তভাগ এটা। বাদরামার জঙ্গল যার নাম। বাঘও আছে সেখানে। তবে বাঘ এদিকে আসে না। হরিণ আর অন্য জন্তুরা জল খেতে আসে আকছার। ভোরে বা সন্ধ্যায় তাদের দেখা যায় হামেশাই। হতে পারে, কারণ এখনও লোকালয়ের বাইরে প্রধানপট জলপ্রপাত। মিউনিসিপ্যাল ট্যুরিস্ট হোমের কাছে সাব-কালেক্টর আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো আছে, তবু বেশ ফাঁকা ফাঁকাই এদিকটা। জায়গাটা এখনও সুন্দর। প্রপাতের কাছে মিউনিসিপ্যালিটির এই ট্যুরিস্ট হোমে থাকতে পারলে এখনও খুবই মনোরম এক পর্যটন-ঠিকানা দেওগড়।

মিউনিসিপ্যালিটির এই বাংলোটা আগেও ছিল। এখন যুধিষ্ঠির আর কার্তিক নায়েকের তদারকিতে পরিপাটি হয়েছে তার পরিবেশ। রাজার অতিথিশালায় নাকি আগের মতো সহজে আর থাকার অনুমতি পাওয়া যায় না। তবে মিউনিসিপ্যাল বাংলোতে পর্যটক সুস্বাগত। আমরা যখন গেছিলাম তখন খালি ছিল দুঘরের বাংলোর পুরোটাই। ভাড়া শহরের হোটেলের তিনভাগের একভাগ মাত্র। আহামরি বন্দোবস্ত নয়, তবে পরিচ্ছন্ন। শহরের হোটেল ছেড়ে দিয়ে এসে আমাদের সেখানে থেকে যেতে অনুরোধ করেছিল যুধিষ্ঠির আর কার্তিক। বলেছিল, পুজোর ছুটিটা সেখানেই কাটিয়ে দিতে। বাজার, রান্নাবান্নার ব্যবস্থা

করবে তারা। আমরা রাজি হতে পারিনি। ঠিক ছিল এরপর সম্বলপুর হয়ে রায়গড়া যাব। দেবগিরি পাহাড়ের আদিবাসীদের গ্রামে যাব সেখানে। প্রধানপটে না হয় আসা যাবে পরে আরেকবার।

দেওগড় থেকে বাস ধরে সম্বলপুর যাওয়া এখন আর আগের মতো অসুবিধাজনক নয়। আগে সেখানে কোনও বাস টার্মিনাস ছিল না। উঠতে হত কেওনঝড় বা রাউরকেল্লা থেকে আসা পথচলতি বাসে। দিনে বাসের সংখ্যাও ছিল কম। এখন নতুন টার্মিনাস হয়েছে। দেওগড় থেকেই ছাড়ছে নানা জায়গার বাস। আগের তুলনায় সহজগম্য পথে সম্বলপুরে পৌঁছনো গেল ঘণ্টাতিনেকের যাত্রাতেই। যদিও এই বাস টার্মিনাসের জন্যই বদলে গেছে দেওগড়ের বাজার-অঞ্চলের পরিবেশ। বাসস্ট্যান্ডের পথে বাইরে থেকে আসা যুবকদের আড্ডা। ক্ষতিকর নয়, তবে তেমন মানুষজন যেন মানায় না আমাদের গতবারের দেখা দেওগড়ে। ৬ নম্বর জাতীয় সড়ককেও এখন চওড়া করা হয়েছে আগের চেয়ে। লোকবসতি অনেক বেশি হয়ে গেছে সেই রাস্তার ধারে। গ্রামের ভেতরে ভেতরে ঢুকেছে পাকা সড়ক। শহরের ছোঁয়া লেগেছে সেদিকে। কিন্তু সম্বলপুরের মাঝামাঝি পথে আসতেই রাস্তার ধারে দেখা দিল সেই বাদরামা অরণ্য। ঘন জঙ্গল এখনও সেই তল্লাটে। সেখান থেকে ঢাল বেয়ে হাইওয়ে নেমেছে সমতলে। আর তারপর এখনও সেখানে ধু-ধু নির্জন প্রান্তর। যেতে যেতে মনে পড়ছিল সেবারও এমনই এক বিকেলে এ পথ ধরে গিয়েছিলাম দেওগড়ে। সূর্য ডোবার পরে হাল্কা আলোতে সেদিনও যেন ছিল এমনই বিষণ্ণতার ছোঁয়া। রাস্তার পাশের ধানখেতের মধ্য দিয়ে লাল সুরকির গ্রামের পথে দেখেছিলাম দূরে দুটো কালচে মানুষকে হেঁটে যেতে। একটা বড় ফিগারের পাশে পাশে হেঁটে চলেছে মাথায় পুঁটলি নিয়ে একটা ছোট ফিগার। বোধহয় খেতের কাজ করে দিনের শেষে বাবা বাড়ি ফিরছে ছেলেকে নিয়ে। নিরালা পথে সে দৃশ্য এতটাই মনে দাগ কেটেছিল যে বহুদিন পর্যন্ত দেওগড়ের কথা ভাবলে মনে পড়ত নিরালা পথের সেই ছবিটা। আর এবারের যাত্রায় মনে গেঁথে রইল দেওগড়ের ছোপ ধরা পুরনো রাজবাড়িতে হেলে পড়া টিভি অ্যান্টেনার আরেক বিষণ্ণ ছবি।

'ভ্রমণ' অক্টোবর, ২০০১

পেঞ্চ অরণ্য

বিশ্বদীপ দত্ত

মধ্যপ্রদেশের মহাদেও পাহাড়ের দিক থেকে দক্ষিণে বয়ে গেছে পেঞ্চ নদী, সে রাজ্যের সীমানা পার হয়ে মহারাষ্ট্রতে। তার চারপাশে ঘন জঙ্গল। নাম হয়েছে নদীর নামে, পেঞ্চ অরণ্য। অসংখ্য বন্যপ্রাণীর বাস এই জঙ্গলে। ২০০২ সালের হিসাবে বাঘ রয়েছে সেখানে ৫০-৫৫টি। তৃণভোজীদের সংখ্যাও অন্য জঙ্গল-সংরক্ষকদের কাছে ঈর্ষণীয়। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫০টি। তবু মধ্যপ্রদেশের দুই বিখ্যাত টাইগার রিজার্ভের মতো খ্যাতি হয়নি পেঞ্চের। বলা যায় এখনও ভারতের দূর প্রান্তের পর্যটকদের কাছে অচেনাই রয়ে গেছে রূপসী পেঞ্চ। সম্ভবত শুধু প্রচারের অভাবে। কারণ যাতায়াত মোটেই অসুবিধাজনক নয় এদিকে। রাজ্যের বেশিরভাগ অঞ্চলের চেয়েই এদিকের রাস্তার অবস্থা আর পরিবহণ ব্যবস্থা ভালো। থাকার জন্য বেশ কয়েকটি ফরেস্ট লজ আগেই ছিল জঙ্গলের নানা জায়গায়। কিছুদিন হল বিলাসবহুল প্রাইভেট রিসর্ট হয়েছে জঙ্গলের তুরিয়া গেটের দিকে। সেদিকেই অনেকটা জায়গা নিয়ে সেরকমই সাজানোগোছানো এম পি ট্যুরিজমের বাংলোও চালু হয়েছে গত ডিসেম্বর মাসে। নাম দেওয়া হয়েছে কিপলিং রিসর্ট।

রুডিয়ার্ড কিপলিং নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন যে বইগুলোর জন্য, তাঁর বিখ্যাত 'জাঙ্গল বুক' ছিল তার মধ্যে। মধ্যপ্রদেশের সেওনির এই জঙ্গলের কথাই বলা হয়েছে সেই বইতে। যেখানে বড় হয়েছিল নেকড়ের কাছে পালিত শিশু মোগলি। শোনা যায়, সত্যিই এরকম একটি ছেলেকে আবিষ্কার করেছিলেন উইলিয়াম স্লিম্যান নামে একজন, ১৮৩১ সালে। তিনি আগে নেকড়ে পালিত মানবশিশু বিষয়ে লিখেছিলেন। কিপলিং জাঙ্গল বুক লেখার সময় স্লিম্যানের সেই বইয়ের সাহায্য নিয়েছিলেন। আরেকটি বই থেকেও তথ্য নিয়েছিলেন তিনি। আর এ স্টারেনডেল নামে লেখকের লেখা সেই বইটির নাম 'ক্যাম্প লাইফ অব সেওনি'।

সেওনি মধ্যপ্রদেশের একটি জেলা। তার সদর শহরের নামও সেওনি। মহারাষ্ট্র আর মধ্যপ্রদেশ দুই রাজ্যেই ছড়িয়ে আছে পেঞ্চের জঙ্গল। তবে পেঞ্চ নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে মহারাষ্ট্রের তোতলাডোহতে। তার ফলে তোতলাডোহর কাছে জঙ্গলের অনেকটা জায়গা জলে ডুবে গেছে। মধ্যপ্রদেশের দিকেই অরণ্যভূমি বেশি। ১৯৭৭-এ যেখানে স্যাঙ্কচুয়ারি তৈরি হয়েছিল। ১৯৮৩তে আরও বেশি

জায়গা নিয়ে হয়েছিল ন্যাশনাল পার্ক। আর ১৯৯২-এ দেওয়া হয়েছে টাইগার রিজার্ভের শিরোপা। মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল বিস্তৃত দুই জেলাতে। সেওনি আর ছিন্দোয়ারা। নাগপুর শহর থেকে পাঁচমাড়ির দিকে রাস্তা গেছে ছিন্দোয়ারা হয়ে। তবে ছিন্দোয়ারার দিক থেকে পর্যটকদের জঙ্গলে ঢোকার সুব্যবস্থা নেই। সুবিধাজনক এন্ট্রি পয়েন্টগুলো সেওনি জেলা দিয়ে। ৭ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে গেছে সেওনি পার হয়ে জব্বলপুর থেকে নাগপুরে। এই দুই বড় শহরের কোনওটি থেকে এসে কারমাঝিরি বা তুরিয়া গেট দিয়ে জঙ্গলে ঢোকা সুবিধার। সেওনি জেলার এ প্রান্তে রিসর্ট তৈরির সময় তাই জাঙ্গল বুকের লেখক কিপলিংকে স্মরণ করেছেন পর্যটন বিভাগ। তুলিয়া গেট দিয়ে জঙ্গলে ঢোকার মুখে লেখা হয়েছে— পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ, দ্য রিয়াল ল্যান্ড অব মোগলি।

৭৫৭ বর্গ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে এই পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ। কোর এরিয়া ৪১১ বর্গ কিলোমিটার। সেগুনের জঙ্গলে ছেয়ে আছে আর একটা বড় অংশ। জায়গায় জায়গায় দেখা যায় বাঁশগাছের ঝাড়। তাছাড়া রয়েছে মিশ্র গাছের ঘন জঙ্গল। মহুয়া, পলাশ, সাজা, বিজা, ধাওড়া, সলাই, তেণ্ডু, হলদু, অমলতাস প্রভৃতি গাছ দেখা যায় প্রচুর। তার মধ্যে দেখা যায় একেকটা সাদা রঙের কুল্লু গাছ। রঙের জন্যই তাকে আলাদাভাবে চোখে পড়ে দূর থেকে। চারদিকে সবুজের ভিড়ে একা দাঁড়িয়ে থাকা উজ্জ্বল সাদা কুল্লু গাছগুলো আরও বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে পেঞ্চের জঙ্গলকে।

উঁচু পাহাড় নেই এই জঙ্গলের ভেতরে। তোতলাডোহ বাঁধের জলাধারের দিকে গেলে দেখা যায় অন্যপারে হালকা টিলার সারি। যদিও পাহাড়ি অঞ্চল বলে পুরোপুরি সমতলও নয় ভূমিরূপ। ঢেউ খেলানো ভূতল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে বনভূমি। কাঁচামাটির সরু জঙ্গলের পথে জিপ নিয়ে চলাই সুবিধাজনক। তবে অন্য ছোট গাড়িও চলে যেতে পারে বেশিরভাগ রাস্তাতে। পৌঁছে যেতে পারে নদীর তীরে বা ঘাসজমির প্রান্তরে। ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখা দেওয়া ঘাসজমির টুকরোগুলো অন্য ধরনের সৌন্দর্যের স্বাদ এনে দেয়। বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস জন্মায় এ জঙ্গলে। হরিণের পাল চরে বেড়াতে দেখা যায় সেখানে।

তরঙ্গায়িত বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্র দেখা যায় বাঁধের জলাভূমির কাছে। একদিকে জলের ধারে উন্মুক্ত ঘাসজমি, আর অন্যদিকে ঘন গাছের ঢেউ নিয়ে পড়ন্ত আলোয় তোতলাডোহ হ্রদ মোহময়। বোটিংয়ের ব্যবস্থা আছে এক জায়গায়। মোটরবোট ভাড়া নিয়ে ভেসে পড়া যায় শান্ত হ্রদের জলে। হ্রদের বুকে গাছে ছাওয়া ছোট ছোট দ্বীপভূমি রয়েছে অনেক। শীতের দিনে পরিযায়ী পাখিদের ভিড় জমে দ্বীপগুলোর গাছের ডালে ডালে।

দূর পরিব্যাপ্ত অবাধ দৃশ্যপটের জন্য হ্রদের দিকটাকে ভালো লাগে ঠিকই কিন্তু জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা সঙ্কীর্ণ পেঞ্চ নদীর সৌন্দর্য যেন তার চেয়েও আকর্ষণীয়। দুপাশ থেকে ঝুঁকে পড়া গাছের আলো আঁধারির নীচে সেখানে সবজে

নদীর জল অনেক বেশি রহস্যময়। নদী কোথাও কিছু প্রশস্ত হয়ে বাঁক নিয়েছে পাথরের সারির মধ্য দিয়ে। পাখিদের ওড়াউড়ি দেখতে বা বনচরদের জল খেতে আসার অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা থেকে যেতে ইচ্ছে হয় সেরকম কোনও জায়গায়।

পরিযায়ী পাখিদের নিয়ে সরকারি হিসাবে ২১০ প্রজাতির পাখি আছে পেঞ্চ অরণ্যে। জলের ধারে অপেক্ষা করলে সারাদিন প্রচুর দেখা যায় নানা ধরনের বক, পানকৌড়ি আর হাঁসের সাঁতার। সরাল, খুন্তে হাঁস, ব্রাহ্মণী হাঁসের ভেসে বেড়ানো মুগ্ধ করে। মাছরাঙারা থেকে থেকে জলে ছোঁ দিয়ে যায় ঝুঁকে পড়া ডাল থেকে উড়ে এসে। ঘাসজমিতে ময়ূর ঘুরে বেড়ায় দলে দলে। গাছে গাছে দোয়েল, বুলবুল, ফিঙে, ভীমরাজ, নীলকণ্ঠ, বসন্তবৌরী, কুবো পাখি দেখা যায় অনেক। বাজপাখি বসে থাকতে দেখা যায় উঁচু গাছের ডালে।

বন্য জন্তুদের মধ্যে তৃণভোজীদেরই দেখা যায় সহজে। নানা প্রজাতির হরিণ, সম্বর, নীলগাই, বুনো শুয়োর আছে প্রচুর। গাউর চরে বেড়াতে দেখা যায় বেশি বাঁশঝাড় অঞ্চলে। মাংসাশীদের মধ্যে বাঘ ছাড়াও রয়েছে চিতা বাঘ। আর বুনো কুকুর ঢোলের জন্যও বিখ্যাত মধ্যপ্রদেশের এদিকের অঞ্চল। গত বছরের হিসাবে ২০০-২৫০ বুনো কুকুর আছে পেঞ্চের জঙ্গলে। বেশ কয়েকটা একসঙ্গে মিলে বড় বড় দলে শিকারের খোঁজে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তারা। ভাগ্য ভালো হলে জিপে যেতে যেতে ঝোপের ধারে দেখা পাওয়া যায় আচমকা। দ্রুত গা ঢাকা দেয় বড় বড় ঘাসের আড়ালে।

বাঘ যে জঙ্গলে আছে সেখানে বাঘের দেখা পাওয়াই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় বেশিরভাগ পর্যটকের। কিন্তু পেঞ্চে বাঘ দেখা অত সহজ নয়, কানহা বান্ধবগড়ের মতো পর্যটকদের জন্য তেমন পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি এখনও সেখানে। গত ডিসেম্বরের শেষে আমরা যখন সেখানে গেলাম তখন সবে কয়েকদিন হল উদ্বোধন হয়েছে ট্যুরিজমের বাংলোর। জঙ্গলে নিয়ে যাবার জন্য ভালো জিপসি গাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে। আরও বেশি সংখ্যায় পর্যটক এসে পৌঁছনোর আশায় গাইডদের ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করছেন বনদপ্তর। পোষা হাতি দিয়ে বাঘকে ট্র্যাকিং করে পর্যটকদের দেখানোর ব্যবস্থাও হয়েছে কানহা বান্ধবগড়ের মতো। পোষা হাতিদের থাকার জায়গা রয়েছে জঙ্গলের ভেতর আলিকাট্টা নামে জায়গায়। পর্যটকদের হাতিতে চড়িয়ে অরণ্যভ্রমণ করানোর পরিকল্পনাও আছে। কিন্তু দুটি হাতির বাচ্চা হওয়ার সময় হয়ে এসেছে তখন। তাই বন্ধ রয়েছে হাতিতে সফর। কাজ করার মতো হাতির সংখ্যা কম হয়ে যাওয়ায় বাঘকে ঠিকমতো ট্র্যাক করে খবরও পাঠানো যাচ্ছে না জঙ্গল থেকে। পর্যটকরা জিপ নিয়ে ঘুরে ফিরছেন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে। রাস্তার ওপরে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে, ঘাসের সঙ্গে গা মিশিয়ে শেয়াল যাচ্ছে ফেউয়ের মতো, হরিণ-হনুমানের ওয়ার্নিং কলও শোনা যাচ্ছে, কিন্তু ঝোপের আড়ালে কোথায় লুকিয়ে ঘুরছে বাঘ বোঝা যাচ্ছে না। সমস্ত রকম লক্ষণ মিলে গিয়ে দেখা পাওয়ার প্রবল আশা শেষে হাল ছেড়ে দেওয়া

হতাশায় পর্যবসিত হচ্ছে।

আমাদের জিপসির ড্রাইভার সাব্বির আলি তখন সবে কয়েকদিন হল পেঞ্চে ট্রান্সফার হয়ে এসেছেন বান্ধবগড় থেকে। বান্ধবগড় জঙ্গল সম্বন্ধে তিনি খুবই অভিজ্ঞ বলে সুনাম অর্জন করেছেন, কিন্তু পেঞ্চের অলিগলি তখনও ভালো চিনে উঠতে পারেননি। বললেন, 'এপ্রিল-মে মাসে আসুন একবার, নিশ্চয়ই বাঘ দেখাতে পারব তখন।' গাইডরা জানালেন, গরমের দিনে জঙ্গলে জল কম হয়ে গেলে পথের পাশে ডোবার ধারে বাঘ দেখা যায় সহজে। পেঞ্চ নদীতেও সব জায়গায় জল থাকে না গরমে, বলছিলেন তাঁরা। শীতের দিনে তখনই শান্ত হয়ে গেছে পেঞ্চ নদীর প্রবাহ। জায়গায় জায়গায় জল শুকিয়ে গিয়ে শেষে থেকে যায় জঙ্গলের বুকে কিছু বিক্ষিপ্ত জলাভূমি। গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে বাঁচতে জন্তুরা বিশ্রাম নেয় শীতল জলার ধারে গাছের নীচে। পর্যটকদের গরমের জন্য ততটা কষ্ট হয় না কারণ সকালে ৬টা থেকে যাত্রা শুরু হয়ে, রোদ চড়া হওয়ার আগে ১০টার মধ্যেই জঙ্গল সফর শেষ হয়ে যায়। দুপুরটা ঘরে কাটিয়ে আবার বিকেল ৩টে থেকে সন্ধে পর্যন্ত দেওয়া যায় দ্বিতীয় চক্কর। কলকাতা থেকে যাতায়াতের কষ্টটুকু সহ্য করে নিতে পারলে গরমের দিনেও পেঞ্চ ভ্রমণ অসম্ভব নয়। আর পাতা শুকিয়ে ঝোপ কম হয়ে যাওয়ার জন্য তখন গাছের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টিও প্রসারিত হতে পারে বেশিদূর তাই বন্যপ্রাণী খুঁজে বের করাও সুবিধার।

তবে যতই বলুক, শীতের দিনে জঙ্গল ভ্রমণ মনোরম। নিঝুম ভোরের ঠান্ডায় জিপ নিয়ে অরণ্য পথে যেতে যেতে সামনে কাঁচা মাটিতে বাঘের সম্বরের হরিণের পায়ের ছাপ আবিষ্কার করাও আনন্দের। দুপাশের সুদীর্ঘ গাছগুলোর মাথায় মাথায় তখন কুয়াশার জড়াজড়ি। তেমন দিনে বাঁক নেওয়া সংকীর্ণ পথ ধরে বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে শব্দহীন গাড়িতে বনচরদের খুঁজতে খুঁজতে ব্রাহ্মণী হাঁস ভাসা শান্ত তন্বী পেঞ্চ নদীর দিকে নিঃসাড়ে এগিয়ে চলা স্বপ্নময়।

তখন হ্রদের দিকে যে পথে তৃণভূমি বেশি, রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বেরিয়ে আসে চিতল হরিণের দল। হ্রদের জলে দ্বীপের গাছে দেখা দেয় শীতের বিশেষ অতিথি পাখিরা। আর যখন পথের ধারে কচিপাতা খেতে আসা সম্বরেরা শুকনো পাতায় শব্দ তুলে ছুটে পালিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ চোখে আরেকবার ঘুরে তাকায় আগন্তুক পর্যটকদের দিকে, তখন কোনও ঋতুতেই মনে হয় না ভুল হয়েছে জঙ্গলে আসার সিদ্ধান্ত।

নদীতে বাঁধ দিয়ে হাইড্রো ইলেক্ট্রিসিটি প্রজেক্ট তৈরি করতে গিয়ে জঙ্গল ভেঙে হ্রদটা তৈরি হয়েছে সুন্দর, কিন্তু অরণ্যভূমি নষ্ট হয়েছে অনেক। পুরোপুরি জলপূর্ণ হলে তা ৫৪ বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ড জলে ছেয়ে রাখে সে জায়গাটাই, যা কিপলিংয়ের জাঙ্গল বুকে পেঞ্চ অরণ্যের শ্রেষ্ঠ উপত্যকাভূমি বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। এখনও সেদিকের উপত্যকায় রক্ষা পেয়ে যাওয়া অরণ্যের সৌন্দর্য মুগ্ধ করে। গাছে ঘেরা ঘাসজমির টুকরোগুলোতে একসঙ্গে নির্ভয়ে চরে বেড়াতে দেখা

যায় হরিণ হনুমান ময়ূরের ঝাঁককে। প্রাচীন সাহিত্যে যেমন ঋষিদের আশ্রম অঞ্চলের পরিবেশের বর্ণনা দেওয়া হত ঠিক তেমনই ছবি খুঁজে পাওয়া যায় পেঞ্চের জঙ্গলে। মনে হয় সত্যিই বেড়ানোর সৌভাগ্য হল এক টিকে যাওয়া তপোবনে।

পেঞ্চের জঙ্গলে পর্যটনের পরিকাঠামো তৈরির চেষ্টা চলছে জোরদার। থাকার জন্য আরও রিসর্ট হচ্ছে। তোতলাডোহ লেকের জলে দাঁড়টানা নৌকো আর প্যাডেল বোটে ঘোরার ব্যবস্থা হচ্ছে। রাতেও বনচরদের গতিবিধি দেখার জন্য জঙ্গলে গাছের ওপর ওয়াচটাওয়ারে রাত কাটানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পেঞ্চ ভারতের একমাত্র ন্যাশনাল পার্ক যেখানে নদীতে জঙ্গলের বাফার জোনে র‍্যাফটিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে। করা হচ্ছে এমন অনেক কিছুই কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এখনও এখানে জঙ্গলে ডিজেল গাড়ি ঢোকা বন্ধ করা যায়নি। যে কোনও যাত্রীগাড়ি চলে যেতে পারে জঙ্গল পার হয়ে। বায়ু দূষণের সঙ্গে শব্দ দূষণও বেশি হয় সে গাড়িতে। আর বনচর দেখাও অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায় তার ফলে। জঙ্গলের পথে ঘুরতে ঘুরতে এমন অনেক যাত্রী বোঝাই ডিজেল গাড়ি দেখা যায়। মনে হয় যেন তাঁরা যাতায়াতের পথে দেখে চলে যাচ্ছেন জঙ্গলটাকে। এটা চলতে দিলে সবদিক থেকেই জঙ্গলের পরিবেশ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা। তবে অবশ্যই অনিয়ন্ত্রিত নয় জঙ্গলে প্রবেশ। চেক গেট থেকে ঢোকার আগে অনুমতির জন্য নাম-ঠিকানা লিখে ফর্ম ফিলাপ করে এন্ট্রি ফি জমা দিয়ে তবেই জঙ্গলে ঢুকতে হয়। আর প্রত্যেক গাড়িতে একজন গাইড নেওয়াও বাধ্যতামূলক। গাড়ি না নিয়ে হেঁটে ঘোরা যায় না কোনও টাইগার রিজার্ভেই।

হেঁটে ঘুরতে ভালো লাগে জঙ্গলের বাইরে আদিবাসীদের গ্রামগুলোতে। তাদের উন্নতির জন্য ইকো ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট শুরু হয়েছে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সহায়তায় ১৯৯৬ সালে। পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভের আশপাশের ৯৯টি গ্রামের মানুষদের উন্নয়নে সাহায্যের প্রকল্প করা হয়েছে যাতে তাদের জঙ্গলের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন কম হয় আর বিনিময়ে যাতে তারা ব্যাঘ্র প্রকল্প সংরক্ষণে সাহায্য করতে পারে। তুরিয়া চেকগেটের পথেই রয়েছে তেমন গ্রাম। দেখে নেওয়া যায় বহুকাল ধরে জঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল এই মানুষদের জীবনযাত্রা। আর সময় থাকলে দেখে আসা যায় নাগপুরের পথে তুরিয়া থেকে ৫১ কিলোমিটার দূরে ন্যাশনাল হাইওয়ের কাছেই মানসরে প্রত্নতত্ত্বের খননকাজ; তার আরও ১০ কিলোমিটার দূরে কবি কালিদাসের মেঘদূত খ্যাত রামটেকের দুর্গমন্দির।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভের তুরিয়া প্রবেশপথে নাগপুর হয়ে যাওয়া যায়। নাগপুর থেকে সেওনি-জব্বলপুরের বাস ধরে এসে নামতে হবে ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপর

খাওয়াসাতে। নাগপুর থেকে খাওয়াসার দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার। সরকারি বাস ছাড়া প্রাইভেট ডিলাক্স বাসও যাতায়াত করে এপথে। পৌঁছতে ঘণ্টা আড়াই সময় লাগে। মহারাষ্ট্রের সীমানা পার হয়ে মধ্যপ্রদেশের চেকপোস্ট পার হয়েই বাস থেকে নেমে পড়তে হবে। হাইওয়ের ওপরে সেখানে কিছু দোকানপাট ও সাধারণ খাবারের হোটেল আছে। সেই মোড় থেকে বাঁদিকের পথে আরও ১০ কিলোমিটার গিয়ে তুরিয়াতে গ্রামের প্রান্তে এম পি ট্যুরিজমের রিসর্ট। জঙ্গলের প্রবেশপথ রিসর্ট থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে।

খাওয়াসা থেকে তুরিয়া গ্রামে যাওয়ার জন্য শেয়ারের ট্রেকারে সওয়ার হওয়া যায়। ৭৫-১০০ টাকায় পুরো ট্রেকারও ভাড়া পাওয়া যাবে। নাগপুর থেকে ৬০০-৮০০ টাকায় গাড়ি ভাড়া করে ৯০ কিলোমিটার দূরের তুরিয়া চলে আসা যেতে পারে। জব্বলপুরের দিক থেকে এলে ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপর সুকতারা নামে জায়গাটা থেকে ডানদিকে গিয়ে কারমাঝিরি প্রবেশপথ দিয়ে জঙ্গলে ঢোকা যায়। জব্বলপুর থেকে সুকতারার দূরত্ব ১৬৫ কিলোমিটার। সুকতারা থেকে কারমাঝিরি গেট ৩০ কিলোমিটার।

জব্বলপুর থেকে তুরিয়াতে আসতে হলে পথের দূরত্ব সামান্য কিছু বেশি হয়। জব্বলপুর থেকে খাওয়াসা ১৯০ কিলোমিটার, তুরিয়ার গেট আরও ১২ কিলোমিটার।

কোথায় থাকবেন

এম পি ট্যুরিজমের 'কিপলিং রিসর্ট'। ভাড়া ডাবল বেড ৮৯০ টাকা।

তুরিয়াতে প্রাইভেট রিসর্ট 'মোগলি ডেন' (☎০৭৬৯৫-৩২৮৩২)। ভাড়া ডাবল বেড ৯৫০ টাকা, এক্সট্রা বেড ২০০ টাকা।

এছাড়া ফরেস্ট বাংলোতেও থাকা যেতে পারে। ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপর রুখড়ে রয়েছে তাদের বাইসন রিট্রিট। কারমাঝিরি, ঘাটকোহকা, খাওয়াসাতেও তাদের লজ আছে। ভাড়া ২৫০-৪০০ টাকা।

প্রবেশমূল্য

প্রতিদিন প্রতি ব্যক্তি ১৫ টাকা। প্রতিদিন প্রতি গাড়ি ৫০ টাকা। গাইড- প্রতিবেলা ৭৫ টাকা। ক্যামেরা: প্রতিদিন ২৫ টাকা (স্টিল), প্রতিদিন ২০০ টাকা (ভিডিও)।

কখন যাবেন

পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ খোলা থাকে ১ নভেম্বর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত। বন্ধ থাকে জুলাই থেকে অক্টোবর।

যাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় মার্চ থেকে মে মাস। তবে গরম পড়ে খুব। দুপুরের দিকে লু চলে এই অঞ্চলে।

'ভ্রমণ' মার্চ, ২০০৩

আলাস্কার দিনগুলো

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

আলাস্কা যাবার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের। কিন্তু মনপবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হুস করে বেরিয়ে পড়া সহজ নয়। যাব যাব করেই দুবছর কেটে গেল, যাওয়া আর হয় না। নানা বাধা, নানা বন্ধন। তারই মধ্যে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ওপর একটা ভ্রমণচিত্র তৈরির কাজে ওই শ্বেত মহাদেশে যাবার সুযোগ হয়ে গেল। এমনিতে বরফঢাকা আন্টার্কটিকা নিজের চোখে দেখবার স্বপ্নও কখনও দেখিনি। ভ্রমণই বলুন আর অভিযানই বলুন, আন্টার্কটিকার যেদিকে যতদূর যেতে পেরেছি, যেখানে যতটুকু দেখতে পেয়েছি, মন ভরে গেছে, ধন্য দু-নয়ন।

দেশে ফিরে আলাস্কার আকর্ষণ তত আর বোধ হয় না। দক্ষিণ মেরু অঞ্চল ভ্রমণের পর আর কি আলাস্কা আমার মন ভরাতে পারবে?

এদিকে 'আন্টার্কটিকা' ভিসিডি-র বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে 'আলাস্কা' নিয়েও ভ্রমণচিত্র তৈরির কথা পাকা হয়ে গেল।

আন্টার্কটিকা যাত্রার আট মাস পরে এবার আলাস্কা যাত্রা। দক্ষিণ মেরুর তুষার অঞ্চলের পর আলাস্কার তুন্দ্রা অঞ্চল। মাঝে অবশ্য সপ্তাহ-দুয়েক ঘুরেছি আফ্রিকার সাভানা অঞ্চলে।

জুলাই মাসের ১৫ তারিখে ভ্যাঙ্কুবার থেকে জাহাজ ছাড়বে।

১৩ তারিখ ঘুম ভেঙেই কলকাতায় সে কথা মনে পড়ে মন আনন্দে ছেয়ে গেল। আজই মধ্যরাতে উড়ব।

কাগজপত্র, ক্যামেরা ক্যাসেট ইত্যাদি গোছগাছ করে অবেলায় অফিসে গিয়ে এয়ারপোর্টে যাবার আগে পর্যন্ত সব কাজ শেষ করে কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর ও সোল হয়ে ভ্যাঙ্কুবারে এসে নামলাম পরদিন দুপুরে। কলকাতায় তখন তারও পরের দিনের রাত দেড়টা।

পরদিন কথামতো সকাল দশটায় জেটিতে হাজির হয়ে ক্রুজ কোম্পানির পোর্টারের কাছে সমস্ত লাগেজ জমা দিলাম।। আছি কানাডার ভ্যাঙ্কুবারে, যাব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায়, নতুন নিয়ম অনুযায়ী ইমিগ্রেশনের সময় দু-হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ আর মুখের অলক্ষ্য ছবিও নেওয়া হল। তবে এই আচার-অনুষ্ঠানে মিনিট কয়েকের বেশি সময় লাগল না। তার মধ্যেই হঠাৎ

অনুভব করলাম, বিশ্বজুড়ে এখন বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসই বেশি প্রবল, ভালোবাসার চেয়ে ঘৃণাই অধিক প্রসারশীল।

বেলা একটায় জাহাজে উঠলাম। জাহাজ ছাড়ল বিকেল ছটায়। তার আগেই যথাসময়ে বুফে লাঞ্চ হল জাহাজের ন-তলার ডেক-এ। তিন-চার জায়গায় তিন-চার ধরনের ভোজ্য সাজানো, বিরাট জায়গায় এদিক-ওদিক প্রচুর খাবার টেবিল, কিন্তু খাবার নেওয়ার সব কটা জায়গায় লম্বা লাইন। দিনে এই, আর রাতে প্রতিদিন একই টেবিলে একসঙ্গে পাঁচ-ছজনের ডিনারের ব্যবস্থা। কারও চারতলার ডেকের ডাইনিং হল-এ, কারও পাঁচতলার ডেকে। প্রথম দিন দুপুর থেকেই আর একটা জিনিস দেখলাম, নতলা-দশতলার দুটো আধুনিক সুইমিং পুলে সব সময়ই মহিষ বা জলহস্তি বা সারসের মতো একদল আবালবৃদ্ধবণিতার ভিড়। শুনলাম প্রায় আড়াই হাজার যাত্রী চলেছেন আলাস্কা দেখতে। অথবা হয়তো আলাস্কাদর্শনের চেয়ে এই আরামে-বিলাসে ভরপুর সমুদ্রবিহারই যাত্রীদের কাছে বড় আকর্ষণ। আড়াই হাজার যাত্রীর সব সময়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দের দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের সংখ্যাও হাজারের কম নয়।

এমন ভ্রমণে আমার মন মাতে না। জাহাজ ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তীরে না দেখছি মানুষের জীবননাট্য, না প্রকৃতির নিসর্গকাব্য— চোখ ভরে দেখবার মতো কিছু পাই না। জাহাজের মধ্যেও আপন সুখে আপন আনন্দে মেতে থাকা ছোট ছোট একেকটি গোষ্ঠী। এ যেন নানা দেশের নানা ভাষার স্বচ্ছল মানুষের একটি চলন্ত আনন্দনগরী। এখানে থিয়েটার হল আছে, রেস্তোরাঁ আছে, বার আছে, ক্যাসিনো আছে, সুইমিং পুল আছে, জগিং ট্র্যাক আছে, হরেক কিসিমের কেনাকাটা আছে, জোড়ায়-জোড়ায় নৃত্য আছে, নাটক আছে, নিলাম আছে, প্রতিযোগিতা আছে, এটা-সেটার প্রশিক্ষণ আছে— এ যেন এক মস্ত বড় চলন্ত ফাইভ স্টার হোটেল।

পরদিন, ১৬ জুলাই, ইনসাইড প্যাসেজ দিয়ে জাহাজ চলেছে। প্রায় যেন তীর ঘেঁসে। তীরে বড় বড় সেডার গাছের ঘন জঙ্গল। সবুজে ঢাকা পাহাড়। মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হচ্ছে। ঠান্ডা প্রাণান্তকর নয়। একটা জ্যাকেটেই যথেষ্ট। তবে কানঢাকা টুপি চাই-ই।

১৭ জুলাই কেটচিকানে সকাল সাতটায় জাহাজ নোঙর করল, থাকবে সারাদিন। এখানে চোদ্দ দুগুণে আঠাশ রকম এক্সকারশান ট্যুরের ব্যবস্থা আছে। তার একটা বা দুটো ট্যুর করতে পারলে ভালো লাগত। বিশেষ করে টোটেম পার্ক বা স্যাক্সম্যান নেটিভ টোটেম গ্রাম দেখার খুব ইচ্ছে। তবে সবই বাড়তি খরচে। জাহাজভ্রমণের যে মূল্য আগাম দিয়েছি, এখরচ তার বাইরে। একেকটা ট্যুরের দামও একেক রকম। আরও বিরক্তিকর, যেদিনের ট্যুর, তার আগের দিন বেলা বারোটার মধ্যে জাহাজের নির্দিষ্ট কাউন্টারে গিয়ে ট্যুর বুক করতে হবে। তাছাড়া এইসব দরকারি তথ্যের কাগজের সঙ্গে এটা কিনুন, সেটা খান, এত ডিসকাউন্ট,

এত ফুর্তি, এত ফ্রি ইত্যাদি এতরকম রংবেরঙের সচিত্র কাগজপত্রের মিশেল যে তার মধ্যে থেকে কাজের কথাটা আলাদা করে দেখে নেওয়া আর হয় না। বেড়াতে এসে অফিসের মতো ঘড়ি-ঘড়ি কাগজপত্র দেখা বা ঘড়ি ধরে ওঠা-বসা বা এত বেশি বাণিজ্যপ্রবণতা বেশ বিরক্তিকর। তাছাড়া কলকাতায় জাহাজের কেবিন বুক করার সময় ট্র্যাভেল এজেন্ট এসব বিষয়ে কিছুই জানাননি। ফলে আমার টোটেম পার্ক দেখা হল না। আলাস্কার সর্ব দক্ষিণের এই শহরে সারাদিন জাহাজেই কাটল।

এরপর জাহাজ থামল স্ক্যাগওয়েতে। ১৮ জুলাই সকাল ১০টায়। ছাড়বে রাত ৮টায়, আলাস্কার রাজধানী জুনোর উদ্দেশে।

স্ক্যাগওয়েতে প্রথম দেখা গেল পাহাড়ের গায়ে মাথায় বরফ, ছোট ছোট গ্লেসিয়ার। ছোট ছোট ঝরনা। এখানেও আঠাশ ছেড়ে আটত্রিশ রকম ছোট-বড় এক্সকারশন আছে।

স্ক্যাগওয়ে শহর আর উদ্যান দর্শন বা কুকুরে-টানা স্লেজগাড়ি দেখা, কি নিসর্গের মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত ট্রেনযাত্রা থেকে শুরু করে হেলিকপ্টারে গ্লেসিয়ার উপত্যকা ঘোরা বা জেটবোটে চড়ে ঈগল সন্ধান— অনেকরকম দেখা শেখা জানা পাওয়ার ভ্রমণসূচি। যার যেটা পছন্দ। যার যেমন সামর্থ।

১৯ জুলাই সকাল ৭টায় জুনো পৌঁছলাম। এখানে সারাদিন থেকে জাহাজ আবার নোঙর তুলবে রাত ৯টায়।

কেটচিকান, স্ক্যাগওয়ে, জুনো— এসবই আলাস্কা উপসাগরের ইনসাইড প্যাসেজ। এ হল দক্ষিণ-পূর্ব আলাস্কা।

আলাস্কার নবতম রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও জুনোয় স্থলপথে যাতায়াতের উপায় নেই। জলপথ আর নাহলে বায়ুপথই যোগাযোগের রাস্তা। এই জুনোতেই গোল্ড রাশ প্রথম শুরু হয়েছিল। শুনলাম জুনো নামে এক মাতাল প্রথম সোনার খোঁজ পায়, যদিও সে নিজে কপর্দকহীন অবস্থায় মারা যায়। তার দেহ তার নিজের দেশে নিয়ে যেতে চাঁদা তুলতে হয়েছিল।

সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের কোলে জুনোর বন্দর এলাকা জনবহুল, যানবহুল, দোকানবহুল, বেশ সমৃদ্ধ। বিভিন্ন দোকানে পাথরের গয়নাগাটি, ফারের পোশাক, স্টাফ করা আলাস্কার পশুপাখি বিক্রি হচ্ছে। রুশদের হস্তশিল্পও প্রচুর। দুয়েকটা দোকানে ভারতে তৈরি উলের পোশাকও চোখে পড়ল। আলাস্কার প্রায় সর্বত্র দোকানে বাজারে নানা ধরনের স্বদেশী হস্তশিল্প, নরম পাথরের শ্বেত ভালুক আর কাঠ পাথর মাটির তৈরি বিভিন্ন বন্যপ্রাণী থাকবেই।

জুনোয় আলাস্কা স্টেট মিউজিয়ামে আলাস্কার ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রায় সব কটা পর্বই দেখা যায়। রুশ আমলের শুরু থেকে গত শতাব্দীর গোড়ায় স্বর্ণখনির লোভে ইউরোপীয়দের ধেয়ে আসা পর্যন্ত আলাস্কার ইতিহাস আলাদা একটা বিভাগে ধরা আছে।

পরদিন ২০ জুলাই সকাল ৮টায় জাহাজ থামল আইসি স্ট্রেট পয়েন্টে। এখানেও

নেই-নেই করে এক ডজন বেড়ানোর আয়োজন। তার মধ্যে তিমি-অভিযান আর বাদামি ভালুকের খোঁজে— দুটোতেই যাবার খুব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাদামি ভালুক দেখার লোভ ত্যাগ করতে হল। দুটো প্রায় একই সময়ে। তিমি জলের অল্প নীচে ও জলের ওপরে বেশ ভালোভাবেই দেখা গেল।

তবে এই জাহাজযাত্রায় প্রথম মন ভরল পরের দিন ভোরে— সামনে সুদীর্ঘ হাবার্ড গ্লেসিয়ার। বিরাট লম্বা। উত্তর আমেরিকায় এর চেয়ে লম্বা উপত্যকা-গ্লেসিয়ার আর নেই। শেষ ক্ষুদ্র তুষারযুগের শত শত গ্লেসিয়ারের মধ্যে একমাত্র এই হাবার্ড গ্লেসিয়ারই এখনও টিকে আছে। ৯০ মাইল দীর্ঘ বরফের এক জমাট পাঁচিল। ৬ মাইল চওড়া, ৩০০ ফুট উঁচু এর মুখ সমানে সামনে এগিয়ে চলেছে। জানা গেছে, দিনে ১০০ ফুট করে এগোচ্ছে। এই প্রথম পূর্ণোদ্যমে ক্যামেরা চালু করলাম।

গ্লেসিয়ারের এখানে ওখানে মেঘগর্জনের মতো প্রবল শব্দে তুষার বিস্ফোরণ দেখতে পাচ্ছি। বড় বড় বরফের চাঁইসুদ্ধ তুষারধস নেমে এসে জলে পড়ে ঢেউ সৃষ্টি করছে। স্থিরচিত্র, চলচ্চিত্র— দুটো ক্যামেরাতে দুরকম ছবিই তুলেছি। স্টিল তুলতে গিয়ে ভিডিও বাদ, আবার কখনও এর উল্টোটাও হল।

সবাই জাহাজের ছাদে উঠে এসেছে। ভয়ানক ঠান্ডা। রাশিয়ার এক বৃদ্ধা গায়ে-মাথায় বিছানার কম্বল জড়িয়ে চলে এসেছেন। এরই মধ্যে এক তরুণ দুহাতে ফ্লাস্ক নিয়ে গরম চকোলেট হেঁকে চলেছে। এক ফ্লাস্ক ১৭ ডলার। সঙ্গে ফ্লাস্কটা সুভেনির হিসাবে নিতে হবে। আমাদের দরকার ছিল কফি। তার বদলে চকোলেট। দুজনের জন্য ৩৪ ডলার, বড্ডই বেশি! তবু শেষ পর্যন্ত নিতেই হল। গরম চকোলেটে চুমুক দিয়ে শীতের কামড় থেকে কিছুটা তো বাঁচলাম। গ্লেসিয়ারের টানে গরম টুপি ছাড়াই ছাদে এসেছিলাম।

একটু বেলা হতেই আবার সমুদ্রযাত্রা। আলাস্কা উপসাগর দিয়ে চলেছি। কেবিনের লাগোয়া একচিলতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু অজানা জল আর অচেনা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সময় কাটে। কখনও বারান্দা থেকে ঝুঁকে, অনেক নীচে ঝাঁক ঝাঁক পাখির ছবি তুলি। কখনও উড়ছে, কখনও জলে ভেসে চলেছে।

রাত সাড়ে এগারোটার সময়ও পশ্চিম আকাশে অস্তসূর্যের অবর্ণনীয় বর্ণচ্ছটা। চোখ ফেরায়, ঘরে যায় কার সাধ্য!

আজ আবার পূর্ণিমা। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ নীচের খোলা ডেক থেকে চাঁদ দেখে স্তম্ভিত। চাঁদ এত বড় হয়! রাত দুটোয়, অস্তসূর্যের রেশ মিলিয়ে যাবার অনেক পরে আকাশে এক অদ্ভুত আলো দেখে অভিভূত হয়ে পড়ি। আমরা যেদিকে যাচ্ছি তার উল্টোদিকে অর্থাৎ আমাদের ফেলে আসা দিকে যেন সূর্যোদয় হচ্ছে। এখন তো অরোরা বোলিয়ালিস বা উত্তরের আলোর সময় নয়! তাছাড়া সে তো শুনেছি আলোর নাচন! আমি যে আলো দেখছি তা স্থির, ওপর থেকে জলের

অনেকটা কাছে এসে মিলিয়ে গেছে।

ভোরবেলা ঘুমিয়েছি, তাও সাতসকালে ঘুম ভেঙে গেল। জাহাজ সিউয়ার্ডে নোঙর করছে। এখানেই সমুদ্রযাত্রা শেষ।

২

রেজারেকশান উপসাগরের শিয়রে কোনাই গিরিশ্রেণীর পাদমূলে ছবির মতো ছোট্ট শহর সিউয়ার্ড। দক্ষিণ-মধ্য আলাস্কার সবচেয়ে পুরনো জনপদ। বাসিন্দা তিন হাজারেরও কম। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে রুশরা এখানে প্রথম বসতি করে। পরে এখান থেকেই বিখ্যাত আলাস্কা রেলরোডের শুরু হয়। সিউয়ার্ড থেকে ফেয়ারব্যাঙ্কস পর্যন্ত ভবিষ্যতের সেই পরিকল্পিত রেলপথের সমুদ্রতীরবর্তী প্রান্তিক স্টেশন হিসেবেই ১৯০৩ সালে সিউয়ার্ডের প্রতিষ্ঠা। তার ৩৬ বছর আগে ১৮৬৭ সালে রাশিয়ার কাছ থেকে আলাস্কা কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করেছিলেন যিনি, আমেরিকার স্টেট সেক্রেটারি সেই উইলিয়াম সিউয়ার্ডের নামে এই ছোট্ট বন্দরশহরের নামকরণ।

একর পিছু দুই সেন্ট, অর্থাৎ বিঘে প্রতি এক পয়সারও কম দরে আমেরিকা আলাস্কা কিনে নেয়। তখন মাটির তলায় তেল আর সোনার কথা কে জানত!

সিউয়ার্ড থেকে পর্যটনসংস্থার কোচে চলেছি। রাস্তার দুপাশে অনাহত সবুজ আর অতি নিকটস্থ গিরিশ্রেণী। তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ বা গ্লেসিয়ার। আজকের গন্তব্য আলাস্কা পাহাড়ের তলায় গার্ডউড। জায়গাটা অ্যাঙ্কারেজের ৪০ মাইল দক্ষিণে। উঁচু রেনফরেস্টে ঘেরা।

বিকেলের দিকে গার্ডউড পৌঁছলাম। এখানে আলিয়েস্কা প্রিন্স হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। আলাস্কায় অনেকেই দেখেছি 'আলাস্কা' না-বলে, বলে 'আলিয়েস্কা'। যেমন, আলিয়েস্কা পাহাড়শ্রেণী। আসলে আলাস্কা আদিতে আলিয়েস্কাই ছিল। 'আলিয়েস্কা' কথাটার অর্থ গ্রেট ল্যান্ড বা মহাভূমি। দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পশ্চিম আলাস্কার আলিয়ুট এস্কিমোদের আলিয়ুট ভাষার শব্দ এটি। এই আলিয়েস্কা থেকেই দেশটার নাম আলাস্কা।

মালপত্র ঘরে রেখেই হোটেলের লাগোয়া এরিয়েল ট্রামে বা আমাদের পরিচিত কেবল কার-এ চড়ে বসলাম। এটাই নাকি দিনের শেষ ট্রামযাত্রা। ওপরে যেখানে নামলাম, সেখান থেকে চারপাশে, ঊর্ধ্বে অধে সুন্দরের সুবিস্তৃত তপোবন। চোখের একেবারে সামনে গ্লেসিয়ার, গিরিশ্রেণী, নদী, সবুজের প্রলেপ।

রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত গভীর অরণ্য চিরে চলে যাওয়া জনহীন রাস্তায় একা একা ঘুরে বেড়ালাম। গাছের আড়াল ছাপিয়ে দপদপ করছে দুটি গাঢ় কমলা রঙের গ্লেসিয়ার, অথবা হয়তো তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ। তুষারচূড়ায় মধ্য রাতের সূর্যাস্তের আঁচড়, এ এক দুর্লভ লাবণ্য।

গার্ডউড থেকে পরদিন গেলাম টালকিটনা। পথে ছুঁয়ে গেলাম অ্যাঙ্কারেজ।

অ্যাঙ্কারেজে পৌঁছলাম ঠিক দুপুরবেলা। এটাই আলাস্কার সবচেয়ে বড় শহর। আলাস্কার সবচেয়ে ঘনবসতির শহরও বটে। আলাস্কার প্রায় অর্ধেক মানুষের বাস এখানে। রাস্তার দুপাশে নানারকম দোকান, রেস্তোরাঁ, ফুটপাতে টেবিল পেতে খাওয়া দাওয়া, হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ে দোকানের শো উইন্ডোতে সাজানো আলাস্কার বিখ্যাত ফার, নানান হস্তশিল্প। আবার আধুনিক জীবনের প্রয়োজনীয় বিবিধ পণ্য।

একটা চিনা রেস্তোরাঁয় চটপট দুপুরের খাওয়া সেরে শহর দেখবার জন্য হাতে অল্পই সময় পাওয়া গেল। এভাবে অন্যের ব্যবস্থায় দলে পড়ে ভ্রমণে আমি অভ্যস্ত নই। ফলে মনে খুঁতখুঁতি, ক্ষোভ নিয়েই রাস্তা থেকে চওড়া সিঁড়ি বেয়ে বেশ নীচে নেমে শনিবারের হাটে ঢুকে পড়লাম। সারি সারি অস্থায়ী তাঁবুতে একেবারে মেলা বসে গেছে। আলাস্কার আদিবাসী, নানা উপজাতির মানুষের এতরকম হাতের কাজ— ইচ্ছে করে ঘুরে ঘুরে হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে সব দেখি। স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলি। অন্যের বিচার-বিবেচনায় সময় বরাদ্দ হয়েছে, পুরো ভ্রমণসূচিই অন্যের জ্ঞান বুদ্ধি রুচিতে স্থির করা, এ অবস্থায় নিজের মনের তাড়নায় এদিক সেদিক ঘোরা বা আশ মিটিয়ে বেড়ানোর আশা করাই বৃথা। হয়তো সীমিত সময় ও নির্দিষ্ট মূল্যও উদার অকৃপণ ভ্রমণসূচি তৈরির প্রধান প্রতিবন্ধক।

তাড়াহুড়ো করে হাটের ভিড়ে, যতটা সম্ভব দেখে বেড়ালাম।

আলাস্কায় নানা উপজাতির এস্কিমোদের বাস। শুনেছি অ্যাঙ্কারেজে আলাস্কা নেটিভ হেরিটেজ সেন্টারে এই রাজ্যের এগারোটি প্রধান দেশজ সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। হাটের সারি সারি তাঁবুর দোকানের অনেকগুলোতেই এদের নানারকম হাতের কাজ দেখলাম। বেশিরভাগ কাঠ বা পাথরের। একটা দোকানে পাথরের গায়ে আঁকা আলাস্কার প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণীর জীবন্ত ছবিতে চোখ আটকে গেল। ছবির ভিড়ের একপাশে বৃদ্ধ দোকানদার নীরবে বসে আছেন। আলাপ করে জানলাম, ইনিই শিল্পী। সব ছবিই এঁর আঁকা।

দোকানে দোকানে ঢেলে গেঞ্জি, টি শার্ট বিক্রি হচ্ছে। সব গেঞ্জি ও শার্টের গায়ে আলাস্কার কোনও না কোনও বন্যপ্রাণীর ছবি। কাঠের হাতলওলা ঝকঝকে ধারালো কুঠার ফলার মতো সব্জি মাছ মাংস কাটার ছুরি— 'উলু' ও এরকম নিত্যব্যবহার্য সাবেকী সরঞ্জাম দোকানের সামনেই রাখা আছে। তিনটি এস্কিমো বালিকা দেখলাম খুব মনোযোগ দিয়ে সস্তার গয়না নাড়াচাড়া করছে।

আবার সেই প্রায় অর্ধশত সিঁড়ি ঠেঙিয়ে শহরের বড় রাস্তায় উঠে এসে দেখি আমাদের কোচ তখনও নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে আসেনি। এই সুযোগে আমার সঙ্গিনী আমার হাতের ও কাঁধের ক্যামেরাগুলোর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে কাছেই একটা সুভ্যেনির শপের সোফায় বসে সেদিনের শ্যুটিং বিবরণ লিখতে শুরু করলেন। আমি রাস্তা পার হয়ে কিছুটা এগিয়ে 'ওল্ড আর্মি শপ'-এ রোদ থেকে

মাথা বাঁচানোর টুপির খোঁজে ঢুকে পড়লাম।

কাউন্টারের মেয়েটি বলল, নীচতলায় চলে যান। নীচতলায় নেমে কাউকেই খুঁজে পেলাম না। দুদিকের ঢালাও জিনিসপত্রে চোখ বোলাতে বোলাতে এগিয়ে চলেছি। কোথায় টুপি, ফিরে আসবার মুখেই আরও সামনে ডানদিকে জিনিসপত্রের আড়ালে এক তরুণকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেলাম। টুপির কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থামতে হল, দেখি একজন নয়, দুজন, সুদীর্ঘ চুম্বনরত। একজনের আড়ালে একজন ঢাকা পড়েছিলেন বলে দূর থেকে একজনকে দেখেছিলাম। এঁরাও হয়তো আমার মতোই কিছু কিনতে এসেছিলেন। হঠাৎই বিনামূল্যে অমূল্য রতন প্রাপ্তির সুযোগ মেলায় সামান্য কেনাকাটার কথা ভুলে গেছেন। টুপির আশা ছেড়ে নিঃশব্দে ফিরে এলাম।

আলাস্কার ভূগোল, রাস্তাঘাট, রেলপথ, নদী, পাহাড়, অরণ্য আগে জানা থাকলে সিউয়ার্ড থেকে পর্যটনসংস্থার কোচে না উঠে আলাস্কা রেলে অ্যাঙ্কারেজ আসতাম। অ্যাঙ্কারেজ সিউয়ার্ড থেকে ১২৭ মাইল। প্রথমে সিউয়ার্ড থেকে কেনাই ফিওর্ড (Kenai Fjord) ন্যাশনাল পার্কের এক্সিট গ্লেসিয়ার দেখে পরদিন ট্রেনে চড়া যেত। গার্ডউড থেকে ছোট শাখা-লাইন ১৩ মাইলের মতো নেমে, চলে গেছে হুইটিয়ার-এ। এটাই আলাস্কার প্রিন্স উইলিয়াম সাউন্ড গ্লেসিয়ার রাজ্যের প্রবেশদ্বার। অবশ্য এভাবে এই ট্রেনে গার্ডউড বা হুইটিয়ার যাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিইনি। আলাস্কা রেলরোডের সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ করে হয়তো ব্যবস্থা করা যায়।

যদি স্বাধীনভাবে আসতাম, অ্যাঙ্কারেজেও দুয়েকদিন থেকে আবার ট্রেনে উঠতাম। সিউয়ার্ড থেকে ফেয়ারব্যাঙ্কস— প্রায় পাঁচশো মাইল দীর্ঘ এই রেলযাত্রাই এক অবিস্মরণীয় ভ্রমণ। টালকিটনা থেকে ডেনালি পার্ক ও ডেনালি পার্ক থেকে ফেয়ারব্যাঙ্কস— আমি সাতদিনে দু দফার এই রেলযাত্রার শেষে বুঝতে পেরেছিলাম, কেলিন জনসন তাঁর 'পোর্ট্রেট অব দ্য আলাস্কা রেলরোড' বইয়ে ঠিকই বলেছেন, 'আলাস্কায় বাস করে আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে ছেলেবেলায় যা কিছু স্বপ্ন দেখেছি তার সবই ছাড়িয়ে গেছে এই ট্রেনযাত্রা।'

দুঃখের কথা আর কী বলব, এক পক্ষকাল আলাস্কায় বিচরণ করে ফেরার পথে বিমানে একটা বইয়ে পড়লাম, বছরের নানা সময়ে আলাস্কা রেলরোডের নানা ধরনের ট্রেন ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। অ্যাঙ্কারেজ থেকে হুইটিয়ার ভ্রমণের ট্রেনের নাম গ্লেসিয়ার ডিসকভারি, মে-র মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত চালু থাকে। গার্ডউড থেকে হুইটিয়ার— এই প্রায় ১৩ মাইল রেলপথে দুটো টানেল পড়ে। তার একটা প্রায় তিন মাইল লম্বা।

আরেকটা ট্রেনের নাম ডেনালি স্টার। যায় অ্যাঙ্কারেজ থেকে ফেয়ারব্যাঙ্কস। পথে ওয়াসিলা, টালকিটনা আর ডেনালি ন্যাশনাল পার্কে থামে। অ্যাঙ্কারেজ থেকে সিউয়ার্ড যাতায়াতের ট্রেনের নাম কোস্টাল ক্লাসিক। গার্ডউডগামী প্যাসেঞ্জারদের

জন্য এই ট্রেন সিউয়ার্ড হাইওয়ের ধারেও একটা স্টপ দেয়।

আলাস্কা রেলপথে এরকম আরও ট্রেন আছে। পড়ছি আর মনের মধ্যে হু-হু করে উঠছে। আসলে আমাদের অনেকেরই ধারণা, আলাস্কা ভ্রমণ মানেই শিপ ক্রুজ বা বিলাসবহুল জাহাজে সমুদ্রবিহার! ইংরিজি বাংলা কাগজে আলাস্কাভ্রমণের ছোট ছোট বৃত্তান্তে বা যাঁরা বেরিয়ে এসেছেন তাঁদের মুখের বর্ণনায় শুধুই এই জাহাজযাত্রার অভিজ্ঞতা। এটাই আলাস্কাভ্রমণের বহুপ্রচারিত পথ। মন্দের ভালো যে কখনও আলাস্কা উপসাগর, কখনও প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে আলাস্কার ইনসাইড প্যাসেজে এই জাহাজযাত্রার পর আমরা আরও সপ্তাহখানেক আলাস্কার অভ্যন্তরে ঘোরবার ব্যবস্থা করেছিলাম।

অ্যাঙ্কারেজের হাট দেখে যখন টালকিটনায় পৌঁছলাম, তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে, যদিও চারদিকে ঝকঝক করছে আলো।

পরদিন সকালে টালকিটনা নদীতে ডিঙি চড়ে ঘুরলাম। নদী-বিহার সংস্থার দুটি মেয়ে হোটেল থেকে ছোট কোচে আমাদের নদীতীরে নিয়ে গেলেন। যাত্রী বলতে চারজন। আমরা দুজন, আর এক বয়োবৃদ্ধ আমেরিকান দম্পতি। সুরক্ষা জ্যাকেট পরে ডিঙিতে উঠে বসলাম। দ্বিতীয় মেয়েটি ডিঙি বাইতে বাইতে প্রায় সর্বক্ষণ নদীর বিষয়ে বলে গেল।

এক জায়গায় নদীর স্রোতের ওপর, প্রায় তীর ঘেঁসে বড় বড় গাছ শুয়ে পড়ে আছে। নিষ্পত্র, শুকনো, প্রাণহীন। ডিঙি-বালিকা বুঝিয়ে দিলেন, এ হল বিভারের কাণ্ড। এই উভচর লোমশ প্রাণী এইভাবেই গাছ কেটে জলে ফেলে দেয়। বেশ কিছু গাছ ফেলে নিজেদের বসতি বানায়। মনে পড়ল গত বছর নভেম্বরে আন্টার্কটিকা যাবার পথে উশুয়াইয়ায়ও বিভারদের এরকম অদ্ভুতভাবে কেটে রাখা গাছ দেখেছিলাম।

নদীর দু পাশে এত সবুজ যে মনে হয় নদীটি যেন সবুজ চিরে চলে গেছে। আলাস্কায় নদী, রাস্তা, রেলপথ— সবই দেখেছি সবুজ চিরে চলে যায়।

৩

আলাস্কার দিনগুলো শেষ হয়ে আসছে। টালকিটনায় আজ দ্বিতীয় দিন, তার মানে আজই এখানে শেষ রাত। এরপর তো আর মাত্রই তিনটি রাত। অতএব একদিনেই দুই নিসর্গ। এবেলা নদী, ওবেলা পাহাড়। ডিঙি নৌকোয় নদী, ছোট্ট বিমানে পাহাড়। নদীর নাম টালকিটনা, পাহাড়ের নাম ম্যাককিনলে। উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এই মাউন্ট ম্যাককিনলে। ২০,২৩০ ফুট।

নদী থেকে ফিরে চটপট দুপুরের খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লাম ছোট্ট বিমানবন্দরের উদ্দেশে। হোটেল থেকে বিমানসংস্থার কোচে যাতায়াতের ব্যবস্থা।

পাইলটের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর পাশের সিটে বসতে দেওয়ার অনুরোধ জানালাম। ছবি তোলার কথাটাও বলতে হল। সবটাই শুনলেন, প্রায় নীরবে

বিড়বিড় করে কী বললেন বোঝা গেল না। সকলে বিমানের দিকে এগিয়ে চলেছেন। পাইলট, কো-পাইলট ছাড়া আটজন যাত্রী। বিমানের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের উদ্দেশে নিরাপত্তা বিষয়ক কিছু নির্দেশোক্তি শোনালেন। তারপরই ঘোষণা করলেন, আই অফার মাই কো-পাইলট'স সিট টু মিস্টার চক্রবর্তী।

কথাটা আমার কানে যেন মধু বর্ষণ করল।

প্লেন আকাশে কিছুটা থিতু হবার অল্প পরেই ওপরে নীচে চারপাশে শুধুই সৌন্দর্যের লীলাভূমি। অনেক নীচে পুরু সবুজের মধ্য দিয়ে ভয়ানক খামখেয়ালি নদীর রেখাচিত্র, সবুজ গালিচার ছোট-বড় ফুটো-ফাটার মধ্যে টলটলে নীল জল, কোথাও শুধুই ন্যাড়া ভূমি— পাইলটের কথায় জানা গেল এসবই শেষ তুষার যুগের দাগ। একটানা চেয়ে থেকেও চোখের পলক ফেলতে ইচ্ছে করে না। বন্ধ জানলার আঁকিবুঁকি দাগটানা কাচের মতো ফাইবার গ্লাসের মধ্য দিয়ে ছবি নেওয়া নিরর্থক, তাছাড়া প্লেনের দুলুনি-ঝাঁকুনি কাটিয়ে ক্যামেরা স্থির রাখাও অসম্ভব। ফলে স্থিরচিত্র, চলচ্চিত্র কোনওটাই মনের মতো হল না।

চারদিকে অবিশ্বাস্য দৃশ্যজগৎ, আমাদের শত নীচতাময় সামান্য সমতলী জীবনে এ যেন এক অলৌকিক সৌন্দর্যলোক। ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে দিয়ে দেখেও অদ্ভুত আবেগে বুক আলোড়িত হয়। শুধু দুঃখ, ওইসব বিস্ময়দৃশ্য শুধু আমার হৃদয়েই দাগা রইল, ক্যামেরায় অবিকল ধরা গেল না।

আরেকটু ওপরে উঁচুনিচু পাহাড়চূড়ার যেন মেলা বসেছে, কাছেই বিরাট বিরাট চওড়া গ্লেসিয়ারময় উপত্যকা। আমাদের ছোট বিমান ঘুরতে ঘুরতে সর্বোচ্চ ম্যাককিনলে পর্বতচূড়ার ছ মাইলের মধ্যে চলে এসেছে। ফোরাকের শৃঙ্গ (১৭,৪০০ ফুট) আর হান্টার পর্বতচূড়াও (১৪,৫৭৩ ফুট) কাছ থেকে দেখা হল। এ দুইয়ের প্রায় মাঝখানে ৪৫ মাইল লম্বা আর ৩ মাইল চওড়া কাহিল্‌তনা গ্লেসিয়ার।

আরও রোমাঞ্চকর, প্লেন সন্তর্পণে তুষারভূমি স্পর্শ করল, আমরা একটা গ্লেসিয়ারে নামলাম। আমাদের স্নিকারের ওপর আরও একটা বড় জুতো পরতে হয়েছিল, ফলে তুষারক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালাম। ছবিও তুললাম আরামে।

৪

পরদিন টালকিটনাকে বিদায় জানিয়ে ট্রেনে চড়লাম। যাব ডেনালি। এ সেই আলাস্কা রেলরোডের ট্রেন। দেখলেই বেড়ানোর আনন্দে বুকের মধ্যেটা গুরগুর করে ওঠে। নীল আর হলদে রঙের ট্রেন। পর্যটনের মরসুমে মূল ট্রেনের সঙ্গে ট্যুর কোম্পানির নিজস্ব কোচ জুড়ে দেওয়া হয়। 'হল্যান্ড আমেরিকা' সংস্থার কোচের নাম হল্যান্ড আমেরিকা হলেও সেলিব্রিটি ট্যুরের কোচের নাম উইল্ডারনেস

এক্সপ্রেস। একেকটা ট্রেনে এরকম তিন-চারটি সংস্থার তিন-চারটি কোচ থাকে। আমরা উঠলাম উইল্ডারনেস এক্সপ্রেসে। একতলায় সুসজ্জিত খাবার ঘর, টয়লেট ইত্যাদি, দোতলায় স্বচ্ছ ফাইবার গ্লাসে পুরো ঢাকা বসবার আসন। কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে নদী। দুপাশেই গাছপালা, পাহাড়। সবার ওপরে নীল আকাশ, সামনেই তুষারাবৃত পর্বতচূড়া, গ্লেসিয়ার। কখনও নদীর ওপর ব্রিজ। ট্রেন প্রায় অর্ধবৃত্তের আকারে ব্রিজের ওপর দিয়ে বেঁকে চলে।

ট্রেনের খাওয়া-দাওয়া অতি উচ্চাঙ্গের। যত্নে রচিত, অতি সুস্বাদু। স্যামন বা হালিবুটের যে কোনও পদ দেবভোগ্য বললেই হয়। ডেজার্টও সুমধুর। সে তুলনায় দাম গলা কাটা নয়।

রেললাইনের ধার ঘেঁসেই বন। বন থাকলে পাখিও থাকে। হঠাৎ হঠাৎ অচেনা পাখি গাছের ডালে উড়ে এসে বসে, কিংবা ডাল ছেড়ে দূরে উড়ে যায়।

রেললাইনের দুধারই ফায়ারউইড ফুলে রাঙা। ছোট ছোট সবুজ গাছে ফুল ধরে আছে। চলন্ত ট্রেন থেকে দেখায় যেন গাঢ় গোলাপির দীর্ঘ পোচ। আগুন লেগে পুড়ে যাবার পরও খুব দ্রুত আবার ফুটে ওঠে বলেই নাকি এ-ফুলের নাম আগুনে আগাছা। মাঝে মাঝে আলাস্কার জাতীয় ফুল নীলবর্ণ ফরগেট-মি-নটও চোখে পড়ছে। আলাস্কার বাসিন্দাদের বিশ্বাস, ফায়ারউইড গাছের ডগা অব্দি ফুলে ভরে গেলে আর ছ-সপ্তা বাদেই ভয়াবহ শীতের আগমন!

সারা আলাস্কায় নদী বন পাহাড় গ্লেসিয়ার প্রচুর, হ্রদ বোধহয় কয়েক লক্ষ। তার মধ্যে আরও একটা সৌন্দর্য— মানুষের ঘন বসতি নেই। ৫ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৭৪ বর্গমাইল আয়তনের আলাস্কায় জনসংখ্যা মাত্র ৬ লক্ষ ২১ হাজার। তার প্রায় অর্ধেকেরই বাস অ্যাঙ্কারেজে। ফলে প্রকৃতি এখানে অবাধ ও বিপুল। সাহসী ও স্বাধীনচেতা। তার সৌন্দর্যই আলাদা।

ডেনালি 'ডিপোয়' অর্থাৎ 'স্টেশনে' নেমে নির্দিষ্ট কোচে ডাউনটাউন পেরিয়ে প্রবল উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথ থেকে অনেক নীচে দেখলাম গভীর খাদের মধ্য দিয়ে নদী বয়ে চলেছে। দূর থেকে ঘন সবুজ পাহাড়ের কোলে সাদা রঙের ছোট্ট খেলনাবাড়ির মতো দেখতে পাচ্ছি গ্র্যান্ড ডেনালি লজ। একটু পরে সেই অরণ্যনিবাসে পৌঁছে এক অনির্ণীত আনন্দে মন ভরে যায়। এখানে আসবার এই পথ প্রায় পুরোটাই ডেনালি ন্যাশনাল পার্কের মধ্য দিয়ে।

জিনিসপত্র হোটেলে রেখে একটু পরেই বেরিয়ে পড়লাম। অরণ্যনিবাসের সামনে থেকেই বিনা ভাড়ার কোচ শহরে যাতায়াত করে। তারই একটাতে উঠে বসি। ডেনালি জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে চলে এলাম ডাউনটাউন এলাকায়। ডাউনটাউন বলতে দুয়েকটা দোকান, দু-চারটে খাবার দোকান আর বিরাট চওড়া রাস্তা, আকাশচুম্বী পাহাড় আর নদী।

ফেরার পথে ভুল কোচে উঠে আমাদের মস্ত লাভ হল। জাতীয় উদ্যানের মধ্যে যেসব অরণ্যাবাস আছে সেসব জায়গার পর্যটকদের আগে নামিয়ে কোচটা

সবশেষে যাবে আমাদের হোটেলে। ফলে ছোট ছোট শাখা পথে ঘুরে আমাদের চমৎকার উদ্যানবিহার হল।

হোটেলে ফিরতেই আমাদের ভ্রমণসঙ্গিনী-তথা-পরিচালক শ্রীমতী কোল জানালেন, কাল সকাল ছ'টায় ঘরের বাইরে দরজার সামনে বাক্স বের করে দিয়ে সাতটায় ব্রেকফাস্ট খেয়ে সাড়ে সাতটায় কোচে উঠতে হবে— সারাদিন ধরে ঘোরা হবে আলাস্কার তুন্দ্রা অঞ্চলে, ডেনালি ন্যাশনাল পার্কে।

ব্রেকফাস্ট হোটেলে পাওয়া যাবে না, যেতে হবে এদেরই একটা রেস্টুরেন্টে— এই হোটেলের কাছেই, শ-দুয়েক গজ দূরত্বে। ছ'টায় বাক্স বের করে দিয়ে, তাড়াহুড়োয় তৈরি হয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে রেস্টুরেন্টের দিকে এগোচ্ছি, দেখি বড় একটা কোচের পাশেই অন্য সকলের ক্যারিব্যাগের মধ্যে আমাদের হাতে-টানা ছোট ব্যাগটাও রাখা আছে। একে একে কোচের পেটের মধ্যে বাক্স রাখার জায়গায় সেগুলো তোলা হচ্ছে। বড় লাগেজ অবশ্য আগেই অন্য কোচে রওনা হয়ে গেছে, সোজা ফেয়ারব্যাঙ্কস পৌঁছে দেওয়া হবে। ডেনালি ন্যাশনাল পার্ক দেখে বিকেলে আমরা ডেনালি স্টেশনে চলে যাব, সেখান থেকে আলাস্কা রেলে ফেয়ারব্যাঙ্কস।

ব্যাগের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে ব্রেকফাস্টের জন্য এগোচ্ছি, এক মহিলা এসে ট্রাফিক পুলিশের মতো হাত বাড়িয়ে পথ আগলে দাঁড়ালেন— প্লিজ টেক ইয়োর সিট। আই উইল স্টার্ট দা কোচ ইন অ্যানাদার থ্রি মিনিটস।

ব্রেকফাস্টের কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করেও রেস্টুরেন্টের দিকে এগোবার অনুমতি পাওয়া গেল না। পাল্টা উত্তর— ইটস উইথ মি। আ'য়্যাম ইয়োর ড্রাইভার-কাম-গাইড।

যাক নিশ্চিন্ত হয়ে বাসে উঠে পড়া গেল।

বনভ্রমণ বা জাতীয় উদ্যান বিচরণের বাহন আরামদায়ক হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের পোর্ট ব্লেয়ার থেকে রঙ্গতের পথে অপরিসর বাসের মতো। মাঁঝখানে কদমতলা জেটি অঞ্চলে জারোয়াদের বিষমাখা তীরের ভয়ে কাচের জানলাও বন্ধ। ডেনালি ন্যাশনাল পার্কে ঘোরার বাসও অনেকটা তেমনই। তবে পায়ে হেঁটেও ঘোরা যায়।

ডেনালি পার্ক রোডের ১ মাইলে এজন্য ভিজিটর সেন্টার আছে। সেখান থেকে পার্কের ম্যাপ নিয়ে পার্কে ঘোরার সাটল কোচের ব্যবস্থা করে দু-তিনদিন ধরে ঘুরলে তবেই এই গাছপালা পশুপাখির সঙ্গে চারপাশের পাহাড় নদী আকাশ-বাতাসের পরম আত্মীয়তাময় এই তেপান্তর সত্যিকার দেখা হয়। ইকো সিস্টেমই ডেনালির বড় বৈশিষ্ট্য।

ডেনালি ন্যাশনাল পার্ক অ্যান্ড রিজার্ভের আয়তন ষাট লক্ষ একরের কিছু বেশি। মহাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ম্যাককিনলে আর বিশাল আলাস্কা পাহাড়শ্রেণী সবসময় চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। নদী, গ্লেসিয়ার, অরণ্য আর পাহাড়ের গায়ে তুন্দ্রাভূমি ডেনালিকে প্রাকৃতিক-সম্পদ আর সৌন্দর্যের মহাভূমি

করে তুলেছে। সে তুলনায় বন্যপ্রাণীদের বিচরণ সামান্যই। যেসব বিদেশি ট্যুরিস্ট শুধু বন্যপ্রাণী দেখতেই বনে যান, তাঁরা এখানে হতাশ হবেন। সামান্য একটা মেঠো কাঠবিড়ালি বা বহু দূরে একটা গোল্ডেন ঈগল দেখতে সাহেবদের তীব্র ব্যাকুলতা ও দেখতে পেয়ে বনের সব রীতিনীতি ভেঙে, উত্তেজিত আলোচনা আমাদের কাছে কিছুটা বিস্ময়ের, কিছুটা বিরক্তিকরও। এইসব জাতীয় উদ্যান তো আর আমাদের ওড়িশার নন্দনকানন বা ত্রিপুরার সিপাহিজলা নয় যে এক চক্কর ঘুরে নিলেই বনের পশুপাখিরা সার বেঁধে দর্শন দিয়ে যাবে!

জানলা দিয়ে উপত্যকার বুকে এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া নদী, আলাস্কা গিরিশ্রেণী, পাহাড়ের বুকে সবুজ তুন্দ্রাভূমি, মহিমান্বিত ম্যাককিনলে পর্বতশৃঙ্গ দেখতে দেখতে চলেছি। মেঠো কাঠবিড়ালি, মুশ, দুয়েকটা বল্গা হরিণও কখনও কখনও চোখে পড়ছে। এদিকে দশটা, এগারোটা, বারোটা বেজে গেল, ব্রেকফাস্টের আর নামগন্ধ নেই।

একটা নাগাদ ড্রাইভার-কাম-গাইড এক গোছা প্লাস্টিকের ব্যাগ প্রথম সারির যাত্রীদের হাতে দিয়ে বললেন, নিজে নিয়ে পাশের যাত্রীকে দিন, পাশের যাত্রী দেবেন তাঁর ডানদিকের যাত্রীকে। তিনি আবার তাঁর পিছনের যাত্রীকে ব্যাগের গোছা এগিয়ে দেবেন। তারপর জিগজ্যাগ করে বাকি সকলের মধ্যে এগুলো বিতরণ করে দিন। খাওয়া হয়ে গেলে খাবারের অবশিষ্টাংশ ও প্যাকেটটা এই প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে রাখবেন। পরের স্টপে নেমে যেখানে কফি বা চকোলেট খাবেন, সেখানে এগুলোও জমা দেবেন। ওঁরা এগুলো পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। আপনাদের এই পরিশ্রম আর প্রকৃতিপ্রেমের বিনিময়ে ওঁরাই আপনাদের গরম কফি বা তরল চকোলেট খাওয়াবেন একেবারে বিনামূল্যে।

খাবারের উচ্ছিষ্ট ফেলবার ব্যাগ যখন এসেছে তখন খাবারও আসবে নিশ্চয়ই!

সব প্লাস্টিক ব্যাগ বিলি হয়ে যাবার পর একই রীতিতে খাবারের প্যাকেটও বিতরণ করা হল। দেখে ভালো লাগল, প্যাকেটে হাতে আঁকা নানা বন্যপ্রাণীর ছবি। ছাগলমুখো বাঁকা-শিং ধপধপে সাদা ভেড়া (Dall Sheep), ব্রাউন বিয়ার, মস্ত মস্ত শিংওলা রেন ডিয়ার। অঙ্কন অতি উচ্চাঙ্গের।

প্যাকেট খুলে দেখি স্যান্ডউইচ আর সসেজই প্রায় পুরো জায়গাটা জুড়ে আছে।

কিসের স্যান্ডউইচ? বিফের। কিসের সসেজ? রেন ডিয়ারের। বিফের শামি কাবাব বহুকাল আগে যদি-বা খেয়েছি, নুনমশলাহীন সিদ্ধ গোমাংসের স্যান্ডউইচ খাইনি কখনও। রেন ডিয়ার বা বল্গা হরিণের সসেজ তো দূরস্থান, শূকর মাংসের সসেজও মুখে তুলি না— সে-ও প্রায় পনেরো-কুড়ি বছর হতে চলল।

আজকাল পৃথিবীর অনেক দেশেই বুফে ব্রেকফাস্টের খাদ্যসম্ভারে পর্ক বা বিফের সসেজের বদলে চিকেন সসেজের চল হয়েছে, খাদ্যরসিকদের কাছে তা যতই অচল হোক। বছর কয়েক আগে অস্ট্রেলিয়ার ওলঙ্গনে বিরাট এক বৌদ্ধমন্দিরের অতিথিশালার নিরামিষ ভোজনকক্ষে নানা দেশের কবিদের সঙ্গে

পংক্তিভোজনে সয়াবিনের সসেজ খেয়েছিলাম। একেবারে আসল সসেজের স্বাদ, ধোঁয়ার গন্ধ সহ! সয়াবিন বলে চিনতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম।

আলাস্কায় এ হল রেন ডিয়ারের সসেজ! রেন ডিয়ারের ছন্দোময় শাখাপ্রশাখার মতো শিং থেকে আমি চট করে চোখ ফেরাতে পারি না। প্যাকেটের সসেজগুলোর দিকে তাকিয়ে তার বড় বড় চোখদুটিও আমার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল।

ছোট্ট একটা হাওয়াভরা প্যাকেটে আট-দশটি আলুভাজা পাওয়া গেল, আর ভেতরে-স্ট্রবেরি-জ্যাম-দেওয়া দুটি বিস্কুট, তাই দিয়ে ব্রেকফাস্ট, থুরি লাঞ্চ, থুরি দুটোই অর্থাৎ ব্রাঞ্চ সারলাম।

ডেনালি উদ্যানের বন্যপ্রাণীদের কিছু তথ্য নিয়ে একটা সচিত্র পুস্তিকা পর্যটকদের উপহার দেওয়া হল। ছোট বই, সংক্ষিপ্ত লেখা, অসাধারণ ছবি, তেমনই ছাপা কাগজ লে-আউট। বনের প্রতি ভালোবাসা ছাড়া এমন উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি সম্ভব নয়। এ বইতেই দেখছি এখানে সতেরোশো ক্যারিবু, দুহাজারের মতো মুশ, আড়াই হাজার ডল শিপ (Dall Sheep), তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো গ্রিজলি বিয়ার আর একশো নেকড়ে আছে। এরা হল ডেনালি ন্যাশনাল পার্ক অ্যান্ড রিজার্ভের বাসিন্দা বা বিচরণকারী। এখানে একশো ষাট প্রজাতির পাখি, সাঁইত্রিশ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী আর শত শত প্রজাতির উদ্ভিদ আছে। বিশ্বের বৃহত্তম শিকারি পাখি সোনালি ঈগলের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা এখানে ভালোই। বেশ দুয়েকটা উড়ন্ত সোনালি ঈগল আমরাই দেখলাম। গাছের ডালেও দেখেছি, একসঙ্গে কয়েকটা বসে আছে। হয়তো ওই গাছেই ওদের বাসা। ডেনালি উদ্যানে এরকম প্রায় সওয়াশো জোড়া সোনালি ঈগলের বাসা।

ডেনালি ন্যাশনাল পার্কে আমি মুগ্ধ হয়েছি প্রাণবান প্রকৃতির প্রবল রূপ দেখে। মাইলের পর মাইল জুড়ে আকাশচুম্বী মাউন্ট ম্যাককিনলে তো আছেনই, প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত আলাস্কা গিরিশ্রেণীর প্রবল দাপটও দেখবার মতো। দেখেছি তুন্দ্রার লাবণ্য— পাহাড়ের গায়ে উঁচুতে ঘন সবুজ নিচু ঝোপের বিস্তার। ড্রাইভার-কাম-গাইড মার্কিন মহিলা জানালেন, এই তুন্দ্রাভূমি শীতকালে পুরু বরফের তলায় চাপা পড়ে যাবে। শীতের শেষে বরফ গললেই আবার যে কে সেই, সবুজ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে। একটা নদী দেখলাম বুক চিরে বিশাল পাহাড়ের একেবারে নিচ পর্যন্ত চলে গেছে।

৫

বিকেল বোধহয় তিনটে-চারটে নাগাদ বন থেকে বেরিয়ে সোজা ডেনালি স্টেশনে পৌঁছলাম। এবার আলাস্কা রেলের ট্রেনে যাব ফেয়ারব্যাঙ্কস।

আবার স্বর্গলোকের মধ্য দিয়ে যাত্রা। সেই অরণ্য, পাহাড়, নদী, নদীর গর্জ, গভীর গিরিখাতে বয়ে চলা খরস্রোতা নদী। অনেক নীচে সেই প্রবল স্রোতে র‍্যাফটিং যতক্ষণ দেখা যায় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতেই হল। মাঝে মাঝে সুড়ঙ্গের মধ্য

দিয়ে ট্রেন চলেছে, কখনও-বা ব্রিজ পেরিয়ে।

ফেয়ারব্যাঙ্কসে ট্রেন পৌঁছল রাত সওয়া আটটায়। টালকিটনা থেকে ডেনালি যেমন প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার পথ, ডেনালি থেকে ফেয়ারব্যাঙ্কসও তেমনই সাড়ে চার ঘণ্টার রেলযাত্রা। আমার খুব ইচ্ছে যে শীতকালে এই ট্রেনে একবার সিউয়ার্ড থেকে ফেয়ারব্যাঙ্কসে আসব। তখন অবশ্য পুরো রেলপথ আট-দশ ফুট বরফের তলায়, বরফ কেটে রেললাইনের দুপাশে কুড়ি-পঁচিশ ফুট উঁচু সেই বরফের দেওয়াল তৈরি হয়ে যায়। মনে হয় যেন বরফের সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলেছে। রেলের যাত্রীসেবিকার মুখে এই বিবরণ রুদ্ধশ্বাসে শুনতে শুনতে আমার মনের ইচ্ছেটা প্রায় সংকল্পে দাঁড়িয়ে গেল।

আলাস্কার উত্তরের শহর ফেয়ারব্যাঙ্কস সম্পর্কে বলা হয়— ১৯০০র প্রথম দশকে সোনা, বিশের দশকে রেললাইন আর সত্তরের দশকে তেল এ শহরে উন্নয়নের ঢেউ তুলেছে। এই তিন তরঙ্গে উপচে পড়েছে ফেয়ারব্যাঙ্কস।

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আলাস্কা-রেলপথ আগে দেখা হল, এবার চললাম এল ডোরাডো সোনার খনি দেখতে। ছোট ট্রেনে ছোট্ট রেলপথে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হল। সোনার খনি আবিষ্কার থেকে সোনা নিষ্কাশন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটাই পর্যটকদের সামনে করে দেখানো হল। তারপর সবাইকেই কিছুটা করে সোনাগুঁড়োময় ধুলো বালি দেওয়া হল, আর একটা করে চাটু বা কড়াই জাতীয় পাত্র। এই প্যানে ওই ধুলোবালি বার বার নেড়েচেড়ে জলে ধুয়ে আবার নেড়ে শেষ পর্যন্ত সোনার কুচি বার করতে হবে। যে যত সোনা পাবে সবটাই তার। কে কত ডলারের সোনা পেল, সবশেষে তাও ওজন করে জানিয়ে দেওয়া হবে।

সব জাতির সব ধর্মের সব বর্ণের নারীপুরুষ এই কাজে মেতে গেলেন। একমাত্র আমি ছাড়া। দেখলাম সোনার আকর্ষণ দেশকালজয়ী। শতবর্ষ আগের আলাস্কায় বিখ্যাত গোল্ড রাশের উন্মাদনা কিছুটা প্রত্যক্ষ করা গেল।

ফেয়ারব্যাঙ্কস থেকে মাত্র ২২০-৩০ মাইল উত্তরে সুমেরু বৃত্ত। সেই বৃত্ত পার হয়ে এস্কিমোদের গ্রাম কোল্ড ফুট, তারপর ওয়াইজ ম্যান, তারপর ঘুরতে ঘুরতে আরও উত্তরে, আলাস্কার সর্বোত্তর বিন্দু, বোফোর্ট সমুদ্রকূলে ইনুপিয়াং এস্কিমোদের আদিবাস 'ব্যারো' গ্রামে পৌঁছে সেখানে কয়েকদিন থাকবার অপূর্ণ বাসনা নিয়ে এ যাত্রায় ফিরে আসতে হল।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৫

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
সম্পাদিত

স্বর্ণাক্ষর